বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস

দর্শন চৌধুরী

২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

প্রিয়াংকা চৌধুরী

ও

রাজর্ষি চৌধুরীকে

মানুষের মানসিক বিকাশ, রুচি ও সংস্কৃতির অবস্থান সেখানকার থিয়েটারে প্রতিধ্বনিত হয়। আর সেই থিয়েটারের দ্বারা সেই দেশের নাটকরচনা ও তার অভিনয়ও নিয়ন্ত্রিত ও পরিগঠিত হয়। তাই তো বলা হয়, একটা জাতিকে জানা যায় তার থিয়েটারের মাধ্যমে।

বাংলায় ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে ধারাবাহিকভাবে নানা থিয়েটার নানা ভাবে গড়ে উঠেছে। সেইসব থিয়েটারের অবস্থা, তাদের নীতি ও আদর্শ এবং সেখানে কি ধরনের নাটক অভিনীত হয়েছে তার পরিচয় এখানে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। মঞ্চ, নাটক, নাট্যকার, অভিনেতা অভিনেত্রী, পরিচালক, মালিক, মঞ্চের নেপথ্যকর্মী, সঙ্গীত, নৃত্যগীত এবং দর্শক, সব নিয়ে গড়ে ওঠে একটা দেশের থিয়েটারের ইতিহাস। তার ভালোমন্দের দায়দায়িত্ব সেই থিয়েটারের সর্বাঙ্গীন পরিমণ্ডলকে বাদ দিয়ে কখনোই আলোচনা সম্পূর্ণাঙ্গ করা যায় না। তাই থিয়েটারের ইতিহাস রচনার প্রয়াস সবদেশেই নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসের পাশে পাশে লক্ষ করা যায়। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস গ্রন্থ রচনায় সেই সর্বার্থ প্রচেষ্টাই কার্যকরী হয়েছে।

গ্রন্থ রচনায় পূর্বসূরি প্রায় সমস্ত গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেছি। তবে উদ্দেশ্য, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ একান্তই আমার নিজস্ব। এই কাজে সবসময়ে উপদেশ ও সাহায্য পেয়েছি আমার শিক্ষক-প্রতিম অধ্যাপক ড. ক্ষেত্র গুপ্ত মহাশয়ের কাছে। বন্ধুবর অধ্যাপক ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার শুভানুধ্যায়ী। সে কোনোরকম ধন্যবাদের তোয়াক্কা না করেই আমাকে সব ব্যাপারে সাহায্য করে যায়। বন্ধুবর অধ্যাপক ড. তাপস মুখোপাধ্যায় এবং তার স্ত্রী রুবি মুখোপাধ্যায় তাদের সংগৃহিত বিশাল গ্রন্থসম্ভার সব সময়ে ব্যবহার করতে দিয়েছে। আমার স্ত্রী সীমা এবং পুত্রকন্যা রাজর্ষি ও প্রিয়াংকা সবসময় নিরন্তর সহযোগিতা না করলে এই গ্রন্থ রচনা সম্ভবই হত না। ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান অভেদানন্দ চৌধুরীর সহযোগিতাও মনে রাখতে হবে।

'পুস্তক বিপণি'র শ্রী অনুপকুমার মাহিন্দার গ্রন্থ প্রকাশের সব ঝামেলা হাসিমুখে গ্রহণ করে আমাকে নিশ্চিন্ত করেছে। স্নেহভাজন অনুপের মঙ্গল কামনা করি।

দর্শন চৌধুরী

জানুয়ারি, ১৯৯৫
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
ও
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস' গ্রন্থটির দ্বিতীয় পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হলো। নতুন কয়েকটি পরিচ্ছেদে একাধিক থিয়েটার ও নতুন কয়েক জন নাট্যব্যক্তিত্ব যুক্ত করে দিলাম। 'প্রসেনিয়াম থিয়েটার' নিয়ে একটি নতুন পরিচ্ছেদ যুক্ত হলো।

তাছাড়া, প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পর নানা গুণীজনের যে সব পরামর্শ ও উৎসাহ পেয়েছিলাম, দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সুযোগে সেগুলি সব কাজে লাগালাম।

তাই বেশ কিছু সংশোধন ও পরিবর্তন করতে হলো। তাতে অবশ্য পূর্ব সংস্করণের মূল ভাবনা ও তথ্যবিশ্বাস খুব একটা হেরফের হয়নি। বহুদিন ধরে গড়ে ওঠা আমার থিয়েটার-ভাবনা সবসময়েই গ্রন্থ রচনার সময়ে কাজ করে গেছে। সেখান থেকে নতুন সংস্করণের সময়েও সরে আসতে হয়নি বলে আমি আশ্বস্ত।

এই গ্রন্থে আমি শুধু থিয়েটারের বিবরণ ও নাট্যাভিনয়ের তালিকা দিইনি। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বাংলা থিয়েটারের কার্যকরী ভূমিকা, তার সার্থকতা ও ব্যর্থতা নিয়েও আলোচনা করেছি। কোন্ থিয়েটারের অবস্থান ইতিহাসের ধারায় কোনখানে হতে পারে, তারও হদিশ সন্ধান করেছি। নাট্যপ্রযোজক, অভিনেতা-অভিনেত্রী, নাট্যপরিচালক, মঞ্চাধ্যক্ষ, সুরকার প্রভৃতি নাট্যব্যক্তিত্বদের অবদান কতোখানি তারও মূল্যায়ন করতে চেয়েছি। এবং এই থিয়েটারের পরিবেষ্টনের উত্থান-পতন ও বিনির্মাণের মধ্যে নাট্যকারদের ভূমিকা, বাংলা নাটকের সমৃদ্ধি ও ন্যূনতারও খোঁজখবর করার চেষ্টা করেছি।

আমার এই প্রয়াস যে নাট্যরসিক মানুষজনের কাছে আদৃত হয়েছে, তাতে আমি খুশি। দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশের মুহূর্তে তাঁদের সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই সংস্করণ প্রকাশের জন্য যে বাড়তি পরিশ্রম করতে হলো, তাতে সবসময় উৎসাহ ও ইন্ধন জুগিয়ে গেছে আমার পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়। তাঁর মঙ্গল কামনা করি।

পূর্বের সংস্করণের চেয়েও এই সংস্করণটিকে আরো শোভন ও দৃষ্টিনন্দন করে তোলবার নিরন্তর চেষ্টা করেছে শ্রী অনুপকুমার মাহিন্দার। তার চেষ্টা সফল হোক।

নতুন বছরের শুরুতে গ্রন্থটি প্রকশ করতে পেরে ভালোই লাগছে।

মাস্টারপাড়া
কোন্নগর। হুগলী
১ জানুয়ারি, ১৯৯৯

দর্শন চৌধুরী

সূ চি প ত্র

নাট্যশালা ও নাটক

প্রশ্ন উঠতেই পারে যে নাটক পাঠ ও সমালোচনা করতে গেলে সেই নাটকটির অভিনয়কালীন নাট্যশালার পরিচয় জানার প্রয়োজনীয়তা কতোখানি? কিংবা প্রশ্ন হতে পারে যে, নাটক ও নাট্যশালার পারস্পরিক সম্পর্ক কতোখানি?

সাহিত্যশিল্পের অন্যসব শাখায় স্রষ্টা ও উপভোক্তার মধ্যে সম্পর্ক সরাসরি। উপন্যাস, ছোটগল্প, কাব্য, প্রবন্ধ ইত্যাদি যাই-হোক-না কেন, তার সঙ্গে পাঠকের সম্পর্ক সোজাসুজি এবং স্পষ্টতর। কিন্তু লিখিত নাটক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়ে দর্শকের সামনে হাজির হয়। দর্শক অভিনয়ের মাধ্যমে সেই নাটকের রস উপভোগ করেন, আনন্দ লাভ করেন। নাটকের এই 'থিয়েট্রিক্যাল ভ্যালু' তার সবচেয়ে বড় সম্পদ। অবশ্য নাটকের 'লিটারারি ভ্যালু' নির্ণয়ের জন্য 'রিডিং ড্রামা' বলে নাটকের বিচার করা হয়। সাহিত্যের শিল্পগত বিচারে সেখানে নাটকের পাঠ্যরূপের বিচার চলে। অভিনয় অর্থাৎ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই। কিন্তু নাটক যেহেতু 'মিশ্রশিল্প' (কম্পোজিট আর্ট) সেইহেতু নাটকের বিচার শুধুমাত্র সাহিত্যগত দিক দিয়ে করলেই তার বিচার সম্পূর্ণাঙ্গ হয় না।[১]

নাট্যকার নাটক লেখেন, সেই লিখিত নাটক রঙ্গমঞ্চের মাধ্যমে দর্শকের সামনে হাজির হয়। আর নাটক অভিনীত হতে গেলেই, নির্দেশক, রঙ্গমঞ্চ, রঙ্গমঞ্চের নানা উপকরণ ও প্রস্তুতি, অভিনেতা-অভিনেত্রী--এসব কিছুর প্রয়োজন হয়। তাই লিখিত নাটক তার এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। দুই-তৃতীয়াংশ রয়েছে নাট্য প্রযোজনার বিবিধ প্রস্তুতি ও সহযোগিতার মধ্যে। নাট্যকারের নাটক তৎকালীন 'মঞ্চব্যবস্থার' মধ্য দিয়ে দর্শকের কাছে উপস্থিত হয়। তাহলে নাটক ও দর্শকের মাঝে থেকে যাচ্ছে মঞ্চব্যবস্থা। 'মঞ্চব্যবস্থা' কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। সংক্ষেপে 'মঞ্চব্যবস্থা' বলতে বোঝায়, সেই যুগের রঙ্গমঞ্চ (Stage) , সেই রঙ্গমঞ্চের মধ্যে দৃশ্যসজ্জার ব্যবস্থা, রূপসজ্জা, সাজপোশাকের ব্যবস্থা, আলো ও তার নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, সেট-সেটিংস, উইংস-এর ব্যবস্থা, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের যোগ্যতা ও প্রতিভা, মঞ্চাধ্যক্ষ তথা পরিচালকের নির্মাণ ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা, প্রযোজক বা অর্থলগ্নী করেন যে বা যারা তাদের মূলধন বিনিয়োগের প্রস্তুতি ও ব্যবস্থা এবং সমকালীন দর্শক সম্প্রদায়ের নাট্যরস উপভোগের মানসিক অবস্থা--এইসব নিয়েই গড়ে ওঠে সেই সময়কার 'মঞ্চব্যবস্থা'। নাটকটি নাট্যকার যখন লিখছেন এবং যে নাট্যমঞ্চের জন্য লিখছেন, তার 'মঞ্চব্যবস্থা' জানা থাকলে, পরবর্তীকালেও সেই নাটকটি বিচারে সুবিধে হয়।

---

১. শ্লেগেল-এর মন্তব্য : 'A Dramatic work must always be regarded from Double point of view—how far it is Poetrical and how far it is Theatrical.'

সাহিত্যগত দিক দিয়ে লেখা একটি নাট্য সমালোচনা গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে গিয়ে যশস্বী সমালোচক ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন : 'নাটক সাহিত্য হইলেও তদতিরিক্ত আরও কিছু। ইহার সহিত দর্শকের রুচি-চাহিদা, রঙ্গমঞ্চের ব্যবস্থাপনা ও অভিনয়-কৌশল অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত। ইহাকে শুধু সমালোচনা কক্ষের নির্জনতায় সাহিত্যনীতির মানদণ্ডে বিচার করিলে চলিবে না—ইহাকে দর্শক-অভিনেতা-প্রযোজকের জনাকীর্ণ কোলাহল ও পরস্পরবিরোধী দাবির সামঞ্জস্য-সাধন-প্রক্রিয়ার মধ্যে স্থাপন করিয়া ইহার স্বরূপটি উপলব্ধি করিতে হইবে। নাটক যে রূপ লইয়া লেখকের সারস্বত মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়, দৃশ্যবিন্যাস সৌকর্য, অভিনয়ের সুবিধা ও দর্শকের সম্ভাবিত প্রক্রিয়ার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উপস্থাপনার পূর্বে তাহার বহু পরিমাণ কাট-ছাঁট ও অদল-বদল হইয়া থাকে। প্রতিটি অভিনীত নাটকের উপর প্রেক্ষালয়-পরিমণ্ডলের একটা বিশেষ প্রভাব থাকে, যাহা দ্বারা নাটকেব শেষ রূপটি নির্ণীত হয়।...আমাদের সাধারণ নাট্য-সমালোচনা এই প্রেক্ষালয়.রহস্যের কোনও খোঁজ-খবর রাখে না।'[১]

নাটক বিচারে তাই অবশ্যম্ভাবিতরূপে 'প্রেক্ষালয়-পরিমণ্ডল' বা 'মঞ্চ ব্যবস্থা'র পরিচয় জানতে হয়। না জানা থাকলে, সেই নাটকের বিচার স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় না।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই এদেশে রঙ্গালয় ও নাটক পারস্পরিক সম্পর্কায়িত হয়েই এগিয়ে চলেছে। লেবেডেফকে সমকালীন 'মঞ্চব্যবস্থা' এবং বিশেষ করে অভিনেতা-অভিনেত্রী ও দর্শকদের কথা বিচার করেই নাট্যরূপ অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। ধনী বাঙালীর বাড়ির সখের নাট্যশালাগুলি প্রাসাদ-মঞ্চের জৌলুষ, জাঁকজমক এবং অভিজাত হিন্দু জাতীয়তার প্রকাশের বাহন ছিল বলে, সেই নাট্যশালাগুলির পরিমণ্ডলে যেসব নাট্যকার নাটক রচনা করেছেন, তাঁরা তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছেন। অল্প ইংরেজি নাটকের অনুবাদ, অজস্র সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ এবং বেশ কিছু প্রহসন রচনা এই পরিমণ্ডলের প্রভাবজাত। নাটক রচনায় নিযুক্ত নাট্যকার কতোখানি সেই রঙ্গ-মঞ্চের প্রভাবাধীন হয়ে পড়েন তার সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ মধুসূদন। বেলগাছিয়া নাট্যশালার ডাকেই মধুসূদনের বাংলায় নাট্যজীবন তথা সাহিত্য জীবনের শুরু। তার স্ফূরণ ও বিস্তার এই ধনী বাঙালীর সখের নাট্যশালাতেই। আবার এই নাট্যশালার মালিক ও তার সহগামীদের ভাবনা, বেলগাছিয়া মঞ্চে পূর্ব অভিনীত 'রত্নাবলী' নাটকের দৃশ্যপট ও সাজসজ্জা এবং অভিনেতাদের সংখ্যা ও কৃতিত্বের দিকে সমান নজর রেখেই মধুসূদনকে 'শর্মিষ্ঠা' লিখতে হয়েছে। তাই পাশ্চাত্য অনুগামী ভাবনায় নাট্যরচনা শুরু করলেও, ইউরোপীয় ভাবনায় ভাবিত মানুষজনের জন্য নাটক লেখার স্পর্ধা প্রকাশ করলেও, 'শর্মিষ্ঠা' নাটকটি কিন্তু পুরোপুরি সংস্কৃত নাটকের প্রভাবজাত, বিশেষ করে 'রত্নাবলী' প্রভাবজাত। ভাব, চরিত্রসৃষ্টি, সংলাপ ও পরোক্ষ নাট্য ঘটনা বর্ণনায় 'শর্মিষ্ঠা'

---

১. ড. বৈদ্যনাথ শীলের 'বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা' (১৩৬৪) গ্রন্থে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা। পৃঃ ৩৭-৩৮

একেবারেই সংস্কৃত নাট্যানুসারী। পাশ্চাত্য ভাবিত মধুসূদন 'হিন্দুত্ব' ভাবনার নাট্যশালার জন্যে 'হিন্দু-ড্রামা' লিখলেন। যেই অন্য ভাবনার নাটক লিখেছেন অমনি বেলগাছিয়া নাট্যশালা সেগুলির অভিনয় করেনি। নাট্যকার হিসাবে মধুসূদনের আক্ষেপ সকলের জানা। বেলগাছিয়া নাট্যশালা মধুসূদনের নাট্যজীবনের সিদ্ধি ও সীমাবদ্ধতাব প্রেক্ষালয়-পরিমণ্ডল। তাকে অস্বীকার করে মধুসূদনের নাটকের বিচার সম্ভব নয়। কাব্যের ক্ষেত্রে মধুসূদন স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং তার প্রকাশও অন্য নিরপেক্ষ। কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে তিনি 'মঞ্চব্যবস্থা'র অধীন হয়ে পড়েছেন।

সাধারণ রঙ্গালয়ের যুগে বাংলা নাট্যশালা ক্রমে ব্যবসায়িক ও পেশাদার প্রথায় চালিত হয়েছে। প্রযোজক অর্থলগ্নী করে মুনাফার আশায়। তাই এই যুগে কমার্শিয়াল থিয়েটারের উদ্দেশ্য ও আদর্শেই বাংলা থিয়েটার চলেছে। নাট্য রচনা ও অভিনয়ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এই প্রথায়। সেখানে দর্শক 'লক্ষ্মী'—লক্ষ্মী'কে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে শিল্পের 'সরস্বতী'কে প্রয়োজনে বিসর্জন দিতেও কেউ কুণ্ঠা করেনি নি। তাদের কাছে একটি নাটকের মঞ্চ-সাফল্যের মূল বিচারই হচ্ছে তার দর্শক আকর্ষণের ক্ষমতা কতোখানি তার ওপর।

ধনীর প্রাসাদে সখের নাট্যশালার দর্শক ছিল নিমন্ত্রিত, তাই নিয়ন্ত্রিত মঞ্চ মালিকের রস-রুচির পরিপূরক। সাধারণ রঙ্গালয়ের যুগে সর্বসাধারণের প্রবেশমূল্য দিয়ে প্রবেশাধিকারের যুগে দর্শক অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, রুচিশীল ও রুচিহীন, হাল্কা আমোদে প্রমত্ত কিংবা গভীর রসাত্মক নাট্য আস্বাদনে বিভোর, সব শ্রেণীর দর্শকই সাধারণ রঙ্গালয়ে এসেছে। ফলে নানাজাতীয় ভাবাস্বাদনের নাটক তখন লেখা হয়েছে। সেই সময়ে জাতীয় ভাবোদ্দীপনামূলক নাটকও লেখা হয়েছে। নীলদর্পণ ১৮৬০-য়ে লেখা হলেও, ধনী বাঙালির মঞ্চে অভিনীত হয়নি, তাদের শ্রেণী চরিত্রের জন্যই। আবার ১৮৭২-য়ে ন্যাশনাল থিয়েটার উদ্বোধনের নাটক হয়েছে 'নীলদর্পণ'—উদ্যোক্তাদের শ্রেণী-চরিত্রের জন্যই।

১৮৭৩-য়ে মঞ্চে পাকাপাকিভাবে অভিনেত্রী গ্রহণের ফলে নানা তিক্ততার সৃষ্টি হয়। বারাঙ্গনা পল্লী থেকে আনা এইসব অভিনেত্রীর জন্য রঙ্গমঞ্চ একেবারে অপবিত্র ও দূষিত হয়ে পড়েছে—এমন ধারণা তৈরি হয়ে গেছে। ফলে শিক্ষিত রুচিশীল দর্শক রঙ্গ-মঞ্চ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। সেখানে ক্রমে ভীড় বাড়িয়েছে সাধারণ দর্শক—যার মধ্যে তৎকালীন বাবু সম্প্রদায়ের বেশ কিছু লোক—যাদের পয়সা রয়েছে, নাটক যাদের কাছে আমোদ স্ফূর্তির জায়গা। আর রয়েছে সাধারণ বাঙালি, যাত্রারসে পুষ্ট, ঐতিহ্যলালিত এবং ভাব ও আবেগে তাড়িত, ধর্মাশ্রয়ী ও আনন্দলাভেচ্ছু। পরে এসেছে মহিলা দর্শক। যারা দুঃখবেদনা-হাসিকান্নায় বিভোর, ধর্মবোধে দেবদেবীর অলৌকিকতায় বিশ্বাসী ও ভক্তিভাবে আপ্লুত।

এই অবস্থায় ১৮৭৬-য়ের 'অভিনয়-নিয়ন্ত্রণ আইন' বাংলা নাট্যশালার স্বাধীন ভাবনাকে আরো নিয়ন্ত্রিত করে দিল। ব্রিটিশবিরোধী কোনো নাটকেরই মঞ্চে অভিনয়ের

অনুমতি রইলো না। বরং রইলো শাস্তি জরিমানার ভয়। বাংলা নাট্যশালা থেকে অচিরাৎ জাতীয় ভাবোদ্দীপক ও স্বদেশানুরাগের নাটক লেখা ও অভিনয় বন্ধ হয়ে গেল। তারপর থেকে ব্যবসায়িক রঙ্গমঞ্চ তার দর্শক সম্প্রদায়ের কথা মাথায় রেখে অবিরত প্রযোজনা করে চলল তাদের মানস উপযোগী নাটক-গীতিনাট্য-প্রহসন-পঞ্চরং। গীতাভিনয় যাত্রার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে অভিনীত হলো অজস্র গীতিনাট্য অপেরা। ধর্মাশ্রয়ী দর্শকের জন্য প্রযোজিত হলো পৌরাণিক বিষয়বস্তু নিয়ে দেববাদ ও ভক্তিবাদের নাটক। সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনার কথা বলতে গিয়ে লিখিত হলো অজস্র সামাজিক বিষয়ের নাটক। কৌতুক ব্যঙ্গ ও কেচ্ছার জন্য লেখা হলো অপরিমিত নক্সা-প্রহসন। বাংলা নাটকের সম্ভার এতেই ভরে উঠলো। ১৯০৫-এর 'বঙ্গভঙ্গ' প্রতিরোধের জন-আন্দোলনের জোয়ারে মঞ্চগুলি আবার স্বদেশপ্রেম ও জাতীয় ভাবানুরাগের দিকে নজর দিল। আইন উপেক্ষা করেও সেই জাতীয় নাটক অভিনয় শুরু হলো। গিরিশ, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল—তাঁদের ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে এই সময়কার ভাবনা, জাতীয়তাবোধ, হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি ও স্বাধীনতার জয়গান গাইলেন।

গিরিশচন্দ্রের শতাধিক নাটকের মধ্যে অর্ধেকই হচ্ছে গীতিনাট্য অপেরা এবং নক্সা-প্রহসন। তাছাড়া নানা উৎসব-অনুষ্ঠানের জন্য লেখা তাৎক্ষণিক নাটিকা। যেমন বড়দিন, দুর্গাপূজা, দোল, জন্মাষ্টমী ইত্যাদি। এরকম নাটক সেই-সময়কার সব নাট্যকারের, যেমন অমৃতলাল বসু, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, রাজকৃষ্ণ রায় প্রমুখ লেখাতেই রয়েছে। গীতিনাট্য ছাড়াও অন্য নাটকেও অজস্র গান এবং আনুষঙ্গিক নাচ রয়েছে। সামাজিক-পৌরাণিক নাটকগুলিতেই বেশি করে রয়েছে। বোঝা যায় যাত্রারসপুষ্ট দর্শককে টেনে আনার ও খুশি রাখার প্রয়াস রয়েছে এখানে। তাছাড়া এমনি, বাঙালি গান শুনতে ভালবাসে; নাটকে গানের সংখ্যা তাই মাত্রা ছাড়িয়েছে।

সারারাত ধরে অভিনয় চালানো হতো বলে, তখনকার নাটকগুলি ছিল আকারে বড়ো। বহু চরিত্র, গান, নাচ ইত্যাদিতে ভরা। তারপরে দৃশ্য-পরিবর্তনে সময় লাগত বেশি। তাই অঙ্কভাগের সাথে দৃশ্যবিভাগ রাখা হতো কম। এইভাবে রাত সাড়ে আটটা ন'টায় অভিনয় শুরু হয়ে ভোর রাতে নাটক শেষ করতে হত। তাই তখনকার নাটক ছিল বৃহদায়তন। পরে বৃহদায়তন নাটকের অভাব মেটানো হতো, একই রাতে একাধিক নাটক-গীতিনাট্য-প্রহসন নক্সার অভিনয় করে। কলকাতা কর্পোরেশন ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে আইন করল, রাত একটার পর নাটক অভিনয় করলে মঞ্চমালিককে পঁচিশ টাকা বা ততোধিক জরিমানা দিতে হবে।[1] শিবরাত্রি, জন্মাষ্টমী, দোল-দুর্গোৎসব উপলক্ষে সারারাত অভিনয়ের জন্য নিয়ম শিথিল করা হতো। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রথম শুরু করলেন, পরে অন্য মঞ্চ মালিকেরাও পঁচিশ টাকা জরিমানা দিয়েও ভোররাত পর্যন্ত নাটক চালিয়ে যেতে লাগলেন। দর্শকের সুবিধে এবং ব্যবসার লাভ এইভাবে নাটককে দীর্ঘাকার করে রেখেছে। যুগীয় পরিবর্তন, সভ্যতার বিস্তার, যানবাহনের সুবিধে,

---

১. এই গ্রন্থের 'কর্পোরেশন এ্যাক্ট ও নাট্যাভিনয়' দ্রঃ

কলকাতার বাইরের বহু মানুষের নিত্য কলকাতা যাতায়াত--সব মিলিয়ে নাটকাভিনয়কে সংক্ষিপ্ত করতে হয়েছে। সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার নাটক ছোট হতে হতে আড়াই ঘণ্টায় দাঁড়িয়েছে। সন্ধ্যে সাড়ে ছটায় শুরু করে রাত নয়টায় নাটক শেষ না করলে দর্শকের অসুবিধে। এখন নাট্যকারেরা গিরিশযুগের মতো পাঁচ অঙ্কের দীর্ঘ নাটক লেখেন না, এখন নাটক হয়েছে বিরতির আগে ও পরে ঘণ্টাখানেক ধরে দৃশ্যবিস্তারে তৈরি।

এইভাবে মঞ্চব্যবস্থার মধ্য দিয়েই সমকালীন নাট্যরচনা ও নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রিত হয়। মঞ্চের সঙ্গে চুক্তিতে, অর্থে, বা অন্য যেভাবেই হোক, যুক্ত থেকে যারা নাটক রচনা করেন, ইংরেজীতে তাদের 'প্লে-রাইট' (Play-wright) বলে। বাংলায় বেশীরভাগ নাট্যকারই প্লে-রাইট। সে অর্থে মধুসূদনও প্লে-রাইট। গিরিশ এবং অন্যেরা তো বটেই। দীনবন্ধু কোনো মঞ্চের সঙ্গে ওতপ্রোতযুক্ত থেকে নাটক লেখেননি, তবে ধনীর আওতা থেকে নাটককে মুক্তি দিয়ে যখন মধ্যবিত্তের সাধারণ রঙ্গালয় হলো তখন দীনবন্ধুর নাটকগুলিই সবচেয়ে আদৃত হয়েছে। শুধু কাহিনী বা নাট্যগুণ নয়, এইসব নাটকে দৃশ্যসজ্জা সাধারণ, সাজসজ্জা ও পোষাকপরিচ্ছদ সাধারণ--সেটাও স্বল্পবিত্তের উদ্যোক্তাদের পক্ষে দীনবন্ধুর নাটক গ্রহণের বড়ো কারণ। পরবর্তীকালে গিরিশ একথা স্বীকারও করেছেন, 'শাস্তি কি শান্তি' নাটকের ভূমিকায়। দ্বিজেন্দ্রলাল পেশাগতভাবে যুক্ত না থাকলেও কার্যগতভাবে সমকালীন মঞ্চগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং তিনি তাঁর সময়ে আদৃত নাট্যকার ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে সাধারণ রঙ্গালয়ে বেশ আদৃত হয়েছিলেন তাঁর 'রাজা ও রানী' এবং 'রাজা বসন্ত রায়' ('বউ ঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসের) নাট্যরূপ-এর জন্য। তখন তিনি এই মঞ্চের উপযোগী নাট্যরচনায় ব্রতী ছিলেন। পরে শান্তিনিকেতন পর্ব থেকে তাঁর যে নতুন নাট্যভাবনা ও নাট্য-রচনার শুরু সেখানেও তাঁর নিজস্ব থিয়েটারভাবনা ও মঞ্চভাবনা কার্যকরী হয়েছে। পরবর্তীকালে সাধারণ রঙ্গালয় তাঁর বেশ কয়েকটি নাটক এবং গল্প-উপন্যাসের নাট্যরূপ অভিনয় করেছে। তখন তিনি মঞ্চের প্রয়োজনে তাঁর অনেক নাটকের পরিবর্তন করেছেন, গান সংযোজন করেছেন, দৃশ্যপরিবর্তন ও চরিত্রসৃষ্টি করেছেন। আগের লেখা বেশ কয়েকটি নাটকও তিনি পরবর্তীকালে 'মঞ্চোপযোগী' ও 'অভিনয়োপযোগী' করে তোলবার জন্য কাটছাঁট করে নতুনভাবে লিখেছেন। ১৯২৯-এর রূপান্তরিত 'তপতী' নাটকে তাঁর নিজস্ব থিয়েটারের মঞ্চ ভাবনা এবং সাধারণ রঙ্গালয়ের দৃশ্যপট-ভাবনা সমান্তরালভাবে কাজ করেছে। ভূমিকায় মঞ্চবাহুল্য তুলে দেবার কথা বলছেন এবং নাটকে দৃশ্যের পর দৃশ্যে দৃশ্যপটের বিবরণ দিয়েছেন। বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ সারাজীবনই নাটক রচনা করেছেন কোনো-না-কোনো থিয়েটারের কথা মাথায় রেখেই। সে তাঁর নিজের থিয়েটার হোক, কি অন্য কারো। সেইভাবেই তাঁর নাটকের ভাব, ভাবনা, উপস্থাপনা, চরিত্র, সংলাপ, গান অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

মনে রাখতে হবে, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত নাট্যকারই (দু'একজন ব্যতিক্রম) তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন এই প্লে-রাইটের দায়িত্ব পালন করেই। অদ্ভুত হলেও সত্য যে,

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি এই প্লে-রাইটদেরই রচনা। আবার প্লে-রাইটের কাজ করতে গিয়ে যুগে যুগে দেশে দেশে অসংখ্য নাট্যকার নিঃশেষ হয়ে গেছেন। প্লে-রাইটের এখানেই সীমা ও সিদ্ধি। প্লে-রাইট হিসেবে নাট্যজীবন শুরু করে শেক্সপীয়র সর্বযুগের নাট্যকারদের আদর্শ হতে পেরেছেন। এইভাবে অনেকেই সীমাবদ্ধতার মধ্যে কালোত্তীর্ণ হয়েছেন।

প্রখ্যাত নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শ'-এর কাছে তাঁর প্রিয় শিষ্য উইলিয়াম আর্চার জানতে চান, শ'-য়ের জীবনে নাট্যরচনার মূল প্রেরণা কি? উত্তরে শ' শিষ্যকে একটি চিঠিতে লেখেন :

'I have to think of my pocket, of the manager's pocket, of the spectator's pocket. It is these factors that decide the playwright's method leaving him so little room for selection.'—এই সুরসিক মন্তব্যের পেছনে রয়েছে প্লে-রাইটের তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট স্বীকারোক্তি। শ' তাঁর 'The Three Unpleasant Plays'—এর-ভূমিকাতেও নাট্যরচনার পেছনে রঙ্গালয়ের মঞ্চব্যবস্থার তাগিদের কথা বলেছেন।

Performing Art বিষয়ে ফরাসী নাট্যকার ও পরিচালক-অভিনেতা মলিয়ের মন্তব্য করেছেন : 'Speaking generally, I would place considerable reliance on the applause of the pit.'

ইংলন্ডের ড্রুরিলেন থিয়েটারের উদ্বোধনী ভাষণে (১৭৪৭) নাট্যকার স্যামুয়েল জনসন ঘোষণা করেছিলেন যে, নাটকের কানুন তৈরি করে মঞ্চের মালিক। আবার রঙ্গ-মঞ্চও দর্শকের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হয়। এবং নাট্যকারের বাঁচবার তাগিদে এদের খুশি করেই চলতে হয়।[১]

এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে সব নাটক রচয়িতাই কি মহাভারতের অভিমন্যুর মতো মঞ্চব্যবস্থার চক্রব্যূহে প্রবেশ করে নিজেদের উৎসর্গ করে দেবেন? তা নয়। কেউ কেউ অর্জুনের মতো চক্রব্যূহে প্রবেশ করে, তারপরে বিজয়ী বীরের উল্লাসে নিরাপদে বেরিয়ে এসে যুদ্ধ জয় নিশ্চিত করেন। যেমন শেক্সপীয়ার, যেমন মলিয়ের, বার্নার্ড শ', ইবসেন, আর্থার মিলার। যেমন সফোক্লিস, ইউরিপিডিস। এখানে যেমন মধুসূদন, দীনবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, কিংবা আধুনিক কালের উৎপল দত্ত।

যথার্থ প্লে-রাইট তাই সমসাময়িক যুগের চিন্তা ভাবনা, তদানীন্তন রঙ্গমঞ্চের বিধি-ব্যবস্থা, সে যুগের 'ক্রেজ'—এসব কিছুকেই তাঁর নাটকে গ্রহণ করেন। সমকালীন মঞ্চব্যবস্থাকে মেনে না নিলে তিনি বাতিল হয়ে যাবেন। কিন্তু এসব কিছুর মধ্যে থেকেও

১, **'The stage but echoes back the public voice / The Drama's laws the drama's patrons give / For we that live to please, must please to live.'—Samuel Johnson : Prologue at the opening of Drury Lane Theatre, 1747.**

দর্শকের নাট্যবোধ ও চিন্তা গড়ে তোলার দায়িত্ব তাঁকে নিতে হয়। জানা জগতের ভাবনার মধ্যে শুধুই ঘুরপাক না খেয়ে সতর্ক মুহূর্তে নাট্যকার দর্শককে নতুন ভাবনার তীরে নিয়ে গিয়ে হাজির করেন। এবার নাট্যকারের চিন্তায় দর্শক নিজেকে তৈরি করতে থাকে। এই যে দর্শকের কাছে ধরা দিয়েও তাদের দূর জগতের ভাবনার অজানা অশ্রুত সুর শুনিয়ে দেওয়া, এইখানেই শক্তিশালী নাটকরচয়িতার কৃতিত্ব। প্রখ্যাত ব্রিটিশ নাট্যসমালোচক এলারডাইস নিকল এই সম্পর্কে যথাযথ উক্তি করেছেন : '...the really strong playwright is the man who is in tune with the audience, but who may perhaps desire to play some melodies for the reception of which the audience is nearly, but not quite ready'. (World Drama)

একটি নাটক বিচার করতে হলে, তাই প্রথমেই জানতে হয় তার নাট্যকার কে? তিনি কোন যুগে কোন ধরনের নাট্যশালার সঙ্গে কিভাবে যুক্ত ছিলেন। সেই যুগের রঙ্গালয়ের বিধি-ব্যবস্থা কেমন ছিল, এবং 'মঞ্চব্যবস্থা' কোন্ অবস্থানে ছিল ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল কিভাবে? সে যুগের নাট্যশালার পরিচয় এইভাবে জানা থাকলে, সেই নাট্যকার এবং তার নাটকের যথার্থ বিচার সম্ভব হয়। কোন্ পরিস্থিতিতে এবং কেন এইরকম সব লিখতে হয়েছিল, ত্রুটিগুলির মৌলিক কারণ কি এবং সেই মঞ্চব্যবস্থা অতিক্রম করে অনাগতকালের ভাবী সম্ভাবনার দ্বারোদঘাটন কিভাবে নাটকে হচ্ছে তা বুঝে নেওয়া যায়। শেক্সপীয়র তাঁর যুগীয় 'মঞ্চব্যবস্থা'র গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ, তাঁর নাটকের বহু অংশই তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু তাতে তিনি হারিয়ে যাননি। এই গণ্ডীর মধ্যে থেকেই তিনি চিরকালীন মানবসভ্যতার সব প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিকে লিপিবদ্ধ করে নাটককে কালজয়ী করেছেন। রাজাসন থেকে নেমে এসে নয়, রাজসিংহাসনে বসেই তিনি জনতার সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন।

সংস্কৃত নাটক ও রঙ্গালয়

আমাদের ভারতীয় নাটকের প্রাচীন ঐতিহ্য সংস্কৃত নাটক। প্রথম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তার বিস্তারের কাল। পণ্ডিতদের মতে ঋকবেদেই নাটকের মৌলিক উপাদান পাওয়া যায়। 'সরমা ও পণি', 'যম ও যমী,' 'পুরূরবা ও উর্বশী' প্রভৃতি সংবাদ-সূক্ত বা গাঁথা পরবর্তীকালে নাট্যরচনাকে প্রভাবিত করেছিল। যজ্ঞের অনুষ্ঠানে উদাত্ত-অনুদাত্ত স্বরে বেদমন্ত্রের উচ্চারণ ও গীত—নাট্যাভিনয়ের প্রাক্ প্রস্তুতি বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

সংস্কৃত নাটক ও নাট্যাভিনয় নিয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী মতামত রয়েছে। Sylvan Levy বা Hartel উপরোক্ত মত মেনেছেন। আবার Sten Konow মৌলিক আনন্দানুষ্ঠানের পরিবর্তিত রূপকেই নাটক বলে ধরে নিয়েছেন। Pischel তো পুতুলনাচকেই নাটকের পূর্বসূরি মনে করেছেন। শ্যাডো-প্লে বা ছায়ানাট্য থেকে সংস্কৃত নাটকের উদ্ভব, মনে করেছেন অধ্যাপক লুডাস। এদিকে অধ্যাপক কীথ (Keith) অনুমান করেছেন রামায়ণ-মহাভারত বীণা সহযোগে বিভিন্ন জনপদে ও রাজসভায় আবৃত্তি ও গান করার মধ্য দিয়ে ভারতীয় নাটকের সৃষ্টি হয়েছে। এইসব পরস্পরবিরোধী মত থেকে কোনো সিদ্ধান্তে আসা মুশকিল।

ভরতমুনি তাঁর 'নাট্যশাস্ত্রে' সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তির একটি উপাখ্যান বলেছেন। রূপকের আড়ালে এখানে নাটকের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ইঙ্গিতটুকু বোঝা যায়। চতুর্বেদে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ছাড়া কারো অধিকার ছিল না বলে গরিষ্ঠ জনতার দাবীতে ব্রহ্মা 'পঞ্চমবেদ' সৃষ্টি করতে বলেন। ঋকবেদ থেকে পাঠ্য, যজুর্বেদ থেকে অভিনয়, সামবেদ থেকে সঙ্গীত এবং অথর্ববেদ থেকে রস আহরণ করেই পঞ্চবেদ সৃষ্টি হবে, যা কিনা 'নাট্যবেদ' হিসেবেই পরিচিত হবে। এই 'নাট্যবেদ' প্রয়োগে বা অভিনয়ে দেবতারা 'অশক্ত' বলে ইন্দ্র জানালে ব্রহ্মা ভরতমুনির ওপরেই দায়িত্ব দেন। তিনি একশত শিষ্যের সাহায্যে 'ইন্দ্রধ্বজ' উৎসব উপলক্ষে দেব ও অসুরের কাহিনী নিয়ে নাট্যরচনা করে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। মহাদেবের পরামর্শে এতে 'কৈশিকী বৃত্তি' অর্থাৎ সুকুমার বৃত্তি, মানে নাচ গান যুক্ত করা হয়। এবং এরই প্রয়োজনে চব্বিশজন অপ্সরা রমণীর সৃষ্টি করেন। নৃত্যগীতে পারদর্শিনী এদের সহযোগে 'দেবাসুর যুদ্ধ' বা 'অসুর বিজয়' নাটকের অভিনয় করা হয়। কিন্তু অভিনয়ের সময়ে অসুরবৃন্দ তাদের পরাজয়ের দৃশ্য দেখে হাঙ্গামা বাধালে ইন্দ্র 'ধ্বজদণ্ড' প্রহারে তাদের জর্জরিত করেন। তারপর থেকে 'ইন্দ্রধ্বজ' সবসময়ে রঙ্গালয়ের মঙ্গল চিহ্ন রূপে ব্যবহৃত হয়। এবং তখন থেকেই ভাবনা চিন্তা শুরু হয়, এই ধরনের খোলা জায়গায় অভিনয় করা নিরাপদ কিনা! তাই থেকেই বোধ করি রঙ্গস্থলকে চারিদিকে ঘিরে রঙ্গালয় তৈরি করে আপাত

নিরাপত্তায় অভিনয় করার ব্যবস্থা হতে থাকে। এরপরে ব্রহ্মা তাঁর দলবল নিয়ে হিমালয়ে 'ত্রিপুরদাহ' নাটকের অভিনয় করেন। মনে হয়, এসবই মুক্তমঞ্চেই অভিনীত হয়েছিল। কেননা, অসুরদের হাঙ্গামা থেকে রক্ষার জন্য ব্রহ্মা এরপরেই বিশ্বকর্মাকে 'নাট্যগৃহ' বা 'নাট্যবেশ্ম' তৈরি করতে বলেন। তারপর থেকেই সংস্কৃত নাটক রঙ্গালয়ে অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। সেই অনুযায়ী নাট্যরচনাও শুরু হয়।

ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' রচনার সময় পর্যন্ত (দ্বিতীয়-তৃতীয় শতক) তিনি নাট্যরচনার যে পরিচয় দিয়েছেন, তা থেকে জানা যায়, নাটক বা রূপক বা দৃশ্যকাব্য দশপ্রকার ছিল। নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ঈহামৃগ, অঙ্গ, বীথী ও প্রহসন। এর সবগুলিই নাটক, তবে গঠন ও রসগত কিছু ব্যতিক্রমের কারণে বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে। এগুলির আবার আঠারো রকমের উপরূপকেরও উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, নাটিকা, ত্রোটকম, গোষ্ঠি, নিট্টকম ইত্যাদি।

ব্রহ্মার ভাষণে সংস্কৃত নাটকের রচনা ও অভিনয়ের মূল সুর ও উদ্দেশ্য বুঝে নেওয়া যায়। মানবজীবনের বিভিন্ন ভাব ও সেই উপযোগী রসবস্তুকে কার্যের দ্বারা ফুটিয়ে তোলার শক্তিসম্পন্ন এই নাটক হবে জনশিক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়। এই নাটক মানুষকে ধর্মে কর্মে, সামাজিক কর্তব্যে, বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা ও অনুশীলনে সঠিকভাবে উদ্দীপিত করবে। আবার দুঃখবেদনায় ভারাক্রান্ত ভাগ্যহীন মানুষ অবসন্ন হয়ে পড়লে এই নাটক জাগিয়ে তুলবে আশা—আনন্দ, হতভাগ্য মানুষকে দেবে সান্ত্বনা। তবে সব নাট্যবস্তুই গড়ে উঠবে ভাবাবেগ বা emotion-এর ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে মনুষ্যজীবনকে পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই।

সংস্কৃতে লিখিত নাটকের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার মধ্যে প্রাচীনতম হল কণিষ্কের সভাকবি অশ্বঘোষ রচিত 'শারিপুত্র প্রকরণ'। নাটকটির অংশমাত্র পাওয়া গেছে। তবুও প্রথম শতাব্দীতে লিখিত এই প্রাপ্ত অংশ থেকেই বোঝা যায় নাট্যসাহিত্য তখনই পূর্ণ বিকাশলাভ করেছিল। তার অনেক আগেই নাটক রচনা ও অভিনয় যে শুরু হয়ে গিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। খ্রিঃ পূঃ ষষ্ঠ (বা পঞ্চম শতকে লেখা পাণিনির রচনায় শীলালিম ও কৃশাশ্ব নামে দুই নাট্যশাস্ত্রকারের উল্লেখ থেকেই অনুমান করা যায় যে, সেই সময়েই নাট্যরচনা প্রচলিত ছিল। ব্যাকরণে ব্যঞ্জনবর্ণের বিচারে তিনি অভিনেত্রী প্রসঙ্গ এনেছেন, তাতেও বোঝা যায় অভিনয় ধারা তখনই চালু ছিল। ভরতমুনির পূর্ববর্তী নন্দিকেশ্বরের নাট্যশাস্ত্রেও অভিনয়রীতির কথা রয়েছে। রামায়ণ মহাভারতেও অভিনয়ের প্রসঙ্গ রয়েছে এবং অভিনেতা অর্থে 'শৈলুষ' শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। যদি মনে হয়, নাটক রচনা ও অভিনয় খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকেই সংস্কৃত ভাষায় প্রচলিত ছিল, যদিও প্রাপ্ত লিখিত নাটক হিসেবে অশ্বঘোষের 'শারিপুত্র'-কেই প্রথম বলে এখন অবধি মেনে নিতে হবে। তারপরে সভাকবি ভাসের (খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতাব্দী) লেখা তেরখানি নাটক (স্বপ্নবাসবদত্তা, চারুদত্ত, প্রতিমা, পঞ্চরাত্র, উরুভঙ্গ, কর্ণভার, বালচরিত, দূত-ঘটোৎকচ প্রভৃতি) ; চতুর্থ শতাব্দীতে লেখা কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলা,

বিক্রমোর্বশী ও মালবিকাগ্নিমিত্র ; পঞ্চম শতাব্দীতে বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস, দেবী চন্দ্রগুপ্ত ; ষষ্ঠ শতাব্দীতে শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক ; সপ্তম শতাব্দীতে শ্রীহর্ষের লেখা রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা, নাগানন্দ ; অষ্টম শতাব্দীতে ভবভূতির মহাবীর চরিত, মালতীমাধব, উত্তররামচরিত ; অষ্টম-নবম শতাব্দীতে ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার, যশোবর্মার রামাভ্যুদয়, ময়ুরাজের উদাত্তরাঘব, দিঙনাগের কুন্দমালা, অনঙ্গের তাপসবৎসরাজ ; নবম-দশম শতাব্দীতে মুরারীর অনর্ঘরাঘর, রাজশেখরের কর্পুরমঞ্জরী, বালরামায়ণ, বালমহাভারত ; একাদশ শতকের পরবর্তীকালে লেখা নাটকের মধ্যে জয়দেবের (বাংলা কবি জয়দেব নয়) প্রসন্নরাঘব, বীরনাগের কুন্দমালা, ভাস্করের উন্মত্তরাঘব, ক্ষেমেন্দ্রের চিত্রভারত, কুলশেখরের সুভদ্রা-ধনঞ্জয়, রামকৃষ্ণের গোপাল-কেলিচন্দ্রিকা, রূপগোস্বামীর বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, বিলহণের কর্ণসুন্দরী, বিশ্বনাথের মৃগাঙ্ক, বৎসরাজের কিরাতার্জুনীয়, সমুদ্রমন্থন, ত্রিপুরদাহ, উদ্দাগুণের মল্লিকামারুত, রামভদ্রের প্রবুদ্ধরৌহিনেয় উল্লেখযোগ্য।

সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার কালিদাসের যুগ এবং তারপরে দশম শতাব্দী পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষায় উল্লেখযোগ্য উৎকৃষ্ট নাটকগুলি রচিত হয়েছে। তার মধ্যে অষ্টম শতাব্দীতে ভবভূতি পর্যন্ত সংস্কৃত নাট্যধারা জীবন্ত ছিল। ভাস, কালিদাস, বিশাখদত্ত, শূদ্রক, শ্রীহর্ষ, ভবভূতি তাঁদের নাট্যরচনার মধ্য দিয়ে সে যুগে তো বটেই, পরবর্তী আধুনিককাল পর্যন্ত সমাদৃত হয়ে এসেছেন। গভীর জীবনবোধ, মানবজীবনের প্রতি অন্তর্দৃষ্টি, রচনাশৈলীর পারিপাট্য, সংলাপ রচনার গভীর কৃতিত্ব, এবং পরিমিত সৌন্দর্য সৃষ্টিতে এঁদের মধ্যে কালিদাস সর্বশ্রেষ্ঠ হলেও, এঁদের প্রত্যেকের মধ্যেই সেই কৃতিত্ব লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো বিষয়ে নিজস্বতা এবং স্বাতন্ত্র্যও ছিল। তারপরে সংস্কৃত নাটকে অবক্ষয় শুরু হয় এবং অজস্র অক্ষম রচনাকারের আবির্ভাব ও রচনার পরিচয় পাওয়া গেলেও, কোনো দিক দিয়েই সেইসব নাটক উৎকৃষ্ট হতে পারেনি। বরং রচনার একঘেয়ে ধারা, বিষয়বস্তুর পৌনঃপুনিকতা এবং ক্ষমতার ন্যূনতা—সংস্কৃত নাটককে ক্লান্ত ও অবসন্ন করে তুলেছিল।

সংস্কৃত নাটকের ও নাট্যকারের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া গেলেও, এগুলির অভিনয়ের পরিচয় বা ইতিহাস কিছুই পাওয়া যায় না। তবে উৎকৃষ্ট নাটকগুলির সবই যে অভিনীত হয়েছিল, তার পরোক্ষ প্রমাণ দেওয়া যায়। অনেক নাট্যকারের সঙ্গেই নট-নটীর পরিচয়, নাটকের শুরুতেই অভিনয়-সংবাদ ও উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীকে সম্বোধন ইত্যাদি থেকে বোঝা যায় নাটকগুলি সে যুগে অভিনয়ের জন্যই লেখা। কালিদাসের সঙ্গে বিভিন্ন নটীর সুসম্পর্কের কথা তো গল্পকথায় পরিণত হয়েছে। ভবভূতি তো নটদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের কথা এবং 'মালতীমাধব' নাটকটি রচনাকালে বিশেষ পরিচিত নাট্যদলের আন্তরিক সৌহার্দের কথা উল্লেখ করেছেন। সেই যুগে উদ্যোক্তা রাজাদের সঙ্গেও নট-নটীদের আন্তরিকতার কথা ভর্তৃহরি, বাণভট্ট প্রভৃতি সংস্কৃত লেখকেরা তাদের লেখায় জানিয়েছেন। এইসব থেকে স্বভাবতই ধরে নেওয়া যায়, সংস্কৃত যুগে নাটকগুলি

নিঃসন্দেহে অভিনীত হতো এবং দর্শকমণ্ডলী সেগুলি উপভোগ করত। বিদগ্ধ রসিকদর্শক সব নাট্যকারই খোঁজেন। ভবভূতি যথার্থ সহৃদয় নাট্যরসিকের জন্য অনন্তকাল অপেক্ষা করতেও প্রস্তুত ছিলেন। অরসিককে রসনিবেদনের বিড়ম্বনা কালিদাস ভুলতে পারেননি।

কালিদাস প্রমুখ শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের আবির্ভাবের পূর্বে দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকে, ভরতমুনি তাঁর বিখ্যাত 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংস্কৃত যুগের নাট্যশালা কিরকম ছিল তার বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। প্রেক্ষাগৃহ, মঞ্চরূপ, নেপথ্য-বিধান, প্রয়োগ-পদ্ধতি, সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতি প্রসঙ্গের বিশদ আলোচনা করেছেন। 'নাট্যবেশ্ম' বা রঙ্গালয়ের প্রধান দুটি ভাগ। অর্ধাংশ প্রেক্ষা বা দর্শকদের বসবার জায়গা। দর্শকাসন হবে সোপানাকৃতি, ইঁট বা কাঠ দিয়ে তৈরি। ভূমি থেকে এক হাত ওপরে এই আসনগুলি ঢালুভাবে তৈরি মেঝেতে বসানো থাকবে। প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য আলাদা নির্দিষ্ট আসন থাকত। সর্বাগ্রে ব্রাহ্মণ, তাঁদের জন্য শ্বেতবর্ণের আসন। মধ্যাংশে রক্তবর্ণ চিহ্নিত আসন ক্ষত্রিয়দের, পেছনের পশ্চিমদিকে পীতবর্ণ বৈশ্যদের এবং পূর্বদিকে নীলবর্ণ শূদ্রদের আসনরূপে নির্দিষ্ট থাকত। রঙীন স্তম্ভ দ্বারা আসনের নির্দিষ্ট স্থল চিহ্নিত হতো। মধ্যিখানে উদ্যোক্তা রাজা বা ধনীগোষ্ঠির সপারিষদ আসন সাজানো থাকত। বাকি অর্ধাংশ রঙ্গপীঠ, এই রঙ্গপীঠ আবার রঙ্গ শীর্ষ ও নেপথ্য গৃহে ভাগ করা ছিল।

আকার অনুযায়ী রঙ্গমঞ্চ হতো তিন প্রকার। বিকৃষ্ট, চতুরস্র ও ত্র্যস্র। এই তিন প্রকার প্রামাণ্য রঙ্গমণ্ডপকে পরিমাণ অনুযায়ী জ্যেষ্ঠ, মধ্য এবং অবর—এই তিনভাগে ভাগ করা হত। একশো আট হাত (বা কিউবিট = ১$\frac{১}{২}$ ফুট) মাপ ছিল জ্যেষ্ঠের, চৌষট্টি হাত ছিল মধ্যের এবং বত্রিশ হাত ছিল অবরের। জ্যেষ্ঠ রঙ্গালয় দেবতাদের, মধ্যমাকার রাজাদের এবং অবর স্থির করা ছিল জনসাধারণের জন্য। এগুলির মধ্যে অভিনয়ের পক্ষে আদর্শ স্থানীয় হল 'চতুরস্র-মধ্য' রঙ্গালয়। এর আয়তন লম্বায় ৬৪ হাত এবং প্রস্থে ৩২ হাত।

সুপ্রাচীনকালে পর্বতগুহায় সঙ্গীত নাটক অনুষ্ঠান হতো। 'নাট্যশাস্ত্রে'-ও নাট্যমণ্ডপকে পর্বত গুহাকৃতি বলা হয়েছে। পরবর্তীকালে অভিনবগুপ্ত তাঁর টীকায় একে 'প্রেক্ষাগৃহে শব্দের স্থিরতা রক্ষার জন্য' বলে মনে করেছেন। নাট্যমণ্ডপকে 'দ্বিভূমি' বলাতে অনেকে দোতলা বলে অনুমান করেছেন। কেউ ভেবেছেন দর্শকদের জন্য নিম্নতল এবং অভিনয়ের জন্য উচ্চতল।

দর্শকদের সামনে থাকবে রঙ্গপীঠ বা মঞ্চ, তার পেছনে রঙ্গশীর্ষ ও নেপথ্যগৃহ। রঙ্গালয়ের ৬৪ হাত দৈর্ঘ্য ও ৩২ হাত প্রস্থের মধ্যে দর্শদের জন্য ৩২ × ৩২ হাত, রঙ্গ পীঠ ৮ × ৩২ হাত এবং রঙ্গশীর্ষ ৮ × ৩২ হাত ও নেপথ্যগৃহ ১৬ × ৩২ হাত। ভরতের বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে, দর্শকের সম্মুখে ছিল মূল অভিনয়স্থল বা রঙ্গ পীঠ, তার পেছনে কিছুটা উঁচুতে রঙ্গশীর্ষ। এই অভিনয় ক্ষেত্রের পেছনে পুতপ এবং

ষড়দারুক (ছয়টি কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি) বা পেছনের দেওয়াল। তার দু'পাশে সংযুক্ত প্রবেশ-প্রস্থানের দুটি দরজা, যা দিয়ে নেপথ্যগৃহ থেকে মঞ্চে আসা যায়। নেপথ্যগৃহ মঞ্চ থেকে উঁচুতে থাকত। এখানে নট-নটীবৃন্দ সাজসজ্জা করত, অভিনয়ের অবসরে অবস্থান করত। এখান থেকেই নাটকের প্রয়োজনে নেপথ্য শব্দ সৃষ্টি করা হতো। যেসব চরিত্র মঞ্চে আনা যেত না তাদের কণ্ঠস্বর এখান থেকেই শোনানো হতো। এই নেপথ্যগৃহ থেকেই নট-নটী মঞ্চে প্রবেশ করতেন। উঁচু নেপথ্যগৃহ থেকে নিচু মঞ্চে তারা আসতেন বলে 'মঞ্চাবতরণ' শব্দটি চালু হয়েছিল।

নেপথ্যগৃহ ও মঞ্চের মাঝখানের দুই দরজায় থাকত যবনিকা (জবনিকা বা যমনিকা)। যবনিকাকে পটী, অপটী, তিরস্করণী, প্রতিসরা প্রভৃতি নামেও উল্লেখ করা হয়েছে। নাটকের প্রধান রস অনুযায়ী যবনিকার রঙ হওয়া বিধেয় ছিল, কোথাও শুধু লাল রঙের উল্লেখ রয়েছে।

'যবনী' ও 'যবনিকা' দুটি গ্রীক ভাষার শব্দ। তা'বলে যবনিকার ব্যবহার যে গ্রীক নাটক থেকে এসেছে, তা ঠিক নয়। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সময় (খ্রীঃ পূঃ ৩২৭) থেকে ভারতের নানা শিল্পকলাতেই গ্রীক প্রভাব পড়েছিল। সংস্কৃত নাটকও এই সময়েই সমৃদ্ধ হতে থাকে। অতএব কিছু গ্রীক প্রভাব সংস্কৃত নাটকে পড়তেই পারে। ভারতের রাজসভায় কিছু গ্রীক নাটক অভিনীতও হত এমন প্রমাণ রয়েছে। 'সীতাবেঙ্গা' গুহায় গ্রীক আদর্শে তৈরি ভারতীয় নাট্যমঞ্চ আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে 'যবনিকা' গ্রীক নাটক থেকে আসে নি, প্রাচীন গ্রীক নাটকে যবনিকার ব্যবহার ছিল না। গ্রীস দেশের 'Ionic' অঞ্চলের তৈরি বস্ত্রখণ্ড গ্রীক বণিকদের কাছে কিনে তাই দিয়েই ভারতীয় মঞ্চের যবনিকা প্রস্তুত হতো, সেই সঙ্গে গ্রীক ভাষা থেকে শব্দটিও চালু হয়। গ্রীক নাটকের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

যাই হোক, ভরত-বর্ণিত যে তিন প্রকার রঙ্গালয়ের কথা পূর্বে বলা হয়েছে, তার মধ্যে বিকৃষ্ট হতো আয়তাকার, চতুরস্র ছিল বর্গাকার এবং ত্র্যস্র ত্রিভুজাকার। প্রত্যেকটি রঙ্গালয়ই উপরোক্তভাবে বিভক্ত থাকত। রঙ্গালয়টি নির্মিত হতো কাঠ ও পাথরের সাহায্যে। রঙ্গপীঠ বা মঞ্চ হবে দর্পণের মতো মসৃণ। কূর্মপৃষ্ঠ বা মৎস্যপৃষ্ঠের মতো কখনোই হবে না, হবে সমতল। মঞ্চ ও দর্শকাসন এমনভাবে নির্মিত হবে যাতে দর্শকের শ্রুতি ও দর্শন স্বাভাবিক ও সহজ হয়।

হিন্দু-বৌদ্ধ রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত নাট্যরচনা ও অভিনয় প্রাচীন যুগে ভারতে খুবই উন্নতি লাভ করেছিল। নাটক লেখা এবং স্থায়ী মঞ্চে তা অভিনয় হওয়া স্বাভাবিক ছিল। কেরালা প্রদেশের ত্রিচুড়ে এই রকম একটি প্রাচীন রঙ্গমঞ্চের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে।

পরবর্তীকালে কালিদাস প্রমুখ শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের নাটকগুলি অভিনীত হয়েছিল ঠিকই কিন্তু সেগুলি কোথায় কিভাবে, কোন প্রয়োগরীতিতে অভিনীত হয়েছিল, তার কোনো সুনির্দিষ্ট খবর পাওয়া যায় না।

'সঙ্গীত রত্নাকর' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, রাজপ্রাসাদে জাঁকজমক ও ঐশ্বর্যপূর্ণ অভিনয়ের জন্য 'সঙ্গীতশালা' নামে হলঘর থাকত। এখানে নাচ-গান এবং অভিনয়ের আয়োজন করা হতো। নগরের অভিজাত ধনী ব্যক্তিদের বাড়িতেও অনুরূপ স্থানে নাটক অভিনয় হতো। হলঘরের মাঝখানে রাজা অথবা গৃহস্বামী আসন গ্রহণ করতেন, বাঁদিকে পুরনারীবৃন্দ এবং ডানদিকে সম্মানিত সভাসদবর্গ, রাজন্যবর্গ এবং তারপরে বিভিন্ন জন যথাযোগ্য স্থানে উপবেশন করত।

বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের দ্বারা সংস্কৃত নাটকের পরিচর্যা হয়েছিল এবং রাজা বা অভিজাত ধনী ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট দর্শকের উপস্থিতিতেই এগুলির অভিনয় হতো। ফলে জীবন সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি এবং অধ্যাত্মবাদ ও প্রণয়লীলা—এই নির্দিষ্ট পরিমণ্ডলের ভাবনার প্রতিফলনেই গড়ে উঠেছিল। সমগ্র জাতীয় জীবনের সঙ্গে যোগসূত্র গড়ে উঠতে পারেনি। সূক্ষ্মভাব, কবিত্বপূর্ণ ভাষা, সৌন্দর্য বর্ণনা, অলঙ্কার-ছন্দের সুষমা ও গাম্ভীর্য সংস্কৃত নাটককে কাব্যময় করে তুলে বিদগ্ধ দর্শক-শ্রোতার মানস উপযোগী হয়ে উঠেছিল। বৃহত্তর ও সাধারণ জনজীবনের পক্ষে কখনোই আস্বাদনীয় হয়ে উঠতে পারেনি। তাছাড়া একই নাটকে বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার (উচ্চশ্রেণীর পুরুষ মাত্র সংস্কৃত ভাষা, শিক্ষিত নারী শৌরসেনী প্রাকৃত এবং ভৃত্য ও নিম্নশ্রেণীর পুরুষ-নারী মাগধীপ্রাকৃত ব্যবহার করত) সকলের পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব হত না। তাছাড়া এগুলিও বাস্তব সমাজে ব্যবহৃত মুখের ভাষা ছিল না, ছিল কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা।

সাধারণ লোকের জন্য নির্দিষ্ট কোনো নাট্যশালা ছিল না, সংস্কৃত নাটকগুলি তাদের জন্য লেখাও হয়নি, অভিনয় দেখবার অধিকার তাদের ছিল না। ফলে সংস্কৃত নাটক কতিপয় বিদগ্ধ লোকের আস্বাদনীয় হয়ে ছিল। আপামর জনসমাজের আস্বাদনের সামগ্রী হতে পারে নি। তবে সংস্কৃত নাটকের ধারার পাশাপাশি একটি লোকনাট্যের ধারা বয়ে চলেছিল এবং সাধারণজন এই লোকনাট্যের মধ্যেই তাদের নাট্যক্ষুধা নিবৃত্ত করত। এদের উৎসাহেই সেই যুগে ছায়ানৃত্য, পুতুলবাজি, ছালিক্য নাট্যরীতি বেড়ে উঠেছিল। কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের মধ্যে এই দুই শ্রেণীর দর্শকের কথাই রয়েছে, 'ভরতবাক্যে' তা স্বীকারও করা হয়েছে। আঙ্গিকেও লোকনাট্য ও অভিজাত নাট্যের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যদিও অভিজাত-বিদগ্ধ দর্শকের আনুকূল্যের কথাই কালিদাস সবসময়ে চিন্তা করেছেন।

নবম-দশম শতাব্দী থেকেই সংস্কৃত নাট্যরচনা ও অভিনয়ের অবক্ষয় শুরু হয়। ফলে কালিদাসোত্তর যুগে ভবভূতি পর্যন্ত যে নাট্যধারা ছিল, অবক্ষয়ের সূত্রপাতে সেখানে অসংখ্য অক্ষম নাট্যকারের ভিড় দেখা গেল। বিষয় বৈচিত্র্যহীন, একঘেয়ে, কবিত্বহীন এই সব দৃশ্যকাব্য সংখ্যায় বাড়লেও, মানে অতি নিম্নশ্রেণীর হয়ে গেল। কিছু রচনা উচ্চ ভাবের হলেও, তত্ত্বকথা, অলঙ্কারভার এবং নাট্যগুণহীনতার জন্য কখনোই অভিনীত বা

আদৃত হয়নি। ফলে এই সময়ে সংস্কৃত নাটক ধ্বংস ও অবনতির পথেই এগিয়ে ছিল। সর্ব-সাধারণের সঙ্গে যোগ হারিয়ে, কতিপয় মানুষের গণ্ডীর সীমাবদ্ধতায় আটকে থেকে, নাট্যগুণহীন কবিত্ব ও বর্ণনার বাহুল্যভারে এবং নবসৃষ্ট আঞ্চলিক ভাষাগুলির সঙ্গে ব্যবধান বেড়ে যাওয়ায় সংস্কৃত নাটক ক্ষীণপ্রাণ হয়ে পড়ে। এই সময়েই মুসলমান শাসকদের আনুকুল্য ও পৃষ্ঠপোষকতা হারিয়ে সংস্কৃত নাটক আরো দিগভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

সমগ্র মধ্যযুগে আর সংস্কৃত নাটকের কোনো প্রসার বা উন্নতি হয় নি। মধ্যযুগে চৈতন্যদেব কৃষ্ণলীলার যে অভিনয় করেন, তা সংস্কৃত নাট্য বা মঞ্চরীতিতে করেননি, করেছিলেন লোকনাট্যের প্রচলিত ধারাতেই।

আধুনিক যুগে ইংরেজ আগমনের পর বিলিতি রঙ্গালয়, নাট্যরীতি ও অভিনয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে নব্য বাঙালি তাদের নাটক ও অভিনয়ধারা গড়ে তোলেন। দীর্ঘদিন বাদে আবার নাট্যশালা তৈরি করে নাট্যাভিনয়ের সংবাদ পাওয়া গেল। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে ইংরেজরা এখানে নাট্যাভিনয় শুরু করে। বাঙালির নাট্যচর্চা মঞ্চাভিনয়ের মাধ্যমে শুরু হয় উনিশ শতকের প্রথম দিকেই। বলা যায়, বাঙালির নতুন যুগের নাটক ও নাট্যচর্চার সূত্রপাত সংস্কৃত নাটক ও নাট্যাভিনয়ের কোনরূপ প্রভাব থেকে নয়, একেবারেই ইংরেজদের অনুকরণ ও অনুসরণে গড়ে উঠেছিল।

তবে ধনী বাঙালির প্রাসাদ-মঞ্চে সখের নাট্যশালার মাধ্যমে এই পাশ্চাত্য মঞ্চ ও নাট্যাভিনয়ের প্রথা চালু হলেও, কিছু কিছু দিকে ভারতীয় ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা যায় নি।

১. প্রথম দিকে সংস্কৃত নাটক অভিনয় করা হয়েছে। পরে সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ অভিনয় করা হয়েছে।
২. মৌলিক নাটক রচনার কালেও সংস্কৃত নাটকের প্রবল প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। পাশ্চাত্য ভাবনায় বিভোর মধুসূদনও তাঁর প্রথম বাংলা নাট্যরচনা 'শর্মিষ্ঠা'য় প্রবলভাবে সংস্কৃত রীতি ও ভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। অন্য নাট্যকারদের কথা বলাই বাহুল্য।
৩. মঞ্চ বিদেশী ধরনের হলেও, তার সাজ-সজ্জা, জাঁকজমক ও ঐশ্বর্য প্রদর্শন অনেকটাই সংস্কৃত নাট্যশালার যুগের ভাবনাতেই গড়ে উঠেছিল।
৪. হিন্দু-ঐতিহ্যে বিভোর বেশ কিছু অভিজাত বাঙালি ও নব্যশিক্ষিত বাঙালি ঐতিহ্যের তাগিদে সংস্কৃত নাটককে স্বীকরণ করার চেষ্টা করেছিলেন।

দীর্ঘ মধ্যযুগের বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও আধুনিক যুগে নবীন রঙ্গালয় ও নাটকাভিনয়ের সূত্রপাতকালে সংস্কৃত নাটক ও মঞ্চের ঐতিহ্যানুসরণ সূক্ষ্মভাবে প্রবাহিত হয়েছিল। যদিও আধুনিক বাঙালির থিয়েটার ও নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শ ও মঞ্চাভিনয় রীতিতেই গড়ে উঠেছিল।

যাত্রা

চারিদিকে দর্শক বসেছে। মাঝখানে একটুখানি খোলা জায়গায়, দর্শক সহজে দেখতে পায়, এমনভাবে কিছুটা উঁচু করে চৌকোণা প্লাটফরম তৈরি হয়েছে। সেখানেই চলেছে অভিনয়। একদিক দিয়ে নেমে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা দর্শকের মাঝখানে একচিলতে সরু পথ দিয়ে গ্রীণরুমে ফিরে যাচ্ছে। গ্রীণরুম মানে যাহোক করে ঘেরা খানিকটা জায়গা। সেখানেই চলে মেকআপ, সাজসজ্জা এবং বিশ্রাম। মঞ্চের পাশেই বাজনদারের দল বাজনা বাজায়। স্মারক (প্রম্পটার) আরেকদিকে বসে পাত্রপাত্রীর ভূমিকা ও সংলাপ স্মরণ করিয়ে দেয়। খোলামঞ্চে, উন্মুক্ত আসরে অভিনয় চলে। কোনো দৃশ্যপট বা সেট-সেটিংস নেই। প্রয়োজনে একটি চেয়ার বা কয়েকটি বসবার জায়গা। ঐ চেয়ার ময়ূর সিংহাসন থেকে কনিষ্ঠ কেরানীর চেয়ার সবই হতে পারে।

গ্রীণরুম থেকে বেরিয়ে পাত্রপাত্রীরা দর্শকের মাঝখান দিয়েই এসে মঞ্চে উঠে অভিনয় করে। মঞ্চ আলোকিত করা হয়, যে যুগের যেমন আলোর ব্যবস্থা সেইভাবে।

যাত্রার এই মঞ্চব্যবস্থা এখনো চলে। খোলামঞ্চে খোলা আসরে যাত্রার অভিনয় চলে। শুধু যুগের ও বিজ্ঞানের উন্নতি ও পরিবর্তনের ফলে টেকনোলজির ব্যবহার বেড়ে গেছে। নাহলে, অভিনয় ও প্রয়োগপদ্ধতি দীর্ঘদিন একই রয়ে গেছে।

এই যাত্রাভিনয়ের ইতিহাস বিস্তৃত হয়েছে যুগে যুগে। নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান ধারা ইতিহাসেরই পদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছে। সেই ইতিহাস আলোচনা করা যেতে পারে।

ধর্মীয় উৎসবের নানা শোভাযাত্রায় নৃত্যগীত যোগে দেবমাহাত্ম্য প্রকাশ করা হত। দেব উৎসবে নৃত্যগীত ও শোভাযাত্রা থেকেই যাত্রার উদ্ভব হয়েছে। সংস্কৃত অভিধানে উৎসব অর্থেই 'যাত্রা' শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে। তবে 'যা'-ধাতু থেকে উৎপন্ন বলে এর মধ্যে যাওয়ার ব্যাপারটি রয়েছে। এই 'গমন' উপলক্ষেই উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হত বলে কালক্রমে উৎসব অর্থেই 'যাত্রা' শব্দটি সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে।[১] পরবর্তীকালে দেবমাহাত্ম্য শুধুমাত্র শোভাযাত্রায় নয়, একই স্থানে বসেই সবাই উপভোগ করত। ক্রমে দেবপরিক্রমা বন্ধ হল, কিন্তু এই ধরনের ধর্মানুষ্ঠান 'যাত্রা' নামেই প্রচলিত হল। কালক্রমে, এইরকম ধর্মোৎসবে নৃত্যগীতের সঙ্গে অভিনয়ের উপাদানগুলি যুক্ত হতে থাকে। এইভাবে হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দেবদেবীর কাহিনীকে নৃত্যগীত-সংলাপ এবং মাধ্যমে প্রদর্শন করাকেই 'যাত্রা' বলা হয়ে থাকে।

১. যা + ত্র (ভাবে + আ (স্ত্রীং) = যাত্রা।
'যাত্রাতু যাপনোপায়েগতৌ দেবার্চনোৎসবে'--সংস্কৃত বিশ্বকোষ।

এই 'গমন' বিষয়ে নানামত দেখা যায়। সূর্যের গমনাগমনের ওপর কৃষিজীবন যেমন নির্ভর করত, তেমনি তাকে কেন্দ্র করেই নানা উৎসব হতো। সূর্যের প্রধান দুই গমন— উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন। দক্ষিণায়নকে কেন্দ্র করে পূর্বভারতে 'রথযাত্রা' উৎসব এবং সূর্যের বিষুবরেখায় অবস্থানকে কেন্দ্র করে চড়ক-উৎসব। মধ্যযুগে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার এবং ষোড়শ শতক থেকে চৈতন্য প্রভাবে তার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। ফলে কৃষ্ণকে উপলক্ষ করে 'কৃষ্ণযাত্রা' গড়ে ওঠে। সূর্যের স্থান সেখানে কৃষ্ণ নিয়েছে, দ্বাদশ রাশি রূপান্তরিত হয়েছে দ্বাদশ গোপিনীতে। এইভাবে দোলযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা। রথযাত্রায় সূর্যের জায়গায় কৃষ্ণ, পরে জগন্নাথ। সূর্য কখনো কখনো শিবঠাকুরও হয়েছেন।

দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড়ভাষীদের 'মারী-আম্মা'র বাৎসরিক পূজানুষ্ঠানকে 'মারী যাত্রা' বলে। মৎস্যজীবীদের নৈমিত্তিক পূজানুষ্ঠানকে 'যাত্রে' বলে। উড়িষ্যায় গাজনের মতো অনুষ্ঠানকে বলে 'সাহীযাত্রা'। উড়িয়া ভাষায় মেলা অর্থে 'যাত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সাঁওতালদের মধ্যে 'যাত্রাপরব', দ্রাবিড়ভাষী ওঁরাওদের মধ্যে 'ওঁরাও-যাত্রা' প্রচলিত রয়েছে।

পাঁচালী থেকে যাত্রার উদ্ভব হয়েছে বলেও কেউ কেউ মনে করেছেন। প্রাচীন পাঁচালীর রূপ জানা নেই। মধ্যযুগে আখ্যানমূলক রচনাকেই বলত পাঁচালী। রাম পাঁচালী, শনির পাঁচালী। উনিশ শতকে সমসাময়িক হাফ-আখড়াই, দাঁড়াকবি এবং নতুন যাত্রার প্রভাবে নতুন পাঁচালী তৈরি হয়েছে। মঙ্গল গান কিংবা শাক্তবিষয়ক গানও প্রচলিত ছিল কৃষ্ণ-বিষয়ের প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে। বেহুলা লখিন্দরকে নিয়ে গান হতো। উনিশ শতকে 'ভাসানযাত্রা' এখান থেকে এসেছে। পাঁচালী থেকেই যাত্রার উৎপত্তি এই মতকে পরবর্তীকালে কেউ গ্রহণ করেন নি। তবে পাঁচালীর পাঁচটি অঙ্গ (পা-চালি, নাচাড়ি, বৈঠকি, ভাব কালি ও দাঁড়া-কবি) একজন গায়কের পক্ষে সবসময়ে করা সম্ভব হয়নি বলে, গান ও ছড়া অংশে অন্য সহায়ক নেওয়া হতো। পরে এই সহায়ক সংখ্যা বেড়ে যায়। অনেকটা যাত্রার গান ও অভিনয় অংশের মতো হয়ে পড়ে। সেখানেই যাত্রার সঙ্গে পাঁচালীর সাদৃশ্য মেলে।

কারো কারো মতে নাটগীত থেকে যাত্রার উদ্ভব ঘটেছে। মধ্যযুগের বাংলায় যাত্রা বলতে দেবোৎসবই বোঝাত। এই উৎসব উপলক্ষে নৃত্যগীত হত বলে একে 'নাটগীত' বলা হত। জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ওই ধরনের নাটগীত। যাত্রা বা উৎসব উপলক্ষে এই নাটগীত হতো বলে ক্রমে এই নাটগীতকেই যাত্রা বলা হতো।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অভিনয় অর্থে 'যাত্রা' শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় না। উৎসব অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। চৈতন্যভাগবতেও তার উল্লেখ রয়েছে-- 'অঙ্কের বিধানে নৃত্য'। গীতগোবিন্দে নৃত্যগীত রয়েছে, রাগ-তালের নির্দেশ আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা-কৃষ্ণ-বড়াই তিনটি চরিত্রের কথোপকথনের এবং নৃত্যগীতের মধ্যে

বেশ নাটকীয়ভাব প্রকাশ পেয়েছে। এগুলির মধ্যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের নাটগীত বা যাত্রার ধরনটি পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়।

একথা ঠিক, প্রাচীনকাল থেকেই যাত্রার মতো একটি লৌকিক নাটক (Folk Drama) এদেশে প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগে তাকেই নাটগীত বলত। ভরতের নাট্যশাস্ত্রেও একটি প্রচলিত লোক-নাট্যের ধারাকে সংস্কার করে আদর্শরূপ দেবার চেষ্টা রয়েছে। ভরতের নির্দেশিত নূতন রূপ সমাজের উচ্চতর লোকের মধ্যে গৃহিত ও প্রচলিত হয়। নিম্নস্তরে প্রাচীন লোকনাট্যের ধারাটি প্রবাহিত হতে থাকে। সারা ভারতে এক এক অঞ্চলে এক এক রূপে প্রচলিত হয়। পূর্ব ভারতে এই ধারা সর্বাধিক প্রাধান্য লাভ করে। তাই ক্রমে জয়দেবের গীতগোবিন্দে কিংবা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পরিচিত হয়েছে।

ধর্মের বিষয়বস্তুই যাত্রার অবলম্বন। তার মধ্যে বিশেষ করে মধ্যযুগে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক যাত্রাই প্রধান হয়ে উঠেছিল। কালক্রমে রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গলের বিষয়বস্তু নিয়েও রাসযাত্রা, ভাসানযাত্রা তৈরি হতে থাকে।

মধ্যযুগে চৈতন্যদেবের অভিনয়ের খবর পাওয়া যায়। তাতে যাত্রার ধরনটিও লক্ষ্য করা যায়। ভরতের নাট্যশাস্ত্রের নির্দেশ উপেক্ষা করে চৈতন্য খোলামঞ্চে যাত্রার মতো অভিনয় করতেন। বোঝা যায়, চৈতন্যদেব এই অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তাঁর ধর্মভাব প্রচারের জন্য জনসংযোগের সুযোগ নিয়েছিলেন। বৃহত্তর জনগণের কাছে যাওয়ার অভিপ্রায়েই চৈতন্য গৃহবন্দী মঞ্চব্যবস্থাকে সরিয়ে রেখে খোলামঞ্চে অভিনয় করেছিলেন।

চৈতন্যদেবের অভিনয়ের খবর তাঁর জীবনী গ্রন্থগুলি থেকে জানা যায়। নদীয়ায় তিনি রুক্মিণীহরণ ও ব্রজলীলা অভিনয় করেন। নীলাচলে অভিনয় করেন ব্রজলীলা ও রাবণবধ পালা। এই অভিনয়ের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সূত্রাকারে বলা যায় :

> ১. খোলা জায়গায়, উন্মুক্ত মঞ্চে অভিনয় হত। ২. পালা তৈরি করা থাকত না, পালার সূত্রটি ঠিক করা থাকত। ৩. গান বাঁধা থাকত। ৪. উপস্থিত মতো বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কিছু সংলাপ মিলিয়ে পাত্রপাত্রী নৃত্য ও ভাবভঙ্গি সহযোগে অভিনয় করত। ৫. সব চরিত্রে পুরুষেরাই অভিনয় করত। ৬. বৃদ্ধ-বৃদ্ধা চরিত্র হাস্যরস সৃষ্টির জন্য থাকত। ৭. সাজসজ্জা করা হত। ৮. দোহার থাকত। ৯. প্রবেশ-প্রস্থান ছিল। ১০. সংলাপ ও নৃত্যগীত থাকত। ১১. ভক্তিভাবের ধর্মীয় আবেশ পালাটিকে ঘিরে রাখত।

চৈতন্যদেবের অভিনয়ের প্রভাবে সে যুগে অনেক যাত্রাপালা লিখিত হয়। কবি কর্ণপুর, রায় রামানন্দ, রূপগোস্বামী, দেবীনন্দন সিংহ প্রভৃতির পালাগুলি উল্লেখযোগ্য। ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে অনেকগুলি সংস্কৃত নাটক ও পালা বাংলায় অনুবাদ হয়। অভিনীত হয়ে সেগুলি প্রচার লাভও করেছিল। লোচনদাস অনুবাদ করেন রামানন্দের জগন্নাথবল্লভ নাটকের, যদুনন্দন দাস করেন রূপগোস্বামীর বিদগ্ধ মাধব, পুরুষোত্তম মিশ্র চৈতন্যচন্দ্রোদয় (কর্ণপুর)। বৈষ্ণবধর্ম ও পদাবলীর প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণযাত্রারও

প্রসার লাভ ঘটতে থাকে।

মধ্যযুগে পালরাজাদের কাহিনী নিয়েও যাত্রাপালা লেখা হয়। তাছাড়া রাধাকৃষ্ণ পালার প্রাধান্য সত্ত্বেও অন্য ধর্ম ও কাহিনী নিয়েও পালা লেখা হয়। চণ্ডী মনসা প্রভৃতি শাক্ত কাহিনী, ধর্মমঙ্গল কাহিনী, গোপীচন্দ্র কাহিনী, গোরক্ষনাথ কাহিনী নিয়েও পালা লেখা হয়। তবে অষ্টাদশ শতক অবধি লিখিত কোনো যাত্রাপালার পরিচয় পাওয়া যায় নি।

অষ্টাদশ শতক বাংলার ইতিহাসের পালাবদলের কাল। মোঘল শাসনের অবসান, নবাবী আমলের শুরু। শাসন নেই, নিরাপত্তা নেই, রয়েছে খাদ্যাভাব--সে এক দুঃস্বপ্নের সময়। তার ওপর বর্গীর হাঙ্গামা, দুর্ভিক্ষ। বিপর্যস্ত জনজীবনের মাঝে এলো ইংরেজ। ১৭৫৭-এর পলাশীর যুদ্ধ। বিজয়ী ইংরেজ শাসনব্যবস্থা শক্ত করলেও, শোষণ ও অত্যাচার হলো আরো নির্মম ও গভীরতর। পলাশীর যুদ্ধের তের বছরের মধ্যে ঘটে গেল মর্মান্তিক ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।

ক্রমে গ্রামবাংলাকে বিপর্যস্ত করে নগর কলকাতা গড়ে উঠছে। কলকাতায় ইংরেজের সাহচর্যে প্রচুর মানুষ ধনী হয়ে উঠল। সামাজিক প্রতিষ্ঠা না হলেও এই 'হঠাৎ নবাবে'র দল তখন রঙীন জীবনে ভরপুর। শিক্ষা নেই, রুচি নেই, পুরনো সমাজবন্ধন নেই, ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার নেই—অথচ অর্থ আছে, আছে জীবন উপভোগের তাড়না। এদের নাগর-পৃষ্ঠপোষকতাতেই গড়ে উঠেছে কবিগান, খেউড় গান, হাফআখড়াই গান। সে এক রুচি ও ঐতিহ্যহীনতার স্বৈরাচার চলেছে বাঙালি সংস্কৃতির ওপর। কৃষ্ণযাত্রাও এই প্রভাবমুক্ত হতে পারেনি--যাত্রাও নিম্নরুচি লাভ করে। অসুস্থ নগরজীবনের মানসিকতায় যাত্রার মধ্যেও কুরুচি এসে গেল। নারদ, ব্যাসদেব চরিত্রকে দিয়ে ভাঁড়ামো সৃষ্টি, অশ্লীলতার বাড়াবাড়ি, আদিরসের প্রাবল্য--যাত্রাপালাগুলিকে কদর্য করে তুলল। এই সময়েই কৃষ্ণযাত্রার ভক্তিরস তরল উচ্ছ্বাস ও খিস্তি-খেউড়ে ভেসে গেল। এই সময়েই কৃষ্ণযাত্রার নাম হয়ে গেল কালীয়দমন যাত্রা।

উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের যুগ। বিশেষ করে নগরকেন্দ্রিক নবজাগ্রত বাঙালি নতুন যুগের ভাবনায় জীবন গড়তে চলেছে। ভাবজগতের পরিবর্তনের ফলে অষ্টাদশ শতকে যেগুলি সাদরে গৃহিত হয়েছিল, উনিশ শতকের নবজাগ্রত চেতনায় সেগুলিও বাতিল হতে লাগল। রুচিহীন যাত্রাও এই সময়ে শিক্ষিত জনসমাজে অনাদৃত হয়ে পড়ল। 'যাত্রা দেখে ফাতরা লোকে' এইরকম কথা শিক্ষিত বাঙালির দিক থেকেই চালু হয়।

এই নতুন যুগে অনাদৃত যাত্রাকে সংস্কৃত ও পাংক্তেয় করে তোলার চেষ্টা শুরু হল। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক থেকেই সেই প্রয়াস লক্ষ্য করা গেল। সংস্কারের কাজে এগিয়ে এলেন শিবরাম, শ্রীদামদাস, সুবলদাস অধিকারী এবং পরমানন্দ অধিকারী। শিবরাম যে চেষ্টা শুরু করেছিলেন শ্রীদাম-সুবল ও তাঁর শিষ্য পরমানন্দের মধ্যেই তা প্রবলরূপে দেখা দিল। এরা প্রত্যেকেই কালীয়দমন যাত্রা অভিনয় করতেন। শ্রীদাম-সুবল

যাত্রা পালায় অভিনয় ও সঙ্গীতকে উন্নত করলেন। পরমানন্দেরও নিজের দল ছিল। সেখানে অভিনয়েও তিনি কিছু পরিবর্তন করলেন। তাঁর লেখা 'কালীয়দমন যাত্রা'য় তিনিই প্রথম প্রচলিত যাত্রার মধ্যে বৈচিত্র্যহীন বৈষ্ণবগীতির যে প্রাবল্য ছিল, তার পরিবর্তে নাট্যিক ক্রিয়া এবং সংলাপ ব্যবহার করেন। যদিও ভক্তিরস, আদিরস ও ভাঁড়ামো তখনো যাত্রার প্রধান আকর্ষক বস্তু ছিল।

উনিশ শতকের প্রথম দিকে লোচন অধিকারী (তাঁর পালার নাম : অক্রুর সংবাদ, নিমাই সন্ন্যাস), বদন অধিকারী (মান, দান, মাথুর—পালা) গোবিন্দ অধিকারী (কৃষ্ণযাত্রা, কালীয়দমন যাত্রা, কৃষ্ণকালী, মুক্তাবলী) প্রভৃতি পালাকারেরা গতানুগতিক যাত্রার ঢঙ ও রীতি কিঞ্চিৎ পরিবর্তনের নিদর্শন রেখেছেন। সেযুগে এরা খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। সমকালীন মধুসূদন কান (মধু-কান)-এর ঢপকীর্তন, অক্রুর সংবাদ, কলঙ্কভঞ্জন প্রভৃতি দর্শক মনোরঞ্জক হয়ে উঠেছিল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে কলিরাজার যাত্রা (১৮২১), নলদময়ন্তী (১৮২২), কামরূপযাত্রা, রাজা বিক্রমাদিত্য যাত্রা, নন্দবিদায় যাত্রার অভিনয়ের খবর পাওয়া যায়। কলকাতার ও আশেপাশে ধনী বাঙালির বাড়িতে এইসব যাত্রানুষ্ঠান হত। কামরূপ যাত্রা শ্যামসুন্দর সরকারের বাড়িতে (৯ মার্চ, ১৮২২), রাজা বিক্রমাদিত্য যাত্রা ভূকৈলাসের মুখুজ্জে বাড়িতে (৩১ মে, ১৮২৩), নন্দবিদায় রামচাঁদ মুখোপাধায়ের চেষ্টায় (মার্চ, ১৮৪৯), শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাড়িতে (১৪ এপ্রিল, ১৮৪৯) অভিনীত হয়েছিল।

বড়লোকের বাড়িতে ছাড়াও এই সময়ে গ্রামাঞ্চলে, শহরের হাটে, বাজারে, মেলায় সাধারণ মানুষের আমোদ-প্রমোদের জন্যও যাত্রানুষ্ঠান হত। তবে সেগুলির ধার ও ভার ধনী বাড়ির অভিনয়ের মতো হত না।

উনিশ শতকের প্রথম ভাগেই 'নতুন যাত্রা' নামে একধরনের যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। বিষয়বস্তু ছিল হয় বিদ্যাসুন্দর, নয় নলদময়ন্তী কাহিনী। সেখানে মালিনীর নৃত্যগীত একটি বিশিষ্ট অঙ্গরূপে ব্যবহৃত হয়। খেমটা নাচেরও ব্যবহার শুরু হল। এদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হচ্ছেন গোপাল উড়ে। এর অন্য বিষয়ের যাত্রার মধ্যেও অপ্রাসঙ্গিক ভাবে এই নৃত্য ও গীত ঢুকে পড়ে। এই সূত্র ধরে ক্রমে নতুন যাত্রায় কালুয়া-ভুলুয়া, মেথর-মেথরানী, ঘেসেড়া-ঘেসেড়ানি, নাপিত-নাপিতানি প্রভৃতি অশ্লীল নৃত্যগীত প্রবেশ করে আবার যাত্রাকে নিম্ন-রুচির বাহন করে তোলে। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ও তাঁর শিষ্য রামধন মিস্ত্রী প্রথমে (১৮২২) বিদ্যাসুন্দর পালার এই অবনমন ঘটান। প্যারীমোহন তাঁর যাত্রাপালায় সস্তা জনপ্রিয়তারই পথ ধরেন। গোপাল উড়ে এসবেরই সর্বাঙ্গীন রূপে অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। কৃষ্ণযাত্রার ভক্তিবিহ্বলতা দূর হয়ে গিয়ে এখানে নৃত্যে-গীতে, সঙ্-য়ের উপস্থিতিতে, সস্তা সংলাপে যাত্রাপালা নিম্ন ও অসুস্থ রুচির হাত ধরে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে লাগল।

গোপাল উড়ের যাত্রাপালা বিদ্যাসুন্দরের এতোই ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল যে, শ্যামবাজারের ধনী নবীন বসুর বাড়িতে নতুন আমদানী থিয়েটারের রীতিতে

'বিদ্যাসুন্দরের' অভিনয় হয়েছিল (১৮৩৫)। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির নাট্যশালা স্থাপনের চিন্তার মূলে যে গোপাল উড়ের যাত্রা, সেকথা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন। খুবই জনপ্রিয় গোপাল উড়ে ও বিদ্যাসুন্দর পালাকে সেযুগে সহজে অস্বীকার করা সম্ভব ছিল না। তাঁর শিষ্য কৈলাস বারুই এই ধারা টেনে নিয়ে যান। লোকাধোপা নামে পরিচিত লোকনাথ দাস গোপাল উড়ের পথ অনুসরণ করে লেখেন বিদ্যাসুন্দর, নলদময়ন্তী, শ্রীমন্তের মশান, কলঙ্কভঞ্জন।

উনিশ শতকের নব্যশিক্ষিত নতুন সম্প্রদায় এই যাত্রার প্রতি অনীহা প্রকাশ করেছিল। ক্রমে এই সমাজের কাছে যাত্রা অপাংক্তেয় হয়ে পড়ে। বাঙালি ধনী সম্প্রদায়ের প্রাসাদ-মঞ্চগুলিতে তখন ইংরেজি ধরনের থিয়েটার চালু হয়েছে ; মঞ্চ বেঁধে, সেট সেটিংস ব্যবহার করে, দৃশ্যপট সাজিয়ে, উইংস ও যবনিকার অন্তরাল সৃষ্টি করে। আলো, সঙ্গীত এবং অভিনয়ের এই থিয়েটার নতুন সম্প্রদায়ের কাছে আদরণীয় হয়ে উঠেছে। সেই তুলনায় সমতল ভূমিতে যাত্রার অভিনয় হয় মুক্ত স্থানে, দর্শক ও অভিনেতা একই তলে প্রকাশ্যে সহাবস্থান করে। পয়ারে সংলাপ, তাতে গানের অহেতুক প্রাধান্য, 'জুড়িগান' ও 'বালকদের গান', বিবেক—রঙ-ঢং-খেমটা নাচ, নিম্নরুচি ও অশ্লীলতার যাত্রাপালা নব্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকদের আনুকূল্য পায়নি। বরং থিয়েটার আদরণীয় হয়েছিল। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বক্তব্যে (বিবিধার্থ সংগ্রহ, মাঘ, ১২৮০ শকাব্দ) এই নব্য ভাবনাটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে : 'ইহার (থিয়েটারের) প্রাদুর্ভাবে যাত্রা কবি খেউড় প্রভৃতি দূষ্য উৎসবের দূরীকরণ ঘটে—ইহা কর্তৃক বঙ্গদেশে কু-নীতির উৎসেদ ও নির্মল ব্যবহারের প্রাদুর্ভাব হয়—ইহা আমাদিগের নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।'

এই সম্প্রদায়ের হাতেই রয়েছে নব্য সংস্কৃতির বিকাশের চাবিকাঠি—তাদের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হয়ে নতুন যাত্রা বিকাশের পথ খুঁজে পায়নি। বরং অবহেলায় অনাদরে ম্লানমুখে নব্য সংস্কৃতির চৌহদ্দির বাইরে অবস্থান করছিল।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে কৃষ্ণযাত্রাকে নতুন করে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিলেন কৃষ্ণকমল গোস্বামী। নবোদ্ভূত সমাজে প্রাচীন কৃষ্ণযাত্রার ধর্মভাবের প্রভাব খুব ছিল না। ফলে কৃষ্ণযাত্রা ক্রমে লুপ্ত হতে থাকে এবং বিদ্যাসুন্দর ও নলদময়ন্তী পালার ব্যভিচার শুরু হয়েছিল। কৃষ্ণকমল প্রাচীন কৃষ্ণযাত্রার আদর্শটি গ্রহণ করে, কৃষ্ণযাত্রার বিষয়বস্তুর একঘেয়েমি কাটিয়ে, চৈতন্যজীবন, রামায়ণ ইত্যাদি থেকে কাহিনী গ্রহণ করলেন। রুচিবিকৃতি দূর করে যাত্রাকে মার্জিত করে নিয়ে নতুন সমাজের কাছে গ্রহণীয় করে তোলার চেষ্টা করলেন। ভাঁড়ামো, অশ্লীলতা, সঙ্-য়ের নাচ ও গানের বিকৃতি থেকে যাত্রাপালাকে মুক্ত করে উনিশ শতকের মধ্যভাগে কৃষ্ণকমল নতুন সংস্কারে হাত দিলেন। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণকমলের কয়েকটি পালা উল্লেখযোগ্য—নিমাই সন্ন্যাস (১৮৩০), স্বপ্নবিলাস, রাই উন্মাদিনী, বিচিত্র বিলাস, ভরতমিলন, সুবল সংবাদ, নন্দবিদায়, গন্ধর্বমিলন।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে কৃষ্ণকমল বাংলার পূর্ব অঞ্চলে কৃষ্ণযাত্রাকে ছড়িয়ে দিয়ে

জনপ্রিয় করেন। রাঢ় অঞ্চলে এই দায়িত্ব নেন নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু দুজনের আপ্রাণ চেষ্টাতেও কৃষ্ণযাত্রা সে জনপ্রিয়তা ফিরে পেল না। নতুন যুগের নতুন দাবীর অন্য পথ ধরল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নতুন প্রমোদ-মাধ্যম থিয়েটার বা 'বিলিতি যাত্রা' নতুন সমাজের কাছে বেশি গৃহিত হয়েছে। নতুন নতুন মঞ্চ গড়ে উঠেছে, নাটক লিখিত ও অভিনীত হচ্ছে। বিলিতি যাত্রা বা নতুন থিয়েটার তখন কলকাতার ধনী সম্প্রদায়, শিক্ষিত সমাজ এবং নবোদ্ভুত জনগণের কাছে সবচেয়ে আদৃত প্রমোদ ব্যবস্থা। এই থিয়েটারের প্রভাবেই 'নতুনযাত্রা' গীতাভিনয়ে পরিণত হলো।

থিয়েটার জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও সবার পক্ষে এই থিয়েটার দেখার সুযোগ ছিল না। কিংবা সবার পক্ষে এই থিয়েটার অভিনয় করার আর্থিক সঙ্গতি ও সম্বল ছিল না। তাই যাত্রার মধ্য দিয়েই নাট্যরস পরিবেষনের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি হল গীতাভিনয়। কৃষ্ণযাত্রা ও নতুনযাত্রার গীত অংশ সংক্ষিপ্ত করে, নতুন নাটকের অভিনেয় অংশকে প্রাধান্য দেওয়া হল। প্রাচীন ও নতুন উভয় যাত্রার ভিত্তির ওপর ইংরেজি আদর্শে রচিত বাংলার নাটকগুলির প্রত্যক্ষ ফলে সৃষ্টি হল গীতাভিনয়।[৩]

কৃষ্ণযাত্রা থেকে গীত, নতুন যাত্রা থেকে নৃত্য, সমসাময়িক নাটকের সংলাপ-প্রাধান্য ও সংঘাত-এর নাট্যধর্ম—এই চার নিয়ে গীতাভিনয় তৈরি হলো। প্রাচীন যাত্রার ভক্তি, নতুন যাত্রার আনন্দ ও ইংরেজি আদর্শে রচিত বাংলা নাটকের কারুণ্য এতে গৃহিত হলো। যাত্রার দেশজ রস সংস্কারের সঙ্গে নতুনকালের রসপিপাসা মিশ্রিত হওয়ার ফলে সাধারণ জনগণ, শিক্ষিত জনগণ, ধনী বাঙালি সকলেই এতে পরিতৃপ্ত হলো। গানের যে ধারা ক্রমে নিম্নরসের আবেশে উপেক্ষিত হচ্ছিল, গীতাভিনয়ের মধ্যে সেই রাগসঙ্গীত আবার প্রাণ ফিরে পেল। বিষয়বস্তুতে কৃষ্ণকথা ছাড়াও পুরাণের বহুবিচিত্র কাহিনী স্থান পেল। কাহিনীর বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতির সঙ্গেই চরিত্র সৃষ্টির দিকেও নজর দেওয়া হলো। ধর্মভাব অনেকাংশে মুক্ত হওয়ার ফলে সর্ব ধর্মের মানুষের কাছেই আদৃতত হলো। কৃষ্ণযাত্রার সংক্ষিপ্ত কাহিনীকে পঞ্চাঙ্ক নাটকের অনুকরণে বিস্তৃত করে তোলা হলো। সব মিলিয়ে কৃষ্ণযাত্রাকে অপসারিত করে গীতাভিনয় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নিজের জায়গা করে নিল। যাত্রার কুরুচি, থিয়েটারের ব্যয়ভার—দুটো থেকেই গীতাভিনয় জনগণকে মুক্তি দিল। যাত্রায় পাওয়া গেল নানা বিষয়, থিয়েটারি অভিনয়, পারস্পরিক সংলাপ, গানের কথা ও সুরের বৈচিত্র্য, মহার্ঘ সাজসজ্জা, উচ্চাঙ্গের রাগরাগিনী এবং দেবতার সঙ্গে মনুষ্য চরিত্রও।

নাট্যকার মনোমোহন বসু যাত্রাকেও ভালবাসতেন। অথচ যাত্রার অধোগতি মনোব্যথার কারণ হয়েছিল। মনোমোহন আধুনিক থিয়েটার ও দেশীয় রুচির সংমিশ্রণে যাত্রা ও নাটকের মেলবন্ধনে কয়েকটি নাটক লেখেন। রামাভিষেক (১৮৬৮), সতী নাটক (১৮৭৪), হরিশ্চন্দ্র (১৮৭৫), পার্থপরাজয়, যদুবংশ উল্লেখযোগ্য। গানের সংখ্যা

৩. ড. সুকুমার সেন এই কারণে 'গীতাভিনয়'কে বলেছেন 'চপসন্দেশ'।

কমিয়ে, দীর্ঘ গায়ন বন্ধ করে, গায়ন পদ্ধতির সংস্কার করে, পাত্রপাত্রীর সংলাপ স্বাভাবিক করে তুলে, ভক্তি ও করুণরসের যোগান দিয়ে এবং অশ্লীলতা ও ভাঁড়ামো থেকে মুক্ত করে লেখা তার নাটকগুলি বৌবাজার বঙ্গনাট্যালয় থিয়েটারের মতো অভিনয় করল। সঙ্গে সঙ্গে বৌবাজারের যাত্রার দলও সেগুলি অভিনয় করল। বোঝা যায়, মনোমোহন দুই রীতিতেই অভিনয়যোগ্য করে নাটকগুলি লিখলেন এবং সঙ্গে পুস্তিকা জুড়ে দিয়ে যে যার পছন্দের বাছাইয়ের হদিশ দিয়ে দিতেন। মনোমোহনের প্রচেষ্টায় নতুন করে যাত্রা লেখা ও অভিনয়ের আয়োজন শুরু হয়ে গেল।

তার আগেই অবশ্য কয়েকজন গীতাভিনয় রচয়িতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। যেমন অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (শকুন্তলা, ১৮৬৫), হরিমোহন রায় (রত্নাবলী, ১৮৬৫, শ্রীবৎসচিন্তা, ১৮৬৬, জানকীবিলাপ, ১৮৬৭, মালিনী, ১৮৭৫)। কালিদাস সান্যাল (নলদময়ন্তী)। তিনকড়ি ঘোষাল (সাবিত্রী সত্যবান, ১৮৬৫) মুলে নাট্যকার ছিলেন বলে যাত্রাপালায় নাটকের আদর্শই গ্রহণ করেন। গীতাভিনয় লিখলেও নামে 'নাটক' কথাটি ব্যবহার করতেন। যাত্রা ও নাটককে সজ্ঞানে কাছাকাছি নিয়ে আসার চেষ্টা এগুলিতে লক্ষ্য করা যায়। গীতাভিনয়ের হুজুগে তখন খ্যাতিমান নাট্যকারদের নাটকগুলিকেও গীতাভিনয়ে রূপান্তরিত করে অভিনয় শুরু হয়ে যায়।

মনোমোহনের পরে পরেই এলেন মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়, যাত্রা জগতে তিনি মদন মাষ্টার নামেই পরিচিত। চন্দননগরে তাঁর পেশাদারি যাত্রার দল ছিল। যাত্রার প্রয়োগ ও উপস্থাপনায় তিনি সংস্কার করলেন। হুগলী স্কুলের শিক্ষক মদনমোহন আধুনিক শিক্ষার সুযোগে প্রচলিত যাত্রার সংস্কার করেন। নৃত্যগীত, সুর, বাদ্য, সাজসজ্জার সংস্কার করেন। যাত্রার প্রয়োগ প্রাধান্যের নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করা যায় তাঁর দক্ষযজ্ঞ, হরিশ্চন্দ্র, রামবনবাস, ধ্রুবচরিত্র, প্রহ্লাদচরিত্র, দুর্গামঙ্গল পালাগুলিকে।

থিয়েটারের পাশে শহর-শহরতলি ও গ্রামাঞ্চলে গীতাভিনয় যাত্রাও জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। এই কাজে যারা প্রধান দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করেছিলেন তারা হলেন মতিলাল রায়, ব্রজমোহন রায়, অহিভূষণ ভট্টাচার্য, ধনকৃষ্ণ সেন, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ পালাকার ও পরিচালকবৃন্দ। প্রত্যেকের নিজস্ব যাত্রার দল ছিল, তাই নিয়ে যাত্রাপালা অভিনয় করতেন। গীতাভিনয়গুলি যাত্রার মতোই মঞ্চবিহীন খোলা আসরেই অভিনীত হতো।

উনিশ শতকের শেষার্ধে সবচেয়ে খ্যাতিলাভ করেন মতিলাল রায়। যাত্রাপালা লিখতেন, নিজের দলে অভিনয় করাতেন, নিজে অভিনয় করতেন। ঠিক যে সময়ে বাংলা নাটকের জগতে গিরিশচন্দ্র নাটকগুলি লিখতে শুরু করেছেন—সেই সময়েই মতিলাল তাঁর সম্প্রদায় নিয়ে যাত্রাপালা অভিনয় করছেন। তাঁর যুগে মতিলাল রায় খ্যাতির শীর্ষে উঠেছিলেন। মনোমোহন বসুর গীতাভিনয়গুলি নাটকের কাছাকাছি। মতিলাল রায়ের গীতাভিনয়গুলি যাত্রারীতির নিকটবর্তী। মতিলালের পালাকে নাটকের চেয়ে যাত্রারূপেই অভিনয় করা সহজ ও সঙ্গত। মনোমোহনের যেমন গানগুলি বাদ

দিয়ে থিয়েটারে অভিনয় সহজ।

প্রথমে নবদ্বীপ বঙ্গ গীতাভিনয় সম্প্রদায় (১৮৮০) খুলে অভিনয় শুরু করেন। পরে নিজের নামে সম্প্রদায় খুলে দীর্ঘদিন অভিনয় করেন। মতিলাল প্রথমে পাঁচালী রচয়িতা ও গায়ক ছিলেন। কথকের বক্তৃতা ও পাঁচালীর পৌরাণিকভাব মিশ্রিত করে লোকশিক্ষা ও ধর্মশাস্ত্রের কথকতার আয়োজন করেন। গানে পল্লীগীতির সুর মিলিয়ে দেন। যাত্রাপালায় থিয়েটারী ঢং এনে, অভিনয়ের ক্ষেত্রে পারদর্শিতা ও কলাকৌশলের প্রয়োগ করে তিনি দর্শকদের মোহিত করে দেন। তাঁর ৪০টি পালায় রয়েছে প্রায় হাজারের ওপর গান। সেই গানও শ্রোতাদের মুগ্ধ করে দিত। কয়েকটি পালা—তরণীসেন বধ, রামবনবাস, সীতাহরণ (১৮৭৮), বিজয়চণ্ডী (১৮৮০), দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ (১৮৮১), ভীষ্মের শরশয্যা, কর্ণবধ, ভরত আগমন (১৮৮৮), নিমাই সন্ন্যাস, ব্রজলীলা (১৮৯৪), যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক (১৯০০), রাবণবধ, পাণ্ডবনির্বাসন, যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ, গয়াসুরের হরিপাদপদ্ম লাভ প্রভৃতি। ভক্তিভাব, করুণরসের সঙ্গে বীর রৌদ্র ও হাস্যরসের ব্যবহার, শালীনতাবোধ, গানের বৈচিত্র্য তাঁর পালাকে প্রাচীন যাত্রা থেকে উন্নত ও জনপ্রিয় করে তুলেছিল।

হারাধন রায় (নলদময়ন্তী, সুরথ উদ্ধার, মীরা উদ্ধার, কাদম্বরী, লক্ষ্মণ বর্জন, রামাবতার), ধনকৃষ্ণসেন (বিল্বমঙ্গল, উমাতারা, কর্ণবধ, রাবণের মোহমুক্তি), ব্রজমোহন রায় (অভিমন্যুবধ, রামাভিষেক, সাবিত্রীসত্যবান, রাবণবধ, কংসবধ), ধর্মদাস রায় (চিন্তার চিন্তামণি লাভ, প্রভাসে নারায়ণ, শ্রীকৃষ্ণের গুরুদক্ষিণা, ভাগীরথী মহিমা), পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য (পারিজাত হরণ, সুবলমিলন, জনা, সতীর পতিভক্তি, মায়াগীতা) উনিশ শতকের শেষার্ধের উল্লেখযোগ্য পালাকার।

উনিশ শতকে গীতাভিনয় সমবেত প্রচেষ্টায় জনপ্রিয়তার উর্ধ্বে উঠেছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে থিয়েটারের প্রতিস্পর্ধী জনপ্রিয়তাও লাভ করেছিল। কিন্তু যাত্রা ক্রমে থিয়েটারের ঢংয়ে বেশী অভিনীত হওয়াতে পালাগুলি নাট্যধর্মী হয়ে উঠলো, অথচ আধুনিক নাটকের শেক্সপীয়রীয় ক্রিয়াবহুলতা, দ্বন্দ্ব গীতাভিনয়ে সম্ভব হয় না। বৈচিত্র্যহীনতাব ভারে গীতাভিনয় শ্লথগতি প্রাপ্ত হলো।

এই সময়েই নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ও তাঁর অনুগামী নাট্যকারেরা থিয়েটারে পৌরাণিক নাটকের বন্যা বইয়ে দিলেন। দেখাদেখি পৌরাণিক যাত্রাও শুরু হল। নতুন যাত্রায় আধ্যাত্মিক ভাব ছিল না। ধর্মবোধ নিরপেক্ষ আনন্দ, মজা ও কৌতুক সৃষ্টি প্রধান লক্ষ্য ছিল। পৌরাণিক যাত্রায় ভক্তি ও বিশ্বাসের ভাব প্রকাশ পেল। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত পুরাণাদি অন্য গ্রন্থ থেকে পৌরাণিক যাত্রার বিষয়বস্তু গৃহিত হলো। উনিশ শতকের শেষ ভাগেই হিন্দুধর্মবোধের ফলশ্রুতিতেই ভক্তিভাব পৌরাণিক নাটক ও যাত্রায় প্রচলিত হয়েছিল। থিয়েটারে ভক্তিভাব ও বাঙালির জীবনাদর্শ নগরজীবনে প্রচারিত হয়েছিল। পৌরাণিক যাত্রা নগর ছাড়িয়ে গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের কাছে ভক্তিভাব ও জীবনাদর্শের সঙ্গে সঙ্গে অদৃষ্টবাদ, কর্মফল, সংস্কার ও বিশ্বাস ছড়িয়ে দিতে

লাগল। গৈরিশ ছন্দে লেখা যাত্রাগুলি বিয়োগান্তক হতো না নাটকের মতো। বিয়োগান্তক হলে 'মেল্‌তা' জুড়ে দিয়ে মিলনান্তক করা হতো। পৌরাণিক নাটক ক্রমে যাত্রার সঙ্গে 'মেলতা' গ্রহণ করেছিল। দ্বৈতনৃত্যগীত, ভাঁড় চরিত্র সৃষ্টি, আবেগধর্মী সংলাপ নাটকে চালু হয়েছিল। গীত-প্রাধান্যও শুরু হয়েছিল। আবার পৌরাণিক নাটকের ভাব ও ভঙ্গি যাত্রা গ্রহণ করে চলেছিল।

উনিশ শতকের শেষভাগের যাত্রায় আখড়াই বন্দী নাচ দিয়ে কাহিনী শুরু হতো। অল্পবয়সী ছেলেরা নর্তকী সেজে গান গেয়ে আখড়াই বন্দী নাচত। বিদেশী বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে দেশী বেহালা, ঢোল, বায়াতবলা, মন্দিরা ব্যবহৃত হতো। দেবদেবী বন্দনার পরে মূল পালা শুরু হত। প্রস্তাবনা জুড়ি গায়কের গান দিয়ে শুরু। জুড়ি গায়ক, স্বতন্ত্র চরিত্র নয়, পাত্র-পাত্রীর মনোভাব সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রকাশ করত। পোষাক ছিল--গায়ে সাদা চোগা চাপকান, মাথায় পাগড়ি। দলে চার জন থাকত--চারকোণে। জুড়ির গানকে বলে 'উক্তগীত', জুড়ির সাহায্যে থাকত হাফজুড়ি। আর 'বিবেক' যখন তখন এসে বিষয়ের ভাব ও চরিত্রের দ্বন্দ্ব ও অভীপ্সা গানে গানে প্রকাশ করে দিয়ে যেত। যাত্রাদলের অভিনেতা, বাদ্যকর এবং কর্মচারীদের বলত 'আসামী'। থিয়েটারে ১৮৭৩ থেকেই পাকাপাকিভাবে মেয়েরা অভিনয় শুরু করে, কিন্তু যাত্রায় অভিনেত্রী আসতে আরো অনেক বিলম্ব হয়েছে। উনিশ শতক জুড়ে পুরুষেরাই সব চরিত্রে অভিনয় করেছে।

মহিলা পরিচালিত কিছু যাত্রাদলের খবর পাওয়া যায়। রাজা বৈদ্যনাথের কোনো বারবিলাসিনী উনিশ শতকে প্রথম মহিলা যাত্রাদল পরিচালনা করেন। চন্দননগরের বৌমাষ্টারের দল (মদন মাষ্টার মারা গেলে, তার স্ত্রী এই দল পরিচালনা করতেন বলে এইরকম নাম), নবদ্বীপের বৌকুণ্ডুর দল (নীলমণি কুণ্ডুর মৃত্যুর পর তার স্ত্রী 'অধিকারী' হন) নানা যাত্রাপালা অভিনয় করেছিল।

উনিশ শতকের সত্তর-আশির দশকেই ছিল সখের যাত্রার দল। উমেশ মিত্রের দল, আড়পুলি গলির দল, সিমলার 'সকের যাত্রা কোম্পানি' প্রভৃতি। ক্রমে গড়ে ওঠে পেশাদারি যাত্রার দল। থিয়েটারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিঁকে থেকে এইসব দল সে যুগে সাফল্য লাভ করেছিল। বেলগাছিয়ার হরিনারায়ণ রায়চৌধুরীর দল, মতিলাল রায়ের দল, ব্রজমোহন রায়ের দল, মদনমাষ্টারের দল, নীলমণি কুণ্ডুর দল সে যুগে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল।

মনে রাখতে হবে ১৮৭২-এর 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল বাগবাজারের এই রকমেরই একটি সখের যাত্রার দল--তারা ধনী বাঙালির জাঁকজমকের প্রাসাদ-মঞ্চ থেকে বাংলা নাটককে মুক্ত করে এনে সর্বসাধারণের উপভোগের থিয়েটার চালু করেছিল।

উনিশ শতকের নানা পরিবর্তনের ধারায় যাত্রা যেরূপে নির্দিষ্ট হয়েছিল, বিশ শতকে সেখানে আবার কিছু সংযোজন ও পরিমার্জন হলো। হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ও মথুর সাহার চেষ্টায় নৃত্যগীতের প্রাধান্য কিছু কমল, অভিনয়ের গুরুত্ব বেশি করে প্রতিষ্ঠিত

হল। ফলে যাত্রা ও থিয়েটার খুব কাছে এসে গেল। হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী' পালা থেকেই (প্রকাশকাল ১৩১১ সাল) যাত্রাকে আর গীতাভিনয় রূপে চিহ্নিত করা যাচ্ছে না। হয়ে গেল 'থিয়েট্রিকাল যাত্রা'। 'যাত্রা শোনার' যুগ পালটে হয়ে গেল 'যাত্রা দেখার' যুগ। অর্থাৎ সঙ্গীত কমে অভিনয় অংশ বৃদ্ধি পেল। গানে থিয়েটারি সুর ও নাচে থিয়েটারি প্রথা প্রবর্তিত হলো। দলগুলির নামও হয়ে গেল থিয়েট্রিকাল যাত্রা কোম্পানী কিংবা অপেরা কোম্পানী। যাত্রার বিষয়বস্তু পুরাণ থেকে সরতে সরতে ইতিহাসের কাছে এসে গেল। হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের কয়েকটি পালা লক্ষ্য করলেই সেটি বোঝা যাবে—নলদময়ন্তী, প্রহ্লাদচরিত্, যদুবংশধ্বংস, মহীরাবণ, ভৃগুচরিত্র তাঁর গোড়ার দিকের রচনা। পরে লিখছেন পদ্মিনী, রাণী জয়মতি, চাণক্য, কালাপাহাড়, রণজিতের জীবনযজ্ঞ।

১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের প্রতিরোধের প্রবল আন্দোলনে স্বদেশপ্রেমের জোয়ার এসেছিল জনমনে। বাংলা থিয়েটারেও ইতিহাসকে অবলম্বন করে দেশাত্মবোধের নাটক প্রচুর অভিনীত হতে লাগল। যাত্রাতেও ভাব ও বিষয়ের পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। ভক্তি, দৈব ও বিশ্বাসের স্থলে স্বদেশচেতনা, দেশভক্তি এবং দেশমাতৃকার বন্দনা যাত্রাপালায় আচরিত হতে লাগল। সামাজিক জীবনধারা ও মানুষের মুক্তির জয়গানও যাত্রায় গৃহিত হল। যাত্রাপালার কাহিনীতে যুগান্তকারী পরিবর্তন হল। মানুষের আবির্ভাব ঘটলো। যাত্রাপালায় দেবদেবী থেকে ক্রমে মনুষ্য চরিত্রের আবির্ভাবের ক্রমপর্যায়টি এইরকম : দেবদেবী—মহাপুরুষ চরিত্র—ইতিহাসের চরিত্র—সাধারণ মনুষ্য চরিত্র। প্রথমে দেবদেবী, তারপরে মহাপুরুষ চরিত্র, তারপরে ইতিহাসের চরিত্র এবং সবশেষে সাধারণ নরনারী যাত্রাপালায় প্রতিষ্ঠা লাভ করল।

বঙ্গভঙ্গের যুগে স্বদেশী যাত্রার শ্রেষ্ঠ পালাকার চারণকবি মুকুন্দ দাস। তাঁর নিজের দলের তিনি পালা রচয়িতা, পরিচালক, অভিনেতা এবং গায়ক। তাঁর পালায় তিনি রাজনৈতিক মুক্তিসংগ্রামের কথা, দেশানুরাগের কথা এবং তার সঙ্গে সমাজসংস্কারের কথাও নিয়ে এলেন। বঙ্গভঙ্গের উন্মাদনার যুগে মুকুন্দদাস বাংলার প্রান্তে প্রান্তে দেশমাতৃকার পরাধীনতার গ্লানি ও স্বদেশভূমির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার কথা পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাঁর পালায় কাহিনী ছিল শিথিল কিন্তু হৃদয়াবেগের উচ্ছ্বাস ছিল প্রবল। দেশীয় সুরে সহজ সরল ভাষায় তাঁর গান সহজেই আবেদন সৃষ্টি করত, নৃত্যঅংশ ছিল না। চরিত্র সৃষ্টির চেয়ে ঘটনা ও বক্তব্য বর্ণনাই প্রধান হয়ে উঠেছিল। তাই বক্তৃতা অংশ বেড়ে গিয়েছিল। তবে তাঁর স্বদেশী যাত্রার আবির্ভাবে যাত্রাপালা থেকে ভক্তিভাব ক্রমে দূরে সরে গেল।

তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পালা : মাতৃপূজা, পথ, সাথী, সমাজ, পল্লীসেবা, ব্রহ্মচারিণী, কর্মক্ষেত্র, দাদা, জয়পরাজয় প্রভৃতি। তবে বিষয়বস্তু ছিল—হিন্দু মুসলমান ঐক্য, অস্পৃশ্যতা বর্জন, বিদেশী পণ্য বর্জন, স্ত্রী শিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা, পল্লীসেবা, বাঙালির কর্মক্ষেত্র এবং অবশ্যই দেশমাতৃকা বন্দনা। তাঁর মাতৃপূজা, পথ, সাথী পালা

ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করে। তিনি আড়াই বছর কারারুদ্ধ ছিলেন।

এই সময়ের উন্মাদনায় এবং মুকুন্দদাসের প্রভাবে কুঞ্জবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় মাতৃপূজা পালা লিখে কারারুদ্ধ হন। পালাটিও বাজেয়াপ্ত হয়। হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের রণজিতের জীবনযজ্ঞ এই সময়কার রচনা। মথুর সাহা (পদ্মিনী, ভরতপুরের দুর্গজয়), ভূষণদাস (মাতৃপূজা)-এর পালাগুলি নিষিদ্ধ হয়। পরে ভোলানাথ রায় (পঞ্চনদ, দাক্ষিণাত্য), পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় (টিপু সুলতান), ব্রজেন্দ্রকুমার দে (বাঙালি), সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (মাটির মা), পূর্ণদাস (শৃঙ্খলমোচন) এই ধরনের পালা রচনা করেছিলেন। তবে এঁদের ক্ষমতা কম থাকায় এবং বঙ্গভঙ্গের উন্মাদনা স্তিমিত হয়ে যাওয়ায় যাত্রায় এই ধারাও কমে যায়।

মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের (১৯২১) সময় থেকে সামাজিক সমস্যা এবং সামাজিক নরনারী যাত্রায় ভালভাবে স্থান পেয়ে যায়। সেই সঙ্গে সমাজের নানা সমস্যা, অস্পৃশ্যতা, অসবর্ণ বিবাহ, জাতপাত, যাত্রায় গৃহিত হলো। তবে সামাজিক যাত্রায় আধুনিক নাটকের মতো ঘাতপ্রতিঘাত, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অন্য নাট্যিক ক্রিয়া দেখানো সম্ভব ছিল না। তাই জীবনদ্বন্দ্বের গভীরে না গিয়ে সামাজিক যাত্রা সমাজের উপরিতলের ঘনঘটা ও চমক দিয়ে কাহিনী ভরিয়ে দিল, তার সঙ্গে যাত্রায় অতিলৌকিক পরিবেশ সৃষ্টির দিন চলে গেল। সামাজিক যাত্রার লৌকিক উপাদান, কাহিনী, চরিত্র, সাজপোষাক সব কিছুর মধ্য দিয়ে 'illusion' বা নাট্যমায়া বর্জন করা হলো। তার সঙ্গে ঐতিহ্যমূলক কাহিনী বর্জন করে সমসাময়িক সমাজজীবনের কাহিনী গ্রহণ করে যাত্রাপালায় বিষয়বৈচিত্র্য বাড়ানো হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বা বিংশ শতকের চল্লিশের দশকে টালমাটাল বাংলায় যুদ্ধ, মহামারী, মন্বন্তর, আগস্ট আন্দোলন, কালোবাজারি, মজুতদারির যুগে বাংলা যাত্রারও অনেক পরিবর্তন সাধিত হলো। গণনাট্য, নবনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে বাংলা নাটকে নতুন জোয়ার এসে যায়। বিষয়ে, ভাবে, চরিত্রবিন্যাসে ও প্রয়োগকুশলতায় যে যুগান্তকারী পরিবর্তন বাংলা নাটক ও তার অভিনয়ে লক্ষ্য করা গেল, বাংলা যাত্রাতেও তার প্রভাব পড়ল। বাংলা যাত্রাও নতুনভাবে বেঁচে উঠে আবার প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে চাইল। এই সময়কালীন কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পালা হলো--

ব্রজেন্দ্রকুমার দে'র আকালের দেশ (১৯৪৫), কানাই শীলের দেশের দাবী (১৩৫৬), বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বেইমান (১৩৫৭), জীতেন্দ্রনাথ বসাকের মানুষ (১৩৫৪), সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের রক্তবীজ (১৩৫৮) উল্লেখযোগ্য। নানা বিষয়ের মধ্যে এগুলিতে রয়েছে স্বাধীনতার কথা, দেশপ্রেমের কথা, পঞ্চাশের মহামন্বন্তরের কথা, ধনী-দরিদ্রের শ্রেণীসংগ্রামের কথা (রক্তবীজ), মানুষের নতুন করে বেঁচে ওঠার কথা।

এই সময়কালের সবচেয়ে খ্যাতিমান ও জনপ্রিয় পালাকার ব্রজেন্দ্রকুমার দে (১৯০৭-১৯৭৬) তাঁর শিক্ষা রুচি ও শিল্পবোধে যাত্রায় নতুন মাত্রা এনে দিয়েছেন। তাঁর নিজের দল ছিল না, তিনি ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। তাঁর পালা যাত্রাদলগুলি

নিয়ে অভিনয় করেছে। ত্রিশের দশকের সূচনায় তিনি পেশাদারি যাত্রার জন্য পালা লিখতে শুরু করেন। তাঁর প্রথম পালা 'স্বর্ণলঙ্কা' ১৯২৫ সালে লেখা। তিনি পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, কাল্পনিক, সামাজিক, রূপক ও পল্লীগাথা--সব নিয়েই যাত্রাপালা রচনা করেছেন। ইতিহাসের চেয়ে কল্পনাপ্রধান রোমান্স, হিন্দুমুসলমান ঐক্যবোধ, দেশপ্রেম, জাতির কর্মপ্রবণতা, সমাজপতির অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ, রাজশক্তির দম্ভে জাতির দুর্দশা, শাসকের অদূরদর্শিতার পরিণাম, গণজীবনে দুর্দশার সন্ধান প্রভৃতি তাঁর পালার বিষয়বস্তু। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পালা--

স্বর্ণলঙ্কা (১৯২৫), বজ্রনাভ (১৯৩২), স্বামীর ঘর (১৯৪৫), মায়ের ডাক (১৯৪৭), বাঙালি (১৯৪৮), আকালের দেশ (১৯৪৫)--এগুলি দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে অভিনীত হয়েছে। (বন্ধনীতে প্রকাশকাল দেওয়া আছে)। পরে তিনি লেখেন গাঁয়ের মেয়ে (১৯৫১), ধর্মের বলি (১৯৫৬), রাজা দেবিদাস (১৯৫৭), সোনার ভারত (১৯৬১), কবি চন্দ্রাবতি (১৯৬১)। এছাড়া তাঁর সোনাই দীঘি, সম্রাট জাহাঙ্গীর, বিচারক, যাদের দেখেনা কেউ, রক্তের নেশা, দেবতার গ্রাস, লোহার জাল, ধূলার স্বর্গ, প্লাবন প্রভৃতি খুবই জনপ্রিয় পালা রয়েছে।

ব্রজেন্দ্রকুমার দে'র জ্ঞান-পাণ্ডিত্য ও শালীনতাবোধ তাঁর পালাগুলিকে গভীর ও বহু বিস্তৃত করেছে। তিনি ভাঁড়ামো বর্জন করে চরিত্র ও ঘটনা উপযোগী হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। প্রচলিত দীর্ঘ সংলাপ সংক্ষিপ্ত করেছেন। সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা তাঁর ছিল না। সাম্প্রদায়িক কথাবার্তা সেই সম্প্রদায়ের চরিত্র সৃষ্টি করে তার মুখ দিয়েই বলিয়েছেন। ছদ্মবেশী চরিত্র এনে কাহিনীতে চমক সৃষ্টি করেছেন। প্রচলিত যাত্রায় চরিত্র শুধুমাত্র ঘটনা বহন করত। তিনি চরিত্র বিশ্লেষণের দিকে জোর দিয়েছেন। কাহিনী গ্রহণ ও বিন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি রস সৃষ্টিতে নিপুণ ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যাত্রাপালা লিখতে শুরু করে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলায় নিরন্তর যাত্রাপালা লিখে গেছেন। বহু ঘটনার উত্থান-পতনের সাক্ষী ব্রজেন্দ্রকুমার তাঁর যাত্রাতেও বিষয়ের নানা বিস্তার ঘটিয়ে তাঁর পালাকে বহুমুখী করে তুলেছিলেন। অবক্ষয়ী যাত্রাপালাকে নানাভাবে উন্নত করার চেষ্টা করে গেছেন।

বিশ শতকের পঞ্চাশ-ষাটের দশক থেকে আধুনিক যাত্রাপালা নতুনভাবে গড়ে উঠেছে। এই সময়ে চলচ্চিত্রের এবং নাটকের অসম্ভব জনপ্রিয়তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যাত্রাদলগুলি নতুনভাবে পুনর্গঠিত হতে শুরু করে। আধুনিক টেক্‌নোলজির সুযোগসুবিধা নানাভাবে গ্রহণ করে যাত্রা প্রতিযোগিতায় নিজেকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করতে থাকে। একেবারে পেশাদারি প্রথায় পরিচালিত যাত্রা দল তার পুরনো মোহ ঝেড়ে ফেলে নতুনভাবে গড়ে ওঠে। চলচ্চিত্র ও নাটকের খ্যাতিমান অভিনেতা-অভিনেত্রী, পরিচালক, সুরকার গ্রহণ করে যাত্রার জনপ্রিয়তা ও মান বাড়ানোর চেষ্টা হয়। নাট্যকারদের দিয়ে পালা লেখানো হতে থাকে। নতুন পালাকারেরাও আসতে থাকে। খোলামঞ্চে অভিনয় হলেও আলো, সাজসজ্জা, চমক প্রায় থিয়েটারি কৌশলে হতে থাকে। যান্ত্রিক সুযোগ

সুবিধা নেওয়ার ফলে নানাদিকে নতুনত্ব সঞ্চার হয়। পালার বিষয় এখন থেকে পৌরাণিক জগৎ ছেড়ে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক বিষয় গ্রহণ করতে থাকে। এদেশ এবং বিদেশের নানা ঘটনা, নানা খ্যাতিমান চরিত্র, নানা সংগ্রাম, নানা উত্থান-পতন যাত্রার বিষয়রূপে গৃহিত হতে থাকে। পুরনো যাত্রার গন্ধ কিংবা রেশ এগুলির মধ্যে নেই বলে অনেকেই ব্যথা পেয়ে থাকেন। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার সব সুযোগ গ্রহণ করে যাত্রা তার অস্বিত্ব বজায় রেখে নিজের পথে চলতে চলতে ক্রমেই চলচ্চিত্র কিংবা থিয়েটারের প্রতিস্পর্ধী মাধ্যম হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।[৪] আধুনিক যাত্রার বিচারে, তার ভালোমন্দ নির্ণয় করতে গিয়ে আধুনিক পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট মাথায় রাখতেই হবে। সেকথা ভুলে গেলে ক্রম অগ্রসর শিল্পমাধ্যমের যথার্থ বিচার হবে না।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ির মন্তব্য :
'যাত্রা থেকে যদি আমাদের থিয়েটার গড়ে উঠত তবে আজ তার রূপ হত অন্যরকম; তা সত্যি হযতো আমাদের জাতীয় নাট্যশালা হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু এ থিয়েটার গড়ে উঠেছে বিদেশীর প্রভাবে।'

প্রসেনিয়াম থিয়েটার

প্রসেনিয়াম থিয়েটার পৃথিবীর সবদেশেই সবচেয়ে আদৃত ও বহুল ব্যবহৃত থিয়েটার। অনেক দেশেই তাদের নিজস্ব নাট্যাভিনয় পদ্ধতি ছিল ও আছে। কিন্তু খ্রিষ্ট-পূর্ব কাল থেকে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগোতে এগোতে মধ্যযুগের ইউরোপে প্রসেনিয়াম থিয়েটার নির্দিষ্ট রূপ পেতে থাকে। ইউরোপের দেশগুলি, বিশেষত ইংরেজ এবং ফরাসীরা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপনের জন্য পৃথিবীর যেসব দেশে গিয়ে বসবাস শুরু করেছে, সেখানেই তাদের দেশের প্রসেনিয়াম থিয়েটার নিয়ে গেছে। সেইসব দেশের নিজস্ব নাট্যাভিনয় পদ্ধতি থাকা সত্ত্বেও সেখানে প্রসেনিয়াম থিয়েটার চালু হয়ে আদৃত হয়েছে।

বর্তমান পৃথিবীতে থিয়েটার পদ্ধতি নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। তাতে প্রসেনিয়াম থিয়েটারের ঘেরাটোপ ভেঙে নাট্যাভিনয়কে কিভাবে কতোদূর প্রসারিত করা যায়, তার উদ্যোগ দেখা যায়। প্রসেনিয়াম ভেঙে, নানাভাবে ও নানা নামে নতুন নতুন থিয়েটার ব্যবস্থা হয়ে চলেছে। কিন্তু এখনো, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 'প্রসেনিয়াম থিয়েটার' -ই চালু রয়েছে। থিয়েটার যারা করেন এবং থিয়েটার যারা দেখেন, উভয়পক্ষেই এখনো সমাদৃত হয়ে রয়েছে প্রসেনিয়াম থিয়েটার। নানাদেশের নানা পদ্ধতির বিচিত্র মিশেল প্রসেনিয়াম থিয়েটারকে আরো সমৃদ্ধ ও বিচিত্রমুখি হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। কিন্তু তার নিজস্ব মডেল এখনো অপরিবর্তিত।

গ্রিক শব্দ Skene, গ্রিক রঙ্গমঞ্চের যে জায়গাটায় দেবতা ডায়নিসাসের আরাধনার পর নাটকের অভিনয় হত, তাকে বলতো Skene. এই Skene-এর সামনের দিকে গোলাকৃতি জায়গায় থাকত Orchestra, তার সামনে বিশাল পাহাড়ের ঢালু জমিতে গ্যালারির মতো করে দর্শকাসন ছিল, প্রায় পনের-কুড়ি হাজার।
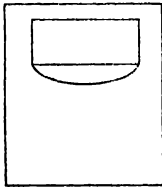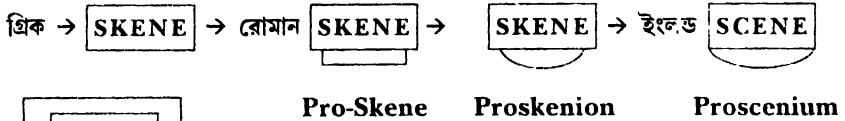
রোমান যুগে থিয়েটারে অভিনয়ের সুবিধার জন্য Skene-এর সামনে খানিকটা জায়গা বাড়িয়ে নিয়ে প্ল্যাটফরম মতো করা হয়েছিল। Orchestra ও Skene-এর মাঝখানে এই বাড়তি অংশটুকু জোড়া হলো। Skene-এর সামনে (Pro) এই অংশ জোড়ার ফলে এর

নাম হয়ে গেল Proskenion, পরবর্তীকালে সামনের Orchestra'র গোলাকৃতি জায়গা তুলে দিয়ে অর্ধবৃত্তাকার ভাবে তার অংশটি Skene-এর সামনে জুড়ে দেওয়া হলো। ক্রমে সেই অংশটি Arch (ধনুক)-এর আকারে Skene-এর সামনের অংশে যুক্ত হয়ে গেল। তাই অনেকে একে Arch Proskenion বলে থাকে।

এই থিয়েটার ইংলন্ডে এসে ইংরেজি ভাষায় 'Skene' হয়ে গেল 'Scene'. গ্রিক 'K'-এর বদলে ইংরেজি 'C'। ইংরেজিতে নাম হলো তাই Proscenium, গ্রিক থেকে রোমান Proskenion ইংরেজিতে হলো Proscenium. এই ধরনের মঞ্চে যে থিয়েটার হয় তাকেই বলে Proscenium Theatre. এখনো মঞ্চের পর্দার বাইরে সামনের Arch আকৃতির অংশটিকে 'আর্চ প্রসেনিয়াম' বলে।

অষ্টাদশ শতকে ইংলন্ডে যে রকম প্রসেনিয়াম থিয়েটার চালু ছিল, ইংরেজরা সেই থিয়েটারই ভারতবর্ষে তথা বাংলায় নিয়ে এলো। ঐ মডেলে থিয়েটার তৈরি হলো কলকাতায় ইংরেজদের আনুকূল্যে ও উৎসাহে। ততদিনে ইংলন্ডে প্রসেনিয়াম থিয়েটার ঘেরা প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে আবদ্ধ হয়েছে। আর খোলা জায়গায় নেই। সেই প্রেক্ষাগৃহের একদিকে কিছুটা উঁচু জায়গায় প্রসেনিয়াম স্টেজ। এই মঞ্চের সামনে তৈরি হলো দর্শকাসন। এবং সবটা ঘিরে তৈরি হলো 'থিয়েটার হল' বা প্রেক্ষাগৃহ বা নাট্যশালা বা রঙ্গালয়।

মঞ্চের তিনদিক ঘেরা, সামনের দিক খোলা। সেখানে কার্টেন বা পর্দা। এই পর্দা সরে গেলে মঞ্চের ভেতর দেখা যায়। মঞ্চের দুধারে 'উইংস' অনেকগুলো। সেইগুলো দিয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা মঞ্চে প্রবেশ-প্রস্থান করে। পেছনে পদায় দৃশ্য আঁকা থাকে, যাকে বলে দৃশ্যপট। সেই দৃশ্যপটের সামনে অভিনয় চলে। যে যুগে যেমন আলোর ব্যবস্থা সেইরকম উপকরণ দিয়ে মঞ্চকে আলোকিত করা হয়। প্রথমে হতো খোলা আকাশে প্রকাশ্য সূর্যের আলোতে দিনের বেলায়। পরে আলোক-প্রাপ্তির বিভিন্ন টেকনোলজির আবিষ্কার ও বিবর্তনের ফলে ঘেরা মঞ্চে আলোর ব্যবস্থা করা হতে থাকল এবং রাতের বেলায়ও অভিনয় চালু হলো। মশাল, তেল বা গ্যাসের আলো থেকে বিদ্যুতের আলো মঞ্চে এসে গেল।

পেছনের দৃশ্যপট বা 'আঁকা-সীন' পদ্ধতি অনেকদিন ছিল। পরে পেছনের দৃশ্যপট তুলে দিয়ে কাটা-সীন, ঝ্যালা-সীন জোড়া হলো। ক্রমে এই আঁকা-সীন পরিত্যক্ত হলো। সেখানে প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্র এবং কাঠের বা পিচবোর্ডের তৈরি দৃশ্যসজ্জা করা হলো। রিয়ালিস্টিক থিয়েটারের যুগে একেবারে হুবহু দৃশ্যসজ্জা করবার তাগিদে সব রকম ব্যবস্থা করা হলো। মায় খাট-আলমারি-সোফাসেট, ঘরের ভেতরের দেওয়াল বানানো হলো। আস্তে আস্তে দৃশ্যসজ্জার ভার কমে গিয়ে 'সাজেসটিভ' দৃশ্যসজ্জা দেখা গেল। দেওয়ালের একটি দিক, কিংবা শুধু একটি দরজার ফ্রেম, কিংবা একটি খড়ের চালা অথবা মন্দিরের সিঁড়ি। প্রাসাদের একটি থাম কিংবা পার্কের একটি রেলিং।

নট-নটীদের সাজপোষাক, আসা-যাওয়া, যন্ত্রানুষঙ্গ, সঙ্গীত, দৃশ্যসজ্জা এবং অভিনয়—সব নিয়ে নাট্যাভিনয় চালু হলো। প্রসেনিয়াম থিয়েটারে নাট্যাভিনয়।

বিদেশী রঙ্গালয়

(১৭৫০-১৮৫০)

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়। কলকাতা তখনো পুরোপুরি কলকাতা হয়ে ওঠেনি। সুদূর ইংলন্ড থেকে বাণিজ্য করতে এসে ইংরেজরা ক্রমে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে গুছিয়ে বসেছে। বাণিজ্য প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শাসন ক্ষমতাও দখল করে নিচ্ছে। পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭) সমাসন্ন। কলকাতায় বসবসকারী ইংরেজের সংখ্যা তখন খুব বেশি নয়।

তারাই নিজেদের আমোদ-প্রমোদের জন্য 'থিয়েটার হল' তৈরি করে নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করল। ইংরেজদের থিয়েটারের ঐতিহ্য অনেকদিনের। নাটক-পাগল ইংরেজ যেখানেই একটু সুস্থিতিতে বসবাস করতে পেরেছে সেখানেই থিয়েটার চালু করেছে. কলকাতাতেও তারা এইভাবে নাটক অভিনয় শুরু করে দিয়েছে।

অষ্টাদশ শতকে ইংলন্ডে যে রকম থিয়েটার চালু ছিল, তারা সেই থিয়েটারই এখানে তৈরি করল। নট-নটীদের সাজপোযাক, আসা-যাওয়া, যন্ত্রানুষঙ্গ. সঙ্গীত--এবং সর্বোপরি অভিনয়রীতি--সবই সেই সময়কার ইংলন্ডের থিয়েটারের মডেলে এদেশে ইংরেজরা চালু করল। এই মঞ্চের সামনে তৈরি হলো দর্শকাসন। এবং সবটা ঘিরে গড়ে উঠল 'থিয়েটার হল'। বাংলায় নাট্যশালা বা রঙ্গালয়। ইংরেজিতে 'প্রসেনিয়াম থিয়েটার'।

প্রথমদিকে ইংরেজদের প্রবর্তিত থিয়েটারের সবই বিদেশী। 'থিয়েটার হল' এবং মঞ্চব্যবস্থা বিদেশী। নাটক এবং নাট্যকার বিদেশী। অভিনেতা-অভিনেত্রী বিদেশী। পৃষ্ঠপোষক, মালিক, উদ্যোক্তা বিদেশী। এবং দর্শকও বিদেশী। এর অভিনয়রীতি, ধরন-ধারণ, পরিবেশ, আচার-নীতি সবই বিদেশী। এই কারণে বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে এই রঙ্গালয় বা থিয়েটারগুলিকে 'বিদেশী রঙ্গালয়' নামে চিহ্নিত করা হয়। যদিও পরবর্তীকালে এর সবটাই আব বিদেশী ছিল না।

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ১৯ শতকের প্রায় শেয অবধি পরপর অনেকগুলি এইরকম রঙ্গালয় স্থাপিত হয়েছে। কিছুদিন চলার পর একটা লুপ্ত হয়েছে, আরেকটি চালু হয়েছে, প্রথমদিকে এখানে বসবাসকারী ইংরেজরাই 'এ্যামেচার' হিসেবে অভিনয় করেছে। কেননা, তারা সবাই ছিল কোম্পানীর কর্মচারী। পরে ইংলন্ড থেকে নানা নট-নটী আনানো হয়েছে। শেক্সপীয়র থেকে শুরু করে যতসব নাটক তখনকার ইংলন্ডের মঞ্চগুলিতে অভিনয় হয়েছে বা হচ্ছে, সেগুলিই এখানে অভিনয়ের চেষ্টা হয়েছে। এদেশের কেউ তাদের মঞ্চের জন্য নাটক লেখেননি।

এদেশে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিদেশী রঙ্গালয় বা সাহেবদের থিয়েটারের পরিচয় নেওয়া যাক :

এক. ওল্ড প্লে-হাউস (Old Play-House)

কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত ইংরেজদের প্রথম নাট্যশালা ওল্ড প্লে-হাউস অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে গড়ে ওঠে। রঙ্গালয়ের সংলগ্ন একটি নাচঘর ছিল। বর্তমান লালবাজার স্ট্রিটের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সেন্ট এনড্রুজ গির্জার অপর পারে এটি তৈরি হয়। এখন সেখানে মার্টিন বার্ন কোম্পানীর অফিস-বাড়ি।

এই রঙ্গালয়ের অভিনেতারা সকলেই 'এ্যামেচার' ছিলেন। ইংলন্ডের বিখ্যাত নাট্যশিল্পী ডেভিড গ্যারিকের কাছ থেকে এরা পরামর্শ ও সাহায্য পেয়ে থাকতেন।

১৭৫৬ সালের জুন মাসে নবাব সিরাজদৌল্লার কলকাতা আক্রমণের সময় এই রঙ্গালয়টি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই রঙ্গালয়ের অভিনয়ের কোনোরকম সংবাদ পাওয়া যায়নি। কেননা, তখন কোন সংবাদপত্র ছিল না। শুধু মিস্টার উইল-এর আঁকা ১৭৫৩ খ্রিষ্টাব্দের কলকাতা মানচিত্রে প্রথম ইংরেজি থিয়েটার ও তার সংলগ্ন নাচঘরের পরিচয় পাওয়া যায়।

দুই. দি নিউ প্লে-হাউস বা ক্যালকাটা থিয়েটার (The New Play-House or Calcutta Theatre)

উদ্বোধন : ১৭৭৫ — স্থায়িত্বকাল : ১৭৭৫--১৮০৮

প্রতিষ্ঠাতা : জর্জ উইলিয়ামসন — (তেত্রিশ বৎসর)

প্রথম রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পর প্রায় কুড়ি বছর বাদে দ্বিতীয় রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। তখন বড়লাট হেস্টিংসের আমল। জর্জ উইলিয়ামসন এই রঙ্গালয়টি ১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দে নির্মাণ করেন। বর্তমান রাইটার্স বিল্ডিং (মহাকরণ)-এর পেছনে লায়ন্স রেঞ্জ-এর উত্তর-পশ্চিমে এই রঙ্গালয়টি ছিল। যেখানে এখন ফিনলে কোম্পানীর অফিসবাড়ি।

কলকাতায় প্রথম সংবাদপত্র ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত 'হিকিস বেঙ্গলী গেজেট'-এর প্রথম সংখ্যার (১৭৮০) প্রথম পৃষ্ঠার বাঁদিকে ক্যালকাটা থিয়েটারের একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। এই সংবাদপত্রে এই থিয়েটারের অনেক খবর প্রকাশিত হতো।

সম্ভ্রান্ত ইংরেজদের শুভেচ্ছা ও চাঁদা নিয়ে রঙ্গালয়টি তৈরি হয়। অনেকেই এর সদস্য ও অংশীদার হন। শেয়ারের দাম ছিল হাজার টাকা। প্রায় এক লক্ষ টাকা খরচ করে নাট্যশালাটি তৈরি হয়। পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে ছিলেন--হেস্টিংস, বারওয়েল, স্যার এলিজা ইম্পে প্রমুখ খ্যাতিমান ইংরেজরা। ইংলন্ড থেকে তাদের উপদেষ্টা ডেভিড গ্যারিকের সহায়তায় শিল্পী বার্নার্ড মেসিংক-কে আনা হয়। তাঁরই নির্দেশে দৃশ্যপট আঁকা হয়েছিল। প্রেক্ষাগৃহের মাঝখানে ছিল 'পিট' এবং এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত 'পিট'-কে ঘিরে ছিল 'বক্স'। এখানে প্রথমদিকে ভারতীয় দর্শকদের প্রবেশাধিকার ছিল না। প্রবেশমূল্য ছিল :

বক্স--এক মোহর। পিটসীট--আট সিক্কা টাকা।

তদানীন্তন ইংলন্ডের প্রথম শ্রেণীর রঙ্গালয়ের মতো করে এটিকে গড়ে তোলা হয়।

এই থিয়েটারেই প্রথম 'Subscription Performance'[১] প্রথা চালু করা হয়। গোড়া থেকেই সদস্য-দর্শক নির্দিষ্ট থাকার ফলে অভিনয়ের দিন দর্শকাসন খালি থাকত না।

গভর্ণর লর্ড কর্ণওয়ালিসের নির্দেশে কোম্পানীর কোনো কর্মচারী অভিনয়ে অংশগ্রহণের অনুমতি পেত না। শিল্পীরা তাই সবাই ছিল 'এ্যামেচার'। ভালো শিল্পীর অভাবে রঙ্গালয়টি দুরবস্থায় পড়ে। এখানে নারীচরিত্রে পুরুষেরাই অভিনয় করত। যদিও ইংলন্ডে অভিনেত্রীরা অনেক আগে থেকেই অভিনয় শুরু করেছে। কিন্তু এখানকার কোম্পানীর ডিরেক্টাররা, পাছে অভিনেত্রীদের নিয়ে পুরুষদের মধ্যে গণ্ডগোল শুরু হয়, সেই আশঙ্কায় নারীদের মঞ্চাবতরণে অনুমতি দেয়নি। পরের দিকে অবশ্য অভিনেত্রীরা অংশগ্রহণ করতে থাকে। ততদিনে কোম্পানীর আইন শিথিল হয়ে গেছে।

রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষেরা আন্তরিক চেষ্টা করতেন সকল শ্রেণীর দর্শককে আকৃষ্ট করতে। শেক্সপীয়র থেকে শুরু করে বেন জনসন, ফ্রান্সিস বোমন্ট, জন ফ্রেচার, ফিলিপ ম্যাসিঞ্জার, কনগ্রীভ, টমাস অটওয়ে, হেনরি ফিলডিং, সেরিডান প্রভৃতি নাট্যকারের নাটক অভিনয়ের চেষ্টা হয়েছে। হ্যামলেট, ম্যাকবেথ-এর মত গভীব-গম্ভীর বিয়োগান্ত নাটকের যেমন অভিনয় হতো তেমনি লঘু প্রহসনেরও ব্যবস্থা থাকত। সঙ্গীতবহুল নাটকের মধ্যে হ্যান্ডেলস মেশায়া (Handel's Messiah) নাটকে দর্শক সমাগম হতো সবচেয়ে বেশি।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অভিনয়ের তালিকা :

টমাস অটওয়ের ভেনিস প্রিজার্ভড, জর্জ ফারকুহরের দি বোষ্ট্যাটাজেম, শেক্সপীয়রের দি মার্চেন্ট অব ভেনিস, ওথেলো, ম্যাকবেথ, হ্যামলেট, সেরিডানের স্কুল ফর স্ক্যান্ডাল খুবই প্রশংসা পায়। তাছাড়া লাইক মাস্টার লাইক সন, দি ফাউন্ডলিং, দি সিটিজেন, দি মাইনর, এক্স পারপাসেস গোড়ার দিকের সাফল্যজনক প্রযোজনা। দি ফেয়ার পেনিটেন্ট, দি প্যাডলক, দি পুওর সোলজার, দি আইরিস উইডো, সি স্টুপস টু কঙ্কার, দি রিভেঞ্জ প্রভৃতি নৃত্যগীতময় 'অপেরাধর্মী ও প্রহসনাত্মক' অভিনয়গুলি দর্শকদের খুবই আকৃষ্ট করেছিল।

শেষের দিকে এই রঙ্গালয়ের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়ে। কলকাতায় একসঙ্গে দুটি রঙ্গালয় তখন চলা সম্ভব ছিল না দর্শক স্বল্পতার জন্য। কেননা, তখন কলকাতায় ইংরেজের সংখ্যা বেশি ছিল না। দর্শনীয়ও ছিল বেশি। তাই অন্য থিয়েটারের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালাতে গিয়ে হাল্কা নৃত্যগীত ও লঘুচপল ভাঁড়ামো নাটকের অভিনয় করে যেতে হয়েছে। যে থিয়েটার প্রথমদিকে শেক্সপীয়রের বা অন্য নাট্যকারের উচ্চ ভাবের নাটক অভিনয় করে খ্যাতিলাভ করেছিল, তাদের এই অধঃপতনে অনেকেই দুঃখ

১. অভিনয়ে টিকিট বিক্রি নিশ্চিত করাব জন্য আগে থেকেই সদস্য-দর্শক নির্দিষ্ট করে নেওয়ার নামই Subscription Performance. কালকাটা থিয়েটারের নিয়মে ১২০ টাকার টিকিটে একজন পুরুষ ও তার বাড়ির মহিলারা ছয়টি নাটক দেখতে পেতেন। কলকাতায় তখন স্বল্প ইংরেজ দর্শকের কারণে প্রায় সব বিদেশী রঙ্গালয়কেই টিকে থাকার জন্য এই প্রথা চালু রাখতে হতো।

পেয়েছিলেন। তাছাড়া ঠিক এই সময়েই (১৭৯৫) লেবেডেফের বেঙ্গলী থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা ও নাট্যাভিনয়ের সাফল্যে ক্যালকাটা থিয়েটারের দুরবস্থা চরমে ওঠে। ম্যানেজার মিঃ রোওয়ার্থ লেবেডেফের নাট্যশালা পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেবার চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে পড়েন।

যাইহোক, তেত্রিশ বছর একটানা অভিনয় চালিয়ে দীর্ঘস্থায়ী এই রঙ্গালয়টি ১৮০৮ খ্রিষ্টাব্দে বন্ধ হয়ে যায়। ইংলন্ডের বিখ্যাত অভিনেতা ও প্রযোজক ডেভিড গ্যারিকের সাহায্য ও উপদেশ, ম্যাসিংগারের দৃশ্যপট-অঙ্কন এই মঞ্চের গর্বের বিষয়। এই মঞ্চে অভিনয় করে খ্যাতি লাভ করেন—ব্যান্ডেল, পোলার্ড, জেমস ব্যাটল, ফ্রিট উড, বিগার, গোল্ডিং, রবিনসন, ফিয়াসবেরি প্রভৃতি অভিনেতা এবং মিসেস হরিটো, মিসেস হিউগেস, মিসেস বেসেট প্রভৃতি অভিনেত্রী। এদের উচ্চমানের অভিনয় ও নৃত্যগীতের পারদর্শিতা ক্যালকাটা থিয়েটারের গৌরবের কারণ। এই থিয়েটারের অভিনেতা ক্যাপ্টেন 'কল'-কে অসামান্য অভিনয়ের জন্য 'গ্যারিক অব দি ইস্ট' বলা হতো।

১৮০৮ খ্রিষ্টাব্দে রঙ্গালয়টি বন্ধ হয়ে গেলে রাজা গোপীমোহন ঠাকুর রঙ্গালয়টি কিনে নিয়ে সেখানে বাজার প্রতিষ্ঠা করেন।

তিন. মিসেস ব্রিস্টোর প্রাইভেট থিয়েটার (Mrs. Bristo's Private Theatre)

উদ্বোধন : ১ মে, ১৭৮৯ স্থায়িত্বকাল : ১৭৮৯-১৭৯০

প্রতিষ্ঠাতা : মিসেস ব্রিস্টো

নাটক : পুওর সোলজার

সে যুগের অসামান্যা সুন্দরী ও নৃত্যকুশলিনী এমা র‍্যাংহাম (Emma Wrangham) কলকাতার সিনিয়ার মার্চেন্ট জন ব্রিস্টোকে বিয়ে করে মিসেস ব্রিস্টো নামে পরিচিত হন। বিয়ের পর নাচের আসর ছেড়ে তিনি থিয়েটারে আসেন। তাঁর চৌরঙ্গীর বাড়িতে তিনি একটি ছোট রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ছোট সর্বাঙ্গসুন্দর এই থিয়েটারটি সে যুগের ইংরেজদের প্রধান আকর্ষণের কেন্দ্র ছিল। কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন এমা ব্রিস্টো স্বয়ং।

১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ১ মে ব্রিস্টোর থিয়েটারের উদ্বোধন হয় জনপ্রিয় সঙ্গীতবহুল 'পুওর সোলজার' দিয়ে। দর্শকাসন পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল সেদিন। এই রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে দুটি উল্লেখযোগ্য কথা হলো—

১. মহিলা পরিচালিত প্রথম সাহেবদের থিয়েটার। ২. এই রঙ্গালয়েই প্রথম অভিনেত্রী গ্রহণ করা হলো।

অভিনেত্রী গ্রহণের বিরুদ্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, মিসেস ব্রিস্টোর থিয়েটারের ক্ষেত্রে সে নিয়ম উঠে গেল তাই নয় শুধু, ক্রমে এখানে মেয়েরাই সব চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, মেয়েরাই প্রয়োজনে পুরুষের ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

সুন্দরী এমা ব্রিস্টোকে নিয়ে তখন কলকাতার ইংরেজ পুরুষেরা খুবই চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। সেই সময়কার সংবাদপত্রে এই নিয়ে বেশ মুখরোচক খবর বেরোত। অভিনেত্রীকে নিয়ে উন্মাদনার ফলে থিয়েটারও ভর্তি হয়ে যেত।

'ক্যালকাটা গেজেট' পত্রিকা থেকে এই রঙ্গালয়ের অভিনয়ের খবর পাওয়া যায়। পুওর সোলজার ছাড়া সুলতান, প্যাডলক নাটক অভিনীত হয়। স্বল্পস্থায়ী রঙ্গালয়টি কয়েক রাত অভিনয়ের পর ১৭৯০তে বন্ধ হয়ে যায়।

চার. হোয়েলার প্লেস থিয়েটার (Wheler Place Theatre)

উদ্বোধন : ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৭৯৭ স্থায়িত্বকাল : ১৭৯৭-১৭৯৮

নাটক : দি ড্রামাটিস্ট

হেস্টিংসের কাউন্সিলের নামী সদস্য এডওয়ার্ড হোয়েলারের নামে রাস্তা ছিল হোয়েলার প্লেস। সে রাস্তা এখন নিশ্চিহ্ন। সেই রাস্তায় এই থিয়েটারটি ছিল বলে এর নাম রাখা হয় হোয়েলার প্লেস থিয়েটার।

অভিজাত ইউরোপীয়ানদের জন্য এই রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। সাধারণ দর্শকের প্রবেশাধিকার ছিল না। প্রবেশমূল্য ছিল এক মোহর। এর আগের ক্যালকাটা থিয়েটার দীর্ঘদিন চলার পর খুবই দুরবস্থায় পড়ে। তখন এই রঙ্গালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। দুই রঙ্গালয়ে প্রতিযোগিতা চলে। শেষ পর্যন্ত হোয়েলার প্লেস থিয়েটার এক বছরের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। এখানেও টিকে থাকার কারণে 'Subscription' প্রথা চালু করতে হয়। দর্শনীমূল্যও কমানো হয়।

মঙ্গলবার, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৭৯৭ খ্রিষ্টাব্দে 'দি ড্রামাটিস্ট' প্রহসন দিয়ে এই রঙ্গমঞ্চের উদ্বোধন হয়। তারপরে অভিনীত হয় :

সেন্ট প্যাট্রিকস ডে, থ্রি উইকস আফটার ম্যারেজ, ক্যাথেরিন অ্যান্ড প্যাট্রিসিও, দি মোগল টেল, দি মাইনর, আইরিশম্যান ইন লন্ডন, দি ডেফ লাভার, দি লায়ার, দি ক্রিটিক, এ্যাপ্রেন্টিস প্রভৃতি নাটক অপেরা প্রহসন।

স্বল্পকালস্থায়ী গতানুগতিক অভিনয়ধারায় এই রঙ্গালয়টি ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে বন্ধ হয়ে যায়।

পাঁচ. এথেনিয়াম থিয়েটার (Atheneum Theatre)

উদ্বোধন : ৩০ মার্চ, ১৮১২ স্থায়িত্বকাল : ১৮১২-১৮১৪

নাটক : আর্ল অফ এসেক্স এবং রেজিং দি উইন্ড

প্রতিষ্ঠাতা : মিঃ মরিস

দীর্ঘস্থায়ী ক্যালকাটা থিয়েটার বন্ধ হয়ে যাবার (১৮০৮) পর মাঝে দু' একটি রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও সেগুলি চলেনি। এর প্রায় সাড়ে তিন বছর পর মিঃ মরিস নামে এক ব্যবসায়ি নব উদ্যোগে এথেনিয়াম থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮নং সার্কুলার রোডে নির্মিত

ছোট এই থিয়েটারে আসন ছিল দুশো. প্রবেশমূল্য ছিল এক মোহর।

সাড়ে তিন বছর কলকাতায় কোনো থিয়েটার ছিল না বলে এই থিয়েটার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকমহলে সাড়া পড়ে যায়। উদ্বোধন দিনে প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ হয়ে গেল। উদ্বোধন হল সোমবার, ৩০ মার্চ, ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দে। প্রথম রাত্রে একটি বিয়োগান্ত নাটক আর্ল অফ এসেক্স এবং একটি প্রহসন রেজিং দি উইন্ড--পরপর অভিনীত হল। এখানেও শেক্সপীয়রের ট্রাজেডিগুলি এবং অন্য নাট্যকারদের নাটক ও প্রহসন প্রযোজিত হয়েছিল। তবে শেক্সপীয়রের ট্রাজেডিগুলির অভিনয়ে এরা সাফল্য লাভ করতে পারেনি। দর্শকাসন শূন্য থাকত। তার দুটি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে--

১. এই থিয়েটারে ভালো অভিনেতা-অভিনেত্রী ছিল না যারা গভীর রসাত্মক নাটক সুচারুভাবে অভিনয় করতে পারে। ২. এই সময়েই বিখ্যাত চৌরঙ্গী থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। সেখানে উৎকৃষ্ট অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দিয়ে সুনিপুণভাবে শেক্সপীয়র ও অন্য নাট্যকারদের নাটক অভিনীত হচ্ছিল। দর্শক সেদিকে আকৃষ্ট হয়েছে বেশি।

বারবার আর্থিক লোকসান দিয়ে এথেনিয়াম থিয়েটার দেনাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং দুই তিনবার মালিকানার হাতবদল হয়। পরে আবার প্রথম মালিক মিঃ মরিস থিয়েটারটি কিনে নিয়ে নতুন করে চালাবার চেষ্টা করেন।

১৮১৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারি 'হ্যামলেট' নাটক দিয়ে দ্বিতীয় দফার উদ্বোধন হয়। সঙ্গে ছিল হাল্কা প্রহসন 'লাইং ভালেট'। মিঃ মরিসের ঝোঁক ছিল বিয়োগান্ত নাটকাভিনয়ের দিকে। অবশ্য তিনিও ব্যর্থ হন নিপুণ শিল্পীর অভাবে।

ঐ বছরেরই নভেম্বর মাসে মিঃ মরিস এখানে 'আর্ল অফ ওয়ারউইক' অভিনয়ের পর 'দি ম্যাজিক পাইপ' বা 'ড্যানসিং ম্যাড' প্রহসন মঞ্চস্থ করেন। এই প্রহসনে বিচারক, কৌসুলী, কেরাণী, ভাঁড়, কসাই, বাজারের ফোড়ে, সৈনিক. নাবিক প্রভৃতি বিচিত্র ধরনের চরিত্র দিয়ে নাটক জমিয়ে দর্শক আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। তাতেও তিনি ব্যর্থ হন। চৌরঙ্গী থিয়েটারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এথেনিয়ামের সামর্থ্য ছিল না অস্তিত্ব বজায় রাখার।

১৮১৪ সালে এই থিয়েটারের অভিনয় প্রচেষ্টা শেষ হয়ে যায়।

ছয়. চৌরঙ্গী থিয়েটার (Chowringhee Theatre)

উদ্বোধন : ২৫ নভেম্বর, ১৮১৩ স্থায়িত্বকাল : ১৮১৩-১৮৩৯

নাটক : কাসল্ স্পেক্টার ও সিক্সটি থার্ড লেটার

প্রতিষ্ঠাতা : এমেচার ড্রামাটিক সোসাইটি

কলকাতায় বসবাসকারী অভিজাত ও শিক্ষিত ইংরেজরা তাদের মনোমত একটি থিয়েটারের অভাব দীর্ঘদিন ধরে বোধ করছিল। ক্যালকাটা থিয়েটারের পর আর এমন কোনো থিয়েটার তৈরি হলো না, যেখানে মনোমত ভালো ও উচ্চাঙ্গের নাট্যাভিনয় দেখতে পাওয়া যায়। এই অভাববোধ থেকেই কলকাতায় গণ্যমান্য ও বিশিষ্ট কয়েকজন ইংরেজ একটি রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার জন্য এগিয়ে এলেন। নাট্যরসিক ব্যক্তিরা সবাই ছিলেন

এমেচার ড্রামাটিক সোসাইটির সভ্য। এই সোসাইটিকে বিফষ্টিক ক্লাবও বলা হতো। এই ক্লাবের সদস্যদের চেষ্টাতেই চৌরঙ্গী থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। চৌরঙ্গী ও থিয়েটার রোডের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এটি তৈরি হয়েছিল। গোড়া থেকেই এখানে প্রাইভেট সাবসক্রিপসন বা ব্যক্তিগত সদস্য চাঁদার ওপর রঙ্গালয়টি পরিচালিত গত। তাই এর আরেক নাম সাবসক্রিপসন থিয়েটার। প্রত্যেক সদস্যই শেয়ার হোল্ডার ছিলেন।

এই থিয়েটারটির সঙ্গে প্রখ্যাত অনেকেই জড়িত ছিলেন। সংস্কৃত পণ্ডিত ও ভারতবিদ এইচ. এইচ. উইলসন থেকে শুরু করে হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসন, উচ্চপদস্থ কর্মচারী হেনরি মেরিডিথ পার্কার, ইংলিশম্যান কাগজের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক জে. এইচ, স্টোকলার প্রভৃতি গণ্যমান্য শিল্পরসিক ব্যক্তিবৃন্দ চৌরঙ্গী থিয়েটারের উদ্যোক্তা ছিলেন।

বাঙালির মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর ড্রামাটিক সোসাইটির সভ্য ছিলেন। নানাভাবে তিনি চৌরঙ্গী থিয়েটারের সুদিন-দুর্দিনে চৌরঙ্গী থিয়েটারের সঙ্গে ছিলেন--একেবারে শেষ দিন পর্যন্ত।

রঙ্গালয়টি তাড়াতাড়ি নির্মাণের ফলে এর বাইরের শোভা ভালো ছিল না। তবে ভেতরের অন্যসব ব্যবস্থা খুবই উচ্চাঙ্গের হয়েছিল।

১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ নভেম্বর চৌরঙ্গী থিয়েটারের উদ্বোধন হলো। অভিনীত নাটক--কাসল্ স্পেক্টার নামে বিয়োগান্ত নাটক এবং সিক্সটি থার্ড লেটার নামে একটি অপেরা। প্রচণ্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর রঙ্গালয়টির উদ্বোধন হলো। বড়লাট লর্ড ময়রা, তাঁর স্ত্রী এবং নাট্যরসিক শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হলেন। প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ হয়ে গেল।

এখানে উচ্চমানের নাট্যশিল্পীদের সমাবেশ হয়েছিল। স্টোকলার, পার্কার, মিসেস লীচ সে-যুগের খ্যাতিমান অভিনেতা-অভিনেত্রী। প্রসিদ্ধ গায়ক উইলিয়াম লিন্টন, কর্নেল জে. সি. ডয়েলি, ক্যাপ্টেন ডব্লু. ডি, প্লেফেয়ার প্রমুখেরাও এখানে যুক্ত ছিলেন। ফলস্টাফের ভূমিকায় সেকালে প্লেফেয়ারের জুড়ি ছিল না। অভিনেত্রীদের মধ্যে মিসেস ফ্রান্সিস, মিসেস গটলিয়েব, মিসেস ব্ল্যাড। তাছাড়া ইংলন্ডের থিয়েটার থেকে কিছু বিখ্যাত অভিনেত্রী এখানে আনা হয়েছিল। ড্রুরিলেন থিয়েটার থেকে মিসেস এটকিনসন, থিয়েটার রয়াল থেকে মিসেস চেস্টার। সঙ্গীতে, নৃত্যে ও অভিনয়ে পারদর্শিনী এই অভিনেত্রীরা চৌরঙ্গী থিয়েটারের অভিনয়কে উচ্চাঙ্গের ও আকর্ষণীয় করে তুলেছিলেন। আর ছিলেন সে সময়ের সবচেয়ে কুশলিনী ও খ্যাতিময়ী অভিনেত্রী মিসেস এসথার লীচ। তাঁকে এদেশে 'ইন্ডিয়ান সিডানস্' নামে অভিহিত করা হতো। মিসেস সিডানস ছিলেন ইংলন্ডের চিরকালের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী। ১৮২৬-এর ২৭ জুলাই চৌরঙ্গী রঙ্গালয়ে মিসেস লীচ প্রথম মঞ্চাবতরণ করেন সেরিডানের বিখ্যাত নাটক 'স্কুল ফর স্ক্যান্ডাল'-এ লেডি টিজেলের ভূমিকায়। ১৮২৬ থেকে ১৮৩৮ পর্যন্ত তিনি এখানে ওথেলো, দি ওয়াইফ, লেডি অফ লায়ন্স, হাঞ্চব্যাক প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করে চৌরঙ্গী থিয়েটারের

আকর্ষণ দর্শকদের কাছে শতগুণ বাড়িয়ে দেন।

এখানকার অভিনেতা সবাই এমেচার ছিলেন। কিন্তু অভিনেত্রীরা উচ্চহারে মাইনে পেতেন ও রঙ্গালয়ের সংলগ্ন গৃহেই বসবাস করতেন।

উদ্যোক্তা নাট্যরসিক ব্যক্তিদের চেষ্টা, অসম্ভব উজ্জ্বল সব তারকাদের অভিনয় এবং অন্যান্য কলাকুশলীদের সনির্বন্ধ প্রয়াসে চৌরঙ্গী থিয়েটারের নাট্যাভিনয় অতি উচ্চাঙ্গের হয়ে উঠল। এথেনিয়াম ট্রাজেডি নাটক অভিনয়ে ব্যর্থ হয়েছিল। চৌরঙ্গী দেখিয়ে দিল ট্রাজেডি নাটকের মর্যাদা কতোদূর যেতে পারে।

এখানে শেক্সপীয়র থেকে শুরু করে সেরিডান, গোল্ডস্মিথ, কোলম্যান, নোয়েলস, ফ্লেচার প্রভৃতি খ্যাতিমান নাট্যকারদের নাটক অভিনয় হয়েছে। হেনরি দি ফোর্থ, Love A La Mode (প্রহসন), সি স্টুপস টু কঙ্কার, স্কুল ফর স্ক্যান্ডাল, কোরিওলেনাস, জেলাস ওয়াইফ, লাভ লাফস এ্যাট লকস্মিথ, দি আয়রন চেস্ট, মঁসিও টেনসন, হানিমুন, কাথেরিন অ্যান্ড পেট্রুসিও (শেক্সপীয়রের 'টেমিং অব দি শ্রু' নাটকের সংক্ষিপ্ত রূপ। রূপান্তর : ডেভিড গ্যারিক), ম্যাট্রিমনি, বিজি বডি, চার্লস দি সেকেন্ড, দি মেরিমনার্ক, দি এ্যাকট্রেস অব অল ওয়ার্কস (এই নাটকে মিসেস লীচ একাই ছয়টি চরিত্রে নেমেছিলেন) প্রভৃতি নাটকগুলি চৌরঙ্গী থিয়েটারে বিপুল সাফল্য ও সংবর্ধনা লাভ করেছিল।

বিপুল জনসমাদর ও দর্শকানুকূল্য পেলেও রঙ্গালয় পরিচালনার ত্রুটিতে কিছুদিনের মধ্যেই চৌরঙ্গী থিয়েটারের আর্থিক অনটন দেখা দিল। প্রথম বছরেই ১৭ হাজার টাকা দেনা হয়ে যায়। বড়লাটের বাৎসরিক ১৬শ' টাকার অনুদান কোন কাজেই লাগল না। কখনো ভালো, কখনো খারাপ--এই ভাবে চলতে চলতে অবস্থা চরমে উঠল ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে। কর্তৃপক্ষ রঙ্গালয়টি ভাড়া দিতে বাধ্য হলেন। এক ইতালিয়ান অপেরা কোম্পানীকে ভাড়া দেওয়া হলো। ভাড়া মাসিক এক হাজার টাকা। ভাড়ার টাকা ছাড়াও দৃশ্যপট, আলো, সাজসজ্জা ইত্যাদি আনুষঙ্গিক আরো খরচ চালিয়ে কারো পক্ষেই এখানে থিয়েটার চালানো সম্ভব হলো না। ইতালিয়ান কোম্পানী ছেড়ে দিলে, এলো এক ফরাসী কোম্পানী। তারাও ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল।

এইভাবে দু'বছর চলার পর থিয়েটারের অবস্থা দুর্বিষহ হয়ে উঠলে ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে দেখা গেল দেনা পাহাড় সমান, আয় প্রায় নেই। শেষ পর্যন্ত দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রস্তাব মতো পরিচালকমণ্ডলী রঙ্গালয়টি বিক্রি করা মনস্থির করল। ১৫ আগস্ট, ১৮৩৫ ঋণের দায়ে নীলামে উঠল চৌরঙ্গী থিয়েটার। ত্রিশ হাজার একশো টাকায় নীলাম ডেকে থিয়েটার কিনে নিলেন বাঙালি ধনী দ্বারকানাথ ঠাকুর। কার অ্যান্ড ঠাকুর কোম্পানী পরিচালিত ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক হলো এর ট্রেজারার। দ্বারকানাথ মালিকানার লোভে থিয়েটারটি কেনেননি। দুরবস্থার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যই তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন। নীলামের অর্থে সব দেনা শোধ করা হলো। পার্কার, ক্লার্ক এবং কার এই তিন অভিনেতার হাতে থিয়েটার পরিচালনার ভার দেওয়া হলো। এইভাবে পুনরুজ্জীবন

পেয়ে চৌরঙ্গী থিয়েটার আবার ভালভাবেই চলা শুরু করে। বিলেত থেকে আবার অভিনেত্রী আনা হলো। ড্রুরিলেন থিয়েটার থেকে এলেন মিসেস চেস্টার। বছর চারেক এইভাবে থিয়েটার চলল।

তারপরে মিসেস লীচ অসুস্থ হয়ে চলে গেলেন লন্ডন। রাজকর্মচারী যেসব অভিনেতা এখানে যুক্ত ছিলেন, তাদের অনেকেই কাজের জন্য বদলি হয়ে অন্যত্র চলে গেলেন। দেনা, অবহেলা, অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভাব--সব মিলিয়ে একেবারে শেষ অবস্থা যখন থিয়েটারের, তখন একরাতে প্রচণ্ড আগুন লেগে সব কিছু পুড়ে শেষ হয়ে গেল। ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ মে, রাত একটা।

চৌরঙ্গী থিয়েটারের বৈশিষ্ট্য অনেক দিক দিয়েই বলার মতো।

কলকাতায় সাহেবদের থিয়েটারের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল চৌরঙ্গী থিয়েটার। এই রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার মূলে যাঁরা ছিলেন তাঁরা সবাই নাট্যপ্রিয় ও শিল্পরসিক। শুধুমাত্র প্রমোদ এবং স্ফূর্তির জন্য এই রঙ্গালয় নির্মিত হয় নি। এখানে প্রথম থেকেই শেক্সপীয়রের ট্রাজেডি ও কমেডিগুলি অভিনয়ের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রখ্যাত নাট্যকারের নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। অসামান্য শিল্পী সমাবেশের ফলে অভিনয়ের মানও উচ্চাঙ্গের হত। বিলেতের শিল্পীরা এখানে এসে অভিনয় করাব ফলে তদানীন্তন ইংলন্ডের মঞ্চের অভিনয়ের আদর্শ ও আদল এখানকার দর্শকেরা পেতেন। শিল্পীদের অভিনয় নৈপুণ্য ও বিদগ্ধজনের নাট্যপরিচালনা এই থিয়েটারের সবচেয়ে বড়ো সম্পদ ছিল।

এই থিয়েটারের সাজসজ্জা ও রূপসজ্জার দিকে প্রখর দৃষ্টির ফলে কোনো চরিত্রই অস্বাভাবিক মনে হতো না। দৃশ্যপট নতুন, উজ্জ্বল ও বর্ণময় ছিল। ভালো চিত্রকর দিয়ে এসব আঁকানো হতো। তাছাড়া নাটকের বিষয়-বৈশিষ্ট্যও এই থিয়েটারের একটি উল্লেখ করার মতো দিক। ২৬ বছর ধরে নানা ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে অভিনয় চালিয়ে বিদেশী রঙ্গালয়ের ইতিহাসে এই থিয়েটার একটি উজ্জ্বল নাট্যাভিনয়েব পরিচয় রেখে গেছে।

বাঙালি দ্বারকানাথ ঠাকুর এর পরিচালকমণ্ডলীতে ছিলেন, পরে মালিকও (১৮৩৫-৩৯) হয়েছিলেন। বিদেশী রাজার লোকেদের থিয়েটারে তাঁর এই গৌরবময় উপস্থিতি ব্রিটিশপদানত বাঙালির কাছে খুবই গৌরবের ও শ্লাঘার বিষয়।

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার (১৮১৭) পর থেকে বাঙালি ছাত্রেরা কলেজে ইংরেজি নাটক পাঠ এবং চৌরঙ্গী থিয়েটারে নাটক দর্শনে তাদের নাট্যবোধ গড়ে তুলেছিল। রিচার্ডসন ও উইলসন দুজনেই হিন্দু কলেজ ও চৌরঙ্গী থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁরাই বাঙালি তরুণ ছাত্রদের বিদেশী থিয়েটারের অভিমুখী করে তুলেছিলেন।

বিদেশী নাটক ও বিদেশী থিয়েটারের আবেষ্টনেই যে আধুনিক বাঙালির নাট্যচর্চা উৎসাহিত ও পরিস্ফুটিত হয়েছে--চৌরঙ্গী থিয়েটার তার মূল ভিত্তিভূমি রূপে কাজ করেছে।

সাত. দমদম থিয়েটার (Dum Dum Theatre)

উদ্বোধন : ১৮১৭

কলকাতায় চৌরঙ্গী থিয়েটারের রমরমার সময়ে দমদম অঞ্চলে আকারে ছোট কিন্তু দেখতে অতি সুন্দর এই দমদম থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। মিলিটারী সৈন্যদের আস্তানার কাছেই একটি করে রঙ্গালয় তৈরী করা সেই সময়কার ইংরেজদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। দমদমে বিরাট সৈন্যদের ছাউনি ছিল। সেখানে ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে এই রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। অভিনয়ের গুণে এবং নাট্যোপস্থাপনের কৃতিত্বে ও কুশলী শিল্পীদের আকর্ষণে দমদম থিয়েটার খ্যাতিলাভ করে। কলকাতা থেকেও প্রচুর দর্শক চৌরঙ্গী থিয়েটারের সাফল্যের দিনেও উপকণ্ঠের দমদমে নাটক দেখতে যেত। এটা গৌরবের কথা। চৌরঙ্গী থিয়েটারকে ইন্ডিয়ান ড্রুরিলেন থিয়েটার নাম দিয়ে ইংলন্ডের বিখ্যাত থিয়েটারের সঙ্গে তুলনা করা হতো। দমদম থিয়েটারকে বলা হতো লিটল ড্রুরিলেন থিয়েটার। এই অনুষঙ্গ মর্যাদাব্যঞ্জক।

এখানে অভিনেত্রী ছিলেন মিসেস লীচ, মিসেস ফ্রান্সিস, মিসেস গটলিয়েব, মিসেস ব্ল্যান্ড। এখান থেকেই এঁরা খ্যাতি অর্জন করে কলকাতার থিয়েটারে যোগ দেন। এই থিয়েটারের প্রাণপুরুষ ছিলেন এক সৈনিক, নাম চার্লস ফ্রাঙ্কলিং। তিনি এসে দমদমে যোগ দেবার পরই এই থিয়েটারের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তিনিই ছিলেন পরিচালক ও প্রধান অভিনেতা। তাঁর একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার ফলেই লোকে চৌরঙ্গীর অভিনয় ফেলে দমদমে ছুটে আসত। ১৮১৭ থেকে ১৮২৪ পর্যন্ত তিনিই ছিলেন থিয়েটারের প্রাণপুরুষ। ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে দমদমে তাঁর মৃত্যু হয়। বিদেশী রঙ্গালয়ে যে কয়জন অভিনেতা ও পরিচালক তাঁদের প্রতিভা ও নিষ্ঠার গুণে সম্মান-শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন ফ্রাঙ্কলিং তাঁদের অন্যতম। তাঁর মৃত্যুতে ইন্ডিয়া গেজেট পত্রিকা সম্পাদকীয় স্তম্ভে তাঁর কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছিল।

এখানে অভিনীত কয়েকটি নাটক হলো :

রাইভ্যালস, ব্রোকন সোর্ড, পেজেন্ট বয়, দি উইল, দি ওয়াটার ম্যান, রেজিং দি উইন্ড, দি হানিমুন। এখানে বিয়োগান্ত নাটক ও হাল্কা প্রহসন দু'ধরনের অভিনয়ই সাফল্য লাভ করেছিল।

১৮২৪-এ ফ্রাঙ্কলিং-এর মৃত্যুর পর, নামকরা অভিনেত্রীরা সব কলকাতায় থিয়েটারে চলে যাওয়ায় দমদম থিয়েটার ম্রিয়মান হয়ে পড়ে ও শেষে বন্ধ হয়ে যায়।

আট. বৈঠকখানা থিয়েটার (Boithakkhana Theatre)

উদ্বোধন : ২৪ মে, ১৮২৪

চৌরঙ্গী ও দমদম থিয়েটারের প্রবল সাফল্যের দিনেও বৈঠকখানা থিয়েটার তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল। সে যুগে এ কম কথা নয়।

কলকাতায় বৈঠকখানা অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত বলে এই থিয়েটারের নাম বৈঠকখানা থিয়েটার। থিয়েটারের বাইরের সজ্জা তেমন ভালো ছিল না, তবে ভেতরের ব্যবস্থাদি সর্বাঙ্গসুন্দর ছিল। মঞ্চব্যবস্থাও ছিল উৎকৃষ্ট নাট্যপ্রযোজনার উপযোগী। এই থিয়েটারের ব্যবস্থাপনা এবং অভিনয় আকর্ষণীয় হয়েছিল।

১৭৭ নম্বর বৈঠকখানার ঠিকানায় এই থিয়েটারের উদ্বোধন হয় ২৪ মে, ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে। এখানে একাধিক খ্যাতনামা অভিনেত্রী ছিলেন--মিসেস ফ্রান্সিস, মিসেস কোহেন উল্লেখযোগ্য। দক্ষ অভিনেতারও সমাবেশ এখানে ঘটেছিল। প্রথম শ্রেণীর শিল্পী সমন্বয়ে অল্পদিনের মধ্যেই বৈঠকখানা থিয়েটারের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

অভিনীত কয়েকটি নাটক :

রেজিং দি উইন্ড, বোম্বাসটিস ফিউরিওসো, ইচ ফর হিমসেল্‌ফ, দি লাইং ভ্যালেট, এ ট্রিপ টু ক্যালে, স্লিপিং ড্রাফট, দি ইয়ং উইডো, মাই ল্যান্ডলেডিজ গাউন প্রভৃতি অভিনয়ের বেশিরভাগই নৃত্যগীত বহুল অপেরা কমেডি, কিংবা হাল্কা মজাদার প্রহসন। এইসব নাট্যাভিনয়ের প্রশংসা করে সংবাদপত্রে বৈঠকখানা থিয়েটারের সাফল্য ঘোষণা করা হতো প্রায়ই।

চৌরঙ্গী থিয়েটারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেশ গৌরবের সঙ্গে এই থিয়েটার কলকাতার বুকে তার অভিনয় চালিয়ে গিয়েছিল।

নয়. সাঁ সুসি থিয়েটার (Sans Souci Theatre)

উদ্বোধন : ২১ আগস্ট, ১৮৩৯ স্থায়িত্বকাল : ১৮৩৯-১৮৪৯

প্রথম নাটক : ইউ ক্যান্ট ম্যারি ইওর গ্র্যান্ডমাদার
সঙ্গে দুটি প্রহসন--বাট হাইএভার
এবং মাই লিটল এডপটেড

প্রতিষ্ঠাতা : স্টোকলার ও মিসেস লীচ

ক. অস্থায়ী মঞ্চ : প্রথম শ্রেণীর বহুখ্যাত রঙ্গালয় চৌরঙ্গী থিয়েটার পুড়ে যাওয়ার (১৮৩৯) তিন মাসের মধ্যেই কলকাতায় আরেকটি প্রথম শ্রেণীর থিয়েটার চালু হয়ে গেল। সাঁ সুসি থিয়েটার। অস্থায়ীভাবে এই নাট্যশালাটি তৈরি করা হলো ওয়াটারলু স্ট্রিট ও গভর্নমেণ্ট হাউস ইস্টের কোণে। বর্তমান এজরা ম্যানসনের কাছাকাছি এর অবস্থান ছিল। তখন সেখানে ছিল থ্যাকার কোম্পানীর বইয়ের দোকান। সেই দোকানের নিচের হল-এ রঙ্গালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন হয় ২১ আগস্ট, ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে। প্রথম রাত্রে অভিনীত হয় 'ইউ ক্যান্ট ম্যারি ইওর গ্র্যান্ডমাদার' এবং সঙ্গে দুটি প্রহসন-- বাট হাউএভার এবং মাই লিটল এডপটেড।

চৌরঙ্গী থিয়েটার পুড়ে যাওয়ায় স্বভাবতই ইংরেজরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিল। অভিনেতা ও সাংবাদিক স্টোকলার উদ্যোগী হয়ে নতুন থিয়েটার প্রতিষ্ঠার জন্য মঞ্চে পেলেন পুরনো অনেককে এবং বিশেষ করে প্রখ্যাতা অভিনেত্রী মিসেস লীচকে। তখন তিনি

ইংলন্ড থেকে আবার ফিরে এসেছেন।

বইয়ের দোকানের নীচের হলঘরটিকে সাজিয়ে-গুছিয়ে একটি সুদৃশ্য রঙ্গালয় তৈরি হলো। ছোট অথচ মনোরম। মঞ্চ, তার সম্মুখভাগ, দেওয়াল সবই সাজানো হলো সুদৃশ্যভাবে। সামনে অর্কেষ্ট্রার ব্যবস্থা ছিল। দর্শকাসন ছিল চারশো। স্টল ১০৮টি আসনের। দাম প্রতিটি ছয় টাকা। বক্স--পাঁচ টাকা। আপার বক্স--চার টাকা। হল্-এ ধূমপান নিষিদ্ধ ছিল এবং শীততাপ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র বসানো হয়েছিল। মিসেস লীচের তত্ত্বাবধানে নক্‌শা তৈরি ; রঙ্গালয়ের সবকিছু নির্মাণ ও প্রস্তুতির দায়িত্ব নেন মিঃ বলিন এবং মিঃ বার্টলেট। বাইরে ভেতরে সুদৃশ্য এই রঙ্গালয়ে প্রতি বৃহস্পতিবার অভিনয়ের সংবাদে উল্লসিত হয়ে উঠল সাহেবরা।

প্রথম রাতের অভিনয়ে 'হাউস ফুল'। মিসেস লীচের এই অস্থায়ী মঞ্চে পর পর অভিনীত হলো :

> ইউ ক্যান্ট ম্যারি ইওর গ্র্যান্ডমাদার, বাট হাইএভার, মাই লিটল এডপটেড, দি ওয়েলচ গার্ল, দি ওরিজিনাল, দি ওয়েদার কক, দি হাঞ্চব্যাক, ক্যাথেরিন অ্যান্ড প্যাট্রসিও, মিন্সট্রেল, দি লেডি অব লায়ন্স, প্লেজেন্ট ড্রিমস, দি আইরিশ লায়ন প্রভৃতি কমেডি, প্রহসন, গীতিনাট্য অপেরা। এছাড়া কার্নিভাল বল, নেভাল এনগেজমেন্টস, শকিং ইভেন্টস প্রভৃতি প্রযোজনায় মিসেস লীচ, মিসেস ফ্রান্সিস অভিনয়ে নাচে গানে মাতিয়ে দিলেন। এই রঙ্গালয়ে এই সময়ে মিঃ বলিন তাঁর বিখ্যাত ভাঁড়-নৃত্য (clown-dance) দেখানো শুরু করেন এবং তার নাচ ও ক্যারিকেচারে দর্শকেরা মাতোয়ারা হয়ে গিয়েছিল। সাঁ সুসি থিয়েটার তার অস্থায়ী মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেল।

খ. স্থায়ী মঞ্চ : অভাবিত সাফল্যে উৎসাহিত মিসেস লীচ স্থায়ীভাবে রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হলেন। অস্থায়ী মঞ্চের দৃশ্যপট, সাজসজ্জা, পোষাক, আলো ইত্যাদি যাবতীয় সম্পত্তি স্থায়ী মঞ্চের জন্য দিয়ে দিলেন। অর্থদাতা ও পৃষ্ঠপোষকের জন্য বিজ্ঞাপনের উত্তরে বড়লাট অকল্যান্ড এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর একহাজার টাকা করে দিলেন। অনেক ইংরেজ, ভারতীয়, বিশেষ করে বাঙালি এগিয়ে এলেন সাহায্যের জন্য।

পার্ক স্ট্রিটে জমি সংগ্রহ করে সেখানে স্থায়ী রঙ্গালয় তৈরি হল। স্থপতি ছিলেন মিঃ কলিনস। মিসেস লীচ, স্টোকলার প্রধান উদ্যোক্তা। শিল্পী নির্বাচন, সাজসজ্জা, দৃশ্যপট তৈরি হলো। ইংলন্ড থেকে এলেন জেমস ব্যারী ও তাঁর স্ত্রী। দুজনেই লণ্ডনের বিখ্যাত শিল্পী। এলেন লন্ডনের অ্যাডেলফি থিয়েটারের মিসেস ডীক্‌ল, এলেন মিস কাউলি। সুপ্রশস্ত, সুরম্য ও সুদৃশ্য এই স্থায়ী রঙ্গালয়ে দুই তলার ওপর-নিচে দর্শকাসন ছিল। অর্কেষ্ট্রার ব্যবস্থা ছিল। প্রবেশমূল্য, বক্স--ছয় টাকা, স্টল--ছয় টাকা, পিট--তিন টাকা।

উত্তম শিল্পী সমাবেশের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রসঙ্গীত পরিচালনার জন্য আনা হলো পি. ডেলমারকে এবং দৃশ্যপট রচনার ভারও দেওয়া হলো উপযুক্ত শিল্পীদের। যবনিকা এঁকে দিলেন প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী মিঃ পোট।

স্থায়ী সাঁ সুসি রঙ্গালয়ের উদ্বোধন হলো ৬ মার্চ, ১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দে। প্রথম রজনীর অভিনয় --'দি ওয়াইফ' নাটক। অভিনয়ে--মিসেস লীচ, হিউম, হাওয়ার্ড, ক্যাপ্টেন সিউয়েল, স্টোকলার অসামান্য কৃতিত্ব দেখালেন। দৃশ্যপট, সঙ্গীত, আলো অভিনয় সবকিছুর উচ্চ প্রশংসা করা হলো পত্রিকায়।

পরের মাসেই অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত অভিনেত্রী মাদাম দেরম্যাঁভিয়ে এখানে যোগ দেন। পরে লন্ডন থেকেও সব নতুন অভিনেতা অভিনেত্রী এসে গেল। সাঁ সুসি'র তখন সাফল্যের পর সাফল্যের পালা।

লন্ডনের ড্রুরিলেন থিয়েটারের প্রবাদপ্রতিম অভিনেতা জেমস্ ভাইনিং ১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দে এলেন এবং 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' নাটকে শাইলকের ভূমিকায় প্রথম অবতীর্ণ হয়েই সাড়া ফেলে দিলেন। পোর্শিয়া--মিসেস ডীকল, জেসিকা--মিসেস লীচ, নেরিমা--মিস্ কাউলি। এই নাটকের এবং 'হ্যান্ডসাম হাজব্যান্ড' প্রহসনের অভিনয় কলকাতার দর্শকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করল। এই রাতেই অভিনয় চলাকালীন সাঁ সুসির প্রাণপ্রতিমা মিসেস লীচের পরিচ্ছদে আগুন লেগে যায়। অগ্নিদগ্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি মারা গেলেন, ১৮ নভেম্বর, ১৮৪১। মৃত্যুর আগেই তিনি সাঁ সুসির মালিকানা দিয়ে যান মাদাম নিনা ব্যাক্সটার নামে অভিনেত্রীকে। মিসেস লীচের আমলে স্থায়ী মঞ্চে অভিনীত কয়েকটি নাটক হলো :

দি ওয়াইফ, হিজ লাস্ট লেগস, চার্লস দি সেকেন্ড, হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, দি মার্চেন্ট অব ভেনিস, রোমিও এ্যান্ড জুলিয়েট, দি জেন্টলম্যান ইন ব্লাক, দি ওয়েলচ গার্ল, দি আইরিশ লায়ন, স্ট্রেঞ্জার, স্কুল ফর স্ক্যান্ডাল প্রভৃতি।

মাদাম ব্যাক্সটারের মালিকানায় অভিনয় চলল। অন্য সব অভিনেত্রী এখানে অভিনয় চালিয়ে গেলেন কিন্তু মিসেস লীচের অভাব পূর্ণ হলো না। নতুন মালিক প্রচুর খরচ করে লন্ডন থেকে মিঃ ও মিসেস আরমন্ডকে নিয়ে এলেন, নতুন নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রী জোগাড়ের ব্যবস্থা করলেন। সাঁ সুসির সুনাম বজায় রাখতে এইসব শিল্পীদের দিয়ে রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট, হ্যামলেট, স্ট্রেঞ্জার প্রভৃতি নাটক অভিনয়ের চেষ্টা চালিয়ে গেলেন। কিন্তু সে অবস্থা আর ফিরে এলো না। দেনা বেড়ে যেতে লাগল। সাঁ সুসির দুরবস্থায় ইংরেজি সংবাদপত্রের সঙ্গে বাংলা পত্রিকা পূর্ণ চন্দ্রোদয়ও খুবই সহানুভূতি প্রকাশ করেছিল। মিসেস ডীকল চলে গেলেন, চার্লস ভাইনিং ছেড়ে দিলেন, মিসেস আরমন্ড কলেরায় মারা গেলেন। নিত্যনতুন অভিনয়ের আয়োজন করে, টিকিটের দাম কমিয়েও অবস্থা ফিরিয়ে আনা গেল না। শেষ পর্যন্ত এখানে ঘোড়ার খেলা দেখাবারও ব্যবস্থা করা হলো। অবশ্য তা কার্যকরী হয়নি। তবে নাটকের মাঝখানে দড়ির ওপর নৃত্য জাতীয় সার্কাসের খেলা দেখিয়ে দর্শকাকর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছিল। মাদাম ব্যাক্সটারের আমলে সাঁ সুসিতে অভিনীত কয়েকটি নাটক হলো :

স্ট্রেঞ্জার, ম্যাকবেথ, রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট, হ্যামলেট, ভেনিস প্রিজার্ভড, মার্চেন্ট অব ভেনিস, সি স্টুপস টু কঙ্কার, রাইভ্যাল্স, রেজিং দি উইন্ড প্রভৃতি।

তবু চলল না, তখন মাদাম ব্যাক্সটার রঙ্গালয়টি হস্তান্তরিত করলেন জেমস ব্যারীর কাছে। তিনিও সাঁ সুসির অভিনেতা ছিলেন। পূর্বের গৌরব তাও ফিরল না, বরং আরো অবনতি হলো। অভিনয় প্রায় বন্ধ থাকত। ভালো শিল্পী আর কেউ ছিলেন না। শুধু ছিলেন মিসেস ফ্রান্সিস, মিসেস ব্যারী এবং জেমস ব্যারী নিজে। শেষ চেষ্টা হিসেবে লন্ডন থেকে আনা হল মিসেস লীচের সুযোগ্যা কন্যা মিসেস এন্ডারসনকে। ওথেলো নাটকে ডেসডিমোনার ভূমিকায় তাঁর অভিনয় বহুদিন মুখে মুখে ফিরেছে।

জেমস ব্যারী কোনোরকমে অভিনয় চালিয়ে সাঁ সুসিকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে যেতে লাগলেন। তাঁর সময়ে এখানে অভিনীত হয়েছিল .

> ম্যাকবেথ, দি ওয়েলচ গার্ল, মার্চেন্ট অব ভেনিস, দি মেড অফ ক্রয়সী, ওথেলো প্রভৃতি পূর্বঅভিনীত নাটকগুলি।

১৮৪৮-এর ১৬ আগষ্ট শেক্সপীয়রের 'ওথেলো' নাটকের অভিনয়ে 'এ নেটিভ এমেচার' বৈষ্ণবচরণ আঢ্য ওথেলোর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। ডেসডিমোনা মিসেস লীচ কন্যা এন্ডারসন। অভিনয়ের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন বাঙালিদের মধ্যে রাধাকান্ত দেব, মহারাজা বৈদ্যনাথ রায়, মহারাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রমুখেরা। সংবাদ প্রভাকরের বিবরণে (২১.৮.১৮৪৮) জানা যায় যে, সাহেবদের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সাহেবদের থিয়েটারে নেটিভ বৈষ্ণবচরণের অভিনয় সেদিন সাড়া ফেলে দিয়েছিল কলকাতায়। ইংরেজি কাগজেও অভিনয়ের, বিশেষ করে চলাফেরা, ইংরেজি উচ্চারণ, অঙ্গভঙ্গির এবং ভাবপ্রকাশের জড়তাহীন অভিব্যক্তির জন্য 'দি হিন্দু ওথেলো'র খুবই প্রশংসা করা হয়েছিল। ১২ সেপ্টেম্বরের (১৮৪৮) অভিনয়ে বৈষ্ণবচরণ আবার ওথেলো করলেন।

সাহেবদের থিয়েটারে বাঙালিরা দর্শক হিসেবে আসতে শুরু করেছিল। ক্রমে পৃষ্ঠপোষক, সদস্য, উদ্যোক্তা এবং মালিকানার অংশীদার থেকে খোদ মালিক পর্যন্ত হয়েছিল, এবারে বাঙালি বৈষ্ণবচরণ সাহেবদের থিয়েটারে মূল ভূমিকায় অভিনয় পর্যন্ত করে ফেললেন সাফল্যের সঙ্গে। বিদেশী রঙ্গালয়ের ইতিহাসে এটি একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ।

তবু সাঁ সুসির দৈন্যদশা ঘুচলো না। মিসেস এন্ডারসন ছেড়ে দিলেন সাঁ সুসি। ১৮৪৯-এর ২১মে অভিনয় হলো মালিক জেমস ব্যারীর ফেয়ারওয়েল নাটক হিসেবে। সাঁ সুসির সেই শেষ অভিনয়।

এখন সেখানে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ।

দশ বৎসরের অধিককাল স্থায়ী সাঁ সুসি থিয়েটার ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত থিয়েটারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। একমাত্র চৌরঙ্গী থিয়েটারের সঙ্গেই এর তুলনা চলে।

সুদৃশ্য ও মনোরম প্রেক্ষাগৃহ, সুসজ্জিত মঞ্চ, উজ্জ্বল দৃশ্যপট, নতুন পোষাক-পরিচ্ছদ, রঙীন যবনিকা—সব দিক দিয়ে অভিজাত ও উন্নত এই রঙ্গালয় বিশেষ

আকর্ষণীয় ছিল। সম্ভ্রান্ত, উচ্চপদস্থ ও শিক্ষিত ইংরেজ এই রঙ্গালয়ের দর্শক ছিল। এখানে শেক্সপীয়রের উচ্চাঙ্গের ট্রাজেডিগুলির অভিনয় খুবই সার্থকভাবে অভিনীত হতো। এই মঞ্চে কমেডি এবং হাল্কা প্রহসনও সাফল্য লাভ করেছিল। লন্ডনের বিখ্যাত থিয়েটার থেকে সব খ্যাতিমান অভিনেতা অভিনেত্রী আনিয়ে অভিনয় করানো হতো। মিসেস লীচ, স্টোকলার, জেমস ভাইনিং, মিঃ ও মিসেস ব্যারী, মিসেস ডীকল, মিসেস কাউলি, মিসেস ফ্রাঙ্কলিং, মিসেস এন্ডারসন প্রভৃতির অভিনয়ের উন্নত ও রুচিশীল মান দর্শকদের আপ্লুত করে রাখত।

বাঙালির সঙ্গে এই থিয়েটারের নানাভাবে যোগাযোগ হতে থাকে। মালিকানার অংশীদার থেকে অভিনেতা পর্যন্ত সব পর্যায়েই বাঙালি এর সঙ্গে জড়িত ছিল। বাঙালির নিজস্ব নাট্যশালা গঠনে ও নাটক অভিনয়ে চৌরঙ্গী থিয়েটারের মতো এই সাঁ সুসি থিয়েটারের প্রভাবও অনেকখানি কার্যকরী হয়েছিল।

লন্ডনের প্রথম শ্রেণীর রঙ্গালয়ের মতো সাঁ সুসির প্রথম শ্রেণীর অভিনয় শিল্পীদের দ্বারা উচ্চাঙ্গের নাটকাভিনয় বিদেশী থিয়েটারের ইতিহাসে স্মরণীয় কৃতিত্ব।

দশ. এবং অন্যান্য থিয়েটার

সাঁ সুসি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরেও বেশ কিছু বিদেশী থিয়েটার কলকাতায় চলেছিল। 'ড্রামান্ডস একাডেমি' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে, প্রতিষ্ঠাতা মিঃ ড্রামান্ড ইংরেজি স্কুলের ছাত্রদের নাট্যাভিনয়ের শিক্ষা দিতেন। তিনি ধর্মতলায় ছোট ও সুন্দর প্রেক্ষাগৃহ তৈরি করে সেখানে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। ১৮২৪-এর ২০ জানুয়ারী এখানে বিয়োগান্ত নাটক 'ডগলাস'-এর অভিনয় হয়। নাটকের গোড়ায় মঞ্চে ডিরোজিও স্বরচিত প্রস্তাবনা কবিতা আবৃত্তি করেন। তখন তিনি ১৪ বছরের কিশোর।

১৮৪৮ সালে কুলিবাজার অঞ্চলে 'জুভেনাইল থিয়েটার' এবং অন্যত্র রয়াল এলবার্ট থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়েই আরো কিছু নবপ্রতিষ্ঠিত থিয়েটারের খবর পাওয়া যায়। সেন্ট জেমস থিয়েটার, মিসেস লিউইস-এর থিয়েটার রয়াল, লিন্ডসে স্ট্রিটের অপেরা হাউসে মিসেস ইংলিশ-এর রঙ্গালয়, ফোর্ট উইলিয়ামে থিয়েটার রয়াল এবং গ্যারিসন থিয়েটার উল্লেখযোগ্য।

অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতা ছাড়াও বিভিন্ন শহরে সাহেবদের থিয়েটার ছিল। বোম্বাই, মাদ্রাজ, কানপুর, মীরাট, সুরাট, আগ্রা, বাঙ্গালোর, এলাহাবাদ, নৈনিতাল, বেরিলি প্রভৃতি শহরেও সাহেবদের থিয়েটার ছিল। বাংলায় কলকাতা, দমদম ছাড়াও ব্যারাকপুর, বহরমপুর অঞ্চলেও ইংরেজরা থিয়েটার করেছিল।

১৯ শতকের শেষার্ধে থিয়েটার রয়াল এবং অপেরা হাউস--কলকাতায় বহুদিন চলেছিল। তাছাড়া বিদেশাগত থিয়েটার কোম্পানীগুলি এখানে এসে অভিনয় করে যেত। মিসেস লুইস তাঁর লুইস থিয়েটার রয়েল চালিয়েছিলেন কিছুদিন। গিরিশচন্দ্র লুইসের সংস্পর্শে এসেই ইংরেজি থিয়েটার ও অভিনয়ে উজ্জীবিত হয়েছিলেন।

ময়দানে তাঁবু খাটিয়ে অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চেও অনেক বিদেশী কোম্পানী নাট্যাভিনয় করে যেত। এইরকম একবার অলিম্পিক থিয়েটার এসে অভিনয় করে। তাদের 'ম্যাকবেথ' অভিনয় বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিল।

তাছাড়াও অন্য কিছু দলেরও পরিচয় পাওয়া যায়। হার ব্যান্ডম্যান্স কোম্পানী ১৮৮২-৮৫ পর্যন্ত অভিনয় করে থিয়েটার রয়ালে। পোলার্ডস লিলিপুটিয়ান অপেরা অভিনয় করে অপেরা হাউসে ১৮৯৬-৯৯ অবধি। দি ব্রাউ কমেডি কোম্পানী ১৮৯৬-তে থিয়েটার রয়ালে অভিনয় করে যায়। এছাড়াও কিছু নাট্যদল থিয়েটার রয়াল ও করিন্থিয়ান থিয়েটার ভাড়া নিয়ে কিছুদিন করে অভিনয় করেছিল। যেমন—দি এমেচার ড্রামাটিক সোসাইটি, এক্‌লিপস্‌, জ্যানেট ওয়ালড্রফ কোম্পানী, হাডসন ড্রামাটিক কোম্পানী, হেনরি দালালের সাউথ আফ্রিকান ড্রামাটিক কোম্পানী প্রভৃতি।

এদের অভিনয়ের মধ্যে শেক্সপীয়রের ট্রাজেডি কমেডিগুলি ছিল, ছিল রবিনসন ক্রুশো, মিকাডো, এ ভিলেজ প্রিস্ট, আলিবাবা, রবিনহুড, সাইন অবদি ক্রশ, এ কান্ট্রি গার্ল, এ্যান আইডিয়াল হাজব্যান্ড, অর্কিড প্রভৃতি নৃত্যগীতময় অপেরা, লঘু, প্রহসন ও উত্তেজক নাটক।

বাংলা নাটক ও নাট্যশালার আলোচনায় এই বিদেশী রঙ্গালয়গুলির পরিচয়ের প্রাসঙ্গিকতা বা প্রয়োজনীয়তা কতোখানি? কিংবা সাহেবদের থিয়েটারের নাট্যাভিনয় বাঙালির থিয়েটার ও নাটকাভিনয়ের ওপর কোনো প্রভাব ফেলতে পেরেছে কি?

থিয়েটারের ঐতিহ্যে লালিত এবং নাটক্‌-পাগল ইংরেজ এদেশে এসে নিজেদের মানসিক প্রয়োজনেই নাটক শুরু করে। ইংলন্ডের অষ্টাদশ শতকের প্রচলিত রঙ্গালয়ের মডেলেই এখানে থিয়েটার বাড়ি ও প্রসেনিয়াম মঞ্চ তৈরি করে। তৎকালীন ইংলন্ডের থিয়েটারের নাট্যপ্রযোজনা, স্টেজ নির্মাণ, সিনসিনারী, সাজসজ্জা তারা এদেশে প্রচলন করার চেষ্টা করেন। এসব ব্যাপারে তারা বিলেতের মঞ্চাভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাহায্য ও উপদেশ গ্রহণ করে। লণ্ডনের বিখ্যাত সব মঞ্চ থেকে খ্যাতিমান নট-নটীদের এখানে আনা হতো ; তারাও ইংলন্ডের মঞ্চের অভিনয়রীতি এখানে উপস্থাপন করত। তাছাড়া সমসাময়িককাল ও অব্যবহিত পূর্ববর্তী নাট্যকার ফিল্ডিং, গে, গোল্ডস্মিথ, সেরিডান এবং অবশ্যই শেক্সপীয়রের নাটকগুলি এখানে অভিনয় করত।

দেখা যাচ্ছে মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ ও গঠনকৌশল, দৃশ্যসজ্জা, আলোকসম্পাত, পোষাক-পরিচ্ছদ, অভিনয়রীতি, নাটক নির্বাচন—সবই ইংলন্ডের তৎকালীন রঙ্গালয়ের আদর্শে এদেশে প্রচলন করা হয়েছিল। অষ্টাদশ শতকে লন্ডনের থিয়েটারের মতোই এখানে বহুতল বিশিষ্ট প্রেক্ষাগৃহ, সম্মুখভাগে দর্শকাসন, পিট (Pit) ও বক্সের (Box) ব্যবস্থা, সামনে অর্কেষ্ট্রার—বাদ্যযন্ত্রীদের স্থান, চার দেওয়াল বিশিষ্ট প্রসেনিয়াম মঞ্চ, তিনদিক ঘেরা, সামনে খোলা, কার্টেন বা পর্দা, ভেতরে উইংস—প্রবেশ-প্রস্থানের পথ, আঁকা দৃশ্যপটের ব্যবহার, নাটকের চরিত্রানুযায়ী পোষাক-পরিচ্ছদ, তেল বা গ্যাসের

আলো, মঞ্চের পেছনে শব্দপ্রয়োগের ব্যবস্থা--ইত্যাদি কলকাতার রঙ্গমঞ্চে অনুসৃত হয়েছিল।

তখনকার ইংলণ্ডের মঞ্চাভিনয়রীতি ছিল বক্তৃতাধর্মী, আতিশয্যপূর্ণ, উচ্চকিত এবং অতিনাটকীয়। প্রখ্যাত শিল্পীরা তার মধ্যেই সূক্ষ্মভাব সৃষ্টি করতে পারতেন। এখানকার স্টোকলার, ব্যারী, জেমস ভাইনিং, মিসেস ব্রিস্টো, মিসেস ফ্রান্সিস, মিসেস ডীকল প্রভৃতি অভিনেতা-অভিনেত্রী ইংলণ্ডের মঞ্চ থেকেই এসেছিলেন।

এখানেও অভিনীত হতো শেক্সপীয়রের ট্রাজেডি-কমেডি, রেস্টোরেশান যুগের কমেডি, ১৮ শতকের 'Beggar's Opera' জাতীয় গীতিনাটিকা, অপেরা এবং কৌতুক নাট্য ও হাল্কা প্রহসনগুলি।

বিদেশী এই থিয়েটারের সঙ্গে ইংরেজরাই সবকিছু নিয়ে জড়িত ছিল। এই থিয়েটারের সঙ্গে প্রথমদিকে বাঙালির কোনো যোগাযোগ ছিল না। ১৮ শতকের শেষ দিকে কিছু 'হঠাৎ নবাব' ধনী বাঙালি এই থিয়েটারে দর্শক হিসেবে যেতেন সাহেবদের পিছু পিছু। তারা এই থিয়েটারের মজা, ফূর্তি ও গর্ব অনুভব করলেও ভাষা সমস্যা এবং উচ্চ প্রবেশমূল্যের জন্য সংযোগ সহজ ও স্বাভাবিক ছিল না। ইংরেজের সাহচর্যও তখন বেশি বাঙালির ছিল না।

উনিশ শতকের গোড়াতে এসে বাঙালির সঙ্গে এই থিয়েটারের যোগাযোগ ভালভাবে গড়ে উঠতে থাকে। ব্যবসা, দেওয়ানী, দালালী, চাকরি সূত্রে বাঙালি ও ইংরেজদের যোগসূত্র গড়ে ওঠে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) ফলে নবসৃষ্ট কলকাতাবাসী জমিদার শ্রেণীও ইংরেজের সঙ্গী হতে শুরু করেছে। মেলামেশার সূত্রে এরা ইংরেজদের থিয়েটারে যেতে শুরু করে। অবশ্য এই থিয়েটারের চাকচিক্য, সাজসজ্জা, মঞ্চসজ্জা--বিলিতি থিয়েটারের অভিনব সব কৌশল এবং সর্বোপরি তাদের অদৃষ্টপূর্ব থিয়েটারি মঞ্চব্যবস্থা তাদের আকৃষ্ট করল।

অন্যদিকে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের ফলে (হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা : ১৮১৭) বাঙালিরা ইংরেজি লেখাপড়ার সঙ্গে ইংরেজি নাটকও পড়তে থাকে। এই নতুন নাট্যপ্রণালী তাদের উদ্বুদ্ধ করে। এরাই আবার সাহেবদের থিয়েটারে ইংরেজি নাটকের অভিনয় দেখা শুরু করে। ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন এবং অধ্যাপক উইলসনের ভূমিকা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। স্কুলকলেজে নাটকপাঠ এবং থিয়েটারে নাট্যাভিনয় দেখা--এই উভয় প্রণালীর মধ্য দিয়ে নব্যশিক্ষিত বাঙালি তরুণ ইংরেজি নাটক এবং বিদেশী থিয়েটার সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে। স্কুলকলেজে বিদেশী থিয়েটারের পরিচালকদের নির্দেশনায় বাঙালি ছাত্রেরা ইংরেজী নাটকের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে বিলিতি নাট্যানুশীলনে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে।

এইভাবে ধনী বাঙ্গালি এবং নব্যশিক্ষিত তরুণ বাঙালির মধ্যে বিদেশী রঙ্গালয়ের প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ক্রমে দেখা যাচ্ছে, শুধু দর্শক নয়, বাঙালি এইসব রঙ্গালয়ের সদস্য, পৃষ্ঠপোষক ও উপদেষ্টা হচ্ছেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর তো চৌরঙ্গী থিয়েটারের সদস্য-পৃষ্ঠপোষক থেকে একেবারে মালিক পর্যন্ত হয়েছিলেন। সাঁ সুসির

পৃষ্ঠপোষণায় ধনী বাঙালিরা অর্থ সাহায্য নিয়ে এগিয়ে এসে মঞ্চটিকে রক্ষা করেন। ক্রমে বাঙালি তরুণ বিদেশী রঙ্গালয়ে মূল অভিনেতা হিসেবে অংশগ্রহণ করছে। সাঁ সুসিতে 'ওথেলো' নাটকে বৈষ্ণবচরণ আঢ্য'র মূল ভূমিকায় অভিনয় অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে (প্রতিষ্ঠা : সেপ্টেম্বর, ১৮৫৩) বাঙালি তরুণেরা সাহেবদের দেখাদেখি টিকিট বিক্রি করে শেক্সপীয়রের বেশ কিছু নাটকের অভিনয় করে।

এইভাবে ধনী ও শিক্ষিত বাঙালির আগ্রহাতিশয্যে অভিজাত বাঙালির বাড়িতে বিলিতি থিয়েটার তৈরি করে নাটকাভিনয় শুরু হলো। এতদিন যেখানে বাঈনাচ, কবিগান, খেউড় এবং যাত্রা অভিনয় হতো, তার জায়গায় এসে গেল এক নতুন মডেল--বিদেশী থিয়েটার--এক অভিনব নতুন 'বিলিতি যাত্রা'।

এইভাবে সাহেবদের থিয়েটার বাঙালির আঙিনায় এসে গেল। শিক্ষিত তরুণের উৎসাহ ও ধনী বাঙালির আগ্রহে প্রাসাদে মঞ্চ তৈরি হলো। সাহেবদের থিয়েটার থেকে লোক আনিয়ে সাহেবদের মতো মঞ্চ ও তার ব্যবস্থাদি তৈরি করা হলো। পোষাক-পরিচ্ছদ, দৃশ্যসজ্জা, দৃশ্যপট অঙ্কন, আলোর ব্যবস্থা বিদেশী থিয়েটারের মতো করা হলো। অভিনয়রীতিও শিক্ষা করা হলো ঐ থিয়েটারের নটনটীদের মত করেই।

সাহেবদের মতো হয়ে ওঠার আগ্রহাতিশয্যে ওদের মতো রঙ্গালয় তৈরি হয়ে গেল তড়িঘড়ি, কিন্তু বাংলা ভাষায় অভিনয় উপযোগী নাটক ছিল না। সব দেশেই নাটক লেখা হয়েছে আগে, সেই নাটক অভিনয়ের প্রয়োজনে তৈরি হয়েছে মঞ্চ। বাঙালির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হয়েছে উল্টো। আগে এসেছে মঞ্চ—তার দাবীতে লেখা হয়েছে নাটক।

সাহেবদের মতো থিয়েটারে বাঙালির বাড়িতে প্রথমে ইংরেজী নাটকই অভিনীত হয়েছে। ক্রমে ইংরেজী ও সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ এবং শেষে প্রয়োজনের তাগিদে মৌলিক বাংলা নাটকের সৃষ্টি হয়েছে। পুরোপুরি বিদেশী থিয়েটারের প্রভাবে, সেখান থেকে দেখে শুনে বুঝে, কখনো না বুঝে এবং অনুসরণ করেই বাঙালির থিয়েটারের ইতিহাস শুরু হয়েছে। অষ্টাদশ শতকের ইংলন্ডের মঞ্চব্যবস্থা ও নাটক সাহেবরা এনে দিল কলকাতায়। এবার সেই হাত ঘুরে বাঙালির কাছে এসে গেল ইংলন্ডজাত বিদেশী থিয়েটার। কলকাতায় ধনী বাঙালির সখের নাট্যশালাগুলিতে তারই অনুবর্তন ছড়িয়ে পড়ল।

ধনী বাঙালির প্রাসাদমঞ্চ ছাড়িয়ে এরপরে যখন মধ্যবিত্ত বাঙালির চেষ্টায় সাধারণ রঙ্গালয়ের ধারা তৈরী হয়েছে তখনো কলকাতায় চালু বিদেশী রঙ্গালয়গুলি থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করা হয়েছে। স্টেজ নির্মাণকৌশল, দৃশ্যপট অঙ্কন, সাজসজ্জা, আলো, সিনসিনারি, অডিটোরিয়াম প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চের নানা বিষয় গৃহিত হয়েছে। গিরিশচন্দ্র মিসেস লুইসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন অনেকাংশেই। থিয়েটার রয়ালের আদর্শে ধর্মদাস সুর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার বাড়ি ও মঞ্চ তৈরী করেন। টিকিট বিক্রি এবং ব্যবসায়িক রঙ্গমঞ্চ পরিচালনার ধারণাটাও এসেছে এইসব বিদেশী থিয়েটার

থেকেই।

হিন্দু রাজত্বের পর থেকেই এদেশে নাট্যশালা ও অভিনয় লুপ্ত হয়। লোকনাট্যের মধ্যে অভিনয়ের ধারা বেঁচে ছিল। আধুনিক যুগে লোকনাট্য যাত্রা ইত্যাদি নিম্নরুচিতে আসক্ত হয়ে পড়ে। নতুন যুগের ইংরেজি শিক্ষিত মানুষজনের কাছে এইসব প্রমোদ উপকরণ অবহেলিত হয়। সেই সময়ে সাহেবদের থিয়েটারের প্রভাবে এদেশে ১৯ শতকে নতুন থিয়েটার গড়ে ওঠে। আধুনিক যুগে বাঙালির নাট্যচর্চার পেছনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিদেশী থিয়েটারের প্রভাব পড়েছে।

পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭) পর বাঙালির রাজনৈতিক দাসত্বের শুরু। ইংরেজ ক্রমে বাঙালিকে অর্থনৈতিক দাসত্বের বন্ধনে বেঁধে ফেলে। ক্রমে শিক্ষা-সংস্কৃতি-দর্শনের চিন্তাতেও ইংরেজি ভাবনৈতিক দাসত্বের বিস্তার শুরু হয়ে যায়। থিয়েটার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে প্রথমে নিজেদের প্রমোদ এবং ক্রমে বাঙালিকে আকৃষ্ট করে ব্যবসা ও সংস্কৃতির ভাব-দাসত্ব চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হতে থাকে। বাঙালিও নবজাগরণের ঐতিহাসিক ধাপ্পায় (Historical Hoax) নিজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বর্জন করে আমদানী করা সংস্কৃতিতে মশগুল হয়ে পড়ল। বাঙালির থিয়েটার এই বিদেশী থিয়েটারেরই প্রভাবজাত।

লেবেডেফ ও বেঙ্গলী থিয়েটার

প্রতিষ্ঠাতা : লেবেডেফ
উদ্বোধন : ২৭ নভেম্বর, ১৭৯৫
নাটক : কাল্পনিক সংবদল
(The Disguise)

স্থায়িত্বকাল : ২৭ নভেম্বর, ১৭৯৫--
২১ মার্চ, ১৭৯৬

ইংরেজি ধরনের নাট্যশালায় বাংলা নাটকের প্রথম অভিনয় অনুষ্ঠান হয় ১৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দে। এই অভিনয়ের আয়োজন যিনি করেন, তিনি জাতিতে বাঙালিও নন, ইংরেজিও নন ; তিনি রুশদেশীয় লেবেডেফ (১৭৪৯--১৫ জুলাই, ১৮১৭)। তৎকালীন রাশিয়ার ইউক্রেন অঞ্চলের অধিবাসী তিনি। তাঁর পুরো নাম Gerasim Stepanovich Lebedeff. লেবেডেফের নামের উচ্চারণ 'হেরাসিম' ও 'গেরাসিম'-- বাংলায় দু'রকম বানানেই দেখা যায়। লেবেডেফ-ও তাঁর নামের ইংরেজি বানানে কখনো Gerasim এবং কখনো Herasim লিখেছেন। আসল কথা, ইংরেজি 'H' রুশ ভাষায় 'G' দিয়েই উচ্চারণ করা হয়। রুশদেশবাসী লেবেডেফ এদেশে এসে ইংরেজিতে নিজের নাম লিখতে গিয়ে প্রাথমিক ভাষান্তরিতের দ্বিধা নিয়ে কখনো 'H' কখনো 'G' লিখে থাকতে পারেন। তবে Gerasim = Herasim হলেও, রুশীয় হিসেবে তাঁর নামের উচ্চারণ 'গেরাসিম' হওয়াই সঙ্গত। এবং ইংরেজি উচ্চারণ লেবেডেফ হলেও রুশীয় উচ্চারণ লিয়েবেদেফ্ হওয়াই সঙ্গত। যদিও তিনি নিজে বাংলায় লিখেছেন নিজের নাম লেবেডেফ।

ভাগ্যান্বেষী ও ভারতীয় ভাষা-সংস্কৃতি-দর্শন সম্পর্কে আগ্রহী লেবেডেফ ভারতে এসে প্রথমে মাদ্রাজে (১৭৮৫) বসবাস করেন, সেখানে তামিল ভাষা শেখেন। তারপরে কলকাতায় এসে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। ভারতীয় ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে অবহিত হন। বাংলা ভাষায় আগ্রহী হয়ে তিনি গোলকনাথ দাসকে ভাষা শিক্ষক রেখে বাংলা ভাষা ভালভাবে রপ্ত করেন। হিন্দি ভাষাও শিক্ষা করেন। কলকাতায় থাকাকালীন তিনি যন্ত্রশিল্পী হিসেবে সঙ্গীত শিক্ষা দিয়ে জীবিকা অর্জন করতেন। পিয়ানো ও ভায়োলিনবাদক হিসেবে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। কখনো কখনো তিনি নৃত্যগীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করেও অর্থোপার্জন করতেন।

তার ২৫ নম্বর ডোমটোলায়[১] (বর্তমান ৩৭-৩৯ নম্বর এজরা স্ট্রিট) তিনি

১. বর্তমান গবেষণায় জানা গেছে যে, জায়গাটির নাম ছিল ডোমটোলা, কলকাতা কর্পোরেশনের তখনকার ম্যাপ ও রেকর্ডে এই নামই লেখা রয়েছে। ইংরেজি উচ্চারণ ও বানানের প্রকোপে সবাই বাংলায় লিখেছেন ডোমতলা বা ডুমতলা। কলকাতার কোনো শ্রেণীবিশেষের অবস্থানের অঞ্চলকে টোলা বলা হত। যেমন কলুটোলা, শাঁখারিটোলা, বেনিয়াটোলা। সেই রকমই ডোমটোলা। ডোমতলা নয়।

জগন্নাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ের বাড়ি ভাড়া নিয়ে সেখানে নিজের উদ্যোগে একটি নাট্যশালা তৈরি করেন। নাম দেন 'দি বেঙ্গলী থিয়েটার' (The Bengally[২] Theatre)। তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই বেঙ্গলী থিয়েটারে লেবেডেফ 'The Disguise' নামে একটি ইংরেজি নাটকের বাংলা অনুবাদ অভিনয় করেন। প্রথম অভিনয় হয় শুক্রবার, ২৭ নভেম্বর, ১৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দে। ঐ একই নাটকের দ্বিতীয় অভিনয় হয় সোমবার, ২১ মার্চ, ১৭৯৬ খ্রিষ্টাব্দে। তৃতীয়বার অভিনয়ের জন্য তিনি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেন। কিন্তু তার মধ্যেই তাঁর রঙ্গমঞ্চটি আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। তাই The Disguise-এর বাংলা রূপান্তর 'কাল্পনিক সংবদল'—নাটকটিই এই থিয়েটারে দুইবার অভিনীত হয়। তাছাড়া অন্য কোনো নাটকের অভিনয় আর এখানে হয়নি।

লেবেডেফ যখন এই নাট্যাভিনয়ের চেষ্টা করেন, তখন সেই অষ্টাদশ শতকের শেষপ্রান্তে, কলকাতায় অবস্থানকারী ইংরেজরা নিজেদের প্রয়োজনে থিয়েটার তৈরি করে ইংরেজি নাটকের অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছে। সেখানে রঙ্গমঞ্চ ও তার ব্যবস্থাদি, নাটক-নাট্যকার, প্রয়োজক, পরিচালক, অভিনেতা, দর্শক সবই বিদেশী। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিককার এই সময়ে বিদেশী এই রঙ্গালয়গুলির সঙ্গে বাঙালির কোনো রকম যোগাযোগ ছিল না। লেবেডেফের নাট্য-প্রচেষ্টার সমসাময়িক এই রকম বিদেশী থিয়েটার একটি 'দি নিউ প্লে-হাউস' বা 'দি ক্যালকাটা থিয়েটার' অভিনয় করছে। কিন্তু ভালভাবে চলছে না। ফলে নাট্যশালার কর্তৃপক্ষেরা 'সাবস্‌ক্রিপসন পারফরমেন্স' চালু করেছেন। অর্থাৎ আগে থেকেই চাঁদা তুলে সদস্য-দর্শক নিশ্চিত করে রাখা। তাতেও নাট্যশালার দুরবস্থা কাটছে না। কলকাতায় তখন বিদেশীদের সংখ্যাও তো খুব বেশী ছিল না।

লেবেডেফ তাঁর রূপান্তরিত বাংলা নাটকটি এই ক্যালকাটা থিয়েটারেই অভিনয়ের জন্য আবেদন করেন। সেখান থেকে তাঁকে অপমানিত হয়ে ফিরতে হয়। তখন তিনি নিজেই উদ্যোগী হয়ে ক্যালকাটা থিয়েটারের কাছাকাছি অঞ্চলেই তাঁর 'বেঙ্গলী থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করেন।

এদিকে বাঙালি তখনো বিদেশী থিয়েটারে আসেনি। তারা তখনো যাত্রা-পাঁচালী-কবিগান-ঢপ-কীর্তন-কথকতা-তর্জা-ঝুমুরের আসরেই ভীড় জমাচ্ছে। বাঙালির নাট্যশালা বা বাংলা ভাষায় নাটকাভিনয় তখনো চালু হয়নি।

কিছু বাঙালি ধনী জমিদার ও বেনিয়া ইংরেজদের নাট্যশালায় উকিঝুঁকি দিতে শুরু করেছে। তাও নাট্যরসলাভে নয়, কৌতূহল মেটাতে। সাহেবদের সঙ্গে বসে সম্মানলাভের জন্য এবং প্রধানত স্ফূর্তির জন্য। আর বৃহত্তর যে বাঙালি যাত্রা-কবিগানের আসরে ভীড় জমাচ্ছে তাদের বিদেশী নাট্যশালায় গিয়ে নাটক দেখার যোগ্যতা কোন দিক দিয়েই নেই। ইংরেজি ভাষা এদের আয়ত্ত নয়, রঙ্গালয়গুলির উচ্চ দর্শনীমূল্য দেবার সামর্থ্য এদের নেই এবং সাহেব ভীতি—এদের রঙ্গালয় থেকে দূরে রেখেছে।

২. Bengali বানান সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনে তিন রকম দেখা যায়--Bengalee, Bengally, Bengallie.

পলাশীর যুদ্ধের পর তখনো পঞ্চাশ বছর কাটেনি। কলকাতা তখনো শহর হয়ে ওঠেনি, উঠছে ; এবং নতুন গঠিত শহরে বাঙালিরা ইংরেজদের ব্যবসায়ের সঙ্গে মিশে অর্থোপার্জন শুরু করেছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) পর বাংলায় কৃষিনির্ভর জনজীবন বিপর্যস্ত হতে শুরু করেছে। কলকাতায় কাঁচা পয়সার লোভে বাঙালির ভীড় বেড়েই চলেছে। নতুন সৃষ্ট কলকাতার এই বাঙালি জনসমাজ রুচি-সংস্কৃতি ইত্যাদিতে পুষ্ট ছিল না। এদের রুচির তাগিদেই কবিগানের আসর জাঁকিয়ে বসেছে। যাত্রাগানে কৃষ্ণলীলা আধ্যাত্মিক রস হারিয়ে নিম্নরুচির পর্যায়ে নেমে গেছে। নতুন 'বাবু' সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হতে চলেছে।

এই অবস্থায় লেবেডেফ নাট্যাভিনয়ের প্রচেষ্টা করলেন। ইংরেজি নাট্যশালার দুরবস্থা তিনি দেখেছিলেন। সেখান থেকে প্রত্যাখ্যাতও হয়েছিলেন। এবারে তাই তিনি যে নাট্যপ্রচেষ্টা করলেন, তার নাটক ইংরেজি নাটক নয়, আবার যাত্রাও নয়। ইংরেজরা নিজেদের প্রয়োজনেই ইংরেজি নাটক করত। বাঙালির কথা তাঁদের চিন্তায় ছিল না। লেবেডেফ ইংরেজ নন, তাই রাজার জাতের অহমিকা তাঁর ছিল না। এদেশের ভাষা শিখেছেন, এখানকার লোকেদের প্রতি আগ্রহী হয়েছেন এবং তার ওপর ভাগ্যান্বেষণের প্রয়োজনে তিনি বুঝেছিলেন, ইংরেজ ও বাঙালি এই মিশ্র দর্শকমণ্ডলীর মতো নাটক করলেই চলবে। নচেৎ ক্যালকাটা থিয়েটারের মতো দুরবস্থা হবে। নতুন আমদানীকৃত সাহেবদের রঙ্গশালার আকর্ষণ এবং সেখানে বাংলায় নাটক অভিনয়—নতুন সৃষ্ট বাবু সম্প্রদায় এবং হঠাৎ নবাব ধনী বাঙালির উৎসাহ বৃদ্ধি করেছিল। আবার ১৮ শতকের শেষ দিকে কলকাতায় বসবাসকারী প্রবাসী ভাগ্যতাড়িত ইংরেজ ও হঠাৎ বড়লোক বাঙালি সম্প্রদায়ের মানসিকতার মিল রয়েছে অনেক দিকে। সস্তা আমোদ-প্রমোদ উপভোগ, কৌতুকরস আস্বাদন, নাচগান বাজনা এবং সর্বোপরি থিয়েটারের নবসৃষ্ট আকর্ষণ।

গোলকনাথ দাস প্রমুখ পণ্ডিতদের কাছে এদেশীয় ভাষা শিক্ষা শেষে লেবেডেফ দুটি ইংরেজি নাটকের বাংলায় অনুবাদ করেন। যে নাটক দুটি বাছাই করলেন, সে দুটিই হাল্কা কৌতুকরস-উচ্ছল। একটি মলিয়ের-এর Love is the Best Doctor, অন্যটি The Disguise. রচয়িতা হলেন অষ্টাদশ শতকের অখ্যাত ইংরেজ নাট্যকার রিচার্ড-পল জড্রেল (১৭৪৫-১৮৩১)। নাটক দুটি অনুবাদের জন্য বাছাই করার কারণ জানিয়েছেন লেবেডেফ :

'I translated two English dramatic pieces, namely, The Disguise, and Love is the Best Doctor, into the Bengali language ; and having observed that the Indians preferred mimicry and drollery to plain grave solid sense ; however purely expressed–I therefore fixed on those plays, and which were most pleasantly filled up with a group of watchmen, chokeydars, savoyards, canera, thieves, ghoonia, lawyers, gumosta and amongst the rest a corps of petty

plunderers'. [A Grammer of the pure and Mixed East Indian Dialects, (1801), Introduction.][৩]

তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এদেশীয়রা গম্ভীর উপদেশাত্মক কথা যতো সুন্দর করেই বলা হোক না কেন, তা পছন্দ করে না। তারা পছন্দ করে অনুকরণ, হাসি-তামাশা। সেজন্যই তিনি ঐ সমস্ত চোর-চৌকিদার-গোমস্তা-উকিল-ঘুনিয়া প্রভৃতি চরিত্রে নাটকটির মজা ভরিয়ে দিলেন। যেসব ছিল না মূল নাটকে তার অনেক কিছুই তিনি তৈরী করে নিলেন।

দুটি নাটকের অনুবাদ করলেও, অভিনয় করলেন কিন্তু একটি নাটকের। The Disguise নাটকের বাংলা রূপান্তরের নাম দিলেন 'কাল্পনিক সংবদল'। এই একটি নাটকের দুবার অভিনয় হলো। দুটি নাটকের অভিনয়ের কোনো প্রমাণ নেই।

লেবেডেফ ইংরেজি ও রুশীয় রঙ্গশালার মিশ্রণে নিজের রঙ্গমঞ্চের পরিকল্পনা করলেন। নিজে নক্সা তৈরি করলেন। সেইমত মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ নির্মিত হলো। অভিনয়ের ব্যাপারে তাঁকে সব রকমের সাহায্য করলেন তাঁর ভাষা শিক্ষক গোলকনাথ দাস। তাঁরই সহায়তায় বাঙালি অভিনেতা-অভিনেত্রী জোগাড় করা হলো। দশ জন পুরুষ ও তিন জন মহিলা। গোলকনাথ দাস তখনকার ঝুমুরের দল থেকে অভিনেত্রীদের সংগ্রহ করে থাকতে পারেন। যেখান থেকেই এদের নেওয়া হোক, এরা কেউই ভদ্রসমাজের ছিল না। এর কিছু আগেই সাহেবদের থিয়েটারে (মিসেস ব্রিস্টোর থিয়েটার)—১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে মেয়েরা অভিনয় করতে শুরু করেছে।

এদের দিয়ে নাটক প্রস্তুত করে লেবেডেফ প্রথম বাংলা ভাষায় নাট্যাভিনয় করলেন। প্রথম রাত্রে অনূদিত নাটকটির 'হ্রস্বীকৃত একাঙ্করূপ' অভিনয় করেন। দ্বিতীয় রাত্রে তিন অঙ্কের পুরো অনুবাদটিই অভিনয় হয়। তাতে ১ম অঙ্ক বাংলায়, ২য় অঙ্কের ১ম দৃশ্য 'মুর' ভাষায়, ২য় দৃশ্য বাংলায়, ও ৩য় দৃশ্য হয় ইংরেজি ভাষায়। ৩য় অঙ্কের পুরোটিই বাংলাতে অভিনীত হয়। মুর ভাষা বলতে হিন্দুস্থানী ভাষা বোঝানো হয়েছে। তিন অঙ্কের নাটকটি আদ্যোপান্ত বাংলা ভাষায় কখনোই অভিনীত হয়নি। যদিও সে ইচ্ছা লেবেডেফের ছিল। ইংরেজি অংশ বাঙালিরা করেনি, সাহেবরা অভিনয় করেছিল, এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। এইভাবে মিশিয়ে নাটক করলেন যাতে বাঙালি ও ইংরেজ উভয় শ্রেণীর দর্শকই তাঁর রঙ্গালয়ে আসে। সাহেব দর্শকদের জন্য আগে থেকেই বাংলা নাটকের ইংরেজি বিবরণ বিলি করা হয়েছিল, যাতে নাটক বুঝতে অসুবিধা না হয়। উভয় শ্রেণীর দর্শকের কথা তাঁকে ভাবতে হয়েছিল, কেননা, তখন দর্শক কম এবং একসঙ্গে দুটো রঙ্গালয় কলকাতায় চলা প্রায় অসম্ভব।

৩. লেবেডেফকৃত ভাষাবিষয়ক গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশ পায় লন্ডনে, ২০ মে, ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে। পরে ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে মহাদেবপ্রসাদ সাহার সম্পাদনায় ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। এর Introduction অংশে লেবেডেফ তাঁর জীবনকথা প্রসঙ্গে নাট্যচর্চার কথা লিখেছেন।

লেবেডেফের থিয়েটারের দর্শনীমূল্য তাঁর সময়ের ক্যালকাটা থিয়েটারের তুলনায় কম ছিল। যদিও তা সাধারণ বাঙালির কাছে খুবই বেশি। প্রথম রজনীতে প্রবেশমূল্য ছিল :

বক্স--আট সিক্কা টাকা। গ্যালারি--চার সিক্কা টাকা।

দ্বিতীয় অভিনয়ে সব আসনের প্রতিটিই সদস্য-দর্শক হিসেবে একমোহর ধার্য হয়েছিল। সে তুলনায় ক্যালকাটা থিয়েটারের প্রবেশমূল্য ছিল--

নীচের বক্স--ষোল সিক্কা টাকা। ওপর তলার বক্স--বারো সিক্কা টাকা। গ্যালারি আট সিক্কা টাকা।

লেবেডেফের প্রচেষ্টায় চারটি সুমহান পরিকল্পনা বাঙালির নাট্যঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল--

১. নাট্যশালার নাম দিলেন বেঙ্গলী থিয়েটার।
২. বিজ্ঞাপন দিলেন--'decorated in the Bengali Style' বলে। অনেকে এই 'Bengali Style'-কে বিজ্ঞাপনের চমক ছাড়া আর কিছু নয় বলে মনে করেছেন। তবে অনেকে মনে করেন, 'Bengali Style'--মানে মঞ্চের বাইরেটা আল্পনা, মঙ্গল কলস, কলাগাছ দিয়ে সাজানো হয়েছিল এবং দৃশ্যপট বাংলাদেশের পরিবেশ অনুযায়ী সজ্জিত হয়েছিল। পরবর্তীকালেও ইংরেজি রঙ্গালয়ের মডেলে তৈরি বাঙালির নাট্যশালাতেও বাঙালিয়ানার বহিরঙ্গ মিশেল দেখতে পাওয়া যায়।
৩. বাঙালি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দিয়ে অভিনয় করালেন।
৪. মূলত অভিনয় হল বাংলা ভাষাতেই।

লেবেডেফ এই সময়কার বাঙালি ও ইংরেজ উভয় সম্প্রদায়ের জনচরিত্রকে জানতেন বলেই, তিনি ভাবসমুন্নত প্রেমের উচ্চ আদর্শের কমেডি বা বিষাদের মোহাচ্ছন্ন গভীর ট্রাজেডি নাটক নির্বাচন না করে 'কমেডিয়া ডেল আর্ট'-এর ধরনে হাল্কা প্রণয়ের, রঙ্গের, স্থূল দেহপ্রেমের, সস্তা কৌতূহলের নাটকটি গ্রহণ করেছিলেন। অষ্টাদশ শতকের ইংরেজি কমেডির এই বিষয় ঐ শতকেরই প্রান্তসীমায় বাংলাদেশের জনরুচিতে আদরণীয় হয়েছিল। প্রেমের ভুল বোঝাবুঝি, অভিমান, চরিত্রের নিজস্ব পরিচয় গোপন রেখে জটিলতা, পরিণামে রহস্য উন্মোচন, এবং মধুরেন সমাপয়েৎ--অতি সস্তা এই কমেডি ধরনের নাটক The Disguise। লেবেডেফ পূর্ণাঙ্গ নাটকটি তিন অঙ্ক দৃশ্যসম্বলিত সংক্ষিপ্ত রূপ দেন। মুল ইংরেজি রচনার পাশাপাশি রাশিয়ান ও বাংলা উভয় অনুবাদ সম্বলিত নাট্যরূপটি পাওয়া যায়।[৪]

---

৪. The Disguise-এর বাংলা রূপান্তর 'কাল্পনিক সংবদল' মদনমোহন গোস্বামীর সম্পাদনায়, ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

মূল নাটকে যা কমতি ছিল, লেবেডেফ তা অনুবাদে যোগ করলেন। অনুবাদে মূলের যথাযথ অনুসরণ নেই, অনেকক্ষেত্রে নতুন কিছু তৈরি করে নিলেন। পাত্রপাত্রীদের নামকরণ করলেন বাংলায়। যেমন--

Lews হল ভোলানাথ, Clara হল সুখময়ী, Bernardo--রামসন্তোষ, ইত্যাদি। স্থাননাম Seville ও Madrid পরিবর্তিত হয়েছে কলকাতা ও লক্ষ্ণৌতে। মূলে নেই এমন অনেক বাড়তি চরিত্রের কথা তো আগেই বলেছি।

মূল নাটকে Musician-দের উল্লেখ রয়েছে। লেবেডেফ তার ওপরে বাড়তি নৃত্যগীতের সংযোজন করলেন। গাইয়্যা, বাজিয়্যা, নাচিয়্যা চরিত্রগুলি এই কারণে সৃষ্টি করলেন। পুরুষকান, মায়্যাকান ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে। গান যাদের ব্যবসা সেই সময়ে তাদের 'কান' (কিন্নর > কান) বলত। যেমন প্রসিদ্ধ সঙ্গীত ব্যবসায়ী মধুকান। সঙ্গীতে লেবেডেফের উৎসাহ ছিল, ভাগ্যান্বেষণে কলকাতায় এসে তিনি সঙ্গীত শিক্ষক হিসেবেই জীবিকা নির্বাহ করতেন। নাটকেও তিনি দেশী ও বিদেশী যন্ত্রসঙ্গীতের ব্যবহার করলেন। এবং ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে লোকান্তরিত কবি ভারতচন্দ্র তখনো ভীষণ জনপ্রিয়। লেবেডেফ কবি ভারতচন্দ্রের কাব্যের প্রতি এতই আকৃষ্ট হন যে, তিনি 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের রুশ ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। সেই ভারতচন্দ্রের দুটি গান তিনি তাঁর নাটকে যোজনা করলেন--

প্রথমটি, 'প্রাণ কেমন রে করে না দেখে তাহারে
যে করে আমার প্রাণ কহিব কাহারে।'

দ্বিতীয়টি, 'গুণসাগরে নাগর রায়
নগর দেখিয়া যায়'

একক সঙ্গীত ও মিলিত সঙ্গীত ব্যবহার করা হয়েছিল। নাটকে উল্লেখ আছে 'আরম্ভ করিল নাচিতে' কিংবা 'দুই মায়্যাকান গানবাদ্দী করে'। এক এক অঙ্কের বিরতিতে গান ও যন্ত্রসঙ্গীত দেওয়া হয়েছিল।

অভিনয়কে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য চরিত্রদের পোষাক ও মুখোস ব্যবহার করা হয়। বাবুর সাজসজ্জা, তোগা, পাখনা দেওয়া টুপি, ছড়ি ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া দৃশ্যসজ্জার বিবরণও নাটকটিতে রয়েছে।

প্রথমবারের অভিনয়ে নাট্যশালায় দর্শকসংখ্যা ছিল দু'শো। প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ হয়ে যায়। উৎসাহিত লেবেডেফ দ্বিতীয়বারের অভিনয়ে আসনসংখ্যা বাড়িয়ে তিনশো করেন এবং সদস্য-দর্শনী মূল্য করেন এক মোহর। তাতেও প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ হয়ে যায়। কৃতজ্ঞ লেবেডেফ সংবাদপত্র মাধ্যমে দর্শকদের অভিনন্দন জানান, এবং তৃতীয় অভিনয়ের উদ্যোগ আয়োজন করতে থাকেন।

কিন্তু তাঁর এই সাফল্যে তৎকালীন ইংরেজদের 'ক্যালকাটা থিয়েটার' কর্তৃপক্ষ খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন। ইংরেজ ও বাঙালি দুই ধরনের দর্শক আকর্ষণ করে, অভিনয়ে বাঙালি মেয়েদের নামিয়ে এবং নাটক মজা-ফূর্তিতে ভরিয়ে দিয়ে লেবেডেফ মাৎ করে

দিয়েছিলেন। ঈর্ষান্বিত ক্যালকাটা থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের পক্ষে বিজাতীয় রুশবাসীকে সহ্য করা সম্ভব হয়নি। লেবেডেফের প্রতিদ্বন্দ্বী ক্যালকাটা থিয়েটারের টমাস রোওয়ার্থ-এর নির্দেশে দৃশ্যপটশিল্পী ও বাজনাদার জোসেফ ব্যাটল লেবেডেফের হিতৈষী সেজে বেঙ্গলী থিয়েটারে যোগ দেন এবং ক্রমে লোক ভাঙিয়ে লেবেডেফকে দুর্বল করে দেন। অনেকেই এই চক্রান্তে যোগ দেন। প্রথমে অভিনেতা অভিনেত্রীরা চক্রান্তের শিকার হয়ে লেবেডেফের সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করে চলে যায়। লেবেডেফ পরে ব্যাপারটি বুঝতে পারেন। চলে যাওয়া নটনটীদের বিরুদ্ধে কোম্পানীর আদালতে অভিযোগ করেন। কিন্তু সেখানেও চক্রান্তের শিকার হলেন। কোনো ইংরেজ ব্যবহারজীবী তাঁর পক্ষে মামলা চালাতে রাজি হলেন না। তবুও তিনি অভিনয় চালাবার জন্য নবোদ্যমে অভিনেতা অভিনেত্রী জোগাড় করে অভিনয়ের ব্যবস্থা করার মুখে ইংরেজ থিয়েটার ব্যবসায়িদের চক্রান্তে তার বেঙ্গলী থিয়েটার ভস্মীভূত হয়ে যায় (মে, ১৭৯৭)। আর্থিক দিক দিয়ে প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। তবুও তিনি এরপরে মঞ্চ সংস্কার করে 'The Deserter' নামে একটা অপেরা মঞ্চস্থ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাও ব্যর্থ হলো। তখন মঞ্চের সব উপকরণ বিক্রি করে দিয়ে একেবারে নিঃস্ব ও ভগ্নোদ্যম হয়ে নাটকাভিনয়ের চেষ্টা ছেড়ে দিলেন। আশাহত লেবেডেফ ভারতবর্ষ ছেড়ে ইংলন্ড চলে যান, সেখান থেকে নিজদেশ রাশিয়ায় ফিরে যান, সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়, ১৫ই জুলাই, ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে।

লেবেডেফের নাট্যপ্রচেষ্টার ব্যর্থতা ও সার্থকতা সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

উনিশ শতকে বাঙালির নবজাগ্রত নাট্যবোধ গড়ে ওঠার অনেক আগেই রুশদেশবাসী লেবেডেফ নাট্যশালা তৈরি করে বাংলায় নাটকাভিনয় করেন। তাঁর নাটকের ভাষার দুরূহতা, দুর্বোধ্যতা ও আড়ষ্টতা কোনো দর্শকের পক্ষেই সহজবোধ্য ছিল না। সাধারণ বাঙালি দর্শকের উপভোগের বিষয়ও হতে পারেনি। তারা সে নাট্যাভিনয় দেখেওনি। অনেক সমালোচক তাই লেবেডেফের এই নাট্যপ্রচেষ্টাকে পরবর্তী বাঙালির নাট্যপ্রচেষ্টার সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারেননি। পরবর্তী বাঙালির উৎসাহ ও রুচির সঙ্গে এর যোগ ছিল না বলেও কেউ কেউ মনে করেছেন। রঙ্গমঞ্চে লেবেডেফ বাংলা নাটকের শুধু অভিনয়ই করেছেন, নাট্যবোধ কিংবা উৎসাহ তিনি বাঙালির মধ্যে জাগাতে পারেননি বলেও অনেকে মনে করেছেন।

ঘটনাগতভাবে একথা ঠিক যে, লেবেডেফের 'বেঙ্গলী থিয়েটার' কোনো ব্যাপক নাট্য আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। লেবেডেফ এককভাবে চেষ্টা করেছিলেন মাত্র। ১৮ শতকের একেবারে অন্তিম লগ্নে তাঁর এই প্রচেষ্টা ১৯ শতকের নবোদ্ভাবিত বাঙালির নবজাগরণের প্রাণচাঞ্চল্যে কোনো সাড়া ফেলতে পারেনি। তার কয়েকটি কারণ বলা যেতে পারে :

১. লেবেডেফের 'বেঙ্গলী থিয়েটার' একেবারেই ক্ষণস্থায়ী থিয়েটার। এখানে মাত্র একটি নাটকের দুইবার অভিনয় হয়। তারপর ধারাবাহিকতার পথ বেয়ে

লেবেডেফ-এর মতো অন্য কারো প্রচেষ্টা দেখা যায় নি। ধারাবাহিকতার ঐতিহ্য সৃষ্টি হয় নি।

২. লেবেডেফের থিয়েটারের প্রবেশ মূল্য সাধারণ বাঙালির ক্ষমতাতিরিক্ত ছিল।

৩. লেবেডেফের সময়ে ইংরেজি শিক্ষা সেভাবে এদেশে চালু হয় নি। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা (১৮১৭), সেকালের ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের নীতি (১৮৩৫) এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা (১৮৫৭) অনেক পরের ঘটনা। ইংরেজি নব্যশিক্ষিত বাঙালির তখনো আবির্ভাব হয় নি।

৪. ১৮ শতকের শেষপ্রান্তে বাংলায় মধ্যবিত্ত বাঙালির উদ্ভব হয় নি। যে কোনো সংস্কৃতির মতোই নাট্য সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে মধ্যবিত্তের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। পরবর্তী বাঙালির থিয়েটারের ক্রমবিকাশে নবোদ্ভূত বাঙালি মধ্যবিত্তের ভূমিকা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

৫. তাছাড়া, বণিক ইংরেজের চক্রান্তের কৌশল তো ছিলই ; যাতে লেবেডেফ পূর্ণাঙ্গ কাজ করতে পারেন নি বা তাকে করতে দেওয়া হয় নি। বেনিয়া ইংরেজ ভিনদেশি লেবেডেফের নাট্যাভিনয়ের ব্যবসায়িক সাফল্যকে ঈর্ষার চোখে দেখেছিল। তাঁর বেঙ্গলী থিয়েটার আগুন লেগে পুড়ে যাওয়া নিশ্চয়ই কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনা মাত্র নয়। এই ধরনের উদ্যমের এই ধরনের মর্মান্তিক পরিণতি পরবর্তী উৎসাহী ব্যক্তিদের স্বাভাবিকভাবেই ভীতসন্ত্রস্ত ও নিরুদ্যম করে দিতে পারে।

এইসব কারণেই, বোধকরি, তাঁর থিয়েটার পরবর্তীকালে বাংলা নাট্যশালা ও নাট্যাভিনয়ের ধারাবাহিকতা থেকে বিযুক্ত হয়ে পড়েছিল।

ইংরেজি নাট্যশালার আদলে রঙ্গমঞ্চ গড়ে ইংরেজি নাটকের মতো নাটক করার প্রথম সূত্রপাত বাঙালিদের মধ্যে দেখা গেল, এর পঁয়ত্রিশ বছর পরে, ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাড়িতে হিন্দু থিয়েটার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। সেখানে হয়েছিল ইংরেজি ভাষায় নাটক বাঙালিদের দ্বারা। তারপর নবীন বসুর বাড়িতে, ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে বাঙালি অভিনেতা-অভিনেত্রী দিয়ে বাংলা নাটকের অভিনয়। এইভাবে কলকাতায় ১৯ শতকের তিরিশের দশকে এসে বাঙালির প্রাসাদমঞ্চে বাংলা নাট্যাভিনয়ের সূত্রপাত হলো ; ধনী বাঙালির অর্থানুকুল্যে ও উৎসাহে এবং ইংরেজি শিক্ষিত নব্যতরুণদলের উদ্যমে ও আগ্রহাতিশয্যে।

বাঙালির এই অভিনয় প্রচেষ্টা লেবেডেফ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে নয়। সমসাময়িককালের চৌরঙ্গী ও সাঁ সুসি প্রভৃতি ইংরেজদের থিয়েটারের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত থেকে, তাদের অভিনয় দেখে, স্কুলকলেজে ইংরেজি নাটক পড়ে, ইংরেজি নাটকে অভিনয় করে, তারা বিলিতি থিয়েটারের মতো নিজেদের থিয়েটার করতে উদ্বুদ্ধ হলো।

তাহলে লেবেডেফের থিয়েটারের কোনো ঐতিহাসিক মূল্য বা প্রভাব কি পরবর্তী বাঙালির নাট্যপ্রচেষ্টার মধ্যে একেবারেই থাকছে না?

একথা ঠিক, লেবেডেফের সময়ে বাংলা সংবাদপত্র ছিল না, ইংরেজি পত্রিকা ছিল। লেবেডেফকে তাই শুধু ইংরেজি সংবাদপত্রেই বিজ্ঞাপন দিতে হয়েছিল। বাংলা সংবাদপত্র থাকলে তিনি নিশ্চয়ই বাংলা ও ইংরেজি দুটি কাগজেই তাঁর নাট্যাভিনয়ের বিজ্ঞাপন দিতেন, তাঁর দুই ধরনের দর্শকের জন্যই। লেবেডেফের পরে পরে বাঙালির কোনো নাট্যপ্রচেষ্টা হয়েছে কিনা তার কোনো লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় না, ঐ বাংলা পত্রিকার অভাবে। ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র 'দিগদর্শন' প্রকাশ পায়। ঐ বছরেই মে মাসে সাপ্তাহিক বাংলাপত্র 'সমাচারদর্পণ' প্রকাশিত হয়।

১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে অভিনীত 'কলিরাজার যাত্রা' এবং ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত 'কামরূপ কামলতা যাত্রা'—দুটিকে অনেকে নতুন ধরনের যাত্রা বা 'নাটকের অনুরূপ যাত্রা' বলে মনে করেছেন। লেবেডেফ বাংলায় যে নাট্যাভিনয়ের সূত্রপাত করেন, এগুলিতে তারই অনুসরণ ঘটেছে বলে মনে করা যেতে পারে।

লেবেডেফের নাট্যানুষ্ঠানের যে কৃতিত্ব পরবর্তী বাংলা নাট্যাভিনয়ের ধারায় গ্রহণ করা যেতে পারে সেগুলি সূত্রাকারে উল্লেখ করলে এই রকম দাঁড়ায় :

এক. লেবেডেফের 'বেঙ্গলী থিয়েটার' প্রথম বঙ্গীয় নাট্যশালা। ইংরেজ ও রুশ থিয়েটারের মিশ্রণে এই রঙ্গালয় গঠিত হয়েছিল। তিনি বঙ্গীয় নাট্যশালার জনক।

দুই. নতুন থিয়েটারে 'অধিকাংশ বাংলায় লিখিত' নাটকের প্রথম অভিনয়। উৎকৃষ্ট না হলেও প্রথম। ইতিহাসগত দিক দিয়ে তা অবশ্য স্মরণীয়।

তিন. সব বাঙালি অভিনেতা-অভিনেত্রী দিয়ে নাট্যাভিনয়।

চার. বাঙালির নাট্যাভিনয়ে প্রথম নারী ভূমিকায় অভিনেত্রীদের আবির্ভাব। সমসাময়িক ও পরবর্তী বাঙালির যাত্রাভিনয়গুলিতে অভিনেত্রী নেওয়ার পেছনে নিঃসন্দেহে লেবেডেফ প্রভাব বিস্তার করেছেন। ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে নবীন বসুর 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকাভিনয়ে অভিনেত্রী গ্রহণ, সেই প্রভাবের সূত্রেই এসেছে, এমন মনে করা যেতে পারে। লেবেডেফ ইংরেজের চক্রান্তে ব্যর্থ মনোরথ না হলে, বোধকরি, ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দের অনেক আগেই বাংলা থিয়েটারে অভিনেত্রীরা ধারাবাহিকভাবে এসে যেতেন।

পাঁচ. বেঙ্গলী থিয়েটারে অভিনয় হয়েছিল বিদেশী রঙ্গমঞ্চের মডেলে। তৎকাল প্রচলিত বাঙালির যাত্রার অনুসরণে নয়।

ছয়. এর আগে যাত্রায় প্রবেশ প্রস্থান ছিল না, অঙ্কবিভাগ থাকলেও দৃশ্যভাগ ছিল না এবং রঙ্গমঞ্চের অন্য কোনো বিধি ব্যবস্থা ছিল না। লেবেডেফের বাংলা নাটকে ইংরেজি ধরনের প্রবেশ প্রস্থান, মঞ্চ ও দৃশ্যবিভাগ এবং মঞ্চের নির্দেশ ছিল। লেবেডেফের নাটকেই বিদেশী রীতির প্রথম অনুবর্তন লক্ষ্য করা গেল।

সাত. এই থিয়েটারের ফলে বাঙালি জানতে পারল যে, যাত্রা জগতের বাইরেও অন্য ধরনের প্রমোদ-ব্যবস্থা থাকতে পারে।

আট. তাঁর প্রহসন বাংলা প্রহসনের রচনায় প্রেরণাস্থল হিসেবে গণ্য হতে পারে।

নয়. তৎকালে প্রচলিত যাত্রা ও কবিগানের বিষয়বস্তু ছিল পৌরাণিক দেবমাহাত্ম্য বিষয়ক। লেবেডেফ সামাজিক ব্যঙ্গ-প্রহসনের নাটক বাংলায় প্রথম অভিনয় করেন। তার পরবর্তী যাত্রাগুলিতে অনেকসময় পৌরাণিক বিষয় ছেড়ে সামাজিক ব্যঙ্গ গৃহিত হয়েছে। কলিরাজার যাত্রা উল্লেখযোগ্য।

দশ. সর্বোপরি, শুধু শাসক ইংরেজের নিজেদেরই থিয়েটার হতে পারে, বাঙালির হতে পারে না—এই হীনতাবোধ থেকে তিনি বাঙালি নাট্যরসিকদের মুক্তি দিয়েছেন।

বাংলা নাট্যশালা ও নাটকাভিনয়ের আলোচনায় আমাদের সর্বপ্রথমেই এই রুশদেশবাসী নাট্যব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই হবে।

সখের নাট্যশালা (১৮৩১–১৮৭২)

উনিশ শতকের ত্রিশের দশক থেকেই ধনী ও অভিজাত বাঙালির প্রাসাদে বিদেশী থিয়েটারের মডেলে মঞ্চ বেঁধে নাট্যাভিনয়ের প্রচলন হয়। কলকাতার সাহেবদের থিয়েটারে অভিনয় দেখে ইংরেজদের থিয়েটারের প্রতি আকৃষ্ট হয় বাঙালিরা। তাছাড়া স্কুল কলেজে ইংরেজি নাটক পাঠ করে, প্রয়োজনে ইংরেজি নাটকের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে এবং অভিনয় দেখে নব্যশিক্ষিত তরুণ বাঙালিরাও বিলিতি থিয়েটার ও নাটকের প্রতি মনোযোগ দেয়।

হিন্দু রাজত্বের কালে সঙ্গীতশালা ও প্রেক্ষাগৃহ ছিল। তাতে নাচগান ও সংস্কৃত নাটকের অভিনয় হতো। হিন্দুরাজত্বের অবসানে সেই ধারা অবলুপ্ত হয়। মধ্যযুগে মুসলমানী রাজত্বে এদেশে নাট্যশালার অবলুপ্তি ঘটে। তবে অভিনয়ধারা অন্য খাতে লোকাভিনয় যাত্রা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ছিল। ইংরেজ শাসনের কালে সাহেবদের নিজস্ব থিয়েটার এদেশে চালু হয়। সেখান থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে এদেশে পুনরায় প্রেক্ষাগৃহ ও রঙ্গমঞ্চের প্রবর্তন হলো।

এদেশে প্রচলিত লোকনাট্য যাত্রা থেকে নয়, বিদেশী থিয়েটার থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে বাঙালি রঙ্গালয় নির্মাণ এবং থিয়েটারি অভিনয়ে উৎসাহিত হয়। বিশেষ করে কলকাতার অভিজাত ধনী বাঙালিরাই অগ্রণী ভূমিকা নেয়। ধনী সমাজের অনেকেই বিদেশী রঙ্গালয়গুলির সঙ্গে সদস্য, পৃষ্ঠপোষক, অর্থদাতা, পরিচালক এবং মালিক ও অভিনেতারূপে যুক্ত হয়েছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর, মতিলাল শীল, রমানাথ ঠাকুর, রসময় দত্ত, প্রতাপচন্দ্র সিংহ চৌরঙ্গী, সাঁ সুসি প্রভৃতি থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

ইংরেজি নাটক পড়ে, থিয়েটারে অভিনয় দেখে বাঙালিরা যেমন নতুন থিয়েটারের প্রতি উৎসাহ বোধ করল, তেমনি তৎকালে প্রচলিত যাত্রার বিকৃত রূপ দেখে বিরক্তবোধও করেছিল। স্বভাবতই এই থিয়েটার প্রথম দিকে তার নতুনত্ব, জাঁকজমক ও অভিনবত্বের কারণে বাঙালির আগ্রহের সঞ্চার করেছিল। থিয়েটারে অভিনয় করার খরচ অনেক। প্রচলিত যাত্রার তুলনায় তো বটেই। মঞ্চনির্মাণ থেকে শুরু করে প্রযোজনার সব ব্যবস্থা করা ব্যয়সাপেক্ষ। ধনী বাঙালির অর্থ, লোকবল, মঞ্চনির্মাণ ও দর্শকাসনের উপযোগী স্থান, বহু মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ এবং সর্বোপরি যথেষ্ট অর্থব্যয়ের ক্ষমতা ও মানসিকতা ছিল। নতুন ধরনের এই প্রমোদ ব্যবস্থার প্রদর্শনের মাধ্যমে ধনী বাঙালিরা—

প্রথমত. তাঁদের ঠাঁট-বাট-জাঁকজমক দেখাবার সুযোগ পেলেন।

দ্বিতীয়ত. নব্যভাবনার শরিক হয়ে নব্য রসাস্বাদনের ব্যবস্থা করে তাঁদের উন্নত রুচি ও মানসিকতার পরিচয় দিলেন।

তৃতীয়ত. এই থিয়েটার করে অর্থোপার্জন নয়, অন্য প্রমোদের মতোই অর্থব্যয় করলেন বেশি।

চতুর্থত. পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজের অবস্থানকে উঁচুতে তুলে ধরার মানসিকতার আরেকটি নতুন উপকরণ খুঁজে পেলেন।

পঞ্চমত. এই নাট্যানুষ্ঠানে উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজকর্মচারী ও প্রতিষ্ঠিত সাহেবদের ডেকে এনে প্রচুর অর্থব্যয়ে আপ্যায়ন করে তাদের ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।

ষষ্ঠত. সাহেবদের মতো তাঁরাও থিয়েটার করতে পারেন এটা বুঝিয়ে সাহেবদের মতো হয়ে জাতে ওঠবার চেষ্টা করেছিলেন।

সপ্তমত. এইসব কিছুর ওপরেও কেউ কেউ নাটক ও অভিনয়ের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ দেখিয়েছিলেন। শিক্ষিত নব্য তরুণ বাঙালির সাহায্য ও সাহচর্য তারা এই কারণেই লাভ করতে পেরেছিলেন। ফলে, বাঙালির নিজস্ব থিয়েটার প্রতিষ্ঠার প্রতি উদ্যমী হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

ধনীদের প্রাসাদ-মঞ্চে থিয়েটারের গতি নিয়ন্ত্রিত ও নাটকের বিষয় নির্বাচিত হচ্ছে পৃষ্ঠপোষক ব্যক্তিটির বা তাঁর অনুগামীদের দ্বারা। তাদের খুশিমত নাটক হচ্ছে। অভিনয়ের সব ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়নি। ধনী ব্যক্তির ব্যক্তিগত খেয়াল খুশিমত এর অভিনয় হয়েছে। নাট্যমঞ্চ থাকা-না-থাকা, কিংবা ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপরে নাট্যাভিনয় নির্ভর করেছে। ফলে কোনো প্রাসাদ-মঞ্চই ধারাবাহিক নাট্যাভিনয়ের ঐতিহ্য গড়ে তুলতে পারেনি। এগুলি পারস্পরিক সম্পর্কবিহীন ও যোগসূত্রহীনভাবে কিছুদিন অভিনয়ের বন্দোবস্ত করেছে। যে কোন কারণেই তাঁর ইচ্ছা বা উদ্যম নষ্ট হলে বা এদের কারো মৃত্যু হলে, কিংবা কার্যোপলক্ষে কলকাতার বাইরে থাকলে অভিনয় বন্ধ হয়ে গেছে। মোট কথা, ধনী বাঙালির শখ-শৌখিনতার মধ্যেই এগুলির অভিনয় সম্ভব হয়েছে। থিয়েটারের প্রতি একান্ত দায়বদ্ধতা এখানে গড়ে ওঠেনি। ধনী বাঙালির বাড়িতে ইংরেজি থিয়েটারের অনুকরণে নাট্যাভিনয়ের পেছনে যতটা না ছিল নাট্যকলার উন্নতির প্রয়াস, তার চেয়ে বেশি ছিল ইংরেজের সংস্পর্শে এসে ধনী হয়ে ওঠা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফসল জমিদার, মধ্যস্বত্বভোগী, মুৎসুদ্দি, ফোঁড়ে ও বেনিয়াদের আলোকপ্রাপ্ত সংখ্যালঘু অংশের প্রগতিশীল শৌখিনতা। ধনী বাঙালির অন্য পশ্চাদপদ বৃহদংশ তখনো বাঈনাচ, বুলবুলির লড়াই কিংবা যাত্রা-খেউড় গানে মশগুল থেকেছে।

স্বভাবতই, অনেক সমালোচক তাই এই ধরনের প্রাসাদ-মঞ্চের অভিনয়গুলিকে 'সখের নাট্যশালার অভিনয়' নামে উল্লেখ করেছেন।

বিদেশী রঙ্গালয়ের অভিনয় দেখে বাঙালির নিজস্ব রঙ্গালয়ে নিজেদের অভিনয়ের প্রয়োজনীয়তা অনেকেই অনুভব করেছিলেন। 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকায় ১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দে

এই ধরনের নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনের কথা সম্পাদকীয় মন্তব্যে প্রকাশ পায়।[১] তার পাঁচ বছরের মধ্যেই শুরু হলো ধনী বাঙালির আঙিনায় মঞ্চ তৈরি করে সখের নাট্যশালার অভিনয়।

এক. প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত হিন্দু থিয়েটার

বাঙালির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালা। প্রতিষ্ঠাতা প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁর নারকেলডাঙ্গার বাড়িতে রঙ্গালয়টি তৈরি করেন। থিয়েটারের পরিচালন কর্মসমিতিতে ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত, গঙ্গানারায়ণ সেন, মাধব মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রমুখ ধনী অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত বাঙালিরা। সমাচার দর্পণ (১৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৩১) পত্রিকা থেকে জানা যায় যে, 'ঐ নর্তনশালা ইংলণ্ডীয়দের রীত্যানুসারে প্রস্তুত হইবেক এবং তন্মধ্যে যে সকল নাটকের ক্রীড়া হইবে সকলি ইংলণ্ডীয় ভাষায়।'

১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে এই নাট্যশালাটি প্রস্তুত হয়। প্রথম নাটক অভিনীত হয় ভবভূতির 'উত্তরারামচরিত' সংস্কৃত নাটকের ইংরেজি অনুবাদ। অনুবাদ করেন সংস্কৃতজ্ঞ ইংরেজ পণ্ডিত এইচ. এইচ. উইলসন। একই রাত্রে এই নাটকের সঙ্গে অভিনীত হয় শেক্সপীয়রের 'জুলিয়াস সীজার' নাটকের পঞ্চম অঙ্কটি, মূল ইংরেজিতেই। অভিনয়ের তারিখ ১৪ ডিসেম্বর, ১৮৩১। উইলসন শুধু নাট্যানুবাদ করেননি, তিনি এই নাট্যশালার উদ্যোক্তাদের মধ্যে একজন ছিলেন এবং নিজে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি অভিনয়ের নাট্যশিক্ষকও ছিলেন। মনে রাখতে হবে, সাহেবদের চৌরঙ্গী থিয়েটারের তিনি উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং নব্য তরুণ বাঙালির শিক্ষক ছিলেন।

এখানে আরেকটি নাটকের অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায়। সেটিও ইংরেজি ভাষাতেই অভিনয় হয়েছিল। প্রহসন নাটকটির নাম 'নাথিং সুপারফ্লুয়াস'। অভিনয়ের তারিখ ২৯ মার্চ, ১৮৩২। অভিনয়ে দৃশ্যপটাদি রুচিসম্মত এবং পাত্রপাত্রীদের সাজসজ্জা ও বেশভূষা চমৎকার হয়েছিল। 'নাথিং সুপারফ্লুয়াস' নাটকের প্রধান চরিত্র সুলতান, সালিন গফর, সাদি ও সুন্দরী গুলনেয়ার। গুলনেয়ারের অভিনয় খুব ভালো হয়েছিল। কোনো পুরুষ অভিনেতা এই চরিত্রে পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন এবং স্ত্রীচরিত্রের ধারণা ও ভাব খুব রুচিসম্মতভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। সেই অভিনেতার নাম জানা যায় নি।

বহু সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় ও দেশীয় ভদ্রলোক নাট্যানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। 'উত্তররামচরিত'কে তৎকাল প্রচলিত 'রামযাত্রা' মনে করে দর্শকের মধ্যে কোলাহল হয়েছিল। এই খবর দিয়ে 'সমাচার দর্পণ' লিখেছিল যে, বড়লোকদের এই নাটকাভিনয়

১. এশিয়াটিক জার্নালে (Vol-XIV, July-Dec, 1826) এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। বলা হয় ধনী ব্যক্তিবর্গ একত্র হয়ে ইংরেজের মতো 'শেয়ার' গ্রহণ করে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করে সেখানে মাসে এক বার করে অভিনয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সেটি হবে বাঙালির জন্য ইংরেজি ধরনের নাট্যশালা।

প্রচলিত কালীয়দমন, রামযাত্রা বা চণ্ডীযাত্রার মতো ছিল না। ইংরেজি শিক্ষার জন্য এদের অভিনয় অনেকগুণ শ্রেষ্ঠ ছিল। হিন্দু থিয়েটারের নাট্যাভিনয় ইতিহাসগত দিক দিয়ে কয়েকটি কারণে উল্লেখযোগ্য :

এক. হিন্দু থিয়েটার বাঙালির প্রতিষ্ঠিত প্রথম থিয়েটার।

দুই. বাঙালির থিয়েটারে ইংরেজি মডেলে মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল।

তিন. প্রথম মঞ্চে বাংলা নাটকের বদলে ইংরেজি ভাষায় নাটকের অভিনয় হয়েছিল।

চার. একটি শেক্সপীয়রের নাটকের মূল ইংরেজি অংশ এবং অন্যটি সংস্কৃত নাটকের ইংরেজি অনুবাদ ও একটি মজাদার প্রহসন ইংরেজিতে হয়েছিল।

পাঁচ. নাট্যশিক্ষা দিয়েছিলেন একজন ইংরেজ--উইলসন সাহেব।

ছয়. দৃশ্যসজ্জা ও সাজসজ্জা অতি সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়েছিল।

সাত. এই থিয়েটারে বাঙালি ও ইংরেজ উভয়শ্রেণীর দর্শকই উপস্থিত ছিল।

আট. হিন্দু থিয়েটারের অভিনয় প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস) মন্তব্য : 'বঙ্গীয় নাট্যশালা ও নাটকের উৎপত্তি ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালিদের দ্বারা বিদেশী আদর্শে। একথাটি ভাল করিয়া স্মরণ রাখা উচিত।'

নয়. এই থিয়েটারের নাট্যাভিনয় তৎকাল প্রচলিত লোকনাট্য যাত্রার তুলনায় অনেক উন্নত মান ও রুচির পরিচয় দিয়েছিল।

দশ. বিদেশী অনুকরণে থিয়েটার হয়েছে, কিন্তু তখনো বাংলায় নাটক রচনা শুরু হয় নি।

এগারো. বাঙালিকে বাঙালির প্রাসাদমঞ্চে বসে ইংরেজি মডেলের থিয়েটারে ইংরেজি নাট্যাভিনয় দেখে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে।

দুই. শ্যামবাজারে নবীন বসুর নাট্যশালা

প্রখ্যাত ধনী ও সম্ভ্রান্ত নবীনচন্দ্র বসু তাঁর শ্যামবাজারের বাড়িতে (এখন যেখানে শ্যামবাজার ট্রাম ডিপো) রঙ্গমঞ্চ তৈরি করেন ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে। সেখানে 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকের অভিনয় করেন। এখানে 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকের প্রথম প্রযোজনা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : ১৮৩৩। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত : ১৮৩৩। শচীন সেনগুপ্ত (বাংলা নাটক ও নাট্যশালা) : ১৮৩৩। ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : (অভিনয় শিক্ষা) : ১৮৩১ (১২৩৭) কোজাগরী পূর্ণিমারাত্রে। সুবল মিত্র সম্পাদিত অখণ্ড সরল বাংলা অভিধান (২য় সং) : ১৮৩১। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি : ১৮৩১। [সন্দর্ভ সংগ্রহ গ্রন্থের রঙ্গভূমির ইতিহাস (১ম ভাগ) প্রবন্ধ]। এখানে বছরে চার-পাঁচটি বাংলা নাটকের অভিনয় হতো বলে জানা যায়। তবে সব অভিনয়ের বিস্তৃত খবর পাওয়া যায় না। মনে হয় চার-পাঁচটি আলাদা নাটক নয়, একটি নাটককেই ৪/৫ বার অভিনয় করা হয়। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি জানিয়েছেন : ১৮৩১ শুরু হয়ে ১৮৩৭

পর্যন্ত অভিনয় প্রবাহিত ছিল। (রঙ্গভূমির ইতিহাস, ১ম ভাগ)।

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত হিন্দু থিয়েটারের মঞ্চ দেখেই নবীন বসু তাঁর রঙ্গমঞ্চ তৈরি ও অভিনয়ের পরিকল্পনা করেন। তবে তিনি তাঁর মঞ্চে অভিনয় করান বাংলা ভাষায় নাটক। তাঁর নাট্যশালায় একটি নাটকের একাধিকবার অভিনয়ের খবর সঠিক বলে মনে হয়। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীকে এখানে নাটকাকারে অভিনয় করা হয়। ৬ অক্টোবর, ১৮৩৫। রাত্রি ১২টায় শুরু করে শেষ হয়েছিল পরদিন সকাল ৬টায়। এই অভিনয়টির খবরই বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায়।

তিনি ইংরেজি ধরনের নাট্যশালা তৈরি করে তাতে প্রথম বাংলা নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা করলেন। বাঙালির উদ্যোগে প্রথম বাংলা নাটকের অভিনয় শুরু হলো। এর আগে ১৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দে লেবেডেফ বাংলায় নাট্যাভিনয় করেছিলেন ; কিন্তু তিনি তো বাঙালি নন, বহিরাগত রাশিয়ান। তা ছাড়া নবীন বসুর থিয়েটারে আরেকটি যুগান্তকারী কাজ করা হলো। তাঁর উদ্যোগেই বাঙালির মঞ্চে নারীচরিত্রে অভিনেত্রীদের গ্রহণ করা হয়েছিল।

এখানে ইউরোপীয় বাঙালি হিন্দু মুসলমান মিলিয়ে প্রায় এক হাজারের ওপর দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

এই সময়ে সখের যাত্রার আসরে বিদ্যাসুন্দর খুবই জনপ্রিয় পালা ছিল। রামতনু মগ নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে নবীন বসু বিদ্যাসুন্দর যাত্রা শুনে উৎসাহিত হন। এবং নিজের বাড়ির নাট্যশালায় সেই বিদ্যাসুন্দরেরই অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। কাহিনী নিলেন বিদ্যাসুন্দরের, কিন্তু উপস্থাপনা করলেন নাটকাকারে। খরচ করলেন দু'হাতে। অভিনবত্বে চমকে দিলেন দর্শকদের।

বিলেত থেকে যন্ত্রপাতি আনিয়ে আলোর ব্যবস্থা করলেন প্রচুর অর্থব্যয় করে। আলোর কৌশলে ঝড়বিদ্যুৎ দেখিয়েছিলেন স্টেজে। পাইওনীয়ার পত্রিকার বিবরণে (২২ অক্টোবর, ১৮৩৫) এই স্টেজ ও তার দৃশ্যপট ও আলোর রকমারি ব্যবহারের খবর পাওয়া যায়। স্টেজের সেট-সেটিংস, দৃশ্যপট ও দৃশ্যাঙ্কনের কথা সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে। থিয়েটারের অনুকরণে দৃশ্যপট আঁকলেও সেগুলি তত ভালো হয় নি। অঙ্কিত পটে মেঘ, জল ইত্যাদি খুবই নিম্নমানের হয়েছিল, একেবারেই বাস্তবানুগ হয়নি বলে সেযুগে পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছিল। এইসব সাধারণ চিত্রপটের মধ্যে রাজা বীরসিংহের বাড়ি, তার কন্যার ঘর তবুও একটু ভালো হয়েছিল।

দেশীয় যন্ত্রের সাহায্যে ঐকতান বাদন হয়েছিল। সেতার, সারেঙ্গি, পাখোয়াজ, বেহালা প্রভৃতি দেশীয় যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। বাদকগণের অধিকাংশই ব্রাহ্মণ ছিল—তার মধ্যে ব্রজনাথ গোস্বামী বেহালাবাদক হিসেবে নাম করেছিলেন। নাটক শুরু হতো পরমেশ্বর স্তুতি গান দিয়ে।

ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর Indian Stage (Vol.-I, P. 286) গ্রন্থে অন্য ধরনের অভিনয়ের কথা জানিয়েছেন। মঞ্চ বেঁধে নয়, ছড়ানো ভাবে বিদ্যাসুন্দর নাটকের অভিনয় হতো। এই ছড়ানো মঞ্চে বিচিত্র ধরন ও রীতিতে অভিনয়ের বিবরণ দিয়েছেন

তিনি। দর্শকেরা উঠে উঠে গিয়ে কখনো নবীন বসুর বৈঠকখানায়, কখনো পুকুরপাড়ে অভিনয় দেখতেন। বীরসিংহ রাজার ঘর হয়েছিল বৈঠকখানায়, বাড়ির পিছন দিকে মালিনীর কুঁড়ে, আর সুন্দর বসেছিল বাড়ির বাগান সংলগ্ন পুকুরঘাটে। এমনকি সুন্দরের গোপনপথে যাওয়ার জন্য সুড়ঙ্গপথও তৈরি হয়েছিল।

বিদ্যাসুন্দরের প্রথম প্রযোজনা একদিনে শেষ হয়নি। দুই রাত ধরে চলেছিল। (বিশ্বকোষ : ব্যোমকেশ মুস্তাফি)

শোনা যায়, শান্তিপুরে চৈতন্যদেব দানলীলার অভিনয়ে প্রকৃতির বাস্তব পটভূমিকা ব্যবহার করেছিলেন। ভাগীরথী নদীর তীরে অভিনয় কালে, মাঠে গাভী চরানো, নদীতে জল-বিহার, প্রকৃত কদম্ববৃক্ষ, দধিদুগ্ধ লুণ্ঠন, সবই ঘুরিয়ে অনুষ্ঠিত হতো। অবশ্য নবীন বসু তাঁর নাট্যানুষ্ঠানে এই অনুপ্রেরণা কোথা থেকে পেয়েছিলেন, বলা মুশকিল।

তবে একথা ঠিক, প্রথমদিকে এইভাবে ছড়ানো মঞ্চে অভিনয় হলেও, পরের দিকে যে মঞ্চ তৈরি করে, সেই মঞ্চেই দৃশ্যপটাদিসহ, আলোর কারসাজিতে অভিনয় হয়েছিল, তা ওপরের পাইওনীয়ার পত্রিকার বিবরণ থেকেই জানা যায়। তাহলে মানতে হয় যে, পাইওনীয়ার ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে অভিনয়ের যে বিবরণ দিয়েছে, তার আগেই এখানে আরো অভিনয় হয়েছিল, ঐ বিদ্যাসুন্দর নাটকেরই।

প্রথম দিকে দৃশ্যপট ও স্থির মঞ্চের অভাবে দৃশ্যপরিবর্তনের সময়ে একজন অভিনেতা ভারতচন্দ্র থেকে সংশ্লিষ্ট দৃশ্যের আবৃত্তি করতেন, এবং দৃশ্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদেরও স্থান পরিবর্তন করতে হতো। কয়েকটি অভিনয়ের পর মঞ্চ ও দৃশ্যপটের ব্যবহার হতে থাকে।

যাই হোক, প্রচলিত যাত্রার চাইতে থিয়েটারের নতুনত্ব ও অভিনবত্বই এখানে বড় কথা। থিয়েটারের এই চমক ও জাঁকজমক এবং ইংরেজি থিয়েটারে বাংলা নাটকের অভিনয়—এই সব দিয়ে নবীন বসুর নাট্যশালা আমন্ত্রিত ইঙ্গবঙ্গ দর্শকদের মুগ্ধ করে দিয়েছিল।

সুন্দরের ভূমিকায় অভিনয় করেন শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। স্ত্রীচরিত্রের মধ্যে বিদ্যার ভূমিকায় রাধামণি বা মণি নামে এক ষোল বছরের বালিকা অভিনয় করে। রানী ও মালিনীর দুটি চরিত্রেই অভিনয় করে জয়দুর্গা নামে প্রৌঢ়া রমণী। বিদ্যার সখীর ভূমিকায় ছিল রাজকুমারী বা রাজু নামে আরেক মহিলা। নবীন বসু নিজে 'কালুয়া' এবং রাজা বৈদ্যনাথ রায় 'ভুলুয়া'-র ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যাত্রায় তখন কালুয়া-ভুলুয়া চরিত্র বিশেষ টাইপ হিসেবে জনপ্রিয় ছিল। তারই প্রভাবে বিদ্যাসুন্দর নাটকে কালুয়া-ভুলুয়া চরিত্র সৃষ্টি করা হয়েছিল। এই নিয়ে সেকালে ছড়ায় গান বাঁধা হয়েছিল :

নবীন বসু কালুয়া
রাজা বৈদ্যনাথ ভুলুয়া
বরাহনগরের শ্যামাচরণ
হলেন সুন্দর।

নতুন থিয়েটারের আকর্ষণ তৈরি হলেও দেশীয় রেশ তখনো কাটানো যাচ্ছে না। 'বিদ্যাসুন্দর' পালাকে নাটকায়িত করা এবং 'কালুয়া-ভুলুয়া চরিত্রসৃষ্টি করা এবং সঙ্গীত ব্যবহার করা সেই যাত্রার অনুষঙ্গগত প্রমাণ হিসেবে রয়ে গেল।' (দ্রঃ নবীন বসুর থিয়েটার--কৌশিক সান্যাল। অনুষ্টুপ শারদীয়, ১৯৯৬, ক্রোড়পত্র-২ পৃ- ১-৫৫)

স্ত্রী ভূমিকাগুলির অভিনয় খুবই সুন্দর হয়েছিল। তাদের অভিনয় এবং সঙ্গীত পরিবেষণ সবাইকার পরিতৃপ্তির কারণ হয়েছিল। 'হিন্দু পাইওনীয়ার' পত্রিকা এই অভিনয়ের এবং বিশেষ করে স্ত্রীচরিত্রের সপ্রশংস উল্লেখ করেছিল। অথচ 'ইংলিশম্যান অ্যান্ড মিলিটারী ক্রনিকল' পত্রিকা এই অভিনয়ের তীব্র নিন্দাসূচক এক পত্র প্রকাশ করে, তাতে স্ত্রীলোক নিয়ে এই অভিনয় নিম্নরুচি ও শালীনতাহীনতার কথা বলা হয়। মঞ্চে অভিনেত্রী গ্রহণ করা নিয়ে পরবর্তীকালেও বাঙালির রঙ্গমঞ্চ-বিদ্বেষ লক্ষ্য করা যায়।
নবীন বসুর থিয়েটারের কৃতিত্বগুলি সূত্রাকারে বলা যায় :

১. বিদেশী থিয়েটারের মঞ্চ
২. মঞ্চে নাটক উপস্থাপনা
৩. বাংলা নাটকের থিয়েটারি অভিনয়
৪. নাট্যবিষয়ে যাত্রার অনুসরণ এবং উপস্থাপনায় যাত্রার কিছু অনুষঙ্গ ব্যবহার
৫. বাঙালির মঞ্চে প্রথম অভিনেত্রী গ্রহণ
৬. সর্বোপরি, বাঙালির উদ্যোগে প্রথম বাংলা নাটক অভিনয়ের কৃতিত্ব নবীন বসুর অবশ্যপ্রাপ্য।
৭. যাত্রার আসর বর্জন করে, ইংরেজি-নাটক বা অনুবাদ নাটক বর্জন করে, এক অভিনব আঙ্গিকে জনপ্রিয় বিদ্যাসুন্দর পালা নাটকাকারে পরিবেষণ করেন। ছড়ানো মঞ্চে বিভিন্ন দৃশ্যের অভিনয়, একাধিক রাত্রি ধরে অভিনয় করেন।
৮. বিদ্যাসুন্দরের প্রযোজনা যাত্রা নয়। আবার এটির পরিবেষণা তৎকালীন কলকাতায় প্রচলিত বিদেশি থিয়েটারের রীতির অনুসারীও নয়।

তিন. ওরিয়েন্টাল থিয়েটার

প্রসন্নকুমার এবং নবীন বসুর প্রচেষ্টার পর তৃতীয় উদ্যোগ হিসেবে নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাট্যশালার কথা বলতে হয়। ন্যাশনাল পেপার পত্রিকায় (১১ ডিসেম্বর, ১৮৭২) সম্পাদক নবগোপাল মিত্র নাট্যশালার ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে এই নাট্যশালার কথা জানিয়েছেন। তবে এর কোনো বিস্তৃত খবর পাওয়া যায় নি।

এরপরে বেশ কিছু দিন বাঙালির থিয়েটারের খবর নেই। মাঝে হেয়ার একাডেমির বাঙালি ছাত্রেরা ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস' অভিনয় করে। এই সময়েই ওরিয়েন্টাল সেমিনারী স্কুলে একটি যথার্থ নাট্যশালা তৈরি হয়। তারই নাম ওরিয়েন্টাল থিয়েটার। এখানে গৌরমোহন আঢ্যের বাঙালি ছাত্রেরা ইংরেজি নাটকের অভিনয়ে অংশ নেয়। সাঁ সুসি থিয়েটারের মিঃ ক্লিঙ্গার ছাত্রদের অভিনয় শিক্ষা দিতেন। ১৮৫৩

খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে রঙ্গালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্যোগী ছাত্র-অভিনেতাদের মধ্যে নাম করা যায় কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ দে, দীননাথ ঘোষ, প্রিয়নাথ দত্ত প্রমুখ। এরা অভিনয়ে খুবই খ্যাতিলাভ করেন এবং পরবর্তীকালে সখের নাট্যশালায় এদের অনেকেই প্রধান অভিনেতা, নাট্যপরিচালক ও নাট্য উপদেষ্টারূপে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিলেন।

মিঃ ক্লিঙ্গারের পরিচালনায় 'ওথেলো' খুব সার্থকভাবে অভিনীত হয় ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৩। ৫ অক্টোবর দ্বিতীয়বার অভিনীত হয়। ইয়াগোর ভূমিকায় প্রিয়নাথ দে খুব খ্যাতিলাভ করেন। পরে শ্রীমতী ইলিস-এর অভিনয়-শিক্ষাদানে এখানে অভিনীত হয় শেক্সপীয়রের আরো দুটি নাটক--মার্চেন্ট অফ ভেনিস (২ মার্চ, ১৮৫৪) এবং হেন্‌রি দি ফোর্থ ; এছাড়া মেরিডিথ পার্কার এর 'আমাটোর' নামে একটি প্রহসন। ১৭ মার্চ মার্চেন্ট অফ ভেনিসের দ্বিতীয় অভিনয়ে মিসেস গ্রীগ নামে ইংরেজ মহিলা পোর্শিয়া চরিত্রে অভিনয় করেন। এখানে কোনো বাংলা নাটকের অভিনয় হয় নি।

ওরিয়েন্টাল থিয়েটারের বাঙালি ছাত্রেরা ইংরেজি পরিচালকের কাছে শিক্ষা পেয়ে ইংরেজি নাটকের অভিনয় করত। ফলে বিদেশী থিয়েটারের অভিনয়রীতি ও প্রকরণে এরা অভিজ্ঞতা লাভ করে। পরে সেই অভিজ্ঞতাই তাঁরা বাংলা রঙ্গালয়ের অন্যত্র ব্যবহার করেছিলেন। এই শিক্ষা তাঁদের ব্যর্থ হয় নি।

এখানে টিকিট বিক্রি করে বিদেশী থিয়েটারের মতো নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ধনী বাড়ির থিয়েটারের মতো আমন্ত্রণমূলক ছিল না।

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উপদেশে কেশব গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখেরা এই থিয়েটারে দেশীয় নাটকের অভিনয় ও দেশীয় বাদনের প্রচলনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে এরাই একটি নাট্য সম্প্রদায় গঠন করেন। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে চড়কডাঙার টেগোর ক্যাস্‌ল রোডে রামজয় বসাকের বাড়িতে নাট্যশালা নির্মাণ করে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কূলীনকূলসর্বস্ব' অভিনয় করেন। সব কিছুর উদ্যোক্তা ছিলেন কেশব গঙ্গোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ বসু।

ওরিয়েন্টাল থিয়েটার দুই বছরের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়। তখনই 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক জানান যে, বোম্বাইয়ে গ্রাণ্ট রোড থিয়েটারে দেশীয় ভাষায় চালু হয়েছে অভিনয়। সেই মতো কলকাতাতেও যাতে নাট্যশালা তৈরি করে বাংলা নাটকের অভিনয় হয়--সেই বিষয়ে তিনি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান।

চার. প্যারীমোহন বসুর জোড়াসাঁকো থিয়েটার

নবীন বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র প্যারীমোহন বসু তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে জোড়াসাঁকো থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন, ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটারের মতো এখানেও ইংরেজি নাটকের অভিনয় মূল ইংরেজি ভাষাতেই অভিনয় করা হয়। ওরিয়েন্টাল থিয়েটার-এর মতোই এই থিয়েটার বেশ বড়ভাবে উদ্যোগ আয়োজন করে ইংরেজি

নাটকাভিনয়ের।

১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ৩ মে এখানে শেক্সপীয়রের 'জুলিয়াস সীজার' নাটকের অভিনয় করে। অভিনয়ের দিন নাট্যশালাটি খুব সুন্দরভাবে সাজানো হয়। চারশো দর্শক উপস্থিত ছিল। জুলিয়াস সীজারের ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেন মহেন্দ্রনাথ বসু। ব্রুটাস—কৃষ্ণধন দত্ত। কেসিয়াস—যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়। সবার অভিনয় যে ভালো হয়নি, তা সংবাদপত্রে উল্লেখ করা হয়েছিল।

মঞ্চ, দৃশ্যপট-অঙ্কন, সাজসজ্জা ও রঙ্গালয়ের অন্যান্য ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত খুব সুন্দর হয়েছিল।

১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা আবার বাঙালিদের বাংলা নাটক অভিনয় করবার জন্য অনুরোধ জানায়।

পাঁচ. আশুতোষ দেবের (সাতুবাবুর) বাড়ির নাট্যশালা

নবীন বসুর বাড়ির নাট্যশালায় বাংলা নাটক বিদ্যাসুন্দরের অভিনয়ের (১৮৩৫) পর কুড়ি বছরের অধিককাল বাঙালির নাট্যশালায় আর কোনো বাংলা নাটকের অভিনয়ের খবর পাওয়া যায় না। একদিকে বাংলায় অভিনয়যোগ্য যথার্থ নাটকের অভাব এবং অন্য দিকে দেশীয় লোকের শিক্ষা ও রুচি তখনো সেইভাবে গড়ে উঠতে পারেনি। ইংরেজি নাটকের অভিনয় স্কুল কলেজ বা ধনী বাড়ির সখের নাট্যশালায় অভিনীত হলেও, তাতে বাঙালির পক্ষে পরিপূর্ণ রসগ্রহণ সম্ভব ছিল না। ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির পক্ষেও তা কষ্টসাধ্য ছিল। থিয়েটারের জাঁকজমক, চমক ও নতুন মজা অনেককেই বিস্মিত ও আকর্ষিত করলেও, সঠিক নাট্যস্পৃহা তাতে পূর্ণ হতে পারে নি।

উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময় থেকে ধনী বাঙালির প্রাসাদ-মঞ্চগুলিতে নতুন করে নাটকাভিনয় শুরু হলো। এরপর থেকে শুধু ইংরেজি নাট্যাভিনয়ের জন্য আর কেউ উদ্যোগী হন নি। বাঙালির তৈরি নাট্যশালায় বাংলা নাটকের অভিনয় পাকাপাকিভাবে শুরু হলো। এই সময় থেকেই বাংলা নাটক ও নাট্যশালার ইতিহাস পরস্পর সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছে। নাটকাভিনয়ের সহযোগী হিসেবেই নাট্যকারদের আবির্ভাব এবং নাটক লেখা শুরু হয়ে গেল। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দ এই দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য বছর। এই বছরেই তিনটি নাট্যশালা বাংলা নাটক অভিনয় শুরু করে। এই ধারা অব্যাহত থেকে যায় এরপর থেকে। এই তিনটি নাট্যশালা হলো—আশুতোষ দেবের নাট্যশালা, জয়রাম বসাকের নাট্যশালা এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ। মঞ্চ ও নাটকের ইতিহাস রচয়িতা লিখেছেন :

'The year 1857 marks the beginning of a new epoch in the history of Bengali Drama and the Theatre. In fact, Bengali Drama and the stage have had a continuous history since that memorable year'—(Probodh Chandra Sen–Bengali Drama and Stage.)

১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দ প্রসঙ্গে স্বতঃই সিপাহী বিদ্রোহের কথা মনে আসে। কলকাতার

ইংরেজরা ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। তাদের নিজস্ব আমোদ-প্রমোদ সব বন্ধ হয়ে গেছে। এদিকে ধনী বাঙালি এবং শিক্ষিত তরুণদের বেশির ভাগের মধ্যেই সিপাহী বিদ্রোহের কোনো প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় না। বরং ধনী বাঙালির প্রাসাদ-মঞ্চগুলিতে আমোদ-প্রমোদের ফোয়ারা ছুটেছে, সঙ্গে নাট্যাভিনয়ের উদ্যমও এই সময়ে নজরে পড়ে। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ধনী বাঙালিদের বাড়িতে পরপর নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়ে নাটক অভিনয়ের ধারা অপ্রতিহত বেগে চলেছে। সিপাহী বিদ্রোহের মতো এত বড় ভারতব্যাপী একটা ঘটনার কোনো প্রতিক্রিয়া এদের ওপর পড়ল না। বিষয়টি, আশ্চর্যের হলেও, এই থেকেই ধনী অভিজাত বাঙালির তৎকালীন মানস-পরিচয় পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠে।

কলকাতার লক্ষপতি ধনী আশুতোষ দেবের (ইনি সাতুবাবু নামেই সমধিক পরিচিত) বাড়িতে একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে। আশুতোষ দেব ও তাঁর ভাই (লাটুবাবু নামে খ্যাত) শুধু লক্ষপতি ছিলেন না, বিলাস-ব্যসনেও প্রমত্ত ছিলেন। নাচ-গান, কবিগান, আখড়াই গান, বুলবুলির লড়াই, পায়রা ওড়ানো, ঘুড়ি ওড়ানো, বাঈনাচ ও খেমটা নাচে প্রচুর অর্থ উড়িয়েছিলেন। মাতার শ্রাদ্ধে, আয়োজনে ও অর্থব্যয়ে কিংবদন্তী তৈরি করেছিলেন। আশুতোষ দেবের মৃত্যুর (২৯ জানুয়ারি, ১৮৫৬) পর তাঁর বাড়িতে স্থাপিত জ্ঞানপ্রদায়িনী সভার সভ্যেরা মিলিত হয়ে এই নাট্যশালা নির্মাণ ও অভিনয়ের আয়োজন করেন।

প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন সাতুবাবুর দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ ও চারুচন্দ্র ঘোষ। এঁরা দুজনেই ছিলেন সাতুবাবুর বড় কন্যার পুত্র।

বাঙালির রঙ্গালয়ে বাংলা নাটকের অভিনয়ে খুবই আনন্দ প্রকাশ করে 'সংবাদ প্রভাকর' লিখেছিল (১৫ জানুয়ারি, ১৮৫৭) :

'সম্ভ্রান্ত ও দেশীয় ভদ্রলোকেরা বিশুদ্ধ আমোদের জন্য সচরাচর অর্থ ব্যয় করেন না। এই কারণে আমাদের সম্ভ্রান্ত যুবকগণ সাধারণতঃ যে সকল নীচ আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকেন। তাহা হইতে তাহাদিগকে মুক্ত দেখিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম।'

এই রঙ্গালয়ের উদ্বোধন হয় ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি, সরস্বতী পূজার দিন। নাটক ছিল নন্দকুমার রায়ের লেখা এবং পূর্বেই মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'। নাটকটি কালিদাসের বিখ্যাত সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ।

বহুদিন পরে বাঙালির রঙ্গালয়ে বাংলা নাটকের অভিনয়ে বেশ সাড়া পড়ে গিয়েছিল। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন--

শকুন্তলা--শরৎচন্দ্র ঘোষ। দুষ্মন্ত--প্রিয়মাধব মল্লিক। দুর্বাসা--অন্নদা মুখোপাধ্যায়। অনসূয়া--অবিনাশচন্দ্র ঘোষ। প্রিয়ম্বদা--ভুবনচন্দ্র ঘোষ। ঋষিকুমার--মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

উমেশচন্দ্র দত্ত ষ্টেজ-ম্যানেজার ছিলেন। কবিচন্দ্র নামে একজন কবি এই নাটকের জন্য গান বেঁধে দিয়েছিলেন।

এই রঙ্গালয়ে চারশো জনের ওপর দর্শকাসন ছিল। রঙ্গালয় অতি মনোরমভাবে

সজ্জিত ছিল। সকলের অভিনয়ই ভালো হয়েছিল। বিশেষ করে শরৎচন্দ্র ঘোষের শকুন্তলা অভিনয় সকলকেই মুগ্ধ করেছিল। শকুন্তলার মনোহারিণী রূপলাবণ্য ও ভাবভঙ্গি এবং সম্ভাষণের মাধুর্য ও বাকচাতুর্যে দর্শকবৃন্দ চমৎকৃত হয়েছিলেন।

এই অভিনয়ে আশ্রমবাসিনী শকুন্তলাবেশী শরৎচন্দ্র ঘোষ সাতুবাবুর বাড়ির মূল্যবান জড়োয়া গয়না পরে মঞ্চে উপস্থিত হয়ে শকুন্তলার রানীবেশ দেখিয়েছিলেন। সাতুবাবুর বাড়ির জড়োয়া গয়না দেখে দর্শকদের চক্ষু স্থির হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্র লিখেছেন যে, লোকের মুখে শুধুই গয়নার কথা। নাটকের কথা কেউ বলে না। নাটক অভিনয়ের মহৎ উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গে ধনীবাড়ির জৌলুষ দেখাবার গোপন প্রয়াস কাজ করেছিল বৈকি!

বাংলা সংবাদপত্রে এই সম্পর্কে কিছু লেখা হয়নি। কিন্তু ইংরেজি 'হিন্দু ইনটেলিজেন্স' পত্রে লেখা হয়েছিল :

'To see the simple Shakuntolah clothed in the splendid garments of the richest Hindu girls, and decorated in the most precious jewels brings to our mind a painful sight of the murder of truth and nature.'

এই মঞ্চে শকুন্তলা নাটকের দ্বিতীয় অভিনয় হয় ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৭। তবে ঐদিন সম্পূর্ণ নাটকটি অভিনীত হয়নি, মাত্র তিন অঙ্ক অভিনীত হয়েছিল। শকুন্তলা নাটকের তৃতীয় অভিনয়ের আয়োজন করা হলেও, সে অভিনয় হয়নি।

'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' ছাড়া এই মঞ্চে অভিনীত হয় 'মহাশ্বেতা' নাটক। বাণভট্টের সংস্কৃত কাদম্বরী গ্রন্থ অবলম্বনে এই নাটকটি রচনা করেন মণিমোহন সরকার। তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য অনূদিত 'কাদম্বরী' বাংলা গ্রন্থের সাহায্যও এখানে নেওয়া হয়েছে। নাটকটির অভিনয় হয় ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ৫ সেপ্টেম্বর। অভিনয়ে—

> রাজা—অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। মহাশ্বেতা—ক্ষেত্রমোহন সিংহ। কাদম্বরী—মহেন্দ্রনাথ ঘোষ। তরলিকা—শরৎচন্দ্র ঘোষ। রানী—ভুবনমোহন ঘোষ। ছত্রধারিণী—মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। কপিঞ্জল—মণিমোহন সরকার (নাট্যকার)। পুণ্ডরীক ও নটী—মহেন্দ্রনাথ মজুমদার।

নাটকটি ভালভাবে নাট্যবদ্ধ হয়নি। সংলাপ রচনাও ত্রুটিপূর্ণ ছিল। অভিনয়ে দু'একজন ছাড়া কারোর অভিনয়ই ভালো হয়নি। তবে মহাশ্বেতা, তরলিকা এবং কাদম্বরীর অভিনয়ে তিনজন 'পুরুষ অভিনেত্রী'ই খুব প্রশংসা লাভ করে। সঙ্গীত ও যন্ত্রবাদ্য আশানুরূপ হয়নি।

দীর্ঘদিন বাদে আবার বাঙালির নাট্যশালায় বাংলা নাটকের অভিনয়ে সবাই খুশি হয়েছিল। তবে দুটো নাটকই সংস্কৃত নাটক ও কাহিনীর অনুবাদ। তা সত্ত্বেও বাংলা ভাষায় রচিত বাঙালির নাটক বাঙালির নাট্যশালায় অভিনীত হয়ে, বাংলা নাট্যাভিনয়ের নতুন ধারার সূত্রপাত করেছিল। এর পরেই নাট্যশালা ও নাটকাভিনয় শুরু হয়ে গেল

মহাসমারোহে। এই রঙ্গমঞ্চের প্রধান দুই উদ্যোক্তা শরৎচন্দ্র ঘোষ এবং তাঁর ভাই চারুচন্দ্র ঘোষ--সাতুবাবুর দুই নাতি পরে উদ্যোগী হয়ে বাংলা সাধারণ নাট্যশালার অভিনয়ে এগিয়ে আসেন। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল থিয়েটার (১৮৭৩) বাংলায় প্রথম স্থায়ীভাবে তৈরি সাধারণ রঙ্গালয়। বিডন স্ট্রিটে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ তৈরি করে শরৎচন্দ্র ঘোষ ও চারুচন্দ্র ঘোষ বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে উজ্জ্বল আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। ভালো অভিনেতা ও পরিচালক হিসেবেও শরৎচন্দ্র প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

সাতুবাবুর বাড়ির থিয়েটারের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য :

১. বাঙালির মঞ্চে ইংরেজি নাটকের অভিনয় বাতিল হলো।
২. বাংলা মৌলিক নাটকের অভাবে সংস্কৃত নাটক ও উপাখ্যানের বাংলা নাট্যরূপ অভিনয়ের ব্যবস্থা হলো।
৩. স্ত্রী চরিত্রে পুরুষেরাই অভিনয় করেছে। যদিও এর আগে নবীনবাবুর থিয়েটারে মেয়েরা অভিনয়ে অংশ নিয়েছিল। কিন্তু সমাজমানসিকতার কারণে সাতুবাবুর বা পরবর্তী সখের নাট্যশালায় অভিনেত্রী গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।
৪. বলা যেতে পারে, এই সময় থেকেই (১৮৫৭) বাঙালির তৈরি বিলিতি ধরনের মঞ্চে পুরোপুরি বাংলা নাটকের অভিনয়ের ধারা প্রবর্তিত হলো।

ছয়. রামজয় বসাকের বাড়ির নাট্যশালা

কলকাতায় নতুনবাজারে চড়কডাঙ্গায় (বর্তমান টেগোর ক্যাস্‌ল্ রোড) রামজয় বসাকের বাড়িতে নাট্যশালা স্থাপিত হয়।

ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে রীতিমত ইংরেজি অভিনয় হলো। রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উপদেশে ওরিয়েন্টাল থিয়েটারের কেশব গঙ্গোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ বসু, রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদ্দুর্লভ বসাক প্রমুখ অভিনেতারা সেখানে বাংলায় নাটকের অভিনয় এবং দেশীয় ঐকতান বাদনের চেষ্টা করে বিফল মনোরথ হন। তখন তাঁরা সেই থিয়েটার থেকে বেরিয়ে এসে নিজেরাই একটি নাট্যসম্প্রদায় গঠন করেন। তাঁদেরই উদ্যোগে এবং ধনী রামজয় বসাকের অর্থানুকূল্যে তাঁরই বাড়িতে নাট্যশালা তৈরি করা হয়।

এখানেই প্রথম রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের অভিনয় হয়। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে এই অভিনয়ের খবর পাওয়া যায়। নাটকটি এখানে চার রাত্রি অভিনীত হয়। অভিনয়ে অংশ নেন--রাধাপ্রসাদ বসাক, রামজয় বসাক, জগদ্দুর্লভ বসাক, নারায়ণচন্দ্র বসাক, রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। সবকিছুর উদ্যোক্তা ছিলেন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। ওরিয়েন্টাল থিয়েটারের অভিনেতা রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জগদ্দুর্লভ বসাক দুজনেই ব্রাহ্মণ কুলীন পণ্ডিতের ভূমিকায় মাতিয়ে দিয়েছিলেন।

এই অভিনয়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য খবর হলো, এই প্রথম বাঙালির নাট্যশালায়

মৌলিক বাংলা নাটকের অভিনয় হলো। এর আগে যা হয়েছে, তার সবই হয় মূল ইংরেজি নাটক, সংস্কৃত নাটক বা কাহিনীর অনুবাদ, বিদ্যাসুন্দর পালার নাট্যরূপ। বাংলা রঙ্গালয়ে মৌলিক নাটকের অভিনয় শুরু হলো। তখন দেশে সমাজ সংস্কার আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছে। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটক রচনার প্রস্তাব দেওয়া হয়। রামনারায়ণ এই নাটক লিখে পারিতোষিক পেয়েছিলেন। বলা যায়, সমাজ সমস্যামূলক নাটক বাংলায় এই প্রথম লিখিত হলো। কুলীন সমস্যা নিয়ে এই নাটক তখন কলকাতায় ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে খুব হৈচৈ ফেলে দিয়েছিল।

'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটক অভিনয় প্রসঙ্গে আরো দুটি রঙ্গালয়ের কথা এখানে বলা যেতে পারে।--

ক. গদাধর শেঠের বাড়ির নাট্যশালা

বড়বাজারে গদাধর শেঠের বাড়ির রঙ্গালয়ে 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের অভিনয় হয় ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ২২ মার্চ। এই অভিনয়ে বিদ্যাসাগর, নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কিশোরীমোহন মিত্র প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ প্রায় সাতশো দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

কারো-কারো মতে, রামজয় বসাকের চাইতে গদাধর শেঠের বাড়ির অভিনয় আরো ভালো হয়েছিল।

খ. চুঁচুড়ার নরোত্তম পালের বাড়ির নাট্যশালা

কলকাতার অদূরে হুগলী জেলার চুঁচুড়া শহরে নরোত্তম পালের বাড়িতে 'কুলীনকুল-সর্বস্ব' নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ৩ জুলাই, নরোত্তম পালের পুত্র শ্রীনাথ পালের উদ্যোগে এই অভিনয় হয়। তাঁকে সাহায্য করেন প্রবোধচন্দ্র মণ্ডল। সংবাদ প্রভাকরের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ৫ জুলাই, রবিবার এই নাটকের দ্বিতীয় বার অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রসিদ্ধ গায়ক ও সঙ্গীতকার রূপচাঁদ পক্ষী এই নাটকের অভিনয়ের জন্য গান রচনা করে অভিনেতাদের তালিম দিয়েছিলেন। তাঁর গান--

--'অধিনীরে গুণমণি পড়েছে কি মনে হে'--নটীর কণ্ঠে খুবই জয়প্রিয় হয়েছিল। প্রথম অভিনয়ে প্রায় নয়শো দর্শক উপস্থিত ছিল। চুঁচুড়া শহরের গঙ্গার অপর পারে ভাটপাড়া। কুলীন ব্রাহ্মণদের পীঠস্থান। নরোত্তম পালের বাড়ির 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের অভিনয়ে ভাটপাড়া থেকে অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ নৌকাযোগে গঙ্গা পেরিয়ে এপারে এসে উপস্থিত হন। তাঁরা তাঁদের অপমানকর এই ধরনের নাটক অভিনয়ের বিরোধিতা করেন। তা নিয়ে গোলযোগ হয়। কিন্তু শেষ অবধি অভিনয় সম্পন্ন হয়েছিল। মনে রাখতে হবে, নাটকের বিরোধিতায় থিয়েটারে সামাজিক আন্দোলন এখান থেকেই শুরু হলো। এবং এই নাটকের রচয়িতা রামনারায়ণ নিজেই ছিলেন ভাটপাড়ার নিকটবর্তী গ্রামের ব্রাহ্মণ কুলীন বংশের সন্তান। নাট্যকার রামনারায়ণ প্রসঙ্গে এটিও উল্লেখযোগ্য কথা।

সাত. কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ

প্রখ্যাত বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যরসিক জোড়াসাঁকো সিংহ পরিবারের ধনী বাঙালি কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০) তাঁর বাড়িতে এই রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন। তাব আগে তিনি বিদ্যোৎসাহিনী সভা নামে একটি সাহিত্য সভা গঠন করেন ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ এই বিদ্যোৎসাহিনী সভার সঙ্গেই যুক্ত ছিল।

বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে। কিন্তু রঙ্গমঞ্চের উদ্বোধন ও অভিনয় শুরু হয় ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ১১ এপ্রিল, শনিবার। প্রথম অভিনীত হয় ভট্টনারায়ণের লেখা সংস্কৃত নাটক 'বেণীসংহার'-এর বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ করেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। অভিনয়ে অংশ নেন স্বয়ং কালীপ্রসন্ন। তাছাড়া মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ ঘোষ, ক্ষেত্রমোহন সিংহ, মণিমোহন সরকার প্রমুখ। দুর্যোধন-পত্নী ভানুমতীর ভূমিকায় অভিনয় কুশলতা দেখান মহেন্দ্রনাথ ঘোষ। কেউ কেউ মনে করেন যে, কালীপ্রসন্ন নিজে ভানুমতী সেজেছিলেন। তথ্যপ্রমাণ সে কথা বলে না।

প্রচুর জ্ঞানীগুণী এদেশীয় এবং ইউরোপীয়ানদের উপস্থিতিতে নাট্যাভিনয় হয়। আদর আপ্যায়নের কোনো ত্রুটি ছিল না। ছোট মঞ্চে এই নাটকের অভিনয় সকলকেই খুশি করেছিল।

'বেণীসংহার'-এর অভিনয়ে প্রচুর প্রশংসা ও খ্যাতিলাভ করে কালীপ্রসন্ন নাট্যাভিনয়ে ও নাট্যরচনায় উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। এবার তিনি নিজেই কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের বাংলায় অনুবাদ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। এই অনূদিত 'বিক্রমোর্বশী' নাটকটি বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ নভেম্বর, অভিনয় হয়। সুসজ্জিত নাট্যশালায় শিল্পীদের নৈপুণ্যে 'বিক্রমোর্বশীর' অভিনয় সাফল্য লাভ করেছিল। বুদ্ধি, সুরুচি, বিলাস ও সম্ভ্রমে পূর্ণ দেশীয় সমাজের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবৃন্দ অভিনয় দেখতে এসেছিলেন। বেশ কিছু ইংরেজ দর্শকও ছিলেন। রাত্রি ৮টা থেকে ১১টা পর্যন্ত অভিনয় হয়। এই নাটকে কালীপ্রসন্ন রাজা পুরূরবার ভূমিকায় খুবই সুন্দর অভিনয় করেছিলেন। ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (পরবর্তী প্রথম কংগ্রেস সভাপতি) অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন।

১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ৫ জুন বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে কালীপ্রসন্নের লেখা 'সাবিত্রী সত্যবান' অভিনীত হয়। 'সাবিত্রী সত্যবান' কোনো সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ নয়। এটি কালীপ্রসন্নের মৌলিক রচনা। অভিনয়ের পূর্বেই এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তবে 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটকটি যথা অর্থে অভিনীত হয়নি। সংবাদ প্রভাকরের বিবরণ (৪ জুন, ১৮৫৮) থেকে জানা যায়, নাটকটির 'আভিনয়িক পাঠ' হয়েছিল। তার সঙ্গে প্রচুর গীত সংযোজিত হয়ে যন্ত্রের অনুষঙ্গে গান করা হয়েছিল। বিদগ্ধ মহলে শেক্সপীয়রের নাটক যেভাবে পাঠ করা হয়, এও অনেকটা সেইরকম। ডঃ সুকুমার সেন একে 'নাট্যোচিত আবৃত্তি' (Dramatic recital) বলে অনুমান করেছেন। ঠিক এই ধরনের প্রথা এদেশে তখনো প্রচলিত ছিল না। বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চেই তার প্রথম

প্রচলন হলো। এখানে 'মালতীমাধব' নাটকের বাংলা অনুবাদেরও এইরকম পাঠ হয়েছিল ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে।

বিদ্যোৎসাহিনী মঞ্চের অভিনয়ে মঞ্চোপকরণের দিকে খুবই নজর দেওয়া হতো। অভিনয়েও পারদর্শিতা অর্জনের জন্য পরিশ্রম করা হতো। এখানে ফোর্ট উইলিয়াম থেকে ব্যান্ডের দল এনে অর্কেস্ট্রার কাজ করানো হয়েছিল।

কালীপ্রসন্ন বিদ্যোৎসাহিনী সভা প্রতিষ্ঠা করে জ্ঞানানুশীলনের ব্যবস্থা করেন। পরে এই সভার সংযোগেই বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ তৈরি ক'রেন। প্রথমে অন্যের লেখা নাটক গ্রহণ করলেও, পরে নিজেই নাটক রচনা শুরু করেন। প্রথমে অনুবাদ করেন, পরে নিজেই মৌলিক নাটক রচনা করেন। আবার বিদেশী রঙ্গমঞ্চে যে ধরনের অভিনয় হতো, সেইরকম অভিনয় করেই ক্ষান্ত হননি, নতুন ধরনের 'আভিনয়িক পাঠ' চালু করেন।

বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্যই নাট্যকার কালীপ্রসন্নের নাট্যরচনার সূত্রপাত। তিনি একাধারে উদ্যোক্তা, প্রযোজক-পরিচালক এবং অভিনেতা। এবং অবশ্যই অভিনীত প্রথম নাটকটি বাদে পরবর্তী সবগুলির নাট্যকার। হয় অনুবাদ করেছেন নিজে কিংবা মৌলিক নাট্যরচনা করেছেন।

১৮৫৯-এর পরে এখানে আর কোনো অভিনয়ের খবর পাওয়া যায় না। তবে এর অনেকদিন পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর নাট্যাভিনয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য যে 'সঙ্গীত সমাজ' গঠন করেন, তার প্রতিষ্ঠা এই বিদ্যোৎসাহিনী মঞ্চেই হয়েছিল। কিন্তু নানা গোলযোগ ও দলাদলির ফলে শেষ পর্য্যন্ত সঙ্গীত সমাজ উঠে গিয়ে 'ভারত সঙ্গীত সমাজ' অন্যত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য তারও আগে, ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দের গোড়ায় দুই তিন মাস ন্যাশনাল থিয়েটার ভাঙার পর অর্ধেন্দুশেখরের নেতৃত্বে যে 'হিন্দু ন্যাশনাল' দল তৈরি হয়, তারা কিছুদিন অপেরা হাউসে এবং বিদ্যোৎসাহিনী মঞ্চে নাট্যাভিনয় করেছিলেন। এসব অনেক পরের কথা। সখের নাট্যশালা প্রসঙ্গে সে নাট্যালোচনার প্রয়োজন নেই।

বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটারের সাফল্যই পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ এবং বাবু (পরে মহারাজা ও স্যার) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতিকে বেলগাছিয়া নাট্যশালা স্থাপনে প্রণোদিত করে।

অনেক আগে কালীপ্রসন্নের 'বাবু' নাটকটি প্রকাশিত হয় (১৮৫৪)। খুবই জনপ্রিয় এই প্রহসনটি এখানে অভিনীত হয়নি এবং সে যুগে অন্য কোনো মঞ্চেও অভিনীত হয় নি। এর ভাগ্যও বোধহয় পরবর্তী মধুসূদনের প্রহসন দুটির মতোই হয়েছিল।

কালীপ্রসন্নের বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য বক্তব্য হলো :

১. বিদ্যোৎসাহিনী মঞ্চ দুই বৎসর স্থায়ী হয়।
২. জ্ঞানানুশীলনের একটি সভার অঙ্গ হিসেবেই এই নাট্যমঞ্চের প্রতিষ্ঠা ও অভিনয়ের সূত্রপাত।

৩. মঞ্চ নির্মাণ, অভিনয় কৃতিত্ব এবং নাট্য উৎসাহ সৃজনে এই রঙ্গমঞ্চের অনন্য কীর্তি অবশ্যস্বীকার্য।
৪. এখানেই প্রথম সুন্দররূপে 'ড্রপসীন' এঁকে ব্যবহার শুরু হয়।
৫. এই মঞ্চে ভরত, কালিদাস প্রমুখ প্রাচীন সংস্কৃত যুগের নাট্যব্যক্তিত্বদের মূর্তি ও চিত্র স্থাপন করে ক্লাসিক যুগের আবহাওয়া তৈরি করা হয়েছিল।
৬. নাট্যাভিনয় ছাড়াও 'আভিনয়িক পাঠ'-এর ব্যবস্থা করে নতুন ধারার সৃষ্টি করেন।
৭. অভিনয়ে সুরুচি, বৈদগ্ধ্য ও নিষ্ঠার পরিচয় ছিল।
৮. এই নাট্যশালার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা থেকেই পরবর্তী অনেকে নাট্যশালা নির্মাণ ও অভিনয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন।
৯. মৌলিক নাট্যকার হিসেবে কালীপ্রসন্ন সিংহের আবির্ভাব হয় এই নাট্যমঞ্চ থেকেই।

আট. পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়া নাট্যশালা

বেলগাছিয়া নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে। পাইকপাড়ার বিখ্যাত রাজভ্রাতৃদ্বয় প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ উদ্যোগী হয়ে তাঁদের বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে একটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন। নাম দেন বেলগাছিয়া নাট্যশালা। এই নাট্যশালার প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন সে যুগের বিখ্যাত ধনী ও বিদ্বজ্জন এবং নাট্য উৎসাহী যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের চেষ্টাতেই ওরিয়েন্টাল থিয়েটারের অভিনেতারা এই রঙ্গমঞ্চে এসে যোগ দেন এবং আর ইংরেজি নাটকের অভিনয় নয়, এবার বাংলা নাটকের অভিনয়ে প্রস্তুত হন। এই প্রস্তুতি তাঁরা প্রথমে নিয়েছিলেন রামজয় বসাকের বাড়িতে নাট্যশালা স্থাপন করে 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটক অভিনয়ের মাধ্যমে। এদের মধ্যে প্রধান ছিলেন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। সহযোগী ছিলেন অভিনেতা প্রিয়নাথ দত্ত, দীননাথ ঘোষ। এঁরা ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে ইংরেজি নাটকের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে এবং মিঃ ক্লিঙ্গার ও মিসেস ক্লেরা ইলিস-এর কাছে নাট্যাভিনয় শিক্ষা করে ইংরেজি থিয়েটারের মঞ্চব্যবস্থা ও মঞ্চোপকরণ ব্যবহার এবং অভিনয়-কলা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করেন। কেশবচন্দ্র বেলগাছিয়া নাট্যশালায় নাট্য পরিচালনা ও অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। প্রিয়নাথ ও দীননাথ সক্রিয় সহযোগিতা করেন এবং অভিনয়ে অংশ নেন। এই সময়কার অনেক ইংরেজি শিক্ষিত তরুণ বাঙালিও এই নাট্যশালার সঙ্গে নানাভাবে জড়িত ছিলেন।

রঙ্গালয়টি ইংরেজি থিয়েটারের আদর্শে বিপুল অর্থ ব্যয়ে স্থায়ীভাবে তৈরি করা হয়। ইংরেজ শিল্পীদের দিয়ে এর দৃশ্যপট আঁকানো হয়। থিয়েটারে অভিজ্ঞ ইংরেজ শিল্পীদের ব্যবস্থাপনায় মঞ্চ পরিকল্পিত হয়। পাদপ্রদীপে গ্যাসের আলো দেওয়া হয়। নানারকমের গীতবাদ্যের সহযোগে প্রথম দেশীয় ঐকতানবাদন চালু করা হয়। নাট্যাভিনয়ের সময়ে প্রচুর খরচ করে চরিত্রানুগ সাজসজ্জা প্রস্তুত করা হয়। অভিনেতারা সবাই শিক্ষিত ও

নাট্যরসবোদ্ধা ছিলেন। স্ত্রী ভূমিকায় পুরুষেরাই অংশগ্রহণ করে। রঙ্গমঞ্চের বিবিধ ব্যবস্থার, শুধুমাত্র ঐকতানবাদন ও নাট্যবিষয় ছাড়া, সব কিছুতেই, যেমন, মঞ্চসজ্জা, সাজসজ্জা, দৃশ্যপট, আলো এবং স্টেজ নির্মাণে কলকাতার সাহেবদের থিয়েটারের অনুবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

রঙ্গমঞ্চের বহিরঙ্গগত কাঠামো ইংরেজদের থিয়েটার থেকে গ্রহণ করলেও, বেলগাছিয়া নাট্যশালায় প্রথম নাটক অভিনয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু সংস্কৃত নাটকের অনুবাদের দিকেই হাত বাড়াতে হলো। শ্রীহর্ষের সংস্কৃত নাটক 'রত্নাবলী'র বাংলা অনুবাদ করে দিলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। অনুবাদের জন্য পেলেন দুইশো টাকা। এই নাটকটি দিয়েই বেলগাছিয়া থিয়েটারের নাট্যাভিনয়ের উদ্বোধন হলো—১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ জুলাই, শনিবার। এই নাটকটি অভিনয় করার জন্য রাজারা দশ হাজার টাকা খরচ করলেন।

মঞ্চ, সাজসজ্জা, আলো, সঙ্গীত এবং অভিনয়ের গুণে 'রত্নাবলী'র খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল, উপস্থিত দর্শকবৃন্দ ও পৃষ্ঠপোষক—উদ্যোক্তারা পরিতৃপ্ত হলেন। দর্শকের বারংবার অনুরোধে 'রত্নাবলী'র ছয়-সাতবার অভিনয় করতে হলো। বারংবার দৃশ্যসজ্জা ও মঞ্চকৌশলের মাধ্যমে রাজা উদয়নের প্রাসাদে আগুন লাগা, পূর্ণচন্দ্রের প্রকাশ, যাদুকরের মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আলোর বিচ্ছুরণ—দর্শকদের চমৎকৃত করেছিল।

রত্নাবলীর অভিনয় দেখতে এসেছিলেন ছোটলাট হেলিডে সাহেব, মিঃ হিউম, ডাঃ গুডইব চক্রবর্তী। অন্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নাট্যকার রামনারায়ণ, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীকৃষ্ণ বাহাদুর প্রমুখ।

রত্নাবলী নাটকের ভূমিকালিপি :

> রাজা উদয়ন—প্রিয়নাথ দত্ত। বিদূষক—কেশব গঙ্গোপাধ্যায়। রুমজ্বান—ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ। যৌগন্ধরায়ণ—গৌরদাস বসাক, দীননাথ ঘোষ, তারাচাঁদ গুহ। দর্ভব্যা—নবীন মুখোপাধ্যায়। বাহুভূতি—গিরিশ চট্টোপাধ্যায়। বাসবদত্তা—মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী, চুনীলাল বসু। রত্নাবলী—হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কাঞ্চনমালা—শ্রীরামপুরের জনৈক ব্রাহ্মণ। সুসঙ্গতা—অঘোরচন্দ্র দিঘরিয়া। বাজিকর—শ্রীনাথ সেন। দ্বারবান—যদুনাথ ঘোষ। সূত্রধর—ক্ষেত্রনাথ গোস্বামী। নট—রমানাথ লাহা। নর্তকী—কালিদাস সান্যাল ও কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। তোপদার—দ্বারকানাথ মল্লিক ও কৃষ্ণগোপাল বসু।

সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। দেশীয় ঐকতানবাদনে ছিলেন ক্ষেত্রমোহন পাল ও যদুনাথ গোস্বামী। সঙ্গীত রচয়িতা—গুরুদয়াল পাল। নাট্যশিক্ষকের দায়িত্বে ছিলেন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

'রত্নাবলী'র অভিনয় দেখে স্বয়ং ছোটলাট বাঙালির নাটক অভিনয়ের প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানান এবং অভিনেতাদের অভিনন্দিত করেন। এই নাট্যানুষ্ঠানে গীতবাদ্য, আলো, সাজসজ্জা অভিনয় এত উন্নতমানের হয়েছিল যে, হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা (৫ আগস্ট, ১৮৫৮) এই অভিনয়ের বিবরণ দিতে গিয়ে সাহেবদের চৌরঙ্গী ও সাঁ সুসি

থিয়েটারের প্রসঙ্গ আলোচনা করে এই নাট্যাভিনয়ের উদ্যোক্তাদের সাধুবাদ জানান।

অভিনয়ে বেশির ভাগই ইংরেজি শিক্ষিত তরুণেরা ছিল। রাজা ঈশ্বরচন্দ্রও অভিনয় করেন। তবে অভিনয়ে কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বিদূষকের ভূমিকায় সবচেয়ে খ্যাতিলাভ করেন। কেউ কেউ তাঁকে এই অভিনয়ের জন্য 'বাংলার গ্যারিক' আখ্যায় ভূষিত করেন। বেলগাছিয়া নাট্যশালার প্রথম নাটকের অভিনয় এদেশে নাট্যাভিনয়ের কিংবদন্তীরূপে প্রচারিত হয়ে গেল।

ইংরেজ দর্শকের জন্য 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। সেই সুবাদে তিনি বেলগাছিয়া নাট্যশালার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন এবং 'রত্নাবলী'র অভিনয়ের প্রস্তুতি দেখেন এবং এইরকমের অকিঞ্চিৎকর সাধারণ একটি নাটকের জন্য রাজারা এত খরচ করছেন জেনে বিস্ময়বোধ করেন। রাজাদের কাছে কোনো ভালো মৌলিক বাংলা নাটক ছিল না। এই রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্যই মধুসূদন তাঁর 'শর্মিষ্ঠা' নাটকটি রচনা করেন। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় 'শর্মিষ্ঠা'র প্রথম অভিনয় হয় ৩ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৯। তৃতীয় অভিনয়--২১ সেপ্টেম্বর, এবং ষষ্ঠ অভিনয় হয় ২৭ সেপ্টেম্বর। ১৮৫৯-এর সেপ্টেম্বরের ৩ তারিখ থেকে ২৭ তারিখের মধ্যেই ছয়বার অভিনীত হলো।

'শর্মিষ্ঠা'র অভিনয়েও এদেশী ও বিদেশীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। 'শর্মিষ্ঠা'র অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন :

> যযাতি—প্রিয়নাথ দত্ত। বিদূষক মাধব্য—কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। শুক্রাচার্য—দীননাথ ঘোষ। বকাসুর—ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ। দেবযানী—হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। শর্মিষ্ঠা--কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়। নট--চুনীলাল বসু। এছাড়া যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র সভাসদ হিসেবে মঞ্চে অভিনয় করেছিলেন।

শর্মিষ্ঠা ও দেবযানীর অভিনয় সকলকে মুগ্ধ করে। অন্য সকলের অভিনয়ও খুবই উৎকৃষ্ট মানের হয়েছিল। লেফটেনান্ট গভর্নর গ্রান্ট সাহেব, পাটনার মুন্সী আমীর আলী উপস্থিত থেকে অভিনেতাদের উৎসাহিত করেন। বিদেশী দর্শকদের জন্য শর্মিষ্ঠা নাটকেরও ইংরেজি অনুবাদ করানো হয়েছিল। শর্মিষ্ঠার অভিনয় দেখে নাট্যকার স্বয়ং মধুসূদন খুবই পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন ; তাঁর প্রায় বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল এমন অভিমত তিনি বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে এই অভিনয়ের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে লিখেছিলেন : 'As for my own feelings, they were, things to dream of, not to tell.'

'শর্মিষ্ঠা'র অভিনয়ের সাফল্য বেলগাছিয়া নাট্যশালার খ্যাতি বাড়িয়ে দেয়। 'রত্নাবলী'র মতো 'শর্মিষ্ঠা'র অভিনয়েও সিংহ রাজভ্রাতারা চেষ্টার ত্রুটি করেননি। অবশ্য মধুসূদন 'শর্মিষ্ঠা' রচনার সময়ে খেয়াল রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন যাতে 'রত্নাবলী' অভিনয়ের জন্য প্রচুর খরচ করে যেসব দৃশ্যপট অঙ্কন করা হয়েছে এবং পোষাক-পরিচ্ছদ তৈরি হয়েছে, সেগুলির সদ্ব্যবহার করা যায়। অনেকটা সেই ভাবেই তিনি চরিত্র এবং দৃশ্য পরিকল্পনা করেছিলেন। কেশবচন্দ্র 'রত্নাবলী'তে বিদূষকের ভূমিকায়

অসামান্য সাফল্য লাভ করেছিলেন. সেই কারণে কেশবের উপযোগী মাধব্য বিদূষকের চরিত্র মধুসূদন সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। তাছাড়া উদ্যোক্তা, দর্শক ও অভিনেতাদের কথা মাথায় রেখেই মধুসূদন 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে সংস্কৃত নাট্যাদর্শের ব্যবহার করেছেন আবার ইংরেজি নাট্যাদর্শকে স্বীকার করে প্লট. চরিত্র ও সংলাপ রচনা করার চেষ্টা করেছেন।

সখের নাট্যশালার ইতিহাসে বেলগাছিয়া নাট্যশালার অবদান অনেকদিক দিয়েই উল্লেখযোগ্য :

১. এই নাট্যশালার জাঁকজমক, দৃশ্যপট অঙ্কন, দেশীয় ঐকতানবাদন, নৃত্যগীত, সাজসজ্জা এবং অভিনেতাদের কৃতিত্বপূর্ণ উন্নতমানের অভিনয়--ধনী বাঙালির বাড়ির সখের সমস্ত নাট্য প্রচেষ্টাকে ছাড়িয়ে যায়।

২. সখের নাট্যশালার ইতিহাসে বেলগাছিয়া নাট্যশালার অভিনয় শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই নাট্যশালার সঙ্গে সংযোগের ফলেই বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের আবির্ভাব। তাঁর 'শর্মিষ্ঠা' এই নাট্যশালার তাগিদেই রচিত ও অভিনীত হয়। শিবনাথ শাস্ত্রী যথার্থ বলেছেন :

'এই নাট্যালয় বঙ্গসাহিত্যে এক নবযুগ আনিয়া দিবার উপায়স্বরূপ হইল। ইহা অমর কবি মধুসূদনের সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিল।'—

[রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ]

মধুসূদনও এই নাট্যশালার প্রধান উদ্যোক্তা সিংহ রাজভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি সম্মান জানিয়ে প্রকাশিত 'শর্মিষ্ঠা'-র ভূমিকায় লিখেছিলেন--

'যদি ভারতবর্ষে নাটকের পুনরুত্থান হয়, তবে ভবিষ্যৎ যুগের লোকেরা এই দুইজন উন্নতমনা পুরুষের কথা বিস্মৃত হইবে না--ইহারাই আমাদের উদীয়মান জাতীয় নাট্যশালার প্রথম উৎসাহদাতা।'

৩. বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনয়ের জন্যই মধুসূদন পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো সালিখের ঘাড়ে রোঁ নাটক-প্রহসন রচনা করেন। কিন্তু উদ্যোক্তা ও পৃষ্ঠপোষকদের অসুবিধা ও আপত্তির কারণে এর কোনোটিই এখানে অভিনীত হয় নি। মধুসূদনের নাট্যকার জীবনের সম্ভাবনার অঙ্কুর এবং বিকাশ যেমন এই নাট্যশালা থেকেই, তেমনি পর পর লেখা নাটকগুলির অভিনয় না করাতে মনোবেদনার কারণে তাঁর সত্যিকারের নাট্যকার জীবনের অপমৃত্যুও এই নাট্যশালার জন্য।

৪. রত্নাবলী ও শর্মিষ্ঠা ছাড়া বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অন্য কোনো নাটকের আর অভিনয় হয় নি। যদিও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের উদ্যোগে কয়েকটি ইংরেজি প্রহসন (Power and Principle, Prince for an hour, Fast Train, High Pressure Express) অভিনয়ের জন্য মহলা শুরু করেছিলেন। কিন্তু এই রঙ্গমঞ্চে কোনো ইংরেজি নাটকের অভিনয় করা সমীচীন হবে না বিবেচনায় ইংরেজি প্রহসনগুলির অভিনয়ের প্রস্তুতি আর এগোয়নি।

৫. এর মধ্যে রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের অকালমৃত্যুতে (২৯ মার্চ, ১৮৬১) এই নাট্যশালায় আর কোনো নাটকের অভিনয়ের সম্ভাবনা বন্ধ হয়ে যায়।
তবুও নাট্যমঞ্চ, নাট্য উপস্থাপনা, অভিনয়, গীতবাদ্য এবং সর্বোপরি মধুসূদনের নাট্যরচনা তথা বাংলা সাহিত্য রচনার শুভযাত্রা--সব মিলিয়ে বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে বেলগাছিয়া নাট্যশালা অবশ্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে।
৬. শুধু ধনী বাঙালির শখ-শৌখিনতা নয়, যথার্থে বাংলার নাট্যসংস্কৃতি গড়ে তোলার উদ্যোগ বেলগাছিয়া নাট্যশালা নিয়েছিল।

নয়. রামগোপাল মল্লিকের প্রাসাদে মেট্রোপলিটান থিয়েটার

চিৎপুরের সিঁদুরিয়াপটিতে রামগোপাল মল্লিকের প্রাসাদে মেট্রোপলিটান থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে। ছয় বছর আগে এইখানেই মেট্রোপলিটান কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। সেই স্থানেই মুরলীধর সেনের স্বত্বাধিকারিত্বে এই থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। কেশবচন্দ্র সেন রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষ ছিলেন।

উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবাবিবাহ' নাটক এখানে অভিনীত হয় ২৩ এপ্রিল, ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে। দ্বিতীয়বার ঐ একই নাটকের অভিনয় হয় ঐ বছরেরই ৭ মে তারিখে। ১৮৫৬তে বিধবাবিবাহ আইন চালু হওয়ার পর এদেশে নানা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এই থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ এবং নাট্যকার সকলেই বিধবাবিবাহের সপক্ষে ছিলেন। উমেশচন্দ্র মিত্র তাঁর নাটকে বিধবা নারীদের মর্মযাতনা এবং সমাজপতিদের নিষ্করুণ নিষ্ঠুরতা বর্ণনা করেছেন। বিধবা বিবাহের সপক্ষে বিপক্ষে এই সময়ে অনেক নাটক রচিত হয়েছিল। উমেশ মিত্রের এই মৌলিক নাটকটি এখানে অভিনয়ের জন্য দৃশ্যপটগুলি এঁকেছিলেন মিঃ হলবাইন। চিত্রপটগুলি সুচিত্রিত ছিল। সঙ্গীত খুবই মনোহর হয়েছিল। গান রচনা করেন দ্বারকানাথ রায় এবং সুর দেন রাধিকাপ্রসাদ দত্ত। কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর জীবনীকার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার অভিনয়ে অংশ নেন। কেশবচন্দ্র ছাত্রজীবনে 'হ্যামলেট' নাটকে অভিনয়ে যে দক্ষতা অর্জন করেন, তাই এখানে কাজে লাগান। এছাড়া টোল পণ্ডিত, তর্কালঙ্কার, ভট্টাচার্য, সুখময়ী প্রভৃতি চরিত্রের অভিনয় উৎকৃষ্ট হয়েছিল।

বিদ্যাসাগর মেট্রোপলিটান থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি দু'বারই 'বিধবাবিবাহ' নাটকটির অভিনয় দেখেন এবং দুঃখে চোখের জল ফেলেন। অবশ্য নাট্যাভিনয়ের উৎকর্ষের জন্য যতটা, তার চেয়ে অনেক বেশি 'হিন্দু নারীর চিরবৈধব্য ভোগের কুফল' মঞ্চে প্রত্যক্ষ করেই তাঁর এই অশ্রুপাত!

এই মৌলিক সমাজসংস্কারমূলক নাটকটি অভিনয়ের ফলে কলকাতায় খুবই উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের ধারা বেয়েই সখের মঞ্চে সমাজসংস্কারমূলক নাটক আদৃত হতে থাকে।

দশ. যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়িতে পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়

বিদ্বজ্জন, ধনী ও নাট্য উৎসাহী মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পাথুরিয়াঘাটার রাজবাড়িতে বঙ্গনাট্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে। যতীন্দ্রমোহনের খুল্লতাত প্রসন্নকুমার ঠাকুর ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে 'হিন্দু থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করে বাঙালি ধনীর বাড়িতে নাট্যাভিনয়ের প্রচলন করেন। যতীন্দ্রমোহনও বাংলা নাটকের অভিনয়ের অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন। বেলগাছিয়া নাট্যশালার তিনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বাঙালি ছাত্রদের ইংরেজি নাট্যাভিনয় থেকে সরিয়ে এনে তিনি ওরিয়েন্টাল থিয়েটারের অভিনেতাদের রামজয় বসাকের নাট্যশালায় এবং বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে নিয়ে আসেন বাংলা নাটক অভিনয়ের জন্য। তিনি নিজেও নাট্যরচনা ও নাট্যসঙ্গীত রচনায় পারদর্শী ছিলেন। ছোটখাট দু-একটি ভূমিকাতেও তিনি অভিনয় করেছিলেন।

বেলগাছিয়া নাট্যশালা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তিনি নিজের পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গনাট্যালয় প্রতিষ্ঠার আগেই তাঁদের আদিবাড়িতে গোপীমোহন ঠাকুরের নাচঘরে তাঁর ভাই শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহযোগিতায় একটি ছোট রঙ্গমঞ্চ ছিল। সেখানে কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের বাংলা অনুবাদ ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে অভিনীত হয়েছিল। পরের বছর দ্বিতীয়বার অভিনয় হয়।

যতীন্দ্রমোহনের প্রতিষ্ঠিত বঙ্গনাট্যালয় বড় আকারের এবং স্থায়িত্বের দিক দিয়ে দীর্ঘকালীন ছিল। এখানে অনেকগুলি নাটকের অনেকদিন ধবে অভিনয় হয়েছিল। এখানে দর্শকাসন ছিল দুশোরও বেশি। দর্শকদের মধ্যে থাকতেন তাঁর বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও সম্ভ্রান্ত দেশী-বিদেশী অতিথিবর্গ।

পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে প্রথম অভিনীত হয় ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকাকারে, ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর। নাট্যরূপ দেন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর স্বয়ং। সেই রাত্রে একই সঙ্গে অভিনীত হয় রামনারায়ণের প্রহসন 'যেমন কর্ম তেমনি ফল'। বিদ্যাসুন্দর ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দের ৬ জানুয়ারি, দ্বিতীয়বার অভিনয় হয়। বিদ্যাসুন্দরের দুটি অভিনয়েই রেওয়ার মহারাজা উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় অভিনয়ের পর তিনি সন্তুষ্ট হয়ে প্রত্যেককে একটি করে শাল ও সকলকে একসঙ্গে তিন হাজার টাকা দেন।

বিদ্যাসুন্দর অভিনয়ের মঞ্চসজ্জা, দৃশ্যপট, গীতবাদ্য এবং অভিনয় খুবই চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। অভিনয়ে বিশেষ করে, মদনমোহন বর্মণ (বিদ্যা), কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় (হীরা মালিনী), রাধাপ্রসাদ বসাক (রাজা বীরসিংহ), হরিমোহন কর্মকার (মন্ত্রী), গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (গঙ্গা ভাট) সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এঁরা ছাড়া অভিনয়ে ছিলেন--মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সুন্দর), হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ধূমকেতু), নারায়ণচন্দ্র বসাক (বিমলা), যদুনাথ ঘোষ ও হরকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (সুলোচনা, চপলা), ব্রজদুর্লভ দত্ত (প্রহরী), অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় (প্রতিহারী) প্রমুখ।

'বিদ্যাসুন্দর' এবং 'যেমন কর্ম তেমনি ফল'--দুটির একসঙ্গে অভিনয় নয় দশবার হয়েছিল। ১৮৬৬-এর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির মধ্যেই ৫টি অভিনয়ের খবর পাওয়া যায়।

এখানে 'বুঝলে কিনা' নামে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখা একটি প্রহসনের অভিনয় ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর অভিনীত হয়। কলকাতায় দলপতিদের দলাদলি ও চক্রান্তের মুখোশ খুলে দেবার চেষ্টাতেই প্রহসনটি এই রঙ্গালয়ের জন্য লেখা হয়েছিল। এরও দৃশ্যপট, গীতবাদ্য এবং অভিনয় সকলকে পরিতৃপ্ত করেছিল। অভিনয় দেখতে উপস্থিত দলপতিদের মুখের ভাব ও মানসিক অবস্থা কিরকম হয়েছিল তার বর্ণনা পাওয়া যায় 'বেঙ্গলী' পত্রে (২২ ডিসেম্বর, ১৮৬৬)।

তারপর এখানে অভিনীত হয় রামনারায়ণের করা ভবভূতির সংস্কৃত নাটক 'মালতীমাধব'-এর অনুবাদ। ১৪ জানুয়ারি, ১৮৬৯। এই বছরেই ৫, ৬ এবং ১৯ ফেব্রুয়ারি মালতীমাধব নাটকের পুনরভিনয় হয়। রামনারায়ণের আত্মকথা থেকে জানা যায় যে, 'মালতীমাধব' এই মঞ্চে দশ-এগার বার অভিনীত হয়েছিল।

তারপর অভিনীত হলো কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র'-এর বাংলা অনুবাদ। সঙ্গে রামনারায়ণের লেখা আরো দুটি প্রহসন—চক্ষুদান ও উভয়সঙ্কট! ২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে এই রঙ্গালয়ে সাময়িকভাবে অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৭২-এর ১৩ জানুয়ারি আবার অভিনয় শুরু হয় 'রুক্মিণীহরণ' ও 'উভয়সঙ্কট' দিয়ে! দুটিই রামনারায়ণের লেখা। রুক্মিণীহরণের অভিনয়ও বেশ কয়েকবার হয়েছিল।

এরপরে এখানে অভিনয় প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৭৩-এর ২৫ ফেব্রুয়ারি বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ির অতিথি হলে তাঁর সম্মানে রুক্মিণীহরণ ও উভয়সঙ্কট আবার অভিনয় করা হয়। প্রচুর গণ্যমান্য ইংরেজ পুরুষ ও মহিলা এবং দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের সামনে এই নাটক দুটির অভিনয়ের সময় ইংরেজি সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হয়েছিল।

১৮৭৩-য়ে আবার নাট্যশালাটি বন্ধ হয়ে যায়। অনেকদিন পরে ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে পুনরায় চালু হলে শৌরীন্দ্রমোহনের লেখা ছোট দৃশ্যকাব্য 'রসাবিষ্কারকবৃন্দ' অভিনীত হয়।

যতীন্দ্রমোহনের প্রচেষ্টায় তাঁর বাড়ির বঙ্গনাট্যালয় শুধুমাত্র তাঁদের বাড়ির নাট্যালয় হয়ে ছিল না। সেকালের জ্ঞানীগুণী, রাজা-মহারাজা এবং শিক্ষিত বাঙালি এখানে নাট্যাভিনয় এবং নাটক অভিনয়ের সহযোগী ও দর্শক হিসেবে সদাসর্বদাই আসা-যাওয়া করেছেন। বাংলা থিয়েটার ও অভিনয়ের দ্বিতীয় পর্ব অর্থাৎ সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার (১৮৭২) প্রাক্-মুহূর্তে যতীন্দ্রমোহনের এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়ে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা লিখেছিল যে, পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয় রাজাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান হলেও, তাঁদেব বদান্যতায় এটি একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে।

এই রঙ্গমঞ্চে রামনারায়ণের একাধিক অনুবাদ, মৌলিক নাটক এবং প্রহসনের অভিনয় হয়েছিল। প্রহসন তিনখানি রচনা করে তিনি মহারাজার কাছে পুরস্কৃত হয়েছিলেন। সেই সময়ে প্রায় সব সখের নাট্যশালার সঙ্গেই রামনারায়ণের যোগাযোগ ছিল। তিনি এই নাট্যশালাগুলির জন্য অকাতরে অনুবাদ, মৌলিক পূর্ণাঙ্গ নাটক ও

প্রহসন রচনা করে দিয়েছিলেন। পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে রামনারায়ণের সবচেয়ে বেশি অনুবাদ, মৌলিক নাটক ও প্রহসনের অভিনয় হয়েছে। সে যুগের সবচেয়ে আদৃত নাট্যকার রামনারায়ণ যে 'নাটুকে' আখ্যা পেয়েছিলেন, তার মূলে পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যালয়ের অবদান স্বীকার্য।

স্টেজ-নির্মাণ, মঞ্চ-ব্যবস্থা, দৃশ্যপট অঙ্কন, গীতবাদ্য ও অভিনয় সব দিকেই এই নাট্যালয় কুশলতা প্রদর্শন করেছে। কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে নতুন যুগের ভাবনায় অগ্রবর্তী হতে পারেনি। বাংলা নাটকের যে অবশ্যম্ভাবী নতুন পরিবর্তন ক্রমে ঘটে চলেছিল মধুসূদন দীনবন্ধুর হাতে এবং দু'এক বছরের মধ্যেই সাধারণ রঙ্গালয়ে নাটকের যে পটপরিবর্তন হতে চলেছে--তা ধরবার মানসিকতা বা অনুপ্রেরণা যতীন্দ্রমোহন বা তাঁর বঙ্গানাট্যালয়ে অভিনেয় নাটকগুলির মধ্যে ছিল না। সেখানে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী, পৌরাণিক কাহিনী কিংবা সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ এবং সমাজ সমস্যামূলক ব্যঙ্গ বিদ্রূপের প্রহসনের বাইরে তাঁরা যেতে পারেননি। তবুও বাংলা নাটক অভিনয়ের ধারাকে দীর্ঘকাল সঞ্জীবিত রেখে এবং উন্নত মানের মঞ্চব্যবস্থায় উন্নত ধরনের অভিনয় প্রদর্শন করে বঙ্গনাট্যালয় সখের নাট্যশালার ইতিহাসে উজ্জ্বল কৃতিত্ব রেখে গেছে। পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ের কৃতিত্বগুলি সূত্রাকারে বলা যেতে পারে :

এক. সখের নাট্যশালাগুলির মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী নাট্যমঞ্চ।

দুই. এই নাট্যশালাতেই একমাত্র নিয়মিত ও ধারাবাহিক নাট্যাভিনয় হয়েছে।

তিন. নাট্যকার রামনারায়ণের বেশির ভাগ নাটক ও অনুবাদ এই মঞ্চের জন্যই লেখা।

চার. দেশীয় ঐকতানবাদনের বৈশিষ্ট্য ; শৌরীন্দ্রমোহনের 'কনসার্ট' সে সময়ে খুবই বিখ্যাত হয়েছিল।

পাঁচ. 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা এই রঙ্গালয়কে জাতীয় নাট্যশালার মর্যাদা দিতে চেয়েছিল এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও ধারাবাহিক অভিনয়ের জন্য।

ছয়. যতীন্দ্রমোহনের আত্মীয় অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি এই মঞ্চের অভিনয় ও রঙ্গমঞ্চ ব্যবস্থা দেখে নিজের নাট্যানুশীলনের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে ছিলেন বলে নিজেই জানিয়েছেন। এই অর্ধেন্দুশেখর পরবর্তী ন্যাশনাল থিয়েটার ও সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার প্রধানতম ঋত্বিক।

সাত. নাটকের ক্ষেত্রে কোনো নতুনতর ভাবনা আনতে না পারলেও, এই মঞ্চের নাট্যোপস্থাপনার গুণে সব নাটকই চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছিল।

আট. এই রঙ্গালয়ের উদ্যোক্তা যতীন্দ্রমোহন শুধু এই থিয়েটারের জন্যই নয়, তখনকার উল্লেখযোগ্য প্রায় সব সখের নাট্যশালাগুলির সঙ্গেই উপদেষ্টা ও সাহায্যকারী হিসেবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন।

নয়. এই রঙ্গালয় পাথুরিয়াঘাটার প্রাসাদ ছাড়িয়ে বহু মানুষকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল।

এগার. শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিকাল সোসাইটি

অনেক আগে, সেই ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে শোভাবাজারের রাজবাড়িতে রাধাকান্ত দেবের উদ্যোগে একটি বড় হলঘরের মধ্যে ছোট একটি মঞ্চ তৈরি করে দুটি ইংরেজি নাটকের ('লাভার্স অফ সালামাঙ্কা' ও 'দি ফক্স অ্যান্ড দি উলফ') অভিনয় হয়েছিল ; ১৮৪৪-এর ১৯ অক্টোবর। সাঁ সুসি থিয়েটারের স্টেজ ম্যানেজার মিঃ ব্যারী তাঁর অভিনেত্রী স্ত্রীকে নিয়ে এই নাট্যমঞ্চের মঞ্চ নির্মাণে ও নাট্য নির্দেশনায় সাহায্য করেন। প্রয়োজনীয় দৃশ্যপট দিয়ে ছোট মঞ্চটি সাজানো হয়। এই অভিনয়ের সঙ্গে মঁসিয়ে রজিয়ার-এর 'টাইট অ্যান্ড স্লাক রোপ' নৃত্য দেখানো হয়েছিল। তারপর দীর্ঘকাল এখানে অভিনয় হয়নি। আবার শুরু হলো ১৮৬৫-তে।

রাধাকান্ত দেবের ভ্রাতুষ্পুত্র দেবীকৃষ্ণ বাহাদুরের উদ্যোগে আবার রঙ্গমঞ্চ তৈরি করে নাট্যাভিনয় শুরু হয়। রাজবাড়ির ছেলেরা এবং বাইরের বেশ কিছু শিক্ষিত যুবক মিলে স্থাপন করেন শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিকাল সোসাইটি। কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতি ছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ।

ধনী বাড়ির যুবকবৃন্দের নাট্যাভিনয়ের এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানায় 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা। ধনী যুবকেরা নীচ আমোদ-প্রমোদে অর্থ ও সময় ব্যয় না করে নাট্যাভিনয়ে মনোযোগ দেওয়াতে তাদের অভিনন্দন জানানো হয়।

এখানে প্রথম অভিনীত হয় মধুসূদনের প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা', ১৮ জুলাই, ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে। দ্বিতীয়বার অভিনয় হয় ২৯ জুলাই। ১৯ জন অভিনেতা অভিনয়ে অংশ নেন। নট-নটীর সঙ্গীত সুমধুর হয়েছিল। অভিনয়ে নববাবু, বৈরাগী, কর্তা, হরকামিনীর অভিনয় প্রশংসা অর্জন করে।

দর্শক ছিলেন রাজা দিগম্বর মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখ প্রায় একশো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। কিছুদিন পরে সভাপতি কালীপ্রসন্ন সিংহ আরো কিছু সদস্যের সঙ্গে এই থিয়েটারের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেন। তা সত্ত্বেও অভিনয় অব্যাহত থাকে। ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি (সোমবার) মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের অভিনয় হয়। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন :

> ভীমসিংহ—বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। বলেন্দ্রসিংহ--প্রিয়মাধব বসুমল্লিক। জগৎ সিংহ--কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ। সত্যদাস--কুমার আনন্দকৃষ্ণ। ধনদাস--মনমোহন সরকার। কৃষ্ণকুমারী--কুমার ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ। বিলাসবতী--হরলাল সেন। মদনিকা— রামকুমার মুখোপাধ্যায়। এদের মধ্যে ধনদাস, মদনিকা, ভীমসিংহ, বলেন্দ্রসিংহ চরিত্রের অভিনয়ের প্রশংসা হয়েছিল।

এই নাট্যশালা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কথা হলো--

১. কর্তাব্যক্তিদের সাহায্য ছাড়াই যুবকবৃন্দ উৎসাহে ও পারদর্শিতায় নাট্যাভিনয় করেছিল।

২. এই রঙ্গালয়ই প্রথম মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'কৃষ্ণকুমারী'

নাটকের অভিনয়ের সাহস ও কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। কেননা, এই প্রহসন ও নাটকটি মধুসূদন বেলগাছিয়ার জন্য লিখলেও সেখানে নানা প্রতিকূলতার কারণে নাট্যশালার কর্তৃপক্ষ অভিনয় করতে পারেননি। এতদিন ধরে অন্য কোথাও অভিনীত হয়নি। এতদিনের অক্ষমতা শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিকাল সোসাইটি দূর করতে সমর্থ হয়েছিল।

তা সত্ত্বেও দেখি কিছু সংবাদপত্রের কাছে প্রহসনটির অনেকাংশ সুরুচি, সুনীতির পরিপন্থী বলে মনে হয়েছিল।

বার. ঠাকুরবাড়ির জোড়াসাঁকো নাট্যশালা

১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুরবাড়িতে জোড়াসাঁকো নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাড়িতে তাঁর মধ্যম পুত্র গিরীন্দ্রনাথের অংশে (৫ নম্বর বাড়ি) এই নাট্যশালাটি তৈরি হয়। প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ও গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গুণেন্দ্রনাথ ছিলেন গিরীন্দ্রনাথের ছোট ছেলে এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের খুড়তুত ভাই। সারদাপ্রসাদ এঁদের নিকট আত্মীয়। গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বাবুবিলাস' নামে একটি নাটক এর আগে লিখেছিলেন এবং সেটি ঠাকুরবাড়িতে অভিনীতও হয়েছিল। তার আগে পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংরেজদের চৌরঙ্গী ও সাঁ সুসি থিয়েটারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। এই বাড়ির মধ্যেই নাটকের আবহাওয়া গড়ে উঠেছিল। যদিও ধর্মমতে দেবেন্দ্রনাথের বাড়ি (৬ নং) ছিল ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত এবং গিরীন্দ্রনাথের বাড়ি (৫ নং) ছিল হিন্দু সমাজভুক্ত। কিন্তু মানসিকতায় এঁরা কেউ গোঁড়া ছিলেন না। তাই দুই বাড়ির ছেলেরা মিলেই যখন নাট্যশালা স্থাপন করে অভিনয় শুরু করেছিল, তখন নাটোর থেকে দেবেন্দ্রনাথ গণেন্দ্রনাথকে (গিরীন্দ্রনাথের বড় ছেলে, গুণেন্দ্রনাথের দাদা) একটি চিঠিতে লেখেন (১৬ জানুয়ারি, ১৮৬৭)

'প্রাণাধিক গণেন্দ্রনাথ,

তোমাদের নাট্যশালার দ্বার উদঘাটিত হইয়াছে—সমবেত বাদ্য দ্বারা অনেকের হৃদয় নৃত্য করিয়াছে—কবিত্বরসের আস্বাদনে অনেকে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে। নির্দোষ আমোদ আমাদের দেশের যে একটি অভাব, তাহা এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইবে। পূর্বে আমার সহৃদয় মধ্যম ভায়ার [গিরীন্দ্রনাথ] উপরে ইহার জন্য আমার অনুরোধ ছিল, তুমি তাহা সম্পন্ন করিলে। কিন্তু আমি স্নেহপূর্বক তোমাকে সাবধান করিতেছি যে, এ প্রকার আমোদ যেন দোষে পরিণত না হয়। সদ্ভাবের সহিত এ আমোদকে রক্ষা করিলে আমাদের দেশে সভ্যতার বৃদ্ধি হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

ইতি—

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্মণঃ।'

এইভাবে ঠাকুরবাড়ির নাটকের ঐতিহ্য, উৎসাহ ও চেষ্টার মধ্য দিয়ে জোড়াসাঁকো নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। নাট্যপ্রযোজনা, নাট্যনির্বাচন ইত্যাদির জন্যে 'কমিটি অফ ফাইভ' নামে পাঁচ জনের কমিটি তৈরি হয়। তাতে ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গুণেন্দ্রনাথ, কৃষ্ণবিহারী সেন, অক্ষয় চৌধুরী ও যদুনাথ মুখোপাধ্যায়। কৃষ্ণবিহারী সেন ছিলেন নাট্যশিক্ষক, তিনি এর আগে 'বিধবাবিবাহ' নাটকে পড়ুয়ার ভূমিকায় অভিনয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। এরা ছাড়া দুই বাড়ির প্রত্যেকেই কোনো-না-কোনোভাবে যুক্ত থেকে এখানে অভিনয়ের ব্যাপারে সাহায্য করেন।

কলকাতায় তখন ধনী বাড়ির সখের নাট্যশালায় অভিনয়ের যে ধুম পড়েছিল, জোড়াসাঁকো নাট্যশালা তার থেকে একটু পৃথক ছিল। এখানে ইংরেজি থিয়েটারের আদলের সঙ্গে দেশীয় রীতির মিশ্রণে নাট্যোপস্থাপনার চেষ্টা করা হয়। দেশীয় যাত্রারীতির পরিশোধন করে, বিলিতি থিয়েটারের মধ্যে তাকে ফেলে অভিনয়ের চেষ্টা এখানে দেখা গেল্।

ঠাকুরবাড়িতে এর আগে তিন দিন ধরে যাত্রানুষ্ঠান হয়েছিল। তার বিবরণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি থেকে জানা যায়। সেখানে সাধারণ লোকের, বিশেষ করে নিম্নশ্রেণীর ভীড়ই ছিল বেশি। এদের নাট্যশালার অভিনয়ে ঐ নিম্নরুচির যাত্রাকে উন্নত করে থিয়েটারের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করাই বোধ হয় এদের উদ্দেশ্য ছিল। গোপাল উড়ের যাত্রা দেখেই যে তাঁরা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন, তা জানা যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একটি চিঠি থেকে। ১৪ জুলাই, ১৮৬৭, গুণেন্দ্রনাথকে আমেদাবাদ থেকে চিঠিতে লেখেন :

> 'It was Gopal Ooriah's Jatra, that suggested us the idea of projecting a theatre. It was Gangooly (Saradaprasad), you and I that proposed it.'

পাঁচ নম্বর ঠাকুরবাড়ির দোতলার হলঘরে মঞ্চ তৈরি করা হয়। সেখানে ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে অভিনয় করা হয় মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক। এবং তার কিছুদিন পরেই অভিনীত হয় মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসন। এই অভিনয়ের বিস্তারিত খবর পাওয়া না গেলেও, এটুকু জানা যায় যে, দুটির অভিনয়ই খুবই উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। বাড়ির অনেকেই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রথম নাটকে কৃষ্ণকুমারীর মাতা এবং দ্বিতীয় প্রহসনে পুলিশ সার্জনের ভূমিকায় অভিনয় করেন।

এরপর অভিনয়ের জন্য মনোমত নাটক না পেয়ে উদ্যোক্তারা অভিনয় উপযোগী এবং লোকশিক্ষার উপযুক্ত নাটক অনুসন্ধান করতে থাকেন। অবশেষে, বহুবিবাহ, হিন্দুমহিলার দুরবস্থা এবং পল্লীগ্রামস্থ জমিদারের অত্যাচার বিষয়ে নাটকের জন্য সংবাদপত্রে (ইন্ডিয়ান মিরর, ১৫ জুলাই, ১৮৬৫) বিজ্ঞাপন দেন। রামনারায়ণ নাটক লিখে দিতে রাজি হন এবং বহুবিবাহ বিষয়ে 'নবনাটক' রচনা করে দেন। নাটকটি মুদ্রিত

হয়ে প্রকাশ পায় ১৮৬৬-এর মে মাসে। এই নাটকের জন্য নাট্যশালা কমিটি নাট্যকারকে একটি রৌপ্যপাত্রে দুশো টাকা পুরস্কার দেন। অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র।

'নবনাটক' অভিনয়ের সময়ে বাড়ির 'বড়'র দল যোগ দেয়। গণেন্দ্রনাথ (গুণেন্দ্রনাথের দাদা) প্রধান দায়িত্ব নেন। তখনকার শ্রেষ্ঠ পটুয়াদের দিয়ে দৃশ্যপট অঙ্কন করানো হয়, সামনের যবনিকা পর্দায় রাজস্থানের ভীমসিংহের সরোবর-তটস্থ 'জগমন্দির' প্রাসাদ অঙ্কিত হয়। প্রায় ছয় মাস ধরে মহড়া চলে অভিনয় ও গীতবাদ্যের।

নবনাটকের প্রথম অভিনয় হলো ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দের ৫ জানুয়ারি। অভিনয়ে ছিলেন :

> জ্যোতিরিন্দ্রনাথ--নটী। নীলকমল মুখোপাধ্যায়--নট। যদুনাথ মুখোপাধ্যায়--চিত্ততোষ। সারদাপ্রসাদ--গবেশবাবুর স্ত্রী। অক্ষয় মজুমদার--গবেশবাবু। মতিলাল চক্রবর্তী--কৌতুক। অমৃতলাল গঙ্গোপাধ্যায়--ছোট গিন্নী। বিনোদলাল গঙ্গোপাধ্যায় --সুবোধ। এরা সবাই ঠাকুরবাড়ির আত্মীয় পরিজন এবং নিকট বন্ধু।

এই অভিনয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মুক্তোর মালা, হীরের গয়না পরে নটীর বেশে সংস্কৃতে বসন্ত বর্ণনার গান গাইতেন। নটী যে মেয়ে নয়, তা বোঝাই যেত না। এই নাটকে তিনি আবার কনসার্টে হারমোনিয়াম বাজিয়েছিলেন।

'নবনাটক' এখানে নয় বার অভিনীত হয়। প্রত্যেক অভিনয়েই গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত আত্মীয়বর্গ উপস্থিত থাকতেন। নবনাটকের স্টেজ ও দৃশ্যপট তৈরির পর মঞ্চব্যবস্থা করতে গিয়ে আঁকা দৃশ্যগুলির সামনে বাস্তবসম্মত উপচার হাজির করা হয়েছিল। একটি 'বন-দৃশ্যে' দৃশ্যপটের সামনে তরুলতা এবং তাতে জীবন্ত জোনাকী পোকা আঠা দিয়ে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। অনেকের মতো জ্যোতিরিন্দ্রনাথও জানিয়েছেন যে, অতি সুন্দর ও সুশোভন এই দৃশ্যকে দূর থেকে দেখলে সত্যিকারের বনের মতই বোধ হতো। সূর্যাস্ত ও সন্ধ্যার দৃশ্যগুলিও মনোহর হয়েছিল।

প্রথমবারের অভিনয়ে নাট্যকার রামনারায়ণ উপস্থিত ছিলেন এবং অভিনয় দর্শনে খুবই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। অভিনয়ে গবেশবাবু (অক্ষয় মজুমদার) এবং চিত্ততোষ (যদুনাথ মুখোপাধ্যায়) সবাইকে মাতিয়ে দেন। কৌতুক ও রসময়ীর অভিনয়ও ভালো হয়েছিল। সোমপ্রকাশ পত্রিকা এই অভিনয়ের কিছু ত্রুটি উল্লেখ করলেও, এর সর্বাঙ্গীন সাফল্যের জন্য নাট্যশালার উদ্যোক্তাদের সাধুবাদ দেন।

নবনাটকের অভিনয় এতই উচ্চাঙ্গের হয়েছিল যে, পরবর্তীকালের অভিনেতা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি পরে বলেছিলেন যে, এই অভিনয় দেখেই তাঁর অভিনয় সম্বন্ধে যা কিছু দেখবার, শোনবার ও জানবার বাকি ছিল তা সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। [ব্যোমকেশ মুস্তাফি : বঙ্গীয় রঙ্গালয়] কথাটির মধ্যে অতিশয়োক্তি থাকতে পারে, কিন্তু পরবর্তী সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা ও পরিচালকের এই মুগ্ধতা জোড়াসাঁকো নাট্যশালার উপস্থাপনার কৃতিত্বকেই উজ্জ্বল করে তোলে।

১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে বিজ্ঞাপনের উত্তরে আরেকটি নাটক রচনা করে বিপিনবিহারী সেনগুপ্ত দুশো টাকা পুরস্কার পান। 'হিন্দু মহিলা' নাটকটি অবশ্য এখানে অভিনীত

হয়নি। কারণ তার আগে এই নাট্যশালার অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়।

জোড়াসাঁকো নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয় এদেশে সখের থিয়েটারের জোয়ারের সময়। ধনী বাঙালির প্রাসাদ-মঞ্চের সঙ্গে এই নাট্যশালার পার্থক্য এই, এখানে বাড়ির সবাই যুক্ত হয়ে অভিনয় করত এবং শুধুমাত্র আমোদ-প্রমোদ বা রাজবাড়ির জৌলুষ দেখানোই এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। পাশ্চাত্য নাট্যরীতির সঙ্গে ভারতীয় নাট্যরীতি এবং বাংলার নিজস্ব দেশজ নাট্যরীতির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে নাট্য-উপস্থাপনা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে একটা নতুন নাট্যধারা সৃষ্টির প্রয়াস এখানে লক্ষ্য করা যায়।

এই সময়েই ঠাকুড়বাড়িতে হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠিত হয়ে জাতীয়তাবোধের উদ্বোধন ঘটে চলেছে। ন্যাশনাল ভাবের উদ্‌গাতা নবগোপাল মিত্র এই অভিনয়ের মধ্যে জাতীয়তাবোধের প্রকাশ লক্ষ্য করে উল্লসিত হয়েছিলেন—'It had no borrowed airs, and was quite in keeping with national taste (The National Paper : 9 January, 1867)' দৃশ্যসজ্জার সবকিছুর প্রশংসা করে সোমপ্রকাশ পত্রিকা (২-১-১৮৬৭) সবকিছুই যে এতদ্দেশীয় শিল্পজাত তার প্রশংসা করেছিল।

পরবর্তীকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের নাট্য-প্রযোজনার মধ্যে এই জাতীয় প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অলীকবাবু' নাটক অভিনয়ের মাধ্যমে জোড়াসাঁকো নাট্যশালা পুনর্জীবিত হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রধান উদ্যোগী ও ভূমিকাভিনেতা। সে এক ব্যাপক ও বিচিত্র ইতিহাসের সূত্রপাত। তার আলোচনা পরে, রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার অধ্যায়ে।

তের. বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়

কলকাতার বহুবাজার অঞ্চলে বহুবাজার অবৈতনিক নাট্যসমাজ স্থাপিত হয়। প্রধান উদ্যোগী ছিলেন বলদেব ধর ও চুনিলাল বসু। এরা দুজনেই ভালো অভিনেতা ছিলেন এবং এর আগে পাথুরিয়াঘাটায় যতীন্দ্রমোহনের বঙ্গনাট্যালয়ে অভিনয় করেছেন। চুনিলাল প্রধানত স্ত্রীচরিত্রের অভিনয়ে দক্ষ ছিলেন। তাদের উৎসাহ ও প্রেরণায় এবং অঞ্চলের যুবকবৃন্দের চেষ্টায় প্রথমে অস্থায়ীভাবে একটি মঞ্চ তৈরি হয়। ২৫নং বাঞ্ছারাম অক্রুরের গলিতে গোবিন্দচন্দ্র সরকারের বাড়িতে নির্মিত এই রঙ্গমঞ্চের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন মধ্যস্থ পত্রিকার সম্পাদক ও নাট্যকার মনোমোহন বসু। এই নাট্যশালার জন্য তিনি 'রামাভিষেক' নাটক রচনা করে দেন। নাটকটি দিয়েই বহুবাজার নাট্যসমাজের নাট্যাভিনয় শুরু হয়, ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দের ৩ অক্টোবর।

এই রঙ্গশালাটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে নির্মাণ করা হয়েছিল। দৃশ্যপটগুলি নাটকের প্রয়োজন মতো তৈরি করা হয়েছিল। পোষাক পরিচ্ছদ ও সাজসজ্জা সুরুচিসম্পন্ন ও যথাযথ হয়েছিল। অভিনয়ও খুব উচ্চমানের হয়েছিল। তবে নারীচরিত্রগুলির অভিনয় এবং সঙ্গীত ভালো হয়নি বলে কেউ কেউ জানিয়েছেন। 'রামাভিষেক' নাটকের চরিত্রলিপি :

দশরথ—অম্বিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাম—উমাচরণ ঘোষ। লক্ষ্মণ—বলদেব ধর। বিদূষক—মতিলাল বসু। কৌশল্যা—চুনিলাল বসু। সুমিত্রা—চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সীতা—আশুতোষ চক্রবর্তী। মন্থরা—ক্ষেত্রমোহন দে।

পাশ্চাত্য ট্রাজেডি রীতিতে রামাভিষেক নাটক বিয়োগান্তক হওয়াতে দেশীয় মিলনান্তক প্রথায় অভ্যস্ত অনেক দর্শকের কাছে নাটকটি সুখপ্রদ হয়নি। মনে রাখতে হবে, মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী নাটকটিও ট্রাজেডি হওয়াতে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁর বাড়ির অমঙ্গল চিন্তায়, মায়ের আপত্তিতে, নাটকটির অভিনয় করতে পারেননি।

প্রথম প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর পরে অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের চেষ্টায় ও অর্থে ২৫ নং মতিলাল লেনে বহুবাজার নাট্যসমাজের স্থায়ী নাট্যশালা তৈরি হয়। গোবিন্দচন্দ্র সরকারের বাড়ি থেকে উঠে এসে এই নতুন নির্মিত স্থায়ীমঞ্চের নাম রাখা হয় বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়। এলাহাবাদ নিবাসী নীলকমল মিত্র এবং অপর কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই নাট্যশালার স্বত্বাধিকারী ছিলেন। পরিচালকমণ্ডলীর সম্পাদক ছিলেন প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নতুন নির্মিত স্থায়ী রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত হয় মনোমোহন বসুর 'সতী নাটক' ; ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি (৩ কিংবা ১০ জানুয়ারিও হতে পারে বলে কেউ কেউ জানিয়েছেন।) শনিবার। রঙ্গমঞ্চটি সুন্দর ছিল, দৃশ্যপট খুবই সুচারুভাবে অঙ্কিত হয়েছিল এবং অভিনয়ও খুবই সুন্দর হয়েছিল। ঐকতান বাদন এবং নৃত্যগীত মনোমুগ্ধকর হয়েছিল। তাতে আঁকা দৃশ্যপটের সঙ্গে এখানে 'প্রথম' হিসাবে বসবার আসন ব্যবহৃত হয়। এখানে প্রতি শনিবার 'সতী নাটক'-এর অভিনয় হতে থাকে। শেষ অভিনয় হয় ১৮৭৪-এর ৪-এপ্রিল। সতী নাটকের চরিত্রলিপি :

শিব ও দক্ষ—চুনিলাল বসু। নারদ—প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। নগরপাল—বলদেব ধর। সতী—আশুতোষ চক্রবর্তী। অশ্বিনী—চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সনকা ও নটী—নন্দ ঘোষ।

'সতী' নাটকের পর অভিনয় হয় মনোমোহনেরই 'হরিশ্চন্দ্র' নাটক। ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। এই নাটকেরও একাধিকবার অভিনয় হয়। হরিশ্চন্দ্রের ভূমিকালিপি :

হরিশ্চন্দ্র—চুনিলাল বসু। রোহিতাশ্ব—ননীলাল দাস। বিশ্বামিত্র—প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। নগরপাল—বলদেব ধর। শৈব্যা—অবিনাশচন্দ্র ঘোষ। কমলা—বিহারী ধর। মল্লিকা—নন্দ ঘোষ।

বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়ে দেশীয় ও ইউরোপীয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকতেন। 'সতী' নাটকের অভিনয়ে ভিজিয়ানা গ্রামের মহারাজা, নাটোরের রাজা চন্দ্রনাথ রায়, পাকুড়ের রাজা উপস্থিত ছিলেন।

এই নাট্যালয় স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ তৈরি করে প্রতি শনিবার নিয়মিত অভিনয়ের ব্যবস্থা করে। যদিও তা দীর্ঘদিন চালানো সম্ভব হয়নি। তবুও প্রতি শনিবার অভিনয় আয়োজন করার মধ্যেই একটি ধারাবাহিক অভিনয় প্রচেষ্টার উদ্যম লক্ষ্য করা যায়।

এই নাট্যশালার সঙ্গে মনোমোহন বসু উদ্যোক্তা, উৎসাহদাতা ও নাট্যকার হিসেবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর লেখা সব নাটক এখানে অভিনীত হয়। মনোমোহন দেশীয় যাত্রার রীতিকে উন্নত করে এবং বিদেশী নাটকের রীতিকে মিশিয়ে নতুন নাটক রচনার চেষ্টা করেন। পুরাণাশ্রিত বিষয়কে নিয়ে পূর্বতন নাটগীতির সঙ্গে আধুনিক নাটকের রীতির যোগাযোগ ঘটালেন। এতে পুরনো যাত্রা পাঁচালির কারুণ্য ও ভক্তিভাব এবং কথকতার বাক্যবয়ন রইল নতুন ভঙ্গিতে। দেশীয় গানের সুর যোজিত হলো। ফলে তাঁর নাটক পুরাতন ও নতুনের সন্ধিবন্ধন, আদি ও মধ্যযুগের সেতু সংযোগ।

ঠিক এই সময়ে নাটকাভিনয়ের যে জোয়ার নামে সেখানে মনোমোহনের এই নাটকগুলি খুবই সহায়তা করে। অর্থাভাবে মঞ্চবিহীন অবস্থাতেও গীতাভিনয়ের মতো এগুলি অভিনয় করা যায়। যাত্রা ও নাটকের সম্মিলন ঘটানোয় মনোমোহন এ যুগে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলেন। আবার 'সতী' নাটক ট্রাজেডি হওয়াতে অনেকের অভিনয়ে আপত্তি ছিল। তাই তিনি 'হর-পার্বতী মিলন' নামে এক 'ক্রোড়অঙ্ক' লিখে ছাপিয়ে জানান, যারা বিয়োগান্তক নাটক অভিনয়ে অনিচ্ছুক তারা এই ক্রোড়অঙ্ক জুড়ে নিয়ে মিলনান্তক অভিনয় করতে পারেন। এই নাট্যরসহীন হাস্যকর প্রচেষ্টাও সে যুগে আদৃত হয়েছিল। পরবর্তী সাধারণ রঙ্গালয়ের যুগেও এইভাবে বিয়োগান্তক নাটককে ক্রোড়অঙ্ক জুড়ে মিলনান্তক করে তোলা হয়েছিল। বহু নাটকের শেষাংশে এই চিহ্ন এখনও দেখতে পাওয়া যায়।

ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা (১৮৭২) ও উদ্যোগের পূর্ববর্তী বহুবাজার নাট্যসমাজ। বিত্তবান বাবুদের দৌলত ও দালান-কোঠা আশ্রিত বাংলা নাটককে এরাই প্রথম সাধারণের কাছে নিয়ে আসার চেষ্টা করে। এদের বিত্ত ছিল না অন্যদের মতো, তবে চেষ্টা ও আন্তরিকতা ছিল বেশি। অবৈতনিক হলেও দক্ষতায় প্রায় পেশাদার। তবে এরা টিকিট বিক্রি করে নাট্য দর্শনের আয়োজন করেননি, তাদের দর্শক ছিল আমন্ত্রিত। উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি বলা যেতে পারে :

এক. নিয়মিত (প্রতি শনিবার) অভিনয় করা।
দুই. একই নাটকের ধারাবাহিক অভিনয়।
তিন. দর্শকের প্রতি শিষ্টাচার।
চার. টিকিট-ব্যবস্থা না থাকলেও বিশেষ আমন্ত্রণ পত্র ছিল।
পাঁচ. প্রযোজনা সর্বাঙ্গসুন্দর করার পেশাদারি চেষ্টা।
ছয়. নাট্যনির্বাচন, অভিনয়, মঞ্চসজ্জা, ঐকতান, গান সুন্দর ছিল।
সাত. স্থায়ী মঞ্চ নির্মাণ।
আট. এই মঞ্চের জন্যই মনোমোহনের নাট্যরচনার সূত্রপাত ও নাট্যকার-সত্তার বিকাশ।

চোদ্দ. অন্যান্য অভিনয়

এইভাবে নাট্যশালা তৈরি করে বাংলা নাটক অভিনয়ের প্রবল উৎসাহ দেখা দেয় কলকাতায় এবং তার দেখাদেখি মফঃস্বলে। এইভাবে ধনী ব্যক্তির অর্থানুকূল্যে প্রচুর

নাট্যশালা নির্মাণ ও নাটক অভিনয় হতে থাকে। এই প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য স্মরণীয় :

> 'স্থায়ী ফল দেখা যাক আর নাই যাক, সে যুগের বাঙালিদের মধ্যে নাট্যশালা অভিনয়ের দলগঠন করা সম্বন্ধে উৎসাহের কোন অভাব ছিল না। কলিকাতার প্রত্যেক পল্লীতেই বড়লোকের ছেলেরা সখের থিয়েটার ফাঁদিয়া বসিতেন, তাঁহাদের অনুকরণে মফঃস্বলবাসী সম্পন্ন ব্যক্তিরা অভিনয় সম্বন্ধে খুব উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছিলেন।' [বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস]

কলকাতার এইরকম কয়েকটি অভিনয়ের মধ্যে বলা যায়--

ভবানীপুরে নীলমণি মিত্রের বাড়ি (সীতার বনবাস, ১৮৬৬), গরানহাটার জয়চন্দ্র মিত্রের বাড়ি (পদ্মাবতী, ১৮৬৭), কাঁসারিপাড়ায় কালীকৃষ্ণ প্রামাণিকের বাড়ি (শকুন্তলা), কয়লাহাটার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাই হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি (কিছু কিছু বুঝি), বাগবাজার নাট্যসমাজে (ইন্দুপ্রভা), আড়পুলি নাট্যসমাজ, ঠনঠনিয়ায় এক ধনীর বাড়ি (এরাই আবার বড়লোক, চন্দ্রাবতী, মহাশ্বেতা)--এইসব অভিনয়ের কথা।

মফঃস্বল বলতে তখন অবিভক্ত বাংলার দুই প্রান্তেই এইরকম অনেক অভিনয় হয়েছে। ইংরেজ শাসনে কলকাতাকেন্দ্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশের ফলে, কলকাতার নাট্য-আয়োজনের কেন্দ্র থেকেই মফঃস্বলেও তা বৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়ে। চুঁচুড়া, জনাই, আগড়পাড়া, হুগলি, তমলুক, গৌহাটি, ঢাকা, বরিশাল, ময়মনসিংহ প্রভৃতি নানা অঞ্চলেই এই ধরনের অভিনয়ের খবর পাওয়া যায়। তবে বেশির ভাগই কোনো ধনী ব্যক্তির উৎসাহে কিংবা অর্থানুকূল্যেই এগুলি গড়ে ওঠে। তবে কোনো কোনোটি সেই অঞ্চলের শিক্ষিত যুবকদের চেষ্টায় নাট্যসমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ও বেশ কিছু মানুষের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠতে দেখা যায়। তবে কোনোটিই দীর্ঘস্থায়ী নয় বা কোনোটির অভিনয়ও সেকালে কোনোরকম সাড়া না ফেলে প্রায় গতানুগতিক ধারায় নাট্যাভিনয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি করেছে মাত্র।

সখের নাট্যশালার ঐতিহাসিক মূল্য ও প্রভাব

উনিশ শতকে বাংলায় আধুনিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠা এবং নাট্যাভিনয় ও বাংলায় নাট্যরচনার ধারাবাহিক সূত্রপাত করল সখের নাট্যশালা। রঙ্গালয় ও নাটক—দুটোকেই ইংরেজদের বিদেশী থিয়েটার থেকে বাঙালির আঙিনায় নিয়ে এলো এই সখের নাট্যশালা। সেই রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনেই বাংলায় আধুনিক নাট্যরচনা শুরু হলো। বিদেশী থিয়েটারের যা কিছু বাঙালির নাট্যচর্চায় গ্রহণ করা হলো--সবই নিয়ে এলো সখের নাট্যশালা। প্রেক্ষাগৃহ, রঙ্গমঞ্চ, সাজসজ্জা, অভিনয়, সংলাপ উচ্চারণ, গীত-বাদ্য, নাটকের গঠন ও আঙ্গিক—সখের নাট্যশালার মাধ্যমেই বাঙালির কাছে গৃহিত হলো।—

১. বিদেশী রঙ্গালয়ের মতোই এখানে রঙ্গমঞ্চ তৈরি করা হতো। বিদেশী থিয়েটারের অভিজ্ঞ লোক আনিয়ে তাদের সাহায্যেই মঞ্চনির্মাণ, দৃশ্যপট অঙ্কন, মঞ্চসজ্জা, ঐকতানবাদন মহার্ঘভাবে করা হতো।

২. বিদেশী রঙ্গালয়ের অভিনয়রীতি এখানে অনুসৃত হয়েছিল। সে রীতি আঙ্গিক, বাচিক ক্রিয়া ও অভিব্যক্তির মাধ্যমে গড়ে উঠত। এই নাট্যশালার প্রধান অভিনেতারা প্রায় সকলেই বিদেশী থিয়েটারের অভিনয়রীতি দেখে, করে, অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিল। তারাই সখের নাট্যশালায় অভিনয়রীতিকে বিদেশী রীতিতে নিয়ন্ত্রণ করেছিল।

৩. বিদেশী রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ পদ্ধতিতে এখানকার মঞ্চ তৈরি হওয়াতে, সেই মঞ্চের প্রভাবে অভিনেয় নাটকের চরিত্রের আগমন-নির্গমন, ঘটনাস্থল, ঘটনার উপস্থাপনা-রীতি নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। ফলে সংস্কৃতধর্মী নাট্যরচনার প্রভাব কাটিয়ে ক্রমে পাশ্চাত্য নাট্যরীতি অনুযায়ী জটিল চরিত্র, বিস্তারিত ঘটনা, দ্বন্দ্ব, ঐক্যবদ্ধ গঠন, সংলাপ তৈরি হতে থাকে।

৪. এই নাট্যশালার প্রচেষ্টা থেকেই বাংলা নাটকে দেশীয় রীতি ও পাশ্চাত্য রীতির মিশ্রণের চেষ্টা হয়েছে। যেখান থেকে বাঙালির নিজস্ব নাট্যচর্চার সূত্রপাত দেখা যায়।

৫. এই সখের নাট্যশালার অভিনয়ের দাবিতেই বাংলায় মৌলিক নাট্যরচনা শুরু হয়েছে এবং বাংলায় নতুন নাট্যকারদের আবির্ভাব ঘটেছে। রামনারায়ণ, উমেশচন্দ্র মিত্র, মধুসূদন, মনোমোহন বসু, দীনবন্ধু (নাটক লিখলেও এখানে অভিনীত হয়নি) কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি নাট্যকারদের আবির্ভাব ও তাঁদের নাট্যরচনা এই রঙ্গালয়গুলি থেকেই হয়েছে।

বেলগাছিয়া নাট্যশালা থেকে মধুসূদনের শুধু নাট্যরচনাই শুরু নয়, তাঁর বাংলা ভাষাতেই সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দীপনা দেখা দেয়। তাঁর নাট্যরচনা নিয়ন্ত্রণও করেছে এই নাট্যশালা। কালীপ্রসন্ন তাঁর বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চের জন্য নাটক লিখেছেন, সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করেছেন। রামনারায়ণের নাট্যরচনার সূত্রপাত, বিকাশ এবং 'নাটুকে' খ্যাতি তো এই রঙ্গালয়গুলি থেকেই। উমেশ মিত্র এই রঙ্গালয়ের তাগিদেই বিধবাবিবাহ লেখেন, অন্য নাটকগুলিও এখানকার অভিনয়ের জন্যই লেখা হয়েছে। মনোমোহন বসু বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়ের জন্যই তাঁর সব নাটকগুলি রচনা করেছেন। অন্যদের ক্ষেত্রেও কোনো না কোনো মঞ্চের দাবী কাজ করেছে।

৬. সখের নাট্যশালার প্রথম কুড়ি বছর (১৮৩১-৫১) মূলত ইংরেজি নাটক এবং ইংরেজি ও সংস্কৃত নাটকের অনুবাদের অভিনয় চলে। শেষ কুড়ি বছর (১৮৫২-৭২) মৌলিক নাটকের অভিনয় হয়। সাহেবদের অনুসরণে প্রথমে রঙ্গ-মঞ্চ তৈরি হলেও, বাংলায় অভিনয়যোগ্য নাটক ছিল না। তাই ইংরেজিতেই নাটক করতে হয়েছে নতুবা অনুবাদ করে নিতে হয়েছে। শেষে মৌলিক নাটকের দাবীতেই এসেছেন বাংলার নাট্যকারেরা। বাংলায় নাটক লেখার চর্চা ও জোয়ার এনেছিল সখের নাট্যশালা।

৭. এখানে অভিনীত নাটকের মধ্যে সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ ও অনুসরণ, পৌরাণিক কাহিনীর নাট্যরূপ, কিছু প্রহসন ও সামাজিক সমস্যামূলক নাটক, ইতিহাস অবলম্বনে নাটক এবং শেক্সপীয়ারের আদলে লেখা নাটক। কিছু নক্সাজাতীয় রচনা, পারস্পরিক ব্যক্তি ও পরিবারের উতোর-চাপানের জন্যই লেখা হয়েছিল।

৮. পরবর্তী সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগীদের কেউ কেউ সখের নাট্যশালাগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির মঞ্চে 'কিছু কিছু বুঝি' প্রহসনে তিনটি চরিত্রে অভিনয় করেন। এটিই তাঁর জীবনের প্রথম অভিনয়। ধর্মদাস সুর এই নাট্যপ্রযোজনাতেই প্রথম রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষরূপে কাজ করেন। স্টেজ ম্যানেজার হিসেবে তিনি এই মঞ্চনির্মাণ করে তাঁর পরবর্তী জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা ও সাধারণ রঙ্গালয়ের যুগে এঁরা দুজনেই তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছিলেন।

৯. সখের নাট্যশালায় অভিনয়ের মাধ্যমে নব্যশিক্ষিত বাঙালির নাট্যবোধ, রুচি ও স্পৃহা গঠিত হয়েছিল। প্রচলিত যাত্রা থেকে সরে এসে নতুন থিয়েটারের প্রতি নতুন যুগের আকর্ষণ তৈরি করেছিল এই নাট্যশালাগুলি। এদের অভিনয়, সেই অভিনয়ে উপস্থিত নিমন্ত্রিত দর্শক এবং সংবাদপত্রের সমালোচকের মাধ্যমে এই খবর প্রাসাদ-মঞ্চের গণ্ডীর বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। সংবাদপত্রগুলি সে সময়ে জনমত গঠনে ও আধুনিক রঙ্গালয়ের প্রসারে খুবই কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিল।

১০. সখের নাট্যশালার পৃষ্ঠপোষকদের হিন্দু জাতীয়তাবোধের ভাবনা, সংস্কৃতমুখীনতা, সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টার কারণে আধুনিক নাট্যভাবনার ব্যাপকতম প্রকাশ এখানে হতে পারেনি। রামনারায়ণকে দিয়ে এই কাজগুলি হয়েছিল, তাই তিনি এই সময়ের সবচেয়ে আদৃত নাট্যকার। মধুসূদনের নাট্যসত্তার পূর্ণ স্ফূরণ সেই কারণেই এখানে হতে পারেনি। মধুসূদনের সেই মানসিক ক্ষোভ ও জ্বালা আমরা জানি। দীনবন্ধুর নীলদর্পণের মতো নাটক ১৮৬০-এ লেখা হয়ে গেলেও, এই নাট্যশালায় অভিনীত হয়নি। সাধারণ নাট্যশালার যুগ অবধি তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছে। ব্রিটিশের ঔপনিবেশিক শাসনের উপজাত এই ধনী বাঙালি শ্রেণী ব্রিটিশের সহায়তা চেয়েছে, বিরোধিতা কখনোই নয়।

১১. ধনীদের প্রাসাদ-মঞ্চে সকলের প্রবেশাধিকার ছিল না। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, রাজকর্মচারী ও অনুগৃহিত ব্যক্তি ছাড়া অন্যদের সেখানে প্রবেশের সাধ্য ছিল না। অথচ ১৯ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই যে নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রসার হয়ে চলেছে, তাদের নবজাগ্রত নাট্যস্পৃহা সখের নাট্যশালায় ধনীদের প্রাসাদ-মঞ্চের মাধ্যমে মেটেনি। প্রাসাদ-মঞ্চের আওতার বাইরে বাংলা নাটক ও নাট্যাভিনয়কে

প্রসারিত করবার প্রেরণা ও উদ্যম থেকেই মধ্যবিত্তের থিয়েটারের যাত্রারম্ভ। ১৮৭২-এ ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই বাংলা থিয়েটারের নতুন যুগের শুভ উদ্বোধন ঘটে।

১২. একথা ঠিক, যাত্রা, কবিগানের নিম্নরুচি থেকে সরে এসে শিক্ষিত মানস যে নতুন থিয়েটার ও নাটকের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, তাদের স্পৃহা এই সখের নাট্যশালাতেই কিছুটা সাজুয্য লাভ করেছিল। তাছাড়া সাহেবী থিয়েটারের শিক্ষা, তার ব্যবহার ও অভ্যাস এই নাট্যশালাগুলিতেই হয়েছে। বাংলা প্রসেনিয়াম থিয়েটারের সূচনাপর্বে সখের নাট্যশালাই ছিল বাঙালির নাট্যচর্চার শুধু প্রধান নয়, একমাত্র প্রবাহ।

১৩. শৌখিন, ধারাবাহিকতাবিহীন, অস্থায়ী, আন্দোলন সৃষ্টিতে ব্যর্থ—ইত্যাদি যত ব্যর্থতার কথাই সখের নাট্যশালা প্রসঙ্গে বলা হোক না কেন, বাংলা থিয়েটার ও নাটকের উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশের ইতিহাসে সখের নাট্যশালার ঐতিহাসিক অবস্থান ও মূল্যকে কখনোই অস্বীকার করা যাবে না। সীমাবদ্ধতা ও সিদ্ধি নিয়েই তার ইতিহাস রচনা করতে হবে।

সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি ও সূত্রপাত

এক. বাগবাজার এমেচার থিয়েটার—শ্যামবাজার নাট্যসমাজ (১৮৬৮-৭২)

দুই. ন্যাশনাল থিয়েটার (১৮৭২-৭৩)

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। ন্যাশনাল থিয়েটারের নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমেই এদেশে সাধারণ রঙ্গালয়ের সূত্রপাত। তাই বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসের ধারায় ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এর ঐতিহাসিক কার্যকারণটি লক্ষ্য করার মতো।

এর আগে কলকাতার ধনী বাঙালির বাড়িতে মঞ্চ বেঁধে নাট্যাভিনয় চালু হয়েছিল। ধনীদের এই সখের নাট্যশালাগুলিতে, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের এই প্রাসাদ-মঞ্চগুলিতে তাঁদের খুশি অনুযায়ী নাটক হতো। মঞ্চের মালিক তাঁরা, দর্শক তাঁদের আমন্ত্রিত, অভিনেতারাও তাঁদের পরিবারের কিংবা বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়স্বজন। এর বাইরে যে বিরাট জনগণ তারা এই নতুন প্রচলিত নাট্যাভিনয়ের খবর পাচ্ছে নানাভাবে, কিন্তু প্রাঙ্গণের ভেতরে প্রবেশাধিকার তাদের ছিল না। অথচ অনেকের মধ্যে অভিনয়স্পৃহা এবং অভিনয় দর্শনেচ্ছা প্রবলতর হয়েছে।

১৯ শতকের পাঁচের দশক থেকেই পত্রপত্রিকায় এই ধরনের চাহিদার প্রতিফলন হতে শুরু করেছে। প্রাসাদ-প্রাঙ্গণের বাইরে সাধারণ মানুষের জন্য নাটকাভিনয়ের আবেদন চারিদিকে প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা কালীপ্রসন্নের বিদ্যোৎসাহিনী মঞ্চে 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে জানায় (২৪ নভেম্বর, ১৮৫৭) : একটি সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হোক। কিশোরীচাঁদ মিত্রও অনুরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। হিন্দু পেট্রিয়টের সিলেকশান বিভাগে, ১১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৬০, প্রস্তাবিত 'ক্যালকাটা পাবলিক থিয়েটার'-এর প্রসপেকটাস ছাপা হয়। এই বিজ্ঞাপনে দেখি, প্রজেকটাররূপে রাধামাধব হালদার ও যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নাম। বিজ্ঞাপনে বলা হলো :

ক. হিন্দুমঞ্চকে য়ুরোপীয় আদর্শে পুনর্গঠিত করা হবে।

খ. দেশীয় এবং ইংরেজ উভয় শ্রেণীর দর্শকের পক্ষে সহজগম্য স্থানে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হবে।

গ. পরিবর্তিত রুচির অনুকূল মৌলিক ট্রাজেডি, কমেডি, ফার্সের অভিনয় আয়োজন করা হবে।

ঘ. অভিনয়ে 'অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানাইজড ব্যান্ড'-এর ব্যবস্থা থাকবে।

ঙ. সুপটু চিত্রকরের সাহায্যে আধুনিক ফ্যাশন অনুযায়ী সীন এবং উইংস এঁকে নেওয়া হবে।

চ. প্রিন্স অফ ওয়েলস থিয়েটারের প্রাক্তন সম্পাদক ডব্লু. বি. কলিন্স স্টেজ ম্যানেজার হবেন।

এই প্রস্তাবে পরিষ্কারভাবে বলা হয়, যেহেতু বিত্তবানদের প্রাসাদ-মঞ্চে সাধারণের প্রবেশাধিকার অবারিত নয়, অতএব, সাধারণ রঙ্গালয় (পাবলিক থিয়েটার) প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা।

এই উদ্যোগ অবশ্য কার্যকর হয়নি। সোমপ্রকাশ পত্রে (১২.৫.১৮৬২) একটি বিজ্ঞপ্তিতে তা জানিয়ে দেওয়া হয়।

এই উদ্যোগ প্রথমেই কার্যকরী না হলেও, বোঝা যায় যে, এইরকম একটি ইচ্ছা ক্রমে গড়ে উঠছিল। ধনীদের প্রাঙ্গণ থেকে বাংলা নাট্যাভিনয়কে সর্বজনের আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসাব ইচ্ছা। সে ইচ্ছায় মঞ্চ তৈরি হবে ধনীদের বাড়ির মঞ্চের মতোই, যা কিনা পশ্চিমী মঞ্চের অনুকরণে নির্মিত। আগস্ট, ১৮৬৭-তেই 'নবপ্রবন্ধ' পত্রিকা লেখে যে, শৌখিনবাবুদের নাট্যস্পৃহার ওপর বিশ্বাস নেই, তা কতদিন থাকবে, তারও আস্থা নেই। তাই সকলে একত্রে সমবেত হয়ে কোনো একটি প্রকাশ্যস্থানে নাট্যমন্দির প্রস্তুত করে, বেতনভোগী নটনটী রেখে টিকিট বিক্রি করে অভিনয়ের ব্যবস্থা করুন। তাতে অভিনয় করা এবং দেখা--দুদিকেই সুবিধে হবে।

বেশ বোঝা যায়, এই সমস্ত আকাঙ্ক্ষা, অর্থাৎ মঞ্চের গণতন্ত্রীকরণের প্রয়াস জেগে উঠেছিল মধ্যবিত্ত মানুষের কাছ থেকেই। ধনীদের খেয়ালখুশির আওতা থেকে মুক্তির এই চেষ্টা করেছিল মধ্যবিত্ত বাঙালিবাই।

১৯ শতকের তিনের দশক থেকেই নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উল্লেখ পত্রপত্রিকায় দেখা যায়। বঙ্গদূত (১৬.৬.১৮২৯) প্রথম বাঙালি মধ্যবিত্তের উল্লেখ করে। এর চল্লিশ বছর পরে অমৃতবাজার পত্রিকা (৯.১২.১৮৬৯) মধ্যবিত্তের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ভূমিকার স্বীকৃতি জানায়। লেখে : 'যদি কোনকালে এদেশে কোনরূপ সামাজিক কি অন্য কোন বিপ্লব হয়, ইহাদের দ্বারাই তাহা সম্পাদিত হইবে। এখন দেশেতে যতরূপ শুভসূচক কার্যের উদ্যোগ হইতেছে তাহা ইহাদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত সুতরাং এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের রক্ষা ও পোষণ করা দেশহিতৈষী রাজার কর্তব্য।'

১৯ শতকের সমাজ, শিক্ষা ও ধর্ম--এই তিন সংস্কারমূলক কাজে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। নাটককে এরা শুধু প্রমোদের বা বিলাসচর্চার উপকরণ হিসেবে দেখেননি। নাটক ও মঞ্চকে এরা রসসংস্কার ও সমাজসংস্কারের অস্ত্র হিসেবেই দেখতে চাইলেন। ধনীদের একচেটিয়া শৌখিন মঞ্চে তা সম্ভব ছিল না। এর ওপর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে যে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারিত হচ্ছিল, মঞ্চকেও তারা তার বাহন করতে চাইলেন। প্রাসাদ-মঞ্চে সে সুযোগ ছিল না। তাই ধনীদের প্রাচীর-গণ্ডি থেকে নাটককে অবারিত করে সর্বজনের দরবারে হাজির করার আগ্রহ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

এই সময়েই গীতাভিনয় বা স্টেজবিহীন অপেরা জাতীয় অভিনয়ের ধারা বাঙালির

মধ্যে চালু হতে থাকে। প্রাসাদ-মঞ্চ থেকে মুক্তির এ এক প্রয়াস। এই সময়ে মনোমোহন বসু যে ধরনের নাটক লিখতে শুরু করেন, তা-ও প্রাসাদ-মঞ্চের দিকে তাকিয়ে নয়, মধ্যবিত্ত যুবগোষ্ঠির যৌথ প্রয়াসে সংগঠিত স্বতন্ত্র মঞ্চ মাধ্যমের জন্য। তখনকার যাত্রা এতই নিম্ন-রুচির ও স্থূলরসের আধার হয়ে উঠেছিল যে, স্বভাবতই শিক্ষিত ভদ্রজন এই যাত্রা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। আবার ইংরেজি ধরনের যে স্টেজ ও অভিনয়--তা এতই ব্যয়সাপেক্ষ যে সকলের সামর্থ্যে তা কুলোয় না। তাই যাত্রার বিষয়কে উন্নত করে, নাচ-গান পরিশীলিত করে লেখা হলো গীতাভিনয়। অনেকটা যাত্রার আদল, আবার থিয়েটারি মিশ্রণ। এগুলি অভিনয় করতে স্টেজ লাগে না। আবার যাত্রার মতো নিম্নরুচিরও নয় ; যাত্রা ও থিয়েটারের মেলবন্ধন। ড. সুকুমার সেন এগুলিকে বলেছেন 'চপ-সন্দেশ'। বিদেশী চপ এবং দেশী সন্দেশ।

বলদেব ধর ও চুনিলাল বসু পাথুরিয়াঘাটার অভিনেতা ছিলেন। সেখান থেকে বেরিয়ে তাঁরা বহুবাজার নাট্যসমাজ তৈরি করেন। তাদের উদ্যোগে এবং পাড়ার যুবকবৃন্দের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হলো বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়, ক্রমে তাঁরা অস্থায়ী থেকে স্থায়ী মঞ্চ তৈরি করলেন। প্রধানত মধ্যবিত্ত যুবগোষ্ঠীর প্রয়াসেই এই মঞ্চে নাট্যাভিনয় চালু হলো। স্থানীয় লোকেদেরও সাহায্য পাওয়া গেল। এখানে থিয়েটারি মঞ্চে দেশীয় যাত্রার আদল উপস্থিত করা হলো।

একদিকে স্টেজবিহীন গীতাভিনয়ের ধারা এবং অন্যদিকে পশ্চিমী মঞ্চের মডেলে গঠিত মঞ্চে নাট্যাভিনয়ের ধারা পাশাপাশি চলতে লাগল। এইসব অভিনয় কলকাতা ছাড়িয়ে চুঁচুড়া, কৃষ্ণনগর, ঢাকা, বরিশালের মত শহরাঞ্চল ও আগড়পাড়া, তমলুক, জনাই, বাড়ুলি প্রভৃতি মফঃস্বল অঞ্চলেও প্রসারিত হয়।

ধনীদের নাট্যশালার বাইরে যে সমস্ত নাট্যসমাজ তৈরি হতে থাকে সেখানে সম্মিলিত প্রয়াসে গড়ে তোলা হলো মঞ্চ। অভিনয় হতে থাকল সামাজিক সংস্কারমূলক নাটক-প্রহসন। আরপুলি নাট্যসমাজ এইভাবে অভিনয় করল 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬৬) এবং 'এরাই আবার বড়লোক' (১৮৬৮)। জনাই-এর সোসাল ইমপ্রুভমেন্ট সোসাইটির নাট্যবিভাগ ১৮৬৮তে করল 'একেই কি বলে সভ্যতা'। ১৮৬৮তেই বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয় 'রামাভিষেক' অভিনয় করে। বাগবাজারের নাট্যসমাজ ঠিক একইভাবে গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইন্দুপ্রভা' অভিনয় করে ১৮৬৮তে। বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্র সরকারের উদ্যোগে চুঁচুড়ায় অভিনীত হয় দীনবন্ধুর 'লীলাবতী' (৩০. ৩. ১৮৭২)।

এইভাবে অভিজাত বাঙালির প্রাঙ্গণ সীমানার বাইরে গীতাভিনয় ছাড়াও মঞ্চ বেঁধে নাট্যাভিনয়ের প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গিয়েছিল। জনগণের দাবী এইভাবেই নানাদিকে সংগঠিত রূপ নিচ্ছিল।

সখের নাট্যশালায় যতদিন পুরাণ কিংবা সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ অভিনয় হয়েছে, ততদিন সাধারণ মানুষের আগ্রহ এবং উৎসাহ তত বেশি গড়ে ওঠেনি। প্রথম দিকে তা

কেবলমাত্র ছিল নতুন ধরনের এই থিয়েটারের অভিনবত্বের প্রতি আকর্ষণ। কিন্তু যখন থেকে এইসব প্রাসাদ-মঞ্চে সমসাময়িক জীবন ও সমাজ সমস্যা অবলম্বন করে নাট্যাভিনয় হতে থাকল, তখনই সাধারণ মানুষ এর প্রতি আগ্রহান্বিত হলো বেশি করে। তখন থেকে সাধারণ রঙ্গালয়ের দাবীও প্রবলতর হয়ে ওঠে। নাট্যশালা শুধু আর প্রমোদ বিলাসের আনন্দ কেন্দ্র হয়ে রইলো না, এখন থেকে মঞ্চও প্রত্যক্ষ সমাজ ও জীবনসমস্যার রঙ্গক্ষেত্র হয়ে উঠল। সাধারণ মানুষ এইসব কিছুর আস্বাদন সর্বক্ষেত্রে পেতে চাইলো।

ধনীদের ছিল সাময়িক শখ-শৌখিনতার ব্যাপার। তারা খরচ করতেন, দু একজন ছাড়া কারো চিন্তাতেও ছিল না স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের কথা কিংবা নিয়মমত ধারাবাহিক নাট্যাভিনয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা। অভিনব নতুন কিছু করছেন এমন শ্লাঘাও কেউ কেউ অনুভব করেছেন। কিন্তু কখনই এগুলির সঙ্গে বৃহত্তর বাঙালির কোনো যোগ ছিল না।

কিন্তু মধ্যবিত্ত বাঙালি যখন অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে রঙ্গমঞ্চ তৈরি করে নাট্যাভিনয়ে এগিয়ে এলো তখন শুধু শখ বা নেশা নয়, তাদের জীবনবোধ, আদর্শ, উদ্দেশ্য ও সাংস্কৃতিক বিকাশের আনন্দকেন্দ্র হয়ে উঠল এই মঞ্চ। এই পটভূমিকাতেই ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা এবং সাধারণ রঙ্গালয়ের ধারার সূত্রপাত হয়েছে।

প্রস্তুতি : বাগবাজার এমেচার থিয়েটার

ধনী ব্যক্তির বাড়িতে অভিনয়ের মাধ্যমে নতুন থিয়েটার ও নাটকের সঙ্গে কিছু বাঙালির পরিচয় হয়েছে। এবারে শিক্ষিত তরুণেরা ধনীর ছত্রছায়ায় না থেকে ক্রমে নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে অভিনয়ের আয়োজন শুরু করেছে। পাড়ার লোকের কাছে চাঁদা তুলে, ধনী ব্যক্তির অর্থ সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে তারা অভিনয়ের প্রচেষ্টা চালিয়েছে। এদের কেউ কেউ ধনী ব্যক্তির বাড়িতে নাটকাভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল, কেউ কেউ এইসব নাটক দেখেছে, অনেকে কলকাতায় তখন সাহেবদের থিয়েটারে যোগাযোগ রেখেছিল। এদের প্রচেষ্টায় ক্রমে ক্রমে বাংলা থিয়েটার ধনীর প্রাসাদ-মঞ্চ ছাড়িয়ে বৃহত্তর বাঙালির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হতে পেরেছে।

বাগবাজার অঞ্চলের যুবক সম্প্রদায়ের 'বাগবাজার এমেচার থিয়েটার' আন্তরিকভাবে এই উদ্যোগ নেয়। এরাই পরে 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ' নামে অভিনয় শুরু করে। এদের প্রচেষ্টাতেই ১৮৭২-এ ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা। বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে সাধারণ রঙ্গালয়ের যুগের সূত্রপাত।

১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দে বাগবাজার এমেচার থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দলে ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধামাধব কর, অরুণ চন্দ্র হালদার। পরে এসে যোগ দেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি। থিয়েটার-পাগল বাগবাজারের এই যুবকবৃন্দ একত্রিত হয়ে নাট্যদল গঠন করলেও থিয়েটারের মঞ্চনির্মাণ,

মঞ্চসজ্জা, দৃশ্যসজ্জা, আলো ও পোষাক-পরিচ্ছদের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, সে সামর্থ্য তাদের ছিল না। এই সময়ে বাগবাজারের 'সখের যাত্রাদল' মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' অভিনয়ের আয়োজন করে। বাগবাজার এমেচার থিয়েটারের ছেলেরা তাতে যুক্ত হয়ে পড়েন। গিরিশচন্দ্র এই পালার জন্য কয়েকটি গান লিখে দেন। তারপর বছরখানেক চুপচাপ। কিন্তু থিয়েটার করার অভিপ্রায় ক্রমশই বেড়ে চলেছে। নগেন্দ্রনাথের প্রস্তাবমত তারা থিয়েটার করার জন্য প্রস্তুত হন। গিরিশচন্দ্র দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' নাটকটি বাছাই করলেন।

স্থায়ী মঞ্চ নির্মাণের সামর্থ্য না থাকাতে সুবিধেমত যে কোন স্থানে অস্থায়ী মঞ্চ বেঁধে এরা অভিনয় শুরু করল। 'সধবার একাদশী'ই তাদের প্রথম অভিনীত নাটক। ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে (সপ্তমী পূজার রাত্রে) বাগবাজারের দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের পাড়ায় প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়িতে এই অভিনয় হলো। এই অভিনয় তেমন জমেনি। তাই পরবর্তী অভিনয় করা হলো শ্যামপুকুরে নবীনচন্দ্র সরকারের বাড়িতে, অক্টোবর মাসেই কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার রাতে। এই অভিনয় সকলকে পরিতৃপ্ত করল। চতুর্থ অভিনয় হলো রায়বাহাদুর রামপ্রসাদ মিত্রের বাড়িতে স্টেজ বেঁধে। অভিনয় করেছিলেন :

> গিরিশচন্দ্র--নিমচাঁদ। অর্দ্ধেন্দুশেখর--কেনারাম। নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়--অটল। ঈশান নিয়োগী--জীবনচন্দ্র। মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়--নকড়ি। নীলকমল বা নীলকণ্ঠ গাঙ্গুলি--রামমাণিক্য। অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়--কুমুদিনী। মহেন্দ্রনাথ দাস--সৌদামিনী। রাধামাধব কর--কাঞ্চন। নগেন্দ্রনাথ পাল--নটী। অভিনয়ের শিক্ষক গিরিশ এবং সহ শিক্ষক অর্দ্ধেন্দুশেখর।

চতুর্থ রজনীর অভিনয়ে অর্দ্ধেন্দুশেখর জীবনচন্দ্র, রাধামাধব কর রামমাণিক্য এবং নন্দলাল ঘোষ কাঞ্চনের চরিত্রে অভিনয় করেন। এই অভিনয় খুব ভালো হয়। গিরিশের নিমচাঁদ এবং অর্দ্ধেন্দুশেখরের জীবনচন্দ্র খুবই প্রশংসিত হয়। গিরিশের এই অসামান্য অভিনয়ের স্মৃতি পরবর্তীকালে অমৃতলাল বসু লিখেছেন :

> 'মদে মত্ত পদ টলে নিমে দত্ত রঙ্গস্থলে,
> প্রথম দেখিল বঙ্গ নব নটগুরু তার।'

চতুর্থ অভিনয়ে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র দর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই অভিনয় দেখে মুগ্ধ হন এবং গিরিশ ও অর্দ্ধেন্দুশেখরের অভিনয়ের প্রশংসা করেন। গিরিশচন্দ্র লিখেছেন :

> 'অর্দ্ধেন্দুর 'জীবনচন্দ্রের' ভূমিকা (Part)। জীবনচন্দ্রের অভিনয় দর্শনে সকলেই মুগ্ধ। স্বয়ং গ্রন্থকার অর্দ্ধেন্দুকে বলেন, 'আপনি অটলকে যে লাথি মারিয়া চলিয়া গেলেন, উহা improvement on the author. আমি এবার সধবার একাদশীর নূতন সংস্করণে অটলকে লাথি মারিয়া গমন লিখিয়া দিব। ['বঙ্গীয় নাট্যশালায় নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী']

সর্বসমেত সাতবার 'সধবার একাদশী'র অভিনয় হয়। অর্ধেন্দুশেখরই 'জীবনচন্দ্র' অভিনয় করতে থাকেন। শেষ অভিনয় ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দের দুর্গাপূজার সময়, চোরবাগানে লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের বাড়িতে। এখানে 'সধবার একাদশী'র শেষে দীনবন্ধুর 'বিয়েপাগলা বুড়ো' অভিনীত হয়েছিল।

এরপরে একবছর অভিনয় বন্ধ ছিল। চলছিল দীনবন্ধুর 'লীলাবতী' নাটকের প্রস্তুতি। এমন সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার চুঁচুড়ায় মল্লিক বাড়িতে 'লীলাবতী'র সফল অভিনয় করলে (৩০ মার্চ, ১৮৭০) অমৃতবাজার পত্রিকা খুব প্রশংসা করে। এতে অনুপ্রাণিত হয়ে বাগবাজারের দল লীলাবতী অভিনয়ে নেমে পড়ে। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১১ মে, লীলাবতীর অভিনয় হলো, শ্যামবাজারের রাজেন্দ্রলাল পালের বাড়িতে স্টেজ বেঁধে। এই অভিনয়ের সময় থেকেই 'বাগবাজার এমেচার থিয়েটারের' নাম বদলে রাখা হলো 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ'। চাঁদা তুলে অভিনয়ের ব্যয় নির্বাহ করা হলো। দৃশ্যপটগুলি আঁকলেন ধর্মদাস সুর। তাঁকে সাহায্য করলেন যোগেন্দ্রনাথ মিত্র। ময়দানে সাহেবদের অলিম্পিক থিয়েটার-এর অনুকরণে মঞ্চদৃশ্য ও দৃশ্যসজ্জা করা হয়েছিল। আটখানি দৃশ্যই সুন্দর হয়েছিল। অতি প্রশস্ত ও সুন্দর মঞ্চে অভিনয় করলেন :

> অর্ধেন্দুশেখর--হরবিলাস ও দাসী। গিরিশচন্দ্র--ললিত। নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়--হেমচাঁদ। যোগেন্দ্রনাথ মিত্র--নদেরচাঁদ। মহেন্দ্রলাল বসু--ভোলানাথ। মতিলাল সুর--মেজখুড়ো। যদুনাথ ভট্টাচার্য--যোগজীবন। রাধামাধব কর--ক্ষীরোদবাসিনী। সুরেশচন্দ্র মিত্র--লীলাবতী। অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়--শারদাসুন্দরী। ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়--রাজলক্ষ্মী।

এছাড়া শ্রীনাথের চরিত্রে শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং রঘু উড়িয়ার ভূমিকায় হিঙ্গুল খাঁ অভিনয় করেছিলেন।

অর্ধেন্দুর হরবিলাস, গিরিশের ললিতমোহন, রাধামাধবের ক্ষীরোদবাসিনী এবং সুরেশচন্দ্রের লীলাবতী উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র লিখেছেন যে, নাট্যকার দীনবন্ধু অর্ধেন্দুর জীবনচন্দ্র দেখে খুশি হয়েছিলেন কিন্তু লীলাবতীতে হরবিলাস দেখে একেবারে চমৎকৃত হয়ে যান। তাঁর মুখে আর প্রশংসা ধরে না। এই দলের অভিনয় তাঁর চুঁচুড়ার বঙ্কিম--অক্ষয় সরকারের অভিনয়ের চেয়ে ভালো লেগেছিল বলে তিনি জানান। বলেছিলেন --'তোমাদের অভিনয়ের সহিত চুঁচুড়া দলের তুলনাই হয় না--আমি পত্র লিখিব--'দুয়ো বঙ্কিম!'

লীলাবতী পর পর কয়েকটি শনিবার একই মঞ্চে অভিনীত হলো। এর অভিনয়ের খ্যাতি এতই বিস্তৃত হয়ে পড়ল যে, দর্শক সঙ্কুলান সম্ভব হচ্ছিল না। তখনই দর্শক নিয়ন্ত্রণের জন্য 'ইউনিভারসিটি সার্টিফিকেট' দেখে তবেই প্রবেশপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা হলো। তাতে ভীড় কমল না। তখনই টিকিট বিক্রি করে অভিনয় ব্যবস্থার কথা ভাবা শুরু হলো। পত্র-পত্রিকাতেও এই টিকিট বিক্রির প্রস্তাব আসতে লাগল। 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় এক দর্শক 'লীলাবতী'র সাফল্য প্রসঙ্গে লিখলেন : 'এই

নাট্যাভিনেতৃগণ মনোযোগ করিলে এমন একটি 'দেশীয় নাট্যশালা' স্থাপন করিতে পারেন, যেখানে লোকে ইচ্ছা করিলে টিকিট ক্রয় করিয়া যাইতে পারেন এবং দেশের অনেকটা সামাজিকতার পরিচয় হয়।'— (৭ জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৯ সাল)।

মনে রাখতে হবে, ধনীদের পয়সার অভাব ছিল না। তারা অভিনয়ের ক্ষেত্রে তাই জাঁকজমকের দিকে জোর দিতেন। অথচ নাট্যপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ এই যুবক সম্প্রদায়ের বাহুল্য খরচের সামর্থ্য ছিল না। আর্থিক ব্যয়বাহুল্যের সমস্যা অনেকে গীতাভিনয়ের মধ্যে মিটিয়েছিল। বাগবাজারের দলও প্রথমে যাত্রা করেছে। কিন্তু এতে নাট্যাভিনয়ের আমেজ আসেনি। পুরোপুরি নাট্যাভিনয় করতে গিয়ে তারা তাই ব্যয়বহুল নাটক বাদ দিয়ে সহজসাধ্য সাজপোষাক, দৃশ্যসজ্জা এবং দৃশ্যপট বেছে নিয়ে অল্প খরচেই নাটক করতে চেয়েছে। তাই এদের কাছে দীনবন্ধুর সামাজিক নাটক-প্রহসনগুলি এতো আদৃত হয়েছে। তাছাড়া দীনবন্ধুর নাটকের বাস্তবধর্মিতা, অভিনয় উপযোগী দৃশ্য ও চরিত্র থাকাতে এবং বিষয়বস্তু প্রগতিশীল সমাজমনস্ক ছিল বলেও এই তরুণ সম্প্রদায়ের কাছে সহজেই গৃহিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্র তাঁর 'শাস্তি কি শান্তি' নাটকের উৎসর্গপত্রে দীনবন্ধুর কাছে এই ঋণ স্বীকার করে তাঁকে 'রঙ্গালয় স্রষ্টা' বলে প্রণাম জানিয়েছেন।

সখের নাট্যশালার যুগে দীনবন্ধুর নাটকগুলি লিখিত হলেও সে সময়ে তিনি সেখানে গৃহিত হননি, উদ্যোক্তাদের শ্রেণীমানসিকতার কারণেই। আবার মধ্যবিত্ত তরুণ সম্প্রদায়ের মানসিকতা ও সঙ্গতির সঙ্গে সাযুজ্যলাভ করাতে এই সময় এবং পরবর্তী ন্যাশনাল থিয়েটার পর্বে দীনবন্ধুই সবচেয়ে আদৃত, গৃহিত ও সম্মানিত নাট্যকার।

সূত্রপাত : ন্যাশনাল থিয়েটার
(১৮৭২-৭৩)

১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। এই থিয়েটার প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোগ নেয় বাগবাজার এমেচার থিয়েটার (পরিবর্তিত নাম শ্যামবাজার নাট্যসমাজ) এর যুবকবৃন্দ। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল সুর, রাধামাধব কর, অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, গিরিশচন্দ্র ঘোষ (প্রতিষ্ঠার সময়ে ছিলেন না, পরে যোগ দেন), অমৃতলাল বসু, ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবকবৃন্দ। পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ছিলেন প্রখ্যাত নাট্যকার মধ্যস্থ পত্রিকার সম্পাদক মনোমোহন বসু, অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ, হিন্দুমেলার উদ্যোক্তা ও ন্যাশনাল পেপার পত্রিকার সম্পাদক 'ন্যাশনাল' নবগোপাল মিত্র।

এঁদের সকলের উদ্যোগে চিৎপুরের মধুসূদন সান্যালের বাড়ির সম্মুখের অংশ মাসিক চল্লিশ টাকায় ভাড়া নিয়ে সেখানে অস্থায়ী মঞ্চ তৈরি করা হয়। ৩৬৫ নম্বর আপার চিৎপুরের সান্যালদের এই বাড়ি শ্রীকৃষ্ণ মল্লিকরা কিনেছেন। বাড়ির সামনে বড়ো ঘড়ি লাগানোর ফলে বাড়িটি 'ঘড়িওয়ালা বাড়ি' নামে পরিচিত হয়।

মঞ্চনির্মাণের প্রধান ছিলেন ধর্মদাস সুর। সহকারী ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। অর্দ্ধেন্দুশেখর ছিলেন 'জেনারেল মাষ্টার' এবং নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সেক্রেটারী। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক দিয়ে ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্বোধন হলো।

বাগবাজার এমেচার থিয়েটার লীলাবতীর অভিনয়ের সময়ে (১১ মে, ১৮৭২) নাম পালটে হয় 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ'। প্রচুর খ্যাতি ও প্রশংসায় উল্লসিত যুবকবৃন্দ এবারে দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে। তখনই অভাবিত দর্শক সমাগমে উৎফুল্ল নাট্যদল টিকিট বিক্রি করে পরবর্তী নাট্যাভিনয়ের প্রস্তাব নেয়। গিরিশচন্দ্র এতে তাঁর আপত্তি জানিয়ে দল ছেড়ে চলে যান। আপত্তির কারণ গিরিশের কথায়--

'ন্যাশনাল থিয়েটার নাম দিয়া, ন্যাশনাল থিয়েটারের উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম ব্যতীত, সাধারণের সম্মুখে টিকিট বিক্রি করিয়া অভিনয় করা আমার অমত ছিল।'

গিরিশকে বাদ দিয়েই টিকিট বিক্রি করে[১] অভিনয়ের বন্দোবস্ত করা হলো এবং

---

১. ন্যাশনাল থিয়েটার-এর প্রচেষ্টার আগেই ঢাকায় প্রথম টিকিট বিক্রি করে মনোমোহনের 'রামাভিষেক' নাটকের অভিনয় করা হয় (৩০ মার্চ, ১৮৭২)। রঙ্গভূমিতে টিকিটের দাম ছিল চার, দুই ও এক টাকা। এই টাকা দেশের সৎকার্যানুষ্ঠানে ব্যয় করা হবে বলে জানানো হয়। [অমৃতবাজার পত্রিকা (১৮.৩.১৮৭২)]

১৮৭২-এর নভেম্বর মাস নাগাদ নীলদর্পণ প্রস্তুতির সময়েই দলের নাম পালটে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' রাখা ঠিক হয়। 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার বিজ্ঞাপনে (২০-১১-১৮৭২) প্রস্তাবিত নাম দেখা যায় 'দি ক্যালকাটা ন্যাশনাল থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি'। সুলভ সমাচার (১০-১২-১৮৭২) নীলদর্পণ অভিনয়ের বিবরণ দিতে গিয়ে নাট্যদলের নাম 'কলকাতা ন্যাসনেল থিয়েট্রিকেল সোসাইটি' বলেই উল্লেখ করেছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ন্যাশনাল থিয়েটার এই দীর্ঘ নামেরই সংক্ষিপ্ত রূপ।[২]

তাদের অভিনয় সাফল্যে উজ্জীবিত বাগবাজারের থিয়েটার-পাগল ছেলেরা পুরোপুরি নাট্যাভিনয়ে নামতে গিয়ে টিকিট বিক্রির কথা ভাবতে বাধ্য হয়েছিল। টিকিট বিক্রি করলে দর্শক নিয়ন্ত্রিত হবে। তার ওপর টিকিট বিক্রির টাকায় পরবর্তী অভিনয়ের খরচ-খরচা উঠে আসবে। পত্র-পত্রিকা ও শুভানুধ্যায়ীরা তাঁদের এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেছিল। অভিনয়-সমাজের উন্নতি ও পুষ্টিসাধন করবার জন্যই এই প্রথা চালু করতে হলো। 'মাছের তেলে মাছ ভাজা'র প্রসঙ্গও অমৃতবাজার পত্রিকা উল্লেখ করেছিল। সাহেবদের থিয়েটারে টিকিট বিক্রি করে অভিনয় হত। তারই মতো এখানেও টিকিট বিক্রি শুরু হলো। ধনীদের সখের নাট্যশালায় অভিনয় দেখা ছিল আমন্ত্রণমূলক। সকলের প্রবেশাধিকার ছিল না। ন্যাশনাল থিয়েটারে টিকিট বিক্রির ফলে যে কেউ টিকিট কেটে অভিনয় দেখার সুযোগ পাবে।

নানাদিকের তাগিদে, প্রয়োজনে, উদ্যোক্তাদের আর্থিক কারণে ও ব্যয়সঙ্কুলানের জন্য টিকিট প্রথা চালু করতে হলো। টিকিটের মূল্য ছিল :

> প্রথম শ্রেণী—১ টাকা। দ্বিতীয় শ্রেণী—আট আনা। রিজার্ভ সিট—২ টাকা। দালানের সিঁড়িতে বসলে—৪ আনা। [তখন চার পয়সায় এক আনা এবং ষোল আনায় এক টাকা ছিল]।

ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনয় শুরু হলো। ঠিক যে অর্থে মধুসূদন জাতীয় নাট্যশালার আশা করেছিলেন এই ন্যাশনাল থিয়েটার সেরকম হলো না। মধুসূদন সখের নাট্যশালার খামখেয়ালিপনা পুরো ভোগ করে বুঝতে পেরেছিলেন যে, জাতীয় রঙ্গমঞ্চ না হলে স্বাধীন নাট্যকার সত্তার সম্যক বিকাশ সম্ভব নয়। অর্থানুকুল্যের জন্য তিনি চাঁদা তুলে রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুতের প্রস্তাব করেন। একক কোনো ধনী ব্যক্তির আওতা থেকে মুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টা তাতে ছিল। অথচ এই ন্যাশনাল থিয়েটার হলো অন্যরকম। কতিপয় যুবকের প্রাণপণ নাট্যপ্রয়াস ও পরিশ্রমে একটি অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চ গড়ে উঠল, ভাড়া করা জায়গায়, ভাড়া করা মালমশলায়।

তবু এইসব প্রয়াসের মাধ্যমেই নবোদ্ভূত মধ্যবিত্ত যুবক সম্প্রদায়ের আত্মবিশ্বাস বেড়ে উঠেছিল। কাগজপত্রের প্রশংসা, জ্ঞানীগুণীজনের আগমন ও সদিচ্ছাপ্রকাশ তাদের

২. অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'নবগোপালবাবু আমাদের থিয়েটারের নাম The Calcutta National Theatre রাখবার প্রস্তাব করেন। শেষে মতিবাবুর প্রস্তাবমত Calcutta-টুকু বাদ দিয়ে কেবল The National Theatre রাখা হয়।'

আরো উৎসাহিত করে তুলল। তাছাড়া সময়ের অনুকূল আবহাওয়াও কাজ করল। অনেকদিনের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা, এবার বাগবাজারের যুবকবৃন্দের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হতে দেখে সবাই একবাক্যে এদের অনুপ্রাণিত করল।

প্রাসাদ-মঞ্চের ঘেরাটোপ থেকে বাংলা নাট্যাভিনয় ও নাটক মুক্তির খোলা হাওয়ায় এসে পড়ল।

ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্বোধন হলো ৭ই ডিসেম্বর, ১৮৭২, শনিবার, দীনবন্ধুর নীলদর্পণ নাটক দিয়ে। বেণীমাধব মিত্র প্রেসিডেন্ট, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেক্রেটারী। স্টেজম্যানেজার ধর্মদাস সুর এবং অভিনয়-শিক্ষক অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি। অভিনয়ে ছিলেন :

অর্ধেন্দুশেখর—উড সাহেব, সাবিত্রী, গোলোক বসু, একজন চাষা রায়ত। নগেন্দ্রনাথ —নবীনমাধব। কিরণ--বিন্দুমাধব। শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—গোপীনাথ দেওয়ান। মতিলাল সুর--তোরাপ ও রাইচরণ। মহেন্দ্রলাল বসু--পদী ময়রাণী। শশীভূষণ দাস—আমিন, পণ্ডিত মশাই, কবিরাজ। পূর্ণচন্দ্র ঘোষ--লাঠিয়াল। গোপালচন্দ্র দাস—আদুরী, একজন রায়ত। অবিনাশচন্দ্র কর--রোগ সাহেব। ক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলি--সরলা। অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়—ক্ষেত্রমণি। তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়--রেবতী। অমৃতলাল বসু--সৈরিন্ধ্রী। [এখানেও পুরুষেরাই স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করেছে।]

নীলদর্পণ অভিনয়ে চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। যদিও প্রয়োগ-ব্যয়ের অসামর্থ্যে মঞ্চ এবং দৃশ্যসজ্জা ও আলো খুব ভালো হয়নি বলে কারো কারো মনে হয়েছে। কিন্তু উপস্থাপনার গুণে ও অভিনয়ের দক্ষতায় নাটকটি প্রচুর প্রশংসা লাভ করল। অর্ধেন্দুশেখর একাই নানাধরনের কয়েকটি চরিত্রে অভিনয়ে মাতিয়ে দিলেন। কখনো সাহেব, কখনো গোলোক বসু, কখনো স্ত্রী ভূমিকায়, কখনো চাষী—এমনি নানাবিধ চরিত্র রূপায়ণে অর্ধেন্দুশেখর অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিলেন। মতিলালের তোরাপ, অবিনাশ করের রোগ সাহেব, ক্ষেত্রমোহনের সরলা এবং অমৃত মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রমণি, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়ের রেবতী চরিত্রাভিনয় সকলেরই প্রশংসা অর্জন করল।

এই নাট্যাভিনয়ের ঘটনাকে 'The event is of national importance' বললেও ন্যাশনাল পেপার এর অভিনয়ের অসম্পূর্ণতা ও বিধিব্যবস্থার দোষত্রুটির উল্লেখ করতে ভোলেননি। কলকাতার মানুষেরা গ্রামবাংলার খবর রাখেন না এবং নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে দেশীয় কৃষকদের কি দুরবস্থা সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানও তাদের নেই। ফলে নাটকের বহু দৃশ্য তাদের কাছে হাস্যকর বলে মনে হয়েছিল। তাই সংবাদপত্রে প্রস্তাব হয়েছিল যে, এই নাটককে গ্রামবাংলায় নিয়ে গিয়ে অভিনয় করাতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়।

যাইহোক, নীলদর্পণের অসামান্য সাফল্যে উৎসাহিত যুবকবৃন্দ এবার পর পর

সপ্তাহে প্রতি শনিবার অভিনয় চালিয়ে যেতে লাগল। 'লীলাবতী' অভিনয়ের পর থেকে শনি ও বুধবার নিয়মিত অভিনয় চালু হয়। সপ্তাহে নতুন নতুন নাটক প্রয়োজনার জন্য তখন থেকেই 'প্রম্পটার' চালু করতে হয়। বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে মঞ্চের পেছনের এই স্মারকের ভূমিকা ন্যাশনাল থিয়েটার থেকেই চালু হয়ে যায়। এরা পরপর অভিনয় করলেন ১৮৭২-এ--

নীলদর্পণ--৭ ডিসেম্বর। জামাই বারিক--১৪ ডিসেম্বর। নীলদর্পণ--২১ ডিসেম্বর। সধবার একাদশী--২৮ ডিসেম্বর।

এরপর ১৮৭৩-এ করলেন--

নবীন তপস্বিনী--৪ জানুয়ারি। লীলাবতী--১১ জানুয়ারি। বিয়েপাগলা বুড়ো--১৫ জানুয়ারি। নবীন তপস্বিনী--১৮ জানুয়ারি। নবনাটক--২৫ জানুয়ারি। নীলদর্পণ--১ ফেব্রুয়ারি। নয়শো রুপেয়া (শিশির ঘোষ)--৮ ফেব্রুয়ারি। জামাই বারিক--১৫ ফেব্রুয়ারি (সঙ্গে কিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতমাতা'র অংশ)। এছাড়া কুঞ্জার কুঘটন, নববিদ্যালয়, মুস্তাফিসাহেবের পাক্কা তামাশা, পরীস্থান প্রভৃতি ফার্স ও প্যান্টোমাইমগুলি এই নাটকের সঙ্গে সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল।

এখানেই প্রায় সব নাটকই দীনবন্ধুর। বিশেষ করে নীলদর্পণ হাতের কাছে থাকলেও ধনীবাড়িতে অভিনীত হয়নি, নাট্যপাগল এই মধ্যবিত্ত যুবকেরা সেই নাটক দিয়েই ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্বোধন করে। ফলে সাহেবদের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। কায়দা করে কোনরকমে এরা তা সামাল দেয়। কিন্তু নীলদর্পণের অভিনয় এরা বন্ধ রাখেনি।

নীলদর্পণের প্রথম অভিনয়ে টিকিট বিক্রি হয় দুশো টাকার। দ্বিতীয় অভিনয়ে চারশো পঞ্চাশ টাকা। এইভাবে টিকিট প্রথা চালু করেও দর্শকের ভিড় সামলানো গেল না। বহু দর্শক টিকিট না পেয়ে ফিরে যেতে লাগল। ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনয়ের মাধ্যমে দীনবন্ধু যেমন নাট্যকার হিসেবে স্বীকৃতি ও সম্মান পেলেন, তেমনি অভিনেতা হিসেবে অর্ধেন্দুশেখর প্রধানতম হয়ে উঠলেন। গিরিশের ভাষায় 'অতুলনীয় মধ্যে অতুলনীয়'। তাঁর অভিনীত গোলক বসু, উড সাহেব, সৈরিন্ধ্রী, জীবনচন্দ্র, জলধর ইত্যাদি ভূমিকা তাঁকে প্রথম শ্রেণীর চরিত্রাভিনেতার মর্যাদা এনে দিয়েছিল।

এরপর ১৮৭৩-এর ২২ ফেব্রুয়ারি কৃষ্ণকুমারী নাটক অভিনয়ের সময়ে গিরিশচন্দ্র পুনরায় দলে ফিরে এলেন। এবং ভীমসিংহের ভূমিকায় নামলেন। ধনদাস--অর্ধেন্দুশেখর। কৃষ্ণকুমারী--ক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলি।

ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম পর্বের শেষ অভিনয় ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই মার্চ। শেষ রাতে অভিনীত হয় বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ, যেমন কর্ম তেমনি ফল। সঙ্গে প্যান্টোমাইম--বিলাতিবাবু, সাবস্ক্রিপসান বুক, গ্রীন রুম অফ এ প্রাইভেট থিয়েটার, মডেল স্কুল, মুস্তাফি সাহেব কা পাক্কা তামাশা। অভিনয় শেষে অর্ধেন্দুশেখর বিদায় ভাষণ দেন এবং বিহারীলাল বসুর গান দিয়ে অনুষ্ঠান পর্ব শেষ হয়।

এরপরেই দল ভেঙে যায়। নাটকউন্মাদ কিছু স্বার্থত্যাগী যুবক যে কষ্ট স্বীকার করে ন্যাশনাল থিয়েটার গড়ে তুলেছিলেন বহু মানুষের শুভেচ্ছা নিয়ে, তা নিজেদের মধ্যেকার বিরোধের ফলে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। দল ভেঙে যাওয়ার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কারণ :

১. টিকিট বিক্রির ফলে এদের উপার্জন ভালোই হচ্ছিল--নীলদর্পণের প্রথম ও দ্বিতীয় অভিনয়ে যথাক্রমে দুশো এবং সাড়ে চারশো টাকা, জামাই বারিকে আড়াইশো টাকা। অমৃতলাল লিখেছেন--'আমরাও অভিনয়ে প্রথম টিকিট বিক্রি আরম্ভ করি ঐ চাঁদা হিসেবে খরচ চালাবার জন্য—আপন আপন উদবপুর্তির জন্য নয়।' কিন্তু যখন তারা টিকিট বিক্রি করে টাকার মুখ দেখলেন, তখন অনেকের প্রলোভন জেগে উঠল। খরচপত্রেরও প্রয়োজন ছিল। অনেকে নিজেদের ব্যক্তিগত খরচপত্র দাবী করলেন। তাও দেওয়া শুরু হলো। পয়সার জন্য দর্শক বৃদ্ধির প্রয়োজনে তাই দেখি এরা মুল নাটকগুলির সঙ্গে কিছু প্যান্টোমাইম, হাল্কা রঙ্গ-ব্যঙ্গ-প্রহসন এবং মুস্তাফি সাহেবকা পাক্কা তামাশা জুড়ে দিচ্ছিলেন। ভালো টাকা উপার্জনের ফলে টাকাকড়ি নিয়েই প্রাথমিক মতান্তর দেখা দিল। হিসেবপত্র ঠিক রাখা, কে কত টাকা পাবে, কে পাবে না, এইসব নিয়েই দলের মধ্যে মতান্তর ও আত্মকলহ তুঙ্গে উঠল।

২. কর্তৃত্ব এবং দায়িত্ব নিয়েও দলে মতভেদ স্পষ্ট হয়ে উঠল। তার ওপর প্রভুত্ব নিয়েও গোলমাল দেখা দিল। সাংগঠনিক দিক দেখার দায়িত্বে মুলত ছিলেন নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিনয়গত দিক মুলত দেখতেন অর্ধেন্দুশেখর। এই নিয়ে দল চলছিল ভালোই। গিরিশচন্দ্র প্রথমে দলের বাইরে ছিলেন। অভিনয় জমে যাওয়ার ফলে প্রথম দিকে তিনি কাগজে বেনামে এদের নিন্দে করেছিলেন। পরে 'কৃষ্ণকুমারী' অভিনয়ের সময়ে তিনি দলে যোগ দেন এবং প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি আসার পরেই দলে মতভেদ আরো বেড়ে গেল। বিশেষ করে, গিরিশের সঙ্গে সাংগঠনিক সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার দাদা দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংঘর্ষ হল বেশি। অভিনয় শিক্ষক ও প্রধান অভিনেতা অর্ধেন্দুশেখরের সঙ্গেও মতভেদ স্বাভাবিক। সাংগঠনিক দিক, অভিনয়গত দিক এবং টাকাপয়সার হিসাবপত্রের দিক—এই তিনে মিলে দলে দুটো ভাগ স্পষ্ট হয়ে গেল। একদিকের নেতৃত্বে অর্ধেন্দুশেখর, নগেন্দ্রনাথ অন্যদিকে গিরিশচন্দ্র। গিরিশ সব দিকেই নিজের কর্তৃত্ব কায়েম করতে চেয়ে গণ্ডগোল আরো ঘনীভূত করে তুললেন।

৩. খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রশংসার দিকও গৌণ ছিল না। কাগজেপত্রে এবং বিদ্বজ্জনের মধ্যে ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনয়ের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। খ্যাতির ভাগ-বাটোয়ারা নিয়েও মনোমালিন্য মধ্যবিত্তসুলভ স্বাভাবিকতায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

৪. ব্যক্তিত্বের সংঘাত তো ছিলই। একই দলে অত বড় মাপের অভিনেতা বেশ কিছু থাকলে স্বভাবতই ব্যক্তিত্বের সংঘাত স্পষ্ট হয়ে দেখা দিতে বাধ্য।

৫. তাছাড়া পর পর অভিনয়ের জন্য এই দলের অনেক অভিনয়োপযোগী সাজসরঞ্জাম তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সেগুলি ঠিকমত রাখার জায়গা ছিল না, তার ওপর রক্ষণাবেক্ষণের অসুবিধেও দেখা দিল। অন্য কারণে মতান্তর স্পষ্ট হওয়ার ফলে এইসব সরঞ্জাম কারা দখলে রাখবে—তা নিয়েও মতভেদ বেড়ে গেল।

৬. তার ওপরে এই সময়েই বর্ষা এসে যাওয়াতে তখন খোলা জায়গায় অভিনয় সম্ভব হচ্ছিল না বলে এমনিতেই অভিনয় বন্ধ করে দিতে হয়েছিল।

এইভাবে ভেতরে কলহ এবং বাইরে প্রকৃতির বিবাদ—দুই কারণেই ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনয় বন্ধ হলো এবং দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল। ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম পর্বের এইখানেই শেষ।

৮ই মার্চ, ১৮৭৩ ন্যাশনাল থিয়েটারের দলবদ্ধ শেষ অভিনয়ের পর দল ভেঙে দুটো দল হয়ে গেল—

১. একটি রইলো ন্যাশনাল থিয়েটার নামে।

২. অপরটির নাম হলো হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার।

প্রথম দল, অর্থাৎ ন্যাশনাল থিয়েটার নামের দলে রইলেন গিরিশচন্দ্র, ধর্মদাস সুর, মহেন্দ্রলাল বসু, মতিলাল সুর, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। তারা 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামটি নিজেদের জন্য রেজিষ্ট্রি করে নিলেন। স্টেজের সরঞ্জাম এবং সিনসিনারি তারা পেলেন। নেতৃত্বে রইলেন গিরিশচন্দ্র।

নেটিভ হাসপাতালের সাহায্যার্থে এরা প্রথম নতুন দল নিয়ে নীলদর্পণ করতে চাইল, কিন্তু দলাদলিতে তাদের প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। অভিনয় হলো না। তারপরেই দল ভাগ পরিষ্কার হয়ে গেল। নতুন দল ন্যাশনাল থিয়েটার নাম নিয়ে টাউন হলে এবং রাধাকান্ত দেবের বাড়িতে স্টেজ বেঁধে অভিনয় করতে থাকে। এদের অভিনয়ের তালিকা :

নতুন ন্যাশনাল থিয়েটার—

নীলদর্পণ (টাউন হল, ২৯ মার্চ, ১৮৭৩)। সধবার একাদশী (টাউন হল, ৫ এপ্রিল, ১৮৭৩)। কৃষ্ণকুমারী (রাধাকান্ত দেবের বাড়ি, ১২ এপ্রিল, ১৮৭৩)। নীলদর্পণ (১৯ এপ্রিল, ১৮৭৩, ঐখানে)। তাছাড়া কিঞ্চিৎ জলযোগ (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর), একেই কি বলে সভ্যতা, কপালকুণ্ডলার নাট্যরূপ অভিনয় করে।

নীলদর্পণ নেটিভ হাসপাতালের সাহায্যার্থে অভিনয় করে ২১০ টাকা তুলে দেয় এবং সধবার একাদশী অভিনয় করল ইন্ডিয়ান রিফর্মস এসোসিয়েশানের সাহায্যার্থে।

এবারে এরা দলবল নিয়ে ঢাকায় যায়। গিরিশচন্দ্র যান নি। সেখানে ন্যাশনাল থিয়েটার সুবিধে করতে পারে নি। ঋণগ্রস্ত হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। পরে ভাঙা দুই দলের অনেকে মিলে মৃত মধুসূদনের অনাথ সন্তানদের সাহায্যার্থে কৃষ্ণকুমারী অভিনয় করে।

দ্বিতীয় দল, হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার নাম দিয়ে অভিনয় চালাতে থাকে। এই দলের নেতৃত্বে রইলেন অর্ধেন্দুশেখর। সঙ্গে রইলেন অমৃতলাল বসু, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। এরা পেল পোষাক-পরিচ্ছদ।

এই দল প্রথম দিকে লিন্ডসে স্ট্রিটে অপেরা হাউস ভাড়া নিয়ে অভিনয় চালাতে থাকে। প্রথম দিকে কিছু প্রহসন, প্যান্টোমাইম অভিনয় করে। পরে অভিনয় করে বিধবা বিবাহ, নীলদর্পণ।

তারপর এরাও ঢাকায় যায়। সেখানে গিয়ে নীলদর্পণ, রামাভিষেক মঞ্চস্থ করে। একমাস ঢাকায় সাফল্যের সঙ্গে নীলদর্পণ, নবনাটক, সধবার একাদশী, নবীন তপস্বিনী, জামাই বারিক, কৃষ্ণকুমারী নাটকের অভিনয় করে এই দল কলকাতায় ফিরে আসে। এরপরে দুই দলের অনেকেই মিলেমিশে আবার অভিনয় চালাবার চেষ্টা করতে থাকে। তারপর আবার রাজশাহী, বোয়ালিয়া, রামপুর, বহরমপুর প্রভৃতি জায়গায় গিয়ে অভিনয় করে আসে। চুঁচুড়ায় অভিনয় করে 'মোহান্তের এই কি কাজ!' নাট্যকার যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ।

এইভাবে মফঃস্বল বাংলায় অভিনয় করে এরা বাংলা থিয়েটারের প্রচারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। অর্ধেন্দুশেখরের নেতৃত্বে এইভাবে নানা অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে অভিনয়ের মাধ্যমে থিয়েটার প্রচারের সাফল্যের জন্য অর্ধেন্দুশেখরকে 'মিশনারি অফ দি বেঙ্গলি স্টেজ' বলা হতো।

এইখানে ন্যাশনাল থিয়েটারের দ্বিতীয় পর্বের শেষ। প্রথম পর্বে একটি দল। দ্বিতীয় পর্বে দুটি দল। তারপর দুটি দলই অভিনয় বন্ধ করে দিল।

১৮৭৩-এর ৭ই ডিসেম্বর দুই দলই সাড়ম্বরে আলাদা করে বাৎসরিক উৎসব পালন করল। ন্যাশনাল থিয়েটার নামের দল পুরনো সান্যাল বাড়িতে সভা করে এবং এইখানেই কিছু দিন অভিনয় চালাবার চেষ্টা করে। হরলাল রায়ের হেমলতা (১৩ ডিসেম্বর ১৮৭৩), নীলদর্পণ (৩ জানুয়ারি ও ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৪), বঙ্কিমের মৃণালিনীর নাট্যরূপ প্রভৃতি অভিনয় তিন মাস ধরে চালিয়ে যায়। ১৮৭৪-এর এপ্রিল মাসে এরা গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের সঙ্গে মিশে যায়।

অন্যদিকে হিন্দু ন্যাশনাল দল গ্রেট ন্যাশনাল নাম গ্রহণ করে অভিনয়ের চেষ্টা করতে থাকে। নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্মদাস সুরের উদ্যোগে এবং ধনী ভুবনমোহন নিয়োগীর অর্থে তারা বিডন স্ট্রিটে মহেন্দ্রনাথ দাসের জমি ভাড়া নিয়ে কাঠের থিয়েটার

বাড়ি তৈরি করে, ১৮৭৩-এর ৩১ ডিসেম্বর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্বোধন করলেন। অমৃতলাল বসুর লেখা 'কাম্যকানন' নাটক দিয়ে এর শুরু। প্রথম রাতেই রঙ্গ-মঞ্চটি আগুন লেগে পুড়ে যায়। নতুন করে তৈরি করে এই মঞ্চে আবার অভিনয় শুরু হয়। নানা হাত ঘুরে গ্রেট ন্যাশনাল যায় উপেন্দ্রনাথ দাস ও অমৃতলাল বসুর হাতে। তখন স্বদেশাত্মক নাট্যাভিনয়ের অপরাধে গ্রেট ন্যাশনাল রাজরোষে পড়ে। এরপরেই অভিনয়নিয়ন্ত্রণ আইন চালু হয় (ডিসেম্বর, ১৮৭৬)। গ্রেট ন্যাশনালের অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়।

গিরিশচন্দ্র এই নির্জীব গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার নিয়ে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম দিয়ে আবার থিয়েটার চালু করেন, জুলাই, ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁর চেষ্টায় ও উদ্যোগে এই নতুন ন্যাশনাল থিয়েটার চাঙ্গা হয়ে ওঠে। তখন ম্যানেজার কেদার চৌধুরী। কিন্তু পারিবারিক কারণে, বিশেষত ভ্রাতার আপত্তিতে আগমনী ও অকালবোধন অভিনয়ের পর গিরিশ স্বত্ব ত্যাগ করেন, শ্যালক দ্বারকানাথ দেব কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। এর পরে গিরিশ আর কখনো কোনো থিয়েটারের মালিক হন নি, যদিও বহুবার এই সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

১৮৭৮-এর প্রথম থেকে মালিক হন কেদার চৌধুরী। ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে গিরিশ ন্যাশনাল থিয়েটারের লীজ ছেড়ে দিলেন। দ্বারকানাথ দেব, কেদারনাথ চৌধুরী, গোপীচাঁদ শেঠ প্রমুখ ব্যক্তির মালিকানায় ন্যাশনাল থিয়েটার কিছু দিন চলে। কিন্তু কেউই ভালভাবে চালাতে পারে নি। বিনোদিনী এই সময়ের ন্যাশনাল থিয়েটারের এই দুরবস্থাকে 'থিয়েটারে অশুভ গ্রহ' বলে উল্লেখ করেছেন।

এই সময়েই থিয়েটারে রবিবারে অভিনয় শুরু হয়। দুপুরবেলা। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে গোপীচাঁদ শেঠের ন্যাশনাল থিয়েটারে ম্যানেজার ছিলেন অবিনাশচন্দ্র কর। তার সময়ে অর্থাভাবে গ্যাস কোম্পানীর বকেয়া বিলের টাকা দিতে না পারায়, গ্যাসের পাইপ লাইনের সংযোগ কেটে দেওয়া হয়। তখন গ্যাসের আলোতেই অভিনয় হতো। অবিনাশচন্দ্র গ্যাস না জ্বালিয়েই অভিনয় করবার অভিপ্রায়ে রবিবার বেলা দুটোর সময়ে অভিনয় করবার ব্যবস্থা করেন। এই নতুন ব্যবস্থায় আগ্রহী দর্শকের ভিড় বেড়ে যায়। সেই থেকে রবিবার দুপুর বেলায় 'ম্যাটিনী শো'—এর অভিনয় চলতে থাকে। [নাচঘর, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৩৮]

ন্যাশনাল থিয়েটার নীলামে উঠল। কিনে নিলেন ব্যবসায়ি প্রতাপচাঁদ জহুরী। পাকাপাকি ভাবে বাংলা থিয়েটার বাণিজ্যিক থিয়েটারে পরিণত হলো। গিরিশ এই ন্যাশনাল থিয়েটারেই ম্যানেজার হয়ে যোগ দিলেন--বেতন মাসিক একশো টাকা। বাংলা থিয়েটারে প্রথম ব্যক্তি গিরিশচন্দ্র, যিনি পুরোপুরি পেশাদারিভাবে রঙ্গমঞ্চে যোগ দিলেন।

বাংলা থিয়েটারের সে এক অন্য ইতিহাস।

ন্যাশনাল থিয়েটার কি আরেকটি পেশাদার থিয়েটার অথবা ব্যবসায়িক থিয়েটার? নাকি শৌখিন থিয়েটার? এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠতে পারে।

ধনী ব্যক্তির তৈরি গৃহাঙ্গনের নাট্যশালাগুলি পুরোপুরি সখের নাট্যশালা ছিল। ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আর্থিক দায় বহনের ইচ্ছা ও ক্ষমতা এবং মর্জি, তার ওপরে বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজনের উৎসাহ--এইসব নিয়েই সখের নাট্যশালা গড়ে উঠেছিল। সেখানে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না--তাদের দাবী-দাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

সখের নাট্যশালার গণ্ডি ভেঙে কলকাতায় ও আশেপাশে ধীরে ধীরে অন্য ধরনের নাট্যাভিনয়ের প্রচেষ্টা শুরু হয়ে যায়। সেখানে একক ধনী ব্যক্তির উদ্যম রইলো না। অনেকে মিলে সমবেত প্রয়াসে নাট্যাভিনয়ের প্রচেষ্টা দেখা যেতে শুরু করল। অথচ এই ধরনের স্টেজ বেঁধে নাট্যাভিনয়ের খরচ-পত্র অনেক বেশি। ধনী ব্যক্তিরা তা বহন করতে পারতেন। সাধারণের পক্ষে তা সম্ভব নয়। তাই অনেকে যাত্রাকে উন্নত করে গীতাভিনয় করে সেই আস্বাদ পেতে চেষ্টা করেছিল। তাতে মঞ্চ লাগে না, আবার যাত্রার নিম্ন রুচিও বাদ দেওয়া গেল। কিন্তু তাতে থিয়েটারের আমেজ ছিল না।

নানাজনের উৎসাহে বাগবাজারের এমেচার থিয়েটার যখন ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করল, তখন পূর্ববর্তী শখ-শৌখিনতা বাদ গেল। নাট্যাভিনয়ের আন্তরিক উদ্যম লক্ষ্য করা গেল। নাটকের নেশা নতুন করে দেখা দিল। সকলে নাটক দেখার সুযোগ পেল।

কিন্তু বিপত্তি হলো, টিকিট বিক্রি করা নিয়ে। ধনী ব্যক্তির বাড়ির রঙ্গালয়ে টিকিট বিক্রির কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তাদের নিজেদের আর্থিক দায়িত্ব বহনেই সেই অভিনয়গুলি চলত। কিন্তু মধ্যবিত্ত যুবকসম্প্রদায়ের নাট্যাভিনয়ের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক সঙ্গতি ছিল না। ফলে প্রথমে স্টেজ বেঁধে থিয়েটার শুরু করা এবং বারবার অভিনয়ের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, তা এ'দের ছিল না। অথচ তাদের অভিনয়ে দর্শকের উপস্থিতি অত্যধিক ছিল। ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য নানাবিধ পন্থাও অবলম্বন করা হয়েছিল। কিছু অংশে দর্শক নিয়ন্ত্রণ এবং বেশি অংশে খরচ বহনের জন্যই টিকিট বিক্রির ব্যবস্থা নেওয়া হয়। প্রথমে চাঁদা তুলেও খরচ চালাবার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। টিকিট বিক্রির ব্যবস্থা নেওয়ার মধ্যে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি ছিল না। পেশাদারিত্বের ব্যাপার তো নয়ই। কিন্তু কয়েকটি অভিনয়ের পরই দেখা গেল, ওদের নাট্যানুষ্ঠানে টিকিট বিক্রি ভালো হওয়ার জন্য আর্থিক লাভ যথেষ্ট হচ্ছে। ফলে শুধুই নতুন প্রযোজনার খরচ-খরচা নয়, ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই অর্থ নিতে লাগলেন। ঠিক চুক্তিবদ্ধ অর্থ নয়, প্রয়োজনে কিছু টাকা ভাগ করে নেওয়া হতে থাকল। অর্থকরী চুক্তি বা বিধিবদ্ধতা না থাকার জন্যই এদের টাকাপয়সার হিসেব নিয়ে গোলমাল ছিল।

যুবক দলের বেশির ভাগই বেকার ছিল। অনেকেরই আর্থিক প্রয়োজন ছিল। তবুও শুধুমাত্র অর্থের প্রাপ্তির জন্য কেউ ন্যাশনাল থিয়েটারে আসেনি। উদ্বৃত্ত অর্থ কেউ কেউ গ্রহণ করেছেন--যাদের সংসারে খুবই প্রয়োজন, যেমন অর্ধেন্দুশেখর।

ব্যবসায়িক থিয়েটারের বা পেশাদারি থিয়েটারের যেটি মূল লক্ষ্য বা 'মোটিভ' তা হলো, ব্যক্তিগত মালিকানায় মূলধন বিনিয়োগ এবং লগ্নীকৃত অর্থ থেকে মুনাফা লাভ-- তা এই থিয়েটারের মূল উদ্দেশ্যর মধ্যে ছিল না। তাছাড়া কোনো ব্যক্তিই এই থিয়েটারকে তখনো পেশা হিসেবে গ্রহণ করেনি। 'অবৈতনিক' শব্দটি সর্বক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়েছে।

ন্যাশনাল থিয়েটার বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। ধনীদের সখের নাট্যশালা থেকে এরা বাংলা থিয়েটারকে মুক্তি দিয়েছে। অথচ তখনো শৌখিনতার কিছু গন্ধ ওদের গায়ে লেগেছিল।

আবার পেশাদারি ব্যবসায়িক থিয়েটারের আদর্শ ও উদ্দেশ্য এদের ছিল না। কিন্তু থিয়েটারে টিকিট বিক্রির মধ্য দিয়ে এরা প্রমাণ করেছিল, বাংলা থিয়েটারের মধ্যে একটি লাভজনক ব্যবসার সম্ভাবনা রয়েছে। লগ্নীকৃত মূলধন বেশি হয়ে ফিরে আসার সম্ভাবনা এখানে রয়েছে। যদিও এই দল নিজেরা ব্যবসায়িক মনোবৃত্তিতে থিয়েটার চালায় নি। কিন্তু ব্যবসায়িক থিয়েটারের প্রাথমিক প্রস্তুতির সম্ভাবনা এরা তৈরি করে দিয়েছিল।

ন্যাশনাল থিয়েটারের দলাদলির পরে কিছু দিনের মধ্যেই ব্যক্তিগত মালিকানার থিয়েটার তৈরি হতে থাকে। শরৎচন্দ্র ঘোষের অর্থে ও অন্যদের শেয়ার নিয়ে বেঙ্গল থিয়েটার (আগস্ট, ১৮৭৩), ভুবনমোহন নিয়োগীর অর্থে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার (ডিসেম্বর, ১৮৭৩) প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। ভেঙে যাওয়া ন্যাশনাল থিয়েটারের অনেকেই এই দুটি থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লেন।

ন্যাশনাল থিয়েটারের নিজস্ব মঞ্চ ছিল না। সেই অবস্থায় পেশাদারিত্ব গ্রহণে অসুবিধেও ছিল। গ্রেট ন্যাশনাল এবং বেঙ্গল, নিজের স্থায়ীমঞ্চ ও থিয়েটার বাড়ি তৈরি করে পেশাদারি থিয়েটারের সূচনা করে দিল। তার কিছু দিনের মধ্যেই অবাঙালি ব্যবসায়ি প্রতাপচাঁদ জহুরি 'ন্যাশনাল থিয়েটার' চালু করে (১৮৮১) বাংলা থিয়েটারকে পাকাপোক্ত কমার্শিয়াল থিয়েটার বা বাণিজ্যিক থিয়েটারে পরিণত করলেন। ব্যবসায়িক থিয়েটারের সম্ভাবনা এইভাবেই বাংলা থিয়েটারে পূর্ণ হলো। এরপরেই গুর্মুখ রায় স্টার থিয়েটার করে (১৮৮৩) সেই ধারা অক্ষুণ্ণ রাখেন। এইভাবে ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রচেষ্টার মধ্যেই ব্যবসায়িক এবং পেশাদারিত্বের যে বীজ ছিল, তাই পল্লবিত হয়েছিল পরবর্তীকালে। অথচ সেই অর্থে ন্যাশনাল থিয়েটারকে পেশাদারি বা ব্যবসায়িক থিয়েটার বলা যাবে না।

শৌখিন থিয়েটার এবং পেশাদারি ও ব্যবসায়িক থিয়েটার—এই দুই প্রান্তের মাঝখানে থেকে ন্যাশনাল থিয়েটার বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে একটি সন্ধিক্ষণের গুরুদায়িত্ব পালন করেছে।

নিচের তালিকা থেকে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে :

ধনী বাঙালির ব্যক্তিগত শখ-শৌখিনতার থিয়েটার	গোষ্ঠীবদ্ধ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবকবৃন্দের ন্যাশনাল থিয়েটার	মালিকানাধীন ব্যবসায়িক থিয়েটার ও পেশাদারি থিয়েটার
১. ধনী বাঙালির শখ-শৌখিনতা থেকে মুক্ত। আবার পুরো পেশাদারি নয়। বড়লোকের উঠোনে স্টেজ তৈরি করেছে, তবে ভাড়া দিয়ে। তাই ধনী ব্যক্তির কর্তৃত্ব থাকছে না। আবার ভাড়া করা স্থানে, ভাড়া করা সাজসজ্জা ও উপকরণ দিয়ে অস্থায়ী মঞ্চে অভিনয় করেছে।	২. টিকিট বিক্রি থেকে অভিজ্ঞতা হলো যে, থিয়েটারে অর্থ লগ্নী করলে মুনাফার প্রবল সম্ভাবনা। এই থেকেই ব্যবসায়িক থিয়েটারের ভাবনা শুরু। ন্যাশনাল থিয়েটার নিজে ব্যবসায়িক নয়, কিন্তু এর মধ্যে ব্যবসায়িক থিয়েটারের সম্ভাবনা লুকিয়ে ছিল। পেশাদারিত্ব শৌখিনতার ঠিক বিপরীত ভাবনা। সংগঠনগত, কার্যগত এবং মানসিকতার দিক দিয়ে চুক্তিবদ্ধ, নিয়মবদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ চর্চাই পেশাদারের মূলকথা। অর্থগত বিধিবদ্ধতাও একটি প্রধান শর্ত। এর কোনোটিরই পরিপূর্ণ ব্যবহার এখানে ছিল না।	৩. শখ-শৌখিনতা কাটিয়েছে অথচ পেশাদার হতে পারে নি। টিকিট বিক্রি করে পয়সা নিচ্ছে অথচ ব্যবসায়িক হতে পারে নি। আবার দুটিরই সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। মধ্যবিত্তের থিয়েটারে মধ্যবিত্তের দোলাচল মনোবৃত্তি রয়েছে--আবার নতুন ইতিহাস তৈরির দায়িত্বও পালন করেছে।

এবারে প্রশ্ন উঠবে, ন্যাশনাল থিয়েটার কতটা জাতীয় নাট্যশালার মর্যাদা পেতে পারে।

প্রথমেই মনে রাখতে হবে, পরাধীন দেশের নাগরিকদের জাতীয় নাট্যশালা হতে পারে না। সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রেই একমাত্র জাতীয় নাট্যশালা সম্ভব। সেই হিসেবে ব্রিটিশ পরাধীন বাংলায় জাতীয় নাট্যশালা গড়ে উঠতে পারে না। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগেই সেই দেশের জাতীয় নাট্যশালা নির্মিত হয়।

তবু, এই নাট্যশালা নামের সঙ্গে 'ন্যাশনাল' শব্দটি যুক্ত হওয়ার ফলে এর মর্যাদা অনেকগুণ বেড়ে গেছে।

ধনী বাঙালির প্রাসাদ-মঞ্চ থেকে মুক্ত করে বাংলা থিয়েটারকে সর্বজনের সামনে নিয়ে আসার কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে এই ন্যাশনাল থিয়েটারের। শখের ব্যক্তিগত থিয়েটারকে সর্বজনের সাধারণ রঙ্গালয়ে পরিণত করার প্রাথমিক কাজ এই ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্যমের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। আর সেই সময়ে মধ্যবিত্তের নবজাগ্রত চেতনার মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে চলেছে। হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠা দিবস ১৩ এপ্রিল, ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দে। তারপরে হিন্দুমেলার অধিবেশন হয়ে চলেছে। বাগবাজারের যুবকবৃন্দ এই জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত ছিল। তাদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে মনোমোহন বসু, শিশির

ঘোষ এবং নবগোপাল মিত্র যুক্ত ছিলেন। নবগোপাল মিত্রের নামই হয়ে গিয়েছিল 'ন্যাশনাল' নবগোপাল। ন্যাশনালের চিন্তায় তিনি মশগুল ছিলেন। শিশির ঘোষ এবং মনোমোহনও জাতীয় ভাবোদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত ছিলেন। এদের সবাইকার সমবেত চেষ্টায় নাট্যশালাকে একটা জাতীয়তার পরিমণ্ডল দিয়ে তৈরি করার ইচ্ছে নিশ্চয়ই ছিল। সেই প্রেরণা থেকেই এর নাম ন্যাশনাল থিয়েটার রাখা হয়েছিল। জানা যায়, প্রথম দিকে এর সঙ্গে 'ক্যালকাটা' কথাটি যুক্ত ছিল, পরে তা বাদ দেওয়া হয়। ন্যাশনাল-এর সঙ্গে সেই দেশের কোনো একটি বিশেষ স্থানকে জুড়ে দিলে, তা আর যাই হোক, স্থানিকবদ্ধ হয়ে পড়ার ফলে 'জাতীয়' আর থাকে না। তবে এও জানা যায়, নাটক অভিনয়ের আগে সংবাদপত্রের দেওয়া বিজ্ঞাপনে কিন্তু নাম ছিল 'দি ক্যালকাটা ন্যাশনাল থিয়েট্রিকাল সোসাইটি'। ন্যাশনাল থিয়েটার তারই সংক্ষিপ্ত রূপ। পুরো নামটির মধ্যে জাতীয়তাবোধের আবেগ ছিল, জাতীয় নাট্যশালা স্থাপনের কোনো সচেতন প্রয়াস ছিল না।

বড়লোকের গণ্ডী থেকে নাটককে মুক্ত করে সর্বসাধারণের কাছে নিয়ে আসা, মধ্যবিত্ত যুবকবৃন্দের নাটকাভিনয়ের আগ্রহ ও নেশা এবং সর্বোপরি তদানীন্তন জাতীয়তার আগুনের উত্তাপ পোহানোর একটা অভিপ্রায়--এইসব মিলিয়েই ন্যাশনাল থিয়েটার গড়ে উঠেছিল।

যে অর্থে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' জাতীয় থিয়েটারের মর্যাদা পেতে পারে, এই নাট্যশালার সেই মর্যাদা প্রাপ্য নয়। যদিও এরা দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটক অভিনয়ের জন্য বাছাই করে ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবোধের পরিচয় রেখেছিলেন, তবুও এদের প্রয়াস সঙ্কীর্ণ 'ন্যাশনালিজম'-এর পর্যায়েই ছিল। জাতীয় নাট্যশালা এটি নয়। এর নামের সঙ্গে ন্যাশনাল নামটি যুক্ত থেকেছে বলেই, একে জাতীয় নাট্যশালার মর্যাদা দেওয়া যায় না।

ব্রিটিশ শাসনের যুগে সরকারী সাহায্যে জাতীয় নাট্যশালার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা ছিল না। ১৮৭২-এ প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল থিয়েটার বিলাতি থিয়েটার থেকে নিজের পার্থক্য বোঝাতেই উক্ত নাম গ্রহণ করেছিল। ন্যাশনাল, হিন্দু ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল, বেঙ্গল থিয়েটার প্রভৃতি নামকরণের মধ্যেই এই মনোভাব কাজ করেছিল। পেশাদার থিয়েটারের যুগে মানসিকতার সঙ্গে সঙ্গে নামও পরিবর্তিত হলো। পালটে হল স্টার, মিনার্ভা, এমারেল্ড, ক্লাসিক, কোহিনুর।

সবশেষে ন্যাশনাল থিয়েটারের বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব সূত্রাকারে উল্লেখ করা যেতে পারে :

এক. সখের নাট্যশালায় সাধারণের প্রবেশ অবাধ ছিল না। ন্যাশনাল থিয়েটারে যে কোনো ব্যক্তি টিকিট কিনে নাটক দেখার সুযোগ পেলেন।

দুই. টিকিটের মূল্য ইংরেজদের থিয়েটারের থেকে অনেক কম ছিল। তাই সাধারণ মানুষ টিকিট কিনে ঢুকতে পারত।

তিন. সাধারণ মানুষের সঙ্গে এই যোগ এবং প্রবেশাধিকার স্বীকৃত ও সহজ ছিল বলেই প্রধানত একে সাধারণ রঙ্গালয় বলা হয়ে থাকে। ন্যাশনাল থিয়েটার থেকেই এদেশে সাধারণ রঙ্গালয়ের সূত্রপাত হলো।

চার. সাহেবদের বিলিতি থিয়েটারের উচ্চমূল্য, বিদেশী নাটক ও পাত্রপাত্রী কোনো কিছুর সঙ্গেই বাঙালির প্রাণের যোগ ছিল না। ন্যাশনাল থিয়েটার বাঙালির সকলের নিজস্ব থিয়েটার।

পাঁচ. ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ধনী ব্যক্তির উঠোন ভাড়া নিয়ে। ফলে সেই ধনী ব্যক্তির মালিকানা বা কর্তৃত্ব কিংবা খেয়ালখুশি একে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে নি।

ছয়. এটা ঠিক, ভাড়া করা স্থানে তৈরি মঞ্চ স্থায়ী ছিল না। ভাড়া করা স্থানে, ভাড়া করা সরঞ্জাম দিয়ে অস্থায়ীভাবে তৈরি নাট্যশালার অভিনয় হতো কিন্তু নিয়মিত। সপ্তাহে প্রতি শনিবার এবং পরের দিকে বুধবার ও শনিবার নিয়মিত অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। সখের নাট্যশালায় এইরকম নিয়মিত অভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল না।

সাত. অভিনেতারা প্রয়োজনে কিছু অর্থ পেতেন। পেশাদারি চুক্তিগতভাবে না হলেও, অভিনেতাদের অর্থ গ্রহণের মধ্যে পেশাদারি থিয়েটারের বীজ তৈরি হয়েছিল।

আট. একটি সঙ্ঘবদ্ধ নাট্যদল এই থিয়েটার পরিচালনা করেছিল। সখের নাট্যশালায় একজন ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছা খেয়ালখুশির ওপরে সেখানে সব কিছু নির্ভর করত। এখানে একটি নাট্যগোষ্ঠি সমবেতভাবে থিয়েটার পরিচালনা করার ফলে ব্যক্তিক আওতা থেকে থিয়েটার মুক্তি পেল।

নয়. জাতীয় ভাবোদ্দীপনায় তৈরি হলেও, এই থিয়েটারকে যথা অর্থে জাতীয় নাট্যশালা বলা যায় না। সীমাবদ্ধ অর্থে জাতীয়তার চেতনা ন্যাশনাল থিয়েটার' নামকরণে কার্যকরী হয়েছিল।

দশ. 'The National Theatre is first public undertaking of its Character......The doors of the National Theatre are open to the public. Whoever shall pay for admission to it, will be permitted to go in it,'--National Paper (11.12.1872)

এগার. ন্যাশনাল থিয়েটারের এইসব অভিনেতা ও উদ্যোক্তারা পরবর্তী ২৫ বছর ধরে বাংলা থিয়েটারগুলির সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত থেকে নাট্যাভিনয়ের প্রধানতম দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলি পালন করেছে।

বেঙ্গল থিয়েটার

৯ নং, বিডন স্ট্রিট, কলকাতা

উদ্বোধন : ১৬ আগস্ট, ১৮৭৩ **স্থায়িত্বকাল : ১৬ আগস্ট, ১৮৭৩--১৯০১**

প্রতিষ্ঠাতা : শরৎচন্দ্র ঘোষ

প্রথম নাটক : শর্মিষ্ঠা (মধুসূদন)

ন্যাশনাল থিয়েটার বন্ধ হয়ে যাবার কয়েক মাসের মধ্যেই বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। ৯ নং বিডন স্ট্রিটে বিখ্যাত ধনী সাতুবাবুর বাড়ির সামনের মাঠে ৫ হাজার টাকার অধিক ব্যয়ে এই থিয়েটার বাড়ি তৈরি হয়। তখনকার কলকাতায় চালু লিউইসের লাইসিয়াম থিয়েটারের অনুকরণে এই নাট্যশালাটি তৈরি হয়।

ম্যানেজার হলেন সাতুবাবুর দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ। সুদক্ষ অভিনেতা শরৎচন্দ্র সাতুবাবুর বাড়ির 'শকুন্তলা' অভিনয়ে শকুন্তলার চরিত্রে অভিনয়ে খ্যাতিলাভ করেন। অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন প্যারীমোহন রায়। নাট্যশালাটি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন মাইকেল মধুসূদন এবং উমেশচন্দ্র দত্ত। উদ্যোক্তা হিসেবে ছিলেন বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, হরিবৈষ্ণব (হরিদাস দাস),. গিরীশচন্দ্র ঘোষ (খ্যাতিমান গিরিশচন্দ্র নন), দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, অক্ষয়কুমার মজুমদার প্রমুখ।

'মধ্যস্থ' পত্রিকার বিজ্ঞাপন (২২-২-১৮৭৩) থেকে জানা যায় যে, ১৮ জন অংশীদার প্রত্যেকে ১ হাজার টাকা করে দিয়ে মোট ১৮ হাজার টাকা সংগ্রহ করে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। প্রধান ছিলেন শরৎচন্দ্র ঘোষ।

এই প্রথম কলকাতায় বাঙালির নিজস্ব থিয়েটার বাড়ি তৈরি হলো। লাইসিয়াম থিয়েটারের আদলে তৈরি হলেও প্রথম দিকে এটি পাকাপোক্ত ছিল না। খোলার চাল, মাটির দেওয়াল এবং সিমেন্টের পলেস্তারা যুক্ত মাটির প্লাটফরম তৈরি করা হয়। পরের দিকে টিনের দেওয়াল এবং করোগেটেড টিন ছাদে দেওয়া হয়। মঞ্চটি মাটির হলেও মাঝখানে তক্তা বসানো ছিল। নিচে ছিল সুড়ঙ্গ। কনসার্টের দল এই সুড়ঙ্গ দিয়েই মূলমঞ্চ এবং প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে যাতায়াত করত। শরৎচন্দ্র অভিনয়ে প্রায়ই ঘোড়ায় চড়ে স্টেজে ঢুকতেন ; সেই সুবিধের দিকে নজর রেখেই মাটির প্লাটফরম করা হয়েছিল। দু'পাশে ঢালু ছিল ঐ কারণেই। শরৎচন্দ্র নিজে ভালো ঘোড়সওয়ার ছিলেন, গড়পারে তাঁর নিজস্ব রেসকোর্স ছিল, তিনি প্রায়ই 'জকি' হতেন সেখানে।

রঙ্গমঞ্চ পরিচালনার জন্য গঠিত কমিটিতে ছিলেন মধুসূদন, বিদ্যাসাগর, দেবব্রত সামশ্রমী, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ।

বেঙ্গল থিয়েটার অভিনয় শুরু করল মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটক দিয়ে, ১৮৭৩

খ্রিষ্টাব্দের ১৬ আগস্ট। অভিনয় করলেন, যযাতি--শরৎচন্দ্র। শুক্রাচার্য—বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। দেবযানী—এলোকেশী। দেবিকা--জগত্তারিণী।

প্রথম অভিনয় থেকেই বেঙ্গল থিয়েটার মঞ্চে অভিনেত্রী গ্রহণ করল। প্রথমে চারজন অভিনেত্রী নেওয়া হয়--শ্যামা, জগত্তারিণী, এলোকেশী ও গোলাপ। পরে আরো অভিনেত্রী নেওয়া হয়।

অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'গিরিশচন্দ্র' গ্রন্থে জানিয়েছেন যে, 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের মহলায় সুকুমারী অংশগ্রহণ করলেও, প্রথম রাতের অভিনয়ে অংশ নেন নি। অন্যদের লেখাতেও প্রথম রাতের অভিনয়ে সুকুমারীর নাম নেই। শঙ্কর ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান' গ্রন্থে জানিয়েছেন, ২৩ আগস্ট, ১৮৭৩ দ্বিতীয় অভিনয়ের রাতে সুকুমারী প্রথম অবতীর্ণ হন। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, তাহলে প্রথম রাতে কে 'শর্মিষ্ঠা' চরিত্রে অভিনয় করল? কোনো 'পুরুষ অভিনেত্রী' কি?

মঞ্চে অভিনেত্রী গৃহিত হলে সমাজে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয়। নাট্যাভিনয়ের প্রয়োজনেই নারী চরিত্রে মেয়েদের অবশ্য প্রয়োজন। অভিনয় প্রসঙ্গে একথা সে যুগে অনেকেই মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু সে যুগে ভদ্র গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের অভিনয়ের ক্ষেত্রে পাওয়া সম্ভব না হওয়াতে বেঙ্গল থিয়েটার বারাঙ্গনা পল্লী থেকে এই অভিনেত্রীদের জোগাড় করে। তাতেই সমাজপতিদের দুশ্চিন্তার মাত্রা বেড়ে যায় ; সে যুগে এই নিয়ে নানা বাক্‌বিতণ্ডা এবং তর্কবিতর্ক চলেছিল। নানা সংবাদপত্র বিভিন্ন মত প্রকাশ করতে থাকে। কিন্তু অভিনেত্রীদের মঞ্চ থেকে বিদায় করা যায় নি। বরং বাংলা মঞ্চে অভিনেত্রী পাকাপাকিভাবে নিজের জায়গা তৈরি করে নিয়েছিল। মধুসূদনের এই ব্যাপারে উৎসাহ ও সমর্থন ছিল। আর বিদ্যাসাগর এই কারণেই এদের কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন।

বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনয়

শর্মিষ্ঠা নাটক দিয়ে শুরু করার পর এখানে রামনারায়ণের স্বপ্নধন (অক্টোবর, ১৮৭৩), বিদ্যাসুন্দর ও যেমন কর্ম তেমনি ফল অভিনীত হয়। তারপর মধুসূদনের 'মায়াকানন' এখানে অভিনীত হয়। বেঙ্গলের জন্যই এই নাটকটি মধুসূদন অসুস্থ ও শয্যাশায়ী অবস্থায় লিখে দিয়েছিলেন। 'বিষ না ধনুর্গুণ' এদের জন্য লেখা শুরু করলেও শেষ করতে পারেন নি। এছাড়া এখানে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে শর্মিষ্ঠার অনেকগুলি অভিনয় হ[illegible]। কিন্তু বেঙ্গল থিয়েটার এই সময়ে কোন অভিনয়েই সুবিধে করতে পারছিল না। অভিনেত্রী প্রসঙ্গ আলোড়ন তুললেও নাট্যাভিনয় দর্শক আনুকূল্য লাভ করতে পারে নি।

এবার তারা অভিনয় করল 'মোহান্তের এই কি কাজ'। নাট্যকার লক্ষ্মীনারায়ণ দাস। ৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩। তারকেশ্বরের মোহান্ত ও এলোকেশীর ব্যাপার নিয়ে তখন সারা দেশে হৈচৈ চলছে। সময়োপযোগী এই ঘটনা নিয়ে তখন অনেকগুলি নাটক লেখা হয়েছিল। বেঙ্গল থিয়েটার এই নাটকটি অভিনয় করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের কপাল ফিরে

গেল। বেঙ্গলের সাফল্যের শুরু তখন থেকেই।

পর পর চক্ষুদান (রামনারায়ণ), রত্নাবলী (অনুবাদ--রামনারায়ণ), কৃষ্ণকুমারী মঞ্চস্থ হয়। বেঙ্গলের অভিনয় দেখে বর্ধমানের মহারাজা প্রীত হন এবং ডিসেম্বর, ১৮৭৪, তিনি বেঙ্গল থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষক হন। এই উপলক্ষে ১২ ডিসেম্বর বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনীর নাট্যরূপ অভিনীত হয়। এটি খুবই সাফল্য লাভ করে। অভিনয়ে ছিলেন জগৎসিংহ--শরৎচন্দ্র। ওসমান--হরিবৈষ্ণব। তিলোত্তমা--জগত্তারিণী। আয়েষা--গোলাপ। জগৎসিংহের ভূমিকায় শরৎচন্দ্র ঘোড়ার পিঠে চড়ে মঞ্চে প্রবেশ করতেন। এই ঘটনা তৎকালীন দর্শকদের কাছে বিস্ময়কর ও কৌতূহলপ্রদ হয়েছিল। অভিনয়ে শরৎচন্দ্র এবং হরিবৈষ্ণব-এর কৃতিত্ব পরবর্তীকালেও স্বীকৃত হয়েছে।

১৮৭৪ খুবই সাফল্যের যুগ বেঙ্গলের। পদ্মাবতী (মধুসূদন), পুরুবিক্রম (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ), বঙ্গের সুখাবসান (হরলাল রায়), মণিমালিনী (হরিমোহন মুখোপাধ্যায়), বিদ্যাসুন্দর, যেমন কর্ম তেমনি ফল, একেই কি বলে বাঙালি সাহেব, প্রভাবতী প্রভৃতি অভিনীত হয়। এর মধ্যে পুরুবিক্রম, যেমন কর্ম তেমনি ফল, বিদ্যাসুন্দর জনপ্রিয় হয়।

১৮৭৫-এর উল্লেখযোগ্য খবর হলো, গ্রেট ন্যাশনাল থেকে বেরিয়ে অমৃতলাল বসু, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহন বর্মন, যাদুমণি, কাদম্বিনী প্রভৃতি নতুন দল তৈরি করে বেঙ্গলের সঙ্গে মিলিতভাবে কিছুদিন অভিনয় করে। সম্মিলিত প্রথম অভিনয়, ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৫ ; নগেন্দ্রনাথের লেখা 'সতী কি কলঙ্কিনী' গীতিনাট্য। সম্মিলিত আরেকটি অভিনয় হলো মেঘনাদবদ কাব্যের নাট্যরূপের। রাজকৃষ্ণ রায়ের অনুপ্রেরণায়, গিরিশচন্দ্র এই নাট্যরূপ দেন। এইখানেই প্রথম গিরিশ ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার করেন। রাজকৃষ্ণ রায়ের 'হরধনুভঙ্গ' নাটকের ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রভাবে গিরিশ এই ছন্দ ব্যবহার করেন এবং তাকে উন্নত ও ত্রুটিমুক্ত করে সংলাপকে স্বচ্ছন্দ করেন। সংলাপে পরবর্তী গৈরিশ ছন্দের সূত্রপাত এইখানেই। মেঘনাদের চরিত্রে কিরণচন্দ্র এবং লক্ষ্মণের ভূমিকায় হরিবৈষ্ণব, মহাদেব--বিহারীলাল, অভিনয়ের কৃতিত্বে ও ভাঙা ছন্দে সংলাপ উচ্চারণে পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন।

এছাড়া সম্মিলিত অভিনয় হয়--কপালকুণ্ডলার নাট্যরূপ, ভীমসিংহ প্রভৃতি। এবারে গ্রেট ন্যাশনালের দল চলে গেল। বেঙ্গল নিজের অভিনয়ের ধারায় গুইকোয়ার নাটক, সুরেন্দ্রবিনোদিনী, বীরনারী, বঙ্গবিজেতা, পলাশীর যুদ্ধ প্রভৃতি অভিনয় করে যায়। এই বছরেই ভূতপূর্ব ন্যাশনাল থিয়েটারের কিছু নট-নটী নিয়ে গঠিত 'দি নিউ এরিয়ান' নামে একটি দল বেঙ্গলের মঞ্চে কিছু দিন অভিনয় করে। উপেন্দ্রনাথ দাসের সুরেন্দ্রবিনোদিনী (১৪ আগস্ট, ১৮৭৫), বীরনারী (৪ সেপ্টেম্বর)। 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী'-র অভিনয়ে : সুরেন্দ্র-নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিনোদিনী—বনবিহারিণী। ম্যাক্রেন্ডেল--হরিবৈষ্ণব। বিরাজমোহিনী--গোলাপ (সুকুমারী)।

সেই সময়ে বরোদা রাজ্যে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট সাহেবকে বিষ খাইয়ে হত্যার অপরাধে বরোদার মহারাজার বিচার চলছিল। এই নিয়ে সারাদেশে প্রচণ্ড আলোড়ন ওঠে। এই বিষয় নিয়ে অনেকেই নাট্য রচনা করতে থাকেন। নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুরেশচন্দ্র মিত্র উভয়ে মিলে 'গুইকোয়ার' নাটক রচনা করেন এবং বেঙ্গল আবার সাফল্যের সঙ্গে তার অভিনয় করে।

১৮৭৬-এর গোড়া থেকেই বেঙ্গল থিয়েটার নতুন বাড়ি নির্মাণে হাত দেয়। ফলে বেশ কিছু দিন অভিনয় বন্ধ থাকে। তিন মাস পর নবনির্মিত পাকা থিয়েটার বাড়িতে আবার অভিনয় শুরু হয়। এখানে বিদ্যাসুন্দর এবং পুরনো নাটকগুলির বেশ কয়েকবার অভিনয় হয়। ১৮৭৬-এর ডিসেম্বরে কুখ্যাত 'অভিনয়নিয়ন্ত্রণ আইন' ব্রিটিশ সরকার চালু করে। ফলে রঙ্গমঞ্চের স্বাধীন বিকাশ ও অভিনয়ের অধিকার নিয়ন্ত্রিত হয়। এই আইনের ফলে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার উঠেই গেল। পাশাপাশি চালু বেঙ্গল থিয়েটারের ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ল।

নানা বিষয়ের নাটক অভিনয়ের যে ধারা বেঙ্গল চালু করেছিল তা এইবার বাধাপ্রাপ্ত হলো। ঐতিহাসিক কিংবা দেশপ্রেমের নাটক বন্ধ হয়ে গেল। শুরু হলো পৌরাণিক নাটক, গীতিনাট্য, অপেরা এবং সামাজিক প্রহসনের পালা। অভিনয়নিয়ন্ত্রণ আইনের নাগপাশ থেকে বেঙ্গল রেহাই পায় নি।

এই বছরেই অভিনেত্রী বিনোদিনী বেঙ্গল থিয়েটারে যোগ দেন। এই সময়েই তাঁরা শুধুমাত্র মহিলা দর্শকদের জন্য একরাত্রি অভিনয় করেছিল। সেইভাবে বিজ্ঞাপন দিয়ে ১৮৭৬-এর ডিসেম্বরে মেঘনাদবধ অভিনয় করেছিল।

১৮৭৭ থেকে শুধুমাত্র শনিবারে অভিনয়ের দিনকে বাড়িয়ে সপ্তাহে তিন দিন—রবি, মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার অভিনয়ের ব্যবস্থা করে। মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার টিকিটের মূল্য অর্ধেক করা হয়।

এই বছরে উল্লেখযোগ্য অভিনয়ের মধ্যে রয়েছে—কুলীনকন্যা অথবা কমলিনী, আলিবাবা, অপূর্বসতী, রত্নাবলী, মেঘনাদবধ প্রভৃতি বেশির ভাগ পুরনো নাটক। এছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপ কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, দুর্গেশনন্দিনী অভিনীত হয়। বিনোদিনীর অভিনেত্রী জীবনের সার্থকতার পর্ব শুরু হয়, বঙ্কিমের সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলির রূপায়ণের মাধ্যমে। দর্শক ও সমালোচক মুগ্ধ হয়। তাঁকে 'সাইনোরা', 'ফ্লাওয়ার অফ দি নেটিভ থিয়েটার' ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

এই বছরেই পঞ্চপাণ্ডবের বনগমন, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, সুভদ্রাহরণ, সতী কি কলঙ্কিনী ভালভাবে অভিনীত হয়। কিন্তু আলিবাবা কিংবা আয় ঘুরে আয় সোনার চাঁদ—দুটি প্রযোজনা দর্শকের দ্বারা নিন্দিত ও সংবাদপত্রে ভর্ৎসিত হয়।

১৮৭৮-এ পুরনো নাটকগুলির সঙ্গে বঙ্কিমের উপন্যাসের নাট্যরূপ এবং দু' একটি নতুন নাটক অভিনীত হয়। এই সময়ে শকুন্তলা নাটকের অভিনয়ে বড়লাট লিটন ও তাঁর স্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। অভিনয়নিয়ন্ত্রণ আইনের পর এই প্রথম ব্রিটিশ সরকারের

কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি বাংলা মঞ্চে হাজির হলেন।

১৮৮০-তে বেঙ্গলের প্রাণপুরুষ শরৎচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু হয়। থিয়েটারের অপূরণীয় ক্ষতি হলো। কিন্তু সব আঘাত কাটিয়ে উঠে শক্ত হাতে এই নাট্যশালার সব দায়িত্ব গ্রহণ করলেন বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। তিনি এই থিয়েটারের প্রথম প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন। অভিনয়েও অংশগ্রহণ করতেন। প্রয়োজনে দুর্গেশনন্দিনীর নাট্যরূপও দিয়েছিলেন তিনি। দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনি বঙ্কিম, রমেশচন্দ্রের উপন্যাসগুলির নাট্যরূপ ও পলাশীর যুদ্ধের অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। নিজে লেখেন— সুভদ্রাহরণ, রাবণবধ, পাণ্ডবনির্বাসন, শ্রীবৎসচিন্তা, প্রভাসমিলন, নন্দবিদায়, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি পৌরাণিক নাটক। ১৮৮০ থেকে ১৯০১-এ মৃত্যু (২০ এপ্রিল) পর্যন্ত এই দুই দশক বিহারীলাল ছিলেন বেঙ্গলের কর্ণধার শুধু নন, নট নাট্যকার, অভিনয় শিক্ষক, মঞ্চাধ্যক্ষ—সব, সবকিছু। ১৮৭৩ থেকে ১৮৮০ অবধি যেমন ছিলেন প্রাণপুরুষ শরৎচন্দ্র ঘোষ। বেঙ্গল থিয়েটারের প্রথম ভাগ যদি শরৎচন্দ্রের হয় তাহলে দ্বিতীয়ভাগ অবশ্যই বিহারীলালের।

১৮৮০-র প্রাক্‌মুহূর্তের একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অশ্রুমতী' নাটক দেখবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেঙ্গলের সঙ্গে বিশেষ ব্যবস্থা করেন। যাতে সেদিন শুধুমাত্র ঠাকুর বাড়ির মেয়ে-পুরুষেরাই ঠাকুর বাড়ির ছেলের লেখা নাটক দেখতে পারে। 'ঘরোয়া'-তে অবনীন্দ্রনাথ তার মজার বর্ণনা দিয়েছেন।

বিহারীলালের নেতৃত্বে বেঙ্গল থিয়েটার সাফল্যের সঙ্গেই চলতে থাকে। অভিনীত হয়—সুভদ্রাহরণ, হরধনুভঙ্গ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ।

১৮৮২-তে অমৃতলাল বসু এখানে যোগ দেন। তাঁর লেখা প্রহসন 'ডিসমিস' এবং নাটক 'হরিশ্চন্দ্র' জনপ্রিয়তা পায়।

১৮৮৩-তে তাঁর ব্রজলীলা মঞ্চস্থ হয়। এই সময়ে নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায়ের কয়েকটি নাটক বেঙ্গলে অভিনীত হয়। হরধনুভঙ্গ (১৮৮৩), প্রহ্লাদ চরিত (১৮৮৪), ভীষ্মের শরশয্যা (১৮৮৬), দুর্বাসার পারণ (১৮৮৫)। পৌরাণিক নাটকের জোয়ার তখন বাংলা মঞ্চে। রাজকৃষ্ণ রায়ও পৌরাণিক নাটক রচনায় সাফল্য লাভ করতে থাকেন। তাঁর প্রহ্লাদ চরিত্র খুবই সফল হয়। এই নাটকটির অত্যধিক জনপ্রিয়তার আরেকটি কারণ, নামভূমিকায় কুসুমকুমারীর অনবদ্য অভিনয়। আবার ভীষ্মের শরশয্যা নাটকে ভীষ্মের ভূমিকায় বিহারীলালের অভিনয় তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। মনে রাখতে হবে, বেঙ্গলের সাফল্যের মূলেও তাঁর অভিনয় কাজ করেছিল।

১৮৮৭-তে বিহারীলালের রচিত শ্রীবৎসচিন্তা, পাণ্ডব নির্বাসন, রুক্মিণীহরণ, হয়। সাফল্য লাভ করে প্রভাসমিলন।

১৮৮৮-তে বিহারীলালের নন্দবিদায়, ব্রহ্মশাপ দুটিই সফলভাবে অভিনীত হয়। ১৮৮৯-তে শৈলজা, জন্মাষ্টমী এবং শকুন্তলার অভিনয় প্রশংসা লাভ করে।

১৮৯০-এর ৭ জানুয়ারি বেঙ্গল থিয়েটার 'রয়াল' উপাধি লাভ করে। ব্রিটিশ যুবরাজের কলকাতায় আগমন, গড়ের মাঠে তাঁর সম্বর্ধনার জন্য লর্ড লিটনের অনুরোধে বেঙ্গল শকুন্তলা অভিনয় করে। তারপরেই তারা 'রয়াল' উপাধি পায়, ব্রিটিশ রাজভক্তির জন্য।

১৮৯০-তে উল্লেখযোগ্য অভিনয় হলো—সীতা স্বয়ংম্বর এবং নাট্যবিচার নামে একটি প্রহসন। ১৮৯১-তে গোবরগণেশ, বাণযুদ্ধ, বসন্তমেলা অভিনীত হয়। ১৮৯২-তে পুরনো নাটকের পুনরভিনয় চলার সঙ্গে মোহশেল, শ্রীরামনবমী মঞ্চস্থ হয়। ১৮৯৩-তে ব্যাসকাশী ও খণ্ড প্রলয় উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা। 'মুই-হাঁদু' প্রহসনটির অভিনয় জনপ্রিয় হয় নি, উপরন্তু সমালোচক ও সংবাদপত্র নিন্দা করে।

১৮৯০-এর ৭ জানুয়ারি রানী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টরের অভ্যর্থনার জন্য কলকাতায় গড়ের মাঠে যে 'স্বয়ং সমিতি' হয় সেখানে 'শকুন্তলা' নাটকের অভিনয় করে বেঙ্গল থিয়েটার 'রয়াল' উপাধি লাভ করে। ১১ জানুয়ারি থেকে বেঙ্গলের নাম হয় 'রয়াল বেঙ্গল থিয়েটার'।

১৮৯৪-তে মহেন্দ্রলাল বসু, কুসুমকুমারী, প্রমদাসুন্দরী প্রভৃতি কয়েকজন প্রখ্যাত নট-নটী বেঙ্গলে যোগ দেয়। এদের সহযোগে অভিনীত হয় বঙ্কিমের মৃণালিনী ও বিষবৃক্ষ উপন্যাসের নাট্যরূপ। দুটিরই নাট্যরূপ দেন বিহারীলাল। মৃণালিনী খুবই সফল হলেও বিষবৃক্ষ সমালোচিত হয়।

১৮৯৫-তে বঙ্কিমের রজনী উপন্যাসের নাট্যরূপ (: বিহারীলাল) কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনীত হয়। মহেন্দ্রলাল বসু এই সময়ে বেঙ্গল ত্যাগ করেন। পর পর দানলীলা, সীতারাম, রক্তগঙ্গা অভিনয়ে প্রশংসা পায়। সীতারামের নাট্যরূপের অভিনয় খুবই খ্যাতিলাভ করে।

১৮৯৬-তে পুরনো নাটকের পুনরভিনয় চলে। সঙ্গে বিহারীলালের দুটি নতুন নাটক ধ্রুব ও নরোত্তম ঠাকুর এবং বঙ্কিমের রাজসিংহ উপন্যাসের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হয়।

১৮৯৭-তে অন্য নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বঙ্কিমের দেবী চৌধুরানী ও কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসের নাট্যরূপের অভিনয়।

১৮৯৮-১৯০১-এর মধ্যে অভিনীত হয়েছে বভ্রুবাহন, দফরখাঁ, প্রমোদরঞ্জন, সুকন্যা, যমুনা, দাওয়াই, নীহার প্রভৃতি অকিঞ্চিৎকর সব নাটকের।

১৯০১-এর ২০ এপ্রিল বেঙ্গলের দ্বিতীয় প্রাণপুরুষ বিহারীলালের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বেঙ্গল থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেল। ১৯০১—এর ২৪ এপ্রিল অমৃতবাজার পত্রিকায় কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় :

'Royal Bengal Theatre/Beadon Street. Calcutta/ Notice/ There will be no performance on wednesday, the 24th April. 1901. Owing to the lamentable death of our venerable Manager/B.L. Chatterjee.'

দীর্ঘ প্রায় ত্রিশ বছর ধরে নানা উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে বেঙ্গল থিয়েটার গৌরবের সঙ্গে তার অভিনয়ের ধারা অব্যাহত রাখে। প্রথম দিকে শরৎচন্দ্র এবং দ্বিতীয় অংশে বিহারীলাল--এই দুই কাণ্ডারীর নেতৃত্বে বেঙ্গল থিয়েটার বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছে। ১৯ শতকের শেষ দশক থেকে বেঙ্গলের অবস্থার অবনতি হয়। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর আর্থিক দায়-দায়িত্বের বিষয়টি প্রাধান্য পায়। যদিও অন্য দিকগুলি বিহারীলাল কৃতিত্বের সঙ্গে সামাল দিয়েছিলেন। এখানে যেমন সে যুগের খ্যাতিমান অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছেন, তেমনি অনেকেই নানা সময়ে বেঙ্গল ছেড়ে চলে গেছেন। নতুন করে অভিনেতা-অভিনেত্রী তৈরি করা সবসময়ে ভালো হয় নি। নাটকের অভাবও দেখা দিয়েছিল। একা বিহারীলাল প্রয়োজনে আর কতো নাটক লিখবেন। প্রয়োজনে কখনো অমৃতলাল বসু, কখনো উপেন্দ্রনাথ দাস, কখনো রাজকৃষ্ণ রায়কে গ্রহণ করতে হয়েছে। উপায়ান্তর না দেখে, বঙ্কিমের সদ্যপ্রকাশিত উপন্যাসগুলির তড়িঘড়ি নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করতে হয়েছে। তবুও নাটকের চাহিদা মেটানো যায় নি। একই সময়ে এমারেল্ড, স্টার, ক্লাসিক, মিনার্ভা প্রভৃতি নাট্যমঞ্চগুলি প্রবলপ্রতাপে নাট্যাভিনয়ের জোয়ার নিয়ে আসে। তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এই সময়ে বারবার পিছিয়ে পড়ে বেঙ্গল।

মনে রাখতে হবে, সেই সময়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় নট-নাট্যকার-নাট্যশিক্ষক গিরিশ কখনো বেঙ্গলে যোগ দেয় নি বা তাঁকে বেঙ্গলে নেওয়া হয় নি। গিরিশকে নিয়ে তখন সব মঞ্চ মালিকের টানাটানি। গিরিশ থাকলেই নাটক এবং জনপ্রিয়তা। সেই গিরিশ ব্যতিরেকে বেঙ্গলের ভাগ্য ফেরানো সম্ভব হয় নি।

এছাড়া যে জমিতে বেঙ্গলের পাকা থিয়েটার বাড়ি তৈরি হয়েছিল, সেই জমি নিয়ে গোলযোগ দেখা দেয়। শরৎচন্দ্র বিহনে বেঙ্গল সেই দায় সামাল দিতে পারে নি। তার উপরে, দলের ভেতরেই আত্মকলহ ও বিবাদ বেঙ্গলের পতনকে ত্বরান্বিত করে। বিহারীলাল একা সবদিক সামলে উঠতে পারছিলেন না। গোড়াপত্তনের সময়ে যে উপদেষ্টা কমিটি ছিল, তাদের প্রায় সকলেই তখন মৃত, সেই কমিটি প্রায় কার্যহীন অবস্থাতেই ছিল।

একদিকে অভিনয়ের জন্য নাটক রচনা, নিজে অভিনয় করা এবং অভিনয়ে শিক্ষাদান করা, তার উপরে দলের নানা গোলমাল, নট-নটী জোগাড় করা, আর্থিক দায়, জমির বিবাদ, ভালো অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভাব, নাটকের অভাব--সব মিলিয়ে বেঙ্গল থিয়েটার ১৯ শতকের শেষের দশ বছর বেশ কাহিল হয়ে পড়ে। ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দের ২০ এপ্রিল, বিহারীলালের মৃত্যুর পরে পরেই তাই বেঙ্গল থিয়েটারের পাদ-প্রদীপের আলো নির্বাপিত হয়ে যায়।

২১ এপ্রিল শেষ অভিনয় : 'নীহার' ও 'দাওয়াই'। নীহার সামাজিক নাটক এবং দাওয়াই সামাজিক নক্সা।

ত্রিশ বছর একটানা অভিনয় অব্যাহত রেখে বেঙ্গল থিয়েটার বাংলা থিয়েটারের

ইতিহাসে যে স্বাক্ষর রেখেছে, তার কয়েকটি দিকের কার্যাবলী অবশ্যই উল্লেখযোগ্য :

ক. বাঙালির থিয়েটারে প্রথম নিজস্ব স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ বেঙ্গল থিয়েটার থেকেই শুরু হয়। প্রথমে কাঁচা এবং পরে পাকাপোক্তভাবে নাট্যশালা গড়ে তোলে বেঙ্গল থিয়েটার।

খ. প্রথম যথার্থ সাধারণ রঙ্গালয় এবং পেশাদারি থিয়েটার এই বেঙ্গল থিয়েটার। ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রচেষ্টার মধ্যে যে সাধারণ রঙ্গালয়ের সূত্রপাত এবং পেশাদারি থিয়েটারের অঙ্কুরোদগম হয়েছিল, বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার মধ্যে তার ধারাবাহিক বিকাশ প্রথম সার্থকভাবে প্রবর্তিত হয়েছিল। সেই অর্থে বাংলায় প্রথম প্রফেশনাল থিয়েটারের শুরু বেঙ্গল থিয়েটার থেকে।

গ. ১৮ জন সদস্যের টাকা নিয়ে শেয়ারভিত্তিক থিয়েটার পরিচালনা শুরু করে বেঙ্গলই প্রথম।

ঘ. থিয়েটার পরিচালনার যৌথ দায়িত্ব বেঙ্গলই প্রথম তৈরি করে। শুধু পরিচালন কমিটি নয়, উপদেষ্টাপর্ষৎও তৈরি করা হয়। নাট্যশালা ঠিকমত দেখাশোনা এবং নাট্যাভিনয় পর্যালোচনা করার জন্য এইভাবে জ্ঞানীগুণীদের নিয়ে কমিটি তৈরি করে বেঙ্গল থিয়েটার বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের যাত্রাপথে যথেষ্ট উৎসাহ জুগিয়েছিল।

ঙ. সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রথম অভিনেত্রী গ্রহণ করে বেঙ্গল থিয়েটার অভিনব ও দুঃসাহসিক কাজ করেছিল। সমাজরুচি ও নীতির দিক দিয়ে অনেক প্রতিবাদ হলেও, থিয়েটারের দিক দিয়ে যে এটি একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ তা অস্বীকার করা যাবে না। পরবর্তী বাংলা থিয়েটারে অভিনেত্রী দিয়ে অভিনয় সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

চ. বেঙ্গলের স্থায়ী মঞ্চ তৈরিতে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেকেই স্থায়ী মঞ্চ তৈরি করে অভিনয় প্রচেষ্টা শুরু করেন। ভুবনমোহন নিয়োগী বেঙ্গল থিয়েটারের কয়েক মাসের মধ্যেই (ডিসেম্বর, ১৮৭৩) নতুন মঞ্চ ও থিয়েটার বাড়ি তৈরি করে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের পত্তন করেন।

ছ. বিদেশী থিয়েটারের মডেলে রঙ্গমঞ্চ তৈরি করে বেঙ্গল থিয়েটার বাংলায় বিলিতি রঙ্গমঞ্চের স্থায়ী প্রতিষ্ঠার সূচনা করে। পরবর্তী সব থিয়েটারই বিলিতি থিয়েটারের আদলে তৈরি হতে থাকে।

জ. সেই যুগের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত করে জনসমর্থন ও আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল।

ঝ. বেঙ্গলের প্রতিষ্ঠার কাল থেকেই বঙ্কিমের উপন্যাসগুলি প্রকাশ পেতে থাকে। বেঙ্গল প্রয়োজনে বঙ্কিমের প্রায় সব উপন্যাসেরই নাট্যরূপ এখানে অভিনয় করে এবং সাফল্য লাভ করে। এইভাবে বঙ্কিমের উপন্যাসের খ্যাতি বিস্তারের মূলে বেঙ্গলের প্রচেষ্টা অস্বীকার করা যাবে না। সঙ্গে সঙ্গে বাংলা নাটকের বিষয়ের বিস্তারও বঙ্কিমের উপন্যাস গ্রহণের ফলে ঘটেছিল।

ঞ. নাট্যকার হিসেবে বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায়, উপেন্দ্রনাথ দাস, অমৃতলাল বসু এই থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এঁদের মধ্যে বিহারীলালের অন্য প্রতিভার সঙ্গে নাট্যকার সত্তারও বিকাশ এই থিয়েটারের মাধ্যমেই ঘটেছিল।

ট. শরৎচন্দ্র, বিহারীলাল, অক্ষয় মজুমদার, প্রিয়নাথ বসু প্রমুখ বেঙ্গলের খ্যাতিমান অভিনেতারা সকলেই সখের নাট্যশালায় অভিনয়ে অভিজ্ঞ হয়েছিলেন। সাধারণ রঙ্গালয়ে তারাই সুনামের সঙ্গে অভিনয় করে সেই অভিনয়রীতিকে অব্যাহত রাখেন।

তবে কয়েকটি দিক দিয়ে বেঙ্গল থিয়েটারের কার্যাবলীর সমালোচনা না করে পারা যায় না।

১. প্রথম দিকে বেঙ্গল থিয়েটার ছিল ধনী বাঙালির প্রাসাদ-মঞ্চের নবরঙ সংস্করণ। ধনীর জমিতে ধনীর নাতি থিয়েটার খুলেছে। তফাৎ ছিল শুধু টিকিট বিক্রির মধ্যে—এই অভিনয় আমন্ত্রণমূলক ছিল না। অনেকেই তাই বেঙ্গলের প্রথম দিককার কাজকে রাজাদের জাঁকজমকপূর্ণ শৌখিন থিয়েটারের নব্যসংস্করণ বলে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন।

২. নাট্যাভিনয়ে প্রথম থেকেই এদের কোনো উচ্চ আদর্শ ছিল না। সামাজিক কোনো দায়িত্ববোধও এরা পালন করতে পারে নি। যখনই সামাজিক কোনো উত্তেজনাকর ঘটনা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, বেঙ্গল তাকে বিষয়বস্তু করে নাটক অভিনয় শুরু করেছে, এইভাবে 'মোহান্তের এই কি কাজ'! কিংবা 'গুইকোয়ার' অভিনয় করে সস্তা জনপ্রিয়তা পেতে চেয়েছে। জনমত গঠনের দায়িত্ব পালন করেনি।

৩. আবার অভিনয়নিয়ন্ত্রণ আইনের (১৮৭৬) কবলে পড়ার ভয়ে তারা এরপর আর কখনোই কোন দেশপ্রেমমূলক নাটক অভিনয় করেনি। সেই সময়ের অন্য থিয়েটারগুলির মতোই তারাও শুধু পৌরাণিক, সামাজিক, গীতিনাট্য-অপেরা এবং বঙ্কিমের উপন্যাসের নাট্যরূপ অভিনয় করে নিরাপদে জনপ্রিয়তা লাভ করতে চেয়েছে।

৪. ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তাদের ঐকান্তিক আনুগত্যের ফলস্বরূপ তারাই প্রথম নাট্যমঞ্চ যারা অভিনয়নিয়ন্ত্রণ আইন চালু হওয়ার পর ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে 'রয়াল' খেতাব লাভ করেছে। অনেকে সেই যুগে যাকে 'লয়াল' খেতাব বলতে চেয়েছেন।

সে যাইহোক, এসব দোষত্রুটি সত্ত্বেও বেঙ্গল থিয়েটার প্রায় ত্রিশ বছর ধরে বাংলায় নাট্যাভিনয়ের ধারাবাহিক ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিল। সমসাময়িক ও পরবর্তী থিয়েটারের ওপর প্রভাব সৃষ্টি করে, বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করেছে।

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার

৬ নং বিডন স্ট্রিট, কলকাতা

উদ্বোধন : ৩১ ডিসেম্বর, ১৮৭৩
প্রতিষ্ঠাতা : ভুবনমোহন নিয়োগী
নাটক : কাম্যকানন (অমৃতলাল)

স্থায়িত্বকাল : ৩১ ডিসেম্বর, ১৮৭৩
৬ অক্টোবর, ১৮৭৭

ন্যাশনাল থিয়েটার তার প্রতিষ্ঠার (১৮৭২) কয়েক মাসের মধ্যেই মতান্তর, দলাদলি ইত্যাদি নানা কারণে দুভাগ হয়ে শেষে বন্ধ হয়ে যায়। উদ্যোক্তা ও অভিনেতারা তখন স্টেজবিহীন অবস্থায় অভিনয় থেকে দূরে থেকে 'দমফাটা' অবস্থায় রয়েছে। ওদিকে বেঙ্গল থিয়েটার রমরম করে অভিনয় করে চলেছে। 'মোহান্তের এই কি কাজ!' নাটক দেখতে গিয়ে বেঙ্গল থিয়েটারে ভুবনমোহন নিয়োগী ও কয়েকজন ন্যাশনালের অভিনেতা টিকিট না পেয়ে মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। তখন অমৃতলাল বসু, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ধর্মদাস সুর প্রভৃতি অভিনেতারা উদ্যোগী হয়ে এবং ধনী ভুবনমোহন নিয়োগীর অর্থে নতুন থিয়েটার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। ভুবনমোহন ন্যাশনাল থিয়েটারের সময়েও নানাভাবে এদের সাহায্য করেছিলেন। ন্যাশনাল থিয়েটার-এর ঐতিহ্য ধরে রাখবার জন্য 'ন্যাশনাল' নামটুকু নিয়ে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করা হলো। বিডন স্ট্রিটে মহেন্দ্রনাথ দাসের জমি (এখন সেখানে মিনার্ভা থিয়েটার) নিয়ে কাঠের থিয়েটার বাড়ি তৈরি করা হয়। তৈরির দায়িত্ব নেন ধর্মদাস সুর। ড্রপসিন এবং আরো দু'চারখানি সিন বিলিতি থিয়েটারের মিঃ গ্যারিককে দিয়ে আঁকানো হয়। ১৮৭৩-এর ২৯ সেপ্টেম্বর নাট্যশালার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হলো। তের হাজার টাকা খরচ করে তিন মাসের চেষ্টায় এই থিয়েটার বাড়ি তৈরি শেষ হলো।

১৮৭৩-এর ৩১ ডিসেম্বর থিয়েটারের উদ্বোধন হলো অমৃতলাল বসুর 'কাম্যকানন'[১] নাটক দিয়ে। তখন বেঙ্গল থিয়েটারে চলছিল মধুসূদনের মায়াকানন। সেই নাটকেরই মতো নামকরণ করা হলো, যদিও বিষয়বস্তু আলাদা, কাল্পনিক এক পরীর দেশের কাহিনী, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রথম রাত্রেই কিছুক্ষণ অভিনয় চলার পর সামনের 'Star light' থেকে আগুন লেগে থিয়েটার বাড়ির ক্ষতি হয়। অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়। দুর্ঘটনার পরের দিনই গ্রেট ন্যাশনাল বেলভেডিয়ারে সখের বাজারে, 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় করে।

১. অমৃতলালের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় যে, দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মেডিকেল কলেজের দেবেন্দ্র নামে এক ছাত্র এবং অমৃতলাল, এই কয়েকজনে মিলে এই নাটক কিংবা Fairy Tales রচনা করেন।

প্রথম অভিনয়ে এইভাবে বাধা পেয়েও এরা ভগ্নোদ্যম হলেন না। নতুন উৎসাহে থিয়েটার বাড়ি পুনর্নির্মাণ করে, ১৮৭৪-এর ১০ জানুয়ারি আবার অভিনয় শুরু করে দিলেন। নাটক বিধবাবিবাহ, নাট্যকার উমেশচন্দ্র মিত্র। দৃশ্যপটগুলি লুইস অপেরা হাউসের মতো হয়েছিল, কনসার্টও ভালো হয়েছিল। তবে গ্রেট ন্যাশনালে তখনো সব ভালো অভিনেতার সমাগম হয় নি। তাছাড়া নাটক নির্বাচনেও ত্রুটি ছিল। তা সত্ত্বেও ১৮৭৪-এর ১৭ জানুয়ারি প্রণয় পরীক্ষা (মনোমোহন বসু), ২৪ জানুয়ারি কৃষ্ণকুমারী (মধুসূদন), ৭ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি কপালকুণ্ডলা অভিনয় করলেন। বিলিতি থিয়েটারের মতো মঞ্চ, জাঁকজমক, ভালো দৃশ্যসজ্জা, ভালো কনসার্ট—কোন কিছুতেই গ্রেট ন্যাশনাল অভিনয় জমাতে পারল না। তার একটা বড়ো কারণ, এই সময়ে বেঙ্গল থিয়েটার মঞ্চে অভিনেত্রী দিয়ে অভিনয় করা শুরু করে দিয়েছে। গ্রেট ন্যাশনাল তখনো অভিনেত্রী নেয় নি, পুরুষেরাই নারী চরিত্রে অভিনয় করছে। তাছাড়া বেঙ্গলে শরৎচন্দ্র ঘোষ সাফল্যজনকভাবে অভিনয় চালিয়ে দর্শক আকর্ষণ করে চলেছেন।

তাই বাধ্য হয়ে কর্তৃপক্ষ এই সময়ে কিছুদিনের জন্য গিরিশচন্দ্রের সাহায্য নিতে বাধ্য হলেন। বঙ্কিমের মৃণালিনী ও বিষবৃক্ষ উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে গিরিশ নিজে সকলকে অভিনয় শেখালেন। নিজে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করলেন। মৃণালিনীর অভিনয় অসম্ভব সাফল্যলাভ করল। অভিনয় করলেন :

> গিরিশচন্দ্র—পশুপতি। অর্ধেন্দুশেখর—হৃষিকেশ। নগেন্দ্রনাথ—হেমচন্দ্র। অমৃতলাল বসু—দিগ্বিজয়। অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়—ব্যোমকেশ। মহেন্দ্রলাল বসু—বক্তিয়ার খিলজি। বসন্তকুমার ঘোষ—মৃণালিনী। আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়—গিরিজায়া। ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়—মনোরমা।

২১ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি পরপর মৃণালিনীর অভিনয় হলো, গ্রেট ন্যাশনালের খ্যাতি প্রচারিত হতে থাকল।

৭ মার্চ করলেন নবাবের নবরত্ন সভা। প্রথম রজনীতে নাটক দেখায় বিফল মনোরথ দর্শকদের দেওয়া প্রতিশ্রুতিমত বিনা টিকিটে অভিনয় করলেন, ১৮ মার্চ, দীনবন্ধুর নবীন তপস্বিনী। ১৮ এপ্রিল করলেন হেমলতা। হেমলতার অভিনয়ের সময় থেকেই ন্যাশনাল থিয়েটারের অনেকেই গ্রেট ন্যাশনালে এসে যোগ দিয়ে মিলিতভাবে অভিনয় শুরু করলেন। ৩০ মে করলেন কুলীনকন্যা বা কমলিনী নাটক। এইভাবে পুরনো ও নতুন নাটকের অভিনয় চালাতে চালাতে ৩০ মে, ১৮৭৪-এর পর চার মাসের জন্য গ্রেট ন্যাশনাল বন্ধ থাকে।

কলকাতায় অভিনয় বন্ধ থাকলেও গ্রেট ন্যাশনাল এই সময়ে মফঃস্বল বাংলায় অভিনয় করবার জন্য দলবদ্ধভাবে বেরিয়ে পড়ে। সেখানে ইংরেজদের স্টেশন থিয়েটারে হেমলতা, কপালকুণ্ডলা, যেমন কর্ম তেমনি ফল অভিনয় করে। সেখানে হেমলতা প্রশংসা পেলেও কপালকুণ্ডলার অভিনয় নিয়ে নানারূপ বিরূপ মন্তব্য হতে থাকে পত্র-পত্রিকায়।

আবার কলকাতায় ফিরে অভিনয়ের উদ্যোগ আয়োজন করতে থাকে। এবারে গ্রেট ন্যাশনাল অভিনেত্রী গ্রহণ করল। এতদিন শুধুমাত্র বেঙ্গল থিয়েটারেই মহিলাদের নেওয়া হয়েছিল। ১৮৭৩-এর আগস্ট মাসে। গ্রেট ন্যাশনাল প্রথম দিকে পুরুষদের দিয়েই নারী ভূমিকা অভিনয় করে আসছিল। এবারে কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি, যাদুমণি, হরিদাসী ও রাজকুমারী নামে পাঁচজন অভিনেত্রী গ্রহণ করা হল। অভিনেত্রী সহযোগে এখানে প্রথম অভিনয় হল 'সতী কি কলঙ্কিনী' নাটক। নাট্যকার নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৪। অভিনেত্রী নেওয়ার ফলে অপেরা জাতীয় নাচ-গানে ভরা অভিনয় করার সুযোগ এরা পেল। তাছাড়া ভালো অর্কেস্ট্রা এবং সঙ্গীতাচার্য মদনমোহন বর্মণের সুর ও গান নাটকটিকে জমিয়ে দিল। ২৬ সেপ্টেম্বর আবার অভিনয় হল এই অপেরার। পত্র-পত্রিকায় প্রশংসা হতে থাকে, দর্শকের সংখ্যাও বাড়তে থাকে।

গিরিশ তখন নেই। নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হয়েছেন ম্যানেজার। আগের ম্যানেজার ধর্মদাস সুরের সঙ্গে ভুবনমোহনের 'আয় ও অর্থ ঘটিত কিঞ্চিৎ গোলযোগ' ঘটে এবং তাঁকে সরিয়ে নগেন্দ্রনাথকে ম্যানেজার করা হয়।

১৮৭৪-এ অভিনয় হলো জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পুরুবিক্রম (৩ অক্টোবর), সতী কি কলঙ্কিনী ও ভারতে যবন (১০ অক্টোবর)। দুর্গাপূজার জন্য কয়েক দিন থিয়েটার বন্ধ থাকে। তারপরে শেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটকের বাংলা রূপান্তর 'রুদ্রপাল' (হরলাল রায়) অভিনীত হলো (৩১ অক্টোবর)। এরপর আনন্দকানন (লক্ষ্মীজনার্দন চক্রবর্তী), কিঞ্চিৎ জলযোগ (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ)। এই সময়ে অর্ধেন্দুশেখর আবার গ্রেট ন্যাশনালে যোগ দিয়ে 'আনন্দকাননে' একটি ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেন। গ্রেট ন্যাশনাল সাফল্যের মুখ দেখে। কিন্তু আবার গোলযোগ দেখা দিল। নগেন্দ্রনাথকে ম্যানেজাব রাখা নিয়ে আত্মকলহের শুরু। তাছাড়া টাকাপয়সার হিসেব নিয়েও মতান্তর হয়। নগেন্দ্রনাথ গ্রেট ন্যাশনাল ছেড়ে দিলেন, সঙ্গে নিয়ে গেলেন মদনমোহন বর্মণ, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু, যাদুমণি, কাদম্বিনীকে। 'গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী' নাম দিয়ে তারা বিভিন্ন স্থানে অভিনয় করতে করতে শেষে বেঙ্গল থিয়েটারে যোগাদান করেন (৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৫)।

নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে আরো সব অভিনেতা অভিনেত্রী চলে যাওয়ায় গ্রেট ন্যাশনাল বেশ বিপাকে পড়ে। ধর্মদাস সুরকে আবার ম্যানেজার করা হলো, ১৮৭৫-এর ১৬ জানুয়ারি। আঘাত সামলে নিয়ে গ্রেট ন্যাশনাল আবার অভিনয় শুরু করে। 'শত্রুসংহার' নাটক দিয়ে। নাটকটি ভট্টনারায়ণের সংস্কৃত 'বেণীসংহার' নাটক অবলম্বনে হরলাল রায়ের লেখা। এই অভিনয় সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য খবর হলো, খ্যাতনামা অভিনেত্রী বিনোদিনী এই নাটকে দ্রৌপদীর সখীর এক ছোট্ট ভূমিকায় প্রথম মঞ্চাবতরণ করেন, ১৮৭৪-এর ১২ ডিসেম্বর।

১৮৭৫-এর ২ জানুয়ারি উপেন্দ্রনাথ দাসের শরৎ-সরোজিনী নাটকের প্রথম অভিনয় এখানে হলো। অভিনয়ে : শরৎ—মহেন্দ্রলাল বসু। সরোজিনী—রাজকুমারী। বৈজ্ঞানিক

হরিদাস--গোষ্ঠবিহারী দত্ত। সুকুমারী--গোলাপসুন্দরী। ৯ জানুয়ারি দ্বিতীয় অভিনয়। 'অমৃতবাজার' পত্রিকার বিবরণ (১৪.১.১৮৭৫) থেকে জানা যায় যে, 'শরৎ সরোজিনী' নাটকের অভিনয় দেখবার জন্য নগরবাসীদের মধ্যে কৌতূহল ও ব্যগ্রতা জন্মেছিল ; স্থানাভাবের জন্য প্রতি রাত্রের অভিনয়ে প্রায় চার-পাঁচ শ' লোক ফিরে যেতে বাধ্য হতেন। এই নাটকেই অভিনয়ে গোলাপসুন্দরী সুকুমারীর চরিত্রে অনবদ্য অভিনয়ের জন্য সুকুমারী নামেই পরিচিত হয়েছিলেন। এরপর রাসলীলা. প্রমথনাথ মিত্রের নগ নলিনী, যেমন কর্ম তেমনি ফল অভিনীত হয়। ২৮ ফেব্রুয়ারি 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' অভিনয় করে বেথিয়ার রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের বাড়ি, সেখানে ভিজিয়ানা গ্রামের মহারাজা, ব্রহ্মরাজ-দূত, মহীশূর রাজবংশের ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

১৮৭৫-এর মার্চ মাসের শেষের দিকে গ্রেট ন্যাশনালের একটি দল ধর্মদাস সুরের নেতৃত্বে দিল্লী, আগ্রা, মিরাট, লক্ষ্ণৌ, লাহোর প্রভৃতি জায়গায় অভিনয় করতে যায়। মূলত অর্থ উপার্জনের আশায়। সেই সঙ্গে বাংলা থিয়েটারের মিশনারী অর্ধেন্দুশেখরের ইচ্ছা ছিল বাংলা থিয়েটারের প্রচার ও অভিনয় শিল্পের বিস্তার সারা দেশে করা। এই দলে ছিলেন ধর্মদাস, অর্ধেন্দুশেখর, অবিনাশচন্দ্র কর, বিনোদিনী, ক্ষেত্রমণি প্রভৃতি। দিল্লীতে সাত-আট দিন, লাহোরে বেশ কিছু দিন তারা অভিনয় করে। সেখানে নৃত্যগীতের অভিনয় চলত ভালো। তারপর মিরাট, সেখান থেকে লক্ষ্ণৌ, আগ্রা। লক্ষ্ণৌতে নীলদর্পণের অভিনয়ের সময়ে সাহেব দর্শকরা কিভাবে উত্তেজিত হয়ে মঞ্চে উঠে এসে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের আক্রমণ করতে চেয়েছিল, তার কৌতূহলজনক বর্ণনা বিনোদিনী তাঁর 'আমার কথা'-য় করেছেন।

১৮৭৫-এর সময়ে গ্রেট ন্যাশনালের মূল অংশ কলকাতায় থেকে অভিনয় করে যাচ্ছিল। তখন এখানে অস্থায়ী ম্যানেজার মহেন্দ্রলাল বসু। কলকাতায় তখন অভিনীত হচ্ছিল—সধবার একাদশী (২০ মার্চ), নয়শো রুপেয়া (১০ এপ্রিল), তিলোত্তমা সম্ভব (১৭ এপ্রিল), সাক্ষাৎ দর্পণ (প্রবোধচন্দ্র মজুমদার, ২৪ এপ্রিল), নন্দনকানন (৮ মে)।

ধর্মদাসের ভারতভ্রমণরত দলটি প্রচুর অর্থোপার্জন ও প্রভূত উপহার সামগ্রী নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলো ১৮৭৫-এর মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে এবং মুল দলে যোগ দিল। সঙ্গীতজ্ঞ ও বিখ্যাত অর্কেস্ট্রা মাস্টার মদনমোহন বর্মণ মাঝে কিছু দিন এখান থেকে গিয়ে বেঙ্গলে ছিলেন। তিনিও এই সময়ে কাদম্বিনীকে নিয়ে ফিরে এলেন গ্রেট ন্যাশনালে।

১৮৭৫-এর ৩ জুলাই মহেন্দ্রলাল বসুর 'পদ্মিনী' নাটকের অভিনয় দিয়ে আবার পূর্ণোদ্যমে গ্রেট ন্যাশনালে অভিনয় শুরু হয়। অভিনয় শেষে অভিনেত্রী যাদুমণির 'ভারতসঙ্গীত' গান দর্শকের মনে উদ্দীপনা সঞ্চার করে।

এবারে গ্রেট ন্যাশনালের আবার কিছু পরিবর্তন হলো। পশ্চিম ভারত থেকে ফিরে এসে ধর্মদাস সুর উপার্জিত অর্থ মালিক ভুবনমোহনকে বুঝিয়ে দেন নি এবং উপহার সামগ্রীও সমবণ্টন করেন নি। ধর্মদাস যৎসামান্য অর্থ ও অকিঞ্চিৎকর উপহার

ভুবনমোহনকে দেন। এই সব কারণে এবং থিয়েটারের হিসেবপত্র নিয়েও তিনি ধর্মদাসের ওপর ক্ষুব্ধ ছিলেন। তাছাড়া ভুবনমোহন গ্রেট ন্যাশনালের মালিক ও স্বত্বাধিকারী হলেও কাজেকর্মে ধর্মদাস সুরই প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন। ১৮৭৫-এর আগস্ট মাসে ভুবনমোহন ধর্মদাসের হাত থেকে কার্যভার নিয়ে নেন। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজনকে রঙ্গমঞ্চটি ইজারা দেন। ম্যানেজার থেকে যান মহেন্দ্রলাল বসু। ধর্মদাস সুর ও সঙ্গীরা গ্রেট ন্যাশনাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তাঁরা 'দি নিউ এরিয়ান (লেট ন্যাশনাল) থিয়েটার' নাম গ্রহণ করে বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনয় করতে থাকেন।

কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ইজারা নিয়ে পুরাতন থিয়েটারের নাম পালটে করেন 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার' এবং ম্যানেজার মহেন্দ্রলালকে নিয়ে অভিনয় চালাতে থাকেন।

১৮৭৫-এর আগস্ট মাসেই 'পদ্মিনী' নাটক দিয়ে এদের অভিনয় শুরু হয়ে গেল। ১৪ আগস্ট অভিনীত হলো উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ-সরোজিনী', ২১ আগস্ট 'নীলদর্পণ'। এই সময়ে অমৃতলাল বসু বেঙ্গল থেকে এসে এখানে যোগ দেন। তারপরেই অভিনীত হয় অভিনেত্রী সুকুমারী দত্তের লেখা নাটক 'অপূর্বসতী'। আশু দাসের সহযোগিতায় লেখা এই নাটকটি সুকুমারীর সাহায্য-রজনী হিসেবেই অভিনীত হয় (২৩ আগস্ট)। এরপর ডাক্তারবাবু (ভুবন সরকার), কনকপদ্ম (হরলাল রায়), হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' কাব্যের নাট্যরূপ সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যে অভিনয় করা হয়।

এইভাবে টানা চার মাস কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় এই নতুন থিয়েটার চালাতে গিয়ে লাভের পরিবর্তে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। থিয়েটার বাড়ির ভাড়াও দিতে পারছিলেন না। তখন ভুবনমোহন বাধ্য হয়ে আবার থিয়েটার নিজের হাতে নিয়ে নেন। আবার পুরনো নামে 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার' তার অভিনয় চালু করল। মালিক ভুবনমোহন এবং ম্যানেজার উপেন্দ্রনাথ দাস। ১৮৭৫-এর ২৩ ডিসেম্বরের 'অমৃতবাজার' পত্রিকার বিজ্ঞাপনে দেখা যায় ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার নাম বদলে আবার গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার হয়েছে। ১৮৭৫-এর ২৫ ডিসেম্বর অমৃতলালের লেখা 'হীরকচূর্ণ' নাটক দিয়ে এদের অভিনয় শুরু হলো। আগের 'কাম্যকানন' নাটক রচনার যৌথ প্রচেষ্টা বাদ দিলে 'হীরকচূর্ণ' অমৃতলালের প্রথম নাটক। এর বিষয় বরোদার রাজা গায়কোয়াড়ের সিংহাসনচ্যুতি, এই রাজ্যের ইংরেজ রেসিডেন্টের বিষপানে মৃত্যু হয়। এই নিয়ে সেই সময়ে দেশে খুব সোরগোল পড়ে যায়। ইংরেজ সরকার বরোদার রাজাকে এই অজুহাতে সিংহাসনচ্যুত করেন। তাই নিয়ে দেশ জুড়ে হৈচৈ হয়। 'হীরকচূর্ণ' নাটকের বিষয়বস্তু এই ঘটনাকে নিয়েই রচিত। এর কিছু আগেই বেঙ্গল থিয়েটার গুইকোয়ার নামে একই বিষয়বস্তুর একটি নাটক নামিয়ে দর্শকদের মধ্যে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। এখানে ১৮৭৫-এর ২৫ ডিসেম্বর অমৃতলালের নাটকটি অভিনীত হলো। তারপরেই ৩১ ডিসেম্বর এখানে উপেন্দ্রনাথ দাসের 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকের প্রথম অভিনয় হলো। এর আগে ১৮৭৫-এর ১৪ আগস্ট বেঙ্গলমঞ্চে 'দি নিউ এরিয়ান' দল সুরেন্দ্র বিনোদিনী

প্রথম মঞ্চে অভিনয় করে। তারাই আবার ফিরে এসে গ্রেট ন্যাশনালে যোগ দেয়। এবং সুরেন্দ্র বিনোদিনী আবার গ্রেট ন্যাশনাল মঞ্চে অভিনয় করে। এই নাটকে সুকুমারী বিনোদিনীর ভূমিকায় অভিনয়ে কৃতিত্ব অর্জন করেন। ১৮৭৬-এ প্রকৃত বন্ধু (ব্রজেন্দ্রকুমার রায়), সরোজিনী (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ) এবং বিদ্যাসুন্দরের অভিনয় হয়।

সরোজিনীতে অভিনয় করে : লক্ষ্মণসিংহ—মতিলাল সুর। ভৈরবাচার্য--গোপাল দাস। বিজয় সিংহ—অমৃতলাল বসু। রণবীর সিংহ—মহেন্দ্রলাল বসু। সরোজিনী—বিনোদিনী।

১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দেই গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার তথা বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটতে থাকে। অভিনয়নিয়ন্ত্রণ আইন (Dramatic Performances Control Act. 1876)[২] এই ঘটনাগুলির মধ্য দিয়েই প্রবর্তিত হওয়ার সুযোগ খুঁজে নেয়। পরাধীন জাতির নাট্য-সংস্কৃতির ওপর ব্রিটিশ সরকারের দমননীতি আইনের রূপে দেখা দিল।

ব্রিটিশ যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েলস (পরবর্তী সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড) কলকাতায় এসে দেশীয় পুরনারীদের দেখতে চাইলে উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় নিজের বাড়িতে তাঁকে আহ্বান করেন। যুবরাজ অন্তঃপুরে ঢুকে পুরনারীদের দেখে আসেন। এই নিয়ে তখন কলকাতায় প্রচণ্ড আলোড়ন। এই বিষয় নিয়েই গ্রেট ন্যাশনাল 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' নামে উপেন্দ্রনাথ দাসের লেখা একটি প্রহসন ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারি অভিনয় করে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকের সঙ্গে। ২৩ ফেব্রুয়ারি 'সতী কি কলঙ্কিনী'র সঙ্গে এই প্রহসনটির দ্বিতীয় অভিনয় হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় দুটি অভিনয়েও প্রচুর দর্শক সমাগম হয়। সেদিন ভিন্ন নামে এটি অভিনীত হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। দ্বিতীয় অভিনয়ের পরেই পুলিশ এর অভিনয় বন্ধ করে দেয়। তখন এটির নাম পালটে 'হনুমান চরিত্র' নাম দিয়ে অভিনয় করা হয় (২৬ ফেব্রুয়ারি)। 'কর্ণাটকুমার' (সত্যকৃষ্ণ বসু সর্বাধিকারী) নাটকের পর। এখানে যুবরাজকে দিল্লীশ্বর হোরঙ্গজেবের পুত্র এবং উকিল গজদানন্দকে 'হনুমান' নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল। পুলিশ এরও অভিনয় বন্ধ করে দেয়। তখন পুলিশকে ব্যঙ্গ করে উপেন্দ্রনাথ The Police of Pig and Sheep প্রহসন লেখেন। সেটি সুরেন্দ্রবিনোদিনীর সঙ্গে অভিনীত হলো (১ মার্চ, ১৮৭৬)। পুলিশ কমিশনার মিঃ হগ এবং পুলিশ সুপার মিঃ ল্যাম্বকে ব্যঙ্গ করেই এই রকম নামকরণ।

ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের এই ভূমিকা গ্রহণে বড়লাট নর্থব্রুক ২৯ ফেব্রুয়ারি এক অর্ডিনান্স জারি করেন তাতে যে কোনো নাটক 'Scandalous, defamatory, seditious, obscene or otherwise pre-judicial to the public interest'—হলে তা বন্ধ করার ক্ষমতা ইংরেজ সরকারের হাতে রইলো। পত্র-

২. 'অভিনয়-নিয়ন্ত্রণ আইন ও বাংলা নাটক' পর্যায়ে এই নিয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। পৃঃ ১৪২-১৫৯

পত্রিকায় এই অর্ডিনান্সের পক্ষে ও বিপক্ষে নানা মতবাদ প্রকাশ পেতে থাকে। গ্রেট ন্যাশনাল তখন এই জাতীয় নাটকের অভিনয় বন্ধ করে দিয়ে আবার 'সতী কি কলঙ্কিনী' ও 'উভয় সঙ্কট' (৪ মার্চ) অভিনয় করতে থাকে। পুলিশ সেই রাতেই থিয়েটারে এসে ডিরেক্টার উপেন্দ্রনাথ দাস, ম্যানেজার অমৃতলাল বসু, অভিনেতা মতিলাল সুর, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং সঙ্গীতকার রামতারণ সান্যাল প্রমুখ আটজনকে গ্রেপ্তার করে। প্রথম বিচারে এদের মধ্যে উপেন্দ্রনাথ ও অমৃতলালের এক মাস বিনাশ্রম দণ্ড হয় এবং অন্যেরা মুক্তি পায়। আপীল করা হয়। আপীলের রায়ে এরা দুজনেও ছাড়া পেলেন (২০ মার্চ, ১৮৭৬)।

ইংরেজ সরকার এবার নব উদ্যমে অর্ডিনান্সটিকে মার্চ মাসেই Dramatic Performances Control Bill নামে আইনের খসড়া তৈরি করে কাউন্সিলে পেশ করে এবং ডিসেম্বর মাসেই তা আইনে পরিণত হয়।

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনয়ের ধারা এবার প্রচণ্ডরূপে আঘাত পেল। উপেন্দ্রনাথ দাস চলে গেলেন বিলেত। অমৃতলাল বসু ও বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় গেলেন পোর্টব্লেয়ার, চাকরী নিয়ে। সুকুমারী দত্ত অভিনয় থেকে বসে গেলেন। বিনোদিনী গ্রেট ন্যাশনাল ছেড়ে দিলেন। নগেন্দ্রনাথ প্রায় স্বেচ্ছা অবসর নিলেন, অর্ধেন্দুশেখর বেরিয়ে পড়লেন দেশভ্রমণে। আর মামলা মোকদ্দমায় সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন ভুবনমোহন।

তবুও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে লাগল গ্রেট ন্যাশনাল। পুরনো নাটকগুলির পুনরভিনয় চলল। সতী কি কলঙ্কিনী ও উভয় সঙ্কট, সরোজিনী, পদ্মিনী, ভীমসিংহ (ওথেলোর রূপান্তর : তারিণীচরণ পাল) প্রভৃতি নাটকগুলি মামলার সময়ে চলছিল। ১৮৭৬-এর ৮ এপ্রিল থেকে এখানে অভিনয় বন্ধ থাকে। একেবারে নতুন বছরে, ১৮৭৭-এর জানুয়ারিতে দু' তিন বার অভিনয় হলো পারিজাত হরণ গীতিনাট্য (নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)। গীতিনাট্যগুলিই এই দুঃসময়ে চলছিল ভালো। তবুও, তারই মধ্যে আদর্শ সতী, চোরের ওপর বাটপাড়ি, একেই কি বলে সভ্যতা, সধবার একাদশী প্রভৃতি নাটকগুলিও অভিনীত হয়। ১৮৭৭-এর ৬ অক্টোবর অভিনীত হলো 'দুর্গাপূজার পঞ্চরং', 'আগমনী গান' ও 'ইয়ং বেঙ্গল'—তিনটি প্রহসন ও গীতিনাট্য।

১৮৭৭-এর ৬ অক্টোবর গ্রেট ন্যাশনালের শেষ অভিনয়। গ্রেট ন্যাশনাল কোনোরকমে অভিনয় চালাতে চালাতে একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল।

ভুবনমোহন এবার গিরিশচন্দ্রকে গ্রেট ন্যাশনালের ইজারা দেন ; গিরিশ এই থিয়েটার-এর দায়িত্ব নিয়ে আবার নামকরণ করেন 'ন্যাশনাল থিয়েটার', জুলাই, ১৮৭৭। এর অনেক আগে গিরিশের পরিচালনাধীন ন্যাশনাল থিয়েটার ১৮৭৪-এর ১৮ এপ্রিল গ্রেট ন্যাশনালের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। এবারে স্বত্বাধিকারী গিরিশের গ্রেট ন্যাশনাল আবার ন্যাশনাল থিয়েটার নাম নিয়ে অভিনয় শুরু করল। ম্যানেজার হলেন অবিনাশচন্দ্র কর।

পরিবারিক কারণে গিরিশ ১৮৭৭-এর ৩০ নভেম্বর এর মালিকানা হস্তান্তরিত করেন। এইরকম নানাজনের মধ্যে হস্তান্তরিত হতে হতে শেষে মূল মালিক ভুবনমোহন দেনার দায়ে এই থিয়েটারটি নীলামে তোলেন। প্রতাপচাঁদ জহুরি এই থিয়েটার নীলামে কিনে নেন, ১৮৮০-তে। সেখানে তিনি নতুন করে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম দিয়ে অভিনয় চালাতে থাকেন। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের অস্তিত্ব শেষ হয়ে গেল।

গ্রেট ন্যাশনাল দীর্ঘদিন চালু ছিল না। তার স্বল্পকালীন অভিনয়ের ইতিহাসে অন্তত তিনটি কারণে এই থিয়েটার বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে চিরকাল আলোচিত হতে থাকবে :

এক. গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার দ্বিতীয় রঙ্গালয় যার নিজস্ব বাড়ি ও মঞ্চ ছিল। এবং ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত হয়েছিল। মূল ন্যাশনাল থিয়েটার বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর নাটক পাগল যুবকেরা শুধুমাত্র পৃষ্ঠপোষকের অভাবে তাদের অবদমিত নাট্যস্পৃহা নিয়ে বসেছিল। ভুবনমোহন সহযোগিতায় এলেন, নিজের খরচে জমি সংগ্রহ, থিয়েটার বাড়ি ও মঞ্চ নির্মাণ করে নিজস্ব মালিকানায় এই থিয়েটারের সব আর্থিক দায়দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। শরৎচন্দ্র ঘোষের বেঙ্গল থিয়েটারের চার মাসের মধ্যেই কলকাতায় এটি দ্বিতীয় প্রয়াস। সাধারণ রঙ্গালয় তাঁর ব্যক্তি মালিকানায় অব্যাহত গতিবেগ লাভ করল।

দুই. বাংলা নাট্যশালায় স্বদেশপ্রেমের উদ্দীপনা ও ব্রিটিশ বিরোধিতা গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের মাধ্যমেই পূর্ণবেগে চালিত হলো। ন্যাশনাল থিয়েটার 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবোধের প্রেরণার যে উন্মেষ ঘটিয়েছিল, গ্রেট ন্যাশনাল সেই ধারাকেই আরো উদ্দীপিত করে তুলল। ব্রিটিশ সহায়তায় জাত ধনী বাঙালির সখের মঞ্চে যা কোনো দিনই সম্ভব হয় নি মধ্যবিত্তের থিয়েটারেই তা সম্ভব হলো।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এদেশীয়দের মনে যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হচ্ছিল এবং জাতীয়তাবোধের উদ্বোধন ঘটে চলেছিল, তারই সহায়ক হিসেবে গ্রেট ন্যাশনাল স্বদেশপ্রেমের এবং ব্রিটিশ বিরোধিতার নাটক অভিনয় করতে লাগল। নীলদর্পণ, ভারতমাতা, শরৎসরোজিনী, সুরেন্দ্রবিনোদিনী, হেমলতা, বঙ্গের সুখাবসান, হীরকচূর্ণ, পুরুবিক্রম প্রভৃতি নাটকের ধারাবাহিক অভিনয়ের মধ্যে তাদের দেশপ্রেম ও পরাধীনতার জ্বালার রূপ প্রকাশ পাচ্ছিল। হরলাল রায়, অমৃতলাল বসু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং উপেন্দ্রনাথ দাস—এই চার নাট্যকারের নাটক গ্রেট ন্যাশনালে প্রায়ই অভিনীত হয়েছে এবং জনসম্বর্ধনা লাভ করেছে। 'নীলদর্পণ' তো হয়েইছে।

তদানীন্তন জাতীয় ভাবধারার উন্মেষের একটা প্রধান সহযোগী হিসেবে গ্রেট ন্যাশনাল তার নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে দেশবাসীকে উজ্জীবিত করে তুলে পরাধীন দেশের রঙ্গালয়ের নাট্যকর্মীর প্রধান দায় ও দায়িত্ব পালন করেছিল।

তিন. স্বদেশপ্রেম ও ব্রিটিশ বিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গে নাটকে ব্রিটিশের শাসন ও অত্যাচার এবং ভারতবাসীর অসহায়তা বা কখনো প্রতিবাদ--এই সব দৃশ্য তুলে ধরা হচ্ছিল। 'ভারতমাতা' গীতিনাট্যে সাহেবদের অত্যাচার এবং এদেশবাসীর ক্ষুধার জন্য হাহাকার চিত্রিত হয়েছিল। 'নীলদর্পণে' তোরাপ তো সাহেবকে ধরে পিটিয়েছিল। সাহেবের নির্মম অত্যাচারও দেখানো হয়েছিল। শরৎসরোজিনীতে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে বাঙালি ধরে পেটাচ্ছে—এমন দৃশ্যও রয়েছে। আবার সাহেবের নারী নির্যাতন ও শোষণও দেখানো হচ্ছে। হীরকচূর্ণ নাটকে তদানীন্তন বড়লাট নর্থব্রুক ও তার সরকারের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ আক্রমণ রয়েছে। এইভাবে ব্রিটিশ বিরোধিতা এবং প্রতিবাদ যখন রঙ্গালয়ে ভাষা পাচ্ছিল এবং জনসমর্থন বিস্তৃত হচ্ছিল, তখন শাসক ইংরেজ স্বভাবতই ভীত হয়েছিল এবং রঙ্গালয়ে ব্রিটিশ বিরোধিতা দমনে এগিয়ে আসে। এই সময়েই 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' সংক্রান্ত ঘটনা ব্রিটিশ সরকারকে আইন প্রবর্তনে বাধ্য ও ত্বরান্বিত করে মাত্র।

গ্রেট ন্যাশনালের অভিনয়ের মধ্যেই ব্রিটিশ রাজশক্তি আশঙ্কার কারণ খুঁজে পেয়েছিল। তাই অচিরাৎ অভিনয়নিয়ন্ত্রণ আইন (১৮৭৬) প্রবর্তন করে বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও নাটকের কণ্ঠরোধের প্রচেষ্টা শুরু করে দেয় ইংরেজ।

ব্রিটিশের কুখ্যাত নাটক ও নাট্যাভিনয় বিরোধী আইন চালু হয়েছিল গ্রেট ন্যাশনালের অভিনয়ের কথা মনে রেখেই। বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে এই প্রসঙ্গ সর্বথা উল্লেখযোগ্য।

গ্রেট ন্যাশনালে ব্যক্তি মালিকানা চালু হলেও পুরো পেশাদারি প্রথা, রীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি (Professional attitude and approach) চালু করতে পারে নি। থিয়েটার চলেছে ভালো, অর্থ উপার্জন হয়েছে ভালো। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মের অভাবে অর্থকে ব্যবহার করা যায় নি। ম্যানেজাররা প্রভুত্ব করেছে, গণ্ডগোল করেছে। ধর্মদাস সুর ম্যানেজার থাকাকালীন মালিক ভুবনমোহনের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশাধিকার ছিল না। পাশেই বেঙ্গল থিয়েটার মোটামুটি থিয়েটারকে নিয়ন্ত্রণে রেখে টানা ত্রিশ বছর অভিনয় চালিয়ে গেছে। শুধুই পেশাদারিত্বের অভাবে গ্রেট ন্যাশনাল গৌরবের দিনেও দেনাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

তবে একথা ঠিক, যে স্বল্পকাল গ্রেট ন্যাশনাল ছিল, ছিল পূর্ণ মর্যাদায়। কিছু হাল্কা রং তামাশার নাটক ও গীতিনাট্য অভিনয় করলেও বেশির ভাগই করেছে সীরিয়াস ও তাৎপর্যময় নাটকের অভিনয়। দর্শকের সহযোগিতাও পেয়েছে।

এই থিয়েটারেই অমৃতলাল নাট্যরচনা শুরু করেন। উপেন্দ্রনাথ দাস এখানেই তাঁর নাট্যকার ও নাট্যশিক্ষকের প্রধান দায়িত্ব পালন করেছেন। হরলাল রায়ের নাটকগুলি এখানেই রচিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পূর্ণ মর্যাদায় এখানেই স্বীকৃত। একথাগুলিও এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে।

অভিনয়-নিয়ন্ত্রণ আইন ও বাংলা নাটক

বাংলা নাটক ও নাট্যাভিনয়ের কণ্ঠরোধ করবার জন্য ব্রিটিশ সরকার এদেশে অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন বা Dramatic Performances Control Act. (1876) চালু করে। তদানীন্তন বড়লাট লর্ড নর্থব্রুকের আমলে ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর এই আইনটি বিধিবদ্ধ হয়।

ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক এই আইন প্রণয়নের ইতিহাস উল্লেখযোগ্য। ১৯ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে নবজাগ্রত বাঙালি মানসে নানান চিন্তা ভাবনার উন্মেষ তার কর্মে, আচরণে ও কথায় প্রকাশ পেতে থাকে। এই ভাবনার জাগৃতিতেই স্বাদেশিকতার প্রেরণা এবং স্বাধীনতার স্বপ্ন বাঙালিকে ধীরে ধীরে উদ্দীপ্ত করে তোলে। সভাসমিতি করা, বক্তৃতা ও আলোচনা, এসোসিয়েশান গড়ে তোলা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে প্রেরণার কর্মজাত প্রকাশ, এবং কাব্যে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে এর চিন্তার বিকাশ। হিন্দুমেলার জাতীয়তার উদ্বোধন ক্রমে বিকশিত হয়ে ১৮৭২-এর দুটি ঘটনায় দ্বিমুখী প্রকাশ লাভ করল। একদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ ; অন্যদিকে জাতীয় রঙ্গালয় বা ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা। বঙ্গদর্শনে তৎকালীন বঙ্গমনীষীর মানসিক চিন্তার দাবি এবং রঙ্গালয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মানসিকতার উল্লাস। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটক দিয়েই জাতীয় রঙ্গালয়ের উদ্বোধন ঘটে -একথা স্মরণ রাখতে হবে।

নীলদর্পণের অভিনয় থেকেই ব্রিটিশ সরকার ভীত হচ্ছিল। রঙ্গমঞ্চের মাধ্যমে জাতীয় চেতনা অনেক বেশি কার্যকর হতে পারে এবং আপামর জনগণের চিত্তবিক্ষোভ রঙ্গমঞ্চ ঘটিয়ে তুলতে পারে—এই আশঙ্কা রঙ্গমঞ্চপ্রিয় ইংরেজ জাতি সহজেই বুঝে নিয়েছিল। সভাসমিতি, আলোচনা শিক্ষিত ভদ্রজনের মধ্যে আবদ্ধ এবং তার সবটাই তখন তত্ত্বগত আবেদন নিবেদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু রঙ্গমঞ্চ যখন নীলদর্পণ অভিনয় করল এবং সাহেবের অত্যাচার, সাহেবের বিরুদ্ধে কৃষকের আক্রমণ মঞ্চে দেখানো হল, তখন বাঙালি দর্শকবৃন্দের স্বাদেশিক চেতনা যতটা উৎফুল্ল হলো, তার চেয়ে অনেক বেশি ব্রিটিশের বাড়ল উদ্বেগ। 'নীলদর্পণ' গ্রন্থাকারে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশের পরই ব্রিটিশ সরকার মামলা করে (জুলাই, ১৮৬১)। বিচারে শাস্তি হয় প্রকাশক জেমস লঙ-এর একমাস জেল ও এক হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো কারাবাস। এবং নীলদর্পণের বেশ কিছু অংশ মানহানিকর সাব্যস্ত হয়। ১৮৭২-এ ন্যাশনাল থিয়েটার নীলদর্পণ অভিনয়ের সময়ে ঐ অংশগুলিকে বাদ দিয়েই অভিনয় করে। ইংলিসম্যান কাগজে নীলদর্পণের অভিনয় নিয়ে তীব্র আপত্তি তোলা হয়। ন্যাশনাল থিয়েটারের সম্পাদক পত্র মারফৎ ইংলিসম্যান কাগজে (২৩-১২-৭২) জানিয়ে দেন যে, আদালতের নির্দেশ মোতাবেক অভিনয় হচ্ছে। পুলিশের ডেপুটি কমিশনার

নিজে অভিনয় দেখতে এসে তা যাচাই করে যান।

ন্যাশনাল থিয়েটার কিছুদিনের মধ্যেই ভেঙে-চুরে আবার গড়ে এবং ভেঙে তৈরি হয়েছে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার। তার আগেই বেঙ্গল থিয়েটার চালু হয়ে গেছে। ১৮৭৬-এর গোড়ার দিকেই কলকাতার বেঙ্গল ও গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার নিয়মিত অভিনয় করে চলেছে। মধুসূদন, দীনবন্ধু, রামনারায়ণ—এঁদের নাটকগুলি, নানা প্রহসন, নক্সা, অপেরা এবং বঙ্কিমের উপন্যাসের নাট্যরূপ এই দুটি রঙ্গালয়ে অভিনীত হচ্ছে। এগুলি নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের মাথাব্যথার কোনো কারণ ছিল না।

রাজরোষ না হলেও সমাজের মাথাওয়ালাদের রোষে কিছু নাটকের অভিনয় প্রচেষ্টা বন্ধ করা হয়েছিল। যেমন মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ'। এবং রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' অভিনয়ের সময়ে চুঁচুড়ায় গিয়ে হাজির হয়েছিল ভাটপাড়ার ব্রাহ্মণকুলীন সমাজপতির দল, নাটকটি বন্ধ করে দেবার জন্য। এসব হলো সরকারি আইনের বাইরে সমাজনেতাদের শক্তি প্রয়োগে কণ্ঠরোধ (Cultural hegemony)—নানাযুগে নানাভাবে সেটা হয়ে চলেছে।

কিন্তু এরই ফাঁকে এই সময়ে গ্রেট ন্যাশনাল ও বেঙ্গল থিয়েটারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম', কিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতে যবন', হরলাল রায়ের 'বঙ্গের সুখাবসান', 'হেমলতা', নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গুইকোয়ার', অমৃতলালের 'হীরকচূর্ণ', উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎসরোজিনী' অভিনয় হয়ে চলেছে। এইসব নাটকের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার-বিরোধী মনোভাব নানাভাবে প্রকাশ পেতে থাকে। 'হীরকচূর্ণ' বা 'গুইকোয়ার' দুটি নাটকই লেখা হয়েছিল সমসাময়িককালে বরোদা রাজ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়ে। বিষপানে ঐ রাজ্যের ইংরেজ রেসিডেন্ট-এর মৃত্যু হওয়া নিয়ে গোলমাল এবং মহারাজার সিংহাসনচ্যুতি, এইসব ঘটনার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশের ক্ষমতা বিস্তারের নগ্ন প্রকাশ ঘটেছে। ভারতমাতা রানী ভিক্টোরিয়ার জয়গাথা থাকলেও, নিরন্ন ভারতীয়ের হাহাকার, ক্ষুধার জন্য চিৎকার এবং ইংরেজ কর্তৃক বিদ্রোহী সন্তানদের পদাঘাত, ব্রিটিশের শাসন-চরিত্রকেই তুলে ধরেছে। শরৎ-সরোজিনীতে প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ বিরোধিতা সংলাপে ও চরিত্রের আচরণে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। পুরুবিক্রমে ইতিহাসের পটে ভারতের স্বাধীনতা ও গৌরবের কথাই বলা হয়েছে। ভারতে যবন, বঙ্গের সুখাবসান বা হেমলতা প্রভৃতি নাটকেও ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বর্তমান ভারতের দেশাত্মবোধই প্রকাশ পেয়েছে। এইসব নাটক নিয়ে ব্রিটিশ সরকার খুশি ছিল না। বরং উদ্বিগ্ন হয়ে তারা তখন থেকেই এইসব নাটকের অভিনয় বন্ধ করার পরিকল্পনা করতে থাকে।

১৮৭৫ থেকে ১৮৭৬-এর মধ্যে এই দুটি রঙ্গালয়ে ধারাবাহিকভাবে যেসব নাটকের অভিনয় হয়ে চলল এবং নিয়ত দর্শক সম্বর্ধনায় উত্তরোত্তর আবেগ সঞ্চার করে চলল সেগুলি নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের উদ্বেগ আশঙ্কা ও দুশ্চিন্তার কারণ হলো।

গ্রেট ন্যাশনালে অভিনীত হলো :

হীরকচূর্ণ (অমৃতলাল), সুরেন্দ্রবিনোদিনী (উপেন্দ্রনাথ), শরৎসরোজিনী (উপেন্দ্রনাথ)

সরোজিনী (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ), গজদানন্দ ও যুবরাজ (উপেন্দ্রনাথ), হনুমান চরিত্র (উপেন্দ্রনাথ) পুলিশ অফ পিগ অ্যান্ড শিপ (উপেন্দ্রনাথ)।

বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হলো :

গুইকোয়ার (নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়), সুরেন্দ্রবিনোদিনী, বীরনারী, ভারতসঙ্গীত, বঙ্গ বিজেতা, পলাশীর যুদ্ধ, বঙ্গের সুখাবসান (হরলাল রায়)।

এই ধরনের জাতীয় ভাবোদ্দীপনার নাটক ঐ সময়ে দর্শকের মানসিক স্ফূর্তিকে জাগ্রত করেছে। মঞ্চে ইংরেজ চরিত্রের অত্যাচারের দৃশ্য. বাঙালি নায়ক ইংরেজকে আক্রমণ করে আঘাত করছে, নায়িকা গুলি করে অত্যাচারী ইংরেজকে হত্যা করছে--এইসব দৃশ্য স্বভাবতই ইংরেজ সরকারকে উৎকণ্ঠিত করেছে। সেই সময় থেকেই শাসক ইংরেজ চেষ্টা চালিয়ে গেছে কিভাবে ঐ ধরনের নাটকের অভিনয় বন্ধ করা যায়।

দুভাবে শাসকশ্রেণী শিল্পসংস্কৃতির প্রচার বন্ধ করতে পারে--১. আইনের বলে। ২. বলপ্রয়োগে। প্রথমে পুলিশ পাঠানো পরে হুমকি দেওয়া--কোনো কিছুতেই যখন এই ধরনের অভিনয় বন্ধ করা যাচ্ছে না, তখনই তাদের আইনের কথা ভাবতে হয়েছে। কেন না, ইংরেজের প্রবর্তিত এমন কোনো আইন ছিল না, যা দিয়ে এই ধরনের নাটকের অভিনয় বন্ধ করা যায়।

এই সময়ে, ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে, দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের 'চা-কর-দর্পণ' নাটক প্রকাশিত হয়েছে। মুদ্রিত গ্রন্থটির মুখপাতে চা-কর সাহেব কর্তৃক কুলী রমণীর নির্যাতনের একটি লিথো ছবি রয়েছে।

এই নাটকটি অভিনীত হয়নি। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এই বইয়ের বিষয় ও বক্তব্য জেনেছেন। বুঝেছেন যে, যেসব ব্রিটিশ চা-ব্যবসায়ী এদেশে রয়েছে তাদের শোষণের মুখোস নগ্ন করে দিয়েছে এই নাটক। নীলদর্পণের নীলকর সাহেবরা অভিজাত ব্রিটিশ ব্যবসায়ী ছিল না, কিন্তু চা-কর দর্পণের চা-ব্যবসায়ীরা অভিজাত বৃটিশ ব্যবসায়ী। নীলকর সাহেবদের রক্ষা করতে ব্রিটিশের যতটা না উৎসাহ ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি উদ্যম ছিল অভিজাত চা-ব্যবসায়ীদের রক্ষা করা। এই বিষয়টি খুব পরিষ্কার বোঝা যাবে হবহাউসের তৈরি বিলের খসড়াটি খুঁটিয়ে পড়লেই। এই 'চা-কর দর্পণ' নাটক যদি একবার পাদপ্রদীপের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে জনসমক্ষে এসে উপস্থিত হতে পারে, তাহলে, হবহাউসের পক্ষে অনুমান করা শক্ত নয় মোটেই যে. চা-এর ব্যবসায়ের ওপর প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়বে! যাতে ব্রিটিশ রাজ-শাসকেরা উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত।

বিলের মূল বয়ানটি খুঁটিয়ে পড়লেই বোঝা যায় ব্রিটিশ শাসকের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল? ভারতীয়ের মনে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠতে দেখে তারা ভেতরে ভেতরে শঙ্কিত হচ্ছিল। তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ কিংবা শোষণের চক্রান্তে কোনোরকম আঘাত আসুক ব্রিটিশ তা চায়নি। নাটকের মাধ্যমে এই কাজ হচ্ছে দেখে তারা আরো বেশি চিন্তিত। কেন না তারা জানে, হবহাউসের বিলের মধ্যেই রয়েছে, সর্বদেশে ও সর্বকালে নাটক ও মঞ্চের প্রচণ্ড প্রভাবের কথা। এবং বাংলা নাটক ও মঞ্চ সেই পথেই

এগিয়ে চলেছে। তাই গোড়াতেই তাকে স্তব্ধ করে দিতে হবে, যাতে আর কিছুতেই বাংলা মঞ্চ ও নাটক ব্রিটিশ বিরোধী কিংবা ব্রিটিশ রাজবিরোধী ভূমিকা পালন না করতে পারে। এটাই ছিল 'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ' বিলের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বাংলা নাটক ও মঞ্চ সম্পর্কে যখন ব্রিটিশ সরকার এইভাবে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে, তখন সহযোগী হিসেবে সঙ্গে পেয়ে গেল এদেশের প্রভাবশালী-নীতিবাগীশ শিক্ষিত শ্রেণী ও অভিজাত সম্প্রদায়কে।

একদল নীতিবাগীশ ব্যক্তির আক্রোশ ছিল রঙ্গালয়ের ওপর। ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দেই নাট্যাভিনয়ে স্ত্রীচরিত্রের জন্য অভিনেত্রীর আমদানী ঘটেছে মঞ্চে, যারা ভদ্রশিক্ষিত ঘরের মেয়ে ছিল না। সবাই ছিল বারাঙ্গনা। তখনকার সামাজিক প্রেক্ষিতে অভিনয়ের জন্য ঘরের মেয়েদের পাওয়া সম্ভব ছিল না। রঙ্গমঞ্চে এই বারাঙ্গনাদের আগমনে নীতিবাগীশ শ্রেণী 'গেল গেল' রব তুলেছিল। 'সাধারণী' পত্রিকায় লেখা হলো :

> 'কুক্ষণে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বঙ্গের রঙ্গভূমিতে বারাঙ্গনা প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছেন। ......ন্যাশনালের প্রমীলা যখন কটিতে কীরিচ আঁটিয়া দুলিতে দুলিতে বলিতে থাকে, 'আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাখবে?' তখন মনে হয়, তা বটেত, তোমার বাঁধা হুঁকা, বারেন্দা, কুশলে থাক—তোমার ডর কি?......গোঁফ কামান, দাঁড়ি কামান, স্বর মোটা, বাপে তাড়ান, এন্ট্রান্স ফেল, প্রমীলা স্বীকার করি শ্লাঘার সামগ্রী নহে। কিন্তু হৃদয় পোড়া, মনপোড়া, লজ্জা পোড়া, ঘর পোড়ানি—মেছোবাজারের প্রমীলার অপেক্ষা লক্ষগুণে ভালো।'--

নীতিবাগীশের দল প্রচণ্ড হৈ-চৈ ফেলে দিয়ছিল রঙ্গমঞ্চের বিরুদ্ধে। দেশ সমাজ সংসার সব রসাতলে গেল এমন সোরগোল উঠল নানা দিকে। অবশ্যই এরা চাইছিলেন যে কোনো প্রকারে নাট্যশালার গতি স্তব্ধ হোক। নাটকের ওপরে সরকারী সমনের মূলে এদের অবদান ছিল অনেকখানি। ইন্ডিয়ান ডেলী নিউজ-এ এক পত্রলেখক লিখেছিল (১৭ মার্চ, ১৮৭৭) : 'That the theatre has by introduction of harlots on the stage become the hot-bed of immortality and corruption, none can deny.'

অথচ সাহিত্য শিল্প ইত্যাদি অন্যক্ষেত্রেও অশ্লীলতা ও নোংরামি বন্ধের জন্য নানাদিক থেকে দাবি উঠতে থাকে। ব্রিটিশ সরকার সেসব নিয়ে মাথা ঘামায় নি। তারা নাটক ও নাট্যাভিনয়কে ভয় পেয়েছে এবং তারই কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছে। ইংরেজ বিরোধিতার অবসান ঘটাতে চেয়েছে নাট্যশালা থেকে। তাই এতো উদ্যোগ। নীতিবাগীশের সমাজনীতিকে তারা কাজে লাগিয়েছে মাত্র।

নীতিবাগীশের ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তৎকালীন অভিজাত বাঙালি সম্প্রদায়ের নাটকশাসনের প্রয়াস। কারণ, অনেক ধনী বাঙালির এবং বড় ঘরের কেচ্ছা প্রায়ই প্রহসন বা রঙ্গনাট্যের বা নক্সার মাধ্যমে প্রকট করা হতো। তার উতর-চাপানও চলত পরস্পর পক্ষের পয়সার মদতে। ড. জয়ন্ত গোস্বামীর প্রহসনের ইতিহাস গ্রন্থে এই ধরনের পাঁচ-

শতাধিক প্রহসনের পরিচয় রয়েছে। প্রহসনগুলি অভিনয়ের দ্বারা ব্যক্তিগত বা পারিবারিক আক্রমণে যাতে পর্যুদস্ত হতে না হয়, সেই উদ্দেশ্যে অনেক বাঙালি সন্তানই নাট্যজগৎ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে শাসকের হাত শক্ত করেছিলেন।

তাছাড়া ঔপনিবেশিক শাসনের প্রক্রিয়াজাত এই নব্য ধনী বাঙালি শ্রেণী ব্রিটিশের শাসনের অনেক কিছুর মতো এই আইনকেও সমর্থন করেছিল। 'নীলদর্পণ' ধনী বাঙালির প্রাসাদ-মঞ্চে কোনো দিন অভিনীত হয়নি কেন তার কারণ এখানে পরিষ্কার।

শাসকশ্রেণী নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগের উদ্দেশ্যে সামান্যতম জনরোষের উৎসও স্তব্ধ করে দিতে চাইছিলেন। তাই শাসক ব্রিটিশের নিজস্ব তাগিদও কম ছিল না। বাংলা মঞ্চে এই সময়ের অভিনয়ের মধ্যে ইংরেজ বিদ্বেষ, পরাধীনতার বেদনা, ইংরেজের অত্যাচার, সর্বোপরি দেশ স্বাধীন করার বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা মূর্ত হয়ে উঠেছে। নীলদর্পণ থেকে শুরু করে সুরেন্দ্রবিনোদিনী পর্যন্ত অধিকাংশ নাটকেই ইংরেজ রাজপুরুষদের নানা ধরনের অত্যাচার বিশেষ করে তাদের লাম্পট্যের দৃশ্য দেখানো হতো। উপরন্তু কয়েকটি নাটকে দুষ্কৃতকারী ইংরেজ রাজপুরুষকে হত্যা করার দৃশ্যও দেখানো হয়েছিল। এর ফলে জনমত উত্তেজিত হওয়া স্বাভাবিক। ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠা স্বাভাবিক। প্রকৃত গণজাগরণ তো এখান থেকেই শুরু হতে পারে। তাই ইংরেজ সরকার আইন করে রঙ্গালয়ে এই ধরনের নাট্যাভিনয়ের প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দিতে চেয়েছে। ইংরেজ শাসন-কৌশলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নীতিবাগীশ দলের সহায়তা এবং অভিজাত শ্রেণীর সমর্থন।

এই তিন প্রচেষ্টার যোগফল অভিনয়নিয়ন্ত্রণ আইন। তবে উপলক্ষ হিসাবে দেখা দিল 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' প্রহসনের অভিনয়। যার পশ্চাৎপটে ছিল মহারাণীর ছেলের কীর্তি। এই ঘটনা আইন প্রচলন ত্বরান্বিত করে তোলে।

১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ ডিসেম্বর কলকাতায় এলেন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পুত্র প্রিন্স অফ ওয়েলস। ইনিই পরে সপ্তম এডওয়ার্ড হন। রাণীর ছেলের নানান খেয়ালের মধ্যে একটি হল, বাঙালি অভিজাত ঘরের অন্দরমহলের জেনানাদের তিনি দেখবেন। তৎকালীন বাঙালি ভদ্রঘরের পক্ষে এটি মারাত্মক প্রস্তাব। ব্রাহ্মরা যদিও মহিলাদের পর্দার বাইরে আনার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু হিন্দুদের সবাই তা মেনে নিতে পারেন নি। কিন্তু মহারাণীর পুত্রের ইচ্ছা পূরণে এগিয়ে এলেন ভবানীপুর নিবাসী হাইকোর্টের উকিল এবং ব্যবস্থাপক সভার সদস্য জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়। তাঁর পুরনারীরা যুবরাজকে উলু দিয়ে বরণ করলেন (৩ জানুয়ারী ১৮৭৬)। এই ঘটনা কলকাতায় তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করল। এই নিয়ে সংবাদপত্রে প্রচুর লেখালেখি শুরু হয়। হাইকোর্টের অন্যতম উকিল প্রখ্যাত কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের সহকর্মীর এই কাজের জন্য ব্যঙ্গ করে কবিতা লিখলেন 'বাজীমাৎ' :

'আমি স্বদেশবাসী আমায় দেখে লজ্জা হোতে পারে।
বিদেশবাসী রাজার ছেলে লজ্জা কিলো তারে।।'

এই ঘটনাকে নিয়েই নাটক লিখলেন উপেন্দ্রনাথ দাস। তিনি তখন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের সঙ্গে ডিরেক্টর ও নাট্যকার হিসেবে যুক্ত। উপেন্দ্রনাথ হলেন তখনকার হাইকোর্টের আরেক নামী উকিল শ্রীনাথ দাসের পুত্র। নাটকের নাম দিলেন 'গজদানন্দ ও যুবরাজ'। ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সরোজিনী' নাটকের সঙ্গে এই নাটিকাটিরও অভিনয় হলো। প্রচুর দর্শক এই অভিনয় উপভোগ করলেন। পরের ২৩ তারিখে আবার নাটকটি অভিনীত হলো 'সতী কি কলঙ্কিনী' নাটকের সঙ্গে। এবারে ব্রিটিশ সরকার এগিয়ে এলেন নাটকটির অভিনয় বন্ধ করে দেওয়ার জন্য।[১] কারণ, 'গজদানন্দ—' নাটকে রাজভক্ত সম্ভ্রান্ত প্রজাকে বিদ্রূপ করা হয়েছে। কিন্তু গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার কর্তৃপক্ষ এতে দমে গেলেন না। তারা মূল নাটকটি ঠিক রেখে নামটি পালটে দিলেন—'হনুমান চরিত' (দ্রঃ ভারতসংস্কারক ৩ মার্চ, ১৮৭৬) এবং অভিনয় করলেন 'কর্ণাটকুমার' নাটকের সঙ্গে ফেব্রুয়ারি মাসের ২৬ তারিখে। 'হনুমান চরিত্র'-ও নিষিদ্ধ করল পুলিশ। এবারে অভিনীত হল 'দি পুলিশ অফ পীগ অ্যান্ড শীপ'। তখনকার পুলিশসুপার মিঃ ল্যাম্ব এবং পুলিশ কমিশনার মিঃ স্টুয়ার্ট হগ—এই দুজনের প্রতি ব্যঙ্গের জন্যই ঐরকম নামকরণ হলো নাটকটির। 'সুরেন্দ্রবিনোদিনী' (উপেন্দ্রনাথ দাস) নাটকটির সঙ্গে এবার এই ব্যঙ্গ নাটিকাটি অভিনীত হলো, ১লা মার্চ তারিখে। দু রাত্রেই অভিনয়ের শেষে উপেন্দ্রনাথ ইংরেজিতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলেন। [মহাদেবপ্রসাদ সাহা : নাটকদুটির ভূমিকা।]

এর আগে ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ আগস্ট, উপেন্দ্রনাথের 'শরৎ-সরোজিনী' নাটকে সাহেব ডাকাতকে নায়ক শরৎ হত্যা করেছে সুকুমারীকে গোরাদের হাত থেকে বাঁচাতে এবং খুনের দায়ে ধরা পড়ে দোষ স্বীকার না করে বলেছিল : 'উৎপীড়িত স্বদেশীয়দিগকে ধবলমূর্তিদের অত্যাচার হতে রক্ষা করবার জন্য যদি আমার জীবন বিসর্জন দিতে হয়, তাও দেব।' এবং সরোজিনী 'ইংরাজ রাক্ষসের হাত থেকে' শরৎকে বাঁচাতে আরেকজন গোরাকে গুলি করে মেরেছে। এবং সুরেন্দ্র-বিনোদিনী নাটকে হুগলির ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাক্রেন্ডেল সাহেব চরিত্রকে লম্পট করে আঁকা হয়েছে এবং সুরেন্দ্র সাহেবকে পদাঘাত করে উত্তম-মধ্যম দিয়েছে। তাছাড়া জেলের কয়েদিদের ওপর সাহেবের অত্যাচার দেখানো হয়েছে। সাহেবের নারী নির্যাতনের দৃশ্যও রয়েছে নাটকটিতে। এইসব কারণে জেলের ভেতর বন্দী বিদ্রোহও (৫ গর্ভাঙ্ক) দেখানো হয়েছে।

উপেন্দ্রনাথের এই দুটি নাটকের অভিনয়, তার ওপর রাজভক্ত প্রজার প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ এবং পুলিশ কর্মচারীদের তীক্ষ্ণ কটূক্তি, ইংরেজ সরকারের ক্রোধ উদ্দীপ্ত করে

১. Prannanth Pandit–'The Dramatic performances Bill'–Mukherjee's Magazine, New series, Vol, 36-40, January–June, 1876 : Reprinted in Nineteenth Century Studies, 6 April, 1974, ed ;–Alok Roy. pp–200-45.

তুলেছে এবং বে-আইনি [ইন্ডিয়ান কাউন্সিল এ্যাক্টের (১৮৬১) ২৩-তম ধারানুযায়ী] এইসব কার্যকলাপ বন্ধের জন্য তৎপর করে তুলেছে।[২]

১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ ফেব্রুয়ারি, লর্ড নর্থব্রুক এক অর্ডিনান্স জারি করলেন বাংলা নাটকের উদ্দেশ্যে : (Legislative Department Notification : Ordinance No : 8)

> '......to empower the Government of Bengal to prohibit certain dramatic performances, which are scandalous, defamatory, seditious, obscene or otherwise prejudicial to the public interest.'এবং অর্ডিনান্সের শেষের দিকে বলা হল : 'The ordinance shall remain in force till May next by which time a law will be passed by the Viceregal Council on the subject'

এরপর গ্রেট ন্যাশনালকে থেমে যেতে হল এবং 'সতী কি কলঙ্কিনী' এবং 'উভয়সঙ্কট' নাটকের অভিনয়ের আয়োজন শুরু হল। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার ততদিনে রঙ্গমঞ্চের টিনের তলোয়ারকে ভয় পেতে শুরু করেছে। ফলে, ঐ বছরের ৪ মার্চ, 'সতী কি কলঙ্কিনী' অভিনয়ের সময়ে পুলিশ রঙ্গমঞ্চ ঘিরে ফেলে এবং উপেন্দ্রনাথ দাস, অমৃতলাল বসু (ম্যানেজার), মতিলাল সুর, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, রামতারণ সান্যাল, মহেন্দ্রলাল বসু, শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গোপাল দাস এবং মঞ্চ মালিক ভুবনমোহন নিয়োগীকে গ্রেপ্তার করল। কারণ দেখানো হল, আগের নাটক সুরেন্দ্রবিনোদিনী অশ্লীল ও এরা সব তার সঙ্গে যুক্ত।

পুলিশ আদালতে ম্যাজিস্ট্রেট ডিকেন্সের কাছে বিচার হল। ৮ মার্চ, বিচারের রায়ে ডিরেক্টর উপেন্দ্রনাথ এবং ম্যানেজার অমৃতলাল--এই দুজনের একমাস করে বিনাশ্রম দণ্ড হলো এবং অন্যেরা ছাড়া পেলেন। পত্র-পত্রিকায় এই বিচার নিয়ে অনেক আলোচনা শুরু হয়। তাছাড়া হাইকোর্টের দোভাষী মিঃ ওয়েন, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি তখনকার বিদ্বজ্জনেরা সবাই পরিষ্কারভাবে জানান যে, সুরেন্দ্র-বিনোদিনী নাটকে অশ্লীলতা নেই। তা সত্ত্বেও আদালতে ঐরকম রায় দেওয়া হলো। ৯ মার্চ তারিখেই আদালতে আপীল করা হলো। প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন পরবর্তী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বনামখ্যাত গণেশচন্দ্র চন্দ্র হলেন এটর্নি। তার সাহায্যে মিঃ ব্রানসন, তারক পালিত এবং মনোমোহন ঘোষ আসামীদ্বয়ের সমর্থনে হাইকোর্টে বিচার চালালেন। বিচারপতি ছিলেন মিঃ মার্কবীব এবং মিঃ ফিয়ার। হাইকোর্টের বিচারে পুলিশের আনীত আপত্তি টিকলো না। দুজনে বেকসুর খালাস পেলেন। ২০ মার্চ এই মুক্তির রায় বের হলো।

২. অতুলকৃষ্ণ মিত্রের নির্বাপিত দীপ (১৮৭৬) নাটকে রয়েছে—১৮৫৭ সালের সিপাহিবিদ্রোহ হচ্ছে ভারতের হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম।

কিন্তু ইংরেজ সরকার দমলেন না। যে করেই হোক অভিনয়কে সংযত করতে হবে। ঐ মার্চ মাসেই 'Dramatic performances control Bill' নামে আইনের খসড়া কাউন্সিলে পেশ করা হল। এই বিলের খসড়া তৈরি করে কাউন্সিলে অভিনয়নিয়ন্ত্রণ বিল উত্থাপন করেন কাউন্সিলের ল' মেম্বার মিঃ হব হাউস। সেই বিলের বয়ান দেখলেই বোঝা যায়, বাইরে অশ্লীলতার দায় তুললেও ব্রিটিশ সরকার ভেতরে ভেতরে শঙ্কিত হচ্ছিলেন সরকার বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠতে দেখে।

এই বিলের বিরুদ্ধে অনেক গণমান্য লোক আপত্তি তুলেছিলেন। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ব্রিটিশ ইন্ডিয়া এসোসিয়েশনের তরফে প্রতিবাদ করেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার আইন প্রণয়ন করতে বদ্ধপরিকর ছিল। তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড লিটন ছিলেন ইংলন্ডের মঞ্চ ও নাটকের স্বাধীনতার লড়াইয়ের অন্যতম ব্যক্তিত্ব বুলওয়ার লিটনের পুত্র। তারই হাতে বর্তাল অভিনয়নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্তনের দায়িত্ব। ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর, এই বিলটি আইনরূপে স্বীকৃত হলো। সিলেক্ট কমিটিতে ভারতীয় সদস্য রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর এই বিলটি সমর্থন করেন। যদিও তিনি যাত্রাকে এই আইনের বাইরে রাখতে বলেছিলেন, কিন্তু তাও মানা হয় নি।

মনে রাখতে হবে, ব্রিটিশ সরকার এর ১৫ মাস বাদে, আরো দুটি আইন চালু করে--'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' (১৪ মার্চ, ১৮৭৮) এবং তারই সঙ্গে 'আর্মস অ্যাক্ট'। প্রথমটিতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ এবং দ্বিতীয়টিতে এদেশীয়দের নিরস্ত্রীকরণের মতলব কার্যকরী হয়। আর অভিনয়নিয়ন্ত্রণ আইন রঙ্গমঞ্চকে শায়েস্তা করতে সরকারের হাত শক্ত করে দিল। বলা হলো : যেসব নাটক বন্ধ করে দেওয়া হবে, তা যদি 'Likely to excite feelings of disaffection to the Government established by law in British India.'

জাতীয় নাট্যশালার মাধ্যমে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন গোড়াতেই স্তব্ধ করে দেওয়া হল। দেশে স্বাদেশিকতার উন্মেষ এবং পরাধীনতার বেদনা থেকে মুক্তির যে শুভসূচনা রঙ্গালয়ে শুরু হয়েছিল সন্ত্রস্ত ইংরেজ সরকার অঙ্কুরেই তাকে বিনাশ করবার জন্য এই আইনের প্রবর্তন করল।

প্রথমে এই বিল পাশ হয় কলকাতায়, পরে সমগ্র ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার সকল ক্ষেত্রেই এই আইন কার্যকরী হয়।

এই আইনের বলে শাস্তিযোগ্য হবে সব পাবলিক থিয়েটার বা সাধারণ রঙ্গালয়। তার সঙ্গে যে কোনো ভাবে যুক্ত অভিনেতা অভিনেত্রী, নির্দেশক, মঞ্চাধ্যক্ষ, থিয়েটারের মালিক এবং নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে কোনো ব্যক্তি। তাদের কৈফিয়ৎ তলব করা হবে ; বিধিলঙ্ঘন প্রমাণিত হলে তাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তার, জরিমানা, জেল প্রভৃতির ব্যবস্থা রইলো এই আইনে। শুধু তাই নয়, বিধিবহির্ভূত নাটকের অভিনয় হলে পুলিশ সেখানে ঢুকে গ্রেপ্তার এবং সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারবে বলপূর্বক। আইনের একটি মারাত্মক দিক হল, শাস্তিযোগ্য নাটকের অভিনয়ের

সময়কালীন উপস্থিত দর্শকেরাও শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হবে। ভয়ে এই রকম নাটক দর্শক দেখতে আসবে না এবং বাণিজ্যিক থিয়েটার তো দর্শকের পয়সাতেই চলে। এমন আইন আর কোনো দেশে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বাংলা নাটক, নাট্যাভিনয় ও রঙ্গমঞ্চের ওপর এতবড় একটা আঘাত নেমে এলো, অথচ তেমন তীব্রভাবে কোনো প্রতিবাদ বা আন্দোলন হল না। দু একটি পত্রিকায় উষ্ণ প্রতিবাদ হল। কিন্তু কোন দানা বাঁধল না।

বরং অর্ডিন্যান্স প্রকাশ পাওয়ার পরে ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকা (১।৩।১৮৭৬) লর্ড নর্থব্রুককে অভিনন্দন জানিয়ে যা লিখেছিল, তখনকার অনেক বাঙালির মনের কথাও ছিল তাই—

'All honour to Lord North Brook for prompt action taken by him to uphold the cause of public morality and decency.'

১৮৭৩-এ বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে পাকাপাকিভাবে অভিনেত্রীদের অভিনয় শুরু করলে হৈ চৈ পড়ে যায়। বিশেষ করে এইসব অভিনেত্রী নিষিদ্ধ পল্লী থেকে আসার জন্য ছুঁৎমার্গ বেশি করে দেখা গেল। নোংরা এবং অশ্লীলতায় ভরে গেল থিয়েটার—এমন মনোভাবে অনেক মানুষই এখান থেকে নিজেদের সরিয়ে নিলেন। অথচ এদের অনেকেই এর আগে নাটক ও থিয়েটারের মাধ্যমে জাতীয়মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিল। ১৮৭২-এ ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা এবং তার পৃষ্ঠপোষকতা তারই প্রকাশ। উচ্চবিত্ত, ধনী, অভিজাত, মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত, চিন্তাশীল, রুচিবান সব নানা মানুষের সহযোগিতায় এবং সহযোগ্যতায় বাংলা থিয়েটার সেদিন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু অভিনেত্রী গ্রহণ এবং তাদের ঘিরে সারারাত নাট্যাভিনয় সেদিনকার বেশিরভাগ মানুষই মেনে নিতে পারলেন না। থিয়েটারের ওপর অশ্লীলতার দায়ভাগ চাপিয়ে দেওয়া হলো। তাই দেখি, ১৯ শতকের শিক্ষিত বৃহত্তম অংশ নিশ্চুপ ; অভিজাত ধনীরা উদাসীন হয়ে পড়লেন থিয়েটারের ওপর আক্রমণে। বরং থিয়েটারে এবার অশ্লীলতা বন্ধ হবে এমন একটা ধারণায় তারা খুশিই হলেন। এরা তো অনেক আগে থেকেই অশ্লীলতার নানা দিক নিয়ে জেহাদ তুলছিলেন। কবিগান, তরজা, খেউড়, পক্ষীরদলের গান, সঙের গান—এইসবের মধ্যে নোংরামি, অশ্লীলতা--এদের অনেককেই ক্ষুব্ধ করেছিল। এগুলি তাদের কাছে কুৎসিত ও অশ্লীল ছিল।

আবার এইসব গানের মধ্য দিয়ে যে সামাজিক বিদ্রূপ এবং ব্যক্তি-পরিবারের বিদ্রূপ সোচ্চারিত হতো, তা থেকে সমাজের এই সব মানুষ রেহাই পেত না। রাজকর্মচারি, ইংরেজ শাসক, বাঙালিবাবু, ধনী জমিদার ও মুৎসুদ্দি, ভণ্ড তপস্বী, সমাজ আন্দোলনকারী—কেউই রেহাই পেত না। এরাই তো সব থিয়েটারে অশ্লীলতা নিয়ে হৈচৈ ফেলেছিল। এইসব গানও তাদের পছন্দের ছিল না স্বাভাবিক কারণেই।

এইসব মানুষেরাই উদ্যোগ নিয়ে কলকাতার টাউন হলে ১৮৭৩-এর ২০ সেপ্টেম্বর সভা ডেকে প্রতিষ্ঠা করে অশ্লীলতার বিরুদ্ধে এক সংগঠন। নাম—Society for the

Suppression of Public Obscenity. এখানে সর্বধর্ম এবং সর্বস্তরের মানুষ জড়ো হয়েছিল। বক্তা ছিলেন, উল্লেখযোগ্য, ব্রাহ্মসমাজের কেশবচন্দ্র সেন, খ্রিস্টানযাজক কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হিন্দু সমাজপতি রাজা কালীকৃষ্ণ দেব প্রমুখ। এদের উদ্দেশ্য ছিল 'জনসাধারণের শুদ্ধতা রক্ষাকল্পে বিধিবদ্ধ পিনালকোড এবং প্রিন্টিং অ্যাক্ট-এর ধারাগুলি প্রয়োগে সরকারকে সাহায্য করা।'—এবং এদেরই উদ্যোগে ১৮৭৪-এ চড়কের দিনে সঙের গান বন্ধ করার চেষ্টা হয়েছিল।

এর দুই বছরের মধ্যেই ব্রিটিশ তার শাসনক্ষমতা কায়েম রাখার স্বার্থে যে অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন চালু করল, তাতে ঐ অশ্লীলতা প্রসঙ্গটিকে সামনে রাখল। এর বীজ রোপিত হয়েছিল টাউন হলের ঐ সভায়। আইন চালু হলে সবাই যে চুপ করে রইলেন, তার প্রেক্ষিত বুঝতে অসুবিধে হয় না।

ইংরেজ সুকৌশলে তাদের রাজ্যশাসন মসৃণ করার তাগিদে রঙ্গমঞ্চের কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছিল। সঙ্গী হিসেবে পেয়ে গেল এদেশের প্রভাবশালী অভিজাত ও বুর্জোয়াদের এবং শিক্ষিত নীতি ও রুচিবাগীশের দলকে। এদের সমর্থনে ইংরেজ নাটকে অশ্লীলতার দোহাই তুলে কূটকৌশলে সমাজনীতিরক্ষার দায় যেন নিজের হাতে তুলে নিয়ে দেশের স্বাস্থ্য রক্ষা করতে চেয়েছিল। দু'পক্ষই থিয়েটারে দুর্নীতি মুক্ত ও কেচ্ছাকেলেঙ্কারির দায় মুক্তি হলো ভেবে ইংরেজ সরকারকে সাধুবাদ জানালেন। অথচ ইংরেজ বাইরে অশ্লীলতার অজুহাত তুললেও, ভেতরে ভেতরে তাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার স্বার্থকেই বড় করে তুলেছিল।

প্রতিবাদ কোনো দিক দিয়েই জোরদার না হওয়াতে, কোন মঞ্চাধ্যক্ষ আর সাহস করলেন না এই ধরনের নাটক অভিনয় করতে। কোন দর্শক আর চাইবে না এই ধরনের নাটক দেখতে। তাছাড়া মঞ্চাভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত যে কোনো ব্যক্তি আতঙ্কিত হয়ে এই ধরনের নাট্যাভিনয় থেকে বিরত রইলেন। বাংলা রঙ্গালয়েও এই নিয়ে আর কোনো আন্দোলন হলো না। প্রথম দিকে, যে সাহসের সঙ্গে এই কর্মপ্রেরণা শুরু হয়েছিল, আইন প্রবর্তনের পর তা স্তিমিত হয়ে গেল। অথচ হিন্দুমেলার অধিবেশন অব্যাহত রয়েছে, জাতীয় আন্দোলন বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হচ্ছে, জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা (১৮৮৫) হতে চলেছে। তার প্রথম সভাপতি যিনি হবেন সেই উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন কিন্তু একজন নাট্যামোদী। কিন্তু রঙ্গালয়ের কণ্ঠরোধের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন হলো না।

উপেন্দ্রনাথ দাস চলে গেলেন বিলেতে। 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' মামলায় জড়িত এবং সর্বস্বান্ত থিয়েটারের মালিক ভুবনমোহন নিয়োগী রঙ্গালয়ের সঙ্গে সব সংস্রব ত্যাগ করলেন। ম্যানেজার অমৃতলাল বিলেত যেতে গিয়ে পারিবারিক বাধায় শেষ পর্যন্ত চলে গেলেন আন্দামানে, অবন্দী বাঙালি হিসেবে। বিহারীলাল চলে গেলেন পোর্টব্লেয়ার, পুলিশের কাজ নিয়ে। অভিনেত্রী সুকুমারী দত্ত থিয়েটার ছেড়ে দিলেন, বিনোদিনী গ্রেট ন্যাশনাল ছেড়ে চলে গেলেন বেঙ্গলে, আর অর্ধেন্দুশেখর বেরিয়ে পড়লেন দেশ ভ্রমণে।

অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আদেশে কোন্ নাট্যাভিনয়কে নিষিদ্ধ করা হবে--

> Whenever the provincial Government is of opinion that any play, pantomime, or other drama performed or about to perform in a public place is–
> (a) of a scandalous or defamatory in nature, or,
> (b) likely to excite feeling of disaffection to the Government established by law in British India (or British Burma) or,
> (c) likely to deprave and corrupt person present at the performances.
>
> [Section–3. Dramatic performances Act., 1876]

রঙ্গালয়ের বিরুদ্ধে এই আঘাত বাংলা নাটকের ওপর প্রচণ্ডভাবে প্রভাব ফেলেছে। এবারে নাট্যশালায় আর স্বদেশপ্রেমমূলক কিংবা জাতীয় ভাবোদ্দীপনাপূর্ণ কিংবা ব্রিটিশবিরোধী কোনো নাটক অভিনীত হল না। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার আইন প্রবর্তনের পর অভিনয় করল অতুল মিত্রের 'আদর্শ সতী' নাটক। সঙ্গে রাধামাধব হালদারের একটি গীতিনাট্য। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র এই আইন সম্পর্কে দুঃখ করে বলেছিলেন : 'এই দেখ না দেশের কি দুর্ভাগ্য যে নাটকের বিচার কর্তা ও সমালোচক পুলিশ, সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের কোনও প্রতিবাদ নেই। পুলিশের নির্দেশমত চরিত্র, dialogue ও scenes বদলাতে হয়।'

এই আইনের বলে পুলিশ প্রয়োজনেই বাংলা নাটকের বিচারকর্তা হয়ে উঠল। নাটকটি অভিনয়যোগ্য কিনা, কোন্ দৃশ্যের কতখানি অভিনয় করা যাবে, কোন সংলাপ বা গান বাদ দিতে বা বদলাতে হবে--সবই নির্ধারণ-কর্তা পুলিশ। এই ভাবেই 'নীলদর্পণ' নাটকের বিখ্যাত আদালতের দৃশ্য বাদ দিতে হয়েছে, সাহেবের অত্যাচার ও নারী নির্যাতন বাদ দিতে হয়েছে। 'প্রতাপাদিত্য' নাটকে 'ফিরিঙ্গি' শব্দটা উচ্চারণ করা চলবে না। চন্দ্রশেখর উপন্যাসের নাট্যরূপে লরেন্স ফষ্টারের ইংরেজি নামটা পালটে পর্তুগিজ গঞ্জালেস করে দিতে হল। রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের অনেক শব্দ পরিবর্তন করতে হলো। 'সংসার', নাটকের আসামের চা-কর সাহেবকে বাংলার গ্রামের ডাক্তারবাবুতে রূপান্তরিত করতে হলো।

ফলত পূর্বের সেই জাতীয় উদ্দীপনা আর রঙ্গমঞ্চে রইলো না। বরং প্রতাপচাঁদ জহুরী নামে এক অবাঙালি ব্যবসায়ী ন্যাশনাল থিয়েটারের মালিক হয়ে (১৮৮১) নাট্যশালাকে পুরোপুরি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে তুললেন। পরে পরেই আর এক অবাঙালি ব্যবসায়ী গুর্মুখ রায় স্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করে (১৮৮৩) সেই বাণিজ্যিক থিয়েটারের ভিত্তিকে মজবুত করে তুললেন। তখন থেকেই ব্যবসায়িক প্রয়োজনে নাট্যশালা রাজনীতি থেকে দূরে সরে থেকেছে। নিরাপদ দূরত্বে থেকে সামাজিক, পৌরাণিক, গীতিনাট্য কিংবা প্রহসনের অভিনয় চালিয়ে গেছে। ভক্তি-ধর্মের

কথা, নৃত্য-গীত স্ফূর্তির আমেজ—এসব নিয়েই রাতের পর রাত বাংলা মঞ্চ মেতে উঠেছে--১৯ শতকে আর দেশপ্রেমের বা জাতীয় ভাবোদ্দীপনার কিংবা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সহযোগী সাংস্কৃতিক কর্মে বাংলা রঙ্গমঞ্চ থাকেনি।

সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার (১৮৭২) প্রথম যুগেই একটা জাতীয় ভাবাবেগ কাজ করেছিল। থিয়েটারের নামের মধ্যেই তার প্রমাণ রয়েছে। ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল, বেঙ্গল, ওরিয়েন্টাল ইত্যাদি। ১৮৭৬-এর পর নতুন থিয়েটারগুলির নাম হলো অন্যরকম, নামকরণেও আর জাতীয় ভাবাবেগ কাজ করল না--নাম হলো স্টার, মিনার্ভা, এমারেল্ড, ক্লাসিক, ইউনিক, অরোরা প্রভৃতি।

নিষিদ্ধ নাটকের তালিকা :

১. বড়লাট নর্থব্রুকের জারি করা অর্ডিনান্স (২৯-২-১৮৭৬) বলে নিষিদ্ধ নাটক--
উপেন্দ্রনাথ দাস--গজদানন্দ ও যুবরাজ, হনুমান চরিত, পুলিশ অফ পীগ অ্যান্ড শীপ, সুরেন্দ্র-বিনোদিনী।

২. অভিনয়নিয়ন্ত্রণ আইন বলে (১৬-১২-১৮৭৬) নিষিদ্ধ নাটক--
গিরিশচন্দ্র : সিরাজদৌল্লা (২য় ও ৩য় সংস্করণ), মীরকাশিম (১ম সং), ছত্রপতি শিবাজী (১ম ও ২য় সং)
ক্ষীরোদপ্রসাদ : পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত, বাঙ্গলার মসনদ, নন্দকুমার, পদ্মিনী, প্রতাপাদিত্য, দাদা ও দিদি।
হারাধন রায় : সুরথ উদ্ধার গীতাভিনয় (২য় সং), মীরা উদ্ধার।
মনোমোহন গোস্বামী : কর্মফল, সমাজ, সংসার, শিবাজী।
হরিপদ চট্টরাজ : রণজিতের জীবনযজ্ঞ, দুর্গাসুর।
কুঞ্জবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় : মাতৃপূজা।
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত : আশা কুহকিনী, আহামরি।
সুরেশচন্দ্র বসু : হোল কি?
মনোমোহন বসু : হরিশ্চন্দ্র নাটক।
হরিসাধন মুখোপাধ্যায় : বঙ্গবিক্রম।
অমৃতলাল বসু : চন্দ্রশেখর (নাট্যরূপ) [এছাড়া অন্যান্যদের নাট্যরূপ দেওয়া মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর, আনন্দমঠ, পথের দাবী (নাট্যরূপ : শচীন সেনগুপ্ত, ১-৫-১৯৪০)]
ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : প্যালারামের স্বাদেশিকতা।
মন্মথ রায় : কারাগার (১-২-১৯৩১)।
শচীন সেনগুপ্ত : নরদেবতা (১৪-১২-১৯৩৫)।

যাত্রাপালা :

মথুর সাহা : পদ্মিনী, ভরতপুরের দুর্গজয়।
ভূষণ দাস : মাতৃপূজা।

মুকুন্দ দাস : মাতৃপূজা, পথ, সাথী, সমাজ, পল্লীসেবা, দাদা, জয়পরাজয়, কর্মক্ষেত্র।

বাজেয়াপ্ত বা নিষিদ্ধ নয়—কিন্তু মঞ্চায়নের পক্ষে আপত্তিজনক--

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : দুর্গাদাস, মেবারপতন, রাণাপ্রতাপ।

মনোমোহন গোস্বামী : পৃথ্বিরাজ, রোশেনারা, শিবাজী।

ক্ষীরোদপ্রসাদ : প্রতাপাদিত্য, দাদা ও দিদি।

দীনবন্ধু মিত্র : নীলদর্পণ।

হরিপদ চট্টোপাধ্যায় : পদ্মিনী।

হরনাথ বসু : রাজারাম, বীরপূজা।

মন্মথ রায় : মীরকাশিম।

মহেন্দ্র গুপ্ত : শতবর্ষ আগে।

স্বাধীন ভারতে নিষিদ্ধ নাটক :

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : অন্তরাল, তরঙ্গ, মোকাবিলা।

সুনীল দত্ত : হরিপদ মাষ্টার।

সলিল চৌধুরী : সংকেত।

তুলসী লাহিড়ী : বাংলার মাটি।

জোছন দস্তিদার : অমর ভিয়েতনাম।

১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে স্বাধীন ভারতের পুলিশ দপ্তরে প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়—মোট ১১৩৬টি নাটক পুলিশ দপ্তরে জমা পড়ে। তার মধ্যে তুলসীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'রত্নাবলী' নাটক সবচেয়ে পুরনো। রবীন্দ্রনাথের মোট ১৪টি (বিসর্জন সমেত) নাটকও জমা পড়ে। পুলিশ এইসব নাটক বিচার করে আইনানুগ ছাড়পত্র দিত।

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও ব্রিটিশের এই আইন বলবৎ রইলো। ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে এই আইনটিকে বলা হয় 'সংবিধান বহির্ভূত ও লজ্জাকর'।

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ-এর লক্ষ্ণৌ শাখা প্রেমচন্দের 'ঈদ্‌গা' গল্পের নাট্যরূপ পুলিশের বিনা অনুমতিতে মঞ্চস্থ করায় নাটকটির অভিনয় বন্ধ করা হয় এবং সঙ্ঘের চারজন কর্মী-অভিনেতাকে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের কুখ্যাত অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী গ্রেপ্তার করে। তাদের বিরুদ্ধে চারদফা অভিযোগ দায়ের করা হয়। লক্ষ্ণৌ কোর্ট এই আইনটি চালু থাকা ভারতীয় সংবিধান সম্মত কিনা এই সন্দেহ প্রকাশ করে এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য এলাহাবাদ হাইকোর্টে প্রেরণ করে। বিচারপতি কিদোয়াই এবং ডব্লিউ, এন. মুল্লাকে নিয়ে গঠিত এলাহাবাদ হাইকোর্টের ডিভিসন বেঞ্চ ভারতীয় সংবিধান অনুসারে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের অভিনয়-নিয়ন্ত্রণ আইন বিধিবহির্ভূত বলে ঘোষণা করে। এই আইনে যে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয় তাদেরও বিরুদ্ধে আনা সমস্ত

অভিযোগ মকুব করে তাদের মুক্তি দেওয়া হয় (১৫ মে, ১৯৫৭)।

সংবিধানের ১৯ নং ধারায় বর্ণিত নাগরিক অধিকারের উপর এই আইন অযৌক্তিক বাধা নিষেধ আরোপ করে, এই অভিমত প্রকাশ করে বিচারপতিদ্বয় এই আইনটিকে সংবিধান বহির্ভূত ঘোষণা করে। তাঁদের মন্তব্য স্মরণযোগ্য : সর্বপ্রকার রাজনৈতিক বিরোধিতাকে দমন করবার জন্য শাসন বিভাগের ভয়াবহ প্রবণতা দেখা যাচ্ছে এবং এর ফলে জনসাধারণকে দুর্নীতি ও অধঃপতনের পথে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। [স্বাধীনতা—বৃহস্পতিবার, ৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩]

তবে, 'বিধিবহির্ভূত' ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই এই আইনটি প্রত্যাহৃত হয়নি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসনকে নিরঙ্কুশ ও নিষ্কন্টক করবার জন্য রচিত প্রেস আইন, অস্ত্র আইনের মতো এই আইনটিও ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কলঙ্কস্বরূপ বিরাজমান।

তাই আবার নানাদিক দিয়ে প্রতিবাদ দেখা দেয়। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ এবং অন্যান্য নাট্যদলের তরফে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান ও প্রতিবাদ সভা সংগঠিত হতে থাকে।

তাসত্ত্বেও ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঐ আইনটিকে খানিকটা পালটে এবং নতুন কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করে পুনরায় চালু করার চেষ্টা করে। নাম দেওয়া হল 'ওয়েষ্ট বেঙ্গল ড্রামাটিক পারফরম্যান্সেস বিল' (১৯৬২)। পরিবর্তিত নিয়মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

> ১৮৭৬-এর আইনে কোনো নাট্যানুষ্ঠানের প্রাক্ অনুমোদনের বাধ্যবাধকতা ছিল না। বাধ্যতামূলক লাইসেন্স নিতে হত না। সব নিয়মই এক মাত্র প্রকাশ্য স্থানে এবং ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে নাট্যানুষ্ঠানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল। ১৯৬২-এর নতুন নিয়মে করা হলো—সব নাট্যানুষ্ঠানই বাধ্যতামূলক। অনুমোদন ছাড়া কোনো অনুষ্ঠানই করা চলবে না। আইনভঙ্গের শাস্তি বাড়িয়ে তিন মাসের জায়গায় ছয় মাস কারাদণ্ড এবং পঁচিশ টাকা জরিমানার জায়গায় এক হাজার টাকা জরিমানা নির্দিষ্ট হলো।
>
> পূর্বের আইনে শুধু নাটক (এবং কিছু ক্ষেত্রে যাত্রা) নিয়মের মধ্যে পড়ত। নতুন নিয়মে মঞ্চনাটক ছাড়াও যাত্রা, নৃত্য, ছায়ানৃত্য, মূকাভিনয়, জলসা, কবিগান, তরজা, কীর্তন, আবৃত্তি এবং সমস্ত রকমের প্রমোদ অনুষ্ঠানই এই আইনের আওতায় এসে গেল। আগের নিয়মে ধর্মানুষ্ঠান পুরো বাদ ছিল, এবারে তারও রেহাই মিলল না।

নতুন আইনের এই খসড়া প্রস্তাব নিয়ে স্বাধীন বাংলায় প্রচণ্ড জনমত গড়ে ওঠে। বিরোধিতায় সামিল হয় সর্বস্তরের সাংস্কৃতিক কর্মী, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, ছাত্র সকলেই। ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ মে, ইউনিভারসিটি ইন্সটিটিউটে 'সারা বাংলা নাট্যানুষ্ঠান বিল' নিয়ে আলোচনা সভা বসে। সভাপতি ছিলেন নাট্যকার মন্মথ রায়। আহ্বায়ক ছিলেন সত্যজিৎ রায়, শম্ভু মিত্র, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, কমল মিত্র প্রমুখ।

প্রচণ্ড জনমতের চাপে কংগ্রেস সরকার বিলটিকে পুনর্বিবেচনার জন্য কংগ্রেস সংসদীয় দলেব একটি বিশেষ কমিটিতে পাঠায়। ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ জুন কমিটি কার্যভার নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় ৮ জুলাই, ১৯৬৩। প্রস্তাবে বলা হল—'It is not expedient to bring the Bill before the Legislature in its present form.'

এই প্রস্তাব অনুসারে তদানীন্তন কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন বিলটিকে প্রত্যাহার করে নেন। কিন্তু এই বিলটিকে আইনে পরিণত করতে না পারলেও কংগ্রেসি সরকার ১৮৭৬-এর নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনের বলেই স্বাধীন দেশে নাটকের কণ্ঠরোধ করতে থাকে। জোছন দস্তিদার পরিচালিত রূপান্তরী নাট্যদলের 'অমর ভিয়েতনাম' পুলিস বন্ধ করে দেন (২৯-১-৬৭)। রবীন্দ্র সদন মঞ্চে উৎপল দত্ত পরিচালিত পি. এল. টি.-র 'টিনের তলোয়ার' নাটকের অভিনয় করার অনুমতি বাতিল করে দেওয়া হয়।

পরিষ্কার বোঝা যায় যে, স্বাধীন ভারতে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ (প্রতিষ্ঠা : মে, ১৯৪৩) এবং তার সহযোগী সংগঠনগুলির নাট্যানুষ্ঠান এবং অন্যান্য বিবিধ অনুষ্ঠান স্বাধীন দেশের কংগ্রেসি সরকারকে চিন্তান্বিত করে তুলেছিল। বিশেষ করে কম্যুনিস্ট পার্টি তথা বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির নিয়ত রাজনৈতিক আন্দোলন এবং তার পাশাপাশি এদের সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলির জনমত গঠনের নানা অনুষ্ঠান সরকারকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। তাই নতুন করে এই ধরনের অনুষ্ঠান বন্ধ করার প্রচেষ্টা শুরু করে স্বাধীন সরকার। স্বাধীনতার পরের বছরেই তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এক গোপন সার্কুলার পাঠিয়ে সমস্ত জেলার ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্দেশ পাঠান যে, প্রচলিত আইনের সাহায্যে অথবা যে কোনো উপায়েই গণনাট্য সঙ্ঘের নাটক এবং অনুষ্ঠানগুলি যেন বন্ধ করে দেওয়া হয়। তার কয়েক বছরের মধ্যেই সরকার ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের প্রযোজিত ঊনষাটটি নাটকের কপি তলব করে পাঠায় এবং সেগুলির অভিনয় নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করতে থাকে। ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দের ১০ নভেম্বর বিধানসভায় কম্যুনিস্ট সদস্য জ্যোতি বসু, মণিকুন্তলা সেন এবং মনোরঞ্জন হাজরার প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় এই ঊনষাটটি নাটকের তালিকা পেশ করেন। সেখানে ডাঃ রায় বলেন : সব নাট্যদলের কাছেই তালিকা চাওয়া হয় নি। 'ক্যারেকটার অফ ড্রামা' প্রসঙ্গে উত্তরে বলেন : 'কম্যুনিস্ট পার্টি অভিনয়ের পূর্বে নাটকগুলি অদলবদল করত। তাই তাদের কাছেই তলব পাঠানো হয়।' সেখানে তিনি পরিষ্কারভাবে বলেন, 'আমাদের খবরই এই যে, ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ কম্যুনিস্ট পার্টি দ্বারা পরিচালিত।' ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২-এর মধ্যে পাণ্ডুলিপি জমা না দিলে তা 'আইনের লঙ্ঘন' বলেই গণ্য হবে।

নীলদর্পণ, অরুণোদয়ের পথে, Lest you forget, ভূয়া স্বাধীনতা, অহল্যা, দলিল, ভাঙ্গাবন্দর, পথিক, জবানবন্দী, নবান্ন, গোরা, Till the Day I die, বিসর্জন, চার অধ্যায়, উলুখাগড়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাটক এই তালিকার মধ্যে রয়েছে। তালিকার অনেকগুলি আদৌ নাটকই নয়।[৩]

---

৩. পঃ বঙ্গ সরকারের সার্কুলার এবং ৫৯টি নাটকের তালিকার জন্য দ্রঃ দর্শন চৌধুরী—গণনাট্য আন্দোলন, ১৯৯৪।

১৯৬৭-তে যুক্তফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে শাসনক্ষমতায় এসে ১৮৭৬-এর নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন নিয়ে ভাবনাচিন্তা করে। কিন্তু আইনটি বাতিল করা হয়নি। তবে এই বিলের ১০ নম্বর ধারায় যেখানে লাইসেন্স প্রথার কথা বলা হয়েছিল, শুধু সেইটুকু বাতিল করা হয়। এখন অবধি (জানুয়ারি, ২০০৩) এই আইনটি সারা ভারতেই অঘোষিত ভাবে বলবৎ রয়েছে। যে কোনো প্রাদেশিক সরকার কিংবা স্বয়ং কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়োজনে ব্রিটিশ প্রবর্তিত আইনটি ব্যবহার করতে পারে প্রকারান্তরে নানা রূপে ও নানা ছলে।

১৮৭৬-এর অভিনয়নিয়ন্ত্রণ আইন পাষাণভারের মতো বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের উপর চেপে বসেছিল। এর হাত থেকে নাটক কখনো আর রেহাই পায়নি। রাষ্ট্রীয় শাসন পরিবর্তনের অবস্থান্তরে কখনো আইন প্রয়োগ হয়েছে কিংবা কখনো হয়নি।

১৮৭২-এর ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার মূলে জাতীয়তার প্রেরণা কাজ করেছিল। নামকরণে 'ন্যাশনাল' ছাড়াও এদের কর্মোদ্যোগ ও প্রচেষ্টার মধ্যেও জাতীয়তার আবহাওয়া তৈরি হয়েছিল। প্রথম অভিনয়ের জন্য নীলদর্পণ নির্বাচন করার মধ্যেই তার প্রমাণ রয়েছে। তারপরে নানা উদ্যম ও অনুপ্রেরণার মধ্য দিয়ে বাংলা মঞ্চে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে চলেছিল। কিন্তু ১৮৭৬-এর আইন প্রবর্তনের পর নাট্যানুষ্ঠানের ওপর কুঠারাঘাত পড়ল, এই ধরনের কর্মোদ্যোগ স্তব্ধ হয়ে গেল। নিরাপত্তার কারণে ব্যবসায়িক রঙ্গমঞ্চ এই ধরনের নাটকাভিনয়ের ঝুঁকি নিল না। ফলে, এই সময় থেকেই বাংলা মঞ্চে পৌরাণিক নাটক, সামাজিক নাটক, গীতিনাট্য অপেরা এবং পঞ্চরং প্রহসনের ছড়াছাড়ি পড়ে গেল। গিরিশ থেকে শুরু করে এই সময়কার অন্যসব নাট্যকারই তাদের নাটক রচনার মধ্যে এইসব বিষয়েই ঘুরপাক খেতে লাগলেন—কিন্তু কখনোই কদাপি ব্রিটিশবিরোধী প্রসঙ্গ নাটকে আনলেন না।

তবে পৌরাণিক নাটকের ছড়াছড়ির এটিই একমাত্র কারণ নয়। ধর্মপ্রাণ বাঙালি পুরাণের কাহিনী এবং ধর্মভাব পছন্দ করত বেশি। বেশির ভাগ দর্শক জাতীয়তাবোধের চেয়ে ভক্তিভাবের পৌরাণিক নাটক পছন্দ করত বেশি। ব্যবসায়িক মঞ্চ পৌরাণিক নাটক অভিনয়ের মাধ্যমে নিরাপত্তা এবং ব্যবসা দুটোই চালাতে পেরেছিল। তারই দাবিতে এতো পৌরাণিক নাটক লেখা হতে লাগল।

উল্টোদিক দিয়ে দেখলে, এর একটা বড়ো প্রমাণ পাওয়া যাবে, ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধের আন্দোলনের সময়কার রঙ্গমঞ্চ ও নাটকের কথা ভাবলে। এই আন্দোলনের সময় বাঙালি জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। এই প্রথম ব্রিটিশের কাজের বিরুদ্ধে আপামর বাঙালি একজোট হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের পথে নেমেছিল! মঞ্চমালিক ও নাট্যকারেরা তার এই প্রাণের স্পন্দনকে রঙ্গমঞ্চে ধরতে চেয়েছিলেন। এই সময়ে নাট্যশালায় তাই আইনের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করেও ইতিহাসের কাহিনী অবলম্বনে স্বদেশপ্রেমমূলক ও জাতীয় ভাবোদ্দীপনামূলক নাটক লিখিত ও অভিনীত হয়েছে। যে

গিরিশ বিগত ২৫ বছর ধরে আর কোনো ঐতিহাসিক বা দেশপ্রেমমূলক নাটক লেখেননি, তিনিও ১৯০৫-এর উন্মাদনার সময়ে পরপর তিনখানি এই ধরনের নাটক লিখে ফেললেন। পুলিশের রক্তচক্ষু তখন তাঁকে ভীতসন্ত্রস্ত করতে পারেনি। সিরাজদৌল্লা, মীরকাশিম, ছত্রপতি শিবাজী নিষিদ্ধ হয়েছে, গিরিশকে হয়রানি ভোগ করতে হয়েছে, তবুও তিনি পিছপা হননি। আবার যেই ১৯০৫-এর ভাবাবেগ কেটে গেছে, গিরিশও আর এই ধরনের নাটক লেখেননি। গিরিশের কথা উদাহরণ হিসেবে এত করে বলার কারণ, তিনি ছিলেন তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, প্রধান অভিনেতা, নাট্যশিক্ষক এবং ম্যানেজার। তাঁকে রঙ্গমঞ্চের এবং নিজের স্বার্থের কথা ভেবে অনেক দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হতো।

নাট্যমঞ্চ থেকে জনগণকে উত্তেজিত করার বদলে, উত্তেজিত জনতার প্রাণস্পন্দন ধরতে পেরে থিয়েটারে সেই ভাবোদ্দীপনাকে সঞ্চার করে দেওয়ার সহজ সঙ্কল্প নিয়েছিল তখনকার নাট্যশালাগুলি। নাট্যকারেরাও সেই মতো নাটক রচনা করতে লেগে পড়েছিলেন।

বলা যায়, অভিনয়নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্তনের পেছনে অনেকাংশের জনসমর্থন ছিল। নাটক ও মঞ্চের পক্ষে সেই অর্থে ততোখানি জনসমর্থন মেলেনি। আবার বঙ্গভঙ্গের উত্তাল সময়ে যেই জনসমর্থন পাওয়া গেছে, অমনি মঞ্চ ও নাট্যাকারেরা এগিয়ে এসেছেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল—এঁদের এই জাতীয় সব রচনা এই সময়কার। তবে একথাও ঠিক, ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের কারণে আন্দোলন যে নবীন জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করেছিল, তখন আবার বাংলা নাটক স্বাদেশিকতায় জাগ্রত হয়েছিল। কিন্তু তাতে আর পরিষ্কারভাবে পরাধীনতার কথা, তার বেদনার কথা, স্বাধীনতার স্বপ্নের কথা কিংবা ইংরেজ বিদ্বেষের কথা প্রকাশিত হলো না। ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে জাতীয় বীর (National hero)-দের গ্রহণ করে তাদের চরিত্র ও ঘটনার মধ্য দিয়ে জাতীয়তা প্রকাশের চেষ্টা হল। কোথাও হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির কথা বলা হল, দেশ গঠনের ও মনুষ্যত্ব গঠনের কথা বলা হলো, কিংবা জাতীয়তাকে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের মহান আদর্শে সমুন্নত করা হল।

অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন চালু হবার পর, স্বদেশী উত্তেজনার নাটক তত আর অভিনীত হল না বটে, তবে সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে প্রহসন জাতীয় রচনা কিছু লিখিত ও অভিনীত হয়েছে। ন্যাশনাল থিয়েটারে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি প্রথম থেকে এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। পরে অমৃতলাল বসু এই ধারাতে কয়েকটি প্রহসন রচনা করেন। অর্ধেন্দুশেখরের প্রচেষ্টার মধ্যে গিরিশ স্বদেশানুরাগ লক্ষ্য করেছেন।—'রঙ্গমঞ্চের কার্য দেশের কার্য—তাঁহার জ্ঞান ছিল।' 'মুস্তাফি সাহেবকা পাক্কা তামাশা' গুলিতে তিনি এই কাজ অনেকাংশে করেছেন। অমৃতলালের সাবাশ আটাশ, নবজীবন, সাবাস বাঙালি—এই তিনটি প্রহসনে ও নক্সায় তৎকালীন রাজনৈতিক চেতনাকে ব্যঙ্গ করতে চেয়েছেন। এইগুলিতে কথায় ও গানে দেশপ্রেম সঞ্চারের চেষ্টা

রয়েছে। 'বাবু' প্রহসনেও (১৮৯৪) রাজনীতি ও ধর্মের পেছনে যে ভণ্ডামি ও স্বার্থপরতা-ভীরুতা রয়েছে তাকে বিদ্রূপ করেছেন। 'বাহবা বাতিকে' আবেদন নিবেদনের রাজনীতিকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। ১৮৭৫-এ গায়কোয়াড়ের ঘটনার অবলম্বনে যে 'হীরকচূর্ণ' নাটক লিখে অমৃতলাল পুরোপুরি ব্রিটিশবিরোধী কথা দৃপ্তভাবে বলেছিলেন, এবারে তা স্তিমিত হয়ে প্রহসনের ব্যঙ্গের মাধ্যমে ক্ষীণকণ্ঠ হয়ে পড়ল।

এইভাবে ক্রমে রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক যে ব্রিটিশবিরোধী প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরে সরে গেল তাই নয়, তার জায়গায় ইংরেজ-প্রশস্তিমূলক নাটক রচিত ও অভিনীত হতে লাগল। ইংরেজ তোষণের এইসব নাটক যদিও খুবই তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর। গিরিশের গীতিনাট্য অশ্রুধারা (১৯০১) রাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু উপলক্ষে লেখা। হীরকজুবিলী (১৮৯৭) লিখেছিলেন মহারাণীর ষাট বৎসর রাজত্বকাল স্মরণে। শান্তি রূপকনাট্যে সপ্তম এডওয়ার্ডের জয়গান করা হয়েছে। অমৃতলালের বৈজয়ন্তধাম (১৯০০) ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু উপলক্ষে লেখা। অমরেন্দ্রনাথ দত্তের এস যুবরাজ (১৯০৫) ব্রিটিশ যুবরাজের ভারত আগমন স্মরণে লেখা।

জাতীয় নাট্যশালার মাধ্যমে জাতীয়তাবোধের উদ্বোধন ও স্বদেশপ্রেমের উদ্দীপনার পরিণতি মহারাণী কিংবা যুবরাজের প্রশস্তিতে এসে থেমেছে। ব্রিটিশরাজভক্তির চরম পরাকাষ্ঠা এই সময়ে দেখিয়ে বেঙ্গল থিয়েটার 'রয়াল' উপাধি লাভ করে। প্রিন্স এলবার্ট ভিক্টরের অভ্যর্থনায় শকুন্তলা নাটকাভিনয় (৭ জানু, ১৮৯০) করে তারা এই উপাধি পায়। অনেকে এই উপাধিকে 'রয়াল' না বলে 'লয়াল' (অনুগত) বলতে চেয়েছেন। ১১ জানুয়ারি, ১৮৯০ থেকে বেঙ্গলের নাম হয় রয়াল বেঙ্গল থিয়েটার।

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই দেখা যায়, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে নাট্যশালার একটি বড় ভূমিকা থাকে। সব দেশেই নাট্যকর্মী ও রঙ্গমঞ্চ তাদের এই জাতীয় দায়িত্ব পালন করে। পরাধীন বাংলাতেও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসের গোড়ার দিকে সে দায়িত্ব পালনে অনেকেই এগিয়ে এসেছিল। ইংরেজরা তাদের দেশের এবং অন্যদেশের ইতিহাস থেকে ভালভাবেই জানত যে, জাতীয়তা ভাবের উন্মেষে এবং স্বাধীনতার দাবীতে নাট্যশালা কত বড় ভূমিকা নিতে পারে। শঙ্কিত ব্রিটিশ রাজশক্তি তাই অতি সত্বর রঙ্গমঞ্চের এই প্রয়াসকে বন্ধ করে দিতে তৎপর হয়েছিল। আইন করে নাট্যশালার সরকারবিরোধী কাজকর্মকে স্তব্ধ করে দিতে চায়। কৌশলে অশ্লীলতার দোহাই পেড়ে ভেতরে ভেতরে শক্ত হাতে আইন করে সব দিক দিয়ে নাট্যশালার সব প্রচেষ্টাকে বন্ধ করে দিয়েছিল। তবুও স্বাধীনতার কাল পর্যন্ত এবং পরবর্তী স্বাধীন দেশেও নানাভাবে চেষ্টা হয়েছিল সরকার বিরোধী কথা বলার। কিন্তু ব্রিটিশের মতো স্বাধীন দেশের সরকারও এই আইন ব্যবহার করে প্রয়োজনে নাটকের ও নাট্যশালার কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছে। ব্রিটিশের এই আইন বাংলা মঞ্চের ও নাটকের পেছনে অশুভ ছায়ামূর্তির মতো ঘুরে বেড়িয়েছে। শৃঙ্খলিত বাংলা নাটক শৃঙ্খলমুক্ত হতে পারেনি। বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এই শৃঙ্খলের দাগ মর্মান্তিকভাবে রয়ে গেছে।

কর্পোরেশন অ্যাক্ট (১৯০৮) ও নাট্যাভিনয়

ব্রিটিশশাসিত ভারতে কলকাতা কর্পোরেশন থিয়েটারের ওপর একটি নিষেধাজ্ঞামূলক আইন জারি করে। ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় এই নতুন আইন চালু হয়। 'ক্যালকাটা কর্পোরেশন এ্যাক্ট' নামে এটি প্রচলিত হয়।

এই আইনের নির্দেশ অনুযায়ী কলকাতায় কোনো থিয়েটার রাত্রি একটার পর নাট্যাভিনয় চালু রাখতে পারবে না। অর্থাৎ রাত্রি একটার মধ্যে যে কোনো নাট্যাভিনয় বন্ধ করে দিতে হবে। নাটক অভিনয়ের ওপর এই নতুন আইনের নিষেধাজ্ঞায় থিয়েটার কর্তৃপক্ষ বিপাকে পড়ে। তাই নিয়ে প্রতিবাদ ও লেখালেখি শুরু হয়। ফলে ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসেই আইনটি সংশোধিত হয়। তাতে বলা হয়, পঁচিশ টাকা জরিমানা দিলে রাত্রি একটার পরেও অভিনয় করা যেতে পারে। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের তখন মালিক। তিনি পঁচিশ টাকা জরিমানা দিয়েও তাঁর থিয়েটারে সারারাত্রি অভিনয় চালাতেন।—তাতে মফঃস্বলের দর্শকদের নাটক দেখে ভোরবেলা বাড়ি ফেরার সুবিধে হতো।[1] দর্শক আনুকূল্য লাভ করেছিলেন তাদের সুবিধের কথা ভেবেই।

এই সময়ে রাত্রি সাড়ে আটটায় নাটক আরম্ভ হয়ে অনেক রাত পর্যন্ত অভিনয় চলত। অনেক রাত পর্যন্ত রঙ্গমঞ্চে অভিনয় চলা নিয়ে অনেক কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনা সেই সময়ে হয়েছিল। অনেক প্রতিবাদও হয়েছিল। বিশেষ করে রুচিবাগীশের দল এবং ব্রাহ্ম মতাবলম্বীরা অভিযোগ তুলেছিল রঙ্গমঞ্চে বারাঙ্গনা অভিনেত্রীদের বিষয়ে। বারাঙ্গনা অভিনেত্রী নিয়ে বেলেল্লাপনার আসর হয়ে উঠেছে রঙ্গমঞ্চগুলি—এমন অভিযোগ করে চলেছিল এরা। দীর্ঘরাত্রিব্যাপী অভিনয়ের বিরোধিতা এই দিক দিয়েই এসেছিল। কাগজপত্রে লেখালেখি এবং অন্য নানাভাবে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিল এই নীতিবাগীশের দল। রাত্রিব্যাপী অভিনয়ের বিরুদ্ধে এই জনমতকে কাজে লাগিয়ে ব্রিটিশ সরকার এই আইনটি জারি করে। ১৮৭৬-এর কুখ্যাত অভিনয়নিয়ন্ত্রণ আইনের পাশাপাশি এই আইন প্রবর্তন করে, ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের সময়কার থিয়েটারের প্রতিবাদী ভূমিকাকে খর্ব করার চেষ্টা করেছিল। নীতিবাগীশের ভূমিকাকে কাজে লাগিয়ে ব্রিটিশ সরকার আবার বাংলা থিয়েটারের ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞা জারি করে দিল।

রাত্রি একটার মধ্যে নাটকাভিনয় বন্ধ করে দেওয়ার এই আইনটি কলকাতা কর্পোরেশন তার এলাকায় জারি করে। কলকাতার সব রঙ্গমঞ্চই এই আইনটি মানতে

১. রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ—রমাপতি দত্ত। পৃ-৪৬৬
'এই দীর্ঘ রাত্রিব্যাপী অভিনয়ের আয়োজনের প্রবর্তক অমরবাবু'—রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর : অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পৃঃ ৪৩।

বাধ্য হয় এবং রাত্রি একটার মধ্যে অভিনয় বন্ধ করে দিতে থাকে।

বেশি রাত অবধি অভিনয় চললে, দূরের দর্শকদের সুবিধে হতো। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর ভোর হলেই গাড়িঘোড়া চলতে শুরু করে। তখন বাড়ি ফেরার সুবিধে। বিশেষ করে মফঃস্বলের দর্শকদের। আর রাত্রি একটায় অভিনয় শেষ হলে বাড়ি ফেরার জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হতো।

তাই তখনকার নাটকগুলিকে বৃহদায়তন করে অভিনয় করতে হতো। এক নাটকে রাত কাবার না হলে দু তিনটি নাটক, প্রহসন-গীতিনাট্যের পসরা সাজিয়ে রাত শেষ করতে হতো। ক্রমে কলকাতাব আশেপাশের এবং বাইরের লোকেরাও কলকাতার থিয়েটারে দর্শক হিসেবে আসতে থাকলে, তাদের সুবিধের জন্যই সারারাত ধরে অভিনয় চালাতে হতো। তাই যে থিয়েটারে ভোররাতে নাটক শেষ হবে, সেখানেই মফঃস্বলের দর্শকদের এবং বেশ কিছু অংশে কলকাতার দর্শকদেরও ভিড় বাড়তে থাকে।

উনিশ শতকের নাটকের যে দীর্ঘ আয়তন তার মূলে এই দীর্ঘরাত্রিব্যাপী অভিনয়ের প্রভাব মানতেই হবে। পাঁচ অঙ্কের নাটক, তাতে প্রতিটি অঙ্কে অনেকগুলি দৃশ্য, প্রচুর গান, অনেক নৃত্য—এইসব নিয়ে নাটকগুলি দীর্ঘায়িত হয়ে ওঠার একটা বড়ো কারণ যে, এই রাত্রিব্যাপী অভিনয়ের তাগিদ তা অস্বীকার করা যাবে না।

অথচ যুগীয় প্রভাব, সমাজপরিবর্তন ও সভ্যতার বিবর্তনে আজকের সময়ে নাটক আর বৃহদায়তন হলে চলে না। আড়াই ঘণ্টার মধ্যেই নাটককে বেঁধে রাখতে হয়। সন্ধ্যে ছ'টা কিংবা সাড়ে ছয়টায় আরম্ভ করে রাত্রি সাড়ে আটটা কিংবা নয়টার মধ্যে এখন নাটকাভিনয়কে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়। নাটক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পাশাপাশি এই যুগীয় প্রভাব ও পরিবেশের চাপ বাংলা নাটককে দীর্ঘাকৃতি থেকে মধ্যাকৃতিতে রূপান্তরিত করেছে।

কলকাতা কর্পোরেশনের আইনে অবশ্য বিশেষ উৎসব-অনুষ্ঠানের দিনগুলিতে আইন শিথিল করার কথা ছিল। যেমন জন্মাষ্টমী, দুর্গাপূজা, দোল-উৎসব ইত্যাদিতে সারারাত্রি অভিনয়ের অনুমতি দেওয়া হতো। তখন আর রাত্রিব্যাপী অভিনয় করলে জরিমানা দিতে হতো না।

কলকাতায় আগে থেকেই এইসব উৎসব অনুষ্ঠানের দিনগুলিতে সারারাত্রি অভিনয় চলত। একটি নাটকে না হলে একাধিক নাটক অভিনয় করা হত। দোল, জন্মাষ্টমী, দুর্গাপূজা নিয়ে নাটক কিংবা গীতিনাট্য রচিত হয়ে এই সময়ে অভিনীত হত। তাই দেখি, উনিশ শতকের অনেক নাট্যকারেরই এই বিষয়ক নাটক বা গীতিনাট্য রয়েছে। ব্রিটিশ সরকার বাঙালির উৎসব-অনুষ্ঠানে হাত দিতে চায়নি। বাংলা থিয়েটারও তাই এই সময়ে চুটিয়ে সারারাত্রি অভিনয় চালিয়ে যেত।

স্বাধীন ভারতে কলকাতায় এখনো নাট্যদলগুলিকে অভিনয়ের সময়ে কলকাতায় কর্পোরেশনের অনুমতি নিতে হয় এবং 'পারফরমেন্স ট্যাক্স' জমা দিতে হয়। রাত একটার পর এখন আর কলকাতায় কোনো থিয়েটারেই অভিনয় হয় না। তাই জরিমানা

দিয়ে সারারাত্রি অভিনয়ের প্রসঙ্গ এখন বাতিল হয়ে গেছে।

১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা কর্পোরেশন নাটকের প্রতিঅভিনয়ের ওপর চল্লিশ টাকা করে কর বসায়। তার প্রতিবাদে নাট্যজগৎ মুখর হয়ে ওঠে। গঠিত হয় 'নাট্যসঙ্কট প্রতিরোধ কমিটি' ১৯৬৬-এর ১ এপ্রিল। ২৯ এপ্রিল, ১৯৬৬ পথে নামেন নাট্যকর্মীরা। আন্দোলনের চাপে কর্পোরেশন এই আদেশ প্রত্যাহার করে নেয়।

১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে আবার থিয়েটারের ওপর প্রমোদ কর চাপানো হয়। পঃ বঙ্গে গড়ে ওঠে 'নাটক বাঁচাও' আন্দোলন।

কর আদায়ের ব্যাপারে কর্পোরেশন নাটক অভিনয়ের অনুমতি দেওয়া বন্ধ করে দিল। এরই প্রতিবাদে শুরু হলো বিক্ষোভ। এবারও বাড়তি করের আদেশ প্রত্যাহার করা হলো।

'নাট্যসঙ্কট প্রতিরোধ কমিটি'র সভাপতি ছিলেন নাট্যকার মন্মথ রায়। আহ্বায়ক ছিলেন তাপস সেন ও সবিতাব্রত দত্ত।

এরই বিরুদ্ধে আরেকটি সংগঠন গড়ে ওঠে। আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর আহ্বানে সৃষ্ট এই সংগঠনের নাম হয় 'সারা বাংলা নাট্যসংগ্রাম সমিতি'। প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৬-এর ১৯ এপ্রিল। দুই ভিন্নমুখি সংগ্রামে ক্ষতিগ্রস্ত হয় আন্দোলন। কর আদায় বহাল রয়ে গেল।

প্রতাপচাঁদ জহুরির ন্যাশনাল থিয়েটার

৬ নম্বর বিডন স্ট্রিট, কলকাতা

উদ্বোধন : ১ জানুয়ারি, ১৮৮১ স্থায়িত্বকাল :

প্রতিষ্ঠাতা : প্রতাপচাঁদ জহুরী ১ জানুয়ারি, ১৮৮১--ডিসেম্বর, ১৮৮৫

প্রথম নাটক : হামীর (সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার)।

বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে যে ন্যাশনাল থিয়েটারের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য প্রতাপচাঁদ জহুরির ন্যাশনাল থিয়েটার সেটি নয়। বাগবাজারের যুবকেরা উদ্যোগী হয়ে ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করে এদেশে সাধারণ রঙ্গালয়-এর সূত্রপাত করেছিল। ধনীর শখ-শৌখিনতা থেকে বাংলা মঞ্চকে মুক্ত করে সর্বসাধারণের সামনে রঙ্গালয়ে অভিনয় শুরু করেছিল। টিকিট-বিক্রির ব্যবস্থা থাকলেও সেটি কিন্তু পুরোপুরি পেশাদার থিয়েটার ছিল না। বাণিজ্যিক থিয়েটার তো নয়ই। প্রতাপচাঁদের ন্যাশনাল থিয়েটার পুরোপুরি পেশাদারি থিয়েটার এবং বাণিজ্যিক থিয়েটার। বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে দুই ন্যাশনাল থিয়েটারের মৌল চরিত্রগত ফারাকটুকু মনে রেখেই আলোচনা করতে হবে।

অভিনয়নিয়ন্ত্রণ আইনের ফাঁসে আটকে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। মালিক ভুবনমোহন নিয়োগী তার গ্রেট ন্যাশনালকে লীজ দিলেন গিরিশচন্দ্রকে। গিরিশ পালটে নাম রাখলেন ন্যাশনাল থিয়েটার। তারপরে ক্রমে হাতবদল হতে হতে, বেশ কয়েকজন স্বত্বাধিকারীকে সর্বস্বান্ত করে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের বাড়ি শেষ পর্যন্ত নীলামে উঠল। দ্বারকানাথ দেব, কেদার চৌধুরী, গোপীচাঁদ শেঠি, কালিদাস মিত্র প্রমুখ অনেক চেষ্টা করেও গ্রেট ন্যাশনালকে চালু রাখতে পারলেন না।

গ্রেট ন্যাশনাল নীলামে উঠলে প্রতাপচাঁদ ২৫ হাজার টাকায় কিনে নিলেন। ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিকে। অবাঙালি ব্যবসাদার প্রতাপচাঁদ জহুরি গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের বাড়িতে চালু করলেন ন্যাশনাল থিয়েটার। এই প্রথম একজন পাকাপোক্ত ব্যবসায়ি বাংলা রঙ্গালয়ের মালিক হলেন। তার আগে বেঙ্গল থিয়েটারের শরৎচন্দ্র ঘোষ কিংবা গ্রেট ন্যাশনালের ভুবনমোহন নিয়োগী—পুরোপুরি ব্যবসাদার ছিলেন না। বা বলা যেতে পারে, একেবারে পাকাপোক্ত ব্যবসায়িক দৃষ্টিতে রঙ্গমঞ্চের মালিকানা ও পরিচালনার দায়িত্ব নেননি। প্রথমে ছিল নাটক অভিনয় করা এবং অভিনয়ের উন্মাদনা ভোগ করা। তারপরে শখ শৌখিনতা এবং সবশেষে আর্থিক লেনদেনের ব্যবসা। যদিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শেষেরটি গৌণ হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু প্রতাপচাঁদ ঝানু ব্যবসায়ি। তার অন্যত্র জহরতের দোকান এবং অন্য

নানাধরনের ব্যবসা ছিল। সে দেখেছিল, অন্যান্য ব্যবসায়ের মতো বাংলা থিয়েটারেও ভালো ব্যবসা করা যায়। টাকা লগ্নী করা এবং ঠিকমত পরিচালনার মাধ্যমে সেই লগ্নীকৃত টাকা ফেরৎ আনা--মূলধন বিনিয়োগের মাধ্যমে বেশি করে মুনাফা লোটা--ব্যবসায়ের এই সাধারণ সূত্র তিনি থিয়েটারে প্রয়োগ করলেন। তিনি দেখেছিলেন, লোকে থিয়েটার দেখে পয়সা দিয়ে। তাদের উৎসাহিত করে থিয়েটারে বেশি বেশি আনতে পারলে টিকিট বিক্রি বেশি হবে। ফলে লগ্নীকৃত মূলধন সহজেই বহুগুণ হয়ে ফিরে আসবে।

কিন্তু উৎপাদন ব্যবস্থাটিকে শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে, আগের অনেক মালিকের মতোই তাকেও লোকসান দিয়ে ব্যবসা চালাতে হবে। তাই একটি নিয়মবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের মতো তিনি থিয়েটারের প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে শৃঙ্খলায় বেঁধে রাখলেন। কর্মচারীদের নির্দিষ্ট বেতন, হাজিরা খাতা, আয়-ব্যয়ের হিসাব--সবই পেশাদারিভাবে চালু করলেন। এই নিয়মের আওতা থেকে কারো রেহাই ছিল না, সে অভিনেতা-অভিনেত্রী, ম্যানেজার, নাট্যকার কিংবা দারোয়ান, যেই হোক না কেন।

এই থেকেই বাংলা থিয়েটারে পাকাপাকিভাবে পেশাদারি থিয়েটার বা ব্যবসায়িক থিয়েটার তার প্রথাসিদ্ধ পথ খুঁজে পেলো। মালিকানাধীন এবং মুনাফাভিত্তিক--পরিচালনার মধ্য দিয়ে বাংলা রঙ্গালয়ের নতুন যুগ শুরু হয়ে গেল। পূর্ববর্তী সাধারণ রঙ্গ ালয়গুলির মধ্যে এই পেশাদারিত্ব কিংবা বাণিজ্যিক মনোবৃত্তি এত প্রখরভাবে ছিল না। প্রতাপচাঁদ বাংলা থিয়েটারে সেটিই যথাযথভাবে চালু করলেন।

ব্যবসা পরিচালনার নিয়মনীতি এবং শৃঙ্খলা থিয়েটারে প্রয়োগ করা হলো। রঙ্গালয়ের ভিতর ও বাইরে এই প্রথম নিয়মশৃঙ্খলা প্রবর্তিত হলো। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মতো থিয়েটারও একটি প্রতিষ্ঠান--এর ভালোমন্দ, লাভ লোকসান সবই নির্ভর করে তার সুষ্ঠু ও যথাযথ পেশাদারি প্রথা, মনোভাব ও প্রয়োগের ওপর।

এইরকম একটি থিয়েটার-প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য একজন যোগ্য ম্যানেজারের দরকার। তিনি জানলেন, সেই সময়ে থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র সেই যোগ্যতম ব্যক্তি। গিরিশ তখন পার্কার কোম্পানীতে ১৫০ টাকার চাকুরি করেন। তাঁকে ১০০ টাকা বেতন দিয়ে ন্যাশনাল থিয়েটারের ম্যানেজার করে আনা হলো। সঙ্গে বাড়তি বোনাস। গিরিশ চাকুরি ছেড়ে এই প্রথম থিয়েটারকে তাঁর জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করলেন। বাংলা নাটকে 'এমেচারিস' গিরিশ এই প্রথম পুরোপুরি 'প্রোফেশনাল' হলেন।

প্রতাপচাঁদ ও গিরিশচন্দ্রের যোগাযোগের ফলে পেশাদার বাংলা থিয়েটারের ভিত্তিটি মজবুত হলো। এই দুজনে মিলে পেশাদার থিয়েটার পরিচালনার যে সব নিয়মনীতি চালু করলেন, পরবর্তী বহুদিন সেই ধারাই বাংলা থিয়েটারে চলে এসেছে। বাধাবন্ধহীন উচ্ছৃঙ্খলতায় বাংলা থিয়েটার যখন ভেসে যেতে বসেছিল, যাকে অভিনেত্রী বিনোদিনী বলেছেন 'অশুভ গ্রহ', সেই সময়ে এই দুজনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দৃঢ়বদ্ধ নিয়মনীতি প্রায় একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার মতো করে বাংলা থিয়েটারকে রক্ষা

করেছিল।

প্রতাপচাঁদের ন্যাশনাল থিয়েটারে যোগ দিয়ে গিরিশ তাঁর পুরনো ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জড়ো করলেন। ধর্মদাস সুর, মহেন্দ্রলাল বসু, অমৃতলাল বসু, মতিলাল সুর, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, সঙ্গীতাচার্য রামতারণ সান্যাল, অমৃতলাল মিত্র, ক্ষেত্রমণি, কাদম্বিনী, লক্ষ্মীমণি, নারায়ণী, বিনোদিনী, বনবিহারিণী—সবাইকে এনে অভিনয়ের দলটিকে গড়ে তুললেন।

১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দের ১ জানুয়ারি মহাসমারোহে প্রতাপচাঁদের ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্বোধন হল। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের লেখা নাটক 'হামীর'। মাইকেল টড-এর রাজস্থান-বিষয়ক ইতিহাসের গ্রন্থ থেকে বিষয় নিয়ে নাটকটি লেখা। গিরিশ এতে নিজের লেখা চারটি গান যুক্ত করেন। অভিনয়ে ছিলেন : হামীর--গিরিশচন্দ্র ; নায়িকা লীলা—বিনোদিনী। এই নাটকটি তেমন সাড়া ফেলতে পারল না। তেমন দর্শক আগমনও হলো না। প্রতাপচাঁদ চিন্তিত হয়ে ভালো নাটকের জন্য বিজ্ঞাপন দিলেন। থিয়েটারের হ্যান্ডবিলের নিচে ভালো নাটকের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হতে থাকল। ভালো নাটকের খোঁজ চলল, ভালো নাটক হাতের কাছে নেই, অথচ রঙ্গমঞ্চও বিনা নাটকে বসে থাকতে পারে না, অভিনেতা-অভিনেত্রী থেকে থিয়েটারের সবাইকে মাইনে দিতে হবে--তাই তাদের বসিয়েও রাখা যায় না, তাতে আর্থিক ক্ষতি। তখন একান্ত দায়ে পড়ে ম্যানেজার গিরিশ নাটক রচনা শুরু করলেন। এর আগে আগমনী, অকালবোধন, দোললীলা নামে গীতিনাট্যগুলি লিখেছিলেন, কিন্তু সেগুলি অকিঞ্চিৎকর। পুরো নাটক গিরিশ এর আগে লেখেননি। অন্যের নাটক সম্পাদনা করেছেন, ভালো ভালো নাটক পড়েছেন, অভিনয় করেছেন, ভালো অভিনয় দেখেছেন, কিন্তু নাট্যকার হওয়ার জন্যে কখনোই সেভাবে কলম ধরেননি। এবারে ধরতে হল। গিরিশ তার কারণ বলতে গিয়ে বলেছেন, তিনি নাটক রচনা আরম্ভ করেছিলেন 'দায়ে পড়ে--out of sheer necessity. যখন মাইকেল, বঙ্কিম, প্রায় সব dramatised করা শেষ হলো, স্টেজে আর কোনও অভিনয়োপযোগী নাটক মিললো না, তখন বাধ্য হয়েই নাটক রচনা করতে হলো।'

বাংলা থিয়েটারে নাট্যকার হিসেবে গিরিশের আবির্ভাব হলো। একেবারে মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত থেকে, মঞ্চের উপযোগী করে নাটক রচনা করলেন। ইংরেজিতে এইরকম নাটক রচনাকারদের প্লে-রাইট (Play Wright) বলে।

গিরিশ লিখলেন মোহিনী প্রতিমা ও মায়াতরু। অভিনীত হল নাটক দুটি—১৮৮১-এর ২২ জানুয়ারি মায়াতরু এবং ৯ এপ্রিল মোহিনী প্রতিমা। মায়াতরুও গীতিনাট্য। এটি অনেকেরই প্রশংসা পায়। বঙ্কিমচন্দ্র এই নাট্য উপস্থাপনা দেখে খুশি হয়ে প্রশংসা করেছিলেন। 'মোহিনী প্রতিমা' প্রেমের উচ্চভাব ও আদর্শে রচিত বলে সাধারণ স্তরের দর্শকের আনুকূল্য পায়নি। যদিও পত্রপত্রিকা খুবই প্রশংসা করেছিল।

এবারে আরব্য উপন্যাস থেকে কাহিনী নিয়ে লিখলেন 'আলাদীন', ৯ এপ্রিল

অভিনীত হল। এই নাটকে গিরিশ 'কুহকী'র ভূমিকায় অভিনয়ে এবং রামতারণ সান্যাল আলাদীনের ভূমিকায় নাচে গানে মাতিয়ে দিলেন।

সেই সময়ে অন্য মঞ্চে ঐতিহাসিক নাটকের জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে গিরিশ তাড়াতাড়ি লিখে ফেললেন 'আনন্দরহো' নামে ইতিহাসের বিষয় নিয়ে রোমান্সধর্মী নাটক। পূর্ণাঙ্গ নাটক হিসেবে 'আনন্দরহো' গিরিশের প্রথম রচনা। অভিনীত হলো ২১ মে, ১৮৮১। এই নাটকে বেতালের ভূমিকায় অভিনয়ে গিরিশ নতুন ভাবনার সঞ্চার করেছিলেন। বেতালের মধ্যে গুরুতন্ত্রসাধনা ও ইচ্ছাশক্তির (will force) ভাব রয়েছে। সুখদুঃখের সমভাব, সদানন্দ, নিঃস্বার্থ ও পরোপকারী চরিত্র বেতালের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। পরবর্তী নাটক শ্রীবৎস চিন্তায় 'বাতুল', ভ্রান্তিতে 'রঙ্গলাল', ছত্রপতি শিবাজীতে 'গঙ্গাজী', অশোকে 'আকাল'—এই একই ভাবনায় রচিত হয়েছিল।

'আনন্দরহো' সাড়ম্বরে অভিনীত হলেও, নাটকটি সমাদৃত হলো না। বোঝাই যাচ্ছে প্রথম নাটক লেখবার জন্য আসরে নেমে গিরিশ নানাদিক সন্ধান করছেন সাফল্যের জন্য। শুধু নাটক লিখলেই চলবে না, সেই নাটককে অভিনয় শিক্ষা দিয়ে মঞ্চস্থ করতে হবে, এবং দর্শক আনুকূল্য পেতে হবে। গিরিশের তাই বিভিন্ন দিকে অনুসন্ধান। কিন্তু তখনো বুঝতে পারছেন না—কোন ধরনের নাটক চলবে।

এবারে গিরিশ রচনা করলেন 'রাবণবধ'। রামায়ণ অবলম্বন করে পৌরাণিক নাটক। প্রতাপচাঁদের থিয়েটারে অভিনীত হলো ৩০ জুলাই, ১৮৮১। রাতারাতি বিপুল জনপ্রিয়তা দেখা গেল এই নাটকের অভিনয়ে : রাম—গিরিশ। সীতা—বিনোদিনী। লক্ষ্মণ —মহেন্দ্রলাল বসু। রাবণ—অমৃতলাল মিত্র।

'রাবণবধ' অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ন্যাশনাল থিয়েটারের কপাল খুলে গেল। বাঙালি ধর্মাশ্রিত। ধর্মাশ্রয়ী জাতির মর্মাশ্রয়ী নাটক লিখতে গেলে যে পুরাণই ভরসা এবং সেই পুরাণের কাহিনীর মধ্যে যুগোপযোগী ভক্তিরসের ধর্মপ্লাবন বইয়ে দিতে হবে—গিরিশ তা অনুধাবন করলেন। বুঝতে পারলেন মালিক প্রতাপচাঁদও।

ম্যানেজার ও অভিনেতা হিসেবে এতদিন গিরিশ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। 'রাবণবধ' থেকেই তিনি নাট্যকাররূপেও খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এবারে ন্যাশনাল থিয়েটারে দর্শক সমাগম শুরু হল। অভিনেত্রী বিনোদিনী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন : 'রাবণবধ-এর পর হইতে থিয়েটারে লোকের স্থান সঙ্কুলান হইত না।'

এই নাটকেই অভিনয়ের সুবিধের জন্য, বিশেষ করে অভিনেত্রীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখেই গিরিশ অমিত্রাক্ষর ছন্দকে ভেঙে 'ভাঙা অমিত্রাক্ষর' ছন্দে সংলাপ লিখলেন। পরবর্তীকালে যা 'গৈরিশ ছন্দ' নামে প্রচলিত হয়ে খ্যাতিলাভ করেছে। এর আগে মাইকেলের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের নাট্যরূপ দিতে গিয়ে গিরিশ অমিত্রাক্ষর ছন্দকে ভেঙে সরল করে সংলাপ তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন। রাজকৃষ্ণ রায়ের উৎসাহ তিনি পেয়েছিলেন। কেননা, রাজকৃষ্ণ রায় এর আগেই এই চেষ্টা করেছিলেন। প্রবহমানতা, উচ্চারণের সুবিধে এবং মুখস্থ করা সহজতর বলে অভিনেত্রীবৃন্দ সহজেই

এই ছন্দকে গ্রহণ করে নিতে পারলেন। ঠাকুর বাড়ির ভারতী পত্রিকায় (মাঘ, ১২৮৮) গৈরিশ ছন্দের প্রশংসা করা হলো। অক্ষয়চন্দ্র সরকারও স্বীকার করলেন যে, এতদিনে নাটকের ভাষা সৃজিত হয়েছে।

দর্শক আনুকূল্যে উৎসাহিত গিরিশ এবার রামায়ণ ধরে ধরে কাহিনী নিয়ে নাটক লিখতে লাগলেন। তারপরে মহাভারত। এইভাবে বাঙালি-দর্শকের রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীর প্রতি আগ্রহকে সম্বল করে তিনি ধর্মভাব নাটকগুলিতে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন।

'রাবণবধে'র পর 'সীতার বনবাস' (১৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৮১)। বনবাসিনী সীতার অশ্রুজল বাঙালি মহিলাদেরও থিয়েটারে নিয়ে আসতে শুরু করল। এর আগে বাংলা রঙ্গালয়ে ভদ্রঘরের মহিলাবৃন্দ দর্শক হিসেবে তত আসতেন না। থিয়েটারের পরিবেশও তখন তার উপযুক্ত ছিল না। তাছাড়া বারাঙ্গনা অভিনেত্রীসহ অভিনয়, থিয়েটারের দর্শকদের বেলেল্লাপনা ইত্যাদি কারণে শিক্ষিত ও রুচিসম্পন্ন মানুষেরা সহসা রঙ্গমঞ্চে যেতেন না, তেমনি ভদ্রমহিলারাও আসতেন না। গিরিশের 'সীতার বনবাস' এই নতুন দর্শকদের মঞ্চাভিমুখি করে তুলে বাংলা নাট্যশালায় একটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়ে তুলল। অহীন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন :

> 'সীতার বনবাসই প্রথম বাংলার মা-জননীদের নাট্যশালায় অভিনয় দর্শনে আগমনের জন্য সমস্ত দ্বিধা-সংকোচের দ্বার উন্মুক্ত করে দিল।'

[নাট্য বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র]

এই ব্যাপারে প্রতাপচাঁদের ভূমিকাও নগণ্য নয়। তিনি দ্রুত মহিলাদের আসন-সংখ্যা বাড়িয়ে দিলেন। এবং দর্শকদের বেলেল্লাপনা বন্ধ করার জন্য কড়া হাতে ব্যবস্থা নিলেন। তিনি বুঝেছিলেন এই মহিলা দর্শকেরাই তার ব্যবসায়ের 'মা-লক্ষ্মী'। সীতার বনবাসের ভূমিকালিপি :

> রাম—গিরিশ। সীতা—কাদম্বিনী। লক্ষ্মণ—মহেন্দ্রলাল বসু। বাল্মীকি—অমৃতলাল মিত্র। লব—বিনোদিনী। কুশ—কুসুমকুমারী (খোঁড়া)।

গিরিশের রাম চরিত্রের অভিনয় সকলকে মুগ্ধ করল। এবং লব-কুশের অভিনয় ও গান লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল। সঙ্গীত রচয়িতা গিরিশেরও প্রতিষ্ঠা হল।

গিরিশের নতুন নাটক রচনার অবসরে অভিনীত হল অমৃতলাল বসুর 'তিল-তর্পণ' (২১ সেপ্টেম্বর)। অমৃতলাল নিজে বাপ্পারাও-এর ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করলেন। গিরিশ এতদিনে মহাভারত ধরেছেন, মহাভারত থেকে লিখলেন 'অভিমন্যু বধ'। অভিনীত হল ২৬ নভেম্বর। যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধন এই দুটি ভূমিকায় গিরিশ নিজে অভিনয় করলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও দ্রোণাচার্য হলেন কেদার চৌধুরী, ভীম ও গর্গ হলেন অমৃত মিত্র, অর্জুন ও জয়দ্রথ মহেন্দ্রলাল বসু। অভিমন্যু চরিত্রে অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় এবং উত্তরা বিনোদিনী। গিরিশ নাটকটির ঘটনা বিন্যাস ও চরিত্র নির্মাণ এমনভাবে করলেন যাতে একই অভিনেতা একাধিক চরিত্রে অভিনয় করতে পারেন। ফলে নাটকটি অভিনয় করতে কম অভিনেতার প্রয়োজন। ব্যবসাদার প্রতাপচাঁদের সাহচর্যে নাট্যকার

গিরিশচন্দ্র কি মিতব্যয়ি হয়ে পড়েছিলেন!

'অভিমন্যুবধ' জনসমাদর লাভ করতে পারল না। প্রতাপচাঁদ নাট্যশিল্পের দিক দিয়ে নয়, তার ব্যবসায়িক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছিলেন, 'সীতার বনবাস' নাটকটির সাফল্যের মূলে শুধু পুরাণ বা ধর্ম নয়, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল লব-কুশের গান। বিনোদিনী ও কুসুমকুমারী, এই দুজনের অভিনয় ও গান দর্শকদের মাতিয়ে দিয়েছিল। তাই 'অভিমন্যুবধ' ব্যর্থ হলে প্রতাপচাঁদ গিরিশকে ডেকে বলেছিলেন--'বাবু, যব দুসরা কিতাব লিখগে তব ফির ওহি দুনো লেড়কা ছোড় দেও'--অর্থাৎ যে নাটকই লেখ না কেন, ঐ দুনো লেড়কা লব-কুশকে মঞ্চে এনে ছেড়ে দিতে হবে। নাটকে দর্শক আকর্ষণের মুল কেন্দ্রটি কোথায় ঝানু জহুরি প্রতাপচাঁদ ধরতে পেরেছিলেন। নাট্যশিল্প বোঝার প্রয়োজন তার ছিল না।

মহাভারত থেকে গিরিশ ফিরে এলেন রামায়ণে লব-কুশের সন্ধানে। তিনি লিখলেন 'লক্ষ্মণ-বর্জন'। লক্ষ্মণ বর্জন এবং ধীবর ও দৈত্য দুটি নাটক একসঙ্গে অভিনীত হল (৩১ ডিসেম্বর)। কিন্তু ব্যর্থ হলো সব প্রচেষ্টা। ১৮৮২-তে পরপর অভিনীত হল রামের বনবাস (১১ মার্চ), সীতার বিবাহ (১৫ এপ্রিল), সীতাহরণ (২২ জুলাই), মলিনামালা (১৬ সেপ্টেম্বর)। সব ক'টি নাটকই গিরিশের লেখা। ফাঁকে ফাঁকে পুরনো নাটক সীতার বনবাস, রাবণবধ এবং ভোটমঙ্গল (১৪ অক্টোবর) নামে হাল্কা প্রহসন অভিনীত হল। লর্ড রিপনের বড়লাট থাকাকালীন মিউনিসিপ্যালিটিতে 'লোকাল সেল্‌ফ গভর্নমেণ্ট' চালু হওয়াতে যে ভোটপর্ব চলছিল, তা নিয়ে রঙ্গাত্মক প্রহসন ভোটমঙ্গল। এইসব অভিনয়ের মধ্যে সীতার বিবাহ এবং মলিনামালা গীতিনাট্য কিছুটা জনসমাদর লাভ করেছিল। অন্যগুলি ব্যর্থ হয়েছিল। সীতার বিবাহ অভিনয়ে মঞ্চাধ্যক্ষ ধর্মদাস সুর মঞ্চে আরেকটি রঙ্গমঞ্চ তৈরি করে জনকের রাজসভার অভিনয় দেখিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

১৮৮২ সাল ভাল গেল না ন্যাশনাল থিয়েটারের ; প্রতাপচাঁদ ও গিরিশেরও খারাপ সময়। এর মধ্য দিয়ে ১৮৮২ শেষ হলো। ১৮৮৩-র গোড়াতেই (১৩ জানুয়ারি) 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' অভিনীত হল। গিরিশের মহাভারতকেন্দ্রিক নাটকটি বিপুল জনসমাদর লাভ করল। রাবণবধের জনপ্রিয়তাকেও ছাড়িয়ে গেল। কীচক ও দুর্যোধনের ভূমিকায় গিরিশের অভিনয় সবার প্রশংসা অর্জন করল। দ্রৌপদীবেশী বিনোদিনী, অর্জুনরূপী মহেন্দ্র বসু, ভীম অমৃত মিত্র খুব আকর্ষণীয় অভিনয় করলেন। নাট্যগ্রন্থনে ও চরিত্র দ্বন্দ্বে এই নাটকটি গিরিশের অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ নাটক—পাঠ্য এবং অভিনেয়, দু'দিক দিয়েই।

পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসের বিপুল জনসমাদর গিরিশকে নাট্যকার, অভিনেতা ও নাট্যপরিচালক হিসেবে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে দেয়। ব্যবসায়িক থিয়েটারের ভাগ্যও খুলে যায়।

কিন্তু প্রতাপচাঁদের সঙ্গে গিরিশের মতান্তর শুরু হয় এই সময় থেকেই। অভিনেতা-

অভিনেত্রীর মাইনে ও সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর প্রস্তাব করেন গিরিশ। প্রতাপচাঁদ তা নাকচ করে দেন। তাছাড়া প্রতাপচাঁদ নিয়মনীতির আরো কড়াকড়ি করতে চান। তা অনেকের পক্ষে বিশেষ করে গিরিশের পক্ষে ফাঁস বলে মনে হয়েছিল। অভিনেত্রীদের প্রতি প্রতাপচাঁদের দুর্ব্যবহার গিরিশকে ক্ষুব্ধ করেছিল। বিনোদিনী কয়েকদিন কামাই করলে তার মাইনে কাটারও চেষ্টা করেন প্রতাপচাঁদ। এমন কি, অনেকক্ষেত্রে প্রতাপচাঁদ তার সীমা লঙ্ঘন করে গিরিশের ওপরও মাতব্বরি করতেন। গিরিশ ক্রমশ ক্রুদ্ধ হচ্ছিলেন। প্রতাপচাঁদের সঙ্গে মনোমালিন্যের এগুলি কারণ। তার ওপর প্রতাপচাঁদ ব্যবসায়ি হলেও কৃপণ ছিলেন। প্রচুর অর্থলাভ করলেও তিনি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কোনো সুযোগ-সুবিধা বা মাইনে বাড়াতে চাননি। তার ওপরে তিনি বাঙালিদেরও খুবই অপছন্দ করতেন। গিরিশ অপমানিতও হন।

গিরিশের সঙ্গে প্রতাপচাঁদের মনোমালিন্য মতান্তরে পরিণত হয়। গিরিশ ন্যাশনাল থিয়েটার ছেড়ে দিলেন। তার সঙ্গে বেশির ভাগ অভিনেতা-অভিনেত্রীও এই থিয়েটার ত্যাগ করেন। অমৃত মিত্র, অঘোরনাথ পাঠক, উপেন্দ্র মিত্র, বিনোদিনী, কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি, নীলমাধব চক্রবর্তী প্রমুখ সকলেই সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ন্যাশনাল থিয়েটারে গিরিশ ও তাঁর সহযোগীদের শেষ অভিনয় রাবণবধ, ১৮৮৩ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি।

গিরিশের সঙ্গে সদলে বেরিয়ে এসে এরা কিছুদিন 'ক্যালকাটা স্টার কোম্পানী' নামে একটি দল তৈরি করে বেঙ্গল থিয়েটার মঞ্চে অভিনয় করেন। তারপরে গুর্মুখ রায়ের টাকায় বিনোদিনীর আনুকূল্যে ও সকলের উৎসাহ ও আগ্রহে বিডন স্ট্রিটে তৈরি হলো স্টার থিয়েটার, ২১ জুলাই, ১৮৮৩।

প্রতাপচাঁদ এতে ক্ষুণ্ণ হলেও অবদমিত হলেন না। তিনি ন্যাশনাল থিয়েটার অব্যাহত গতিতে চালিয়ে যেতে লাগলেন। কেদারনাথ চৌধুরীকে ম্যানেজার করে আনলেন। ১৮৮৩-তে ৭ মে, কেদার চৌধুরীর নাট্যরূপ দেওয়া 'আনন্দমঠ' অভিনীত হলো। এই সময়ে অর্ধেন্দুশেখর এখানে যোগ দেন। তাছাড়া গিরিশরা চলে গেলেও যে কয়েকজন তখনো এখানে ছিল তারা অভিনয় করতে থাকেন। মহেন্দ্র বসু, রামতারণ সান্যাল, অমৃত মিত্র, ধর্মদাস সুর, বনবিহারিণী (ভূনি) প্রমুখেরা কেদারনাথের অধ্যক্ষতায় আনন্দমঠে অভিনয় করলেন। মহাপুরুষরূপে অর্ধেন্দুশেখর এবং মহেন্দ্র চরিত্রে মহেন্দ্রলাল বসু উচ্চাঙ্গের অভিনয় করেন। তা সত্ত্বেও আনন্দমঠ সমাদৃত হলো না। পরবর্তী অভিনয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বপ্নময়ী (১৫ সেপ্টেম্বর)। আগে লেখা ও অভিনীত হয়ে যাওয়া এই নাটকটি নিয়ে ন্যাশনাল ভাগ্য পরীক্ষা করল। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে রাজা শোভা সিংহের বিদ্রোহ অবলম্বনে এই নাটকটি এক সময়ে বেঙ্গল থিয়েটারে সমাদৃত হয়েছিল। কিন্তু এখানে সাফল্যলাভ করল না। তা সত্ত্বেও কিছু অভিনয় চলল। কেদার চৌধুরীর ছত্রভঙ্গ (দুর্যোধনের উরুভঙ্গ), রাজসূয় যজ্ঞ প্রভৃতি অভিনীত হল। কিন্তু কোনোদিক দিয়েই সুবিধে করা গেল না।

প্রতাপচাঁদ এবারে ন্যাশনাল থিয়েটার ছেড়ে দিলেন। 'লেসি' হয়ে থিয়েটারের ভার

আবার গ্রহণ করলেন ভুবনমোহন নিয়োগী ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে, স্ত্রীর বকলমে। তিনিও কেদার চৌধুরীকে ম্যানেজার রাখলেন। কেদার চৌধুরী এবারে রবীন্দ্রনাথের 'বৌঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসের নাট্যরূপ অভিনয় করলেন, ৩ জুলাই, ১৮৮৬। তার আগে অভিনেতা পণ্ডিত হরিভূষণ ভট্টাচার্যের 'কুমারসম্ভব' অভিনয় করেছিল। এই নাটকটি অভিনয় নৈপুণ্যে ও চমকপ্রদ দৃশ্যকৌশলে দর্শকদের তৃপ্ত করেছিল।

এরপরে প্রতাপচাঁদ ও ভুবনমোহনের মামলা শুরু হয়। ন্যাশনাল থিয়েটারের বাড়ি (সাবেক গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের বাড়ি) নীলামে ওঠে। হাতিবাগানের স্টার থিয়েটার আড়াই হাজার টাকায় এটি কিনে নেন এবং থিয়েটার বাড়িটি ভেঙ্গে ফেলা হয়। এইসব দরজা, জানলা, আসবাব প্রভৃতি নিয়ে সেগুলি তাঁদের নবনির্মিত স্টার থিয়েটারের কাজে লাগানো হয়। ন্যাশনাল তথা গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার নিশ্চিহ্ন হলো। পরে এই জমিতেই গড়ে ওঠে মিনার্ভা থিয়েটার।

প্রতাপচাঁদ জহুরির ন্যাশনাল থিয়েটার-এর ইতিহাস এইখানেই শেষ।

বাংলা রঙ্গমঞ্চের ধারায় স্বল্পকালীন হলেও প্রতাপচাঁদ তাঁর ন্যাশনাল থিয়েটারের মাধ্যমে অনেকগুলি নতুনতর কাজ করেছিলেন বা করতে উৎসাহিত করেছিলেন। এগুলি পরবর্তী বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এক. প্রথম সার্থকভাবে থিয়েটারে পেশাদারিত্ব চালু করেন প্রতাপচাঁদ। মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত সব রকমের কর্মীর মাইনে ইত্যাদি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। প্রত্যেকের কাজের গণ্ডিও নির্ধারিত হয়।

দুই. নিয়মশৃঙ্খলার দ্বারা থিয়েটারের উচ্ছৃঙ্খলতা ও শখ-শৌখিনতাকে তিনি নিয়ন্ত্রিত করেন।

তিন. 'এমেচারিস' থেকে বাংলা থিয়েটারকে পুরোপুরি প্রোফেশনালরূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন।

চার. প্রতাপচাঁদের ন্যাশনাল থিয়েটারে পেশাদার হিসেবে গিরিশচন্দ্র যোগ দিয়েই থিয়েটার জীবনের শৃঙ্খলা উপলব্ধি করেন। যেটা তাঁর পরবর্তী থিয়েটার জীবনের পাথেয় হয়ে ছিল।

পাঁচ. অভিনেতা ও ম্যানেজার গিরিশ প্রতাপচাঁদের ন্যাশনাল থিয়েটারে এসেই নাটক রচনা করতে বাধ্য হন। এইভাবে তাঁর নাট্যকার জীবনের শুরু হয়। প্রাথমিক নাট্যকার সত্তার সম্ভাব্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা এই থিয়েটারেই তিনি করে নিতে পেরেছিলেন। প্রতাপচাঁদের থিয়েটারে গিরিশ ছিলেন দু'বছর। দু'মাস বাদে বাদেই নতুন নাটক নামাতে হত বলে এই দু'বছরে গিরিশ নয়টি নাটক, ছয়খানি গীতিনাট্য লেখেন।

ছয়. বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়কে পুরোপুরি বাণিজ্যিক থিয়েটারে (Commercial Theatre) পরিণত করার দৃঢ় পদক্ষেপ এখান থেকেই শুরু হয়।

একথা ঠিক, প্রতাপচাঁদ ব্যবসা করতে গিয়ে ন্যাশনাল থিয়েটারকে দর্শকলক্ষ্মীর চাহিদার কাছে বিকিয়ে দিয়েছিলেন। তাই সস্তা নাচগানের নাটক, গীতিনাট্য, ধর্মাশ্রয়ী পৌরাণিক নাটকগুলিই এখানে অভিনীত হয়েছে। উচ্চভাবের অসাধারণ নাটক এখানে অভিনীত হয়নি। গিরিশও লিখতে পারেন নি। তাছাড়া নানারকম নাট্যকৌশল ও কলাকৌশল প্রয়োগ করে দর্শক আকর্ষণের চেষ্টা এইখানেই শুরু হয়েছিল। ব্যবসায়ি প্রতাপচাঁদ থিয়েটারকে পুরোপুরি ব্যবসায়ের দিক দিয়েই দেখেছিলেন। নাট্যশিল্পের দিক দিয়ে দেখেন নি। সে দায় বা দায়িত্ববোধও তার ছিল না।

কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল শিল্পীজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং গিরিশের শিল্পীসত্তাকে পেশাদারি নৈপুণ্যে জাগ্রত করে তিনি বাংলা থিয়েটারের যে উপকার করেছিলেন, তা বিস্মৃত হবার নয়। অভিনয়নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্তনের পরবর্তী বাংলা থিয়েটারের যে অশুভ গ্রহ চলছিল, প্রতাপচাঁদ তা থেকে থিয়েটারকে বাঁচাবার ব্যবসায়িক পথ দেখিয়েছিলেন।

প্রতিষ্ঠিত শিল্পী গিরিশ তাঁর সহযোগী শিল্পীদের নিয়ে ব্যবসায়ির আষ্টেপৃষ্ঠের বন্ধন থেকে বেরিয়ে মুক্ত হাওয়ায় নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য গড়ে তুললেন স্টার থিয়েটার। প্রতাপচাঁদ থিয়েটার থেকে চলে গেলেন। কিন্তু রয়ে গেল তার প্রবর্তিত পেশাদারি থিয়েটারের নিয়মরীতির ধারা।

স্টার থিয়েটার

৬৮ নং বিডন স্ট্রিট, কলকাতা

প্রতিষ্ঠাতা : গুর্মুখ রায়
উদ্বোধন : ২১ জুলাই, ১৮৮৩
নাটক : দক্ষযজ্ঞ (গিরিশ)

স্থায়িত্বকাল : ২১ জুলাই, ১৮৮৩—৩১ জুলাই ১৮৮৭

কলকাতার ধনী ব্যবসায়ির পুত্র গুর্মুখ রায়[১] বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা। থিয়েটারে প্রমোদের মোহে এবং বিশেষ করে বিনোদিনীর আকর্ষণে গুর্মুখ রায় থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন। গিরিশ তখন প্রতাপচাঁদ জহুরির ন্যাশনাল থিয়েটার ছেড়ে নতুন থিয়েটারের আশায় ঘুরছিলেন। ন্যাশনালের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে 'ক্যালকাটা স্টার কোম্পানী' নামে একটি থিয়েটারের দল কোনক্রমে চালাচ্ছিলেন। অমৃতলাল মিত্র, অঘোরনাথ পাঠক, নীলমাধব চক্রবর্তী, উপেন্দ্রনাথ মিত্র, কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি, বিনোদিনী প্রমুখ গিরিশ-অনুরাগী শিল্পী নিয়ে গিরিশচন্দ্র এই 'ক্যালকাটা স্টার কোম্পানী' চালু করেছিলেন। বেঙ্গল থিয়েটারের মঞ্চ ভাড়া নিয়ে তিনরাত্রি যথাক্রমে ২৮ ও ৩১ মার্চ এবং ১৭ এপ্রিল, ১৮৮৩, অভিনয়ও করেছিলেন। গুর্মুখ রায় গিরিশের কাছে প্রস্তাব দেন নতুন থিয়েটার খোলার। শর্ত একটাই—অভিনেত্রী বিনোদিনীকে তার রক্ষিতা হতে হবে। গিরিশ প্রমুখের অনুরোধে বিনোদিনী নতুন থিয়েটারের আশায় এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান। তাছাড়া কথা ছিল, বিনোদিনীর নাম অনুসারেই এই নতুন নাট্যশালার নাম হবে 'বি—থিয়েটার'।

বাগবাজারের কীর্তিচন্দ্র মিত্রের ৬৮নং বিডন স্ট্রিটের খালি জমি ইজারা নিয়ে গুর্মুখ রায়ের অর্থে এবং গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল বসু, দাসুচরণ নিয়োগী, অমৃতলাল মিত্র প্রমুখের তত্ত্বাবধানে নতুন 'ইষ্টক নির্মিত' পাকা রঙ্গালয় তৈরি হলো। বিনোদিনীর নামে নামকরণ না হয়ে, শেষ মুহূর্তে 'স্টার থিয়েটার' নামে রেজিস্ট্রি করা হলো। বিনোদিনী কিন্তু মনপ্রাণ দিয়ে থিয়েটার চেয়েছিলেন এবং সেই থিয়েটার হবে তার নামে—এই রঙীন আশায় তিনি গুর্মুখ রায়ের আশ্রিতা হয়েছিলেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র ও তার সহযোগীদের চক্রান্তে তার সব আশা নষ্ট হয়ে গেল। এর নাম যে 'স্টার' দেওয়া হবে এমন একটা পরিকল্পনা গিরিশের মধ্যে ছিল এবং তার অস্থায়ী নাট্যদলের নাম তিনি 'ক্যালকাটা স্টার থিয়েটার' আগেই রেখেছিলেন। নতুন থিয়েটারের বাসনায় তিনি বিনোদিনীকে 'টোপ' হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন মাত্র। বিনোদিনীও থিয়েটার ও নিজের নামাঙ্কনের প্রতি

১. পুরো নাম গুর্মুখ রায় মুসাদ্দি। পিতা গণেশদাস মুসাদ্দি হোরমিলার কোম্পানীর বেনিয়ান ছিলেন। আদি নিবাস রাজস্থান।

স্বভাবতই দুর্বল ছিলেন। তাছাড়া বিনোদিনীর নামে নামকরণ না হওয়ার আরেকটা কারণ হল সামাজিক বাধা। বারাঙ্গনা অভিনেত্রীর নামে একটি পাবলিক থিয়েটারের নামকরণ হবে, তাও তার জীবৎকালেই, এতখানি দুঃসাহস অনেকেরই ছিল না। তার ওপর বিনোদিনীর প্রতি অনেকেরই ঈর্ষা এবং সন্দেহ থাকাও স্বাভাবিক ছিল।

শুরু হল স্টার থিয়েটার। মালিক গুর্মুখ রায় হলেও এই মঞ্চের সর্বেসর্বা হলেন গিরিশ। তিনিই ম্যানেজার, নাট্যকার, পরিচালক ও প্রধান অভিনেতা। প্রথম চার বছর একচ্ছত্রভাবে গিরিশের সব পৌরাণিক নাটক, পঞ্চরং-গীতিনাট্য এখানে অভিনীত হয়েছে। স্টেজ ম্যানেজার জহরলাল ধর, সঙ্গীত পরিচালক বেণীমাধব অধিকারী, কোষাধ্যক্ষ হরিপ্রসাদ বসু। প্রধান অভিনেতা ছিলেন গিরিশ নিজে, তাছাড়া অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল বসু, নীলমাধব চক্রবর্তী, অঘোর পাঠক, উপেন্দ্রনাথ মিত্র, বিনোদিনী, কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি, গুণবিহারিণী প্রমুখ অভিনেতা-অভিনেত্রী।

১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দের ২১ জুলাই, শনিবার গিরিশের লেখা 'দক্ষযজ্ঞ' নাটক নিয়ে স্টার থিয়েটারের উদ্বোধন হলো মহাসমারোহে। বিজ্ঞাপন বেরোল :

Grand Opening Night/Star Theatre.
Beadon Street./
Propietor : Baboo Goormuk Roy/Saturday. 21st July./
Baboo G.C. Ghose's New Drama/Dakshya Yajna./
Everything Grand and wonderful/ G.C. Ghose. Manager.
[The Indian Daily News. 21 July 1883.]

অভিনয় করলেন :

দক্ষ--গিরিশ। মহাদেব--অমৃতলাল মিত্র। দধীচি--অমৃতলাল বসু। ব্রহ্মা--নীলমাধব চক্রবর্তী। বিষ্ণু--উপেন্দ্রনাথ মিত্র। সতী--বিনোদিনী। তপস্বিনী--ক্ষেত্রমণি। প্রসূতি--কাদম্বিনী। দক্ষ, মহাদেব ও সতীর ভূমিকায় অভিনয় অনবদ্য হয়েছিল। বিশেষ করে মহাদেবরূপী অমৃত মিত্র, তার অভিনয়ে সকলকে বিমোহিত করে দিয়েছিলেন। অভিনয়, সঙ্গীত, দৃশ্যসজ্জা, আলোর ব্যবহার, কারসাজি দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল। দক্ষযজ্ঞ নাটক দিয়ে স্টারের গৌরবময় যাত্রা শুরু হলো।

গুর্মুখ রায় মালিক হিসেবে ছিলেন মোটমাট ছয় মাস। তার থাকাকালীন স্টারে অভিনীত হয়--

১৮৮৩ : দক্ষযজ্ঞ (২১ জুলাই), ধ্রুবচরিত (১১ আগস্ট), রামের বনবাস (২৯ আগস্ট), সীতার বনবাস (২৬ সেপ্টেম্বর), সীতাহরণ, চক্ষুদান (রামনারায়ণ--২৭ অক্টোবর), মেঘনাদবধ (২১ নভেম্বর), সধবার একাদশী (দীনবন্ধু, ৫ ডিসেম্বর), রাবণবধ (৮ ডিসেম্বর), নলদময়ন্তী (১৫ ডিসেম্বর), চোরের উপর বাটপাড়ি (অমৃতলাল, ২৬ অক্টোবর)।

এই ছয় মাসে দীনবন্ধু, রামনারায়ণ, অমৃতলালের একটি নাটক, মেঘনাদবধের নাট্যরূপ (গিরিশ) ছাড়া আর সবই গিরিশের লেখা নাটক। এবং গিরিশের সব নাটকই

পৌরাণিক নাটক। দক্ষযজ্ঞের পর ধ্রুবচরিত্র ও নলদময়ন্তীও খুব সাফল্য লাভ করে। ধ্রুবচরিত্র নাটকেই গিরিশ প্রথম বিদূষক চরিত্র সৃষ্টি করেন এবং অমৃতলাল বসু সেই চরিত্রে অসামান্য অভিনয় করে তাকে প্রতিষ্ঠা করেন। ধ্রুব চরিত্রে ভূষণকুমারী গানে ও অভিনয়ে মাতিয়ে দিয়েছিলেন। নলদময়ন্তী নাটকের অভিনয় উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। অমৃতলাল মিত্র (নল), অমৃতলাল বসু (বিদূষক), বিনোদিনী (দময়ন্তী) প্রমুখের অভিনয়ের প্রশংসা সংবাদপত্রের সমালোচনায় করা হয়েছিল।

১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে গুর্মুখ রায় আত্মীয়স্বজন ও পরিবারের লোকজনের পীড়নে এবং ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে স্টারের স্বত্ব ছেড়ে দিতে চান। বিনোদিনীর জন্যই এই থিয়েটার, তাই তাকেই এর স্বত্ব, অন্তত অর্ধেক স্বত্ব দিতে চান। কিন্তু গিরিশ প্রমুখের প্রতিবন্ধকতায় বিনোদিনী কোনো স্বত্ব পেলেন না। গুর্মুখ রায় হতাশ হয়ে মাত্র এগারো হাজার টাকায় স্টার থিয়েটারের স্বত্ব বিক্রি করে দিলেন স্টারেরই চার জনকে—অমৃতলাল মিত্র, দাসুচরণ নিয়োগী, হরিপ্রসাদ বসু ও অমৃতলাল বসু—১৮৮৪'র জানুয়ারি মাসে। গিরিশ পারিবারিক শর্তের কারণে মালিকানার অংশ নেন নি। দক্ষযজ্ঞ ছাড়া স্টারের অন্য কোনো নাটকে তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অভিনয়ও করেন নি। গুর্মুখ চলে গেলেও বিনোদিনী স্টারে রয়ে গেলেন।

চার জন নতুন মালিকের তত্ত্বাবধানে স্টার আরো চার বছর চলেছিল। গিরিশ রইলেন সর্বেসর্বা হিসেবেই। ম্যানেজার, অভিনয় শিক্ষক, নাট্যকার হিসেবে। এই চার বছরের অভিনয়ের উল্লেখযোগ্য তালিকা :

> ১৮৮৪ : পূর্বের নাটকগুলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অভিনয় করা হয়। তাছাড়া—অভিমন্যুবধ (১৬ মার্চ), কমলেকামিনী (২৯ মার্চ), বৃষকেতু, হীরার ফুল, (২৬ এপ্রিল) চাটুজ্জে-বাঁড়ুজ্জে (অমৃতলাল, ২৬ এপ্রিল), আদর্শ সতী (অতুল মিত্র, ২১ মে), শ্রীবৎসচিন্তা (৭ জুন), চৈতন্যলীলা (২ আগস্ট), প্রহ্লাদ চরিত্র (২২ নভেম্বর), বিবাহ বিভ্রাট (অমৃতলাল, ২২ নভেম্বর)।

এই বছরেও অমৃতলাল বসু, অতুলকৃষ্ণ মিত্র ও দীনবন্ধুর একটি করে নাটক ছাড়া বাকি সব নাটকই গিরিশচন্দ্রের লেখা। এর সবই পৌরাণিক নাটক।

এই বছরে নতুন নাটকের মধ্যে গিরিশের 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয় নানা দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। পুরাণের বিষয় নিয়ে এতদিন নাটক লিখে গিরিশ ধর্মীয় কাহিনী বলছিলেন। চৈতন্যলীলায় শ্রীচৈতন্যের জীবন আশ্রয় করে তিনি এই নাটকে হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানের জয়গান এবং ধর্মীয় ভক্তিবাদের প্রবল স্রোত বইয়ে দিলেন। ধর্ম ও ভক্তির ভাবাবেগে হিন্দুধর্ম ও জাতীয়তাবাদ একাকার হয়ে গেল।

নিমাই—বিনোদিনী এবং নিতাই—বনবিহারিণী, নৃত্যে গীতে ও অভিনয়ে সবাইকে মুগ্ধ করে দিলেন। এই নাটকে সুর সৃষ্টি করেন ও নৃত্য শিক্ষা দেন বেণীমাধব অধিকারী। চৈতন্যলীলা দেখতে আসেন পরমহংস রামকৃষ্ণদেব, ২১ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪। তিনি নাট্যরসের চাইতে ধর্মীয় ভক্তিবাদের উন্মাদনায় আপ্লুত হন এবং অভিনেতা

অভিনেত্রীদের বিশেষ করে চৈতন্যরূপী বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করেন। সমাজে নিন্দিত ও শিক্ষিত মহলে অপাঙ্‌ক্তেয় বাংলা থিয়েটার রামকৃষ্ণের পদার্পণে পবিত্র এবং গৃহিত হতে থাকে।

তাই থেকে বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব অবশ্য স্মরণীয় ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। থিয়েটারের গ্রিনরুমে প্রখ্যাত কোনো নাট্যব্যক্তিত্বের ছবি না থাকলেও শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি অবশ্যই শ্রদ্ধার সঙ্গে রক্ষিত হতে থাকল।

এখানে গিরিশের প্রহ্লাদ চরিত্র তেমন জমেনি। তুলনায় প্রায় একই সময়ে বেঙ্গল থিয়েটারে রাজকৃষ্ণ রায়ের প্রহ্লাদ চরিত্র অনেক বেশি সমাদর পেয়েছিল। স্টারে বরং অমৃতলালের মজার নাটক বিবাহ-বিভ্রাট খুবই আকর্ষণীয় হয়েছিল।

> ১৮৮৫ : চৈতন্যলীলা, ২য় ভাগ (১০ জানুয়ারি), দোললীলা (১ মার্চ), মৃণালিনী (১ এপ্রিল), পলাশীর যুদ্ধ (২৬ এপ্রিল), প্রভাস যজ্ঞ (৩০ মে), বুদ্ধদেবচরিত (১৯ সেপ্টেম্বর)।

এই বছরেও গিরিশের লেখাই প্রায় সব নাটক এবং সবগুলি পৌরাণিক। শুধু বঙ্কিমের উপন্যাসের নাট্যরূপ, নবীনচন্দ্র সেনের কাব্যের নাট্যরূপ দুটি ব্যতিক্রম। অবশ্য এই দুটি নাট্যরূপ গিরিশেরই দেওয়া।

চৈতন্যলীলা প্রথম ভাগের অভিনয়ের সার্থকতায় এবং বিক্রির সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে তার দ্বিতীয় ভাগ নিয়ে অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু আশানুরূপ হলো না। প্রভাস যজ্ঞ কিছুটা চললেও সবচেয়ে সার্থক হল 'বুদ্ধদেবচরিত'। স্যার এডুইন আর্নল্ডের কাব্য 'লাইট অফ এশিয়া' অবলম্বন করে গিরিশ এই নাটকটি লেখেন। অভিনয় করেছিলেন :

> সিদ্ধার্থ—অমৃতলাল মিত্র। শুদ্ধোধন—উপেন্দ্রনাথ মিত্র। বিদূষক—শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য। সুজাতা—প্রমদাসুন্দরী। গোপা—বিনোদিনী।

সৌভাগ্যবশত স্যার আর্নল্ড সে সময়ে কলকাতায় থাকার ফলে নাটকটির অভিনয় দেখেন। তাঁর খুবই ভালো লাগে। তিনি এই অভিনয়ের ও নাটকটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে সংবাদপত্রে চিঠি লেখেন।

> ১৮৮৬ : বিল্বমঙ্গল ঠাকুর (১২ জুন), বেল্লিকবাজার (২৬ ডিসেম্বর), কমলেকামিনী (২৬ ডিসেম্বর)। এছাড়া আগের নাটকগুলিও ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অভিনয় করা হয়েছিল।

এই বছরেও সবই গিরিশের লেখা পৌরাণিক নাটক অভিনীত হয়েছে। তবে সবচেয়ে সফল প্রযোজনা বিল্বমঙ্গল ঠাকুর। এই নাটকেই গিরিশ প্রথম দেখালেন ইন্দ্রিয়জ প্রেম কিভাবে সাধনার পথে ইন্দ্রিয়াতীত প্রেমোন্মাদনায় পরিণত হয়। 'ভক্তমাল' গ্রন্থ থেকে কাহিনী নিলেও গিরিশ তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা, অনুভব এবং রামকৃষ্ণদেবের প্রত্যক্ষ প্রভাবে নতুন করে রচনা করলেন। শুধু ভাবময় চরিত্র সৃষ্টিতেও তিনি অসামান্য কৃতিত্ব দেখালেন। এই নাটকের বড়ো সম্পদ এর গানগুলি। যেমন কথা,

তেমনি সুর এবং নটনটীদের গায়নভঙ্গি। কাহিনী, ভাব, চরিত্র, সঙ্গীত ও অভিনয়ে বিল্বমঙ্গল ঠাকুর একটি সফল প্রযোজনা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। অভিনয়ে ছিলেন--

অমৃতলাল মিত্র (বিল্বমঙ্গল), অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (সাধক), অঘোরনাথ পাঠক (ভিক্ষুক), বিনোদিনী (চিন্তামণি), গঙ্গামণি (পাগলিনী)। পাগলিনী, চিন্তামণি ও বিল্বমঙ্গলের অভিনয় অসামান্য হয়েছিল।

এছাড়াও বেল্লিকবাজারের রঙ্গরস ও ব্যঙ্গ এবং অমৃতলাল বসুর (দোকড়ি সেন) রঙ্গ ও শ্লেষাত্মক অভিনয়ে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। 'বেল্লিকবাজার' প্রসঙ্গে আরো একটি উল্লেখযোগ্য খবর হলো এই নাটকেই বিনোদিনীর মঞ্চে শেষ অভিনয়।

১৮৮৭ : রূপসনাতন (২১ মে), বুদ্ধদেবচরিত ও বেল্লিকবাজার (৩১ জুলাই)।

এই বছর গিরিশেরই সব নাটক অভিনীত হল। নতুন নাটকের মধ্যে রূপসনাতন খুবই সাফল্যলাভ করেছিল। বিশেষ করে শ্রীচৈতন্যের ভূমিকায় অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়ের ভাববিহ্বল অভিনয় সকলকে মুগ্ধ করেছিল।

১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ জুলাই বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটারে শেষ অভিনয়। নাটক বুদ্ধদেবচরিত ও বেল্লিকবাজার। অমৃতলাল বসু অভিনয় শেষে মর্মস্পর্শী ভাষায় দর্শকদের বিদায় সম্ভাষণ জানান।

১৮৮৭ সাল স্টারের পক্ষে ভালো যায়নি। ১৮৮৭-এর ১ জানুয়ারি বিনোদিনী সহকর্মীদের দুর্ব্যবহারে 'স্টার' ছেড়ে দিলেন। স্টারে তাঁর শেষ অভিনয় 'বেল্লিকবাজার'-এর রঙ্গিণীর ভূমিকায়। বিনোদিনী ক্ষুব্ধ ও হতাশ হয়ে শুধু স্টার থিয়েটারই ছাড়লেন না, বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ থেকেই চিরতরে বিদায় নিলেন। তারপরেও তিনি দীর্ঘজীবন বেঁচেছিলেন, কিন্তু কখনোই আর পাদপ্রদীপের আলোয় আসেন নি।

স্টার তখন এমনিতেই ভালো চলছিল না। অন্যদিকে ধনকুবের মতিলাল শীলের নাতি গোপাল লাল শীল থিয়েটার করার সখে মত্ত হয়ে কৌশল করে স্টার থিয়েটারের জমি কিনে নিলেন। স্টারের স্বত্বাধিকারীদের উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হলো। তারা বাধ্য এবং নিরুপায় হয়ে ত্রিশ হাজার টাকায় এই থিয়েটার বাড়ি ছেড়ে দেন গোপাল শীলকে।

বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটারের বাড়িতে গোপাল লাল শীল খুললেন এমারেল্ড থিয়েটার। ৬৮নং বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটারের প্রায় পাঁচ বছরের ইতিহাস শেষ হলো।

বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে ৬৮ নং বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটারের কার্যাবলীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক :

১. মধ্যবিত্ত যে যুবক সম্প্রদায় একটা জাতীয় আবেগে ন্যাশনাল থিয়েটার (১৮৭২) তৈরি করেছিল সেই দলেরই বেশ কিছু ছেলে এই স্টারের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাই স্টার আদি ন্যাশনালেরই ধারাবাহী, উত্তরসূরি। প্রধান শিল্পী ও

কর্মীরা একই। পার্থক্য মালিকানায়। গোড়ার ন্যাশনাল ছিল শিল্পী ও কর্মীদের, স্টার হল একজন মালিকের। থিয়েটারে অনাগ্রহী একজন নটীলোলুপ মালিকের। স্টারের মধ্যে পূর্বতন ন্যাশনালের উত্তরাধিকার ছিল বলেই বাঙালির অনেক আশা ও আকাঙ্ক্ষা তাকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল।

২. স্টারের পূর্বে সব থিয়েটারের নামের মধ্যেই একটা জাতীয়তাবোধের আবেগ ছিল। —ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল, বেঙ্গল ওরিয়েন্টাল প্রমুখ। ১৮৭৬-এর অভিনয়নিয়ন্ত্রণ আইনের ফাঁস চেপে বসার ফলে থিয়েটারে নাট্যাভিনয় ও নাটক থেকে জাতীয়তার আবেগ দূরে সরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে থিয়েটারের নামকরণ থেকেও পূর্বের সেই অনুরাগ ফিকে হয়ে গেল। স্টার থেকেই নামকরণ হতে থাকল অন্য রকম—স্টার, এমারেল্ড, বীণা, মিনার্ভা, ক্লাসিক, কোহিনুর, অরোরা।

৩. এই স্টারেই গিরিশ তাঁর নাট্যকার জীবনের সেরা নাটকগুলি রচনা করেন। চৈতন্যলীলা, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর, বুদ্ধদেব চরিত, রূপসনাতন, প্রহ্লাদচরিত, প্রভাসযুদ্ধ, অভিমন্যুবধ, নলদময়ন্তী প্রভৃতি তার সেরা পৌরাণিক নাটকগুলি এই স্টারের জন্যই লিখিত ও অভিনীত হয়। গিরিশ পূর্ণোদ্যমে পৌরাণিক নাটক রচনা শুরু করেন।

৪. বিনোদিনীর অভিনেত্রী জীবনের সেরা সময়ও এই স্টারেই। নানা চরিত্রে অসামান্য অভিনয় তাঁকে খ্যাতির উচ্চ শিখরে নিয়ে যায়। গিরিশ ও বিনোদিনীর যুগলবন্দী বাংলা থিয়েটারের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।
আবার এই স্টারেই বিনোদিনীর অভিনেত্রী জীবনের শেষ অধ্যায় রচিত হয়ে যায়। খ্যাতির তুঙ্গে থাকতে থাকতেই তিনি এই স্টারেই জীবনের শেষ অভিনয় করেন।

৫. এখানেই 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয় দেখতে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণদেব আসেন।[২] অভিনয় দেখে অভিভূত তিনি 'সোনার আতা ও শোলার আতা'র বিভেদ ভুলে (তাঁর কাছে আসল নকল এক হয়ে গিয়েছিল।) সকলকে আশীর্বাদ করেন। বিশেষ করে চৈতন্যরূপী বিনোদিনীকে 'চৈতন্য হোক' বলে আশীর্বাদ করেন। বিনোদিনীর ঘৃণিত জীবনে এইরকম মহাপুরুষের আশীর্বাদ তাঁকে মোহাবিষ্ট করে তোলে। আধ্যাত্মিক ভাবোন্মাদনা দেখা দেয়। এই সময়েই তার কন্যা শকুন্তলার মৃত্যু, স্টারের সহযোগীদের বিরূপ ব্যবহার, গিরিশের ছলনা ও চক্রান্তের প্রতি অভিমান এবং নতুন আশ্রিত বাবুর থিয়েটারে অভিনয়ের

---

২. বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটারে শ্রীরামকৃষ্ণদেব গিরিশের তিনটি নাটকাভিনয় দেখতে আসেন। চৈতন্যলীলা (২১-৯-১৮৮৪), প্রহ্লাদ চরিত্র (২৪-১২-১৮৮৪), বৃষকেতু ও অমৃতলাল বসুর বিবাহ বিভ্রাট (২৫-২-১৮৮৫)।
রামকৃষ্ণদেবের মৃত্যু : ১৬ আগস্ট, ১৮৮৬

অনিচ্ছা—বিনোদিনীকে বিপর্যস্ত করে তুলছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে তখন থেকেই বিনোদিনী ভক্তির দিকে চলে যেতে থাকেন এবং এক সময়ে অভিনেত্রী জীবন ত্যাগ করে পুরোপুরি আধ্যাত্মিক জীবন চর্চায় নিমগ্ন হন। বাংলা থিয়েটার তাব সেরা অভিনেত্রীর অভিনয় প্রতিভা থেকে বঞ্চিত হয়।

৬. শ্রীরামকৃষ্ণদেব থিয়েটারে আসেন ধর্মভাবের আকর্ষণে। তাতে বাংলা থিয়েটারের লাভ ও ক্ষতি দুটোই হলো।

ক. লাভ। এতোদিন যে থিয়েটার ভদ্র ও ধর্মীয় মানুষের কাছে আপাঙ্‌ক্তেয় ছিল, রামকৃষ্ণদেবের পদার্পণে তা ধন্য ও পবিত্র হলো। এরপর থেকে থিয়েটারের প্রতি মানুষের বিমুখ মনোভাব অনেকাংশে দূরীভূত হল। সামাজিকভাবে থিয়েটার যেন পাঙ্‌ক্তেয় হয়ে উঠল।

খ. ক্ষতি। শ্রীরামকৃষ্ণের পদার্পণে ও আশীর্বাদে বিনোদিনী শুধু নয়, ধীরে ধীরে গিরিশের জীবনেও পরিবর্তন আসে। তাতে তাঁদের ব্যক্তিজীবনে যে শান্তিই আসুক না কেন, বাংলা থিয়েটারের ক্ষতি হয়েছে অপূরণীয়। বিনোদিনী অভিনয় ছেড়ে দিলেন, শৈব গিরিশ 'ভক্ত ভৈরবে' রূপান্তরিত হলেন। এরপর থেকে গিরিশের নাটকে পৌরাণিক বিষয়ের মধ্যে অহৈতুকি ভক্তিবাদ এবং রামকৃষ্ণ-প্রচারিত ভক্তিতত্ত্ব প্রাধান্য পেতে থাকে। এই সময় থেকেই গিরিশের সব নাটকেই, এমন কি সামাজিক, ঐতিহাসিক নাটকেও ভক্তি ধর্মের তারল্য ও রামকৃষ্ণদেবের মতবাদ এবং সেই ধরনের চরিত্র সৃষ্টি হতে থাকে। গিরিশের নাটকের নাট্যগুণ বহুলাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৭. স্টার থিয়েটারে পঁচানব্বই ভাগ নাটকই পৌরাণিক নাটক অভিনীত হয়। পুরাণের বিষয় ও ধর্মীয় ভাব জাতীয় জীবনে উন্মাদনা সৃষ্টি করে। হিন্দুধর্মভাব ও জাতীয়তাবোধ তখন যেন একাকার। রঙ্গক্ষেত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়ে গেল।

৮ স্টার একজন ব্যবসায়ির মালিকানাধীন হয়ে শুরু হলেও ছয় মাসের মধ্যেই অভিনেতা ও কর্মীদের স্বত্বাধীনে চলে আসে। সেইভাবেই চলে। তবে ১৮৭২-এর ন্যাশনাল থিয়েটার শিল্পী ও কর্মী সবাই মিলে চালাত। স্টারে কিন্তু সবাই নয়, নির্দিষ্ট চার জনের মালিকানাতেই চলেছিল।

৯. অনেক হাত ফেরতা হয়ে স্টারের ৬৮নং বিডন স্ট্রীটের বাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তার ওপর দিয়ে 'চিত্তরঞ্জন এভেন্যু' রাস্তা তৈরি হয়েছে।

এমারেল্ড থিয়েটার

৬৮ নম্বর বিডন স্ট্রিট, কলকাতা

উদ্বোধন : ৮ অক্টোবর, ১৮৮৭
স্থায়িত্বকাল : ৮ অক্টোবর, ১৮৮৭ —২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৬।
প্রতিষ্ঠাতা : গোপাল লাল শীল
প্রথম নাটক : পাণ্ডব নির্বাসন (কেদার চৌধুরী)।

৬৮ নম্বর বিডন স্ট্রিটে গুর্মুখ রায় স্টার থিয়েটারের যে বাড়ি তৈরি করেন, গুর্মুখ রায় ছেড়ে দেবার পর সেই থিয়েটার পরবর্তী স্বত্বাধিকারীরা ভালোমত চালাতে না পারলে নীলামে ওঠে। ধনকুবের মতিলাল শীলের নাতি গোপাল লাল শীল থিয়েটার করতে সখ হওয়াতে থিয়েটার বাড়িটি কিনে নেন। স্টারের স্বত্বাধিকারীবৃন্দ বাড়িটি বেচলেও 'স্টার' নামের 'গুডউইল' বেচেননি। তারা ঐ নামে হাতিবাগানে নতুন থিয়েটার খোলেন। আর পুরনো স্টার থিয়েটারের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হলো এমারেল্ড থিয়েটার।

গোপাললাল বাড়িটি কিনে পুরো সংস্কার করান। প্রচুর খরচ করে ডায়নামো বসিয়ে ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা করেন। বাংলা রঙ্গালয়ে তখন গ্যাসের বাতি জ্বলছে। এমারেল্ডেই প্রথম বিজলি আলোর প্রবর্তন করা হয়। আলো ঝলমল চকচকে এই সাজানো গোছানো নাট্যশালার ম্যানেজার হলেন কেদার চৌধুরী। তিনি একাধারে ম্যানেজার, নাট্যকার ও পরিচালক হিসেবে এখানে কাজ শুরু করেন। অভিনেতৃ দলে রইলেন—অর্ধেন্দুশেখর, ধর্মদাস সুর, রাধামাধব কর, মতিলাল সুর, মহেন্দ্রলাল বসু, ক্ষেত্রমণি, বনবিহারিণী, কিরণশশী প্রমুখ।

১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দের ৮ অক্টোবর এমারেল্ডের উদ্বোধন হল, কেদার চৌধুরীর লেখা 'পাণ্ডব নির্বাসন' নাটক দিয়ে। দৃশ্যপট ও সাজসজ্জার দায়িত্বে রইলেন জহরলাল ধর এবং সুকুমারী ও শশিভূষণ দেব।

একাধিকবার সাফল্যের সঙ্গে 'পাণ্ডব নির্বাসন' অভিনয়ের পর এখানে অভিনীত হল রবীন্দ্রনাথের নাটক। ১৮৮৭-র ২৬ অক্টোবর 'বউ ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'রাজা বসন্ত রায়'। কেদার চৌধুরীর এই নাট্যরূপ এর আগেই ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনয় করানো হয়েছিল (৩-৭-১৮৮৬)। এমারেল্ডে কেদার চৌধুরী আবার রবীন্দ্রনাথের কাহিনীর নাট্যরূপটি অভিনয়ের ব্যবস্থা করলেন। মোটমুটি চলল। আবার অভিনীত হল 'পাণ্ডব নির্ব্বাসন'। তারপর আনন্দকানন, মদনভস্ম প্রভৃতি অভিনয়ের পর দেখা গেল এমারেল্ডের অবস্থা ভালো নয়।

গোপাল শীল তখন কেদার চৌধুরীর পরিবর্তে গিরিশচন্দ্রকে ম্যানেজার হিসেবে নিয়ে আসার চেষ্টা করলেন। গিরিশ তখন নাট্যপরিচালক ও ম্যানেজার হিসেবে প্রচুর

খ্যাতি পেয়েছেন। নাট্যকার হিসেবেও তার নাটকগুলি জনসমাদর পাচ্ছিল। গিরিশকে এনে এমারেল্ডকে নতুন করে চালাবার চেষ্টা করলেন গোপাললাল। গিরিশ প্রথমে সম্মত না হলেও, পরে স্টারের স্বত্বাধিকারীদের সঙ্গে আলোচনা করেই তিনি এমারেল্ডে যোগ দিলেন। স্টারে তখন অর্থসঙ্কট চলছে। গিরিশ এমারেল্ডে যোগ দিলেন ৫ বছরের চুক্তিতে, ২০ হাজার টাকার বোনাস এবং মাসিক ৩৫০ টাকা বেতন। বোনাসের টাকা থেকে তিনি ১৬ হাজার টাকা স্টারকে বিনাশর্তে দিয়ে দেন নতুন বাড়ি তৈরির জন্য। ১৯ নভেম্বর, ১৮৮৭ থেকে গিরিশ হলেন এমারেল্ডের ম্যানেজার।

'নীলদর্পণ' নাটক দিয়ে গিরিশ এখানে কাজ শুরু করলেন। তারপরে সীতার বনবাস। তারপর সীতাহরণ, দীনবন্ধুর নবীন তপস্বিনী, গিরিশের মায়াতরু। শেষের দুটি খুবই জনসমাদর লাভ করল।

গিরিশ এমারেল্ডে যোগ দিয়েই রবীন্দ্রনাথ এবং কেদার চৌধুরীর পূর্ব অভিনীত নাটকগুলি বন্ধ করে দেন। গিরিশ যোগ দেওয়ার আগে এখানে রবীন্দ্রনাথের 'রাজা বসন্ত রায়' অভিনীত হয়েছিল। বেশ কয়েকবার। দায়িত্ব নেওয়ার দিনও (২০ নভেম্বর, ১৮৮৭) 'রাজা বসন্ত রায়' অভিনীত হয়েছিল। গিরিশ যতদিন এমারেল্ডে ছিলেন তত দিন রবীন্দ্রনাথের এই নাট্যরূপটি বা অন্য কোনো নাটক অভিনীত হয়নি। আবার গিরিশ যেই চলে গেলেন (৩ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৯) তারপরেই 'রাজা বসন্ত রায়' এখানে অভিনীত হল (৭ এপ্রিল, ১৮৮৯), 'রাজা ও রানী' (৭ জুন, ১৮৯০), খ্যাতির বিড়ম্বনার পরিবর্তিত নাম 'দুকড়ি দত্ত' (৬ এপ্রিল, ১৮৯৫) এখানে সমাদরের সঙ্গে অভিনীত হয়। গিরিশ থাকাকালীন এমারেল্ডে রবীন্দ্রনাথের কোনো নাটক আর অভিনীত হয়নি।

প্রতাপ জহুরির ন্যাশনাল থিয়েটারে গিরিশ 'দায়ে পড়ে' নাটক লেখা শুরু করেছিলেন। এমারেল্ডে চাপে পড়ে গিরিশ তাঁর নাট্যব্যক্তিসত্তায় অভ্যস্ত হয়ে পড়লেন। নাট্যকার, পরিচালক, অভিনেতা ও ম্যানেজারের চতুর্বিধ দায়িত্ব পালনে গিরিশের পেশাদারি কুশলতা তখন তাঁকে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে নিয়ে গেছে। গিরিশ ছাড়া কোন রঙ্গ-মঞ্চই তখন ভালভাবে চলতে পারত না। আবার গিরিশকে নিলে একজনের মাধ্যমেই মঞ্চে চাররকমের কার্যসমাধা হয়। ফলে সব মালিকই গিরিশকে পেতে আগ্রহী হয়ে পড়েছিল। তাঁকে অমান্য করার সাহস ছিল না।

এখানে গিরিশ সীতার বনবাস অভিনয় করালেন। বঙ্কিমের মৃণালিনী উপন্যাসের নাট্যরূপ, এবং মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্যের নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করালেন। তারপর নিজের নাটক 'পূর্ণচন্দ্র' করলেন। এমারেল্ডের ভাগ্য ফিরে গেল। জনসমাগমে এমারেল্ড গমগম করতে লাগল। এই সময়েই গিরিশের সঙ্গে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফিও এখানে যুক্ত হলেন। নবীন তপস্বিনীতে জলধরের ভূমিকায় অর্ধেন্দু আবার দর্শকদের মাতিয়ে দিলেন। মহাসমারোহে গিরিশের নেতৃত্বে এমারেল্ড চলতে লাগল। দীনবন্ধুর

'নীলদর্পণ' ও 'জামাইবারিক' ঘুরে ঘুরে অভিনয় হতে লাগল। মধুসূদনের প্রহসন দুটি— 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ' অভিনীত হলো। বঙ্কিমের উপন্যাস আনন্দমঠ, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল—প্রভৃতির নাট্যরূপ অভিনয় করে বাংলা থিয়েটারে নতুন মাত্রা সঞ্চার করা হলো।

এমারেল্ডের এই রমরমা অবস্থার মধ্যেই গোপাল লালের থিয়েটারের শখ মিটে গেল। তিনি থিয়েটার ছেড়ে দিলেন। মতিলাল সুর, পণ্ডিত হরিভূষণ ভট্টাচার্য, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, ব্রজনাথ মিত্রকে থিয়েটার বাড়ি লিজ দিয়ে দিলেন, ৩ ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৯।

অর্ধেন্দুশেখর আগেই এমারেল্ড ছেড়ে চলে যান (৩০-৯-১৮৮৮) এবং মতিলাল সুর সহকারী ম্যানেজার হিসেবে গিরিশের সঙ্গে কাজ করছিলেন। গোপাললাল এই অবস্থায় তাঁর থিয়েটার মতিলাল ও অন্যান্যদের লিজ দিয়ে চলে যান। এর ফলে গিরিশের সঙ্গে গোপাললালের চুক্তি আর কার্যকরী রইলো না। গিরিশ আবার স্টারে যোগ দিলেন। গিরিশ এমারেল্ডে ছিলেন ১৯ নভেম্বর, ১৮৮৭ থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৯ পর্যন্ত। অর্ধেন্দুশেখর এই সময়ে (মার্চ, ১৮৮৯) আবার এমারেল্ডে যোগ দিয়ে 'বক্কেশ্বর' প্রহসনে বক্রেশ্বরের ভূমিকায় অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেন।

দেখা গেল, নতুন মালিকেরাও এমারেল্ড ভালভাবে চালাতে পারলেন না। অবস্থা আবার খারাপ। গোপাললাল তাঁর তৈরি থিয়েটারের দুরবস্থা সহ্য করতে না পেরে আবার এমারেল্ডের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, ৮ এপ্রিল, ১৮৮৯। এবং ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত এখানে অভিনয় বন্ধ রাখলেন। রঙ্গমঞ্চের ভিতরকার এবং থিয়েটারের আর সব দিকের অবস্থা গুছিয়ে নিয়ে পুনরায় অভিনয় চালু করলেন। পরিচালক হিসেবে এবার যোগ দিলেন প্রবীণ নাট্যকার মনোমোহন বসু, ঐ ২৭ এপ্রিল থেকে। নাট্যকার হিসেবে অতুলকৃষ্ণ মিত্রও এমারেল্ডে যুক্ত ছিলেন। গিরিশের পর অতুলকৃষ্ণই মুখ্যত এমারেল্ডের নাট্যকার ছিলেন। কয়েকদিন বাদে, ৪ মে, কেদার চৌধুরীকে আবার ম্যানেজার করে আনা হল। তবে কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি (৩ নভেম্বর) কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যান। অতুলকৃষ্ণ এরপর থেকে (১৭ জানুয়ারি, ১৮৯০) বিজনেস ম্যানেজার হিসেবে পাকাপাকিভাবে নিযুক্ত হলেন।

বোঝাই যায়, গিরিশ চলে যাওয়ার পর ছন্নছাড়া এমারেল্ডকে গোছাতে একটু সময় লাগল। একা গিরিশের বদলে সেখানে নাট্যকার হিসেবে অতুল মিত্র, পরিচালক হিসেবে মনোমোহন এবং ম্যানেজার হিসেবে কেদার চৌধুরীকে রাখতে হল। এবার পূর্ণোদ্যমে এমারেল্ড আবার চলতে লাগল। এবার গিরিশের বদলে অতুল মিত্রের নাটক ও প্রহসনগুলি অভিনীত হতে থাকল। নন্দ বিদায়, গাধা ও তুমি, বক্কেশ্বর, গোপীগোষ্ঠ, ভাগের মা গঙ্গা পায় না প্রভৃতির অভিনয় হল। তারপর মনোমোহন বসুর 'রাসলীলা' দিয়ে নবোদ্যমে এমারেল্ড চলতে লাগল। ১৮৮৯ ভালভাবেই কেটে গেল এমারেল্ডের।

এমারেল্ডেই রবীন্দ্রনাথের লেখা নাটক 'রাজা ও রানী'র প্রথম অভিনয় হয় ৭ জুন, ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে। রাজা বসন্ত রায় তো আগেই অভিনীত হয়েছিল। পরে (৬ এপ্রিল,

১৮৯৫) এখানে রবীন্দ্রনাথের প্রহসন 'খ্যাতির বিড়ম্বনা'র পরিবর্তিত নামে 'দুকড়ি দত্ত' বেশ সমাদরের সঙ্গে অভিনীত হয়।

এমারেল্ডে ১৮৮৭ থেকে ১৮৯০ পর্যন্ত অভিনয়ের সংক্ষিপ্ত তালিকা :

১৮৮৭-৮৮ : পাণ্ডব নির্বাসন (কেদার চৌধুরী), রাজা বসন্ত রায় (বৌ ঠাকুরানীর হাট উপন্যাসের নাট্যরূপ : কেদার চৌধুরী), আনন্দকানন (লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী), সীতার বনবাস, সীতাহরণ, মায়াতরু, পূর্ণচন্দ্র, বিষাদ (সবগুলি গিরিশ), নীলদর্পণ (দীনবন্ধু), নবীন তপস্বিনী (দীনবন্ধু), বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা (মধুসূদন), তুলসীলীলা, নন্দ বিদায়, গাধা ও তুমি (সবকটি অতুল মিত্র)।

১৮৮৯-৯০ : বক্কেশ্বর, ভাগের মা গঙ্গা পায় না, ষণ্ড, বুড়ো বাঁদর (সবগুলি অতুল মিত্র), আনন্দকুমার (পুলিশ এই নাটকটির অভিনয় কয়েক রাত্রির পর বন্ধ করে দেয়), নবীন তপস্বিনী (দীনবন্ধু), রাজা ও রানী (রবীন্দ্রনাথ)। এছাড়া এই কয় বছরে মেঘনাদবধের নাট্যরূপ (: গিরিশ), আনন্দমঠ উপন্যাসের নাট্যরূপ (: গিরিশ), মৃণালিনী উপন্যাসের নাট্যরূপ (: গিরিশ), বিষবৃক্ষ (: নাট্যরূপ অতুল মিত্র), কপালকুণ্ডলা (: নাট্যরূপ অতুল মিত্র) এখানে অভিনীত হয়েছিল।

১৮৯০-এর পর থেকে এমারেল্ডের অবস্থা আবার খারাপ হয়ে গিয়েছিল। পুরনো নাটকগুলির অভিনয়ের মাধ্যমে থিয়েটার তার অভিনয়ের ধারা অব্যাহত রাখার চেষ্টা চালিয়ে যায়।

১৮৯৩-এর ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে অতুল মিত্র এবং মহেন্দ্রলালবাবু 'লেসি' হন। ধারদেনা করে তারাও অভিনয় চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। না পেরে শেষ পর্যন্ত অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফিকে 'লেসি' করা হয়। ম্যানেজার হন মতিলাল সুর। অর্ধেন্দুশেখর এবার নিজ মালিকানায় এমারেল্ড থিয়েটার চালাতে থাকেন।

১৮৯৪-এর ২২ সেপ্টেম্বর অতুল মিত্রের 'মা' অভিনয়ের মধ্য দিয়েই অর্ধেন্দুশেখর তথা এমারেল্ড থিয়েটার নতুনভাবে জেগে ওঠে। অর্ধেন্দুশেখর নিজেই নাট্যশিক্ষক ও অভিনেতা হিসেবে বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। তারই চেষ্টায় মৃতপ্রায় এমারেল্ড আবার জেগে ওঠে। তিনি শক্ত হাতে এই ভেঙ্গে-পড়া থিয়েটারকে পুনর্জীবিত করার চেষ্টা করেন। নিজ স্বত্বাধিকারিত্বে বেশ কয়েকমাস এমারেল্ড চালিয়েছিলেন। 'মা' দিয়ে শুরুর পর বৈকুণ্ঠনাথ বসুর 'মান' (৪ ডিসেম্বর, ১৮৯৪), রাজা বসন্ত রায় (জানুয়ারি, ১৮৯৫), আবুহোসেন (গিরিশ, জানুয়ারি, ১৮৯৫) এমারেল্ডে রমরম করে চলতে থাকে। 'অনুশীলন' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল : 'বাবু অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফির প্রশংসা এই, তিনি প্রায় এই নতুন সম্প্রদায়কে এমন সুশিক্ষিত করিয়াছেন যে, কার সাধ্য নবশিক্ষিত সম্প্রদায় বলিয়া কল্পনাতেও আনিতে পারেন।'

নাটক-পাগল অর্ধেন্দুশেখর নাট্যাভিনয় নিয়ে যত মাথা ঘামাতেন, থিয়েটার ব্যবসা তার কিছুই বুঝতেন না। ফলে অভিনয়গুলি প্রচুর দর্শক আকর্ষণ করলেও, শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অভিজ্ঞতার অভাবে কিছুদিনের মধ্যেই এমারেল্ডের আর্থিক অনটন দেখা দিতে শুরু করল। তখন নিরুপায় হয়ে এমারেল্ড থিয়েটারের মালিকানা হস্তান্তর করা হল বি. ডি. কোম্পানীর মালিক বেনারসী দাসকে। তিনি আর্থিক দায়িত্ব থেকে থিয়েটারকে বাঁচালেন। সেখানে ম্যানেজার ও নাট্যশিক্ষক ও অভিনেতা হয়ে কাজ চালাতে লাগলেন অর্ধেন্দুশেখর।

বেনারসী দাস মালিক হলেন ১০ নভেম্বর, ১৮৯৫ থেকে। সেদিন থেকে 'কপালকুণ্ডলা' অভিনয় শুরু হলো। এমারেল্ড আবার নবোদ্যমে চালু হলো। এই বছরে উল্লেখযোগ্য অভিনয় হল রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্যাস 'বঙ্গবিজেতা'র নাট্যরূপ (১৪ ডিসেম্বর), রবীন্দ্রনাথের 'খ্যাতির বিড়ম্বনা'র পরিবর্তিত নাম দুকড়ি দত্ত, ক্ষীরোদপ্রসাদের ফুলশয্যা, কপালকুণ্ডলার নাট্যরূপ ও অতুল মিত্রের পুরনো নাটক ভাগের মা গঙ্গা পায় না।

এমারেল্ডের শেষ অভিনয় : ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৬। নাটক—কপালকুণ্ডলা ও ভাগের মা গঙ্গা পায় না। তারপর থেকেই এমারেল্ড থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়। তারপরে এই থিয়েটার বাড়ি ভাড়া নিয়ে এখানে খোলা হয় 'সিটি সম্প্রদায়', ২০ জুন থেকে। ১৮৯৭-এর প্রথম দিকে সিটি থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেলে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় ক্লাসিক থিয়েটার।

১. বাংলা সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পনের বছরের মধ্যেই এমারেল্ড থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। মালিকানাধীন এই থিয়েটার পেশাদার সাধারণ রঙ্গালয় হিসেবেই পরিচালিত হয়েছিল। ছিমছাম সুন্দর রঙ্গালয়, বিজলি আলোর ব্যবস্থা এবং ধারাবাহিক অভিনয়ের সূত্রে এমারেল্ড একটি উল্লেখযোগ্য নাট্যশালারূপে পরিগণিত হয়েছিল।
২. যদিও মোটামুটি দশবছর এর আয়ুষ্কাল, তাহলেও এই মঞ্চে নাট্যকার হিসেবে কেদার চৌধুরী, গিরিশচন্দ্র, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, মনোমোহন বসু যুক্ত থেকে নাটক রচনা করেছেন।
৩. এমারেল্ড থেকেই গিরিশ তাঁর অভিনেতা ও নাট্য পরিচালক সত্তার পূর্ণ আবিষ্কার করেছিলেন। নাট্য রচয়িতা হিসেবেও নিজেকে অনেকখানি তৈরি করে নিতে পেরেছিলেন। ফলত হাতিবাগানের স্টারে ফিরে গিয়ে গিরিশ সম্ভাবনার দিকগুলিকেই পূর্ণ বিকশিত করে তুলতে পেরেছিলেন।
৪. এমারেল্ড মঞ্চেই বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ঔপন্যাসিকদের প্রসিদ্ধ উপন্যাসগুলির নাট্যরূপ প্রায়শই অভিনীত হয়ে বাংলা নাটকের বিষয়ের বিস্তার ঘটিয়েছিল।

৫. এমারেল্ডই প্রথম সাহসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি অভিনয়ের ব্যবস্থা করে। রাজা ও রানী, রাজা বসন্ত রায়, দুকড়ি দত্ত প্রমুখ নাটকে, নাট্যরূপ ও প্রহসনের অভিনয় বহুবার হয়ে দর্শক রুচিতে ভিন্ন স্বাদের সঞ্চার করেছিল।

৬. গিরিশচন্দ্র. অর্ধেন্দুশেখর, কেদার চৌধুরী, মতিলাল সুর, মনোমোহন বসু, মহেন্দ্রলাল বসু প্রমুখ প্রথিতযশা অভিনেতা-পরিচালকদের সহযোগিতায় এমারেল্ড থিয়েটারের দশ বছরের অভিনয়ের ধারায় উন্নত মানের সৃষ্টি হয়েছিল।

৭ মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের নাট্যরূপ এবং প্রহসন দুটির এখানে যেমন অভিনয় হয়েছিল, তেমনি মধুসূদনের সমাধিস্তম্ভ নির্মাণের জন্য এই থিয়েটার উদ্যোগী হয়ে ৩ মার্চ, ১৮৮৮, মধুসূদনের বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ এবং গিরিশের মায়াতরু অভিনয় করে। অভিনয়ের বিক্রীত অর্থ সমাধিস্তম্ভ নির্মাণের জন্য তারা দান করেন।

৮. দশ বছরের সময়কালে এমারেল্ড নানা ভাবের ও স্বাদের এবং বিভিন্নমুখী বিষয়ের নাটক উপহার দিয়েছে, একাধিক নাট্যকার ও তাঁদের নাটক রচিত ও অভিনীত হবার দায়িত্ব নিয়েছে। হাল্কা রং তামাশা বা শুধুমাত্র নৃত্যগীতের ফোয়ারা ছুটিয়ে দর্শককে সস্তা খুশিতে ভরিয়ে দেবার চেষ্টা করেনি।

৯. সেকালের থিয়েটারের তিন প্রধান ব্যক্তিত্ব গিরিশ, অর্ধেন্দুশেখর ও কেদার চৌধুরীর সাহায্য ও সহযোগিতা লাভে এমারেল্ড পরপর এগিয়ে যেতে পেরেছে।

এমারেল্ড তার দশ বছরের বিভিন্নমুখী কার্যাবলীর মাধ্যমে বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসে স্মরণীয় অধ্যায় রচনা করেছে। বড়লোকের নাতির শখ-শৌখিনতায় এমারেল্ড হারিয়ে যায়নি।

বীণা থিয়েটার ও রাজকৃষ্ণ রায়

৩৮ নম্বর মেছুয়াবাজার রোড, ঠনঠনিয়া, কলকাতা

প্রতিষ্ঠা : ১০ ডিসেম্বর, ১৮৮৭
প্রতিষ্ঠাতা : রাজকৃষ্ণ রায়
নাটক : চন্দ্রহাস অথবা দ্বিতীয় প্রহ্লাদ (রাজকৃষ্ণ রায়)।

স্থায়িত্বকাল : ১০ ডিসেম্বর, ১৮৮৭— ডিসেম্বর, ১৮৯০।

কলকাতার ৩৮ নম্বর মেছুয়াবাজার রোডে কবি ও নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-১৮৯৪) তাঁর বীণা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। কবি হিসেবে খ্যাতি ছিলই, নাট্যকার হয়েছেন রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে ও তাগিদে। বীণা নামে তাঁর নিজের ছাপাখানা ছিল, সেখান থেকে বীণা নামে পত্রিকাও প্রকাশ করতেন। রঙ্গমঞ্চের নামও রাখলেন বীণা থিয়েটার।

রাজকৃষ্ণ রায় ভালো অভিনেতা ছিলেন। মাহেশ ও কলকাতায় তিনি বেশ কিছু অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন। কলকাতায় আর্য নাট্যসমাজে তিনি নিজের নাটক 'প্রহ্লাদ চরিত্র'-এ হিরণ্যকশিপুর ভূমিকায় নৈপুণ্য দেখান। ইংরেজি ও বাংলা সংবাদপত্রে এই অভিনয়ের উচ্চ প্রশংসা করা হয়।

অতিমাত্রায় উৎসাহিত হয়ে তিনি নিজের থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। আর্থিক সঙ্গতি তেমন না থাকাতে রঙ্গমঞ্চটি খুব সুদৃশ্যভাবে গড়ে তোলা যায়নি। দৃশ্যপটও মহামূল্যের ছিল না—যদিও পারিপাট্য ছিল। বাইরের চাকচিক্যও তেমন ছিল না। তখনকার খ্যাতিমান নট-নটীদেরও তিনি সংগ্রহ করতে পারেন নি। আর্য নাট্যসমাজের সঙ্গে যোগ থাকার ফলে সেখান থেকেই অভিনেতাদের সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি তাঁর রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রী গ্রহণ করেননি। অথচ তখন কলকাতার সব মঞ্চেই অভিনেত্রীরাই নারী ভূমিকায় অংশগ্রহণ করছে। অভিনেত্রীপূর্ণ বাংলা থিয়েটারের সেই যুগে রাজকৃষ্ণ অভিনেত্রীদের বাদ দিয়েই অভিনয় করতে চেয়েছিলেন। কিছু নীতিবাগীশ মানুষ ও পত্র-পত্রিকা তাঁকে এই কার্যে স্বাগত সমর্থন জানিয়েছিলেন সমাজনীতির কারণে। নাট্যাভিনয়ের পক্ষে তখন অভিনেত্রীদের বাদ দিয়ে থিয়েটার চালানো অসম্ভব ছিল।

রাজকৃষ্ণ রায় ছিলেন 'বীণা'-র মালিক ও নাট্য পরিচালক। মূল নাট্যকারও তিনি। অভিনয়েও অংশগ্রহণ করেছেন।

১০ ডিসেম্বর ১৮৮৭, রাজকৃষ্ণের লেখা 'চন্দ্রহাস' (বা দ্বিতীয় প্রহ্লাদ) নাটক দিয়ে 'বীণা'-র উদ্বোধন হল। পরপর কয়েক রাত্রি 'চন্দ্রহাস' অভিনয়ের পর প্রহ্লাদ চরিত্র (৩১ ডিসেম্বর) দুর্গেশনন্দিনী, ভণ্ড দলপতি দণ্ড (২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৮) অভিনয় হয়।

রাজকৃষ্ণের লেখা চতুরালী (হায়-হায়, একি শুনি ভাই / আটক পড়েছে আমার বিনোদিনী রাই) এবং চন্দ্রাবলী গীতিনাট্যের (তুমি যে কত ভাল / চিকন কালো / বলব কত একটি মুখে) গান দুটি সে সময়ে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। 'প্রহ্লাদ চরিত্র'ও খুব প্রশংসা পেয়েছিল। অভিনয়ে ছিলেন : প্রহ্লাদ—শরৎ কর্মকার। যণ্ড—অক্ষয়কালী কোঙার। হিরণ্যকশিপু—রাজকৃষ্ণ। সার্থক অভিনেতার সব গুণই রাজকৃষ্ণ রায়ের অভিনয়ে লক্ষ্য করেছিল 'ইন্ডিয়ান মিরর' পত্রিকার নাট্য সমালোচক।

পত্রপত্রিকা প্রশংসা করে উৎসাহিত করলেও দর্শক সমাগম ক্রমেই হ্রাস পেতে থাকল। এই সময়ে কিছু ধনী ব্যক্তি অর্থ দিয়ে রাজকৃষ্ণকে সাহায্য করেছিলেন, যাতে বারাঙ্গনাবিহীন নৈতিকতার এই থিয়েটার টিকতে পারে। তা সত্ত্বেও দর্শক অভাবে রাজকৃষ্ণের আর্থিক সঙ্কট প্রবলতর হল। অভিনেতারা সব অবৈতনিক, তা সত্ত্বেও থিয়েটারের আনুষঙ্গিক খরচ যোগানোও সম্ভব হচ্ছিল না। গিরিশচন্দ্র লিখেছেন : 'স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ রায় বালক লইয়া অভিনয় করিতে গিয়া বহু আয়াস-সঞ্চিত সম্পত্তি বিনাশ করিয়াছিলেন।'

কয়েকমাস থিয়েটার চালিয়েই ঋণগ্রস্ত রাজকৃষ্ণ দেনা শোধের আশায় বীণা থিয়েটার ভাড়া দিলেন 'আর্য নাট্যসমাজ'কে।

১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস থেকে বীণা থিয়েটারে আর্য নাট্যসমাজ অভিনয় শুরু করে। রাজকৃষ্ণ নিজেও আর্য নাট্যসমাজের নাটকগুলিতে অভিনয়ে অংশ নিতেন। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফিও কিছুদিন এখানে যুক্ত থেকে অভিনয় করেন। সব চেষ্টাতেও তারা সফল হতে পারল না। ১৮৮৮-এর নভেম্বর মাসেই আর্য নাট্যসমাজ তাদের অভিনয় বন্ধ করে দেয়।

ঋণগ্রস্ত রাজকৃষ্ণ বীণা থিয়েটার ভাড়া দিলেন এবার উপেন্দ্রনাথ দাসকে। নাটক করার জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে অভিযুক্ত উপেন্দ্রনাথ এতদিন বিলেতে ছিলেন। বিলেত থেকে ফিরে এখানে তিনি 'নিউ ন্যাশনাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু শত উদ্যম সত্ত্বেও তিনি অসফল হলেন এবং ১৮৮৮-এর ডিসেম্বর থেকে ১৮৮৯-এর মার্চ পর্যন্ত থিয়েটার চালিয়ে তিনি বিদায় নিলেন। রাজকৃষ্ণ রায় এবার নিজেই বীণা থিয়েটার চালাবার চেষ্টা করলেন। শুরু হল বীণা থিয়েটারের দ্বিতীয় পর্যায়।

এবার আর তিনি আগের মতো ভুল করলেন না। সব আদর্শ বর্জন করে তিনি তাঁর থিয়েটারে অভিনেত্রী গ্রহণ করলেন। তখনকার খ্যাতিময়ী অভিনেত্রী তিনকড়িকে মাত্র কুড়ি টাকা বেতনে নিয়ে এলেন। অন্য অভিনেত্রীও নেওয়া হল। আর্য নাট্যসমাজের অভিনেতারা তার সঙ্গে যোগ দিলেন।

শনিবার ২০ জুলাই, ১৮৮৯ রাজকৃষ্ণ রায়ের দ্বিতীয় প্রচেষ্টার বীণা থিয়েটার উদ্বোধন হল। নাটক, তাঁরই লেখা 'মীরাবাঈ'। অভিনয় করলেন : তিনকড়ি দাসী—মীরাবাঈ। অক্ষয়কালী কোঙার—রাণা কুম্ভ। এই নাটকে, রাজকৃষ্ণের লেখা গান : 'খেলার ছলে হরিঠাকুর গড়েছেন এই জগৎখানা'—খুবই জনপ্রিয় হয়। এখানে সম্ভবত

তিনি মাইক্রোফোনে নেপথ্য সঙ্গীতগুলি পরিবেশন করেছিলেন। অনুসন্ধান পত্রিকা (৩০-৭-১৮৮৯) লিখেছিল : 'কোথায় গান হইতেছে অথচ বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াযোগে সেই গান দর্শকের কানের কাছে কে যেন আসিয়া গাহিয়া যাইতেছে—এই যে সুন্দর কৌশলটি, এটি বাঙ্গালার থিয়েটারে সম্পূর্ণ নূতন।' ষ্টেটসম্যান পত্রিকার বিজ্ঞাপনে (২০-৭-১৮৮৯) রাজকৃষ্ণ জানিয়েছিলেন : 'Special attraction–songs by scientific process'.

মীরাবাঈয়ের ভূমিকায় তিনকড়ি'র অভিনয় খুবই প্রশংসা পায়। তবে কিছু পত্রিকা অভিনেত্রী নেওয়ার জন্য রাজকৃষ্ণের তীব্র নিন্দা করে। কিন্তু দর্শক আনুকূল্যের জন্য রাজকৃষ্ণ বীণা থিয়েটারের দ্বিতীয় পর্যায়ে অভিনেত্রী নিয়েই অভিনয় চালিয়ে গেলেন। এবং মীরাবাঈ বহুবার অভিনীত হয়ে জনসম্বর্ধনা লাভ করেছিল।

১৮৮৯-তে লীলাবতী (৩ আগস্ট), শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষা (১৪ সেপ্টেম্বর), সধবার একাদশী (২২ সেপ্টেম্বর), চমৎকার (১৬ নভেম্বর), রুক্মিণীহরণ ও খোকাবাবু (১৪ ডিসেম্বর), ঘোষের পো (১৬ ডিসেম্বর) মহাসমারোহে অভিনীত হল।

১৮৯০-তে ডাক্তারবাবু, উভয় সঙ্কট (৪ জানুয়ারি), চন্দ্রহাস, হরধনুভঙ্গ (৫ জানুয়ারি), রাজা বিক্রমাদিত্য (১১ জানুয়ারি), চন্দ্রাবলী (২৬ জুলাই), প্রহ্লাদচরিত্র (১ নভেম্বর) লোভেন্দ্র-গবেন্দ্র (২ নভেম্বর), চতুরালী (৮ নভেম্বর) প্রভৃতি নাটক অভিনীত হল। এর মধ্যে সধবার একাদশী, লীলাবতী, উভয় সঙ্কট ছাড়া বাকি সব নাটকই রাজকৃষ্ণের লেখা। পরিচালক তিনি, মঞ্চ-মালিক তো বটেই! দ্বিতীয় পর্যায়ের 'বীণা'কে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য রাজকৃষ্ণ সচেষ্ট ছিলেন। অভিনেত্রী নেওয়া, ভালো অভিনেতা সংগ্রহ—এসবও তিনি করেছিলেন। তাছাড়া থিয়েটারের দর্শনী মূল্য খুব কম করে ধার্য করেছিলেন। যাতে সাধারণ দর্শক অতি সহজেই তাঁর রঙ্গালয়ে নাটকগুলি দেখতে আসতে পারে। এইভাবে তিনিই রঙ্গালয়ে প্রথম 'চীপ থিয়েটারে'র প্রবর্তন করেন। ১৫ মার্চ, ১৮৯০-এর ষ্টেটসম্যান পত্রিকার বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় : সোমবার বাদে রোজ বীণাতে অভিনয় হত। প্রবেশ মূল্য ছিল—এক আনা, দু আনা, তিন আনা, চার আনা, পাঁচ আনা[১]। মহিলাদের জন্য দু আনা, মহিলা বক্স—দু টাকা (ছয় জন), রয়েল বক্স—দশ টাকা (আট জন)। টিকিটের মূল্য হ্রাস করতে করতে রাজকৃষ্ণ এক আনা এবং দুই আনা পর্যন্ত নামিয়ে এনেছিলেন।

তাছাড়া নিত্য নতুন নাটক নামিয়ে, খ্যাতি পাওয়া নাটকগুলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অভিনয়ের ব্যবস্থাও করেছিলেন। মঞ্চে থিয়েটারি কৌশল ব্যবহার করে দর্শক আকর্ষণের চেষ্টা করেছিলেন। মঞ্চের দৃশ্য সুন্দর ও মনোহর করেছিলেন। একই রাতে একাধিক নাটক একই দর্শনী দিয়ে দেখাবারও ব্যবস্থা করেন।

কিন্তু কোনো ভাবেই রাজকৃষ্ণ ঋণভার থেকে মুক্তি পেলেন না। অভিনেত্রী না থাকাতে প্রথম পর্যায়ের বীণা ভালো চলেনি, দ্বিতীয় পর্যায়ে ভালো চলেছিল। কিন্তু রাজকৃষ্ণের ব্যবসায়িক বুদ্ধি পাকাপোক্ত না হওয়াতে এবং দর্শনী মূল্য খুবই কম

১. তখন ১৬ আনায় ১ টাকা এবং ৪ পয়সায় ১ আনা ছিল।

হওয়াতে এবারও রাজকৃষ্ণ তাঁর থিয়েটারে লাভের মুখ দেখতে পেলেন না। বরং ঋণভারে আরো জর্জরিত হয়ে পড়লেন।

অনুসন্ধান পত্রিকা মারফৎ (২৯-১১-৯০) তিনি জনসাধারণের কাছে আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানালেন। তাতেও সাড়া মেলেনি। দারিদ্র্য, দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তায় একেবারে হীনবল হয়ে পড়েন। স্টার থিয়েটারের আমন্ত্রণে তখন তিনি স্টারের নাট্যকার হিসেবে নিযুক্ত হলেন, মাস মাইনে একশো টাকা (১৮৯১-এর ১৫ ফেব্রুয়ারি)। সেখানে তাঁর বেশ কয়েকটি নাটক অভিনীত হলো।

সেই সময়ে বীণা থিয়েটারে ছোট ছোট কিছু নাট্যদল ভাড়া নিয়ে কিছু দিন করে অভিনয় করে গেছে। ইন্ডিয়ান থিয়েটার (৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১—২৯ মার্চ, ১৮৯১), নীলমাধব চক্রবর্তীর সিটি থিয়েটার (১৬ মে ১৮৯১—৮ এপ্রিল ১৮৯২) এখানে খোলা হয়েছিল।

ইন্ডিয়ান থিয়েটার অভিনয় করেছিল বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তর অবলম্বনে কমালাকান্ত বা উকিল বিভ্রাট (৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯১)।

ঋণভারে জর্জরিত রাজকৃষ্ণ স্ত্রী-কন্যার অলঙ্কার বিক্রি করে, ছাপাখানা বিক্রি করে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। এবারে তাঁর সাধের বীণা থিয়েটার বিক্রি করে দিলেন। কিনে নেন প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়, ১৮৯২-এর নভেম্বর মাসে। 'ভিক্টোরিয়া অপেরা হাউস' খুলে সেখানে অভিনয় চলল। প্রিয়নাথ এখানে সব চরিত্রই মহিলাদের দিযে করাবার চেষ্টা করে সর্বস্বান্ত হলেন। রাজকৃষ্ণের প্রথমদিকে মহিলা ছিল না, ভিক্টোরিয়া অপেরা হাউসের অভিনয়ে পুরুষ রইলো না। স্রোতের বিপরীত মুখে চলতে গিয়ে বীণা থিয়েটারের সব রকম প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল।

রাজকৃষ্ণ পরিচালিত বীণা থিয়েটারে শেষ অভিনয় : ১৬ নভেম্বর, ১৮৯০। ভিক্টোরিয়া অপেরা হাউসের শেষ অভিনয় : ডিসেম্বর, ১৮৯২। বর্তমানে এটি সিনেমা হল 'জওহর'। ঠিকানা—২২ কেশব সেন স্ট্রিট, কলি-৯। এখানে কিছুদিন নীলমাধব চক্রবর্তীর সিটি থিয়েটার আবার খোলা হয়েছিল (১৮৯৩-এর ৭ অক্টোবর)। পরে এখানে নীলমাধব 'গেইটি' থিয়েটার চালান ১৮৯৪-এর শেষ থেকে ১৮৯৬-এর গোড়া পর্যন্ত।

দেনাগ্রস্ত, ভগ্নোদ্যম রাজকৃষ্ণ রায়ের অকাল মৃত্যু ত্বরান্বিত হল। মাত্র ৪৫ বছর বয়সে, ১৮৯৪-এর ১১ মার্চ তাঁর মৃত্যু হয়। বীণা থিয়েটারের ইতিহাস এইখানেই শেষ।

পত্রিকা সম্পাদক ও কবি রাজকৃষ্ণ রায়ের প্রতিভা ছিল। কয়েকটি নাটকে অভিনয়ে খ্যাতিলাভ করেই তিনি রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করতে আসেন। থিয়েটার প্রতিষ্ঠান পরিচালনা এবং থিয়েটারে নাট্যাভিনয় পরিচালনায় তিনি একেবারেই ব্যর্থ হয়েছিলেন। থিয়েটার পরিচালনার জন্য যে বাস্তব বুদ্ধি, ব্যবসায়িক চিন্তা, পেশাদারি দক্ষতা এবং নিয়মশৃঙ্খলার প্রয়োজন, তা তাঁর ছিল না। আবার নাট্যপরিচালনা করার যে বোধ ও উদ্যম প্রয়োজন—

তাও তাঁর ছিল না। শুধু আবেগ ও ভালবাসা দিয়ে থিয়েটারের মতো একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও মিশ্র শিল্পের (composite art) পরিচালনা কখনোই সম্ভব নয়। তাছাড়া সে যুগে মঞ্চে অভিনেত্রীদের চাহিদা যখন ক্রমবর্ধমান, তখন নিজের মঞ্চে তাদের বর্জন করা—একেবারেই স্রোতের বিপরীতমুখী প্রচেষ্টা। প্রথম দিকে এই চেষ্টা করে কোনো থিয়েটারই টিকতে পারে নি। স্রোতের বিপরীতে ইতিহাসের ধারাকে প্রবাহিত করতে গেলে যে প্রতিভা, উদ্যোগ এবং কর্মকুশলতার প্রয়োজন, রাজকৃষ্ণের তা ছিল না।

ফলে শেষের দিকে তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে সর্বস্বান্ত হন। যে রঙ্গমঞ্চের প্রতি পূর্ণ ভালবাসায় তিনি তাঁর জীবন, যৌবন, ধনমান সব ঢেলে দিয়েছিলেন, শেষ জীবনে সেই রঙ্গমঞ্চের প্রসঙ্গ এলেই তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাপ্রার্থী রাজকৃষ্ণের নির্মম পরিণতি দীর্ঘশ্বাসের মতো বাংলা থিয়েটারে রয়ে গেছে। রঙ্গমঞ্চ সুদে আসলে তাঁর জীবনকে নিংড়ে নিঃশেষ করে দিয়েছিল।

নাট্যকার হিসেবে রাজকৃষ্ণ একেবারে থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত থেকেই নাট্য রচনা করেছেন। প্রথমে বেঙ্গল থিয়েটার, পরে নিজের বীণা থিয়েটার, তারপরে স্টার থিয়েটারে যুক্ত থেকে তিনি নাট্য রচনা করেছেন। এবং তখনকার রঙ্গমঞ্চে যে ধরনের ও প্রথার নাটক চলছিল, নাট্য রচনায় তিনি তারই অনুগামী ছিলেন। থিয়েটার পরিচালনায় যিনি অভিনেত্রী না নিয়ে তদানীন্তন থিয়েটারের ধারার বিপরীতমুখে চলতে চেয়েছিলেন, নাটক রচনায় কিন্তু প্রচলিত ধারার বাইরে যান নি বা যেতে চান নি। ফলে তখন রঙ্গমঞ্চে যে ধরনের নাটক হতো, তিনি সেই পৌরাণিক নাটক, প্রহসন-পঞ্চরং-নক্সা, গীতিনাট্য অপেরা এবং কিঞ্চিৎ সামাজিক নাটকই রচনা করেছিলেন। একদিকে যাত্রাধর্মী মনোমোহন বসু এবং অন্যদিকে নাট্যধর্মী গিরিশ—দুজনের মাঝখানে অবস্থান করে নাট্য রচনায় কোনো নিজস্বতা সৃষ্টি করতে পারেন নি। তবুও তাঁর বেশ কিছু গীতিনাট্য-অপেরা এবং পৌরাণিক নাটক সে যুগে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।

রাজকৃষ্ণের 'বীণা থিয়েটার' বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে কোনো স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে নি। নাট্যকার হিসেবেও রাজকৃষ্ণকে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা দিতে পারে নি। তাঁর নাট্যশালার মতো তাঁর নাটক-প্রহসন-অপেরাগুলিও সে যুগের মঞ্চের তাৎক্ষণিক চাহিদা মিটিয়েই শেষ হয়ে গেছে।

তবে নাট্যমঞ্চ চালনায় অপরিণামদর্শিতা মালিক ও পরিচালককে কিভাবে সর্বস্বান্ত করে দেয়, তার ঋণাত্মক (Negative) উদাহরণ হিসেবে রাজকৃষ্ণ ও তাঁর বীণা থিয়েটার পরবর্তী বাংলা থিয়েটার পরিচালনায় শিক্ষার উদাহরণ হিসেবে সাহায্য করেছে।

স্টার থিয়েটার (হাতীবাগান)

৭৫/৩ নম্বর কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট (বিধান সরণি), কলকাতা

প্রতিষ্ঠাতা : গিরিশচন্দ্র (নেপথ্যে)
অমৃতলাল বসু, দাসুচরণ নিয়োগী,
অমৃতলাল মিত্র, হরিপ্রসাদ বসু।

স্থায়িত্বকাল : ২৫ মে ১৮৮৮
—১২ অক্টোবর ১৯৯১।

উদ্বোধন : ২৫ মে, ১৮৮৮ (শুক্রবার)

নাটক : নসীরাম ('সেবক' ছদ্মনামে গিরিশ)

প্রথম পর্ব : (১৮৮৮-১৯০০)

৬৮নং বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটারের বাড়ি গোপাল শীলকে ত্রিশ হাজার টাকায় বিক্রি করে দিয়ে গিরিশচন্দ্র এবং স্বত্বাধিকারী চারজন (অমৃতলাল বসু, দাসুচরণ নিয়োগী, অমৃতলাল মিত্র, হরিপ্রসাদ বসু) শুধুমাত্র 'স্টার' নামটির 'গুডউইল' সঙ্গে নিয়ে চলে আসেন। তারা কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটে হাতীবাগানের কাছে রণেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের ত্রিশ কাঠা জমি সাতাশ হাজার টাকায় কেনেন। গিরিশ গোপাল শীলের এমারেল্ড থিয়েটারে চুক্তিবদ্ধ হয়ে যে কুড়ি হাজার টাকা বোনাস পেলেন, তার থেকে ষোল হাজার টাকা বিনা শর্তে নতুন স্টারের বাড়ি তৈরি করতে দিয়ে দিলেন। প্রথমে কুড়ি হাজার টাকাই গিরিশচন্দ্র দিয়েছিলেন। তবে তাঁর ভাই অতুলকৃষ্ণ এতে খুশি হননি। তিনি অনেক চেষ্টা করে তাঁদের কাছ থেকে শেষমেষ চারহাজার টাকা ফেরত নিয়েছিলেন। থিয়েটার বাড়ি তৈরি করতে দিয়ে স্টারের দল বাইরে অভিনয় করতে বেরিয়ে গেল অর্থোপার্জনের আশায়। মাত্র পাঁচ মাসের চেষ্টায় নতুন বাড়ি তৈরি হয়ে গেল। সাহায্য করলেন এঞ্জিনীয়ার যোগেন্দ্রনাথ মিত্র এবং মঞ্চ অভিজ্ঞ ধর্মদাস সুর। থিয়েটারের নক্সা নির্মাণ ও অলঙ্করণ এদের দায়িত্বেই সুষ্ঠু ও সুদৃশ্যভাবে সম্পন্ন হল। গ্যাসবাতি দিয়ে উজ্জ্বল আলোর ব্যবস্থা করলেন পি. সি. মিত্র এণ্ড কোম্পানী। দৃশ্য সজ্জাকর ছিলেন দাসুচরণ নিয়োগী, সঙ্গীত—রামতারণ সান্যাল এবং নৃত্য—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়। ম্যানেজার—অমৃতলাল. বসু। দেড় হাজার দর্শকাসন বিশিষ্ট এই রঙ্গালয়ের প্রবেশমূল্য ছিল—

> রয়েল বক্স (পাঁচ জন)—একশো টাকা। বক্স (চার জন)—চোদ্দ টাকা। বক্স (দুই জন)—আট টাকা। ড্রেস সার্কেল—চার টাকা। অর্কেস্ট্রা স্টল—তিন টাকা। স্টল—দুই টাকা। পিট সিট—এক টাকা। গ্যালারি—আট আনা। জেনানা বক্স (চার জন)--দশ টাকা। জেনানা সিট—দুই টাকা।

মহিলাদের একেবারে আলাদা আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। উদ্বোধনের দিনে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানানো হয়েছিল, অভিনয় শেষে হাতীবাগান থেকে বউবাজার পর্যন্ত ছয়

পয়সা ভাড়ায় দর্শকদের জন্য স্পেশাল ট্রামগাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ মে শুক্রবার ফুলদোলের দিন (১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫) মহাসমারোহে হাতীবাগানের নবনির্মিত দ্বিতীয় স্টার থিয়েটার উদ্বোধন হলো। নাটক গিরিশের লেখা 'নসীরাম'। এমারেল্ডের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ থাকাতে গিরিশ লুকিয়ে খালপারে বসে এই নাটকটি লিখে দেন। গভীররাতে এমারেল্ড কর্তৃপক্ষের চোখ এড়িয়ে স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে বাড়িথেকে বেরিয়ে গিয়ে গোপনে নাটকটি লিখতে হয়েছিল গিরিশকে। এবং নিজের নাম গোপন রেখে 'সেবকপ্রণীত' বলে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। নসীরাম নাটকে অভিনয় করলেন স্টারের খ্যাতিমান অভিনেতা-অভিনেত্রীবৃন্দ—

> নসীরাম—অমৃতলাল বসু। অনাথনাথ—অমৃতলাল মিত্র। শম্ভুনাথ—অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়। কাপালিক—অঘোর পাঠক। বিরজা—কাদম্বিনী। সোনা—গঙ্গামণি। তারাসুন্দরী পাহাড়িয়া বালকের ভূমিকায় প্রথম মঞ্চাবতরণ করেন এবং একটি মাত্র সংলাপ—'ওরে হরি বল, নইলে কথা কি কইবে না।'—দিয়ে নাট্যজীবন শুরু করেন।

উদ্বোধনকালে অমৃতলাল বসু গিরিশের লেখা কবিতা পাঠ করেন, তার একটি লাইন—'হিন্দুপ্রাণ কোমলতায় / ধর্মপ্রাণ শ্রেষ্ঠ পরিচয় / ধর্ম রঙ্গালয়।' বোঝা যাচ্ছে জাতীয় রঙ্গালয়ের উন্মাদনা স্তিমিত হয়ে, হয়ে গেল ধর্ম রঙ্গালয়। 'হিন্দু' ও 'জাতীয়' প্রায় সমার্থক তখন অনেকেরই কাছে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে উনিশ শতকের শেষ তের বছর স্টার খুব সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় চালিয়ে যায়। প্রথম বছর গিরিশ স্টারে ছিলেন না, তবুও তাঁর পুরনো নাটকগুলিই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এখানে অভিনীত হয়ে চলল। চৈতন্যলীলা, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর, সীতার বনবাস, নলদময়ন্তী, রাবণবধ ভালই চলল। কিন্তু প্রচুর সাফল্য পেল 'সরলা'র অভিনয়। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন অমৃতলাল বসু এবং 'সরলা' নামে অভিনয় হয় ২২ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৮। বাংলা থিয়েটারে ঠিক এই রকম ঘরোয়া পারিবারিক ও সামাজিক নাটক কখনো অভিনীত হয়নি। 'Domestic Tragedy' নামে খ্যাত সরলার অভিনয় জনমনে নতুন সাড়া ফেলে দিয়েছিল। সে যুগে অভিনয় ও টিকিট বিক্রির রেকর্ড করেছিল সরলা। এই নাটকে অসামান্য অভিনয় করেন—

> বিধুভূষণ—অমৃতলাল মিত্র। গদাধর—অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়। শশিভূষণ—নীলমাধব চক্রবর্তী। সরলা—কিরণবালা। গোপাল—তারাসুন্দরী। শ্যামা—গঙ্গামণি। প্রমদা—কাদম্বিনী।

গিরিশ স্টারে এলেন ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৯, কিন্তু 'অফিসিয়াল' যোগ দিলেন ২৭ এপ্রিল। হলেন ম্যানেজার। 'সরলা' নাটকের সাফল্য গিরিশকে এই ধরনের নাটক লিখতেই প্ররোচিত করল। এর আগে গিরিশ সামাজিক বিষয় নিয়ে নাটক লেখাকে 'নর্দমা ঘাঁটা' বলে মনে করতেন। কিন্তু এবারে উপায়ান্তর না দেখে লিখেই ফেললেন

'প্রফুল্ল'। একান্নবর্তী পরিবারে ভাইয়ের বিরুদ্ধে চক্রান্ত, পারস্পরিক সম্পর্কের হানি, মদ্যপানের বিষময় ফল কিভাবে একটি মধ্যবিত্ত সংসারকে ভেঙে তছনছ করে দিল তারই কাহিনী। কলকাতার নীচুতলার সমাজজীবনের ছবিও এখানে বাস্তবসম্মত ভাবে আঁকা হলো। আর সবার উপরে রইলো বিশ্বাস ও আদর্শের জ্বলন্ত প্রতীকরূপে প্রফুল্ল নামের নারী চরিত্রটি। নাটকটি অভিনীত হল ২৭ এপ্রিল। মুহূর্তে পূর্ববর্তী সরলার সব রেকর্ড ভেঙে দিল প্রফুল্ল। গিরিশ কোনো চরিত্রে অভিনয় করেন নি। যারা অভিনয় করলেন—

> অমৃতলাল মিত্র—যোগেশ। অমৃতলাল বসু—রমেশ। কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়—সুরেশ। অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়—ভজহরি। মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী—পীতাম্বর। শ্যামাচরণ কুণ্ডু—কাঙালিচরণ। নীলমাধব চক্রবর্তী—মদন ঘোষ। ভূষণকুমারী—প্রফুল্ল। গঙ্গামণি—উমাসুন্দরী। কিরণবালা—জ্ঞানদা। টুম্পামণি—জগমণি।

অমৃতলাল মিত্রের যোগেশ চরিত্রে অভিনয় সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অমৃতলাল বসুর খল রমেশ চরিত্র এবং অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়ের দুষ্ট ভজহরির চরিত্র অভিনয়ে কৃতিত্বও সবাই স্বীকার করেছেন।

১৮৮৯-তে প্রফুল্ল ছাড়া আর অভিনীত হল গিরিশেরই সব পুরনো নাটক ধ্রুবচরিত্র, দক্ষযজ্ঞ এবং অমৃতলালের তাজ্জব ব্যাপার। গিরিশের নতুন নাটক 'হারানিধি' (৭/৯/৮৯) প্রফুল্লের মতই সামাজিক নাটক। কিন্তু সেরকম সাফল্য পেল না।

১৮৯০-তে সবই গিরিশের পুরনো নাটক, যেমন রূপসনাতন, চণ্ড অভিনীত হল। অমৃতলালের বাঞ্ছারাম, তরুবালা এবং গিরিশের মলিনাবিকাশ এবং মহাপূজা (জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে) মঞ্চস্থ হলো। গিরিশের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ (দানী) চণ্ড নাটকের রঘুদেবজীর চরিত্রে প্রথম অভিনয় শুরু করেন। গিরিশের 'মলিনাবিকাশ' গীতিনাট্যে বাংলা মঞ্চে প্রথম দ্বৈত-নৃত্যগীতের প্রচলন হয়। বিকাশ—গোলাপ (সুকুমারী) এবং মলিনা—মানদাসুন্দরী। রামতারণ সান্যালের সুর এবং কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নৃত্যশিক্ষায় এবং অভিনেত্রী দুজনের নৃত্যগীত কুশলতায় মলিনাবিকাশ সাফল্যলাভ করে। এই ধরনের দ্বৈত-নৃত্যগীতের অভিনয় অন্য সব মঞ্চেও শুরু হয়ে গেল।

এই বছরেই স্টারের বিখ্যাত অভিনেতা অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (১১ মার্চ) এবং অভিনেত্রী কিরণবালার (এপ্রিল) মৃত্যু হয়। দুজনের আকস্মিক মৃত্যুর জন্য তিন মাস স্টারে অভিনয় বন্ধ থাকে। অমৃতলাল বসুর নতুন নাটক 'তরুবালা' মঞ্চ সাফল্য লাভ করে। ঠাকুরদা নীলমাধব চক্রবর্তী এবং ঠানদিদি—গঙ্গামণি অভিনয়ে মাতিয়ে দিয়েছিলেন। তরুবালার ভূমিকায় প্রমদাসুন্দরীও খ্যাতি অর্জন করেন। সামাজিক ব্যঙ্গ নাটকে অমৃতলালের কৃতিত্ব স্বীকৃত হয়।

এই ক'বছরে স্টারের অভিনয়ের ধারাবাহিক সাফল্য লক্ষ্য করা যায়। তাই "অনুসন্ধান' পত্রিকা (১৫ শ্রাবণ, ১২৯৭) লিখেছিল :

> 'আজকাল থিয়েটারের বাজারে স্টার থিয়েটারের বড়ই নামডাক। কাগজে-কলমে

চারিদিকে সুখ্যাতির ছড়াছড়ি, আর সেজন্যই স্টার থিয়েটারের কোন কিছু অভিনয় হইবে শুনিলেই লোক আর ধরে না--তিনি উনি সকলেই অভিনয় দেখিতে ছুটেন।'

১৮৯১-তে গিরিশ স্টারের ম্যানেজারের পদ থেকে বরখাস্ত হন (১৫ ফেব্রুয়ারি)। কিছু দিন ধরেই স্টারের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গিরিশের নানা কারণে মনোমানিল্য চলছিল। বরখাস্ত হয়ে গিরিশ চলে যাওয়ার সময়ে সঙ্গে নিয়ে যান নীলমাধব চক্রবর্তী, অঘোরনাথ পাঠক, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, দানীবাবু, শরৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানদাসুন্দরী প্রমুখদের। নীলমাধব চক্রবর্তীর নেতৃত্বে সিটি থিয়েটার খোলা হয় এবং গিরিশ অন্তরাল থেকে এদের সাহায্য করতে থাকেন। এইভাবে স্টার ভেঙে যাওয়াতে নাট্যাভিনয়ের ধারা ব্যাহত হয়।

গিরিশের পরিবর্তে ম্যানেজার হলেন অমৃতলাল বসু এবং নাট্যকার হিসেবে যোগ দেন রাজকৃষ্ণ রায় (১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯১), মাসিক একশো টাকা বেতনে।

১৮৯১-তে তাই গিরিশের পরিবর্তে রাজকৃষ্ণ রায়ের নাটকগুলিই অভিনীত হতে থাকে। সম্মতি সঙ্কট, নরমেধ যজ্ঞ, লায়লা-মজনু প্রভৃতি রাজকৃষ্ণের নাটকগুলি মোটামুটি চলল। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে (১৯ জুলাই, ১৮৯১) স্টারে অমৃতলাল বসু রচিত 'বিলাপ বা বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন' অভিনীত হলো (২২ আগস্ট)।

১৮৯২-তে সবই প্রায় রাজকৃষ্ণের নাটক অভিনীত হল। বনবীর, ঋষ্যশৃঙ্গ, রাজাবাহাদুর প্রভৃতি রাজকৃষ্ণের নাটক ছাড়া অমৃতলালের কালাপানি অভিনীত হলো। এখানে 'কৃষ্ণবিলাস' নামে একটি হিন্দি ভাষায় অপেরা অভিনীত হয় (৬ আগস্ট)। বাংলা মঞ্চে হিন্দি ভাষায় রচিত নাটকের এই প্রথম অভিনয় হলো। এর সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে পরের বছর গিরিশের সীতার বনবাস নাটকের হিন্দীরূপ 'রামাশ্বমেধ' স্টার অভিনয় করে (২৭ মে, ১৮৯৩)। কৃষ্ণবিলাসে রাধিকা চরিত্রে তারাসুন্দরী সচ্ছন্দ ও প্রাণবন্ত অভিনয় করেন।

১৮৯৩-তে রাজকৃষ্ণের বেনুজীর বদরেমুনীর এবং অমৃতলালের বিমাতা বা বিজয়বসন্ত অভিনীত হলো। '৯৪-তে বঙ্কিমের চন্দ্রশেখর (নাট্যরূপ : অমৃতলাল) এবং অমৃতলালের বাবু অভিনীত হয়। চন্দ্রশেখর আর্থিক সাফল্যলাভ করে। অমৃত মিত্র (চন্দ্রশেখর), তারাসুন্দরী (শৈবলিনী), অক্ষয় কোঁঙার (প্রতাপ) এবং নরীসুন্দরী (দলনী) খুবই ভালো অভিনয় করেন।

রাজকৃষ্ণ রায়ের মৃত্যু হয় ১১ মার্চ, ১৮৯৪। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু ৮ এপ্রিল, ১৮৯৪। তাঁদের মৃত্যুতে স্টারের অভিনয় বন্ধ থাকে ১৪ মার্চ ও ১৮ এপ্রিল। রাজকৃষ্ণের অভাবে স্টারে আর কোনো নির্দিষ্ট নাট্যকার রইলো না।

১৮৯৫-তে ১৩ জুলাই এখানে আবার গিরিশের প্রফুল্ল নামানো হয়। একই দিনে মিনার্ভায় 'প্রফুল্ল' অভিনীত হয়। গিরিশ তখন মিনার্ভায়, তিনি যোগেশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। স্টারে যোগেশ সাজেন আগের মতই অমৃতলাল মিত্র। প্রতিযোগিতা জমে

ওঠে। বাংলা নাট্যশালায় একই নাটক একই সময়ে একাদিক্রমে দুটো মঞ্চে এই প্রথম অভিনয়ের সূত্রপাত হল। যোগেশের ভূমিকায় গুরু-শিষ্যের (গিরিশ—অমৃত মিত্র) অভিনয়ের তুলনায় দর্শকেরা মেতে উঠলেন।

এই বছরে প্রফুল্ল ছাড়া তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য নাটকের অভিনয় হয় নি। বাদবাকি সবই পুরনো নাটক--এগুলি আগেই স্টারে অভিনীত হয়েছে।

১৮৯৬-তে গিরিশ মিনার্ভা ছেড়ে স্টারে ফিরে এলেন (১৫ এপ্রিল, ১৮৯৬) এবং পুরোপুরি 'ড্রামাটিক ডিরেক্টর' হিসেবে যোগ দিলেন। বাংলা থিয়েটারে এই পদ প্রথম গিরিশের জন্যই তৈরি হলো।

রাজসিংহ (নাট্যরূপ : অমৃতলাল) ১১ জানুয়ারি অভিনীত হল। গিরিশ তাঁর নতুন নাটক 'কালাপাহাড়' লিখে খুব যত্ন সহকারে অভিনয় করালেন (২৬/৯/৯৬)। অভিনয় করলেন :

> গিরিশ--চিন্তামণি। অমৃত মিত্র—কালাপাহাড়। নগেন্দ্রবালা—ইমান। নরীসুন্দরী--দোলনা। প্রমদাসুন্দরী—চঞ্চলা।

অমৃতলালের 'বৌমা'-ও এই বছর অভিনীত হয়। বিলিতি মঞ্চের অভিনেতা দেব কার্সন সাহেবের মৃত্যুতে (২৪ ফেব্রুয়ারি) স্টার অভিনয় বন্ধ রাখে এবং দুদিন পরে তার স্ত্রীর সাহায্যার্থে অভিনয় করে। বিদেশী হলেও, অভিনেতার প্রতি অভিনেতাদের এই সম্মান প্রদর্শন থিয়েটারের মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়। আবার ৮ জুলাই ঔপন্যাসিক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতির সম্মানে স্টার তাঁর পরিবারের সাহায্যে 'স্বর্ণলতা' নাটক অভিনয় করে।

১৮৯৭-তে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো নাটকের অভিনয় হয় নি। রানী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যশাসনের অষ্টম বর্ষপূর্তি স্মরণে অভিনীত হয় হীরকজুবিলী (২১ জুন)। গিরিশের দুটি নতুন রচনা পারস্যপ্রসূন ও মায়াবসান সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে অভিনয় করা হয়। 'মায়াবসান' গিরিশের নতুন সামাজিক নাটক, এতে গিরিশ নিজে কালীকিঙ্করের ভূমিকায় অবিস্মরণীয় অভিনয় করেন। অন্যান্য ভূমিকায় দানীবাবু (হলধর), অক্ষয় কোঁঙার (গণপতি), তারাসুন্দরী (অন্নপূর্ণা), নরীসুন্দরী (রঙ্গিনী) ও নগেন্দ্রবালা (বিন্দু) অভিনয় করেন। হীরকজুবিলীতে নট চরিত্রে অমৃতলাল মিত্র এবং এক মাতালের ভূমিকায় দানীবাবু অসামান্য অভিনয় করেন।

'৯৮-তে শুধুমাত্র অমৃতলালের গ্রাম্য-বিভ্রাট এবং হরিশচন্দ্র নতুন নাটক হিসেবে অভিনীত হয়। অমৃত মিত্রের হরিশচন্দ্র এবং অক্ষয় কোঁঙারের বিদূষক খুবই প্রশংসা পেয়েছিল।

এই বছরেই আবার গিরিশের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের মনান্তর হয় এবং গিরিশ ১১ মে অভিনয়ের পর স্টার ছেড়ে দেন। তাঁর এই স্টার ছেড়ে শেষবারের মতো যাওয়া, আর কখনো তিনি স্টার থিয়েটারে ফিরে এসে যোগ দেন নি।

এই সময় অমনিতেই স্টারের অবস্থা ভালো যাচ্ছিল না। তার উপরে গিরিশ চলে

গেলেন। নাটক নেই, ভালো অভিনেতা নেই। এই দুর্দিনে থিয়েটার বাঁচাতে স্টার এক অভিনব ব্যবস্থা নেয়। নাট্যাভিনয়ের পূর্বে 'বায়স্কোপ'[১] দেখাবার ব্যবস্থা করে। ২৯ অক্টোবর, ১৮৯৮ স্টারে বায়োস্কোপ দেখানো শুরু হয়। নেলসনের মৃত্যু, হীরকজুবিলীর শোভাযাত্রা, গ্ল্যাডস্টোনের শবানুগমন দেখানো হয়। পরে অমৃতলালের 'বাবু' অভিনীত হয়। এরপর থেকে প্রতিটি নাট্যানুষ্ঠানের সঙ্গে বায়স্কোপ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

১৮৯৮-তে কলকাতায় প্লেগ মহামারী রূপে দেখা দেয়। মার্চ মাস থেকেই আতঙ্কে লোকজন কলকাতা ছেড়ে পালাতে থাকে। ফলে ১৫ মে থেকে টানা চল্লিশ রাত স্টারে অভিনয় বন্ধ থাকে। আবার অভিনয় শুরু হয় ২৫ জুন থেকে। গিরিশের চৈতন্যলীলা নাটক দিয়ে।

১৮৯৯-তে পুরনো নাটকগুলির সঙ্গে নতুন নাটক অভিনীত হল মৃচ্ছকটিক, সাবাস আটাশ (অমৃতলাল), বিরহ (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)।

দেখা যাচ্ছে নাট্যকারের অভাবে অমৃতলাল পরপর নাটক লিখে চলেছেন। পুরনো নাট্যকার মনোমোহনের নাটক অভিনয় করতে হচ্ছে। নতুন নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বাংলা মঞ্চে গৃহিত হচ্ছেন, যদিও তাঁর সার্থক নাটকগুলি এখনো রচিত হয়নি।

১৮৯৯-এর ২৮ এপ্রিল থেকে, 'আদর্শবন্ধু' অভিনয়ের সঙ্গে স্টারে প্রথম বিদ্যুৎ-আলোর ব্যবস্থা করা হয়। কলকাতায় তখন সবে (১৮৯৯-এর ১৭ এপ্রিল থেকে) নবাবিষ্কৃত বিদ্যুৎ-আলোর ব্যবস্থা চালু হয়েছে এবং রঙ্গালয়ের মধ্যে প্রথমেই স্টার তার ব্যবহার শুরু করে।[২] এই নতুন আলোর ব্যবহারের ফলে থিয়েটারে আলোক নিয়ন্ত্রণ অভিনব হয়ে উঠলো। গ্যাসের আলোর যুগ শেষ হলো।

১৯০০-তে আদর্শবন্ধু (অমৃতলাল), কৃপণের ধন (অমৃতলাল), প্রণয়পরীক্ষা (মনোমোহন বসু), লীলাবতী (দীনবন্ধু), হরিশ্চন্দ্র (মনোমোহন), ব্রাহস্পর্শ (দ্বিজেন্দ্রলাল), যাদুকরী (অমৃতলাল) অভিনীত হয়।

উনিশ শতক শেষ হয়ে বিংশ শতক শুরু হলো। 'স্টার' নানা সুখ দুঃখ, উত্থান-পতন, বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়ে তার অভিনয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে.

এই পর্বে কলকাতায় একই সঙ্গে স্টার, মিনার্ভা ও ক্লাসিক থিয়েটার সমানে পারস্পরিক পাল্লা দিয়ে চলেছে। গিরিশ তখন বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে খ্যাতির মধ্যগগনে। তিন থিয়েটারই গিরিশকে নিয়ে টানাটানি করছে এবং গিরিশ যখন যে মঞ্চে গেছেন, তারই সৌভাগ্য ফিরেছে। স্টার সবসময়ে গিরিশের আনুকূল্য পায় নি, একসময় থেকে

১. প্রথম থিয়েটারের সঙ্গে 'বায়স্কোপ' (Animatograph) দেখানো শুরু হয় মিনার্ভায়, ৩১ জানুয়ারি, ১৮৯৭। তারপরে ক্লাসিকে ১৯ মার্চ, ১৮৯৮। পরে স্টারে ২৯ অক্টোবর, ১৮৯৮। বেঙ্গল থিয়েটারে ৪ ডিসেম্বর, ১৮৯৮। শঙ্কর ভট্টাচার্য—বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান, ১৯৮২, পৃঃ ৫০১।

২. 'Story of Electricity in the city of Calcutta' Booklet of CESC, Calcutta, 29 May, 1983.
দ্রঃ দর্শন চৌধুরী—উনিশ শতকের নাট্যবিষয়, ১৯৮৫।

একেবারেই আর পায় নি। তবুও শত অসুবিধে সত্ত্বেও স্টার তার অব্যাহত অভিনয় ধারা রক্ষা করেছে। তুলনায় ক্লাসিক কিছুদিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে, মিনার্ভা থেকে থেকেই নির্জীব হয়ে পড়েছে।

দ্বিতীয় পর্ব : (১৯০১-১৯২০)

বিশ শতকের গোড়া থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কাল পর্যন্ত (১৯০১-১৯২০) স্টার চালিয়েছিলেন কখনো অমৃতলাল, অর্ধেন্দুশেখর কিংবা অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। এই সময়কালের মধ্যেই অর্ধেন্দুশেখর (১৯০৮) ও অমরেন্দ্রনাথ (১৯১৬) মারা যান। দীর্ঘায়ু অমৃতলাল বসু তারপরেও বহুদিন সব সময়েই স্টারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। অভিনেতা অমৃতলাল মিত্রও (১৯০৮) চলে গেলেন।

১৯০১ খ্রিস্টাব্দে রাজকৃষ্ণ রায়ের 'নরমেধযজ্ঞ' ও অমৃতলালের 'যাদুকরী' অভিনীত হয় (১ জানুয়ারি)। তাছাড়া গিরিশের 'বুদ্ধদেবচরিত' ও অমৃতলালের 'তাজ্জব ব্যাপার' (৫ জানুয়ারি), রাজকৃষ্ণ রায়ের 'ঋষ্যশৃঙ্গ' (৬ জানুয়ারি), দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' (১৩ জানুয়ারি), মনোমোহন বসুর 'প্রণয় পরীক্ষা'' (১৯ জানুয়ারি), দীনবন্ধুর 'লীলাবতী' (১৬ ফেব্রুয়ারি), বঙ্কিমের বিষবৃক্ষ উপন্যাসের নাট্যরূপ (অমৃতলাল বসু, ১৩ এপ্রিল), 'সরলা' প্রভৃতি নাটকের ঘুরে ফিরে অভিনয় হয়। ২৫ ডিসেম্বর অভিনীত হয় 'অবতার' (অমৃতলাল)।

১৯০২ খ্রিস্টাব্দে পুরনো নাটকগুলিরই অভিনয় চলতে থাকে। নতুনের মধ্যে অমৃতলাল বসুর 'নবজীবন' প্রথম অভিনীত হলো (১ জানুয়ারি), বঙ্কিমের চন্দ্রশেখর উপন্যাসের নাট্যরূপ (অমৃতলাল, ২ ফেব্রুয়ারি), অমৃতলালের 'তরুবালা' (৯ ফেব্রুয়ারি), এখানে প্রথম অভিনয় করা হলো। এছাড়া সপ্তম এডওয়ার্ডের মুকুটোৎসব হিসেবে বিশেষ অভিনয় করা হলো 'সাতখুন মাপ' নামে নাটক ২৫ জুন। এটি 'Seven murders perdoned' নাটকের বাংলা রূপান্তর। ক্ষীরোদ প্রসাদের 'সাবিত্রী' প্রথম অভিনীত হলো (৪ অক্টোবর), 'বেদৌরা' প্রথম অভিনীত হলো ২৫ ডিসেম্বর।

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ বাংলার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। এই বছরেই ব্রিটিশ বড়লাট লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব দেন। সঙ্গে সঙ্গে সারাদেশ প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে। জনমনের এই দাবিতে রঙ্গালয়গুলিও পেছনে থাকতে পারে নি। অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের (১৮৭৬) ভয়ে বাংলা মঞ্চ থেকে জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশপ্রেমের নাটক প্রায় অন্তর্হিত হয়েছিল। এই গণ-উন্মাদনার দিনে রঙ্গমঞ্চগুলি আবার সাহস ভরে জাতীয় ভাবাবেগের নাট্যাভিনয় শুরু করে দেয়। রঙ্গমঞ্চের উৎসাহে নাট্যকারেরাও আবার এই ধরনের নাট্যরচনায় মনোনিবেশ করেন। বাংলা থিয়েটারে আবার স্বদেশ ও জাতীয়তাবোধের বিষয় নিয়ে নাটক রচনার জোয়ার এলো।

গিরিশচন্দ্র মিনার্ভা থিয়েটারে তাঁর 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাশিম', 'ছত্রপতি শিবাজী'— স্বদেশপ্রেমের নাটকগুলি অভিনয় করে বাঙালিকে মাতিয়ে দিলেন। স্টার থিয়েটারও

এতদিন বাদে সাহসভরে পৌরাণিক নাটক ও গীতিনাট্য ছেড়ে স্বাদেশিক ভাবানুরাগের নাটক অভিনয় আরম্ভ করল। ঠিক এই সময়ে (মে, ১৯০৩) অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী স্টারে যোগ দেন এবং তাঁরই উদ্যোগে এই জাতীয় অভিনয় হতে থাকল। এবং স্টার থিয়েটারের ভাগ্য ফিরে গেল। ক্ষীরোদ প্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' (১৫.৮.০৪), 'রঞ্জাবতী' (৩.৯.০৪) প্রথম অভিনয় করল স্টার। এই ধারা বেয়েই ক্রমে ক্ষীরোদ প্রসাদের 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' (৪.৬.০৬), 'নন্দকুমার' (১৪.৮.০৭), 'পদ্মিনী' (২৩.১২.০৫) ; দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'রাণাপ্রতাপ' (২২.৭.০৫), অমৃতলাল বসুর 'সাবাস বাঙালি' (২৫.১২.০৫) ; মনোমোহন গোস্বামীর 'কর্মফল' (৩.৭.০৯), অভিনীত হলো। অনেকদিন বাদে বংলা রঙ্গালয় জাতীয় ভাবোদ্দীপনায় পরিপূর্ণ হয়ে গেল। ফিরে এলো 'নীলদর্পণ', অভিনীত হতে থাকল বঙ্কিমের 'চন্দ্রশেখর', রমেশচন্দ্র দত্তের 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' উপন্যাসের নাট্যরূপ (ঃ 'অমরেন্দ্রনাথ দত্ত) 'জীবনসন্ধ্যা' নামে (২১.১১.০৮) ; অমরেন্দ্রনাথ দত্তের 'রানী ভবানী'। অনেকদিন বাদে ঝিমিয়ে পড়া রঙ্গ-মঞ্চ প্রাণাবেগে চঞ্চল হয়ে উঠল। স্টার থিয়েটারে অভিনেতা অমৃতলাল মিত্র প্রতাপাদিত্য, রাণাপ্রতাপ, মীরকাশিম প্রভৃতি ইতিহাসের 'জাতীয় বীরদের' চরিত্রাভিনয়ে বাঙালি দর্শকদের আবেগাপ্লুত করে তুললেন।

এই জাতীয় অভিনয় শুরু হয়েছিল স্টারে ১৯০৩ থেকেই, সেই বঙ্কিমের 'রাজসিংহ' উপন্যাসের নাট্যরূপ (ঃ অমৃতলাল বসু, ৪.৪.০৩) অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। রাজসিংহের ভূমিকায় অমৃতলাল মিত্র এবং দরিয়ার চরিত্রে নরীসুন্দরী জনগণকে মাতিয়ে দিতে শুরু করলেন। 'রাজসিংহ' স্টারে আগেও অভিনীত হয়েছিল, কিন্তু বর্তমান যুগমানসের আকাঙ্ক্ষায় এবারকার 'রাজসিংহ' নতুন মাত্রা পেয়ে গেল।

ক্ষীরোদ প্রসাদের নতুন লেখা 'প্রতাপাদিত্য' সেই ধারাকে আরো প্রাণবন্ত করে তুলল। অভিনয়ে ছিলেন : বিক্রমাদিত্য ও রডা—অর্ধেন্দুশেখর। বসন্ত রায়--অক্ষয়কালী ঢোঙার। প্রতাপাদিত্য—অমৃতলাল মিত্র। গোবিন্দ দাস—কালীনাথ চট্টোপাধ্যায়। বিজয়া—নরীসুন্দরী। গয়লা বৌ—ক্ষেত্রমণি।

১৯০৩ থেকে ১৯০৫, এই উন্মাদনার মধ্য দিয়ে বাঙালি যেমন চলেছিল, বাংলা রঙ্গমঞ্চগুলিও সেইভাবে এই জাতীয় নাটকগুলি অভিনয় করে চলেছিল। ১৯০৫-এর জুলাই মাসে বড়লাট লর্ড কার্জন ঘোষণা করেন, ১৬ অক্টোবর থেকে 'বঙ্গভঙ্গ' কার্যকর হবে। বাংলাকে ভেঙে দু টুকরো করে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গ যুক্ত হবে অসম প্রদেশের সঙ্গে এবং পশ্চিমবঙ্গ যুক্ত হবে বিহার-ওড়িশার সঙ্গে। এর প্রতিবাদে সারা বাংলা উত্তাল হয়ে ওঠে। আন্দোলন শুরু হয়। 'স্বদেশী আন্দোলন' নামে খ্যাত এই প্রতিবাদের প্রচণ্ডতায় সেদিন সারাদেশ স্বদেশ প্রেমের দীক্ষা নেয়। বাংলা রঙ্গমঞ্চগুলির সঙ্গে স্টার থিয়েটারও সেদিন নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে বাঙালির স্বদেশপ্রেমের আন্দোলনে শামিল হয়েছিল।

১৯০৫-এর ৬ সেপ্টেম্বর, যেদিন 'বঙ্গভঙ্গ' করার কথা ঘোষণা করলেন লর্ড কার্জন, সেদিন সমগ্র বাঙালি জাতির সঙ্গে বাংলা রঙ্গালয়গুলিও অশৌচ পালন করেছিল।

সেদিন স্টার থিয়েটারেও অভিনয় বন্ধ রাখা হয়েছিল বিজ্ঞপ্তি মারফৎ :

'Mourning At the 'STAR'!!!
Partition of Bengal
No Amusement work at the
Star Theatre
on
Wednesday, the 6th September
Amritlal Bose
Manager
[Amritabazar Patrika : 6.9.1905]

এই ধরনের নাটক ছাড়াও এই পর্বে সৎসঙ্গ (ভূপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়), খাসদখল (অমৃতলাল), পরপারে (দ্বিজেন্দ্রলাল), ধর্মবিপ্লব (মনোমোহন গোস্বামী), জয়পতাকা (রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়), অহল্যাবাঈ (মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়), অকলঙ্ক শশী (রবীন্দ্রনাথের 'দিদি' গল্পের নাট্যরূপ : রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়), সওদাগর (মার্চেন্ট অফ ভেনিসের রূপান্তর : ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়), বিরাজ বৌ (শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপ : ভূপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়), ওথেলো (অনুবাদ : দেবেন্দ্র বসু) প্রভৃতি অভিনয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক যেমন এই সময়ে স্টারে অভিনীত হতে থাকে, তেমনি নাট্যকার হিসেবে ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতিষ্ঠাও এখানে হতে থাকে। 'প্রতাপাদিত্য' থেকেই তাঁর খ্যাতি বৃদ্ধি পায়। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯১১-১৩ পর্যন্ত এই মঞ্চের স্বত্বাধিকারী হন, অবশ্য ১৯০৭ থেকেই তিনি কুসুমকুমারী সহ স্টারে অভিনয় করছিলেন। ১৯০৭-এর ৪ মে স্টার থিয়েটার-এ বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবহার শুরু হয়। তখন 'রক্ষ ও রমণী' (ক্ষীরোদপ্রসাদ) এবং 'একাকার' (অমৃতলাল) অভিনয় হচ্ছিল।

১৯০৮ থেকে পুরনো নাটকগুলি অভিনীত হয়ে চলল মাঝে অভিনীত হলো অমরেন্দ্রনাথ দত্তের যৎকিঞ্চিৎ (২৫ জুন), হারাণচন্দ্র রক্ষি র উপন্যাস অবলম্বনে 'কামিনীকাঞ্চন' (নাট্যরূপ থ দত্ত), রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্যাস রাজপুত জীবনসন্ধ্যা অবলম্বনে (নাট্যরূপ অমরেন্দ্রনাথ, ২১ নভেম্বর), অমরেন্দ্রনাথের 'কেয়া মজাদার' (২৫ ডিসেম্বর)।

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ চলল একইভাবে। নতুন নাটকের মধ্যে 'ইন্দিরা', মনোমোহন গোস্বামীর 'কর্মফল', নিত্যবোধ বিদ্যারত্নের 'কুসুমে কীট' (২০ জুলাই) অভিনীত হলো। স্টারেই কর্মফল প্রথম অভিনীত হয়। ব্রিটিশ সরকার এই নাটকের অভিনয় ও প্রচার বন্ধ করে দেয়।

১৯১০-এ প্রথম অভিনীত হল 'দশচক্র', রবীন্দ্রনাথের মুক্তির উপায় গল্পের নাট্যরূপ (সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৬ ফেব্রুয়ারি)। অমরেন্দ্রনাথের 'রাণী ভবানী' (৬ আগস্ট), গুরুঠাকুর (ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১১ সেপ্টেম্বর), হরনাথ বসুর 'বেহুলা'

(১০ ডিসেম্বর)। নতুন এই নাটকগুলির সঙ্গে পুরনো নাটকগুলি তো চলছিলই।

১৯১১-তে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'সুলতান' এবং 'নাগেশ্বর' (২৯ এপ্রিল) এখানে প্রথম অভিনীত হল। এছাড়া পুরনো সব নাটকের পুনরভিনয় চলছিল। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ নভেম্বর এখানে অভিনয় বন্ধ ছিল। তারপর অভিনীত হলো ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সৎসঙ্গ' (১১ নভেম্বর), দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মজার নাটক 'হরিনাথের শ্বশুরবাড়ি যাত্রা' (২৫ নভেম্বর), নরেন্দ্রনাথ সরকারের 'জীবন সংগ্রাম' (২৬ ডিসেম্বর)। 'হরিনাথের শ্বশুরবাড়ি যাত্রা' নাটকে দেখানো হয়েছিল, মঞ্চে একটা আস্ত ট্রেন। এই ট্রেন থেকে যাত্রীরা ওঠানামা করছে, তারপরে ট্রেন ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে। মঞ্চের এই কৌশল সেদিন দর্শকদের আকর্ষণের ও আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য খবর হলো গিরিশচন্দ্রের মৃত্যু (৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯১২)। [৮ ফেব্রুয়ারি রাত্রি বারোটার পর ১টা ১০ মিনিটে তাঁর মৃত্যু হয়, সেজন্য ইংরেজি মতে ৯ ফেব্রুয়ারি হওয়াই বিধেয়]। গিরিশচন্দ্রের মৃত্যু বাংলা রঙ্গালয়ের পক্ষে বিরাট ক্ষতি। তাঁর নাট্যজীবনের প্রায় ৪০ বছর তিনিই ছিলেন বাংলা মঞ্চের শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় অভিনেতা, শ্রেষ্ঠ নাট্য পরিচালক ও মঞ্চাধ্যক্ষ। এবং অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ ও খ্যাতিমান নাট্যকার।

১৯১২ তে পুরনো নাটকেরই অভিনয় চলছে। তার মধ্যে অমৃতলাল বসুর নতুন নাটক 'খাসদখল' প্রথম অভিনীত হয় ৩০ মার্চ। অভিনয় করলেন : অমৃতলাল বসু—নিতাইচরণ। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত—মোহিতমোহন। কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়—মনোমোহন। কুঞ্জলাল চক্রবর্তী—ঠাকুর্দা মহাশয়। লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্র—ডা. ডি. মিত্র। কার্তিকচন্দ্র দে—পাকড়াশি।। বসন্তকুমারী—মোক্ষদা। মৃণালিনী—বিধু ঝি।

এই নাটকের অভিনয় সব দিক দিয়ে আলোড়ন তুলেছিল। অভিনয় সাজসজ্জা, দৃশ্যপট, হ্যান্ডবিল—সব বিষয়েই রঙ্গালয়ের ইতিহাসে অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছিল। নিতাইচরণের মুখে (অভিনেতা—অমৃতলাল) 'is the' বাংলা ভাষায় প্রবাদবাক্য হয়ে উঠেছিল। "নিতাই অমৃতলালের এক অভিনব ও অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। স্বল্পবুদ্ধি এই মানুষটি তাহার 'ইজ দি'-র বাহুল্যে কৌতুকের প্রবাহ অনর্গল করিয়া দিয়া নাটকের শেষের দিকে একটি পুরা মানুষ হইয়া উঠিয়াছেন...মোহিত ও গিরিবালার পুনর্মিলনে আনন্দিত হইয়া বলিয়াছে—'Beg your pardon is the, মোহিতের সঙ্গে ইজ দি নয়। You are is the গিরিবালা—মা'র বর, your pardon'—এখানে হাস্যরস ও করুণরস এক হইয়া গিয়াছে।" [অরুণকুমার মিত্র—অমৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য]। গিরিবালার ভূমিকায় সুশীলাবালার কণ্ঠে গান—'ওগো কেউ বল না গো ভাতার কেমন মিষ্টি'—সেকালে ভীষণ জনপ্রিয় হয়েছিল।

এছাড়া, এই বছরে মনোমোহন বসুর 'রূপকথা' (১৫ জুন), দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'পরপারে' (১৭ আগস্ট), মনোমোহন গোস্বামীর 'ধর্মবিপ্লব' (২৯ মার্চ), রামলাল

বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কাল পরিণয়' (২৫ ডিসেম্বর) এখানে প্রথম অভিনীত হয়।

এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ অবশ্যই প্রয়োজন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখা কৌতুক গীতিনাট্য 'আনন্দবিদায়' স্টার থিয়েটারেই প্রথম অভিনীত হলো ১৬ নভেম্বর, ১৯১২। সঙ্গেই দ্বিজেন্দ্রলালেরই 'পরপারে' অভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল। 'আনন্দবিদায়' গীতিনাট্যে রূপকের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করাই ছিল নাট্যকারের উদ্দেশ্য। এই নিয়ে আনন্দবিদায় অভিনয়ের প্রথম দিনেই গণ্ডগোল শুরু হয়। সেদিনকার মতো নাটকটির অভিনয় বন্ধ হয়ে গেলেও ৫ ডিসেম্বর, ১৯১২ নাটকটি পুনরভিনীত হয়। সঙ্গে অ্যানি অ্যাবটের প্রদর্শনী ও 'আবু হোসেন'-এর অভিনয় হয়েছিল। [এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. ড. দর্শন চৌধুরীর প্রবন্ধ--'স্টার থিয়েটারের ইতিহাস'--নাট্যচিন্তা, মে-অক্টোবর, ২০০১]। নাটকটি অভিনয়ের সময়ে স্টার থিয়েটারের ম্যানেজার ছিলেন রবীন্দ্রভক্ত ও পারিবারিক পরিচিত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং অনারারি 'ড্রামাটিক ডিরেক্টর' ছিলেন অমৃতলাল বসু।

দ্বিতীয়বারের পর 'আনন্দবিদায়' স্টারে তো নয়ই, অন্য কোনো রঙ্গমঞ্চেও আর কখনো অভিনীত হয়নি।

১৯১৩-তে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যু হয় (১৭ মে)। পুরনো নাটকগুলির সঙ্গে মঞ্চে 'বায়োস্কোপ' দেখানো চলছে। টাকার জন্য বাইরে গিয়ে আমন্ত্রিত অভিনয়ও চলছে। সে কারণে কলকাতায় অভিনয় বন্ধ থাকছে। তার মধ্যে মনোমোহন গোস্বামীর 'ধর্মবিপ্লব' ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক অভিনীত হলো (২৯ মার্চ)। অমরেন্দ্রনাথের কৌতুক গীতিনাট্য 'কিসমিস' (৩ মে), অনেকদিন বাদে রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' (১৭ মে) অভিনীত হলো। অমরেন্দ্রনাথের কৌতুকনাট্য 'রোকশোধ' (১ নভেম্বর) প্রথম অভিনয়। কোনও কোনও দিন নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে প্রফেসর চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর হাস্যকৌতুক, ম্যাজিক, টেলিপ্যাথি, গোপালচন্দ্র সিংহরায়ের ক্যারিকেচার ও ভেন্ট্রিলোকুইজম ; এম. এল. সেনের রয়্যাল বায়স্কোপ ইত্যাদি প্রোগ্রামে থাকত।

১৯১৪-তে উল্লেখযোগ্য অভিনয় রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পের নাট্যরূপ (রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত) 'অভিমানিনী' (১৩ জুন)। অভিনয়ে--মন্মথনাথ পাল--ছিদাম। ক্ষেত্রমোহন মিত্র--দুখীরাম। কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়--রামলোচন। বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়--সিভিল সার্জেন। কুসুমকুমারী--চন্দরনা। নরীসুন্দরী--ললিতা। মৃণালিনী--রাধা।

এই সময়ে অমরেন্দ্রনাথ উদ্যোগী হয়ে 'থিয়েটার' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রথম প্রকাশ ১০ জুলাই, ১৯১৪। আটমাস চলে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অহল্যাবাঈ' প্রথম অভিনীত হলো (১৫ আগস্ট)। ৩১ অক্টোবর অভিনীত হলো 'অকলঙ্ক শশী'--রবীন্দ্রনাথের 'দিদি' গল্পের নাট্যরূপ (রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়)। অভিনয় করেছিলেন--

।াথ দত্ত--জয়গোপাল। কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়--দুর্লভ। কুঞ্জলাল চক্রবর্তী--

কেদার নন্দী। হীরালাল দত্ত--মধু ডাক্তার। কুসুমকুমারী--শশী। বসন্তকুমারী--তারা। মৃণালিনী--সুভাষিণী।

এছাড়া ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ক্ষত্রবীর' (৫ ডিসেম্বর) মহাভারতের যুদ্ধ নিয়ে লেখা হলেও ইউরোপের বর্তমান বিশ্বযুদ্ধকে তুলে ধরে। মনে রাখতে হবে, ১৯১৪-তে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়, চলেছিল ১৯১৮ পর্যন্ত। যদিও প্রথম এই মহাযুদ্ধের কোনও প্রত্যক্ষ প্রভাব এদেশে পড়েনি। তবুও পরোক্ষ প্রভাব ভারতবাসী হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল। অমরেন্দ্রনাথ দত্তের 'অভিনেত্রীর রূপ' এখানে প্রথম অভিনীত হল (২৬ ডিসেম্বর)। তাঁর একই নামের উপন্যাসের নাট্যরূপ তিনি নিজেই দিয়েছিলেন।

১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দেও স্টার চলেছে ভালোমন্দ মিশিয়ে। পুরনো সব নাটক অভিনয় করা হচ্ছে। বছরের গোড়াতেই (৩ জানুয়ারি) স্টারের প্রখ্যাত অভিনেত্রী সুশীলাবালা মারা গেলেন। তাই সেদিন স্টারে অভিনয়ের আগে হরিসঙ্কীর্তন হয়েছিল। এই বছরে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য অভিনয় নেই। ভালো নাটকও তেমন রচিত হচ্ছে না। তার মধ্যেও অমরেন্দ্রনাথ দত্তের 'প্রেমের জেপলীন' (৬ ফেব্রুয়ারি), রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেলোয়ারী' (৬ ফেব্রুয়ারি), স্বর্ণকুমারী দেবীর 'কনে বদল' (৬ ফেব্রুয়ারি), মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মাধব রাও' (২৭ এপ্রিল), জগৎচন্দ্র সেনের 'রাজ চন্দ্রধ্বজ' (২১ আগস্ট), মনোমোহন গোস্বামীর 'ভীলেদের ভোমরা' (২৫ ডিসেম্বর) প্রথম অভিনীত হলো। এর মধ্যে Wilson Barret-এর লেখা বিখ্যাত উপন্যাস 'The Sign of the Cross' অবলম্বনে ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ নামেই বাংলায় নাট্যরূপ দেন এবং স্টারে অভিনীত হয় (২৭ ফেব্রুয়ারি)। অমৃতবাজার পত্রিকা (২৩ মার্চ, ১৯১৫) প্রশংসা করে লিখেছিল : 'The Sign of the Cross on the whole, as produced by this Company, marks a distant epoch, in dramatic production.'

এই বছরেই একবার স্টারে বহুখ্যাত মার্কিনী নাট্যশিল্পী Denever Bill তাঁর All Star Co. নিয়ে কলকাতায় এসে স্টারে 'Red Indian War Drama' অভিনয় করে যান (২৪ মার্চ)। তাঁরা বারকয়েক অভিনয় করেছিলেন। স্টার একদিন (১২ অক্টোবর) ইংরেজিতে 'দ্য সাইন অফ দ্য ক্রস' নাটকটির নির্বাচিত দৃশ্যের অভিনয় করে। বাংলায় এই নাটকেরই একই দৃশ্যের অভিনয় করে দর্শকদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিল।

৪ ডিসেম্বর মহাসমারোহে অভিনীত হলো শেক্সপীয়রের Merchant of Venice নাটকের বাংলা রূপান্তর (ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) 'সওদাগর' নামে। অভিনয় করেছিলেন--

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত--কুলীরক (Shylock)। বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়--অনিলকুমার (Antonio)। কুঞ্জলাল চক্রবর্তী--বসন্তকুমার (Bassanio)। লক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায়--রাজা বিক্রম সিংহ (Duke of Venice)। কুসুমকুমারী--প্রতিভা (Portia)। নারায়ণী--নিরজা (Narissa)। আশ্চর্যময়ী--যুথিকা (Jessika)। কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়--নটবর (Launcelot gobbo)।

১৯১৫-এর ১২ ডিসেম্বর 'সাজাহান' নাটকে ঔরংজেবের ভূমিকায় অভিনয় করে যেতে যেতে অমরেন্দ্রনাথ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তৃতীয় অঙ্ক শেষ হওয়ার আগেই তাঁর মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে থাকে। তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। মঞ্চে এই তাঁর শেষ অভিনয়। এর মাস খানেকের মধ্যে, ৬ জানুয়ারি ১৯১৬, অমরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়।

অমরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর স্টার কর্তৃপক্ষ কোনওরকমে কিছুদিন থিয়েটার চালান এবং পুরনো নাটকগুলিই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অভিনয় করতে থাকেন। তখন ম্যানেজার হয়েছেন অমৃতলাল বসু। নতুন অভিনয়ের মধ্যে ভূপেন্দ্রনাথের 'গুরুদক্ষিণা' (১১ মার্চ), হেমেন্দ্রলালের একটি উপন্যাসের নাট্যরূপ (ভূপেন্দ্রনাথ, ৮ এপ্রিল), যোগেন্দ্রনাথ দাসের 'বল্লাস সেন' (১৩ মে), হারাণচন্দ্র রক্ষিতের 'জড়ভরত' (২৪ জুন)। মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পঞ্চশর' এবং মনোমোহন গোস্বামীর 'সাধনা' (২৫ ডিসেম্বর) প্রভৃতি।

১৯১৭-তে পুরনো নাটক সব অভিনীত হচ্ছে। নতুন নাটক অভিনীত হলো, ১৪ এপ্রিল, মাইকেলের জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসুর পঞ্চাঙ্ক নাটক 'দেববালা'। 'চন্দ্রশেখর' নাট্যরূপের ওপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে স্টারে তা অভিনীত হলো ১৪ জুলাই। এ-ই দিনে মিনার্ভা ও মনোমোহন থিয়েটারেও চন্দ্রশেখর অভিনীত হলো।

১৯১৭-এর ৮ আগস্ট 'চন্দ্রশেখর' ও 'খাসদখল' নাটকে প্রথম মঞ্চাবতরণ করলেন অমৃতলাল বসুর কনিষ্ঠপুত্র অসিভূষণ বসু। তিনি 'চন্দ্রশেখর'-এ প্রতাপ এবং 'খাসদখল'-এ মোহিত চরিত্রে অভিনয় করেন।

স্টার থিয়েটারের অবস্থা তখন খুবই সঙ্গীন। ভালো নাটক নেই, ভালো অভিনেতা নেই। দর্শকও কমে আসছে দিনকে দিন। এই অবস্থায় ১২ আগস্ট, ১৯১৭ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অভিনয় বন্ধ থাকে। কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব ছেড়ে 'লেসী' করলেন অনঙ্গমোহন হালদারকে। ম্যানেজার নরেন্দ্রনাথ সরকার। ২২ সেপ্টেম্বর ডা. নারায়ণ বসুর লেখা মহাভারতের 'কুরুক্ষেত্র' নাটক দিয়ে নতুন করে স্টার থিয়েটার চালু হলো। এবং পরপর পুরনো নাটকের মাঝে 'কুরুক্ষেত্র' সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করে চলল। অভিনয়ে—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু—শ্রীকৃষ্ণ। লক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায়—ভীষ্ম। পুষ্পকুমারী—উত্তরা। কুঞ্জলাল চক্রবর্তী—ভীম। হরিসুন্দরী (ব্লাকী)—দ্রৌপদী।

আবার অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে থিয়েটারের। তাই ৩১ অক্টোবর অভিনয়ের পর ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবার স্টার বন্ধ থাকে। ২৯ ডিসেম্বর থেকে পুরনো নাটকগুলির অভিনয় শুরু হয়।

১৯১৮-তেও স্টার থিয়েটার কোনওরকমে চলছিল। 'রণভেরী' নাটক দিয়ে ১ জানুয়ারি শুরু হলো। নাট্যকার দাশরথি মুখোপাধ্যায়। এই নাটকটি দেখতে সেদিন বালগঙ্গাধর তিলক এসেছিলেন। ১৩ জানুয়ারি 'Sole Lesee' হলেন অনঙ্গমোহন, ম্যানেজার—এম. এল. মুখার্জী। অভিনীত হল বঙ্কিমের 'মুচিরাম'-এর নাট্যরূপ (১৯ জানুয়ারি)। মুচিরামের ভূমিকায় কুসুমকুমারীর অনবদ্য অভিনয় সেদিনের পত্রপত্রিকায়

উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল। ১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে আবার স্টার বন্ধ হয়ে যায়। তবে মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত অভিনয় চলেছে। গওহরজানের গান, ম্যাজিক, বায়োস্কোপ ইত্যাদি দিয়ে দর্শক আকর্ষণের চেষ্টা চলেছে। তবে ২৮ এপ্রিলের অনুষ্ঠানের পর একেবারে ২৮ জুন পর্যন্ত স্টার একটানা বন্ধ থাকে। ২৯ জুন থেকে পুরনো নাটক এবং সঙ্গীত, নৃত্য, বায়োস্কোপ ইত্যাদির অনুষ্ঠান চলতে থাকে।

এরপর ৩ আগস্ট থেকে গিরিমোহন মল্লিকের কর্তৃত্বাধীন স্টার থিয়েটারের ভাগ্য ফেরানোর জন্য নামানো হয় শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ বৌ'-এর নাট্যরূপ (ভূপেন্দ্রনাথ)। সাধারণ রঙ্গালয়ে শরৎচন্দ্রের এই কাহিনীর প্রথম নাট্যরূপ অভিনীত হল। অভিনয় করেছিলেন--অমৃতলাল বসু--যদু। মি. পালিত--নীলাম্বর। ক্ষেত্রমোহন মিত্র--পীতাম্বর। কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়--নিতাই। হীরালাল দত্ত--ভুলু। মনোমোহন গোস্বামী--নরহরি। কুসুমকুমারী--বিরাজ বৌ। বসন্তকুমারী--সুন্দরী। নরীসুন্দরী--মোহিনী।

এক সময়ে বঙ্কিমের উপন্যাসের নাট্যরূপ বাংলা থিয়েটারে প্রবলভাবে অভিনীত হয়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। শরৎচন্দ্রের আত্মপ্রকাশের কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর উপন্যাসের নাট্যরূপ অভিনয় শুরু করেছিল স্টার। তারপরে বিভিন্ন থিয়েটারে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপের অভিনয়ও জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

'বিরাজ বৌ' স্টার থিয়েটারের ভাগ্য ফিরিয়ে দিল। আর্থিক সাফল্যে উৎসাহী গিরিমোহন নতুন উদ্যমে থিয়েটার চালাতে লাগলেন। পুরনো নাটকের ফাঁকে ভূপেন্দ্রনাথের প্রহসন 'বিদ্যাধরী' (২১ সেপ্টেম্বর), যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক 'আরব অভিযান' (২ নভেম্বর) অভিনয় করা হলো।

ব্রিটেনের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ উপলক্ষে স্টার বিশেষ অভিনয় (victory celebration performance) করেছিল ২৯ নভেম্বর, ১৯১৮। 'খাসদখল' ও 'জয়দেব'। উল্লেখ্য, এই দিন দরিদ্রদের জন্য প্রবেশমূল্য ছিল না।

গিরিমোহন মল্লিক স্টার থিয়েটারকে আরও ভালোভাবে চালানোর জন্য অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে থিয়েটারের ম্যানেজার নিযুক্ত করেন (৪ ডিসেম্বর)। অপরেশচন্দ্রের সঙ্গে মিনার্ভা থিয়েটার থেকে চলে এলেন তারাসুন্দরী ও নীরদাসুন্দরী। 'Sole Proprietor' হলেন গিরিমোহন। নতুন নাটক প্রস্তুতির জন্য থিয়েটার বন্ধ রইলো। তারপরে ১৪ ডিসেম্বর অভিনয় করলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'কিন্নরী'। এটি আগেই অপরেশচন্দ্র মিনার্ভায় অভিনয় করেছিলেন। (১৭.৮.১৮)। স্টারে অভিনেতা-অভিনেত্রী হলেন : তারকনাথ পালিত--সুধন। তারাসুন্দরী--উৎপল। বসন্তকুমারী--মকরী। নীরদাসুন্দরী--চকুরিশ। স্টারের পাশাপাশি মিনার্ভাও 'কিন্নরী' অভিনয় করে চলল। একসঙ্গে দুই থিয়েটারে 'কিন্নরী' হাউসফুল হতে থাকল। মিনার্ভার মালিক উপেন্দ্রনাথ মিত্র স্টারের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা ঠুকে দিলেন। কিন্তু স্টারেও 'কিন্নরী'র অভিনয় চলতে লাগল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মিটে গেছে। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ শুরু হলো সেই 'কিন্নরী' দিয়ে। চলল

আরো সব পুরনো নাটক। ১৯১৯-এর ২ মার্চ আদালতের আপত্তিতে স্টার 'কিন্নরী'র অভিনয় বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়।

উনিশ শতকের শেষের দিকে গিরিশচন্দ্রকে নিয়ে এইরকম এক মামলা হয়। গিরিশ তখন (১৮৯১) স্টার ছেড়ে নীলমাধব চক্রবর্তীকে নিয়ে সিটি থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেখানে গিরিশের নাটকগুলির অভিনয় শুরু হয়। সেই নাটকগুলি স্টারেও চলছিল। স্টার কর্তৃপক্ষ এই নিয়ে মামলা করেন। স্টার হেরে যায়। বিচারপতি উইলসন তাঁর রায়ে বলেন, কোনও মুদ্রিত নাটক দোকানে বিক্রি হতে শুরু করলেই সে নাটক সকল থিয়েটারই বিনা বাধায় অভিনয় করতে পারবে।

এই রায় মেনেই এতোদিন সব থিয়েটারে অভিনয় চলত। কিন্তু 'কিন্নরী' নাটক খুব সাফল্যলাভ করায়, মিনার্ভা ও স্টারে একইসঙ্গে অভিনয় চলতে থাকায়, মিনার্ভার উপেন্দ্রনাথ মিত্র হাইকোর্টে মামলা করে জেতেন এবং স্টারে 'কিন্নরী' বন্ধ হয়ে যায়। ২৬ বছর ধরে প্রচলিত ও অনুসৃত আইন পালটে যায় এবং এক থিয়েটারে অভিনীত নাটক বিনা অনুমতিতে অন্য থিয়েটারে অভিনয় করা যাবে না—এই আইন চালু হয় (5A of British Copy-right Act of 1912)। এখন অবধি বাংলা থিয়েটারে এই আইন চালু আছে।

১৯১৯—পুরনো নাটকের মধ্যেই নতুন নাটক প্রথম অভিনীত হলো 'ওথেলো' (৮ মার্চ) এবং মুখের মতো (নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮ মার্চ)। শেক্সপীয়রের 'ওথেলো' নাটকের বঙ্গীয় রূপান্তর করেন দেবেন্দ্রনাথ বসু। অভিনয়ে—তারকনাথ পালিত—ওথেলো। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—ইয়াগো। লক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায়—ব্রাচাব্রসিও। প্রবোধচন্দ্র বসু—কেসিও। তারাসুন্দরী—ডেসডিমোনা। নীরদাসুন্দরী—এমিলিয়া। মণিমালা—বিয়াঙ্কা। অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—ডিউক।

প্রবোধচন্দ্র বসুর নির্দেশে পরেশচন্দ্র বসু (পটলবাবু) দৃশ্য পরিকল্পনা করেছিলেন। ওথেলোর অভিনয় দর্শকদের সমাদর লাভ করে। এবং বেশ কিছু রাত্রি 'ওথেলো'র অভিনয় চলেছিল। তারাসুন্দরীর ডেসডিমোনা প্রশংসা লাভ করেছিল। তবুও প্রচুর পরিশ্রম, মহার্ঘ সাজসজ্জা, দৃশ্যসজ্জা ইত্যাদিতে যা খরচ ও মেহনত হয়েছিল, তা উশুল হয়নি।

এবারে অপরেশচন্দ্র নিজের লেখা গীতিনাট্য 'উর্বশী' নামালেন। কালিদাসের সংস্কৃত 'বিক্রমোর্বশীয়ম' অবলম্বনে এটি লেখা। নাচগানে ভরা এই নাটক নামিয়ে অপরেশচন্দ্র আর্থিক ক্ষতিপূরণ করলেন। তারপরে অপরেশচন্দ্র নিজের লেখা 'দুমুখো সাপ' নাটক অভিনয় করলেন। এটি William Congreve-এর 'The Double Dealer' অবলম্বনে লেখা। এই নাটকও ভালোই চলল।

১ নভেম্বর অভিনীত হল দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী'। তাতে উল্লেখযোগ্য খবর হলো নিমচাঁদের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন অভিনেত্রী নীরদাসুন্দরী। এই অভূতপূর্ব প্রয়াসের কথা কর্তৃপক্ষ সগর্বে সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনে জানিয়েও দিয়েছিলেন। এবং

একরাত্রি নয়, বেশ কয়েক রাত্রি নীরদাসুন্দরী নিমচাঁদের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। যদিও বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায়, এই 'Lady artist quite unacquainted with the English Alphabet' এবং এই অভিনেত্রী যে তা সত্ত্বেও 'নিমচাঁদ'-এর অভিনয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন, তাও বিজ্ঞাপনে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

এরপরে অভিনীত হলো রমেশচন্দ্র দত্তের ঐতিহাসিক উপন্যাস 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত' অবলম্বনে ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাট্যরূপ 'জীবনপ্রভাত' (২৯ নভেম্বর)। তারপরে ভূপেন্দ্রনাথের মিলনাত্মক নাটক 'বৈবাহিক' (২৫ ডিসেম্বর)।

১৯২০-তে গিরিমোহন মল্লিক স্টার থিয়েটারের দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন। এবারে অপরেশচন্দ্র 'লিসী' হলেন এপ্রিল মাস থেকে। পুরনো নাটকের মাঝে নতুন নাটক মঞ্চস্থ হলো 'রাখীবন্ধন' (২২ জুন), দেবেন্দ্রনাথ বসুর 'কুইকী' (১৯ জুন) এবং অপরেশচন্দ্রের নিজের নাটক 'ছিন্নহার' (২১ আগস্ট)। ছিন্নহার সে সময়ে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।

১৯২১ খ্রিষ্টাব্দও চলল কোনওরকমে। অপরেশচন্দ্রের 'বাসবদত্তা' (১৫ জানুয়ারি), ক্ষীরোদপ্রসাদের 'মন্দাকিনী' (২ এপ্রিল) এবং অপরেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটক 'অযোধ্যার বেগম' (২ ডিসেম্বর) মঞ্চস্থ হলো।

১৯২২-তেও একই অবস্থা। নতুন নাটকের মধ্যে নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নবাবী আমল' (১ জুলাই), অপরেশচন্দ্রের দুটি নাটক 'অপ্সরা' (১৯ আগস্ট) এবং 'সুদামা' (২৩ সেপ্টেম্বর)।

এই সময় কালে দেখা যাচ্ছে, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অভিনেতা ও ম্যানেজার হয়ে স্টার থিয়েটারে যোগ দিয়ে ধীরে ধীরে নাট্যকার হয়ে উঠলেন। ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুবাদ করছেন, নাট্যরূপ দিচ্ছেন এবং মৌলিক নাটক লিখে চলেছেন। এই মন্দা অবস্থায় অভিনেতা অপরেশচন্দ্র ক্রমে মঞ্চের তাগিদে নাট্যকার হয়ে উঠলেন। তখনকার প্রচলিত নাটকের ধরন এবং বিষয়বস্তু নিয়েই তাঁর নাটকগুলি তৈরি হয়েছিল। সমসাময়িক চাহিদা মিটিয়েই সেগুলির মূল্য শেষ হয়ে গেছে।

তৃতীয় পর্ব (১৯২৩-৩৩)

এবারে গিরিমোহন স্টার ছেড়ে দিলে অপরেশচন্দ্র, প্রবোধচন্দ্র গুহ ও তারাসুন্দরী মিলে থিয়েটারের লীজ নেন এবং পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন অপরেশচন্দ্র স্বয়ং। একা কিছুদিন থিয়েটার চালাবার পর সবাই মিলে একটি যৌথ প্রতিষ্ঠান তৈরি করে 'আর্ট থিয়েটার লিমিটেড' নাম দিয়ে স্টার থিয়েটারের বাড়িতে নতুন নাট্যদল তৈরি করে নাট্যাভিনয় করতে থাকে। ১৯২৩-এর ৩০ জুন অপরেশচন্দ্র রচিত, পরিচালিত ও অভিনীত 'কর্ণার্জুন' নাটক দিয়ে আর্ট থিয়েটারের অভিনয় শুরু হয়। ২৬০ রাত্রি একাদিক্রমে অভিনয়ের রেকর্ড সৃষ্টি করল 'কর্ণার্জুন'। আর্ট থিয়েটার পূর্ণবেগে তাদের থিয়েটার চালাতে লাগল স্টার থিয়েটারের বাড়িতে। একটানা দশ বৎসর অভিনয় চালিয়ে আর্ট থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে। কিছুটা দেনার দায় ও মুলত

'প্রধান উদ্যমী' অপরেশচন্দ্রের মৃত্যু আর্ট থিয়েটারের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটায়।

(স্টার থিয়েটারে আর্ট থিয়েটারের বিশদ বিবরণ পরে রয়েছে। পৃ. ৩৩৫-৩৩৯)

চতুর্থ পর্ব (১৯৩৪-৩৭)

১৯৩৪ থেকে এখানে শিশির ভাদুড়ি ভাড়া নিয়ে তাঁর 'নবনাট্য মন্দির' খোলেন এবং একটানা ১৯৩৭ পর্যন্ত তাঁর দলের অভিনয় এখানে চালান।

আর্ট থিয়েটার-এর অভিনয়ের রমরমা স্টার থিয়েটারের গৌরব বাড়িয়ে দিয়েছিল। তারপরে শিশিরকুমার ভাদুড়ির নবনাট্য মন্দির ও তাঁর বিভিন্নমুখী অভিনয়ের কৃতিত্ব ও সৌকর্যে স্টার থিয়েটার বাড়ির মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

(স্টারের বাড়িতে শিশিরকুমারের নবনাট্য মন্দিরের অভিনয়ের বিবরণ 'শিশিরকুমার' অধ্যায়ে দ্রঃ পৃ ৩১৯-৩৩৪)

পঞ্চম পর্ব (১৯৩৮-১৯৫৩)

স্টার থিয়েটার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মামলায় হেরে শিশিরকুমার স্টার ছেড়ে দিলেন (জুন, ১৯৩৭)। তারপর মামলা-মোকদ্দমার নানা ঝামেলায় স্টার প্রায় বন্ধই থাকে। ১৯৩৭-এর ৪ অক্টোবর, যোগেশ চৌধুরী স্টার থিয়েটার ভাড়া নিলেন। তাঁর নাট্যদলের নাম 'নাটমহল'। এই সম্প্রদায়ের হয়ে যোগেশ চৌধুরী তাঁর নিজের লেখা নাটক 'গৌরাঙ্গসুন্দর' (৪ অক্টোবর) অভিনয় করালেন। তারপর বিমল পাল নামে একজন কিছুদিনের জন্য স্টার থিয়েটারের 'লেসী' হন। তিনি তৈরি করলেন 'স্টেজ অ্যান্ড স্ক্রিন সিন্ডিকেট'। স্টার মঞ্চে এই সম্প্রদায় অভিনয় করেছিল রমেশ গোস্বামীর 'বিদ্যাপতি' (১৭ নভেম্বর), অয়স্কান্ত বক্সীর 'অভিসারিকা' (২৫ ডিসেম্বর), ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'অপরাজিতা' (৩০ ডিসেম্বর)। ১৯৩৭ এইভাবে শেষ হলো।

১৯৩৮-এর মার্চ পর্যন্ত 'স্টেজ অ্যান্ড স্ক্রিন সিন্ডিকেট' বিমল পালের কর্তৃত্বে স্টার থিয়েটারে অভিনয় চালিয়ে যায়। এই বছরে নতুন নাটকের মধ্যে শচীন সেনগুপ্তের 'কালের দাবি' (১২ মার্চ) উল্লেখযোগ্য।

বিমল পাল স্টার ছেড়ে দিলেন। মিনার্ভা থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রকুমার মিত্রের পুত্র সলিলকুমার মিত্র স্টারের নতুন 'লিসী' হলেন। নাট্যকার পরিচালক ও অভিনেতা হিসেবে যোগ দিলেন মহেন্দ্র গুপ্ত। ১৯৩৮-এর ২৯ মার্চ শুরু হলো স্টারের নতুন পর্ব।

এই সময় থেকে স্টার থিয়েটারে শুক্রবার ছাড়া সপ্তাহের প্রতিদিন অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। মহেন্দ্র গুপ্তের নিয়ন্ত্রনাধীনে খুবই সুষ্ঠুভাবে এই নতুন অভিনয় সূচি পালিত হতে থাকে। তখন স্টারে অভিনয় করতেন মহেন্দ্র গুপ্ত স্বয়ং, বিপিন গুপ্ত, ভূপেন চক্রবর্তী, শেফালিকা, পূর্ণিমা প্রমুখ।

মিনার্ভা থিয়েটার থেকে সলিলকুমার মিত্র স্টারে এসে প্রথমে মিনার্ভায় অভিনীত নাটকগুলিই চালাবার চেষ্টা করেন। তার সম্পর্কিত ভ্রাতা কালীপ্রসাদ ঘোষ প্রথম দিকে দায়িত্ব নিয়ে মিনার্ভার চলতি নাটক, যেমন 'ধর্মদ্বন্দ্ব' 'গয়াতীর্থ', 'শিবার্জুন' স্টারে অভিনয় করান। তার পরিচালনায় এবার এখানে অভিনীত হল নতুন নাটক 'চক্রধারী' (৩ জুন, ১৯৩৮)। নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্ত। পরেই সুধীন্দ্রনাথ রাহার 'বাংলার বোমা' (৩০ সেপ্টেম্বর), মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাসুদেব'।

১৯৩৮-এর ২০ আগস্ট স্টার থিয়েটারের জমি কিনে নেন অমিয়কুমার দে এক লক্ষ একাত্তর হাজার টাকায়। জমির মালিক নতুন হলেও স্টার থিয়েটার পরিচালনার পুরো দায়িত্বে রইলেন সলিলকুমার মিত্র। তাঁরই সুষ্ঠু ও নিপুণ কর্তৃত্বাধীনে স্টার থিয়েটার ১৯৩৮-এর ২৯ মার্চ থেকে ১৯৭১-এর ৩০ মার্চ পর্যন্ত দীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর একটানা নাট্যাভিনয় চালিয়ে গেছে।

এবারে নাট্য পরিচালনার দায়িত্বে এলেন মহেন্দ্র গুপ্ত। অক্টোবর, ১৯৪০। তারপর থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত মহেন্দ্র গুপ্ত একটানা স্টারের নাট্য পরিচালনা করেছেন, প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন এবং প্রয়োজনে অনেক নাটক রচনা করেছেন। তাই নাট্যাভিনয়ের দিক থেকে এই পর্বকে (১৯৩৮-৫৩) স্টার থিয়েটারে মহেন্দ্র গুপ্তের পর্ব বলা যেতে পারে।

মহেন্দ্র গুপ্তের জাতীয় ভাবাত্মক নাটকগুলি এখানে জন সমাদর লাভ করে। 'নন্দকুমার', 'টিপু সুলতান', 'রণজিৎ সিংহ', 'শতবর্ষ আগে' প্রভৃতি নাটক খুবই খ্যাতিলাভ করে। 'নন্দকুমার' তো একটানা দু'শো রজনী অভিনয় হয়েছিল। এখান থেকেই মহেন্দ্র গুপ্ত নাট্যকার, পরিচালক ও অভিনেতা হিসাবে বঙ্গরঙ্গমঞ্চে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

মনে রাখতে হবে, এই পর্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫) শুরু হয়। যুদ্ধের ভয় ও জাপানি বোমার আতঙ্কে তখন কলকাতাবাসী আতঙ্কিত। শহর কলকাতায় ব্ল্যাক-আউট। সারাদেশে খাদ্যাভাব, দুর্ভিক্ষ, মহামারী। পঞ্চাশের মন্বন্তরের ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন। তার সঙ্গে চোরাচালানি, কালোবাজারি, মজুতদারি। দেশজুড়ে ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রাম। সে এক বিপর্যয়কর অবস্থা। বিশ্বযুদ্ধ মিটলেই ১৯৪৬-এর ভ্রাতৃঘাতী নিষ্ঠুর দাঙ্গা, ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা এবং বঙ্গবিভাগের ক্ষত ও জ্বালা। কাতারে কাতারে উদ্বাস্তুর আগমন। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি বিপর্যস্ত। এই ভয়ঙ্কর ও বিভীষিকাপূর্ণ সময়ে কলকাতার বুকে রঙ্গালয়গুলিও মহাসমারোহে নাট্যাভিনয় চালাতে পারেনি। অন্য থিয়েটারগুলির মতো স্টারও মাঝে মাঝে নির্জীব হয়ে পড়ছিল। তার মধ্যেও মহেন্দ্র গুপ্তের জাতীয় ভাবাত্মক নাটক রচনা ও অভিনয় এবং সাফল্যলাভ অবশ্যই উল্লেখের দাবি রাখে। ঐতিহাসিক নাটকের উপস্থাপনা ও তার অভিনয়ের কৃতিত্বে তিনি এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছেন।

১৯৩৯-এ অভিনীত হল ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুর্গাশ্রীহরি' (১৮ মার্চ), মহেন্দ্র

গুপ্তের 'সোনার বাংলা' (২৭ মে), ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রীর 'জাহ্নবী' (২ সেপ্টেম্বর), সুধীন্দ্রনাথ রাহার 'জননী জন্মভূমি' (২৪ নভেম্বর)।

১৯৪০-এ মহেন্দ্র গুপ্তের তিনটি নাটক--'সতী তুলসী' (১৬ মার্চ)। 'উত্তরা' (১৮ মে), 'পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ' অভিনীত হল। পরে সুধীন্দ্রনাথ রাহার 'রণদাপ্রসাদ' (২৮ সেপ্টেম্বর)। এই পর্যন্ত কালীপ্রসাদ ঘোষ স্টারের নাটকগুলি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। যদিও মহেন্দ্র গুপ্তই মূল দায়িত্ব পালন করতেন। অক্টোবর ১৯৪০ থেকে মহেন্দ্র গুপ্ত পুরোপুরি নাট্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। নামালেন 'গঙ্গাবতরণ' (২৬ অক্টোবর) এবং 'উষাহরণ'--দুটিই তাঁর লিখিত ও পরিচালিত।

১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে মহেন্দ্র গুপ্তের 'কমলেকামিনী' (৪ এপ্রিল) ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রীর 'বৃত্রসংহার' (১০ জুলাই), অমল চট্টোপাধ্যায়ের 'মদনমোহন' (১৮ সেপ্টেম্বর) প্রভৃতি অকিঞ্চিৎকর সব নাটক মঞ্চস্থ হল।

১৯৪২-এ অভিনীত হল মহেন্দ্র গুপ্তের 'রাণী ভবানী' (২৪ জানুয়ারি) ও অলকানন্দা (১৮ এপ্রিল)। অশ্বিনীকুমার ঘোষের 'পুরীর মন্দির' (১৮ জুলাই) এবং মহেন্দ্র গুপ্তের 'মহালক্ষ্মী' (৯ অক্টোবর)।

১৯৪৩-এ মহেন্দ্র গুপ্তের 'রাণী দুর্গাবতী' (৯ জানুয়ারি), 'মহারাজা নন্দকুমার' (৪ জুন) সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হল। এগুলি ছাড়া বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের 'কৃষ্ণার্জুন' (১১ ফেব্রুয়ারি), রবিপাত্রের 'সুকন্যা' (২২ এপ্রিল), বঙ্কিমের দেবীচৌধুরানীর নাট্যরূপ (মহেন্দ্র গুপ্ত, ২৯ সেপ্টেম্বর), দুর্গেশনন্দিনীর নাট্যরূপ (মহেন্দ্র গুপ্ত, ২২ ডিসেম্বর) অভিনীত হল।

১৯৪৪-এর প্রযোজনা হল 'টিপুসুলতান' (মহেন্দ্র গুপ্ত ১৯ মে) পুরনো নাটক 'কেদার রায়' কিংবা 'অযোধ্যার বেগম' (অপরেশচন্দ্র) অভিনীত হয়েছিল।

১৯৪৫-এর উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা 'কঙ্কাবতীর ঘাট' (৫ মে), হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'পলাশী' (১১ নভেম্বর)। তারপরে অভিনীত হল যুগান্তকারী নাটক 'শতবর্ষ আগে' (২১ ডিসেম্বর)। এই নাটকের অভিনয় সে যুগে খুবই সাড়া ফেলেছিল। ব্রিটিশ সরকার নাটকটির অভিনয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল।

১৯৪৬-এ আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'মনীশের বৌ' (৩০ এপ্রিল), মহেন্দ্র গুপ্তের 'হায়দর আলি' (১৫ আগস্ট) ও 'রায়গড়' (১৪ সেপ্টেম্বর) অভিনয় হয়।

১৯৪৭-এ মহেন্দ্র গুপ্তের 'স্বর্গ হতে বড়' (১৫ ফেব্রুয়ারি) অভিনয় করা হল। এই নাটকেই মহেন্দ্র গুপ্ত সর্বপ্রথম অভিনেতা হিসেবে মঞ্চে নামেন। ভূমিকা ছিল 'অমরেশ' চরিত্র। এরপরে অভিনীত হয় 'শনিবার বাইশে' (দিলীপ দাশগুপ্ত, ৭ মে), 'পার্থসারথী' (উৎপল সেন), শ্রীদুর্গা (মহেন্দ্র গুপ্ত, ১২ অক্টোবর)। তাছাড়া বঙ্কিমের 'রাজসিংহ' (নাট্যরূপ : মহেন্দ্র গুপ্ত, ২০ ডিসেম্বর)।

১৯৪৮-এ তারাশঙ্করের বিখ্যাত উপন্যাস 'কালিন্দী'র নাট্যরূপ (মহেন্দ্র গুপ্ত) অভিনীত হয় ২৫ জুন। এর আগে তারাশঙ্করের নিজেরই দেওয়া 'কালিন্দী' উপন্যাসের

নাট্যরূপ নাট্যনিকেতনে (১২ জুলাই, ১৯৪১) অভিনীত হয়েছিল। কিন্তু সে নাটক বেশিদিন চলেনি। মহেন্দ্র গুপ্তের নাট্যরূপটি স্টার থিয়েটারে বহুরাত্রি অভিনীত হয়ে খ্যাতিলাভ করেছিল। এছাড়া অন্য অভিনয়ের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ রাহার 'গোলকোণ্ডা' (২৩ ডিসেম্বর) পুরনো নাটক হিসেবে অভিনীত হয়েছিল।

১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে সুধীন্দ্রনাথ রাহার 'দিল্লী চলো' (২৪ ফেব্রুয়ারি) মহেন্দ্র গুপ্তের 'বিজয়নগর' (২৩ জুলাই) ও 'সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত' (২৩ ডিসেম্বর) অভিনীত হয়েছিল। এই বছরে রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবি উপন্যাসের নাট্যরূপ (মহেন্দ্র গুপ্ত) ৭ মে মঞ্চস্থ হয়। রবীন্দ্রনাথের এই একটি নাটক বা নাট্যরূপ এই পর্বে স্টারে অভিনীত হয়েছিল।

১৯৫০-এ মহেন্দ্র গুপ্তেরই দুটি নাটক 'উর্বশী' (৯ ফেব্রুয়ারি) এবং 'পৃথ্বীরাজ' (২০ ডিসেম্বর) অভিনীত হয়।

১৯৫১-তে 'মেঘমালা' (সুরেশচন্দ্র চৌধুরী, ২ মে), শকুন্তলা (মহেন্দ্র গুপ্ত, ১২ জুলাই) অভিনীত হওয়ার পর তারাশঙ্করের নাটক 'বালাজীরাও' (৬ অক্টোবর) মহেন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনা ও পরিচালনায় অভিনীত হলো।

১৯৫২ খিষ্টাব্দের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা হলো রমেশচন্দ্র দত্তের 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' অবলম্বনে মহেন্দ্র গুপ্তের নাট্যরূপ 'সূর্যমহল'. ১৯ মে অভিনীত হলো।

১৯৫৩-এর অভিনয়ের তালিকায় রয়েছে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কলঙ্কবতী' (৬ মার্চ), মহেন্দ্র গুপ্তের 'রাজনর্ত্তকী' (২৩ মে)। নীহাররঞ্জন গুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে 'পদ্মিনী' (নাট্যরূপ মহেন্দ্র গুপ্ত) ২ এপ্রিল অভিনয় করা হল।

১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দেই মহেন্দ্র গুপ্তের যুগ শেষ হল। এই বছরের শেষের দিকে দেখা গেল, স্টারের পরপর বেশ কয়েকটি নাটকে তেমন দর্শক হচ্ছে না, কর্তৃপক্ষের লোকসান যাচ্ছে। মনে করা হলো, মহেন্দ্র গুপ্ত আর আগের মতো মনঃসংযোগ বা নিষ্ঠা সহকারে থিয়েটারের কার্যাবলী পালন করতে পারছেন না। তাই থিয়েটারের মালিক সলিলকুমার মিত্র মহেন্দ্র গুপ্তকে ছেড়ে দিয়ে নিজের হাতেই সব দায়িত্ব তুলে নিলেন। মহেন্দ্র গুপ্ত বিদায় নিলেন।

এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ ও তারাশঙ্করের উপন্যাসের নাট্যরূপ বা নাটক কিংবা বঙ্কিমের একাধিক উপন্যাসের নাট্যরূপ ছাড়া বাদবাকি প্রায় সব নাটকই মহেন্দ্র গুপ্তের। বাকি কিছু অন্য নাট্যকারের। এই পর্বের বড়ো ঘটনা ভারতের স্বাধীনতা লাভ। ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা দ্বিখণ্ডিত হওয়ার অভিশাপ পশ্চিমবঙ্গকে ভোগ করতে হয়েছে। পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৯৪৩), দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫), সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (১৯৪৬), এবং এর পরেই দেশভাগের মাধ্যমে স্বাধীনতা--পশ্চিমবঙ্গের বিপর্যয়কে বাড়িয়ে তুলেছে। দলে দলে উদ্বাস্তুর ভিড়ে কলকাতা জনাকীর্ণ—পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি বিপর্যস্ত।

এইসব প্রাণান্তকর দেশিয় পরিস্থিতিতে আমোদ-প্রমোদের রঙ্গালয়গুলি হয়ে পড়ল প্রাণহীন। সাধারণ রঙ্গালয়গুলি কোনওরকমে অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছে--মালিকেরাও

দর্শকাভাবে দেনাগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। তবুও রঙ্গালয়গুলি অভিনয়ধারা চালিয়ে যাচ্ছিল। নাট্যকার পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্তের মন্তব্য :

'স্বাধীনতা লাভের পর যে দুর্যোগের ঝড় সাধারণ রঙ্গালয়গুলির ওপর দিয়ে বয়ে গেছে—আমি তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। সন্ধ্যায় প্রতিটি রঙ্গালয়ে আলো জ্বলত বটে, কিন্তু দর্শক সংখ্যা ছিল অত্যন্ত সীমিত এবং রঙ্গালয়গুলির অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও দৃশ্যপটগুলির ছিল জরাজীর্ণ অবস্থা। সুলিখিত নাটক মঞ্চস্থ করেও এইসময়ে দর্শকদের মন জয় করা যায় নি।'

এই সময়কার অবস্থা বর্ণনা করছেন বুদ্ধদেব বসু :

'যত চেষ্টাই করা যাক থিয়েটারকে আর বাঁচানো যাবে না, সে মরতে বসেছে। কোনও থিয়েটারের মধ্যে ঢুকলে তার ধূলিমলিন জীর্ণ আসবাব, পানের পিকমাখা মেঝে ও দেওয়াল, রঙ্গমঞ্চে লক্ষপতির ড্রইংরুমে দুখানা ভাঙা চেয়ার—প্রতিটি ছোট ছোট জিনিস হা হা করে বলে--নেই, নেই, কিছু আর নেই। রঙ্গালয়ের এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হল, আমাদের থিয়েটারের প্রাণবন্ত কিছু আর নেই, যারা থিয়েটার চালান তাঁরা নিজেরাই নিরুৎসাহ।'

তাছাড়া এই সময়ে (১৯৩১ থেকে) নবনির্মিত চলচ্চিত্রে কথা বলা শুরু হয়েছে। এতদিন থিয়েটারে 'বায়োস্কোপ' দেখানো হতো। তাতে থাকত শুধু চলমান চিত্র, কথা ছিল না। এই নতুন কথাবলা চলচ্চিত্র এদেশেও তৈরি হয়ে সিনেমা হলে দেখানো শুরু হয়েছে। এই চলচ্চিত্র থিয়েটারকে ক্রমশই কোণঠাসা করে দিয়েছিল, প্রথমদিকে।

অন্যদিকে নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রী প্রায়শই আসছিল ফিল্ম থেকে, থিয়েটার থেকে চলে যাচ্ছিল ফিল্মে। কেউ দু চারদিন স্টেজে দেখা দিয়েই 'তারকা' হওয়ার মতলবে চলচ্চিত্র জগতে ছুটেছেন। বুদ্ধদেব বসু এদের 'তারকা' না বলে 'তাড়কা' বলেছেন। কারণ, 'ফিল্ম আজ রাক্ষসীর মতো সমস্ত বাংলাদেশকে গিলে খাচ্ছে।'

টাকাওয়ালারা থিয়েটারে টাকা না ঢেলে নতুন এই প্রমোদ মাধ্যম চলচ্চিত্রে অর্থ লগ্নী করতে লেগেছে। সব দিক দিয়েই তখন বাংলা থিয়েটারের নাভিশ্বাস। মহেন্দ্র গুপ্ত সাধারণ রঙ্গালয়ের এই অভিশপ্ত বিপর্যস্ত অবস্থানেই স্টার থিয়েটারে নিয়মিত নাটক রচনা, নাট্য পরিচালনা এবং নিজে অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করে থিয়েটারকে প্রাণবন্ত করে রেখেছিলেন।

.এই পরিস্থিতি স্মরণে রাখলে, এই সময়কার স্টার থিয়েটারের এবং মহেন্দ্র গুপ্তের কৃতিত্বকে কোনো অংশেই খাটো করে দেখা যায় না। তবে একথা ঠিক যে, মন্বন্তর ও যুদ্ধের পটভূমিকায় বাঙালির জনমানসের কোনও প্রতিক্রিয়ার নাট্যরূপ মহেন্দ্র গুপ্ত দেখাতে পারেন নি। কিংবা স্বাধীনতা এবং দেশভাগের প্রতিক্রিয়ার কোনও ছবি তিনি আঁকতে পারেন নি। তাছাড়া শিশিরকুমার ভাদুড়ি তাঁর আগেই বাংলা রঙ্গালয়ে যে নতুন নাট্যাভিনয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছিলেন, মহেন্দ্র গুপ্ত তার যথাযোগ্য উত্তরসূরি হয়ে উঠতে পারেন নি। নাট্যভাবনায় ও মঞ্চায়নে তিনি শিশির পূর্ববর্তী ধারারই অনুবর্তন করে গেছেন।

আর একটি কথা। ১৯৪৩ থেকে মহামন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে এ দেশে গণনাট্য সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। তাদের নাট্য আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলা নাটকের বিষয়বস্তু, উপস্থাপনা এবং গণমানসে উদ্দীপনা সৃষ্টির যে নবতম প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল তার কোনও প্রভাবই স্টার থিয়েটারে সমকালে পড়েনি। মন্বন্তরের বুকে বসে যখন গণনাট্য সঙ্ঘ বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী', 'নবান্ন' অভিনয় করে বাংলা নাটক ও তার প্রয়োগ দিয়ে সমকালের সমাজদ্বন্দ্বের প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করে চলেছে, স্টার থিয়েটার তখনো সেই ঐতিহাসিক রোমান্সের উদ্দীপনায় দেশপ্রেমের ভাবাবেগের তারল্য উদগীরণ করে চলেছে। মহেন্দ্র গুপ্তের ও তাঁর সময়কার স্টার থিয়েটারের এই সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধতাও অবশ্যস্বীকার্য। একথা ঠিক, সেই সময়কার কোনও সাধারণ রঙ্গালয়ই সেই দায়িত্ব পালন করতে পারেনি।

ষষ্ঠ পর্ব (১৯৫৩-১৯৭১)

১৯৫৩-তে মহেন্দ্র গুপ্ত স্টার ছেড়ে দিলেন। অক্টোবর মাসে পরিচালক ও নাট্যকার হিসেবে যোগ দিলেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। এবারে সব দায়িত্ব নিলেন সলিলকুমার মিত্র। নতুন মালিকানায় নতুন করে রঙ্গালয় সাজানো হল। মঞ্চেরও আমূল সংস্কার করা হলো। সাজসজ্জা অলঙ্করণ নতুনভাবে করা হল। সামনের মন্দিরের চূড়ার মতো অংশটি অক্ষুণ্ণ রেখে নাট্যশালার বাকি অংশ পুনর্নির্মাণ করা হল। ১৯৫৬-তে 'পরিণীতা' অভিনয়ের সময়ে সমগ্র রঙ্গালয় হল শীততাপনিয়ন্ত্রিত। সেই প্রথম কলকাতার কোনো পেশাদার রঙ্গালয় 'এয়ারকন্ডিশনড্' করা হয়। তখন থেকে স্টার বাংলার শ্রেষ্ঠ নাট্যশালারূপে পরিগণিত হল।

১৯৫৩-এর ১৫ অক্টোবর প্রযোজিত হল 'শ্যামলী'। নিরুপমা দেবীর ঐ নামের উপন্যাসের নাট্যরূপ দিলেন দেবনারায়ণ। নির্দেশনায় রইলেন শিশির মল্লিক ও যামিনী মিত্র। সহকারি পরিচালনায় রইলেন দেবনারায়ণ। নাট্যকারও তিনি। শিল্প নির্দেশক ও আলোকসম্পাতে সতু সেন।

'শ্যামলী' নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে বাংলা পেশাদারি রঙ্গালয়ে যুগান্তর ঘটে গেল। একাদিক্রমে ২৬ মাস ধরে ৪৮৪ রাত্রি অভিনীত হয়ে সর্বকালীন অভিনয়ের এবং জনপ্রিয়তার রেকর্ড সৃষ্টি করল। প্রথম পর্যায়ে শেষ-অভিনয় ১৩ নভেম্বর, ১৯৫৫। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বাংলা ব্যবসায়িক ও পেশাদার মঞ্চে যে একঘেয়েমি এবং রক্তাল্পতা দেখা দিয়েছিল, 'শ্যামলী' সেখানে নতুন প্রাণাবেগ এনেছিল। পেশাদার থিয়েটার নতুনভাবে উজ্জীবিত হয়ে উঠল। তদানীন্তন বাংলা চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তম সুদর্শন অভিনেতা উত্তমকুমার এবং খ্যাতিময়ী অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়কে দিয়ে মূল ভূমিকায় অভিনয় করানো হলো। উত্তমকুমারের জনআকর্ষণের ক্ষমতা এবং শ্যামলী চরিত্রে সাবিত্রীর অভিনয়কুশলতা বাংলা পেশাদার মঞ্চে নতুন প্রাণ সঞ্চার করল। একটি বোবা মেয়ের আশা আকাঙ্ক্ষা কামনার মধ্য দিয়ে 'সেন্টিমেন্ট'-এর উত্তুঙ্গ স্তরে

নাট্যবিষয় ও ভাবনাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ভাবাবেগ আপ্লুত দর্শক 'শ্যামলী'কে সাদরে গ্রহণ করেছিল সেদিন। উত্তম-সাবিত্রীর সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন সরযূবালা দেবী, জহর গাঙ্গুলি, অনুপকুমার প্রভৃতি সেকালের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অভিনেত্রীরা। তাছাড়া ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি রায়, শ্যাম লাহা, সন্তোষ সিংহ, মিহির ভট্টাচার্য, অপর্ণা দেবী, শেফালী দত্ত প্রমুখ শিল্পীরা তো ছিলেনই।

'শ্যামলী'র জনপ্রিয়তায় উৎসাহিত স্টার থিয়েটার তাদের সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন নাটক অভিনয়ের প্রথা তুলে দিলেন। এর আগে সাধারণ রঙ্গালয়ে সপ্তাহে বুধ ও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এবং শনি ও রবিবারে ম্যাটিনী ও সন্ধ্যায় অভিনীত হতো। শনি ও রবিবারে মূল নাটক অভিনয় করা হতো এবং মধ্য-সাপ্তাহিকে অন্য নাটক অভিনয়ের প্রথা চলে আসছিল। 'শ্যামলী' নাটকের জনপ্রিয়তা দেখে এই নিয়ম পালটে স্টার থিয়েটারে বৃহস্পতি, শনি ও রবিবারে একই নাটকের অভিনয় চলতে থাকে। পরবর্তীকালে সব সাধারণ রঙ্গালয়ই এই প্রথা মেনে তাদের অভিনয় চালিয়ে যেতে থাকে।

স্টারের তখন মূল নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত। তিনি 'শ্যামলী'র সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে পরপর জনপ্রিয় উপন্যাসগুলির নাট্যরূপ দিলেন এবং সেগুলির অভিনয়ে স্টার থিয়েটার দিনে দিনে খ্যাতির শিখরে উঠে গেল।

অভিনীত হলো 'পরিণীতা' (১৫.১২.৫৫)। শরৎচন্দ্রের ঐ নামের উপন্যাসের নাট্যরূপ (দেবনারায়ণ গুপ্ত)। 'পরিণীতা'র পরিচালনায় রইলেন শিশির মল্লিক। এই নাটকের অভিনয়ে আর উত্তমকুমার ছিলেন না, তিনি 'শ্যামলী' অভিনয় চলাকালীনই স্টার ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেখানে এলেন চলচ্চিত্রের আর এক খ্যাতিমান অভিনেতা অসিতবরণ। সঙ্গে গায়ক তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

'পরিণীতা' টানা ১৩৫ রাত্রি চলার পর (১৫.৭.৫৬) প্রায় সাড়ে ছয়মাস থিয়েটার বন্ধ রেখে সলিলকুমার মিত্র থিয়েটার বাড়ির সংস্কারে হাত দিলেন। ভাস্কর সুধাংশু চৌধুরীর পরিকল্পনায় ভেতরের সব সাজানো হলো। এবারে চালু করা হলো শীতাতপনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা। স্টার থিয়েটার বাঙালির গৌরবের বস্তুতে পরিণত হলো।

১৯৫৭-এর ৭ জানুয়ারি আবার স্টার চালু হলো নব সাজে সেজে। নামানো হলো 'শ্রীকান্ত'। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাসের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব অবলম্বনে নাট্যরূপ দিলেন দেবনারায়ণ এবং পরিচালনায় শিশির মল্লিক। নাটকের জন্য গান লিখলেন শৈলেন রায় তাতে সুর দিলেন দুর্গা সেন। মঞ্চ পরিকল্পনায় মণীন্দ্র দাস।

নিয়মিত শিল্পী ছাড়াও নতুন আনা হয়েছে সিনেমার জনপ্রিয় নায়ক নির্মলকুমারকে, সঙ্গে শিপ্রা মিত্র এবং সুখেন দাস। একটানা তিনশ' রাতের বেশি চলে বন্ধ হলো ২ মে, ১৯৫৮। অভিনয়ে ছিলেন—সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়—অভয়া। জহর গঙ্গোপাধ্যায়—অভয়ার স্বামী। নির্মলকুমার—শ্রীকান্ত। শিপ্রা মিত্র—রাজলক্ষ্মী। সুখেন দাস—ইন্দ্রনাথ। অনুপকুমার—নতুনদা। খ্যাতিমান শিল্পীদের অভিনয়ের গুণে, শরৎচন্দ্রের কাহিনীর আকর্ষণে,

দেবনারায়ণের নাট্যরূপের কৃতিত্ব এবং দৃশ্যসজ্জা, দৃশ্য-পরিবর্তন ও আলোক সম্পাতের নৈপুণ্যে 'শ্রীকান্ত' জনপ্রিয় হয়ে গেল।

'শ্রীকান্তের' সাফল্যে নামানো হলো ঐ শ্রীকান্ত উপন্যাস থেকেই 'রাজলক্ষ্মী' (২.৬.৫৮)। শ্রীকান্ত উপন্যাসের ৩ ও ৪ পর্ব অবলম্বনে এই অংশেরও নাট্যরূপ দিলেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। পরিচালনা--শিশির মল্লিক। মঞ্চ ও আলো--মণীন্দ্র দাস। গীতরচনা--শৈলেন রায়। সুরকার হিসেবে যোগ দিলেন জনপ্রিয় গায়ক মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। স্টারের নিয়মিত শিল্পীরাই অভিনয় করলেন। চলল টানা ১৩৪ রাত্রি, ২১ ডিসেম্বর, ১৯৫৮ পর্যন্ত।

এবারে নতুন নাটকের প্রস্তুতির জন্য দেরি না করে আগের 'শ্যামলী' দ্বিতীয় পর্যায়ে নামানো হলো (২৫.১২.৫৮) এবং ৩৮ রাত্রি অভিনয়ের শেষে (১৫.২.৫৯) বন্ধ করে দিয়ে নতুন নাটক অভিনয় শুরু হলো।

মনোজ বসুর 'বৃষ্টি বৃষ্টি' উপন্যাসের নাট্যরূপ (দেবনারায়ণ) 'ডাকবাংলো' নাটক। অভিনীত হলো ১২ মার্চ, ১৯৫৯। নাট্যকারের দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গে দেবনারায়ণ স্টারের নাট্য পরিচালকও হলেন। ডাকবাংলো দিয়ে শুরু। মঞ্চসজ্জা ও আলো : অনিল বসু। নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রী হিসেবে যোগ দিলেন মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের প্রখ্যাত বর্ষীয়ান নট ছবি বিশ্বাস এবং খ্যাতিমান নায়িকা সন্ধ্যা রায়। আগের শিল্পীরাও রইলেন। অনেকদিন বাদে আবার পেশাদারি মঞ্চে এসে ছবি বিশ্বাস 'বীরেশ্বর'-এর ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করলেন। দুশো রাতের বেশি চলল 'ডাকবাংলো'।

১৯৬০-এর মার্চ নতুন নাটক 'পরমারাধ্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' দেবনারায়ণের মৌলিক রচনা। বাংলা মঞ্চে শ্রীরামকৃষ্ণ বরাবরই আদৃত হন। তাঁর জীবনীর নাটক কিন্তু বেশিদিন চলল না। দেবনারায়ণের কুশলী পরিচালনায় এবং শিল্পীদের অভিনয়ের গুণেও (গিরিশ চরিত্রে ছবি বিশ্বাস) মোটে ৭৬ রাত্রি অভিনীত হয়ে বন্ধ হলো। নতুন নাটক তখনো তৈরি হয়নি বলে আবার 'ডাকবাংলো' নামিয়ে দেওয়া হলো (২১.৭.৬০)। ১১ রাত্রি চলার পর নতুন নাটক 'শ্রেয়সী'র অভিনয় শুরু হলো।

১৯৬০-এর ১১ আগস্ট 'শ্রেয়সী'র প্রথম অভিনয়। সুবোধ ঘোষের ঐ নামের উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে পরিচালনা করলেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। নায়ক হলেন চলচ্চিত্রের অভিনেতা বসন্ত চৌধুরী। লিলি চক্রবর্তীও এই প্রথম পেশাদার মঞ্চে অভিনয় করতে এলেন। সঙ্গে রইলেন কমল মিত্র, ছবি বিশ্বাস প্রমুখ দিকপাল অভিনেতৃবৃন্দ। 'শ্রেয়সী' জন সমাদর লাভ করল। চলল টানা ১৯৬২-এর ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, ৩৭৩ রাত্রি।

এরপরেই মঞ্চস্থ হলো 'শেষাগ্নি' (৮ মার্চ, ১৯৬২)। উপন্যাস শক্তিপদ রাজগুরুর। নাট্যরূপ ও পরিচালনা দেবনারায়ণ গুপ্ত। এই নাটকটি চলেছিল ২২০ রাত্রি, দু'দফায়। শেষ অভিনয় হয় ১৯৬৩-এর ৩ ফেব্রুয়ারি।

মাঝে চীন-ভারত সংঘর্ষ শুরু হলে মন্মথ রায়ের এই উপলক্ষে লেখা

দেশাত্মবোধেক নাটক 'স্বর্ণকীট', সঙ্গে তাঁরই লেখা 'কারাগার' স্টার থিয়েটার কয়েক রাত্রি অভিনয় করেছিল।

'তাপসী' নাটকের প্রথম অভিনয় হয় ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৩। নীহাররঞ্জন গুপ্তের ঐ নামের উপন্যাস থেকে নাট্যরূপ দিলেন দেবনারায়ণ। তাঁরই পরিচালনা। সঙ্গীত পরিচালনা--অনাদি দস্তিদার। চলচ্চিত্রের খ্যাতিমান অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এই প্রথম পেশাদার মঞ্চে এলেন ; অভিনয় করলেন নায়ক দীপকের চরিত্রে। মঞ্চে তাঁর নতুনমাত্রার অভিনয় দর্শক ও সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করল। এর আগে তিনি শিশির কুমারের দলে নাট্যাভিনয়ের শিক্ষা নিয়েছিলেন। এই নাটকে তিনখানি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ব্যবহার হয় এবং আবহে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর ব্যবহৃত হয়। 'তাপসী' একটানা ১৯৬৫-এর ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত ৪৬৭ রাত্রি চলেছিল। সৌমিত্র ছাড়া এই নাটকে প্রথম অভিনয় করলেন চিত্রজগতের অভিনেত্রী মঞ্জু দে। অন্যেরা হলেন : বাসবী নন্দী, অপর্ণা দেবী, গীতা দে, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, নবকুমার, সুখেন দাস, প্রেমাংশু বসু প্রমুখ।

বিমল মিত্রের 'একক দশক শতক' উপন্যাস সেই সময় বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। স্টার এবার এই উপন্যাসটির নাট্যরূপ (দেবনারায়ণ) ঐ একই নামে অভিনয় করল। প্রথম অভিনয় ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৫। পরিচালনা—দেবনারায়ণ। সঙ্গীত--অনাদি দস্তিদার। মঞ্চ ও আলো--অনিল বসু। গীতরচনা--পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। নৃত্য--নীলিমা দাস। নাটকটি চলেছিল ২৬৪ রাত্রি। শেষ অভিনয় ১৭ এপ্রিল. ১৯৬৬।

'দাবী' অভিনীত হলো ২৮ এপ্রিল, ১৯৬৬। এটি দেবনারায়ণ গুপ্তের মৌলিক নাটক। পরিচালনাও তাঁরই। স্বল্পবিত্ত বাঙালি ঘরের স্বাভাবিক চিত্র তিনি এই নাটকে পরিচ্ছন্ন ও পরিমিতি দিয়ে রচনা করেছেন। একেবারে চেনা বাঙালি ঘরের এই নাটক দর্শকেরা সাদরে গ্রহণ করল। সঙ্গীতে কালীপদ সেন, গীত রচনায় পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্চ ও আলো অনিল বসু। চলচ্চিত্রের অভিনেতা সতীন্দ্র ভট্টাচার্য প্রথম পেশাদার মঞ্চে অভিনয়ে এলেন। সঙ্গে অভিনেত্রী সুব্রতা সেন (পরে চট্টোপাধ্যায়)। স্টারের অন্যান্য শিল্পী ও কলাকুশলীরা তো রইলেনই। 'দাবী' জনপ্রিয়তায় এতো দিনকার সব রেকর্ড ভেঙে দিয়ে একটানা ৫৮০ রাত্রি চলল। শেষ হলো ১৩ অক্টোবর, ১৯৬৮।

এরপরে 'শর্মিলা'। দেবনারায়ণের রচনা। পরিচালনাও তাঁরই। অভিনীত হলো ১৯৬৮-এর ২৪ অক্টোবর। অভিনেতা হিসেবে এলেন শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়। চলল ৫৫১ রাত্রি। শেষ অভিনয় ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১।

দেবনারায়ণ গুপ্তের রচনা ও পরিচালনায় এবার মঞ্চস্থ হলো 'সীমা'। নাটকটি চলেছিল ২০৩ রাত্রি। অভিনয়ে ছিলেন স্টারের নিয়মিত শিল্পীবৃন্দ। বন্ধ হয় ২ জানুয়ারি, ১৯৭২। 'সীমা' নাটকটি চলার সময়েই স্টার থিয়েটারের স্বত্ব বদল হয়ে গেল। সলিলকুমার মিত্র ১৯৩৮ থেকে একনাগাড়ে দক্ষতার সঙ্গে স্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী হিসেবে থিয়েটারটি চালিয়ে আসছিলেন। ১৯৭১-এর ৩১ মার্চ তিনি রয়্যালটির সঙ্গে তাঁর দীর্ঘকালের সম্পর্ক ছেড়ে দিলেন। ১৯৩৮-এর ২৯ মার্চ থেকে ১৯৭১-এর ৩০

মার্চ পর্যন্ত সলিলকুমার স্টার থিয়েটারে ছিলেন।

স্টার থিয়েটারের জমির মালিক কলকাতার প্রাক্তন মেয়র গোবিন্দচন্দ্র দের বৌদি রেণুবালা দে (অমিয়কুমার দে'র স্ত্রী)। তাঁর কাছ থেকে রঞ্জিত পিকচার্সের মালিক রঞ্জিতমল কাঙ্কারিয়া স্টার থিয়েটারের সম্পত্তি ও নামটুকু কিনে নিলেন ৩১ মার্চ, ১৯৭১। সলিলকুমার মিত্রের বিদায়ের পর স্টারের স্বত্বাধিকারী হলেন রঞ্জিতমল (১ এপ্রিল, ১৯৭১)। রঞ্জিত পিকচার্সের তরফে রঞ্জিতমল স্টারের পূর্ণ দেখাশোনার দায়িত্ব নিলেন। দেবনারায়ণ গুপ্ত নাট্যকার ও পরিচালক হিসেবে রইলেন। চালু নাটক 'সীমা' যেমন চলছিল তেমনই চলতে লাগল। ১৯৭২-এর ২ জানুয়ারি পর্যন্ত 'সীমা' নাটকটি চলার পরে (২০৩ রাত্রি) বন্ধ হয়ে যায়।

'সীমা' নাটক চলার মাঝেই ঘটে যায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। এই নিয়ে সারাদেশ উত্তাল। এই বিষয় নিয়ে দেবনারায়ণ গুপ্ত লিখলেন 'জয় বাংলা'। প্রথম অভিনীত হলো ৮ মে, ১৯৭১। 'সীমা'র অভিনয় বন্ধ রেখে। 'জয় বাংলা' বেশ কয়েকরাত্রি অভিনয়ের পর আবার 'সীমা' চালু হয়।

রঞ্জিতমলের পুরোপুরি মালিকানায় এবার মঞ্চস্থ হলো 'মঞ্জরী'। আশাপূর্ণা দেবীর ঐ নামের উপন্যাসের নাট্যরূপ দিলেন দেবনারায়ণ। তাঁরই পরিচালনা। নিয়মিত শিল্পীরা ছিলেন। নতুন এলেন সবিতাব্রত দত্ত। চলল ২৬৭ রাত্রি। (১৮.২.৭৩ পর্যন্ত)।

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর কলকাতায় ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সাধারণ রঙ্গালয়ের শুভ সূচনা হয়েছিল। তারই শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে স্টার থিয়েটার মঞ্চস্থ করল 'বিদ্রোহী নায়ক' (১৮.৩.১৯৭৩)। একশ বছর আগেকার গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের নাট্যকার ও পরিচালক উপেন্দ্রনাথ দাসের জীবনী নিয়ে এই নাটক লিখলেন দেবনারায়ণ। সেই উপেন্দ্রনাথ, যার সুরেন্দ্র বিনোদিনী, শরৎ সরোজিনী, গজদানন্দ ও যুবরাজ এক সময়ে ব্রিটিশ বিরোধী নাটক বলে হৈচৈ ফেলে দেয় এবং ব্রিটিশ সরকার ১৮৭৬-এর কুখ্যাত অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন জারি করে। তাঁর জেল হয়, পরে ছাড়া পান। স্টারে বিদ্রোহী নায়ক চলেছিল ১০৪ রাত্রি, বন্ধ হয় ১৯৭৩-এর ৩০ আগস্ট।

তারপরেই শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জনপদবধূ' উপন্যাসের নাট্যরূপ ঐ একই নামে অভিনীত হলো, ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩। পরিচালনা—দেবনারায়ণ। সঙ্গীত--তিমিরবরণ। নাটকটি ১৭৭ রাতের বেশি চলেনি। শেষ অভিনয় : ২৮ এপ্রিল, ১৯৭৪।

১৯৭৩-এর ২৫ ডিসেম্বর মন্মথ রায়ের একাঙ্কিকা বলে প্রচারিত 'মুক্তির ডাক' অভিনীত হলো, নাটকটির পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে। এইখানে এসেই স্টার থিয়েটারের একটি গৌরবময় পর্বের সমাপ্তি ঘটল। ১৯৭৪-এর প্রথম দিকেই দেবনারায়ণ গুপ্তের সঙ্গে স্টার থিয়েটারের সম্পর্ক শেষ হলো। পুরাতন শিল্পী ও কলাকুশলী গোষ্ঠীকেও বিদায় দেওয়া হলো।

দেবনারায়ণ গুপ্ত স্টারে থাকাকালীন ছোটবড় মিলিয়ে নাট্যরূপ এবং মৌলিক মোট

কুড়িটা নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। তার সবগুলিই জনসমাদর লাভ করেছিল। নাট্য সমালোচকদেরও প্রশংসা কুড়িয়ে ছিল। ঝকমকে রঙ্গমঞ্চ, সুদৃশ্য ঘূর্ণায়মান মঞ্চ, আলোর বাহার, নামকরা সব শিল্পী, আবেগ সর্বস্ব পারিবারিক কাহিনী, প্রেম-ভালোবাসার মধুর ও বিরহের অনুভব এবং পরিচালনার নিষ্ঠা—স্টার থিয়েটারের এই পর্বের নাট্যগুলিকে জনসমাদরে ভরিয়ে দিল। প্রতিটি নাটকই বহুরাত্রি অভিনীত হয়েছিল। প্রচলিত জনপ্রিয় উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে দেবনারায়ণ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। পরে মৌলিক কয়েকটি নাটকও লেখেন। সাদামাটা পারিবারিক কাহিনী বাঙালি জীবনের আবেগ-অনুভূতির ওপর নির্ভর করে এইসব নাটক সেদিন দর্শক আকর্ষণে সক্ষম হয়েছিল।

এদিকে স্বাধীনতার পর থেকেই দেশের মধ্যে যে টালমাটাল অবস্থা, তার কোনও প্রভাব কিন্তু এইসব নাটকে ছিল না। চীন-ভারত যুদ্ধ, খাদ্য আন্দোলন, পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ, কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হয়ে যাওয়া, নকশাল আন্দোলন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, পশ্চিম বাংলায় সন্ত্রাস এবং সত্তরের আগে পরে রাজনৈতিক বিভীষিকার অন্ধকারময় দিনরাত্রি—এগুলির, এই যুগসঙ্কটের কোনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রতিচ্ছবি এই সময়কার নাটকে দেখা যায় না। 'জয়বাংলা' বা 'স্বর্ণকীট' নামিয়ে তারা দায় সেরেছিল, যুগভাবনার দ্বন্দ্বময় উপস্থাপনা থেকে বহু দূরে স্টারের নাট্যাভিনয়গুলি অবস্থান করছিল।

তবে পরিচ্ছন্ন, সুন্দর ও সুস্থ সংস্কৃতির নাট্যাভিনয় করে স্টার বাঙালি দর্শকের সাধুবাদ কুড়িয়েছিল। সেই সময়ে পাশাপাশি অনেক পেশাদার থিয়েটার নগ্ন নাচ-গান এবং ক্যাবারে নৃত্য ইত্যাদি আমদানি করে বাংলা মঞ্চকে কলুষিত করেছিল। স্টার থিয়েটার কখনোই সে প্রলোভনের হাতছানিতে ভোলেনি। থিয়েটারের ইতিহাসে এটাও উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী মরা রঙ্গালয়ে প্রাণের বান ডাকিয়েছিল স্টার। এবং তাতেই উজ্জীবিত হয়ে আবার অন্য সাধারণ রঙ্গালয়গুলিও নতুন করে ফিরে দাঁড়িয়ে নাট্যাভিনয়ের ধারাবাহিক ইতিহাস তৈরি করেছিল।

সপ্তম পর্ব (১৯৭১-১৯৯১)

১৯৭১-এর ১ এপ্রিল থেকে রঞ্জিতমল কাঙ্কারিয়া স্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নতুন পর্ব শুরু হয়েছে বলে ধরা যায়। তবে রঞ্জিতমল দায়িত্ব নিয়ে আগের ধারার কোনওরকম পরিবর্তন প্রথমেই করেন নি। পুরনো নিয়মেই সব চলেছে। নাট্যকার-পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্ত, কলাকুশলী শিল্পী সব আগের। এবং আগের মতোই দেবনারায়ণ নাটক ও নাট্যরূপের অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

১৯৭৪-এ স্টারের সঙ্গে দেবনারায়ণের সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। তখন থেকেই পুরোপুরিভাবে স্টারের আর এক পর্ব শুরু হলো। রঞ্জিতমল নিজেই সব দায়িত্ব নিয়ে ভাড়া করা লোকজন দিয়ে থিয়েটারের কাজ চালাতে লাগলেন। এক একজন নাট্যকার, আবার নতুন পরিচালক, শিল্পীদলের পরিবর্তন—এইভাবে বেশ কয়েকটি নাটক

রঞ্জিতমলের কর্তৃত্বাধীনে স্টার থিয়েটারে অভিনীত হলো। বলা যায়, তখন থেকেই স্টারের গৌরবময় অধ্যায়ের অবসান হলো।

সত্তরের দশকের রাজনৈতিক ডামাডোল, পটপরিবর্তন এবং আতঙ্ক ও সন্ত্রাস জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। সব রঙ্গালয়ের অভিনয়ই তখন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। স্টার থিয়েটারও তা থেকে রেহাই পায়নি। তবে জীবন সমস্যার কোনো গভীর ব্যাপক নাট্যরূপায়ণ স্টার করতে পারেনি। বরং দেবনারায়ণের সাদামাটা সামাজিক ও পারিবারিক কাহিনীর নাটকই স্টারে অভিনীত হতে থাকল।

১৯৭৪-এর ৩১ মে অভিনীত হলো 'পরিচয়'। কুণাল মুখোপাধ্যায়ের নাটক। পরিচালনায় বঙ্কিম ঘোষ। নায়িকা হলেন চলচ্চিত্রের শমিতা বিশ্বাস। এই নাটকই চলল ৩০৭ রাত্রি, বন্ধ হয়ে গেল ২২ জুন, ১৯৭৫।

২৮ জুন নামানো হলো নতুন নাটক বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র নাট্যরূপ (কুণাল মুখোপাধ্যায়)। এই উপন্যাসের নাট্যরূপ আগে স্টার সমেত অন্যান্য রঙ্গালয়েও বহুবার মঞ্চস্থ হয়েছে। এবারে মহেন্দ্র গুপ্ত প্রধান উপদেষ্টা হয়ে এলেন। কৃষ্ণকান্তের ভূমিকায় অভিনয় করলেন। পরিচালক হিসেবে নাম বিজ্ঞাপিত হলো রঞ্জিতমলের। বোঝাই যায়, টাকা দিয়ে অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছেন, নাম রাখছেন নিজের। ৫৪৫ রাত্রি হলো অভিনয়।

১৯৭৬-এর ১৮ সেপ্টেম্বর, শরৎচন্দ্রের জন্মশতবর্ষের বছরে অভিনয় করা হলো 'চন্দ্রনাথ'। ঐ নামের উপন্যাসের নাট্যরূপ দিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। কিছুদিন 'চন্দ্রনাথ' চলার পর নতুন নাটক অভিনীত হলো 'সম্রাট'। নাট্যকার অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়। নান্দীকার গ্রুপ থিয়েটারের একনিষ্ঠ অভিনেতা ও কর্মী অসিত পেশাদারি থিয়েটারের জন্য নাটক লিখে দিলেন। প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে রইলেন মহেন্দ্র গুপ্ত। অভিনয়ও করলেন প্রধান ভূমিকায়। কিন্তু পরিচালক হিসেবে নাম রইলো রঞ্জিতমলের। এই নাটক চলেছিল অনেকদিন, ১১ ডিসেম্বর, ১৯৭৮-এ, বন্ধ হওয়ার সময় পর্যন্ত ৪৩৭ রাত্রি।

এবারে নতুন নাটক 'সংগ্রাম' (১৪ ডিসেম্বর ১৯৭৮)। নাট্যকার তপেন্দু গাঙ্গুলি। অপ্রস্তুত এই নাটক বেশিদিন চলল না। ২৮ রাত্রি। তাই উপায়ান্তর না দেখে রঞ্জিতমল পুরনো নাটক 'কৃষ্ণকান্তের উইল' আবার নামালেন। স্টারের মুখরক্ষা করে তা চলল ৭৭ রাত।

এবারে, ১৯৭৮-এর ৩০ এপ্রিল থেকে ৪ জুলাই পর্যন্ত স্টার থিয়েটার বন্ধ রাখা হয়। তারপরে অভিনীত হলো 'সমাধান' (৫ জুলাই, ১৯৭৯)। 'সমাধান' নাটক বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের সর্বকালের অভিনয়ের সব রেকর্ড ভেঙে দিয়ে চলল টানা এক হাজার চব্বিশ রাত্রি। ১৯৭৯-এর ৫ জুলাই থেকে শুরু করে ১৯৮৬-এর ১৩ মার্চ পর্যন্ত, সাত বছর ধরে নাটকটি একাদিক্রমে দর্শক পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অভিনীত হয়ে গেছে। 'সমাধান' নাটকটি চলচ্চিত্রকার অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দাদু'-র মঞ্চরূপ (সন্তোষ সিংহ)। সন্তোষ সিংহের পরিচালনায় এবং মহেন্দ্র গুপ্তের উপদেশনায় নাটকটি মঞ্চস্থ

হয়। পারিবারিক আবেগধর্মী এই নাটক সেদিন বাঙালি দর্শককে খুশি করেছিল। মহেন্দ্র গুপ্তের দাদুর ভূমিকায় অসামান্য অভিনয় উল্লেখযোগ্য। নাটকটি চলার মাঝপথেই ১১ নভেম্বর ১৯৮৪, মহেন্দ্র গুপ্ত মারা যান। 'সমাধান' নাটকেই তাঁর শেষ অভিনয়।

'সমাধান' নাটক যখন রমরম করে স্টারে চলছে বৃহস্পতি, শনি ও রবি (ম্যাটিনী ও সন্ধ্যা), তখন আবার পূর্বের নিয়মে মধ্য-সাপ্তাহিক অভিনয় শুরু করে স্টার থিয়েটার। মধ্য-সাপ্তাহিক হিসাবে নামানো হলো 'পাশের বাড়ি'। জনপ্রিয় চলচ্চিত্র হিসাবে এর আগেই 'পাশের বাড়ি' সিনেমাহলগুলিতে খুবই চলেছিল। অরুণ চৌধুরীর এই চলচ্চিত্র কাহিনীর নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করা হলো স্টারে (১৪.৪.১৯৮৪)। 'সমাধান' নাটকের ফাঁকে ফাঁকে মধ্য-সাপ্তাহিক নাটক হিসেবে 'পাশের বাড়ি' জনপ্রিয় হয়ে উঠল। চলল টানা ৭০৫ রাত।

এবারে শুরু হলো অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শাপমোচন'। প্রথম অভিনয় হলো ১৯৮৫-এর ২৭ জানুয়ারি। ভালো চলল না। মাত্র ২৬১ রাত।

আবার একটি চলচ্চিত্রের কাহিনী নিয়ে স্টার থিয়েটার নাটক তৈরি করল। আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস 'বালুচরী' অবলম্বনে আগেই চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছিল। তারই মঞ্চরূপ দিলেন অজিত গঙ্গোপাধ্যায়। নায়িকা এলেন খ্যাতিময়ী অভিনেত্রী সুপ্রিয়া চৌধুরী। ৩৮৮ রাত চলার পর 'বালুচরী'র অভিনয় বন্ধ হয়ে গেল (২২.১১.১৯৮৭)। 'বালুচরী'র সঙ্গে আবার একটি মধ্য-সাপ্তাহিক নাটক নামানো হলো 'খেলনা' (৩১.১২.১৯৮৬)। চলেছিল ৭২ রাত্রি, 'বালুচরী'র ফাঁকে ফাঁকে। তারপরে 'ঘরে ঘরে'। প্রথম অভিনয় : ১৫ এপ্রিল, ১৯৮৭। ভালো চলেনি। মোটে ১০৭ রজনী।

স্টার থিয়েটার 'লক আউট' ঘোষণা করা হলো। আগে থেকেই স্টার থিয়েটার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কর্মী ও কলাকুশলীদের নানা ব্যাপারে মতান্তর চলছিল। কর্মী বিক্ষোভও চলছিল মাঝে মাঝে। রঞ্জিতমল স্টার থিয়েটারে 'লক আউট' ঘোষণা করলেন ১৯৮৭-এর ১ ডিসেম্বর। একবছর বন্ধ থাকার পর ৩০ নভেম্বর, ১৯৮৮, স্টার থিয়েটার আবার খোলে। বাংলা পেশাদার মঞ্চের ইতিহাসে এর আগে কখনও এইভাবে কোনও থিয়েটারে 'লক আউট' ঘোষণা করা হয়নি। গৃহ সংস্কার, মালিকানার হাতবদল অথবা মামলা-মোকদ্দমা, কিংবা আদালতের রায়ে কখনও কখনও কোনও রঙ্গালয় কিছুদিন বন্ধ থেকেছিল কিংবা একেবারে উঠে গিয়েছিল। কিন্তু স্টার থিয়েটারের মতো এইভাবে কারখানা সদৃশ 'লক আউট', বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

অনেক টালবাহানার পর কর্মীদের সঙ্গে সমঝোতায় এসে রঞ্জিতমল স্টারের দরজা খুললেন। গড়িমসি করে নাটকও প্রযোজনা করলেন। অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'টগরী' (২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯)। এ নাটক হতাশ করল সবদিক দিয়ে। টেনেটুনে ৪৩ রাত্রি চালানোর পর লোকসান দিয়ে, নাটক বন্ধ করে দিলেন। আগে থেকেই এর লোকসান চলছিল। লকআউট ঘোষণা তারই ইঙ্গিত। সবশেষে রঞ্জিতমল স্টারের কর্তৃত্ব ছেড়ে দিলেন। ১৯৮৯-র ৩০ এপ্রিল। এরপর রঞ্জিতমল স্টার থিয়েটার ভাড়া দিয়ে দিলেন

অনুপ গুপ্ত ও স্বপন সেনগুপ্তকে।

এদের অন্য পেশা ছিল। থিয়েটারের ব্যবসায় এসে এরা উঠে পড়ে লাগলেন। একে তাকে জোগাড় করে প্রযোজনা করলেন 'ঘরজামাই' নামে এক মজার নাটক। একশো রাত্রি টানা চলল। স্টার যেন জেগে উঠল। কিন্তু ১৯৭ রজনী অভিনয়ের পর (১০ মার্চ, ১৯৯০) তারা উৎসাহ হারিয়ে ফেললেন, 'ঘরজামাই' বন্ধ হয়ে গেল।

রঞ্জিতমল্ল তার স্টার থিয়েটার ভাড়া দিয়েছিলেন। সেখানে অনুপ গুপ্ত ও স্বপন সেনগুপ্ত নতুন করে নাটক করতে না পেরে স্টার থিয়েটার ভাড়া দিলেন প্রখ্যাত নট ও চলচ্চিত্রখ্যাত সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

তিনি তাঁর নিজস্ব থিয়েটার দল নিয়ে স্টারে এসে অভিনয় করলেন তাঁর 'নহবত' নাটক, ১৮ মার্চ ১৯৯০। রচনা ও পরিচালনা তাঁরই। প্রধান ভূমিকাতেও অভিনয় করলেন। সিরিও-কমিক এই নাটক একশ রজনী অতিক্রম করল। রঞ্জিতমল তখন আবার উৎসাহিত হয়ে নিজেই উদ্যোগী হয়ে প্রযোজনা করলেন, 'স্বামীরা আসামী'। প্রথম অভিনয় হলো ২৭ এপ্রিল, ১৯৯০। ব্যর্থ হলো। ৪৩ রাত্রি মোটে অভিনয় হয়েছিল।

আবার অনুপ গুপ্ত এবং স্বপন সেনগুপ্ত উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে এলেন। তারা মঞ্চ ও চলচ্চিত্র জগতের খ্যাতকীর্তি ও জনপ্রিয় সুদর্শন অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে এলেন। অভিনীত হলো 'ঘটক বিদায়'। নাটক বচনা, পরিচালনা ও সঙ্গীতে : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। মঞ্চ ও চলচ্চিত্র জগতের নামকরা সব অভিনেতা অভিনেত্রী এই নাটকে যোগ দিলেন। সৌমিত্র তো ছিলেনই, অন্যরা হলেন মাধবী মুখোপাধ্যায় (চক্রবর্তী), রবি ঘোষ, শ্রীলা মজুমদার, তরুণকুমার প্রমুখ।

মজাদার এই নাটক জমে গেল রাতারাতি। সৌমিত্র, রবি ও তরুণকুমার প্রমুখের অসামান্য অভিনয় এই নাটকের সাফল্যের বড় কারণ। সৌমিত্রের নাট্য পরিচালনার কৃতিত্বও উল্লেখযোগ্য। সব মিলিয়ে 'ঘটক বিদায়' নাটক স্টার থিয়েটারে আবার প্রাণ ফিরিয়ে আনল। চলেছিল টানা ৩১৬ রাত্রি। কিন্তু ৩১৭তম অভিনয়ের আগেই, ১৯৯১-এর ১২ অক্টোবর রাত ১-১০ মিনিটে আগুন লেগে স্টার থিয়েটার পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায়। [ইংরেজি মতে, 13th October at 1-10 a.m.]। একশো বছরের ঐতিহ্যশালী স্টার থিয়েটার শেষ হয়ে গেল।

১০০ বছরের অধিককাল ধরে একটি রঙ্গালয়ের নানা উত্থান-পতন, ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়ে একাদিক্রমে অভিনয় চালিয়ে যাওয়া, পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসেই খুব কম দেখা যায়। এদেশে স্টারই একমাত্র মঞ্চ যা শতাধিক বৎসরের ঐতিহ্য নিয়ে অভিনয় চালিযে গেছে। এখন ভস্মীভূত হয়ে বন্ধ হয়ে গেছে। আশাকরি কিছুদিনের মধ্যেই স্টার থিয়েটার তার গৌরবের নব অধ্যায় শুরু করবে।

১. ১০০ বছরের ঐতিহ্য নিয়ে কোনো থিয়েটারের অভিনয় চালিয়ে যাওয়াই একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

২. নানা উত্থান-পতন সত্ত্বেও স্টার থিয়েটারে কখনো অভিনয় বন্ধ হয় নি। সাময়িকভাবে হলেও তা কখনো দীর্ঘস্থায়ী হয় নি।

৩. একই সঙ্গে তিন চারটি রঙ্গমঞ্চ পাশাপাশি চললে এবং সেগুলি সবই ব্যবসায়িক থিয়েটার হলে, স্বাভাবিকভাবেই বিষম প্রতিযোগিতায় সুস্থতা থাকে না, অনেক সময়েই রুচি বিকৃতি দেখা যায়। প্রতিযোগিতার ভালো দিকের বাইরে এ এক অসুস্থ সম্ভাবনা। স্টার কিন্তু সবসময়েই কাহিনী নির্বাচনে এবং উপস্থাপনে সুস্থ রুচি বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। কুৎসিত, নিম্নরুচি কিংবা হাল্কা ভাঁড়ামো দিয়ে দর্শক আকর্ষণের চেষ্টা স্টার থিয়েটার কখনো করেনি। যতই মালিক বদল হউক, কোনো মালিকই কখনো এই পরিচ্ছন্ন শিল্প সংস্কৃতির ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হন নি। এমন কি ১৯৬০-এর দশকের শেষ দিক থেকে সত্তর-আশির দশকে অন্য মঞ্চগুলি যখন 'ক্যাবারে গার্ল'দের দিয়ে কুৎসিত নৃত্য, কিংবা নায়িকার 'বস্ত্রবিপ্লব' ঘটিয়ে দর্শক আকর্ষণ করতে চেয়েছে, তখনো স্টার নির্মল ও সুস্থ মানসিকতার প্রসঙ্গ থেকে সরে যায় নি।

৪. এই রঙ্গমঞ্চে বাংলার শ্রেষ্ঠ নাট্যকারবৃন্দ (গিরিশ, অমৃতলাল, রাজকৃষ্ণ, ক্ষীরোদপ্রসাদ, অতুল মিত্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, দেবনারায়ণ, মহেন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ) যুক্ত ছিলেন এবং তাঁদের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি এই স্টারের জন্যই লেখা। এখানে তার অনেকগুলি অভিনীত হয়ে যেমন দর্শকমণ্ডলীকে পরিতৃপ্ত করেছে, তেমনি বাংলা নাটকের ইতিহাসকেও সমৃদ্ধ করেছে। তাছাড়া এখানে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নিরুপমা দেবী, তারাশঙ্কর, বিমল মিত্র, মনোজ বসু আশাপূর্ণা দেবী প্রমুখের উপন্যাসের নাট্যরূপগুলিও প্রায়শই অভিনীত হয়েছে।

৫. সে যুগ এবং এ যুগের সেরা অভিনেতা-অভিনেত্রীবৃন্দ এখানে যুক্ত থেকে তাঁদের অভিনয়ের পারদর্শিতা দেখিয়ে বাংলা মঞ্চাভিনয়ের মান উন্নতও করেছেন। গিরিশ, অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু, অর্ধেন্দুশেখর, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, দানীবাবু, অপরেশচন্দ্র, অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশ মিত্র, তিনকড়ি চক্রবর্তী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, উত্তমকুমার, নির্মলকুমার, অনুপকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল মিত্র, ছবি বিশ্বাস প্রভৃতি দিকপাল অভিনেতা এবং তারাসুন্দরী, কুসুমকুমারী, তিনকড়ি, প্রমদাবালা, নিভাননী, প্রভা দেবী, সরযূ দেবী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অভিনেত্রীবৃন্দ এখানে নানা সময়ে যুক্ত থেকে অভিনয় করে গেছেন। এছাড়াও দীর্ঘ একশো বছরে আরো কত দীপ্ত নট-নটী ছিলেন, তার তালিকা শেষ করা যাবে না।

৬. এই রঙ্গমঞ্চ যেমন সুদৃশ্যভাবে তৈরি হয়েছিল, তেমনি দর্শকদের সুবিধের কথাও সমসময়ে ভাবা হয়েছিল। মহিলা দর্শকদের জন্যও আলাদা ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ফলে এখানকার পরিবেশ কখনো কলুষিত হয়নি।

৭. বাংলা মঞ্চের মধ্যে এখানেই প্রথম শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা এবং

বিদ্যুৎআলোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ডায়নামো বসিয়ে সাময়িকভাবে চমক দেবার জন্য নয়। একেবারে পাকাপাকি ব্যবস্থা।

৮. বিশ শতকের গোড়ার দিকে অনেক রঙ্গমঞ্চই দুরবস্থা কাটিয়ে উঠবার জন্য অসুস্থ প্রতিযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে দর্শক আকর্ষণের সব সস্তা ও নাট্যবহির্ভূত কৌশল অবলম্বন করত। স্টার সবসময়েই রুচি মাফিক কাজ করার চেষ্টা করেছে। ফলে অন্য রঙ্গমঞ্চে দর্শকের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রায়শই দেখা যেত। কিন্তু স্টার দর্শকদের কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে বেঁধে রাখত। দর্শকেরা বেহিসেবী হওয়ার সুযোগ পেত না।

৯. দীর্ঘ একশো বছর ধরে নানা ভাব ও নানা বিষয়ের এবং তাৎপর্যময় ঘটনার নাটক এখানে অভিনীত হয়েছে। নাটকের শ্লীল-অশ্লীল প্রসঙ্গে সুস্থ মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে।

১০. তবে একথাও ঠিক, বিশ শতকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে বাংলা নাটকের ধারায়, তার অভিনয়ে এবং বিষয়বস্তুতে আমূল পরিবর্তন এনেছিল গণনাট্যধারা। সেই ধারাকে নানামুখীন উৎকর্ষে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল গ্রুপ থিয়েটারগুলির অভিনয় প্রচেষ্টা। বিষয়ের এই নতুনত্ব এবং প্রযোজনা ও উপস্থাপনার এই পরিবর্তনের ধারাকে স্টার থিয়েটার গ্রহণ করতে পারে নি। যদিও গণনাট্য ও গ্রুপ থিয়েটারের অনেক খ্যাতিমান অভিনেতা অভিনেত্রীকে প্রয়োজনে স্টার থিয়েটারে নিয়ে আসা হয়েছে। কিন্তু বাণিজ্যিক থিয়েটারের প্রচলিত ও প্রথাসিদ্ধ থিয়েটারি ঘেরা-টোপ থেকে স্টার থিয়েটার নিজেকে উন্মুক্ত করতে পারে নি। বাংলা নাটকের বিষয় ও উপস্থাপনা যখন অনেক দূর এগিয়ে গেছে, আন্তর্জাতিক হয়ে উঠছে, স্টার তখনো ত্রিশ-চল্লিশের দশকের ঐতিহ্যের মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছে।

১১. স্বাধীনতার পর নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে যখন নতুন করে দেশ গড়ে তোলার ভাবনা শুরু হয়েছে এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক নানা ভাবনার প্রসার মানুষের মনে বিস্তারিত হচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে স্টার প্রযোজনা করল 'শ্যামলী' (১৯৫৩)। শ্যামলীর অসামান্য সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে অন্য মঞ্চগুলিও অভিনয় করল 'এরাও মানুষ', 'উল্কা', 'সেতু'। লক্ষ্য করতে হবে, এইসব নাটকের বিষয় কিন্তু 'অসম্পূর্ণাঙ্গ' মানুষের কথা। 'সেতু'তে বন্ধ্যা নারীর বেদনা, 'উল্কা'তে বীভৎসদর্শন পুরুষের স্নেহাকাঙ্ক্ষা ও আত্মজ্বালা, 'এরাও মানুষ'-এ বিকৃত শরীরের ভিখিরিদের বেদনা। 'শ্যামলী'তে ছিল বোবা-কালা মেয়ের মনোবেদনা। কিন্তু এইসব 'অসম্পূর্ণাঙ্গ' মানুষও সমাজের একজন, তারা তাদের সব প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করেও নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, সে সংগ্রামের কথা নাটকগুলিতে নেই। বরং তাদের প্রতিবন্ধকতাকে অবলম্বন করে দর্শকের 'সেন্টিমেন্ট' তৈরি করে কারুণ্যের বেদনা প্রকাশ করেছে। নাটকগুলির

এইখানেই সীমাবদ্ধতা।
ঠিক একই সময়ে পেশাদারি থিয়েটাব 'মিনার্ভা' ভাড়া করে উৎপল দত্ত তাঁর 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ' নিয়ে (১৯৫৯-৬৯) 'অঙ্গার', 'কল্লোল', 'তিতাস একটি নদীর নাম' প্রভৃতি নাটকের প্লাবন বইয়ে দিলেন। গোটা 'সম্পূর্ণাঙ্গ' মানুষের সন্ধান চলেছে সেখানে, যে মানুষেরা সমবেত প্রয়াসে সমাজবদলের সম্ভাবনা জাগিয়ে তোলে দর্শকের মনে। বাংলা নাটকের ও প্রযোজনার যে ধারাবদল হয়ে যাচ্ছে পার্শ্ববর্তী 'মিনার্ভা'তে, স্টার থিয়েটার তা ভ্রূক্ষেপ করেনি। তারা তাদের ব্যবসায়িক পেশাদারি থিয়েটারের গতানুগতিক ভাবধারায় ও উপস্থাপনায় মশগুল থেকেছে।

স্টার থিয়েটার ভস্মীভূত হওয়ার সময়ে (১৯৯১) বাংলা অন্য সাধারণ রঙ্গালয়-গুলিও আর চলছিল না। রঙমহল, বিশ্বরূপা বন্ধ হয়ে পড়েছিল। মিনার্ভার অবস্থাও তাই। প্রতাপ মেমোরিয়াল বন্ধ, সুজাতা সদন দ্বাররুদ্ধ। কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ তালাবন্ধ। অন্য ছোটখাটগুলিও বন্ধ বলা যায়। অর্থাৎ একবিংশ শতকের প্রারম্ভকালে পেশাদারি সাধারণ রঙ্গালয়ের অভিনয়ের ধারা বন্ধই হয়ে যাচ্ছে বলা যায়। এখানে সেখানে দু একটি বিক্ষিপ্ত এবং ক্ষণিক প্রয়াস দিয়ে ইতিহাসের ধারা অব্যাহত রাখা যায় না।
দেবনারায়ণ গুপ্ত স্টার থিয়েটার তথা বাণিজ্যিক পেশাদারি থিয়েটারের সঙ্গে কাটিয়েছেন দীর্ঘ ত্রিশ বছরেরও বেশি। ৮২ বছর বয়সী দেবনারায়ণ গুপ্ত চোখের সামনে স্টার থিয়েটার পুড়ে গেলে আর্তনাদ করে বলেছিলেন : 'ওপারে যাবার বেলায় দেখে যাচ্ছি এপারে আমার কারখানা পুড়ে ছাই হল।...রঙ্গালয়টি আবার গড়ে উঠবে কি না জানি না। যদিও বা গড়ে ওঠে, আমার জীবদ্দশায় আমি তা দেখতে পাব না।—'
শেষে 'বহুরূপী' নাট্যদলের নাট্য পরিচালক ও অভিনেতা বর্ষীয়ান শ্রদ্ধেয় কুমার রায়ের মন্তব্য স্মরণযোগ্য : 'স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পর সাধারণ রঙ্গালয়ের কাজ নিঃশেষ প্রায়। স্টার পুড়ে যাওয়াটা যেন তারই প্রতীক।'
কোনও সাধারণ রঙ্গালয়ই আবার নতুন উদ্যমে চালু হওয়ার কোনো উদ্যোগই আর চোখে পড়ছে না।
লেখার দিন পর্যন্ত (জানুয়ারি, ২০০৩) ভস্মীভূত স্টার থিয়েটার বাড়িটির নবনির্মাণের উদ্যোগটুকুই শুধু শুরু হয়েছে। আলাপ আলোচনা, সভা, বক্তৃতা এবং মাঝে ঋণ-জটের মধ্যেই স্টারের নতুন ভবনের শিলান্যাস (৭ মার্চ, ২০০১) হয়েছে। নবনির্মাণের পর আবার অভিনয় শুরু হবে, এই আশা করা যেতে পারে।

সিটি থিয়েটার

প্রথম পর্যায় :

বীণা থিয়েটার মঞ্চে (৩৮নং মেছুয়াবাজার স্ট্রিট) প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠাতা : নীলমাধব চক্রবর্তী। প্রতিষ্ঠা : ১৬ মে, ১৮৯১। নাটক : গিরিশচন্দ্রের চৈতন্যলীলা।

রাজকৃষ্ণ রায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত বীণা থিয়েটার চালাতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েন। তখন (১৮৯১) তিনি তাঁর বীণা থিয়েটার ভাড়া দিতে শুরু করেন। একসময়ে এই থিয়েটার ভাড়া নিলেন নীলমাধব চক্রবর্তী। সেখানে খুললেন 'সিটি থিয়েটার'। প্রোপাইটার তিন জন—নীলমাধব চক্রবর্তীর নেতৃত্বে প্রবোধচন্দ্র ঘোষ ও অঘোরনাথ পাঠক। লেসী ও সেক্রেটারী : নীলমাধব চক্রবর্তী। ১৬ মে, ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে বীণা থিয়েটার মঞ্চে সিটি থিয়েটারের উদ্বোধন হল, গিরিশের চৈতন্যলীলা নাটক দিয়ে। গিরিশ ছিলেন এই থিয়েটারের পরামর্শদাতা ও মুখ্য নাট্যকার। তাঁর ছেলে দানীবাবুও এখানে অভিনয় করতে থাকেন।

হাতীবাগানের স্টার থিয়েটার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গিরিশের মনোমালিন্য হয়। তিনি স্টার ছেড়ে চলে আসেন ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯১। গিরিশের সঙ্গে স্টার ছাড়েন নীলমাধব চক্রবর্তী। তারই নেতৃত্বে অঘোরনাথ পাঠক, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু), দানীবাবু, প্রমদাসুন্দরী, মানদাসুন্দরী প্রমুখেরাও স্টার পরিত্যাগ করেন। গিরিশের উৎসাহে ও নীলমাধবের নেতৃত্বে সিটি সম্প্রদায় তৈরি হল। তারাই খুললেন সিটি থিয়েটার। গিরিশ সম্মুখে না এসে পেছন থেকে এই সম্প্রদায়কে সাহায্য ও উৎসাহ দিতে থাকেন।

১৮৯১-তে অভিনয় করে : চৈতন্যলীলা (১৬ মে)। সরলা (১৭ মে), তাজ্জব ব্যাপার (২৩ মে), বিল্বমঙ্গল ও বিবাহবিভ্রাট (৩১ মে), সীতার বনবাস (১৭ জুন), নলদময়ন্তী (২০ জুন), মলিনাবিকাশ (৫ জুলাই), বুদ্ধচরিত (১৮ জুলাই), তরুবালা (৯ আগস্ট), বিদ্যাসাগর (২১ আগস্ট), লীলা (৩ অক্টোবর), বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ (৩১ অক্টোবর), পয়জারে পাজি (দুর্গাদাস দে, ২৪ ডিসেম্বর)।

১৮৯২-তে গত বছরের নাটকগুলিই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অভিনয় করানো হয়। সরলা, বিল্বমঙ্গল, বেল্লিকবাজার, বুদ্ধদেবচরিত, মলিনাবিকাশ প্রভৃতি পুরনো নাটকের সঙ্গে চোরের ওপর বাটপাড়ি (অমৃতলাল, ৩০ জানুয়ারি), ভোট-ভেল্কি (২৭ মার্চ) প্রভৃতি নাটকের নতুন অভিনয় করা হয়।

১৮৯২-এর ৮ এপ্রিল 'সরলা' ও 'তাজ্জব ব্যাপার' অভিনয় সিটি থিয়েটারের প্রথম পর্যায়ের শেষ অভিনয়।

এখানে বেশির ভাগ নাটকই গিরিশের লেখা। অমৃতলাল বসুর কয়েকটি (তাজ্জব

ব্যপার, তরুবালা, বিবাহবিভ্রাট, সরলা, চোরের ওপর বাটপাড়ি) নাটকেরও অভিনয় হয়। নতুন নাট্যকার (দুর্গাদাস দে'র একটি গীতিনাট্য ছাড়া) বা নতুন কোনো নাটকের অভিনয় এখানে হয় নি। পুরনো প্রচলিত নাটকগুলিই এখানে অভিনীত হয়েছিল।

দ্বিতীয় পর্যায় :

বীণা থিয়েটার মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠাতা : নীলমাধব চক্রবর্তী। প্রতিষ্ঠা : ৭ অক্টোবর, ১৮৯৩ ; নাটক সরলা (নাট্যরূপ : অমৃতলাল বসু)।

নীলমাধব চক্রবর্তী প্রথম পর্যায়ের সিটি থিয়েটার বন্ধ করে দিয়ে বীণা থিয়েটার থেকে চলে আসেন। এদিকে গিরিশ তখন মিনার্ভা থিয়েটার প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যস্ত। সিটি সম্প্রদায়ের সঙ্গে গিরিশের মনোমালিন্য বেড়ে চলল। অবশেষে গিরিশ প্রথম পর্যায়ের সিটি থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অনেককে নিয়েই মিনার্ভায় চলে যান। দানীবাবু, প্রবোধ ঘোষ মিনার্ভায় যোগ দেন। গিরিশের সাহায্য ও উপদেশ থেকে সিটি সম্প্রদায় বঞ্চিত হয়।

বীণা থিয়েটারে তখন অন্য দল নাটক করছিল। তারা ব্যর্থ হয়ে 'বীণা' ছেড়ে দিলে নীলমাধব চক্রবর্তী আবার উদ্যোগী হয়ে বীণা থিয়েটার ভাড়া নেন। সেখানে তাঁর সিটি থিয়েটারের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করেন। ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ৭ অক্টোবর অমৃতলাল বসুর নাট্যরূপ দেওয়া 'সরলা' (তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' উপন্যাস) নাটক দিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের সিটি থিয়েটারের উদ্বোধন হল। নীলমাধবই লেসী ও অনারারী সেক্রেটারী। আগের সিটি থিয়েটারের ভাঙা দল নিয়েই নীলমাধব চক্রবর্তী অভিনয় শুরু করলেন বীণা থিয়েটার মঞ্চে।

১৮৯৩-তে অভিনয় করলেন : সরলা (৭ অক্টোবর), ধ্রুবচরিত্র ও বিবাহবিভ্রাট (৮ অক্টোবর), তাজ্জব ব্যাপার (১৪ অক্টোবর), নলদময়ন্তী ও বিবাহবিভ্রাট (১৫ অক্টোবর), বিজয়াতে আগমন (২৮ অক্টোবর), চৈতন্যলীলা (৪ নভেম্বর), আনন্দলহরা বা হরিলীলা (৯ ডিসেম্বর), প্রফুল্ল (১৭ ডিসেম্বর), বেল্লিকবাজার (৩০ ডিসেম্বর), বেহদ্দ বেহায়া (কেদারনাথ মণ্ডল, ৩১ ডিসেম্বর)।

তারপরে, ১৮৯৪-এ যা অভিনয় করে, তার মধ্যে নতুন কোনো নাট্যকার বা নাটক ছিল না। পুরনো নাটকগুলিরই পুনরভিনয় চলতে থাকে। ১৮৯৪-এর ১১ ফেব্রুয়ারি বীণা থিয়েটার মঞ্চে সিটি থিয়েটারের দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষ অভিনয়।

পরে অবশ্য নীলমাধব চক্রবর্তী এই মঞ্চে আবার ভাড়া নিয়ে 'গেইটি থিয়েটার' (Gaiety Theatre) খোলেন। 'গেইটি' সিটি থিয়েটারেরই পরিবর্তিত নাম, সিটি থিয়েটারের নীলমাধব এর লেসী ও সেক্রেটারী এবং সিটি সম্প্রদায়ের লোকেরাই এখানে অভিনয় করে। 'গেইটি' এখানে ১৮৯৪-এর শেষের দিক থেকে ১৮৯৬-এর গোড়ার দিক পর্যন্ত চলেছিল। কিন্তু সে তো অন্য ইতিহাস।

তৃতীয় পর্যায় :

মিনার্ভা মঞ্চে সিটি থিয়েটার। প্রতিষ্ঠা : ১১ এপ্রিল, ১৮৯৬।

নীলমাধব চক্রবর্তী মিনার্ভা মঞ্চ ভাড়া করে আবার তার দলবল নিয়ে সিটি থিয়েটার চালিয়েছিলেন, ১৮৯৬-এর ১১ এপ্রিল থেকে ১৮৯৬-এর ১৪ জুন পর্যন্ত, মোটে দু'মাস। কোনরকমে এখানে পুরনো কয়েকটি নাটকের অভিনয় করেন। স্থায়িত্বকাল খুবই সংক্ষিপ্ত এবং কার্যাবলীও খুবই সীমিত।

চতুর্থ পর্যায় :

এমারেল্ড মঞ্চে সিটি থিয়েটার, ৬৮নং বিডন স্ট্রিট। প্রতিষ্ঠা : ২০ জুন, ১৮৯৬। প্রতিষ্ঠাতা : নীলমাধব চক্রবর্তী। নাটক : মোহমুক্তি।

১৮৯৬-তে এমারেল্ড থিয়েটারের অবস্থা খুবই খারাপ হয় এবং বেশ কিছু দিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এই সময়ে নীলমাধব চক্রবর্তী এমারেল্ড মঞ্চ লীজ নেন এবং সেখানে খোলেন সিটি থিয়েটার। এমারেল্ড মঞ্চে সিটি থিয়েটারের উদ্বোধন হয : ২০ জুন, ১৮৯৬ ; নাটক : মোহমুক্তি। ম্যানেজার ধর্মদাস সুর।

১৮৯৬-তে এখানে অভিনীত হয় :

মোহমুক্তি (২০ জুন), আবুহোসেন ও বৃষকেতু (২১ জুন), তরুবালা ও তাজ্জব ব্যাপার (অমৃতলাল, ৫ জুলাই), বুদ্ধচরিত (২৫ জুলাই), প্রফুল্ল (৯ আগস্ট), সরলা (২৯ আগস্ট), বেহদ্দ-বেহায়া (কেদারনাথ মণ্ডল, ৩০ আগস্ট), মাধবী (৫ সেপ্টেম্বর), কালীয়দমন, চৈতন্যলীলা (১৩ সেপ্টেম্বর), সারস্বত কুঞ্জ (২৬ সেপ্টেম্বর), চারযুগ, স্বর্গনরক, মাধবী (৪ অক্টোবর), হীরার ফুল (৮ নভেম্বর), দেবী চৌধুরানী (১৯ ডিসেম্বর) এবং ১৮৯৭-তে—মাধবী, কষ্টিপাথর (The Touch Stone, ১ জানুয়ারি), বিল্বমঙ্গল (১০ জানুয়ারি) এইভাবে পুরনো এবং বারবার অভিনীত নাটকগুলিই এখানে অভিনীত হয়ে চলল। এবং বেশির ভাগই গিরিশের নাটক।

নীলমাধব চক্রবর্তী ঠিকমতো এমারেল্ড থিয়েটারের ভাড়া দিতে পারেন নি। তাই এমারেল্ডের মালিক গোপাললাল শীল সিটি থিয়েটারকে উঠিয়ে দেন। এমারেল্ডে সিটি থিয়েটারের চতুর্থ পর্যায়ের শেষ অভিনয় : ১০ জানুয়ারি, ১৮৯৭ । নাটক : গিরিশের বিল্বমঙ্গল।

তারপর সেখানে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত খোলেন ক্লাসিক থিয়েটার।

পঞ্চম পর্যায় :

সিটি থিয়েটার কার্জন থিয়েটারের মঞ্চে। ৯১ হ্যারিসন রোড।

১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে নীলমাধব চক্রবর্তী হ্যারিসন রোডের কার্জন থিয়েটার ভাড়া নিয়ে আবার সিটি থিয়েটার চালু করেন। উদ্বোধন হল, রবিবার ২৩ ডিসেম্বর, ১৯০০।

উদ্বোধনের দিন অভিনীত হল গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'পারিসানা' নাটক। 'পারিসানা' গিরিশের আগের লেখা ও অভিনীত হয়ে যাওয়া 'পারস্য-প্রসূন' গীতিনাট্যের পরিবর্তিত নাম। এর সঙ্গে অমৃতলালের প্রহসন 'কৃপণের ধন' অভিনীত হয়। কৃপণের ধন নাটকে নীলমাধব হলধরের ভূমিকায় অভিনয় করেন। তারপরে এখানে আলিবাবা, হীরার ফুল প্রভৃতি নাটকেরও অভিনয় হয়েছিল। এই মঞ্চেও সিটি থিয়েটারের স্থায়িত্বকাল খুবই অল্প সময়ের। ক্ষণিকের এই থিয়েটার-এর অস্তিত্বও তাই খুবই ক্ষীণ।

নীলমাধব চক্রবর্তী মুলত অভিনেতা ছিলেন। কিন্তু সে যুগের খ্যাতনামা অভিনেতাদের তুলনায় তিনি ক্ষমতায় ও প্রতিভায় অনেক ন্যূন ছিলেন। অথচ সে যুগের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা গিরিশের তিনি অনুগ্রহভাজন ছিলেন। গিরিশ প্রয়োজনে তাঁকে অনেক সময়েই কাজে লাগিয়েছেন। দলাদলি ও মনোমালিন্যের সময়ে গিরিশ প্রায়শই নীলমাধবকে সামনে রেখে পেছন থেকে লড়াই চালিয়েছেন।

তাছাড়া সে যুগের রীতি অনুযায়ী নীলমাধব নিজের একটি থিয়েটারের জন্য প্রায়ই লালায়িত হতেন। সেখানে অপরের মুখাপেক্ষী বা খেয়াল-খুশির ওপর নির্ভর করে থাকতে হয় না, নিজের অভিনয় ক্ষমতার ন্যূনতা, পেছন থেকে গিরিশের অনুপ্রেরণা লাভ এবং নিজের থিয়েটারের মোহে নীলমাধব অনেক সময়েই খালি রঙ্গমঞ্চ ভাড়া নিয়ে নিজের থিয়েটার খুলেছেন, এইভাবে প্রথমে বীণা রঙ্গমঞ্চে সিটি থিয়েটার দু'বার দু'ভাবে চালাতে চেষ্টা করেছেন। পরে আবার এমারেল্ড মঞ্চ ভাড়া নিয়ে নতুন করে সিটি থিয়েটার চালাতে চেয়েছেন। সঙ্গে প্রথম দিকে পেয়েছেন গিরিশকে। পরে দানীবাবু, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ অভিনেতাদের পেয়েছেন। শেষের দিকে তাও সেরকম কাউকে পান নি।

গিরিশ পারিবারিক শর্তের কারণে কখনোই কোনো মঞ্চের মালিক আর হননি। জীবনের প্রথম দিকে দু' একটি ছাড়া। গিরিশ তাই যখনই কোনো মঞ্চের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঝগড়া করে বা শর্ত ভেঙে বেরিয়ে গেছেন, তখনই বেশ কিছু অভিনেতা অভিনেত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। যতদিন না পাকাপোক্ত কোনো নতুন থিয়েটার কাউকে দিয়ে খোলাতে পেরেছেন, বা চালু কোনো থিয়েটারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছেন, ততদিন তাঁর সঙ্গী অনুগ্রহভাজন অভিনেতা অভিনেত্রীদের অভিনয় জীবন অব্যাহত রাখার জন্য অস্থায়ী অন্তর্বর্তীকালীন একটি থিয়েটারের ব্যবস্থা রাখতে হয়েছে। তখনই তিনি নীলমাধবকে কাজে লাগিয়ে সামনে রেখে নিজে পেছন থেকে তাকে সচল রাখার চেষ্টা করেছেন। এইভাবে গিরিশের উৎসাহে ও সাহায্যে নীলমাধব বারে বারে স্বল্পকালীন থিয়েটার শুরু করেছেন আবার বন্ধ করে দিয়েছেন।

এইভাবে গিরিশের সঙ্গে অন্য কোনো থিয়েটারের মামলা হলে তার ফল অনেক সময়েই সিটি থিয়েটারকেও ভোগ করতে হয়েছে। কখনো জয়, কখনো পরাজয় ঘটেছে। যেমন স্টার থেকে বেরিয়ে গিরিশ নীলমাধবকে দিয়ে বীণা মঞ্চে সিটি থিয়েটার খুললেন। স্টার মামলা করল, চুক্তির কারণে গিরিশের কোনো নাটক সিটি করতে পারবে

না। গিরিশের শিশু পুত্রের মৃত্যুর কারণে গিরিশের ওপর থেকে মামলা তুলে নিলেও, সিটির বিরুদ্ধে মামলা চলেছিল। সেবার সিটি জিতেছিল, তাই নবোদ্যমে আবার অভিনয় করতে পেরেছিল।

আবার গিরিশ মিনার্ভা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করিয়ে সিটির দলবল নিয়ে মিনার্ভায় যোগ দিলেন। বীণা মঞ্চে সিটি থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেল। অবশ্য মিনার্ভার সঙ্গে টাকা পয়সা নিয়ে মতান্তর হওয়ায় নীলমাধব ফিরে এসে আবার বীণা মঞ্চে সিটি থিয়েটার খুললেন। এবার আর গিরিশের সাহায্য পেলেন না।

নীলমাধবের প্রত্যেকটি প্রচেষ্টাই খুবই স্বল্পকালীন। এই স্বল্পকালীন প্রচেষ্টায় তিনি রঙ্গ-মঞ্চের নতুন কোনো পরিবর্তন করতে পারেন নি, সেরকম চিন্তাও তাঁর ছিল না। তিনি তখনকার চলতি জনপ্রিয় নাটকগুলি নিয়েই, তাঁর সীমাবদ্ধ শিল্পীদের ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে, গতানুগতিক পদ্ধতিতেই অভিনয় চালিয়ে গেছেন। নাটক—অভিনয়—প্রযোজনা কোনো দিকেই তিনি নতুন কোনো উদ্যম বা ভাবনা চিন্তার পরিচয় রাখতে পারেন নি। শুধ্মাত্র বাংলা নাট্যশালার প্রথাসিদ্ধ যাত্রাপথের চলতি পথিক হিসেবেই পা মিলিয়েছেন। এবং তাঁর স্বল্পকালীন উদ্যম ইতিহাসের বিস্তৃত পরিসরে কোনো স্থানই লাভ করতে পারে নি।

মিনার্ভা থিয়েটার

৬ নম্বর বিডন স্ট্রিট, কলকাতা

প্রতিষ্ঠাতা : নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় স্থায়িত্বকাল : ২৮ জানুয়ারি, ১৮৯৩–
প্রতিষ্ঠা : ২৮ জানুয়ারি, ১৮৯৩ বর্তমান সময় পর্যন্ত
নাটক : ম্যাকবেথ (শেক্সপীয়ার। অনুবাদ : গিরিশচন্দ্র)

স্টার থিয়েটারের মতোই মিনার্ভা থিয়েটার ঐতিহ্যসমৃদ্ধ। এই থিয়েটার নিজস্ব নামে বর্তমান পর্যন্ত চলছে। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় এই থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পেছনে গিরিশচন্দ্রের উদ্যোগ ও নেতৃত্ব কাজ করেছিল। অর্থব্যয় করলেন নাগেন্দ্রভূষণ আর থিয়েটারের দল তৈরি ও নাট্যাভিনয়ের যাবতীয় দায়িত্ব নিলেন গিরিশচন্দ্র। অভিনয়-শিক্ষক বা মাস্টার রূপে যোগ দিলেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি। বাংলা থিয়েটারের দুই স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব অনেকদিন বাদে এক থিয়েটারে মিলিত হলেন, বিডন স্ট্রিটের যে জমিতে আগে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেখানেই নির্মিত হলো নতুন থিয়েটার বাড়ি। নতুন দলে অভিনেতা-অভিনেত্রী হিসেবে রইলেন গিরিশ, অর্ধেন্দু ছাড়া, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু), চুনীলাল দেব, নিখিল দেব, নীলমণি ঘোষ, কুমুদনাথ সরকার, অনুকূল বটব্যাল, অঘোরনাথ পাঠক, তিনকড়ি, প্রমদাসুন্দরী, পরমাসুন্দরী প্রভৃতি। সঙ্গীত শিক্ষক রইলেন দেবকণ্ঠ বাগচি। স্টেজ ম্যানেজার ধর্মদাস সুর।

মহাসমারোহে শেক্সপীয়রের বিখ্যাত ট্রাজেডি 'ম্যাকবেথ' নাটক দিয়ে মিনার্ভার উদ্বোধন হল, ২৮ জানুয়ারি, ১৮৯৩। অনুবাদ করলেন গিরিশচন্দ্র। বহু পরিশ্রমে অনুবাদ করে এবং দীর্ঘদিন অনুশীলন করিয়ে নাটকটি অভিনয় করা হলো। ড্রপসিন আঁকেন ইংরেজ চিত্রকর মিঃ উইলিয়ার্ড এবং রূপসজ্জা ও দৃশ্যসজ্জা করেন পিমসাহেব। অভিনয়ে ছিলেন—

> ম্যাকবেথ—গিরিশ। লেডি ম্যাকবেথ—তিনকড়ি। ম্যালকম—দানীবাবু। ব্যাঙ্কো—কুমুদ সরকার। ম্যাকডাফ—অঘোরনাথ পাঠক। লেডি ম্যাকডাফ—প্রমদাসুন্দরী ; অর্ধেন্দুশেখর ডাকিনী, ডাক্তার, দ্বারপাল, হত্যাকারী প্রভৃতি নানা চরিত্রে অভিনয় করেন।

শেক্সপীয়রের নাটকের এতো সুন্দর অনুবাদ এবং সেই অনুবাদ নাটকের এতো মর্যাদাপূর্ণ ও সাফল্যজনক অভিনয় বাংলা মঞ্চে খুব কমই হয়েছে। শিক্ষিত ও রুচিশীল দর্শকের কাছে এই অভিনয় খুবই প্রশংসা লাভ করল। পত্র-পত্রিকাও অকুণ্ঠচিত্তে সাধুবাদ জানাল, তিনকড়িকে লেডি ম্যাকবেথের চরিত্রে গিরিশ নিজে হাতে অমানুষিক

অধ্যবসায়ে তৈরি করেছিলেন। গিরিশ নিজেও ম্যাকবেথের চরিত্রে অনন্যসাধারণ অভিনয় করলেন। পণ্ডিত ও বিদগ্ধ মহলে ম্যাকবেথ প্রযোজনা এবং অভিনয়ের খ্যাতি প্রতিষ্ঠা পেল। কিন্তু তখনকার মঞ্চের সাধারণ দর্শক এই নাটককে গ্রহণ করতে পারল না। তাদের মানসিক সাজুয্য না পেয়ে তিন-চার রাত অভিনয়ের পর থেকেই রঙ্গালয়ে দর্শক কমে যেতে লাগল। অর্থাগম কমে গেল। প্রচুর অর্থব্যয়ে নির্মিত ম্যাকবেথ প্রযোজনা দশ রাত অভিনয়ের পরই বন্ধ করে দিতে হলো। ভালো ও উন্নতমানের নাট্যাভিনয়ের যে প্রচেষ্টায় গিরিশচন্দ্র নেমেছিলেন, 'ম্যাকবেথ'-এর অভিজ্ঞতা তাঁকে অন্য শিক্ষা দিল। ক্ষুব্ধ গিরিশ এবার নামালেন হাল্কা নাচ গানের নাটক 'মুকুলমুঞ্জরা' এবং 'আবুহোসেন'। 'ম্যাকবেথ'-এর অর্থক্ষতি সুদে-আসলে পুযিয়ে দিল এই নাটক দুটি। পেশাদার ব্যবসায়িক থিয়েটারের সীমাবদ্ধতা সেদিন গিরিশের মতো অনেককেই আতঙ্কিত করে তুলেছিল।

এই দুটি নৃত্যগীতের নাটকে নৃত্য ও সঙ্গীত শিক্ষা দিলেন শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু) ও দেবকণ্ঠ বাগচি। 'আবু হোসেন'-এর অভিনয়ে (২৫ মার্চ, ১৮৯৩, প্রথম অভিনয়) দ্বৈত নৃত্যগীতে মাতিয়ে দিলেন তিনকড়ি (দাই) এবং রাণুবাবু (মশুর)। আর আবু হোসেনের ভূমিকায় অর্ধেন্দুশেখর কৌতুক অভিনয়ে রঙ্গমঞ্চ প্রাণোচ্ছলতায় ভরিয়ে দিলেন। সঙ্গে সহযোগিতা করলেন আবুর মা'র চরিত্রে গুলফন হরি। 'মুকুলমুঞ্জরা'র বরুণচাঁদের চরিত্রাভিনয়েও অর্ধেন্দুশেখর রসের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন। এই ধরনের অভিনয়ে তখন অর্ধেন্দুর জুড়ি ছিল না।

সাফল্যের তুঙ্গে উঠে মিনার্ভা এবারে পর পর অভিনয় করে গেল কয়েকটি নাটক। সপ্তমীতে বিসর্জন (১১-১০-৯৩), নল-দময়ন্তী (২৪-১২-৯৩), জনা (২৩-১২-৯৩), বড়দিনের বখশিস (২৫-১২-৯৩), কমলেকামিনী (২৭-১২-৯৩), বেজায় আওয়াজ (দেবেন্দ্রনাথ বসু, ২৭-১-৯৪), করমেতিবাঈ (১৪-৭-৯৪), প্রফুল্ল (১৩-৭-৯৫) প্রভৃতি গিরিশের নাটকগুলি অভিনয় হল। 'প্রফুল্ল' এর আগে স্টারে অভিনীত হয়েছিল। সেখানে যোগেশ চরিত্রে অভিনয় করেন অমৃতলাল মিত্র। মিনার্ভাতেই প্রথম গিরিশচন্দ্র যোগেশ চরিত্রে অভিনয় করলেন। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখছেন : 'গিরিশের যোগেশের পার্শ্বে অমৃতলালের যোগেশ হীনপ্রভ হইয়া পড়িল। মনে হইল একজন যথার্থ যোগেশ, আর একজন যোগেশ সাজিয়াছেন।' (রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর)। মাঝে কয়েকটি পুরনো নাটক সধবার একাদশী (দীনবন্ধু), পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস (গিরিশ), দক্ষযজ্ঞ (গিরিশ), পলাশীর যুদ্ধ (নাট্যরূপ : গিরিশ), মেঘনাদবধ (নাট্যরূপ : গিরিশ) অভিনয় করা হয়েছিল। এরই ফাঁকে হাল্কা নৃত্যগীতের নাটক স্বপ্নের ফুল, ফণির মণি, এবং হাল্কা ব্যঙ্গ প্রহসন সভ্যতার পাণ্ডা, পাঁচকনে প্রভৃতি লিখে গিরিশ এখানে অভিনয় করিয়েছেন।

এইগুলির মধ্যে 'জনা' এবং 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' খুবই মঞ্চসফল হয়েছিল। দর্শকেরও আনুকূল্য লাভ করেছিল। জনার ভূমিকায় তিনকড়ি, বিদূষক চরিত্রে

অর্ধেন্দুশেখর (তিনি মিনার্ভা ছেড়ে দিলে এই চরিত্রে গিরিশ অভিনয় করতেন), প্রবীর—দানীবাবু, মদনমঞ্জরী—কুসুমকুমারী। গিরিশের পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে 'জনা' শ্রেষ্ঠ। জনার চরিত্রে অভিনয় তিনকড়ির জীবনেও শ্রেষ্ঠ অভিনয়। অর্ধেন্দুশেখর বিদূষকের অভিনয়ে 'মজা' নিয়ে আসতেন, সঙ্গে ভক্তির মিশেল দিয়ে তাকে খুবই আদৃত করে তুলতেন। গিরিশ বিদূষক চরিত্রকে হাল্কা থেকে সীরিয়াস করে তুলতেন। একই চরিত্রে দুই প্রতিভার ভিন্ন রূপদান সে যুগের দর্শকেরা খুবই উপভোগ করেছিলেন।

'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটকটিও খুব জমেছিল। দ্রৌপদী—তিনকড়ি। ভীম—হরিভূষণ ভট্টাচার্য। বৃহন্নলা—দানীবাবু। কীচক—অঘোরনাথ পাঠক। উত্তর—গোবর্ধন বন্দ্যোপাধ্যায়। এদের সকলের সম্মিলিত উচ্চ অভিনয়ে নাটকটি জনসমাদৃত হলো। পুরনো নাটককে নতুন ছাঁচে ও ছাঁদে অভিনয় করিয়ে গিরিশ আবার কৃতিত্ব দেখালেন। 'প্রফুল্ল' নাটকের অভিনয়েও নতুন প্রথায় শিক্ষা দেওয়া হলো। তাঁর নিজ হাতে গড়া প্রফুল্ল নাটকের অভিনয় স্টারে প্রথম হওয়ার সময়ে তিনি যোগেশের চরিত্রে অমৃতলাল মিত্রকে একভাবে গড়ে তুলেছিলেন। সে অভিনয়ে অমৃত মিত্র খ্যাতি লাভ করেন। মিনার্ভায় গিরিশ নিজে 'যোগেশ' সাজলেন (রমেশ-সুরেশ—চুনীলাল ও দানীবাবু) এবং গৃহকর্তা সম্মানিত যোগেশের সব হারানোর রিক্ততা ও শারীরিক অবসন্নতার যে রূপ অভিনয়ে ফুটিয়ে তুললেন তা বাংলা মঞ্চে তুলনারহিত হয়ে রইলো।

এখানে একটি প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য। 'বড়দিনের বখশিস' এবং 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' অভিনয়ের সময়ে ব্রিটিশের পুলিশ বাধা দেয়। বড়দিনের মজা নিয়ে লেখা 'বেকুবের একজাই' নামটি পাল্টে এবং কিছু পরিবর্ত্তন করে 'বড়দিনের বখশিস' নামে সেটিকে সেখানে অভিনয় করা হয়। আর পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে কীচক-দ্রৌপদীর অত্যাচারের দৃশ্যে অশ্লীলতা রয়েছে এমন অভিযোগ পুলিশ তোলে। গিরিশ কিছু অংশ পাল্টে নিজে এরপর থেকে কীচকের ভূমিকায় অভিনয় করতে থাকেন।

১৮৯৬-তে গিরিশ মিনার্ভা ছেড়ে দেন। মালিক নাগেন্দ্রভূষণের সঙ্গে আর্থিক ব্যাপারে তাঁর বনিবনা হয় নি। নাগেন্দ্রভূষণের অমিতব্যয়িতা এবং কাপ্তেনী মনোভাবের জন্য প্রচুর আয় সত্ত্বেও মিনার্ভার আর্থিক সঙ্গতি গড়ে ওঠে নি। বরং ঋণভার বেড়েই চলেছিল। দুজনের মধ্যে মনোমালিন্য বেড়ে গেল। গিরিশ মিনার্ভা ছেড়ে আবার স্টারে যোগ দিলেন। গিরিশ-শূন্য মিনার্ভার দুর্দশা শুরু হলো। ১৮৯৬-এর সেই দুর্গতির দিনে মিনার্ভা থিয়েটারে সিটি থিয়েটার সম্প্রদায় কয়েক মাস (এপ্রিল-জুন) অভিনয় চালিয়ে যায়।

তারপরে ভাঙা মিনার্ভার পরিচালনার দায়িত্ব নেন চুনীলাল দেব। তিনি এবং দুর্গাদাস দে মিলে এখানে জুবিলি যজ্ঞ, আকবর, লক্ষ্মণ বর্জন, ফটিকচাঁদ, আলিবাবা, পলাশীর যুদ্ধ, ল-বাবু প্রভৃতি নাটক প্রহসনের অভিনয় করান। ১৮৯৭-এর পুরো বছরটাই এইভাবে কেটে যায়। কিন্তু মিনার্ভা থিয়েটারের দুর্দশা কাটে না বরং অবনতি হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মালিক নাগেন্দ্রভূষণ বাধ্য হয়ে ১৮৯৮-এর ৩১ মার্চ মিনার্ভা থিয়েটারকে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রি করে দেন। যারা কেনে তাদের কাছ থেকে ১৮৯৯-তে শ্রীপুরের জমিদার নরেন্দ্রনাথ

সরকার মিনার্ভা কিনে নেন এবং মালিক ও পরিচালক হয়ে নব উদ্যমে থিয়েটার চালাতে থাকেন। অর্ধেন্দুশেখর এই সময়েই এখানে যোগ দেন।

২৯ মে, ১৮৯৯, দুর্গাদাস দে'র লেখা 'শ্রী' নাটক দিয়ে নতুনভাবে মিনার্ভায় অভিনয় শুরু হল। তারপরে মালিক নরেন্দ্রনাথের নিজের লেখা নাটক 'মদালসা' এখানে অভিনীত হল। পর পর এখানে অভিনয় হলো কিশোরসাধন, জুলিয়া, পলাশীর যুদ্ধ, জেনানা যুদ্ধ, বসন্তবিহার, মাধবীকঙ্কন, বসন্ত রায় প্রভৃতি নাটক, নাট্যরূপ এবং গীতিনাট্যের। ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাস পর্যন্ত চলল। কিন্তু কোনো অভিনয় সেভাবে সার্থক হল না বা অর্থাগম ঘটলো না।

১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ এপ্রিল থেকে ২২ জুন পর্যন্ত মিনার্ভায় অভিনয় বন্ধ থাকে। কারণ, থিয়েটার গৃহ এবং মঞ্চকে বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সাজানো হয়। গ্যাসের আলোর বদলে পুরোপুরি বৈদ্যুতিক আলো স্থায়ীভাবে ব্যবহার শুরু হয় ১৯০৩-এর ৭ নভেম্বর থেকে। নাটক রঘুবীর। ম্যানেজার অমরেন্দ্রনাথ দত্ত দিয়ে তার শুরু। নরেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রকে এবার মিনার্ভায় নিয়ে এলেন। সঙ্গে এলেন আবার অর্ধেন্দুশেখর। এদের দুজনের সাহায্যে কিছুদিন মিনার্ভা চলল। গিরিশ বঙ্কিমের 'সীতারাম' উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করলেন (২৩ জুন, ১৯০০)। অভিনয় করলেন :

> সীতারাম—গিরিশ। গঙ্গারাম—দানীবাবু। চন্দ্রচূড়—অঘোর পাঠক। গঙ্গাধর—ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায়। শ্রী—তিনকড়ি। জয়ন্তী—সুশীলবালা। নন্দা—সরোজিনী। রমা—পুঁটিরাণী।

এদের অভিনয়ে, গিরিশের নাট্যরূপের গুণে এবং স্বয়ং বঙ্কিম-উপন্যাসের ঘটনার আকর্ষণে 'সীতারাম' জনপ্রিয় হলো। এর আগে ক্লাসিক থিয়েটারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মিনার্ভা হেরে যাচ্ছিল, সীতারাম সে দুর্দশা কাটিয়ে দিল। সীতারামের পর 'মণিহরণ' গীতিনাট্য গিরিশ লিখে অভিনয় করলেন। তারপরে নন্দদুলাল গীতিনাট্যও অভিনীত হল। নৃত্য-গীত ও ভক্তিরসের এইসব গীতিনাট্য দর্শকের ভালো লেগেছিল। কিন্তু নাট্যরস হিসেবে এগুলি অকিঞ্চিৎকর।

পাশাপাশি অমরেন্দ্রনাথ দত্তের ক্লাসিক থিয়েটারের তখন রমরমা। তা সত্ত্বেও গিরিশের পরিচালনায় মিনার্ভা বেশ দাঁড়িয়ে গেল। আর্থিক লাভও হতে লাগল। কিন্তু এই সময়েই গিরিশের সঙ্গে মালিক নরেন্দ্রনাথের মনোমালিন্য শুরু হয়। নরেন্দ্রনাথ গিরিশের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করে দিলেন। ক্লাসিক থিয়েটার গিরিশকে সসম্মানে তাদের ক্ষেত্রে ফিরিয়ে নিল। গিরিশ-বিহীন মিনার্ভা যখন কিছুতেই ভালোভাবে চলছে না, তখন নরেন্দ্রনাথ নিজেও থিয়েটার ছেড়ে দিলেন। মালিক হলেন জমিদার প্রিয়নাথ দাস। সহযোগী বেণীভূষণ রায়।

১৯০৩-এর ১০ মে ক্লাসিকের অমরেন্দ্রনাথ প্রিয়নাথের কাছ থেকে মাসিক পাঁচশো টাকা ভাড়ায় তিন বছরের জন্য 'মিনার্ভা' লীজ নিয়ে একসঙ্গে দুটো থিয়েটার মিনার্ভা ও ক্লাসিক চালাতে লাগলেন।

অমরেন্দ্রনাথ থিয়েটার বাড়ির সংস্কার করলেন। গ্যাসের পরিবর্তে স্থায়িভাবে আলোর ব্যবস্থা করলেন। ১৯০৩-এর ৭ ই নভেম্বর ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'রঘুবীর' নাটক দিয়ে অমরেন্দ্রনাথ মিনার্ভার উদ্বোধন করলেন। তিনি স্বয়ং অভিনয় করলেন নামভূমিকায়। কিন্তু নাটকটি দর্শকপ্রিয় হলো না। নামালেন বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের নাট্যরূপ, ১৫ নভেম্বর, ১৯০৩। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হিতে বিপরীত' অভিনয়ের পর তারা ঢাকায় যান (১ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৪) অভিনয় করতে। লর্ড কার্জনের ঢাকা আগমন উপলক্ষে মিনার্ভা সেখানে আমন্ত্রিত হয়। এইভাবে কিছুদিন আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও মিনার্ভা চালিয়ে অমরেন্দ্রনাথ ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। মালিকানা নিয়ে মামলা হয়। অমরেন্দ্রনাথ শেষে আদালতের রায়ে আবার মালিক হয়ে (২৪ ডিসেম্বর, ১৯০৩) অভিনয় শুরু করেন। কিন্তু আবার ব্যর্থ হয়ে এবারে মিনার্ভা লীজ দিলেন ধনী ব্যবসায়ী মনোমোহন পাঁড়েকে। মনোমোহন এবার থিয়েটারটি সাবলীজ দিলেন চুনীলাল দেবকে ; মাসিক সাতশো পঞ্চাশ টাকা ভাড়ায়।

চুনীলাল মিনার্ভার দায়িত্ব নিয়ে নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রী সংগ্রহ করে থিয়েটার চালাবার ব্যবস্থা করলেন। তাদের সঙ্গে 'শেয়ার'-এর ব্যবস্থা করলেন। মোটামুটি ভাঙা মিনার্ভা গুছিয়ে নিয়ে চুনীলাল মনোমোহন গোস্বামীর 'সংসার' দিয়ে শুরু করলেন। কিন্তু ক্লাসিকের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তিনিও হেরে যেতে লাগলেন। এই সময়েই তিনি রঙ্গালয়ে উপহার-প্রথা চালু করলেন। চুনীলাল 'বসুমতী'র মালিক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে এই কাজে হাত দিলেন। উপেন্দ্রনাথ এই 'রঙ্গালয়ের উপহার' গ্রন্থাবলীর প্রকাশক ছিলেন। 'বসুমতী গ্রন্থাবলী'র পরবর্তী সূচনা এখান থেকেই। টিকিটের দাম অনুযায়ী উপহারের গ্রন্থসংখ্যা ঠিক হত। 'ফাউ' হিসেবে গ্রন্থ পাওয়ার লোভে মিনার্ভায় দর্শকের ভিড় বেড়ে গেল। চুনীলাল মিনার্ভায় অতুল গ্রন্থাবলী উপহার দেন। সেদিন ২৩ আগস্ট, ১৯০৪ এবং অভিনীত হয়েছিল তিনটি অতি অকিঞ্চিৎকর নাটক 'নন্দ বিদায়', 'লক্ষ্মণ বর্জন, 'কুব্জা ও দর্জী'। এতো ভিড় যে, পরের দিনই আবার এই তিন বাজে নাটকের অভিনয় করতে হল এবং 'হাউসফুল'। এবারে ক্লাসিকও গ্রন্থ উপহার শুরু করল। একই সঙ্গে মিনার্ভা ও ক্লাসিক গ্রন্থ উপহারের হিড়িক ফেলে, লোভ দেখিয়ে খদ্দের টানতে লাগল। উভয় থিয়েটারের তরফ থেকে দর্শকেরা সে সময়ে উপহার পেয়েছিল অতুলকৃষ্ণ মিত্রের গ্রন্থাবলী, মাইকেল গ্রন্থাবলী, কালীপ্রসন্নের মহাভারত, রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ, শব্দকল্পদ্রুম প্রভৃতি। এছাড়া বৃষ্টির দিনে থিয়েটার ফেরৎ দর্শক উপহারের ছাতা মাথায় দিয়ে, বই বগলে নিয়ে দলে দলে চলেছে—এমন বর্ণনা দেখা যায়। এই প্রতিযোগিতায় ক্লাসিক আর্থিক দুর্দশায় পড়ল, চুনীলাল সাফল্য পেলেন। যারা দর্শক আকর্ষণের জন্য এইসব কাণ্ড করতে পারেন, তারা নাট্যাভিনয়ের উন্নতির চেষ্টা করবেন তা ভাবাই যায় না।[১]

১. প্রতাপচাঁদ জহুরি ন্যাশনাল থিয়েটারের মালিক হওয়ার ঠিক আগে থিয়েটারে রুমাল, সাবান, আংটি, লাউ, কুমড়ো, ফুটি, ইয়ারিং, ছাতা, এমন কি এক ঝুড়ি কয়লা পর্যন্ত দর্শকদের টিকিটের সঙ্গে লটারীর জন্য ব্যবস্থা রাখা হত। দর্শন চৌধুরী—উনিশ শতকের নাট্যবিষয় (১৯৮৫), পৃঃ ১৩৩-১৩৫।

এবারে গিরিশ, অর্ধেন্দুশেখর, অপরেশের সম্মিলনে মিনার্ভার হৃতগৌরব ফিরে এলো। 'হরগৌরী' অভিনয়ের পর 'বলিদান' নামানো হলো (৮ এপ্রিল, ১৯০৫)। গিরিশের নতুন নাটকের অভিনয়ে করুণাময় করলেন গিরিশ এবং রূপচাঁদ অর্ধেন্দুশেখর। গিরিশ এই সময়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং অর্ধেন্দুশেখর করুণাময় করেন। আবার একই চরিত্রে দুই প্রতিভাবান অভিনেতার বিভিন্ন রূপদান দর্শকদের মোহাবিষ্ট করে রাখল।

এরপরই নামানো হলো দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাণাপ্রতাপ', ২৯ জুলাই ১৯০৫। লর্ড কার্জনের 'বঙ্গভঙ্গ' প্রস্তাব নিয়ে ১৯০৩ থেকেই সারা বঙ্গদেশ উত্তাল হয়ে উঠেছিল। অর্ধেন্দু মঞ্চে জাতীয়তাবোধের ভাবনার উদ্বোধনের চেষ্টা তখন থেকেই করতে থাকেন। রঘুবীর, প্রতাপাদিত্য, রাণাপ্রতাপ (১৯.০৭-১৯০৫) প্রভৃতির অভিনয়ে মিনার্ভা থিয়েটার স্বদেশপ্রেম প্রবাহিত করতে চাইলো।

১৯০৫-এর ৬ সেপ্টেম্বর 'বঙ্গভঙ্গ' ঘোষণা করেন লর্ড কার্জন। এবারে জাতীয়তাবোধের আন্দোলন তুমুল আকার ধারণ করে। স্টারে 'রাণাপ্রতাপ' সাড়া ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে স্টার কর্তৃপক্ষের মতান্তর হয়, নাট্যকার তাঁর নাটক তুলে এনে মিনার্ভাতে দেন। মিনার্ভা রাণাপ্রতাপ অভিনয় করল, জমলো না। তখন গিরিশ রচনা করলেন 'সিরাজদৌল্লা', মিনার্ভায় প্রথম অভিনীত হলো ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯০৫ :

> সিরাজ—দানীবাবু[২]। মীরজাফর—নীলমাধব চক্রবর্তী। করিমচাচা—গিরিশ। দানশা ফকির ও ড্রেক—অর্ধেন্দুশেখর। লুৎফা—সুশীলাবালা। ঘেসেটি বেগম—সুধীরাবালা। ক্লাইভ—ক্ষেত্রমোহন। জহরা—তারাসুন্দরী।

সিরাজদৌল্লার অভিনয়ে বাংলা মঞ্চে নতুন প্রাণের সাড়া দেখা দিল। ১৮৭৬-এর অভিনয়-নিয়ন্ত্রণ আইনের ফলে ব্রিটিশবিরোধী কিংবা দেশপ্রেমমূলক নাটক বাংলা মঞ্চে কেউ অভিনয়ের সাহস দেখায় নি। মঞ্চ থেকেই জাতীয়তাবোধ, স্বাধীনতার মন্ত্রোচ্চারণ হারিয়ে গিয়েছিল। ১৯০৫-এ 'বঙ্গভঙ্গ' প্রতিরোধের আন্দোলন নিয়ে বঙ্গভঙ্গ মেতে ওঠায় বাংলা রঙ্গমঞ্চও অনেকদিন বাদে স্বদেশপ্রেম, স্বাজাত্যবোধ, স্বাধীনতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রভৃতি প্রসঙ্গ নিয়ে নাটক অভিনয়ে উদ্বেল হয়ে পড়ে। গিরিশ এই সময়ে তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলি রচনা করতে থাকেন। যে ঐতিহাসিক নাটক গিরিশ বলতে গেলে লেখেনই নি, 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলনের উন্মাদনার যুগে গিরিশ তাই রচনা করলেন। এবং ইতিহাসের কাহিনীর মধ্য দিয়ে দেশের জাতীয়তাবোধ, স্বাধীনতা স্পৃহা ও পরাধীনতার বেদনা ফুটিয়ে তুলতে লাগলেন। ইতিহাসের চরিত্রগুলি নিয়ে তাদের 'ন্যাশনাল হিরো' বা জাতীয় বীর নায়কের মর্যাদায় দর্শকমনে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

'সিরাজদৌল্লা' প্রচণ্ড জনপ্রিয় হলো। জাতীয় আন্দোলনের দিনে বাংলা মঞ্চ সেদিন তার দায়িত্ব যথারীতি পালন করতে পেরেছিল।

---

২. এরপরে ক্লাসিকে সিরাজদ্দৌলা অভিনয়ে (২৭.২.১৯০৬) সিরাজের চরিত্রে অভিনয় করেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

গিরিশের 'মীরকাশিম' একই ভাবনায় লেখা। অভিনীত হলো ১৬ জুন, ১৯০৬। মীরজাফর চরিত্রে গিরিশ এবং মীরকাশিম চরিত্রে দানীবাবুর অভিনয়ে সেদিন বাংলার ইতিহাস মূর্ত হয়ে উঠেছিল। হলওয়েল, হে এবং মেজর এডামস এই তিনটি চরিত্রে অর্ধেন্দু অবিস্মরণীয় অভিনয় করেন। মিনার্ভায় 'মাষ্টার' অর্ধেন্দুশেখরের উদ্যমে এবং ম্যানেজার গিরিশের প্রচেষ্টা মিলেমিশে থিয়েটারে ন্যাশনালিটির উদ্বোধন ঘটিয়েছিল। ডাঃ হরনাথের লেখা জাগরণ (১৭ ডিসেম্বর, ১৯০৫), বাসর (২৬ ডিসেম্বর), সংসার ও নসীব (৩ জানুয়ারি, ১৯০৬), দুর্গেশনন্দিনী (১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৬) অভিনীত হয়েছিল। বাসর গিরিশের লেখা এবং দুর্গেশনন্দিনী তাঁরই নাট্যরূপ। সংসার মনোমোহন গোস্বামীর এবং নসীব চুনীলাল দেবের অপেরা। সিরাজদৌল্লা একটানা পঞ্চাশ রাত্রি অভিনীত হয়ে সাড়া ফেলেছিল। মীরকাশিমও ভালো চলেছিল। আর সাফল্য পেয়েছিল দুর্গেশনন্দিনী। অভিনয় করেছিলেন :

> গিরিশচন্দ্র (বীরেন্দ্র সিংহ), অর্ধেন্দুশেখর (বিদ্যাদিগগজ), দানীবাবু (ওসমান), তারক পালিত (জগৎ সিংহ), নীলমাধব চক্রবর্তী (অভিরাম স্বামী), সুশীলাবালা (তিলোত্তমা), তিনকড়ি (বিমলা)।

প্রত্যেকেরই অভিনয় নাটকটিকে খুবই আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। বিদ্যাদিগগজের ভূমিকায় অর্ধেন্দুর অভিনয় তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।[১] ১৯০৬-এর আর উল্লেখযোগ্য অভিনয় হলো রাণাপ্রতাপ, প্রতাপাদিত্য, জনা, আলিবাবা, পাণ্ডবগৌরব, প্রফুল্ল, চৈতন্যলীলা, বিবাহবিভ্রাট, অভিমন্যু বধ, শিরী-ফরহাদ (অতুল মিত্র), কপালকুণ্ডলা। বড়দিনের বড় আসরে (২৩-৩০ ডিসেম্বর) পরপর আটদিন দশটি নাটকের অভিনয় করা হয়েছিল—সংসার, সিরাজদৌল্লা, দুর্গেশনন্দিনী, আলিবাবা, বেল্লিকবাজার, মীরকাশিম, শিরী-ফরহাদ, দুর্গাদাস, বলিদান, আলিবাবা।

বঙ্গভঙ্গের উন্মাদনা যতো কমে যেতে থাকে রঙ্গালয় থেকে দেশপ্রেমের নাটকও বিদায় নিতে থাকে। তবুও এই সময়ে গিরিশের মতোই ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর বিখ্যাত ঐতিহাসিক নাটকগুলি রচনা করেন। ঐতিহাসিক নাট্যকার রূপে পূর্ণ খ্যাতিতে এই সময়েই দ্বিজেন্দ্রলালের আবির্ভাব ঘটে। তাঁর প্রতাপ সিংহ, তারাবাই, দুর্গাদাস এই উন্মাদনাকালে রচিত। কিছু পরে লেখা মেবারপতন, সাজাহান, নূরজাহান এবং চন্দ্রগুপ্ত। অনেকগুলিই মিনার্ভায় অভিনীত হয়। মিনার্ভা থিয়েটার থেকেই ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল এবং গিরিশের ঐতিহাসিক নাটকের পূর্ণ যাত্রা শুরু হয়। প্রথম দুজনের খ্যাতি বিস্তার লাভ করে এই থিয়েটার থেকেই।

১৯০৬-এ (২৮ এপ্রিল) মিনার্ভায় সমগ্র প্রেক্ষাগৃহে বৈদ্যুতিক পাখার বন্দোবস্ত করা হয়, তখন সিরাজদৌল্লার অভিনয়ে ভিড় বেড়েই চলেছিল। আর, এখানেই বহু প্রশংসিত ও পূর্ব অভিনীত 'চৈতন্যলীলা' নাটকের নতুন করে অভিনয়ে গিরিশ ও অর্ধেন্দুশেখর

১. 'অর্ধেন্দুবাবুর কথাই ধর। ঐ যে পেটুক বামুন—গজপতি বিদ্যাদিগগজ—করলেন, দেখলে একেবারে পিলে চমকে যায়। একটা কমপ্লিট ক্যারেকটারাইজেশন'—শিশির ভাদুড়ি, 'শিশির সান্নিধ্যে' পৃঃ ১৪৭।

দুটি ছোট্ট ও বিশিষ্ট ভূমিকায় (মাধাই ও জগাই) অভিনয় করেন। স্টারে চৈতন্যলীলার স্বর্ণযুগে এরা অভিনয় করেন নি। কিন্তু ঐ দুটো ছোট্ট ভূমিকায় তাঁরা অভিনয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। কিভাবে মাতাল বর্বর শাক্ত পাষণ্ড মাধাই ও জগাই চৈতন্যের স্পর্শে ক্রমে ভক্তে রূপান্তরিত হচ্ছে তাঁরা তা শারীরিক ও বাচিক অভিনয়ে মঞ্চে মূর্ত করে তুলেছিলেন। ছোট্ট ভূমিকার অভিনয়েও যে চিরস্মরণীয় অভিনয় করা যায়, অর্ধেন্দু তা আগেই দেখিয়েছেন। এখানে গিরিশও তার দোসর হলেন। দু'জনের অভিনয়ে মদে মাতাল ও ধর্মে মাতাল দুই ভাবাবেগের বিভিন্ন রূপ মূর্ত হয়ে উঠে একাকার হয়ে গিয়েছিল।

১৯০৭ শুরু হলো গিরিশের 'যায়সা ক্যা ত্যায়সা' দিয়ে, ১ জানুয়ারি অভিনয়ে সুশীলাবালা (গরব) ও পরবর্তী অভিনয়ে দানীবাবু (হারাধন) মলিয়েরের নাটকটিকে জমিয়ে দিয়েছিলেন। এই বছরেই মিনার্ভা ও স্টার দুই থিয়েটারই এক সঙ্গে 'প্রফুল্ল' নামায়। স্টারে (১ জুন) এবং মিনার্ভায় (২ জুন) তখন বেশ প্রতিযোগিতা জমে ওঠে। স্টারে ম্যানেজার অমৃতলাল বসু এবং ডিরেক্টার অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। মিনার্ভায় মালিক মনোমোহন পাঁড়ে, ম্যানেজার গিরিশ এবং মাষ্টার অর্ধেন্দুশেখর। স্টারে যোগেশ—অমৃতলাল মিত্র, মিনার্ভায় অর্ধেন্দুশেখর। গিরিশের হাতে গড়া অমৃত মিত্র যোগেশের অভিনয়ে গুরু গিরিশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামলেন—'তোমার অধীত বিদ্যা দেখাব তোমায়'—এমন বিজ্ঞাপনও প্রকাশিত হলো। দর্শক দুটো থিয়েটারেই প্রফুল্ল দেখলেন। সে এক উন্মাদনা ও তর্কাতর্কির পর্ব চলল থিয়েটারে।

১৯০৭-এর জুলাই থেকে মিনার্ভা দুরবস্থায় পড়ে। দানীবাবু, তিনকড়ি, কিরণবালা এবং গিরিশচন্দ্র মিনার্ভা ছেড়ে কোহিনূরে চলে গেলেন। মিনার্ভা বিপদে পড়ে এবারে স্টার থেকে অমরেন্দ্রনাথ দত্তকে পাঁচশো টাকা মাইনে ও বাড়তি বোনাস দিয়ে নিয়ে এলেন, সঙ্গে কুসুমকুমারী। ৩১ জুলাই থেকে অমরেন্দ্রনাথের নাম 'ম্যানেজার' হিসেবে বিজ্ঞাপিত হতে থাকে। অর্ধেন্দুশেখর 'মাষ্টার' হিসেবে থেকে গেলেন। অক্টোবর থেকে তিনিও কাজে নেমে পড়লেন। অভিনীত হলো—প্রফুল্ল (২৭ অক্টোবর), দুর্গাদাস (৩ নভেম্বর ; (অর্ধেন্দু—রাজসিংহ, অমর দত্ত—দুর্গাদাস), সিরাজদৌল্লা (১৭ নভেম্বর), ছত্রপতি শিবাজী (প্রথম অভিনয় ২ নভেম্বর, শিবাজী—অমর দত্ত), দলিতা ফণিনী (অমর দত্ত, ৩০ নভেম্বর)।

১৯০৮-এ অভিনীত হল—বলিদান, নূরজাহান (১৪ মার্চ), প্রায়শ্চিত্ত (দ্বিজেন্দ্রলাল), মেবার পতন (২৬/১২), শাস্তি কি শান্তি (গিরিশ ৭/১১), আর সব পুরনো নাটক। ২৫ এপ্রিল অমর দত্ত মিনার্ভা ছেড়ে দিলেন। তখনো অভিনীত হয়ে চলল নূরজাহান, নবীন তপস্বিনী, য্যায়সা ক্যা ত্যায়সা, তুফানী। 'তুফানী' থেকেই মিনার্ভার ভাগ্য আবার ফিরে এলো। উঠে দাঁড়াল মিনার্ভা। 'জাফর' করলেন অর্ধেন্দু। সে এক মনোমুগ্ধকর অভিনয়। তারপরে রাণাপ্রতাপ, সিরাজদৌল্লা—পুরনো গৌরবের যুগ ফিরে এলো।

ফিরে এলেন গিরিশ মিনার্ভায়, ১৯ জুলাই থেকে সিরাজদৌল্লা দিয়ে শুরু করলেন

তাঁর কাজ। কিন্তু তার আগেই অর্ধেন্দু মনোমালিন্যের কারণে মিনার্ভা ছেড়ে চলে গেলেন (৬ জুলাই)। স্বাস্থ্যও তখন তাঁর একেবারে ভেঙে পড়েছিল। তখনো অভিনীত হল সোরাবরুস্তম (দ্বিজেন্দ্রলাল, ১৯ সেপ্টেম্বর), শাস্তি কি শান্তি (গিরিশ, ৭ নভেম্বর), মেবারপতন (দ্বিজেন্দ্র, ২৬ ডিসেম্বর)।

১৯০৯-এ উল্লেখযোগ্য অভিনয় হল দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' (২১ আগস্ট), 'দুর্গাদাস' (৮ ডিসেম্বর) এবং রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গকৌতুক 'নূতন অবতার' অবলম্বনে ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্যরূপ দেওয়া 'ভগীরথ' (প্রথম অভিনয় : ২৫ ডিসেম্বর, ১৯০৯)। 'সাজাহান' নাটকে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন : প্রিয়নাথ ঘোষ--সাজাহান। দানীবাবু--ঔরঙ্গজেব। হরিভূষণ ভট্টাচার্য--দিলদার। সুধীরাবালা--জাহানারা। সুশীলাবালা--পিয়ারা। তারক পালিত--দারা। পরে তারাসুন্দরী (জাহানারা) এবং অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (দিলদার) অভিনয়ে অংশ নেন। নাচে গানে সুশীলাবালা পিয়ারা চরিত্রে প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করেন। জাহানারা রূপী তারাসুন্দরীও আশ্চর্য নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন।

১৯১০-এ বঙ্কিমের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের নাট্যরূপ, গিরিশের অশোক (৩ ডিসেম্বর) এবং শঙ্করাচার্য (১৫.১.১০) এখানে প্রথম অভিনীত হয়। অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'ঠিকে ভুল' (মলিয়ের অবলম্বনে) অভিনীত হয় ১ অক্টোবর। অতুলকৃষ্ণ মিত্রের হিরন্ময়ী (২৪ জুলাই), ক্ষীরোদপ্রসাদের 'বাঙ্গলার মসনদ' (২ জুলাই)।

১৯১১-তে মনোমোহন তাঁর 'মিনার্ভা'র এক-তৃতীয়াংশ বেচে দিলেন মহেন্দ্রনাথ মিত্রকে বাইশ হাজার টাকায়। ১৭ জুন মহেন্দ্রনাথ নতুন করে 'মিনার্ভা' চালু করেন, অতুলকৃষ্ণের 'রকমফের' নাটক দিয়ে। 'রকমফের' নাটকটি শেরিডানের বিখ্যাত 'School for Scandal' অবলম্বনে লেখা। মনোমোহনের আমলে অভিনীত হয় ক্ষীরোদপ্রসাদের 'পলিন' (৪.২.১১), 'ঝকমারি' (গিরিশ, ৮ এপ্রিল)। গিরিশ তখনো মিনার্ভায় আছেন।

গ্রেট ন্যাশনালের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় 'বলিদান' (গিরিশ) নামানো হলো। করুণাময় চরিত্রে অভিনয় করলেন স্বয়ং গিরিশ (১৫.৭.১৯১১)। মঞ্চে গিরিশের এই শেষ অভিনয়, এরপরেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। গিরিশের মৃত্যু হয় ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯১২।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' এখানেই প্রথম অভিনীত হলো, ২২ জুলাই, ১৯১১। দানীবাবু চাণক্য চরিত্রে অসামান্য অভিনয় করে খ্যাতিলাভ করেন। নরীসুন্দরী করেন ছায়া চরিত্রটি।

গিরিশচন্দ্রের 'তপোবল' (১৮ নভেম্বর, ১৯১১) এবং 'গৃহলক্ষ্মী' (২১ সেপ্টেম্বর, ১৯১১) এখানেই প্রথম অভিনীত হয় এবং জনপ্রিয়তা লাভ করে। উল্লেখ্য, 'গৃহলক্ষ্মী' নাটকটি গিরিশচন্দ্র শেষ করে যেতে পারেন নি। মোটে চারটি অঙ্ক লিখতে পেরেছিলেন। অভিনয়ের তাগিদে পঞ্চম অঙ্কটি লিখে নাটকটি শেষ করেন দেবেন্দ্রনাথ বসু। অবশ্য নাট্যকার হিসেবে গিরিশের নামই বিজ্ঞাপিত হয়েছিল।

১৯১১ খ্রিষ্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর 'বঙ্গভঙ্গ' আইন রদ হয়। ১৯১২-এর ১ এপ্রিল

থেকে ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে স্থানান্তরিত হয় দিল্লীতে। কলকাতার অর্থনীতি এবং জীবনযাপন পদ্ধতির ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে। যদিও তখনকার নাটক ও নাট্যাভিনয় দেখে পরিস্থিতির এই বদলের কোনো হদিশ পাওয়া যায় না।

১৯১২-এর ১২ মে মালিক মহেন্দ্রনাথ মিত্রের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীদের আপত্তি সত্ত্বেও মনোমোহন মিনার্ভা থিয়েটারের দখল নেন এবং নিজেকে মালিক বলে ঘোষণা করেন। দুপক্ষে মামলা শুরু হয়। এই সময়ে অমৃতলাল বসু স্টার ছেড়ে মিনার্ভায় নাট্যাচার্যরূপে যোগ দেন। তাঁর নাটক 'খাসদখল' এখানে অভিনয় করেন। আবার 'রঙ্গিলা' (অপরেশচন্দ্র), রূমেলা (সৌরীন্দ্রমোহন), 'রূপের ডালি' (ক্ষীরোদপ্রসাদ) প্রভৃতি নাটক এখানে অভিনীত হলো। তাছাড়া অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'আসল-নকল', ক্ষীরোদপ্রসাদের 'সোফিয়া' অভিনীত হয়। 'আসল-নকল', 'সেরিডান'-এর নাটক অবলম্বনে লেখা। রবীন্দ্রনাথের 'বিদায়-অভিশাপ' এখানে প্রথম অভিনয় হয় ১৯১৩-এর ২ আগস্ট। ক্ষীরোদপ্রসাদের ভীষ্ম ১০ মে, ১৯১৩।

১৯১৪-তে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রণদামামা বেজে উঠেছে। এখানে যদিও এই মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কোনো ফল দেখা দেয়নি, কিন্তু ইতিহাসের এই ঘনঘটার কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব বাংলা নাটক বা নাট্যশালাতেও পড়েনি। সে তার গতানুগতিক পথেই এগিয়ে চলেছিল। এই সময়ের প্রাক্কালে অভিনীত হয়েছিল প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর 'ভাগ্যচক্র' (১৫.১১.১৩), অমৃতলাল বসুর 'নবযৌবন' (২০.১২.১৩) ; দেবকণ্ঠ বাগচির 'হেস্তনেস্ত' (২১.৩.১৪) ; ক্ষীরোদপ্রসাদের 'নিয়তি' (২১.৩.১৪) ; রাজকৃষ্ণ রায়ের মনোচোরা (২০.৬.১৪) [এই নাটকের সবটাই গানে গানে রচিত ইন্ডিয়ান অপেরা] ; প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের 'ক্লিওপেট্রা' (৫.৯.১৪) ; ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আহেরিয়া' (২৬.১২.১৪) ; অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'আহুতি' (৬.৩.১৫) [Wilson Burret-এর 'The sign of the Cross' অবলম্বনে লেখা] অভিনীত হয়। ঐ সময়ে (২৭.২.১৫) স্টারে ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ঐ একই বিদেশী নাটকের নাট্যরূপ অভিনীত হয়েছিল। এছাড়া, অপরেশচন্দ্রের শুভদৃষ্টি [Lytton রচিত 'Lady of Lions' অবলম্বনে রচিত] অভিনীত হয়েছিল ৩ ডিসেম্বর, ১৯১৫।

মহেন্দ্রনাথের ভাই উপেন্দ্রনাথের কাছে মামলায় হেরে যাবেন বুঝতে পেরে ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দের ৭ আগস্ট থেকে মনোমোহন পাঁড়ে ৬নং বিডন স্ট্রিট থেকে মিনার্ভা থিয়েটারকে স্থানান্তরিত করেন ৬৮ নং বিডন স্ট্রিটে, যেখানে তখন চলছিল কোহিনূর থিয়েটার, তার মালিক ছিলেন মনোমোহন, ম্যানেজার দানীবাবু। গিরিশের 'কালাপাহাড়' নাটক দিয়ে কোহিনূর মঞ্চে মিনার্ভার অভিনয় শুরু হয়। মিনার্ভার শিল্পী ও কলাকুশলীরাও দুভাগে ভাগ হয়ে দুই মিনার্ভায় কাজ ও অভিনয় করতে থাকেন। আবার মামলা হয়। মামলায় এবার জিতে মহেন্দ্র মিত্রের ভাই উপেন্দ্রকুমার পুরনো মিনার্ভা মঞ্চে (৬ নং বিডন স্ট্রিট) মিনার্ভাকে ফিরিয়ে আনেন, ম্যানেজার হলেন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মিনার্ভায় মনোমোহনের যুগ শেষ হলো বলা যায়। ১৯১৫-

এর ১ সেপ্টেম্বর থেকে কোহিনুর মঞ্চে তিনি নিজের নামেই মনোমোহন থিয়েটার খোলেন।

উপেন্দ্রনাথ মিত্রের কর্তৃত্বে মিনার্ভায় নতুন করে অভিনয় শুরু হলো ; ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দের ২ অক্টোবর দ্বিজেন্দ্রলালের 'সিংহল বিজয়' নাটকের প্রথম অভিনয় দিয়ে। ম্যানেজার তখন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সিংহবাবুর ভূমিকায় অভিনয় করলেন তিনি।

এই সময় মিনার্ভার দল কলকাতার বাইরে গিয়ে আমন্ত্রিত অভিনয় করছিল মাঝে। তার ফলে কলকাতার মিনার্ভার অভিনয় প্রায়ই বন্ধ থাকত। তার মধ্যেও অভিনীত হয় বঙ্গনারী' (দ্বিজেন্দ্রলাল), 'মোতির মালা' (বরদাপ্রসন্ন), বঙ্গের রাঠোর (ক্ষীরোদপ্রসাদ), রামানুজ (অপরেশচন্দ্র) প্রভৃতি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) পরবর্তীকালে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অভিনয়ের কথা বলা যায়। বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের 'মিশরকুমারী' নাটক এখানে অভিনীত হয়, ৫ জুলাই, ১৯১৯। শিল্পীরা ছিলেন—কুঞ্জলাল চক্রবর্তী (আবন), হাঁদুবাবু (রামেসিস), সুশীলাসুন্দরী (নেনাহেরিন), প্রিয়নাথ ঘোষ (সামন্দেশ)। এই অভিনয় খুবই সাফল্যলাভ করেছিল। 'মিশরকুমারী'র অভিনয় দেখে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর আনন্দের কথা কর্তৃপক্ষকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন (২১ জুলাই, ১৯১৯) :

'দেশকাল পাত্র বিশেষে যথোপযোগী দৃশ্যপট ও সাজগোছ এবং সরঞ্জাম যথাসম্ভব ঠিক রেখে দর্শকের চোখে নিপুণভাবে ধরা বাংলা থিয়েটার মিনার্ভাতেই প্রথম দেখেছি। অভিনয়কালে পাত্র-পাত্রীগণের চারিদিকটা ফাঁকি এবং ফাঁক না রেখে যথোপযোগী আসবাবপত্র শোভাসৌন্দর্যে মনোরম করে তোলা 'মিশরকুমারী'তেই প্রথম দেখলাম। এজন্য আপনাদের রঙ্গপীঠের অধ্যক্ষ ও শিল্পীগণকে প্রশংসা না করে থাকতে পারলাম না।'

১৯২২-এর ১১ ফেব্রুয়ারি অভিনীত হলো দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত', তারপরে 'সাজাহান', ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্যালারামের স্বাদেশিকতা'। এই নাটকে ব্রিটিশবিরোধী ভাবনা থাকাতে সরকার নাটকটি বাজেয়াপ্ত করে (২৯.৭.১৯২২)। সাহেব চরিত্রে নরেশ মিত্র অসামান্য কুশলতা দেখান।

এই সময়কার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং বিষাদান্তক সংবাদ হলো, মিনার্ভা থিয়েটার আগুন লেগে পুড়ে যায়। ১৮ অক্টোবর ১৯২২ (১৩২৯ বঙ্গাব্দের ১ কার্তিক)। প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত মালিক উপেন্দ্রনাথ তাঁর দলবল নিয়ে তখন কলকাতার বাইরে আবার অভিনয় করা শুরু করেন। এবং নবউদ্যমে পুড়ে যাওয়া রঙ্গালয়টি পুনর্নির্মাণ ও সংস্কারে উঠে পড়ে লাগলেন। আর সময় পেলে কলকাতার আলফ্রেড থিয়েটার ভাড়া নিয়ে অভিনয়ও চালিয়ে যান। এই সময়েই চিত্তরঞ্জন দাশের কাহিনী 'ডালিম' অবলম্বনে নাট্যরূপ দেন বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এবং আলফ্রেড থিয়েটারে মিনার্ভা অভিনয় করে।

উপেন্দ্রনাথ মিত্র নতুন করে নবউদ্যমে মিনার্ভা গড়ে তুলে আবার অভিনয় শুরু করেন। মিনার্ভার সাজসজ্জা ও মঞ্চ এবং আঙ্গিক প্রয়োগের নানা অভিনব বৈচিত্র্য আনা

হলো। এই সময় থেকেই মিনার্ভায় নাটক অভিনয়ের সময় সংক্ষিপ্ত করা হয় এবং টিকিটের দামও কমানো হয়।

১৯২৫-এর ৮ আগস্ট শুরু হলো নবনির্মিত মিনার্ভায় নতুন করে নাট্যাভিনয়। নাটক 'আত্মদর্শন'। এই সময় থেকে মিনার্ভায় দর্শকদের নানা সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়। বিশেষ করে মহিলা দর্শকদের জন্য। তাদের জন্য আলাদা বিশ্রামগৃহ এবং 'যাহাতে শিশুদের নিরাপদে গদিমোড়া খাটে শোয়াইয়া নিশ্চিন্তমনে মহিলারা অভিনয় দেখিতে পারেন'—তারও ব্যবস্থা হয়েছিল। ১৯৩৮ পর্যন্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র মিনার্ভা থিয়েটারের মালিক ছিলেন। তাঁর সময়েই খ্যাতনামা অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরী কিছুকাল এখানে যুক্ত থেকে অভিনয় ররেন (১৯৩০ থেকে)। সে সময়কার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাট্যাভিনয় হলো মিশরকুমারী (এপ্রিল, ১৯৩০), বেহুলা (৩০ আগস্ট, ১৯৩০), চন্দ্রনাথ (৯ অক্টোবর, ১৯৩১), প্রতাপাদিত্য (২ আগস্ট, ১৯৩২), দেবযানী (১০ ডিসেম্বর, ১৯৩২)। এসব নাটকে নানা চরিত্রে অসামান্য অভিনয়ের স্বাক্ষর রাখেন অহীন্দ্র চৌধুরী। যেমন আবন (মিশরকুমারী), চন্দ্রধর (বেহুলা), শুক্রাচার্য (দেবযানী) ইত্যাদি।

১৯৩২-এ নতুন আমদানী সবাক চলচ্চিত্রের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে মিনার্ভায় টিকিটের দাম আবার কমানো হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে (১৯৩৯-৪৫) মিনার্ভা নতুন পরিচালক বোর্ডের অধীনে আসে। ১৯৪২ থেকে কাজ শুরু করে। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি গুপ্তা, নীরদাসুন্দরী প্রভৃতি খ্যাতিমান শিল্পী মিনার্ভায় যোগ দেয়। এখানে অভিনয় কালেই (কাঁটাকমল' নাটকে) দুর্গাদাস অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মারা যান। তখন নির্মলেন্দু লাহিড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য যোগ দেন। পরে সরযূবালা, ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র প্রমুখ অভিনেতা অভিনেত্রীরা আসেন। এই সময়কার উল্লেখযোগ্য অভিনয়গুলি হলো — দেবদাস, দুইপুরুষ (তারাশঙ্কর), ধাত্রীপান্না, সীতারাম, কাশীনাথ, রাষ্ট্রবিপ্লব (শচীন সেনগুপ্ত) প্রভৃতি। এখানে প্রখ্যাত নট ছবি বিশ্বাস নুটু বিহারী (দুইপুরুষ) এবং রনবীর (ধাত্রীপান্না) চরিত্রে অসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। দেবদাস নাটকেই ছবি বিশ্বাসের অভিনয় জীবনের শুরু (১১ মার্চ,, ১৯৪৪)।

স্বাধীনতার পরে কয়েক বছর নানা কারণে মিনার্ভা বন্ধ থাকে।

১৯৪৯ থেকে আবার নিয়মিত অভিনয় শুরু হয়। অহীন্দ্র চৌধুরী এই সময়ে মিনার্ভায় ফিরে আসেন (১৯৫০)। মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঝাঁসীর রাণী (২১ জুলাই, ৪৯), সুধীন্দ্রনাথ রাহার বিক্রমাদিত্য (২২ ডিসেম্বর, ৪৯), অভিনয় হওয়ার পর ১৬ জুন, ১৯৫০-এ অভিনীত হলো 'দেবদাস' শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপ। রাজকৃষ্ণ রায়ের 'নরমেধযজ্ঞ' (২২ নভেম্বর, ৫০), মন্মথ রায়ের 'চাঁদ সদাগর' (১৯৫০)। তারপরে ১৯৫১-এর ২৩ মার্চ শুরু হয় শরৎচন্দ্রের 'চন্দ্রনাথ' (নাট্যরূপ : বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র)। অভিনয়ে অহীন্দ্র চৌধুরী (কৈলাস খুড়ো), ছবি বিশ্বাস (চন্দ্রনাথ), সরযূ (সরযূ দেবী) খুব ভালো অভিনয় করেন। মিনার্ভা আবার আর্থিক সাফল্যের মুখ দেখে।

মিনার্ভার একটি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনারূপে সে যুগে 'চন্দ্রনাথ' নাট্যাভিনয়কে মনে রাখতে হবে।

শচীন সেনগুপ্তের 'তুষারকণা' অভিনীত হলো ৭ অক্টোবর ১৯৫১। ইন্দু ভট্টাচার্যের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ঐ বছরেরই ২১ ডিসেম্বর অভিনয় হলো।

তারপরে বঙ্কিমচন্দ্রের সুবর্ণগোলক (নাট্যরূপ : বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র) অভিনীত হলো ১৩ মার্চ, ১৯৫২। ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক 'কেরানীর জীবন' (২৫ অক্টোবর, ১৯৫২) বিষয় ভাবনায়, বাস্তব জীবন রূপায়ণে এবং উচ্চমানের অভিনয়ে দর্শকচিত্ত জয় করেছিল। মন্মথ রায়ের 'জীবনটাই নাটক' (২৯ জানুযয়রি, ৫৩), শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'ঝিন্দের বন্দী'র নাট্যরূপ অভিনীত হলো। 'ঝিন্দের বন্দী'তে অভিনয় করেছিলেন—ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, সরযূ দেবী, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। কাহিনীর রস এবং এঁদের অভিনয়ের উচ্চমানের গুণে নাটকটি দর্শক সাফল্য লাভ করে। এর পরে মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জাহাঙ্গীর' অভিনীত হয় (১৫ অক্টোবর, ৫৩), বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'পিতাপুত্র' (১৫ জানুয়ারি ৫৫) মহেন্দ্র গুপ্তের 'সারথী শ্রীকৃষ্ণ' (১৯৫৫), নিরুপমা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে 'দেবত্র' (৫৫), ঠাকুর রামকৃষ্ণ (৫৫) ধীরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'মহানায়ক শশাঙ্ক' (৮ অক্টোবর, ৫৫) ধারাবাহিক অভিনয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

১৯৫৫-এর ২২ ডিসেম্বর সন্তোষ সেনগুপ্ত রচিত 'এরাও মানুষ' নাটকটি অভিনীত হয়ে সাড়া ফেলে দেয়। অভিনেতা সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় অসাধারণ অভিনয় করে খ্যাতিলাভ করেন। বিকলাঙ্গ ভিখিরিদের জীবনযন্ত্রণা, তাদের সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনার উচ্চকিত সেন্টিমেন্ট দর্শক আনুকূল্যে সার্থকতা পেয়েছিল। দুশো রাত্রির ওপর এই নাটকটি সে সময়ে অভিনীত হয়েছিল। সন্তোষ সেনগুপ্তের 'মধ্যবিত্ত' (৪ অক্টোবর, ৫৬) প্রশান্ত চৌধুরীর 'প্রত্যাবর্তন' (৮ ডিসেম্বর, ৫৬) কেদারলাল রায়ের 'কুন্তী কর্ণ কৃষ্ণ' (৫ জুলাই, ৫৭), জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'ড. শুভঙ্কর' (ডিসেম্বর '৫৮) এই সময়কালের উল্লেখযোগ্য অভিনয়। এই সময়ে কিছুদিন এখানে শিশিরকুমার ভাদুড়ি তাঁর 'জীবনরঙ্গ' নাটকটি অভিনয় করেন এবং নিজেও অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন।

পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে প্রথমে 'বহুরূপী' নাট্যগোষ্ঠী শম্ভু মিত্রের পরিচালনায় এখানে নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করে। সপ্তাহের তিনদিন, বৃহস্পতি, শনি ও রবিবারে 'ছেঁড়া তার' ও 'রক্তকরবী'র নিয়মিত অভিনয় শুরু করে। মাত্র দুমাস এখানে অভিনয়ের পর দর্শক আনুকূল্যে ব্যর্থ হয়ে অভিনয় বন্ধ করে দেয়। যে শিক্ষিত, বিদগ্ধ ও রুচিশীল সীমিত রসিক দর্শকের জন্য তাঁরা তাঁদের দলের হয়ে মাঝে মাঝে অভিনয় করত, সাধারণ রঙ্গালয়ে পেশাদারি ভাবে নিয়মিত অভিনয় করতে গিয়ে সাধারণ দর্শকের আনুকূল্য থেকে তাঁরা বঞ্চিত হলেন।

মিনার্ভার তখন এমনিতেই দুরবস্থা। প্রায়ই অভিনয় বন্ধ থাকে। অভিনয় হলেও, সেগুলি কোনোদিক দিয়েই উল্লেখযোগ্য নয়। এই দশ বৎসরের সঙ্কটকালে 'বহুরূপী'

এসে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল।

তারপরে উৎপল দত্তের পরিচালনায় তাঁর 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ' (এল. টি. জি) মিনার্ভা থিয়েটার 'লীজ' নিয়ে ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত একাদিক্রমে বহু নাটকের সাফল্যজনক অভিনয় করে। ২৭ জুন ১৯৫৯ থেকে তারা এখানে অভিনয় শুরু করে। ওথেলো, ছায়ানট, নীচের মহল, অঙ্গার, ফেরারী ফৌজ, তিতাস একটি নদীর নাম, কল্লোল, প্রফেসর মামলক, তীর, মানুষের অধিকারে, লেনিনের ডাক প্রভৃতি নাটকের অভিনয়ে পেশাদারি থিয়েটারের জগতে নতুন ভাবোন্মাদনা ও উদ্দীপনার জোয়ার নিয়ে আসেন। রাজনৈতিক ভাবনাচিন্তার প্রসারে ও প্রগতিশীল চেতনার বিকাশে লিটল থিয়েটার গ্রুপ-এর প্রযোজনাগুলি বাংলা ব্যবসায়িক থিয়েটারের জগতে নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। অভিনয়ে পরিচালনায়, দৃশ্যসজ্জায়, সেট নির্মাণে, আলোক সম্পাতে, সুর ও সঙ্গীত ব্যবহারে এবং নাট্যবিষয়ের গুরুত্বে, সম্মিলিত অভিনয়ে সেদিন মিনার্ভা জনকল্লোলমুখি হয়ে উঠেছিল। ১৯০৫-এর পর আবার মিনার্ভা তার থিয়েটারকর্মে মানুষের প্রতি তার দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতে পেরেছিল।

'লিটল থিয়েটার গ্রুপ' তাদের অভিনয়ের জন্য মিনার্ভার নাম পরিবর্তন করে 'শিশির নাট্য মন্দির' রাখার পরিকল্পনা করেছিল। যদিও আইনঘটিত এবং অন্যান্য কারণে শেষ পর্যন্ত মিনার্ভা নামটিই ব্যবহার করা হয়েছিল।

আরেকটি কথা, 'মিনার্ভা'-তে নিয়মিত অভিনয় করতে এসেই অভিনেতা ও পরিচালক উৎপল দত্ত থিয়েটারের দাবিতে ক্রমান্বয়ে নাট্যকার হয়ে পড়লেন। মিনার্ভায় শুধু উচ্চমানের নাট্যাভিনয় নয়, নাট্যকার উৎপল দত্তকেও সম্ভব করে তুলল।

'লিটল থিয়েটার গ্রুপ' মিনার্ভা ছেড়ে চলে গেলে (২৮ জুলাই, ১৯৭১) মিনার্ভার অভিনয় প্রায় বন্ধ হতে বসে। 'নাট্যকর্মী পরিষদ' নামে মিনার্ভার কর্মীসংস্থা এখানে 'প্রবাহ' নাটক কিছুদিন অভিনয় করে। ১৯৭২-এ অভিনয় করে '১৭৯৯' নামে নাটক। নাট্যকার ও পরিচালক অসিত বসু। এঁদের কোনো প্রায়াসই সেভাবে সার্থক হয়নি।

১৯৭০-এর দশকে কলকাতার বেশ কিছু পেশাদার থিয়েটার ব্যবসা চালাবার ঝোঁকে তাদের থিয়েটারে 'এ'-মার্কা 'ব্লো হট' নাটক অভিনয় করতে থাকে। নাট্যাভিনয় নিম্নমান ও রুচির পর্যায়ে পৌঁছে যায়। মিনার্ভা তার এই দুর্দিনে (তখন মালিক কস্তুরচাঁদ জৈন) ঐভাবে থিয়েটারকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল। সেরকম কয়েকটি নাটক হলো—সমরেশ বসুর কাহিনী অবলম্বনে সমর মুখার্জীর নাট্যরূপে এবং তারই পরিচালনায় 'প্রজাপতি' (২৫ এপ্রিল, ১৯৭৪), ব্যভিচার (৩০ মে, ১৯৭৬) ইত্যাদি। এই ধারা বেয়েই নব্বই-তেও মিনার্ভা অস্তিত্বহীনতার মাঝে অভিনয় করেছিল 'এক্সজোন', 'সুহাস' 'শুধু তোমাকে চাই' নামীয় রুচিহীন বিকৃত সব নাটক। কিছু কিছু দল মিনার্ভা ভাড়া নিয়ে এইসব নাটকাভিনয়ের আয়োজন করেছিল। নীহাররঞ্জন গুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে স্বর্ণবলয় (১৫ অক্টোবর, ১৯৭৭), সুনীতকুমার দাসের রচনা ও পরিচালনায় বান্ধবী (১৯৭৮), সুবোধ ঘোষের কাহিনী অবলম্বনে বাসুদেব ঘোষের নাট্যরূপ ও পরিচালনায়

জয়া (১৪ আগস্ট, ১৯৭৯), সমর মুখার্জীর রচনা ও পরিচালনায় প্রিয়ার খোঁজে (২ নভেম্বর, ১৯৮০) প্রভৃতি এইসব অকিঞ্চিৎকর নাট্যপ্রযোজনার তালিকায় পড়ে।

১৯৭০-এর দশকের পর থেকে মিনার্ভা প্রায় জীর্ণ ও ব্যবহারহীন হয়ে পড়ে। কখনো কোনো নাট্যদল উদ্যোগী হয়ে মিনার্ভা ভাড়া নিয়ে কিছু নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করে। কিন্তু কোনটিই ভালভাবে বা বেশি দিন চলে নি। এই ভাবে বিডন স্ট্রিটে মিনার্ভা থিয়েটার তার প্রাচীন ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার অন্তে অস্তিত্বের নিরালম্ব ও জনশূন্যতার হাহাকার নিয়ে পড়ে আছে।

১. মিনার্ভা প্রতিষ্ঠার পর থেকে শতবর্ষ অতিক্রম করে গেল। শতবর্ষব্যাপী একটি থিয়েটারের অস্তিত্বই তার ঐতিহ্য ও সাফল্যের প্রমাণ দেয়। যদিও স্টার থিয়েটারের তুলনায় তার গৌরব অনেক কম। বহু মালিকানা বদল সত্ত্বেও মিনার্ভা তার অভিনয় চালিয়ে গেছে। গিরিশ, অর্ধেন্দুশেখর, অমরেন্দ্রনাথ, অপরেশচন্দ্র, অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস, নির্মলেন্দু, ছবি বিশ্বাস--থিয়েটার জগতের খ্যাতিমান পুরুষেরা এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে মিনার্ভার মাহাত্ম্য বাড়িয়ে দিয়েছেন।
২. গিরিশ, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলালের বিখ্যাত সব নাটকের অভিনয় এখানেই হয়েছে।
৩. নানা বিচিত্রমুখী নাটকের প্রযোজনায় মিনার্ভা খ্যাতিলাভ করেছিল। ঐতিহাসিক, সামাজিক, পৌরাণিক গীতিনাট্য অপেরা, পঞ্চরং, প্রহসন-নক্সা-সব জাতীয় নাটকের অভিনয়েই মিনার্ভা সাফল্য লাভ করে।
৪. গিরিশের জীবনের শেষ দশ-বারো বছর তিনি প্রায় মিনার্ভাতেই কাটিয়েছেন। পরিণত বয়সের নাট্যরচনাগুলি সব মিনার্ভার জন্যই। তাঁর পরিণত অভিনয় শিক্ষাদান এই মিনার্ভার শিল্পীদের জন্য।
৫. অর্ধেন্দুর স্বাজাত্যবোধ ও দেশানুরাগ এই মিনার্ভার মধ্য দিয়েই আবার প্রকাশ লাভ করেছিল। ব্রিটিশের শাসনের চোখ রাঙানি অস্বীকার করে মিনার্ভা দেশপ্রেমের নাটক অভিনয় করে গেছে। থিয়েটারকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের শরিক করে তুলতে পেরেছিল।
৬. এল. টি. জি. এই মিনার্ভাকেই নতুন যুগের থিয়েটারের 'প্রাণস্থল' করে দিয়ে গেছে।
৭. বাঙালির জাতীয়জীবনেব উত্থান-পতনের শরিক হওয়ার চেষ্টা মিনার্ভা সবসময়েই করে গেছে। নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে মিনার্ভার শতবর্ষব্যাপী বিচিত্রমুখী নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত করে রেখেছে।

ক্লাসিক থিয়েটার ও অমরেন্দ্রনাথ দত্ত

৬৮ নম্বর বিডন স্ট্রিট, কলকাতা

প্রতিষ্ঠা : ১৬ এপ্রিল, ১৮৯৭ (৪ বৈশাখ, ১৩০৪)
স্থায়িত্বকাল : ১৬ এপ্রিল, ১৮৯৭-- মে, ১৯০৬
প্রতিষ্ঠাতা : অমরেন্দ্রনাথ দত্ত
নাটক : নলদময়ন্তী ও বেল্লিকবাজার (গিরিশ)

ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার (১৮৭২) পরে পঁচিশ বছর কেটে গেছে। উনিশ শতকের সেই শেষ প্রান্তে রঙ্গালয়গুলির অবস্থা ভালো নয়। বেঙ্গল থিয়েটার জরাজীর্ণ অবস্থায় উঠে যাওয়ার মুখে, মিনার্ভা নীলামে উঠবে, আর্থিক অনটনে স্টার চলছে কোনোরকমে। পুরনো খ্যাতিমান অভিনেতাদের সব বয়স হয়েছে। তিনটি থিয়েটারে একঘেয়ে নাটক ও একই মুখ দেখতে দেখতে দর্শকেরাও ক্লান্ত।

ঠিক এই সময়ে, ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ এপ্রিল, গুডফ্রাইডের দিন, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (১ এপ্রিল, ১৮৭৬—৬ জানুয়ারি, ১৯১৬) প্রতিষ্ঠিত ক্লাসিক থিয়েটারের উদ্বোধন হলো। ঠিক সন্ধ্যা সাতটায় অভিনয় শুরু হল গিরিশের 'নলদময়ন্তী' নাটক দিয়ে, পরে প্রহসন 'বেল্লিকবাজার।' ১২০০ টাকা অগ্রিম এবং মাসিক ২৫০ টাকা ভাড়ায় এমারেল্ড থিয়েটারের বাড়িতে ক্লাসিক থিয়েটারের পত্তন করেন।

সুদর্শন, উজ্জ্বল স্বাস্থ্যবান তরুণ যুবা অমরেন্দ্রনাথ বনেদী ও বিদগ্ধ পরিবার থেকে থিয়েটারে এলেন। কলকাতার চোরবাগানের বিখ্যাত দত্ত পরিবারের সন্তান[১] অমরেন্দ্রনাথ অল্পবয়স থেকেই থিয়েটারের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন। 'ইন্ডিয়ান ড্রামাটিক ক্লাব' প্রতিষ্ঠা করে সখের অভিনয় করতে থাকেন। পলাশীর যুদ্ধ, বেল্লিকবাজার, বিষাদ নাটকের অভিনয় করেন। 'পলাশীর যুদ্ধে'র দ্বিতীয় অভিনয়ে, মিনার্ভায়, অমরেন্দ্রনাথ সিরাজদৌল্লার ভূমিকায় প্রথম মঞ্চাবতরণ করেন (১৮৯৫)। তাঁর সখের নাট্যাভিনয়ে অন্য সঙ্গীরা ছিলেন : সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু), চুনিলাল দেব, নৃপেন বসু, সতীশ চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, নীলমাধব চক্রবর্তী এবং অভিনেত্রী তারাসুন্দরী।

৬৮ নম্বর বিডন স্ট্রিটে গোপাল শীলের এমারেল্ড থিয়েটার (সাবেক স্টার থিয়েটার) লীজ নিয়ে পুরো পেশাদারি অভিনয়ের ব্যবস্থা করলেন। লেসী ও ম্যানেজার

---

১. পিতা খুবই ধনী দ্বারকানাথ দত্ত। মেজদা প্রখ্যাত পণ্ডিত ও দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। হীরেন্দ্রনাথের পুত্র পরবর্তীকালের বিখ্যাত কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। সুধীন্দ্রনাথের লেখা 'The World of Twelight' গ্রন্থে কাকা অমরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনেক কথা লেখা আছে। আরেক ভ্রাতুষ্পুত্র হরীন্দ্রনাথ দত্ত, রমাপতি দত্ত ছদ্মনামে 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ' গ্রন্থ লেখেন।

অমরেন্দ্রনাথ। অভিনেতৃ দলে পুরনোদের মধ্যে সতীশ চট্টোপাধ্যায় ও তারাসুন্দরী। নতুন এলেন মহেন্দ্রলাল বসু, অঘোরনাথ পাঠক, গোবর্ধন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ দাস, ধর্মদাস সুর, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, হরিভূষণ ভট্টাচার্য, কুসুমকুমারী, নয়নতারা, শরৎসুন্দর, সরোজিনী। এদের সকলকে নিয়ে খোলা হল ক্লাসিক থিয়েট্রিকাল কোম্পানী। দীর্ঘদিনের 'থিয়েটার'-বাসনা এতদিনে কার্যকরী হল। বহু পরিশ্রম, ভাগ্য বিপর্যয় এবং অধ্যবসায়ের শেষে অমরেন্দ্রনাথের নিজের মালিকানায় ও পরিচালনায় নিজস্ব থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হল--ক্লাসিক থিয়েটার।

উদ্বোধনের রাতে মহাসমারোহে নলদময়ন্তীর অভিনয় হল। অভিনয় করলেন :

অমর দত্ত—নল। তারাসুন্দরী—দময়ন্তী। অঘোর পাঠক—কলি।

ক্লাসিক থিয়েটারের প্রথম বিজ্ঞাপন (স্টেটসম্যান : ১৬-৪-১৮৯৭) থেকে জানা যায়, থিয়েটারের নেপথ্যকর্মে ছিলেন : ধর্মদাস সুর—রঙ্গভূমি সজ্জাকর। আশুতোষ বড়াল—বিজনেস ম্যানেজার। প্রমথনাথ দাস--বিজ্ঞাপন বিভাগের ম্যানেজার। অঘোরনাথ পাঠক—সঙ্গীত শিক্ষক। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত—লেসী ও ম্যানেজার। কোম্পানীর নাম—দি ক্লাসিক থিয়েট্রিকাল কোম্পানী।

পূর্ণোদ্যমে ক্লাসিক থিয়েটারের অভিনয় শুরু হয়ে গেল। বাংলা নাট্যশালায় নতুন জীবন সঞ্চার হল।

অভিনয়ের তালিকা :

১৮৯৭ : নলদময়ন্তী ও বেল্লিকবাজার (১৬ এপ্রিল)। পলাশীর যুদ্ধ ও লক্ষ্মণ বর্জন (১৭ এপ্রিল)। দক্ষযজ্ঞ (১৮ এপ্রিল)। বিবাহবিভ্রাট (২৪ এপ্রিল)। তরুবালা (২৫ এপ্রিল)। হারানিধি (১ মে)। বিল্বমঙ্গল (২৩ মে)। দেবীচৌধুরাণী (নাট্যরূপ : অমর দত্ত, ২৯ মে)। হরিরাজ (শেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' অবলম্বনে নগেন্দ্রনাথ চৌধুরীর লেখা, ২১ জুন)। বুদ্ধদেব চরিত (৩০ জুন)। রাজা ও রানী (রবীন্দ্রনাথ, ২৪ জুলাই)। পূর্ণচন্দ্র (৫ সেপ্টেম্বর)। আলিবাবা (ক্ষীরোদপ্রসাদ, ২০ নভেম্বর)। আলাদীন (১২ ডিসেম্বর)। কাজের খতম (অমর দত্ত, ২৫ ডিসেম্বর)।

দু'একটি নতুন নাটক ছাড়া প্রায় সবই পুরনো নাটক এবং গিরিশের নাটক। একই সঙ্গে একাধিক নাটকের অভিনয় করা হত; আবার একই নাটক অনেকবার অভিনয় করা হত। উল্লেখযোগ্য, 'হ্যামলেট' অবলম্বনে 'হরিরাজ' নাটকের অভিনয়।

চরিত্রলিপি :

হরিরাজ—অমরেন্দ্রনাথ। শ্রীলেখা—তারাসুন্দরী। সুরমা—ক্ষুদিবালা। মলিনা—সরোজিনী। জয়াকর —হরিভূষণ ভট্টাচার্য। কূলধ্বজ—গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্তী। দধিমুখ—ভোলানাথ দাস

হরিরাজ অভিনয় করে খুবই খ্যাতিলাভ করে। হ্যামলেটের ট্রাজেডির সূক্ষ্ম ভাব যে দর্শকের পরিতৃপ্ত করেছিল, তা 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা জানিয়েছিল (২০ জুন, ১৮৯৭)।

অভিনয়ে অমর দত্ত এবং তারাসুন্দরী খুবই কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এছাড়া দেবী চৌধুরানীর নাট্যরূপও প্রশংসিত হয়েছিল। অমর দত্ত (ব্রজেশ্বর), হরিভূষণ ভট্টাচার্য (ভবানী পাঠক), তারাসুন্দরী (প্রফুল্ল), কুসুমকুমারী (নিশি) অভিনয়ে কৃতিত্ব দেখান। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী' নাটকে অমর দত্ত--বিক্রম, মহেন্দ্রলাল বসু--কুমার সেন, হরিভূষণ ভট্টাচার্য--দেবদত্ত উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন। রবীন্দ্রনাথ এই নাটকের অভিনয় দেখতে ক্লাসিকে আসেন এবং অভিনয়ের প্রশংসা করেন।

প্রথম বছরের সবচেয়ে সফল প্রযোজনা আলিবাবা। 'আলিবাবা' এই সময়ে মিনার্ভায় অভিনীত হচ্ছিল। প্রতিযোগিতামূলকভাবে ক্লাসিকেও 'আলিবাবা' নামানো হল। প্রতিযোগিতায় ক্লাসিকের বিক্রি বাড়তে থাকে এবং বাইশ শো টাকা পর্যন্ত দৈনিক বিক্রি শুরু হয়। সর্বমোট লক্ষাধিক টাকা লাভ হয়। অন্যদিকে মিনার্ভায় বিক্রি কমতে কমতে নীলামে উঠে বিক্রি হয়ে গেল (মার্চ, ১৮৯৮)। আবদালা--নৃপেন বসু এবং মর্জিনা-কুসুমকুমারী নাচ-গানে মাতিয়ে দিলেন। গীতিনাট্যটির উপযোগী দৃশ্যসজ্জা, সাজসজ্জা, আলো এবং অসংখ্য মনোহারি গান ও নয়নলোভন নাচ দর্শকদের দারুণভাবে আকর্ষণ করল। দ্বৈত নৃত্যগীতের নাটিকায় 'আলিবাবা' রেকর্ড সৃষ্টি করল। অমর দত্তের নিজের লেখা 'কাজের খতম' পঞ্চরং এই বছরের শেষ অভিনয়। মঞ্চের তাগিদে অমর দত্তকে নাটক লেখায় হাত দিতে হল। অভিনেতা, ম্যানেজার, নাট্য পরিচালক-এর সঙ্গে এবারে কিছু কিছু নাটক রচনার দায়িত্বও তাঁকে নিতে হল।

> ১৮৯৮ : পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস (৮ জানুয়ারি)। দোললীলা (অমর দত্ত, ৫ মার্চ)। মেঘনাদবধ (নাট্যরূপ : গিরিশ, ১৬ জুলাই)। মুকুলমুঞ্জরা (৩০ জুলাই)। দক্ষযজ্ঞ (১৪ আগস্ট)। প্রফুল্ল (২৭ আগস্ট)। ইন্দিরা (নাট্যরূপ : অমর দত্ত, ২৪ সেপ্টেম্বর)। কমলেকামিনী (৫ নভেম্বর)। নির্মলা (অমর দত্ত রচিত গীতিনাট্য, ২৪ ডিসেম্বর)।

১৮৯৮-এর ১৯ মার্চ থেকে ক্লাসিকে প্রথম 'Cinematography' প্রদর্শন হয়।[২] সঙ্গে দোললীলার অভিনয়। এরপর মাঝে মাঝেই ক্লাসিকে 'বায়স্কোপ' দেখানো হত। সঙ্গে অন্য নাটক থাকত। এই বছরের জুলাই মাসে গিরিশচন্দ্র ক্লাসিকে যোগ দেন, সঙ্গে পুত্র দানীবাবু। ছিলেন একটানা ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত, নাট্যকার ও নাট্যশিক্ষকরূপে। এই বছরের মার্চের গোড়াতেই কলকাতায় 'প্লেগ' রোগ মহামারীরূপে দেখা দেয়। মে মাসে প্রকোপ বেড়ে গেলে গিরিশ ক্লাসিক ছেড়ে দলবল নিয়ে কলকাতার বাইরে অভিনয়ের জন্য চলে যান। কলকাতার লোকজন আতঙ্কে বাইরে পালাতে থাকেন। স্টার দেড় মাস অভিনয় বন্ধ রাখে। ক্লাসিক কিন্তু অভিনয় বন্ধ রাখেনি। অভিনেতা চুনিলাল দেব, নিখিলকৃষ্ণ দেব এবং পরে অভিনেত্রী তিনকড়ি ও প্রমদাসুন্দরী ক্লাসিকে যোগ দিলেন। এই বছর অমরেন্দ্রনাথের দুটি গীতিনাট্য ছাড়া পুরনো সব নাটক, গীতিনাট্য ও নাট্যরূপের অভিনয় হতে থাকে। দোললীলা নাচগানে সাফল্য পেল। গিরিশ পাঁচ মাস

২. দ্রঃ পাদটীকা পৃঃ ১৯৫ ; প্রথম দিকে বাংলা থিয়েটারে 'Animated Cinema' হত।

থেকে নিজের পুরনো কয়েকটি নাটকের অভিনয় করান এবং অমর দত্তের নির্মলা গীতিনাট্য নামান। তারপরে গিরিশ চলে যান, আগেই অভিনেতা মহেন্দ্রলাল বসু চলে গেছেন। ক্লাসিক অবস্থা সামাল দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

১৮৯৯ : নির্মলা (১ জানুয়ারি)। জনা (৮ জানুয়ারি)। রাজা ও রানী (১৫ জানুয়ারি)। বিষাদ (৪ ফেব্রুয়ারি)। ধ্রুবচরিত্র (২২ ফ্রেব্রুয়ারি)। সীতার বনবাস (৮ মার্চ)। হীরার ফুল (১৫ মার্চ)। প্রফুল্ল (১৮ মার্চ)। সিন্ধুবধ বা দশরথের মৃগয়া (রাজকৃষ্ণ রায়, ২৫ মার্চ)। আবু হোসেন (১২ এপ্রিল)। চোরের ওপর বাটপাড়ি (১৯ এপ্রিল)। বুদ্ধদেবচরিত ও চক্ষুদান (১৩ মে)। দেলদার (১০ জুন)। করমেতিবাঈ (১৫ জুলাই)। শ্রীকৃষ্ণ (অমর দত্ত, ২৬ আগস্ট)। ভ্রমর (কৃষ্ণকান্তের উইল-এর নাট্যরূপ : অমর দত্ত, ১৬ সেপ্টেম্বর)। ম্যাকবেথ (অনুবাদ : গিরিশ, ১৮ নভেম্বর)।

১৮৯৯-এর ১৮ মার্চ, মিনার্ভাতে গিরিশের পরিচালনায় প্রফুল্ল অভিনীত হয়। প্রতিযোগিতার জন্য অমর দত্ত ক্লাসিকেও ঐ একই দিনে প্রফুল্ল নামান। এবং বিজ্ঞাপনে দুই প্রফুল্লের তুলনামূলক বিচারের জন্য দর্শকদের আহ্বান করেন। যোগেশের ভূমিকায় ক্লাসিকে অমর দত্ত এবং মিনার্ভায় গিরিশচন্দ্র অভিনয় করেন।

কিছুদিন বাদে (১২ এপ্রিল) গিরিশ ক্লাসিকে নাট্যকাররূপে যোগ দেন। শর্ত হয় বছরে চারটি নাটক লিখতে হবে এবং শর্ত ভঙ্গে উভয় পক্ষ তিন হাজার টাকা গুণাগার দেবেন। গিরিশ এখানে থাকাকালীন এই বছরে শুধুমাত্র 'দেলদার' গীতিনাট্য ছাড়া আর কিছু নতুন লিখে দেননি। দেলদার খুবই সাফল্যলাভ করে। অভিনয় করেন : নৃপেন বসু--দেলদার। কুসুমকুমারী--পিয়াসী। অমরেন্দ্রনাথ--গহন। দানীবাবু--সরল। প্রমদাসুন্দরী--রেখা। অঘোরনাথ--কুহকী। নাচেগানে নৃপেন বসু এবং কুসুমকুমারী আবার মাতিয়ে দিলেন। 'দেলদার'--এর সাফল্যে উৎসাহিত অমরেন্দ্রনাথ 'শ্রীকৃষ্ণ' লিখে ফেললেন। শ্রীকৃষ্ণ দারুণভাবে জমে গেল। স্টারে 'মৃচ্ছকটিক', বেঙ্গল থিয়েটারে 'বভ্রুবাহন', মিনার্ভায় 'মদালসা' সব নতুন নাটক-গীতিনাট্য শুরু হয়েছে। ক্লাসিকও নতুন গীতিনাট্য 'শ্রীকৃষ্ণ' নামাল এবং অচিরাৎ সব মঞ্চকে হারিয়ে অসামান্য সাফল্যলাভ করল। এখানে ভিড় উপচে পড়তে লাগল। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রলিপি :

কুসুমকুমারী--শ্রীকৃষ্ণ। প্রমদাসুন্দরী--বলরাম। রানীসুন্দরী--শ্রীদাম। ভূষণকুমারী--শ্রীরাধিকা। পান্নারানী--যশোদা। কুমুদিনী--জটিলা। গুলফনহরি--কুটিলা। যতীন্দ্র ভট্ট --নন্দ ঘোষ। হীরালাল চাকী--উপানন্দ।

বঙ্কিমের 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর নাট্যরূপ 'ভ্রমর' অভিনয় প্রতি রাত্রে 'হাউসফুল' হতে লাগল। খাট আলমারি সোফাসেট সব দিয়ে একেবারে বাস্তবসম্মত দৃশ্যসজ্জা, উজ্জ্বল আলো এবং অসামান্য অভিনয় এর সাফল্যের মূলে। অমর দত্তের গোবিন্দলাল সবাইকে মুগ্ধ করে দিয়েছিল। কুসুমকুমারীর ভ্রমর এবং মহেন্দ্রলাল বসুর কৃষ্ণকান্ত, প্রমদাসুন্দরীর রোহিণী, হরিভূষণের হরলাল, দানীবাবুর নিশাকর সকলের প্রশংসা অর্জন

করে। গোবিন্দলালরূপী অমরেন্দ্রনাথ ঘোড়ায় চেপে মঞ্চে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চকিত করতালিতে প্রেক্ষাগৃহ ভরে উঠত। ঘোড়ায় চেপে মঞ্চে আগেও ঢুকেছেন কেউ কেউ। অমরেন্দ্রনাথের ঘোড়ার মাথায় জ্বলত আলো। তাতেই বাজার মাত করতেন তিনি। বিজ্ঞাপন বেরোত--'Gobindalal on horse-back'--Statesman, 16. 9. 1899.

১৫ নভেম্বর এখানে রুশ যাদুকর প্রোঃ বোসাকোভস্কির ম্যাজিক প্রদর্শন করা হয়েছিল। ম্যাকবেথ-এর অভিনয়ও খুব আন্তরিকতার সঙ্গে করা হয়েছিল। গিরিশের নির্দেশনায় অমর দত্ত (ম্যাকবেথ), কুসুমকুমারী ও তিনকড়ি (লেডি ম্যাকবেথ) অনবদ্য অভিনয় করেন।

> ১৯০০ : দেবী চৌধুরাণী, শ্রীকৃষ্ণ, ভ্রমর, বিল্বমঙ্গল, দোললীলা, আলিবাবা প্রভৃতি পূর্ব অভিনীত নাটকগুলিরই পুনরভিনয় চলে। নতুন নাটক বলতে গিরিশের 'পাণ্ডবগৌরব' (১৭ ফেব্রুয়ারি), অমর দত্তের গীতিনাট্য 'দুটি প্রাণ' (২৬ মে), নাট্যরূপ 'সীতারাম' (৩০ জুন), প্রহসন 'থিয়েটার' (২৫ আগস্ট) এই বছরের প্রযোজনা। তাছাড়াও পুরনো সরলা, সধবার একাদশী, বৃষকেতু প্রভৃতি নাটকেরও অভিনয় হয়।

গিরিশ এই বছরে শুধু পাণ্ডবগৌরব লিখেছেন এবং ১৫ এপ্রিল দলবল নিয়ে ক্লাসিক ছেড়ে মিনার্ভায় চলে যান। মিনার্ভায় সীতারাম-এর অভিনয়ের দ্বিতীয় রাতেই অমর দত্ত ক্লাসিকে সীতারাম নামান। এইভাবে সীতারাম নিয়েও দুই মঞ্চে প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। পাণ্ডবগৌরবের অভিনয়ে ছিলেন--ভীম--অমর দত্ত। কঞ্চুকী--গিরিশ। শ্রীকৃষ্ণ--দানীবাবু। সুভদ্রা--তিনকড়ি। দ্রৌপদী--গোলাপসুন্দরী। সুভদ্রা ও দ্রৌপদীর অভিনয় খুব ভালো হয়েছিল। এই নাটকে মূল চরিত্র 'ভীম'-এর ভূমিকায় গিরিশ তাঁর পুত্র দানীবাবুকে নামাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অমর দত্ত নিজেই ভীম চরিত্র গ্রহণ করেন। তখন গিরিশ শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রকে প্রাধান্য দিয়ে নাটকটিকে পুনর্গঠিত করেন এবং পুত্রকে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র অভিনয় করতে দেন। এইসব নিয়ে অমর দত্ত ও গিরিশের মনোমালিন্য হওয়া স্বাভাবিক।

> ১৯০১ : চাবুক (অমর দত্ত, ১ জানুয়ারি), অশ্রুধারা (২৬ জানুয়ারি), রামনির্বাসন (গিরিশ, ১৬ মার্চ), কপালকুণ্ডলা (নাট্যরূপ : গিরিশ, ১ জুন), মৃণালিনী (নাট্যরূপ : গিরিশ, ২৭ জুলাই), গুপ্তকথা (অমর দত্ত, ৩১ আগস্ট), চৈতন্যলীলা (১৪ সেপ্টেম্বর), অভিশাপ (গিরিশ, ২৮ সেপ্টেম্বর), তোমারি (প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়, ৭ ডিসেম্বর), অভিশাপ (গিরিশ, ২৮ সেপ্টেম্বর)।

এই বছরে পুরনো নাটকগুলির সঙ্গে এইসব নাটক অভিনীত হয়। এর মধ্যে অমরেন্দ্রনাথের লেখা চাবুক প্রহসন ও গুপ্তকথা লঘু নাটিকা দুটি ক্লাসিকের জন্যই লিখিত ও অভিনীত হয়। গিরিশ নতুন একটি ক্ষুদ্র নাটিকা 'অশ্রুধারা' লেখেন রানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু উপলক্ষে। গিরিশের 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয়ে এখানে একটি নতুনত্ব

লক্ষ্য করা যায়। চৈতন্যের লীলার তিন অংশ তিনজন অভিনেত্রী করেন। বাল্যলীলা রানীসুন্দরী, গার্হস্থ্যলীলা--তারাসুন্দরী, বৈরাগ্যলীলা--প্রমদাসুন্দরী। 'অভিশাপ' পৌরাণিক গীতিনাট্য ক্লাসিকের জন্যই লেখা। এখানে বাংলা মঞ্চে প্রথম মহিলা নৃত্যপরিচালিকা হিসেবে কুসুমকুমারী নৃত্য সংযোজন ও শিক্ষা দেন। 'তোমারি' প্রহসনের উত্তরে মিনার্ভা 'আমারি' নামে এক প্রহসন অভিনয় করে উতোর-চাপান দেওয়া শুরু করে। মিনার্ভার সঙ্গে একযোগে ক্লাসিক 'কপালকুণ্ডলার' প্রতিযোগিতামূলক অভিনয় আরম্ভ করে। অভিনেতা মহেন্দ্রলাল বসুর মৃত্যুতে (৮-৩-১৯০১) ক্লাসিকের ক্ষতি হয়। গিরিশের 'মনের মতন'ও এখানে প্রথম অভিনীত হয়।

এই বছরেই অমর দত্ত তার অভিনীত নাটকগুলির নির্বাচিত অংশ সিনেমায় তৈরি করেন বাংলা চলচ্চিত্রের পথিকৃৎ হীরালাল সেনের সহায়তায়। সিনেমার সেই নির্বাক যুগে এতদিন বিদেশ থেকে আনা সিনেমা দেখানো হতো। ক্লাসিক প্রথম বাঙালির নিজের তৈরি করা সিনেমা রঙ্গালয়ে অভিনয়ের আগে পরে দেখানো শুরু করে। এই অভিনয় ও সিনেমার টানে প্রচুর দর্শক সমাগম হতো।

> ১৯০২ : বহুৎ আচ্ছা (দ্বিজেন্দ্রলাল, ১৮ জানুয়ারি), শিবজী (২২ মার্চ), ফটিকজল (অমর দত্ত, ১২ এপ্রিল), শান্তি (গিরিশ, ৭ জুন), ভ্রান্তি (গিরিশ, ১৯ জুলাই), লাট গৌরাঙ্গ (অমর দত্ত, ২৭ সেপ্টেম্বর), আয়না (গিরিশ, ২৫ ডিসেম্বর)।

পুরনো নাটকের সঙ্গে এইগুলি অভিনীত হয়। গিরিশ শান্তি, ভ্রান্তি ও আয়না নতুন লিখেছেন। তবে সবচেয়ে সাফল্যলাভ করে অমরেন্দ্রনাথের শিবজী নাটকটি। মনোমোহন গোস্বামীর 'রোসেনারা' অবলম্বনে লেখা শিবজী জাতীয়তামূলক নাটক হিসেবে অনেক দিন বাদে মঞ্চে প্রথম অভিনীত হলো। অভিনয় করেছিলেন শিবজীর ভূমিকায় অমর দত্ত এবং মাতিয়ে দিয়েছিলেন দর্শকদের। অমর দত্তের 'ভক্তবিটেল' নাটকটি 'লাটগৌরাঙ্গে'র পরিবর্তিত নাম। পুলিশের নির্দেশে নাম পরিবর্তন করতে হয়।

> ১৯০৩ : এই বছরের প্রথম আট মাস সবই পুরনো নাটক অভিনীত হয়। সেগুলিই প্রচণ্ড দর্শক আকর্ষণ করতে থাকে। এমন সময়ে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরোধিতায় জনমনে দেশপ্রেমের জাগরণে স্টার ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' নামায়। অমনি ক্লাসিক হারাণচন্দ্র বক্সিতের 'বঙ্গের শেষ বীর' উপন্যাসকে নাট্যরূপ দিয়ে প্রতাপাদিত্য নামিয়ে দেয় (২৯ আগস্ট)। দুই মঞ্চের আবার প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। এর আগে স্টারের মঞ্চে 'নীলদর্পণ' নিয়েও প্রতিযোগিতা চলেছিল এই বছরেই।

এই সময়েই অমরেন্দ্রনাথ মিনার্ভা তিন বছরের জন্য লীজ নিয়ে একসঙ্গে ক্লাসিক ও মিনার্ভা চালাতে থাকেন। ক্লাসিক তখন মহাসমারোহে চলছে। 'হিরন্ময়ী' গীতিনাট্য (অতুল মিত্র) প্রচণ্ড সাফল্য পেল। পঁচিশ হাজার টাকা লাভ হলো।

> ১৯০৪ : রবীন্দ্রনাথের 'বউঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'রাজা বসন্ত

রায়' এর আগে সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়েছে। ক্লাসিক এর নাম পালটে 'প্রতাপাদিত্য' অভিনয় করে ১০ জানুয়ারি। ১ ফেব্রুয়ারি থেকে অমর দত্ত মিনার্ভার দলবল নিয়ে ঢাকায় যান লর্ড কার্জনের আগমন উপলক্ষে উৎসবে নাটক করতে। সেখানে দলের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। অমর দত্ত ফিরে আসেন।

ক্লাসিক তখন 'ভ্রমর'-এর পর গিরিশের নতুন নাটক 'সৎনাম' নামাল (৩০ এপ্রিল)। কিন্তু চতুর্থ অভিনয় রাত্রে (২১ মে) মুসলমান দর্শকদের আপত্তিতে সৎনামের অভিনয় বন্ধ করে দিতে হয়। এই সময় মিনার্ভার দেনা এবং সৎনামের বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে ক্লাসিকের দুর্দশা ঘনিয়ে এলো। অমরেন্দ্রনাথের অমিতব্যয়িতা, অবিমৃষ্যকারিতা, অপরিণামদর্শিতা, কর্মচারীদের ওপর অন্ধ বিশ্বাস, পেশাদারি থিয়েটার চালাবার কর্তব্যকর্মে অবহেলা প্রভৃতি কারণে ক্লাসিকে প্রচুর টিকিট বিক্রি হওয়া সত্ত্বেও অমর দত্ত দেনায় জড়িয়ে পড়লেন।

তা সত্ত্বেও নামালেন 'পেয়ার' (রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়), শ্রীরাধা (অমর দত্ত), তরণীসেন বধ (রাজকৃষ্ণ রায়, ২৩ জুলাই), বিক্রমাদিত্য (রাজকৃষ্ণ, ২৩ জুলাই)।

কিন্তু ততদিনে, 'মিনার্ভা' লীজ দিয়ে ছেড়ে দিতে হয়েছে। এদিকে মিনার্ভা থিয়েটার ও 'রঙ্গালয়' পত্রিকা চালাবার দরুন প্রচুর খরচ হয়ে গেছে, বাজারে তখনো তিন হাজার টাকা দেনা। এই সময়েই মিনার্ভায় দর্শকদের উপহার হিসেবে বই দেওয়া শুরু হয়। ক্লাসিকও সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে বই দেওয়া শুরু করে কোনোরকমে আসর সরগম রাখার চেষ্টা করেছিল।[৩] গিরিশ আবার এই সময়েই ক্লাসিক ছেড়ে চলে যান। নানাদিকে বিপর্যস্ত অমর দত্ত এবার নিজে রবীন্দ্রনাথের সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস 'চোখের বালি'র নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করেন (২৬ নভেম্বর)। অভিনয়ে ছিলেন—অমরেন্দ্রনাথ—মহেন্দ্র। বিহারী—মনোমোহন গোস্বামী। বিনোদিনী—কুসুমকুমারী। ব্লাকী—আশা। নাটক জমল না।

১৯০৫ : দেনাগ্রস্ত অমর দত্ত ক্লাসিক বন্ধক রেখেছেন, টাকা ধার করেছেন, সবার মাইনেপত্র বাকি পড়েছে, তবুও শেষ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। শেক্সপীয়রের 'Commedy of Errors' অবলম্বনে 'কোন্‌টা কে' অভিনয় করলেন। তারপর 'প্রেমের পাথারে' ও 'সংসার', এবং শিবরাত্রি (অমর দত্ত, ৪ মার্চ) অভিনয়ে নামালেন।

২ এপ্রিল, ১৯০৫, রবিবার ক্লাসিকের স্বত্বাধিকারীরূপে অমরেন্দ্রনাথের শেষ অভিনয়—হরিরাজ, সোনার স্বপন, শ্রীকৃষ্ণ (এবং বায়স্কোপ)। হরিরাজের ভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথ।

হাইকোর্টের রায়ে অমর দত্ত ক্লাসিক ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন, রিসিভার নিযুক্ত হলেন অতুলচন্দ্র রায় ও পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী।

---

৩. থিয়েটারে উপহার প্রথা সম্পর্কে দ্রঃ দর্শন চৌধুরীর 'উনিশ শতকের নাট্যবিষয়' গ্রন্থটি।

ভগ্নমনোরথ অমর দত্ত দলবল নিয়ে কিছুদিন 'গ্রান্ড থিয়েটার' খুলে অভিনয় চালাবার চেষ্টা করলেন। তবে আর মালিক নন, শুধু অধ্যক্ষ। এদিকে অমরেন্দ্রনাথ ব্যতিরেকেই ক্লাসিকের অভিনয় আবার চালু হলো। কিন্তু সফল হলো না। তখন মালিক অতুল রায় অমরেন্দ্রনাথকে মাসিক পাঁচশো টাকা বেতনে ম্যানেজার করে নিয়ে এলেন। থিয়েটারের মালিক অমর দত্ত এবারে ম্যানেজার, মাস মাইনের চাকুরিয়া। গ্রান্ড থিয়েটারের দলবল নিয়ে ক্লাসিকে আবার অমর দত্ত অভিনয় শুরু করলেন (২১ অক্টোবর, ১৯০৫) পৃথ্বিরাজ (মনোমোহন গোস্বামী, ৪ নভেম্বর), হল কি (সুরেন্দ্রনাথ বসু, ৪ নভেম্বর), প্রণয় না বিষ (অমর দত্ত, ২৩ ডিসেম্বর), এস যুবরাজ (অমর দত্ত, ৩০ ডিসেম্বর)।

'বঙ্গভঙ্গে'র উন্মাদনার যুগে অমর দত্ত কখনো ব্রিটিশ বিরোধী নাটক (বঙ্গের অঙ্গ-চ্ছেদ, কিংবা 'হল কি') অভিনয়ের সঙ্গে ব্রিটিশ তোষণের নাটক 'এস যুবরাজ' অভিনয় করে তার দ্বৈত মানসিকতার পরিচয় রেখে গেছেন।

> ১৯০৬ : সিরাজদৌল্লা (গিরিশ, ২৭ জানুয়ারি) অভিনীত দল। মিনার্ভাতেও এই সময়ে সিরাজদৌল্লা নামিয়েছিল। আবার প্রতিযোগিতা চলল। ক্লাসিকে সিরাজ—অমর দত্ত। করিম—হরিভূষণ ভট্টাচার্য, জহরা—কুসুমকুমারী। মিনার্ভায় সিরাজ—দানীবাবু, করিম—গিরিশ এবং জহরা—তারাসুন্দরী।

ক্লাসিকে অভিনয় কিছুতেই জমছিল না। উপহার-প্রথা চালু রেখেও প্রাণ সঞ্চার করা গেল না। মানসিক ও শারীরিক অসুস্থ অমর দত্তের সঙ্গে রিসিভার অতুল রায়ের মনোমালিন্যের কারণে, অমর দত্ত ক্লাসিক ছেড়ে দিলেন (মে ১৯০৬)।

রিসিভার অতুল রায় অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তারাসুন্দরীকে এনে ক্লাসিক চালাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। ক্লাসিকের 'সব কিছু' অমরেন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে সেখানে প্রাণ সঞ্চার করা সম্ভব হলো না।

তাঁর পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ জর্জ থিয়েটার নামে একটি অভিনয় সম্প্রদায় গঠন করেন। থেসপিয়ান টেম্পল-এ (বেঙ্গল থিয়েটার মঞ্চে) কিছুদিন অভিনয় করেন। পরে সেখানে বায়স্কোপ দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়।

ক্লাসিক থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেল। জমিদার শরৎকুমার রায় ক্লাসিকের থিয়েটার বাড়ি কিনে নিয়ে সেখানে খুললেন কোহিনূর থিয়েটার।

•

উনিশ শতকের শেষ দিকে বাংলা থিয়েটারের দুর্দিনে অমরেন্দ্রনাথ এসেছিলেন। একেবারে আনকোরা তরুণ সুদর্শন যুবা ও খ্যাতিমান বনেদী পরিবারের সন্তান অমর দত্ত তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য, পরিচিতি এবং নিজের অভিনয় ক্ষমতায় ও প্রযোজনার কৃতিত্বে শীঘ্রই দর্শকের মন জয় করে নিলেন। শুধু অভিনয় দিয়ে থিয়েটার চলে না, আনুষঙ্গিক আরো প্রক্রিয়া থাকে, যার মধ্য দিয়ে সমকালে অন্য থিয়েটারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জনপ্রিয়তার তুঙ্গে ওঠা যায়। অমর দত্ত নানাভাবে, নানা প্রক্রিয়ায় তাঁর

থিয়েটারকে দর্শক সাধারণের কাছে উপস্থিত করতে পেরেছিলেন।

১. ক্লাসিকে অমর দত্ত পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক নাটক, প্রহসন, নক্সা, পঞ্চরং, গীতিনাট্য, অপেরা--সে যুগের দর্শক সাধারণের মনোমত সব রকমের এবং বিভিন্ন রসের ও বিষয়বস্তুর ক্রমাগত প্রযোজনা করে গেছেন।

২. সেই সময় সর্বাধিক জনপ্রিয় গিরিশকে ক্লাসিক মঞ্চে বারবার ব্যবহার করা হয়েছে। গিরিশের পুরনো জয়প্রিয় নাটকগুলির অভিনয় করেছেন, নতুন নাটক লিখিয়ে প্রথম অভিনয় করেছেন। গিরিশের খ্যাতি ও প্রতিভাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছেন, যখনই সুবিধে হয়েছে।

৩. তখন মঞ্চে অল্পদিনের ব্যবধানেই নতুন প্রযোজনা নামাতে হত। তাই সবসময়ে অন্য নাট্যকারের মুখাপেক্ষি না থেকে অমর দত্ত নিজেই নাটক রচনা করে নিয়েছেন। তিনি নাট্যকার নন মূলত, তাঁর লেখা নাটকগুলিও খুব উচ্চাঙ্গের নয়। কিন্তু তৎকালীন মঞ্চে কোন্ ধরনের নাটক ভালো চলতে পারে, এ ব্যাপারে তাঁর ধারণা ছিল খুবই পরিষ্কার। মঞ্চের চাহিদা ও দর্শকের মানস-উপযোগী নানা ধরনের নাটক রচনা ও অভিনয় করে প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন।
অমরেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা নাটক : 'মজা' প্রহসন (১৯০০), থিয়েটার (১৯০০), চাবুক (১৯০১), গুপ্তকথা (১৯০১), ঘুঘু (১৯০৫), লাটগৌরাঙ্গ (১৯০২),। সবগুলিই প্রহসন। শেষের দুটি ব্রিটিশের অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের ধাক্কায় অভিনয় বন্ধ রাখতে হয়। এছাড়া বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ (১৯০৫), আশা কুহকিনী (১৯০৫), নেপোলিয়ান বোনাপার্ট-ও রচনা করেন। গোড়ার দিকে কয়েকটি গীতিনাট্য লিখেছিলেন--ঊষা, মানকুঞ্জ, শ্রীকৃষ্ণ (১৮৯৯) দুটি প্রাণ, নির্মলা (১৮৯৮)। পঞ্চরং জাতীয় রচনা--এস যুবরাজ, কাজের খতম। এছাড়া তিনি বঙ্কিমের কৃষ্ণকান্তের উইল-এর নাট্যরূপ দেন 'ভ্রমর' নামে (১৮৯৯)। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'র নাট্যরূপ (১৯০৪) এবং বঙ্কিমের সীতারাম উপন্যাসের নাট্যরূপ তাঁরই দেওয়া।

৪. গিরিশ এবং নিজের নাটক ছাড়াও তিনি প্রয়োজনে রাজকৃষ্ণ রায়, মনোমোহন গোস্বামী, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রমুখ নাট্যকারের নাটক অভিনয় করেছেন। তখন একেবারেই অপরিচিত নবীন নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলিবাবা' নির্বাচন করে, সম্পাদনা ও সঙ্গীত-নৃত্য যোজনা করে সেযুগের জনপ্রিয়তম প্রযোজনায় পরিণত করেছিলেন। কুসুমকুমারী ও নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসুর অভিনীত মর্জিনা আবদালা নাচে গানে মাতিয়ে দেয়। অমরেন্দ্রনাথের অভিনীত হুসেন চরিত্র রূপে গুণে দর্শকদের মোহিত করে।

৫. রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী' নাটক অন্তত কুড়ি রাত্রি ক্লাসিক অভিনয় করে। তাছাড়া 'চোখের বালি'র নাট্যরূপ এবং রাজা বসন্ত রায়ের পরিবর্তিত নাম 'প্রতাপাদিত্য' অভিনয় করে।

৬. শুধু ভালো নাটক বা নাট্যকার নয়, ক্লাসিকে তখন সেরা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জড়ো করা হয়েছিল। অমরেন্দ্রনাথ স্বয়ং, তাছাড়া গিরিশ, দানীবাবু, অঘোর পাঠক, মহেন্দ্রলাল বসু, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, চুনিলাল দেব, হরিভূষণ প্রভৃতি অভিনেতা এবং তারাসুন্দরী, কুসুমকুমারী, গুলফন হরি, তিনকড়ি (ছোট), রানীসুন্দরী, প্রমদাসুন্দরী প্রমুখ খ্যাতিময়ী অভিনেত্রী ক্লাসিকে অভিনয় করতেন। তাছাড়া নৃত্যগীতে নৃপেন বসু ও কুসুমকুমারী মাতিয়ে দিতেন।

৭. অনেক ভালো নেপথ্য-শিল্পীর সহযোগিতা ক্লাসিক পেয়েছিল। অঘোর পাঠক (সঙ্গীত শিক্ষক), ধর্মদাস সুর (রঙ্গসজ্জা), নৃপেন বসু (নৃত্য শিক্ষক), অমৃতলাল ঘোষ (বংশীবাদক), ভূতনাথ দাস (হারমোনিয়াম শিক্ষক) এবং দেবকণ্ঠ বাগচী (সঙ্গীতাচার্য) প্রভৃতির নেপথ্য সহযোগিতায় যে-কোনো প্রযোজনা জমে যেত।

৮. বঙ্কিমের নাটকীয় উপাদানে ভরা উপন্যাসগুলির নাট্য প্রযোজনা সে যুগে খুবই জনপ্রিয় ছিল। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে তিনি বঙ্কিমের বেশ কয়েকটি উপন্যাসের নাট্যরূপ অভিনয় করেছিলেন। ভ্রমর (কৃষ্ণকান্তের উইল), কপালকুণ্ডলা, দুর্গেশনন্দিনী, সীতারাম, দেবী চৌধুরাণী, ইন্দিরা—ক্লাসিকের অতি নিপুণ ও সফল প্রযোজনা।

৯. মাইকেলের 'মেঘনাদবধ', নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যের নাট্যরূপ ; শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ, হ্যামলেট, কমেডি অফ এররস নাটকের অনুবাদ ও রূপান্তর অতি উৎসাহের সঙ্গে ক্লাসিকে অভিনীত হয়েছিল। ভিন্ন নাট্যরসের স্বাদ দর্শকদের দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল।

১০. আলিবাবা, হিরন্ময়ী, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি গীতিনাট্য অপেরার অভিনয়ে কৃতিত্ব ও সাফল্য বাংলা মঞ্চে আদর্শস্থানীয় হয়েছিল। এগুলির অসম্ভব জনপ্রিয়তা ক্লাসিকের ভাগ্য সুপ্রসন্ন করে তুলেছিল।

১১. অন্য রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে একই নাটক তিনি প্রতিযোগিতামূলকভাবে ক্লাসিকে অভিনয় করতেন। এইভাবে মিনার্ভার সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালিয়ে প্রফুল্ল, সীতারাম, কপালকুণ্ডলা, সিরাজদৌল্লা এবং স্টারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নীলদর্পণ, প্রতাপাদিত্য করা হয়েছিল। একাদিক্রমে কয়েক রাত্রি দুই থিয়েটারে একই নাটকের অভিনয়ের ফলে দর্শকদের মধ্যে তুমুল উদ্দীপনা ও আলোড়ন সৃষ্টি হত। দর্শকদের দুটো নাটক দেখতে হতো এবং তুলনামূলক বিচারে প্রবৃত্ত হতে হত। থিয়েটারে বিক্রি বেড়ে যেত স্বাভাবিক ভাবেই।

বিজ্ঞাপন :

> অশ্বপৃষ্ঠে সীতারাম। কি অপূর্ব শোভা! ছুটে যেন রোধিবারে গিরিশ প্রতিভা! নাট্যগুরু সনে রণ / দম্ভে করে আস্ফালন / ক্লাসিকের সীতারাম বলদৃপ্ত যুবা।

১২. এমারেল্ড থিয়েটার লীজ নিয়ে 'ক্লাসিক' খোলার সময়ে সব ছিল জীর্ণ ও ভাঙাচোরা! সেই থিয়েটার সারিয়ে, মঞ্চের উৎকর্ষ সাধন করে তিনি থিয়েটারটিকে আকর্ষণীয় করে তোলেন। দর্শকাসন বাড়িয়ে দর্শকসংখ্যা বৃদ্ধি করেন। আলো, গাড়ি রাখার ব্যবস্থা, আপ্যায়ন--সবকিছু দিয়েই আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলেন।

১৩. নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে মঞ্চব্যবস্থা একটি বড়ো হাতিয়ার! বাংলা থিয়েটারে যে মঞ্চব্যবস্থা চলে আসছিল অমর দত্ত তার পরিবর্তন করলেন। দৃশ্যপট ও সাজসজ্জায় নতুনত্ব নিয়ে এলেন। দৃশ্যপটের ক্ষেত্রে আগে গুটনো সীন, কাটা সীন, ঠ্যালা সীন ব্যবহৃত হত। চিত্রকরকে দিয়ে নাট্য নির্দেশিত স্থানের (যেমন বনপথ, মন্দির, রাস্তা, শয়নকক্ষ ইত্যাদি) চিত্র বড়ো করে আঁকিয়ে গুটিয়ে তুলে রাখা হত। অভিনয়ের সময়ে প্রয়োজনে গুটনো সীন নামিয়ে পেছনে ঝুলিয়ে দৃশ্যসজ্জা করা হত। ঠ্যালা বা কাটা সীনও সেইভাবে ব্যবহৃত হত। এইসব দৃশ্যপট প্রায়শই বর্জন করে অমর দত্ত তার বদলে উইংস, কার্টেন, প্রসেনিয়াম এগুলির ব্যবহার শুরু করলেন।

এবং দৃশ্যপটের পরিবর্তন হিসেবে অনেক সময়েই তিনি বাস্তবানুগ মঞ্চসজ্জার দিকে নজর দিলেন। শয়নকক্ষ ইত্যাদির ক্ষেত্রে তিনি নকলের বদলে আসল খাট, আলমারি, সোফা-সেট, টেবিল, চেয়ার, আয়না ইত্যাদি ব্যবহার শুরু করেন। গোটা মঞ্চটিকেই এভাবে নাটকের প্রয়োজনীয় বাস্তব দৃশ্যে রূপান্তরিত করে নেওয়া হত। দর্শকের চমৎকারিত্ব সৃষ্টিতে এই নতুন ব্যবস্থার জুড়ি ছিল না।

১৪. অমর দত্ত থিয়েটারে বিদ্যুৎ-আলোর সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৯৯-তেই কলকাতায় বিজলী আলো এসে যায়। তিনি এই নতুন ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে ঝকমকে নানা আলোর ঝর্ণা বইয়ে দিতেন। আবার নাট্যাভিনয়ের সময়ে রঙীন আলো, স্পট লাইটের ব্যবহার করতেন। আলো দিয়ে চমক সৃষ্টির চেষ্টা করা হত প্রায়ই।

১৫. দর্শকদের চমক দেবার জন্য, আজকের ভাষায় যাকে 'গিমিক' বা 'স্টান্ট' বলে, অমর দত্ত মঞ্চে তার ব্যবহার প্রায়ই করতেন। কৃষ্ণকান্তের উইলে গোবিন্দলালরূপী অমরেন্দ্রনাথ ঘোড়ায় চড়ে স্টেজে ঢুকতেন। বাংলা মঞ্চে এটা নতুন নয়। অমর দত্তর 'স্টান্ট' হল, তিনি ঘোড়ার মাথায় ইলেকট্রিক আলো জ্বালিয়ে দিলেন। জলমগ্না রোগিণীকে গোবিন্দলাল একেবারে জলসিক্তা অবস্থায় মঞ্চে তুলে আনতেন। জলে ঝাঁপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জলের শব্দের সাথে জলও ছিটিয়ে পড়ত দর্শকদের মধ্যে। তাছাড়া, আকাশে উড়ে যাওয়া, ফোয়ারার জল, বিদ্যুৎচমক, রিভলবার পিস্তলের গুলি ছোঁড়ার শব্দ ; জীবন্ত পশুপাখি—সবই তিনি অবলীলাক্রমে মঞ্চে দেখাতেন। অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলি নাট্য-ব্যতিরিক্ত হতো, কিন্তু দর্শক তাতেই আকৃষ্ট হতো বেশি।

১৬. আধুনিক ব্যবসায়ের বড় একটি দিক হল বিজ্ঞাপন। গুণগত মানের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপনের প্রচার—যে কোন উৎপাদনকেই বাজারে চালিয়ে দেয়। ব্যবসায়িক থিয়েটারের বিজ্ঞাপনের ধারাটিকেই আমূল পাল্‌টে দেন অমর দত্ত। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া, হ্যান্ডবিল, রাস্তার দেওয়ালে প্লাকার্ড—এগুলি তিনিও করেন। কিন্তু বিজ্ঞাপনের ভাষাকে আকর্ষণীয় করে তোলা, মাত্রাচ্যুতি ঘটলেও হতোদ্যম না হওয়া, হ্যান্ডবিলের সস্তা চোতা কাগজের পরিবর্তে দামী ও রঙীন কাগজ ব্যবহার শুরু করলেন তিনি। হাতপাখার পেছনে, মুদিখানার ঠোঙার ওপরে তাঁর থিয়েটারের বিজ্ঞাপন ছড়িয়ে দিলেন। নতুন নাটক নামলে সম্প্রদায়ের সকলকে বেশ কিছু ফ্রি-পাশ দিতেন, যাতে অনেক লোক দেখতে আসে আবার তাদের মাধ্যমেই নাটকটির প্রচার হয়ে যেত নানা দিকে। ফুটবল ফাইনালে 'ইস্ট ইয়র্কস'কে হারিয়ে (১৯১১) মোহনবাগান হৈচৈ ফেলে দেয়। অমর দত্ত'র বিজ্ঞাপন : 'Mohunbagan has won the shield. Baji Rao has gained the Victory.' (বাজিরাও নাটক)।

১৭. উপহার প্রথায় তিনিও মেতে ওঠেন। দর্শকদের তিনি নানা ধরনের বই উপহার দিতেন। গিরিশ গ্রন্থাবলী, মাইকেল গ্রন্থাবলী, শ্রীরাধা নাটক। দর্শক নাটকের টিকিটের সঙ্গে একটি করে গ্রন্থ পেয়ে যেত।

১৮. থিয়েটারের মালিকের সদিচ্ছা এবং থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত অন্য সকলের সহযোগিতা ভিন্ন অভিনয় চালানো অসম্ভব। মালিক অমর দত্ত তাই সম্প্রদায়ের সকলের সুখ-দুঃখের দিকে নজর রাখ্‌তেন। তিনিই উদ্যোগী হয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রী, নৃত্য-সঙ্গীত-শিক্ষক, বাজনদার, শিফটার সকলের মাইনে বাড়িয়ে দেন। কুড়ি-পঁচিশ টাকার পরিবর্তে দুশো তিনশো টাকা বেতন এবং হাজার দু'হাজার টাকা বোনাস তিনি চালু করেন। তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অন্য দিকেও নজর দেন। শিল্পীদের প্রয়োজনে আর্থিক সাহায্যের জন্য তিনিই বাংলা মঞ্চে প্রথম 'বেনিফিট নাইটে'র ব্যবস্থার প্রচলন করেন।

১৯. থিয়েটারের মালিকানা, নাট্যরচনা ও পরিচালনা, নিজের অভিনয়—এগুলি তো তার থিয়েটার-কর্তব্যকর্মের মধ্যেই ছিল। তারই ফাঁকে তিনি নাট্যসম্বন্ধীয় পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেন। নাট্যসম্বন্ধীয় পত্রিকা যে নাটকের দর্শক তৈরি করে এবং সেই দর্শকের মানসিক উন্নতি বিধান ঘটায়, অমর দত্ত সেটা বুঝেই সেই যুগে তিনিই প্রথম নাট্যপত্রিকা প্রকাশ করেন। এবং একটি নয়, তিনটি।[৪]

---

৪. পরবর্তীকালে স্টারে থাকাকালীন তিনি 'থিয়েটার' নামে আরেকটি সাপ্তাহিক নাট্যপত্র প্রকাশ করেন (আষাঢ়, ১৩২১), ১০ জুলাই, ১৯১৪।
থিয়েটার সাপ্তাহিক পত্রিকা। প্রথম তিন-চার মাস প্রথম পৃষ্ঠায় স্টার থিয়েটারের শনি ও রবিবারের অভিনয় সূচি ছাপা হতো। তাই সে সময়ে হ্যান্ডবিল প্রচার বন্ধ থাকে। পরে মূল্য হয় এক পয়সা। আটমাস পরে বন্ধ হয়ে যায়।

সৌরভ মাসিক পত্রিকা (প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ, ১৩০২ সাল), রঙ্গালয় সাপ্তাহিক পত্রিকা (প্রথম প্রকাশ ১৭ ফাল্গুন, ১৩০৭ সাল), নাট্যমন্দির মাসিক পত্রিকা (প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ, ১৩১৭ সাল)। সৌরভের সম্পাদক গিরিশচন্দ্র, রঙ্গালয়ের পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নাট্যমন্দিরের মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। তিনটি পত্রিকার সর্বেসর্বা ছিলেন অমরেন্দ্রনাথ। প্রথম দিকে সম্পাদনাও করেছেন। পরে থিয়েটারের চাপে এবং আর্থিক ঝঞ্ঝাট পোহাতে না পেরে অন্যদের দায়িত্ব দেন। তিনটি পত্রিকাতেই অভিনেতা অভিনেত্রীদের লেখা, দেশ-বিদেশের থিয়েটারের ও নট-নটীদের খবর বেরোত ছবিসহ। থিয়েটার ও অভিনয় সম্বন্ধীয় নানা লেখাও প্রকাশিত হতো। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস বর্ণনায় এই থিয়েটার সম্পর্কীয় পত্রিকা প্রকাশের কথা অবশ্যই স্মরণযোগ্য। রঙ্গালয় পত্রিকাতেই দুটি আত্মকথা প্রকাশিত হয়। ধর্মদাস সুরের আত্মজীবনী এবং অভিনেত্রী বিনোদিনীর আত্মকথা। (গ্রন্থাকারে আমার কথা)। দুটিই বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস রচনায় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান

২০. উনিশ শতকের শেষ পঁচিশ বছর বাংলা থিয়েটারে পৌরাণিক নাটকের প্লাবন বয়ে যায়। রঙ্গক্ষেত্র একেবারে তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। বাঙালি দর্শকের ধর্মপ্রাণতার সুযোগ নিয়ে সব মঞ্চই পৌরাণিক নাটকের নামে ভক্তিরসের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন। অমর দত্ত ভাবপ্লাবনের সেই উচ্ছ্বাসে 'পৌরাণিক নাটক'কে একেবারে বাদ দিতে পারেননি, কিন্তু তাঁর ক্লাসিক থিয়েটারকে ধর্মক্ষেত্রেও পরিণত করেন নি। বরং গীতিনাট্য-অপেরার নতুন ঢঙ নিয়ে এসে দর্শকদের অন্যভাবে মাতিয়ে দিয়েছিলেন। নৃত্যে নতুন ভঙ্গিমা, গায়কীতে নতুন আমেজ তৈরি করে তখনকার দর্শকের কাছে গীতিনাট্যগুলিকে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছিলেন। তাছাড়া, সামাজিক নাটক, প্রহসন ও নক্সাগুলিতে অভিনয়ের নতুন রীতি নিয়ে এসে দর্শকদের নতুনের স্বাদ দিয়েছিলেন। ফলে ধর্মক্ষেত্র থেকে ক্লাসিক থিয়েটার আমোদ-প্রমোদের রঙ্গক্ষেত্রে রূপান্তরিত হলো। ভক্তিরসের ভাবাবেগের বাইরে দর্শকেরা প্রথম তাদের নিজেদের জীবনের আবর্তের মধ্যেই স্ফূর্তির ফোয়ারা উছলে পড়তে দেখল।

অন্যদিকে অমরেন্দ্রনাথ নিজে এবং সঙ্গী দুই প্রধান অভিনেত্রী তারাসুন্দরী ও কুসুমকুমারী ভক্তিরসের চরিত্রাভিনয়ে সার্থকতা লাভ করতে পারেন নি। সেই তুলনায় তেজোদ্দীপ্ত অভিনয়, কৌতুক বা নৃত্যগীতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। সেই কারণেও, ক্লাসিকে পৌরাণিক নাটক থেকে তারা মুক্তি পেতে চেয়ে থাকতে পারেন।

২১. অমর দত্ত তাঁর নিজের এবং ক্লাসিক থিয়েটারের মর্যাদা বাড়াবার জন্য প্রায়ই বিভিন্ন ক্ষেত্রের খ্যাতিমান লোকদের থিয়েটারে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসতেন। সে যুগের ছোটলাট থেকে শুরু করে বড় বড় সরকারি আমলা (দেশিয় ও

বিদেশিয়), জজ-ম্যাজিস্ট্রেট, লেখক-শিল্পী, বিদ্বজ্জন-পণ্ডিত মানুষের সমাগম থিয়েটারে হতে থাকল। একদিকে থিয়েটারের প্রতি এই জাতীয় মানুষের আকর্ষণ বাড়ানো তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। অন্যদিকে এইসব মানুষের সমাগমে তাঁর থিয়েটারের মর্যাদা অনেক বেড়ে যেত। সাধারণ দর্শকও এতে আকৃষ্ট হতো বেশি।

২২. ক্লাসিকে অমরেন্দ্রনাথ ছিলেন মালিক, নাট্যশিক্ষক, অভিনেতা ও নাট্যকার। তাঁর আবির্ভাবের সময়ে মিনার্ভা ছিল হতশ্রী, বেঙ্গল থিয়েটারের শেষ অবস্থা। উত্থান-পতনের সাক্ষী স্টারে প্রবীণ অমৃতলাল বসুর পরিচালনায় কঠোর নিয়মকানুন দর্শকের পছন্দ ছিল না। অমরেন্দ্রনাথ এসব ভেঙে দিলেন। তাঁর থিয়েটারে দর্শকেরা প্রাণ খুলে নাটক দেখতে এলো, উপভোগ করল, আনন্দ মজা, সুখ দুঃখের উপলব্ধি জানান দিল। একটা খোলামেলা আনন্দের হাট বসিয়ে দিলেন অমরেন্দ্রনাথ। ক্লাসিক মানেই তখন আনন্দের, ক্লাসিক মানেই তখন যৌবনের। উনিশ শতকের শেষের দিকে ঝিমিয়ে পড়া বাংলা থিয়েটারে নতুন প্রাণস্পন্দন ও উত্তেজনা সৃষ্টি করে বাংলা নাটকাভিনয়ের ধারাকে প্রাণবন্ত ও সচল করে তুলেছিলেন। অমরেন্দ্রনাথের দশ বৎসরের ক্লাসিক থিয়েটার-এর সেখানেই সিদ্ধি।

এইসব কারণেই বোধকরি, শিশিরকুমার ভাদুড়ি অমরেন্দ্রনাথকে 'বাংলা মঞ্চের নেপোলিয়ান' বলে আখ্যাত করেছেন। [দেবনারায়ণ গুপ্ত—একশো বছরের নাট্যপ্রসঙ্গ]

২৩. বুদ্ধি, অধ্যবসায় দিয়ে কর্মবীর অমরেন্দ্রনাথ নব নব উদ্যমে ক্লাসিক চালিয়েছেন। নানাভাবে দর্শক আকর্ষণ করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন। কিন্তু পেশাদারি ও ব্যবসায়িক থিয়েটার প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জ্ঞান, দক্ষতা ও উদ্যমের অভাবে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। অমিতব্যয়িতা ও উচ্ছৃঙ্খলতাও এজন্য দায়ী। ফলে এক সময়ে তাঁকে ক্লাসিক ছেড়ে দিতে হয়, পরে এই থিয়েটারেই কর্মী হিসেবে চাকরি নিতে হয়। শেষ অবধি 'দেউলিয়া' হয়ে যেতে হয়। অর্থের অভাব, দলের লোকের শত্রুতা, ভালো নাটকের অভাব—কোনো কিছুই তাঁকে বিচলিত করেনি। কিন্তু একটি মানুষের অপরিণামদর্শিতার এই ভয়ঙ্কর পরিণাম—বাংলা থিয়েটারের আবহাওয়াকে শ্বাসরোধকারী করে তুলেছে।

অরোরা থিয়েটার

বেঙ্গল থিয়েটারের বাড়িতে

প্রতিষ্ঠাতা : গুরুপ্রসাদ মৈত্র
স্থায়িত্বকাল : ১৭ আগস্ট, ১৯০১--ডিসেম্বর, ১৯০২
প্রতিষ্ঠা : ১৭ আগস্ট, ১৯০১
নাটক : দক্ষিণা (ক্ষীরোদপ্রসাদ)

শরৎচন্দ্র ঘোষ প্রতিষ্ঠিত ৯ নম্বর বিডন স্ট্রিটের বেঙ্গল থিয়েটার ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বন্ধ হয়ে গেলে এই মঞ্চ ভাড়া নিয়ে গুরুপ্রসাদ মৈত্র সেখানে অরোরা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। নীলমাধব চক্রবর্তীকে ম্যানেজার করা হয়। অভিনেতা অভিনেত্রী ছিলেন--শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কুসুম (বিষাদ), হরিমতী, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ. অক্ষয় চক্রবর্তী, গোপাল ও নীলমাধব স্বয়ং।

১৯০১ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ আগস্ট ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'দক্ষিণা' নাটক দিয়ে অরোরা থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। অভিনয়ে ছিলেনঃ ভৈবর--শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সুষমা--কুসুম। সুরমা--হরিমতী। সাদামাটা অভিনয় দিয়ে অরোরার অভিনয়ের যাত্রা শুরু হলো। পরের দিনই অভিনীত হলো ক্ষীরোদপ্রসাদের 'জুলিয়া' এবং অমৃতলাল বসুর 'কৃপণের ধন।' তারপর আলিবাবা ও বেল্লিকবাজার। গিরিশের বেশ কয়েকটি নাটক এখানে ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দেই অভিনীত হল। যেমন চৈতন্যলীলা, বিল্বমঙ্গল, হীরার ফুল প্রভৃতি। তাছাড়া অমৃতলাল বসু কৃত স্বর্ণলতা উপন্যাসের নাট্যরূপ 'সরলা', তাজ্জব ব্যাপার অভিনীত হয়েছিল। বঙ্কিমের দেবী চৌধুরানীর নাট্যরূপ (অতুলকৃষ্ণ মিত্র) এখানে অভিনীত হয়ে খুবই প্রশংসিত হয়েছিল। দেবী চৌধুরানীর চরিত্রলিপি :

> নীলমাধব চক্রবর্তী--ভবানী পাঠক। প্রবোধচন্দ্র ঘোষ--ব্রজেশ্বর। অক্ষয় চক্রবর্তী--হরবল্লভ। গোলাপ--প্রফুল্ল। নিশি--কুসুম (বিষাদ)।

১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে সাড়ে চার মাস অভিনয় চালিয়ে অরোরা মোটামুটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। ১৯০২-তে নীলমাধব চক্রবর্তীকে ম্যানেজারের পদ থেকে সরিয়ে মালিক গুরুপ্রসাদ নিজেই ম্যানেজার হলেন। নাট্যশিক্ষক রইলেন সঙ্গীতসমাজের নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী। এই সময়ে প্রখ্যাতা অভিনেত্রী তারাসুন্দরীকে এখানে আনা হয়। তারাসুন্দরী আসার ফলে অরোরার খ্যাতি বেড়ে গেল। তারা গিরিশচন্দ্রের নলদময়ন্তী ও বিল্বমঙ্গল নামাল। তাতে দময়ন্তী ও চিন্তামণির ভূমিকায় তারাসুন্দরীর অনবদ্য অভিনয় দর্শকদের পরিতৃপ্তি দিয়েছিল।

নীলমাধব চক্রবর্তী আবার ম্যানেজার হিসেবে যোগ দিয়ে 'সরলা' নামালেন। কিন্তু সকলের সমবেত প্রচেষ্টা এবং নীলমাধব ও তারাসুন্দরীর অনবদ্য অভিনয় সত্ত্বেও

'সরলা' দর্শক আকর্ষণে ব্যর্থ হলো। ফলে নীলমাধবকে আবার ম্যানেজারের পদ ছেড়ে দিতে হল। তারপরেই, ১৯০২-এর মে মাসে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি অরোরায় যোগ দিলেন ম্যানেজার, নাট্যশিক্ষক ও অভিনেতা হিসেবে। অর্ধেন্দুশেখর যোগ দিয়েই অতি সত্বর নামালেন মনোমোহন রায়ের 'রিজিয়া' নাটক (১৭ মে, ১৯০২)। তার সঙ্গে 'কালপরিণয়' ও 'আবুহোসেন'। গিরিশের আবুহোসেন নাটকে আবুহোসেন-এর ভূমিকায় অর্ধেন্দুর অসাধারণ অভিনয় জনসমাদরে ধন্য হলো। 'রিজিয়া'র অভিনয় অরোরার ভাগ্য ফিরিয়ে দিল। প্রচুর দর্শক সমাগম হতে থাকল রিজিয়ার অভিনয়ে। 'রিজিয়া' নাটকটি এই থিয়েটারেই প্রথম অভিনীত হল। তারাসুন্দরী রিজিয়ার ভূমিকায় অর্ধেন্দুশেখরের শিক্ষকতায় ও নিজ প্রতিভায় খুবই উচ্চ ধরনের অভিনয় করেন। 'রিজিয়া'র অভিনয় সম্পর্কে প্রখ্যাত নট ও পরিচালক অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লেখেন : 'এই থিয়েটারে যতগুলি নাটক অভিনীত হইয়াছিল, তন্মধ্যে একমাত্র 'রিজিয়া'ই উল্লেখযোগ্য আর বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চের গৌরবাস্পদা অভিনেত্রী শ্রীমতী তারাসুন্দরীর যশোমুকুটে অতিশয় সাফল্যের যতগুলি রত্ন আছে, এই রিজিয়ার ভূমিকায় অভিনয় নৈপুণ্য তন্মধ্যে মধ্যমণি স্বরূপ।' (রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর)। তারাসুন্দরীর রিজিয়ার অভিনয় দেখেই প্রখ্যাত বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর 'The Bengali Stage' প্রবন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে তাঁকে ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীদের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।

খ্যাতি ও অর্থপ্রাপ্তির আনন্দে অরোরা থিয়েটার পরপর অভিনয় করে যেতে লাগল। তরুবালা (অমৃতলাল) ও পশুশাসন (অতুল মিত্র), ২৮ মে ১৯০২ অভিনয় করল। তারপর সধবার একাদশী (১ জুন) অভিনয়ে অর্ধেন্দু প্রথম নিমচাঁদের ভূমিকায় নামেন। জীবনচন্দ্রের চরিত্রেই এতদিন তাঁর খ্যাতি ছিল। এবারে নিমচাঁদ চরিত্রও তিনি গভীরভাবে উপস্থাপন করলেন। তারপরে নলদময়ন্তী, আবুহোসেন, জেনানাযুদ্ধ (১৬ জুলাই), কালপরিণয় (রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়) ও গিরিশের আলাদীন (২৬ জুলাই), বিষবৃক্ষ ও প্রমোদরঞ্জন (ক্ষীরোদপ্রসাদ, ২৭ জুলাই), বিল্বমঙ্গল ও তাজ্জব ব্যাপার (অমৃতলাল, ৩০ জুলাই), একাদশ বৃহস্পতি (নিত্যবোধ বিদ্যারত্ন, ২ আগস্ট), রাধারানী (নাট্যরূপ : হরিচরণ আচার্য, ২৩ আগস্ট), প্রফুল্ল (গিরিশ, ২৩ নভেম্বর) অভিনয় করা হল। এই নাটকগুলির মধ্যে অর্ধেন্দুশেখর অভিনয় করেছিলেন—রিজিয়াতে ঘাতক, সধবার একাদশীতে নিমচাঁদ, আবুহোসেনে আবুহোসেন, জেনানাযুদ্ধে পদ্মলোচন, কালপরিণয়ে জগদীশ এবং প্রফুল্লতে যোগেশ। রিজিয়াতে ঘাতকের ছোট্ট ভূমিকায় অর্ধেন্দুশেখর সকলকে মুগ্ধ করেন। পরবর্তীকালে শিশির ভাদুড়িও এই নাটকে ঐ একই ভূমিকায় অভিনয় করতেন। তিনি বলেছেন, 'রিজিয়াতে অর্ধেন্দুবাবু 'ঘাতক' করতেন, তার জন্যই চলত' (শিশির সান্নিধ্যে)। প্রফুল্ল নাটকে তিনি যোগেশের ভূমিকায় অভিনয় করে দর্শকদের দেখিয়ে দেন যে তিনি কমেডির মতো ট্র্যাজেডি চরিত্রের অভিনয়েও সমান পারদর্শী। গিরিশের অভিনয়ে প্রতিষ্ঠিত নিমচাঁদ ও যোগেশের চরিত্র দুটিকে অর্ধেন্দুশেখর তাঁর অভিনয়ে নতুন মাত্রা (ডাইমেনশান) ও ভঙ্গি এনে দিয়ে সে যুগের

বোদ্ধা দর্শকদের চমৎকৃত করেছিলেন।

নীলমাধব ক্লাসিকে যোগ দিলেন। এরপর অর্ধেন্দুশেখর অরোরা ছেড়ে স্টারে চলে গেলেন। অন্য অনেক অভিনেতা—অভিনেত্রীও অন্যত্র চলে গেলেন। অরোরা কর্তৃপক্ষ খুবই বিপাকে পড়ে গেলেন। এইভাবে চলতে চলতে ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ ডিসেম্বর, এখানে শেষ অভিনয় হল। নাটক পরিতোষ, নাট্যকার রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

অরোরা থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেল।

এক বছর চার মাস অরোরা থিয়েটারের স্থায়িত্বকাল। বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে এই রকম অনেক থিয়েটার তৈরি হয়েছে আবার বন্ধ হয়ে গেছে।

এখানে রিজিয়ার মতো দু' একটি নতুন নাটক ছাড়া আর সবই পুরনো অভিনীত নাটকেরই অভিনয় হয়েছে। গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, অতুলকৃষ্ণ মিত্র. ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রভৃতি খ্যাতিমান নাট্যকারদের সঙ্গে সঙ্গে কিছু অখ্যাত নাট্যকারের নাটকও এখানে অভিনীত হয়েছে।

এই থিয়েটারের উল্লেখের মতো ঘটনা হল—এখানে রিজিয়া, আবুহোসেন ও প্রফুল্লের অভিনয়। বিশেষ করে তারাসুন্দরী ও অর্ধেন্দুশেখরের অভিনয় মাহাত্ম্যে অরোরা কিছুটা খ্যাতিলাভ করেছিল। সেই একই সময়ে স্টার (হাতীবাগান), ক্লাসিক, মিনার্ভা প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর রঙ্গমঞ্চগুলি প্রবল প্রতাপে অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছে। সেখানে খ্যাতিমান নাট্যকারের ভালো ভালো নতুন নাটক এবং জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অনবদ্য অভিনয় দর্শকদের আকর্ষণ করে রেখেছে। তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অরোরা তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারেনি। স্বল্পায়ু এই থিয়েটার অচিরাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল।

কোহিনূর থিয়েটার

এমারেল্ড থিয়েটার বাড়িতে

প্রতিষ্ঠাতা : শরৎকুমার রায় — স্থায়িত্বকাল : ১১ আগস্ট, ১৯০৭–২১ জুলাই, ১৯১২।
প্রতিষ্ঠা : ১১ আগস্ট, ১৯০৭
নাটক : চাঁদবিবি (ক্ষীরোদপ্রসাদ)।

গোপাললাল শীল প্রতিষ্ঠিত এমারেল্ড থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেলে সেখানে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ক্লাসিক থিয়েটার খোলেন। এপ্রিল, ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে থিয়েটার প্রকাশ্য নীলামে উঠলে জমিদার শরৎকুমার রায় এক লক্ষ ষাট হাজার টাকায় সেই থিয়েটার বাড়ি কিনে নিয়ে সেখানে কোহিনূর থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন।

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এখানে সহকারী ম্যানেজার হিসেবে যোগ দেন। তারপরে দুজনে মিলে নতুন দল গঠনে নেমে পড়েন। অন্য রঙ্গমঞ্চগুলি থেকে নামকরা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ভাঙিয়ে আনলেন। এর জন্যে দু'হাতে খরচ করতেও কার্পণ্য করলেন না শরৎকুমার।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদকে নাট্যকার হিসেবে আনা হল, স্টার থেকে ভাঙিয়ে। ন্যাশনাল থিয়েটার থেকে এলেন শরৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু) ও তারাসুন্দরী। মিনার্ভা থেকে আনা হলো সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু), মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু), তিনকড়ি, কিরণবালা, ক্ষেত্রমোহন মিত্র প্রমুখ খ্যাতনামা অভিনেতা অভিনেত্রীকে। স্টেজ ম্যানেজার হিসেবে ধর্মদাস সুরকে এনে এমারেল্ড থিয়েটারের পুরনো বাড়িকে নতুন করে সংস্কার করা হলো, মঞ্চকে নতুন করে সাজানো হল এবং নতুন নতুন শোভাসুন্দর দৃশ্যাবলী তৈরি করা হলো। বিজনেস ম্যানেজার হলেন দুর্গাদাস দে। সাজসজ্জা ও নতুন চাকচিক্যময় পোষাকপরিচ্ছদ তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হলো শিল্পী মহাতাপচন্দ্র ঘোষকে। ঐকতানবাদনের দায়িত্ব অর্পিত হল দক্ষিণারঞ্জন রায়ের ওপর। সর্বোপরি গিরিশচন্দ্রকে কোহিনূর নিয়ে এলো দশ হাজার টাকা বোনাস ও মাস মাইনে পাঁচশো টাকা দিয়ে। তাঁর পুত্র দানীবাবুর জন্য লাগল তিন হাজার এবং অন্য নটনটীদের জন্য এক হাজার টাকা করে।

ক্ষীরোদপ্রসাদের 'চাঁদবিবি' নাটক দিয়ে থিয়েটারের উদ্বোধন হলো : ১১ আগস্ট, ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে। অভিনয় করলেন :

তিনকড়ি—যোশিবিবি। তারাসুন্দরী—চাঁদবিবি। মন্মথনাথ পাল—রঘুজী। ক্ষেত্রমোহন মিত্র—ইব্রাহিম।

রঙীন ও জমকালো প্লাকার্ড ও হ্যান্ডবিলের মাধ্যমে থিয়েটারের বিজ্ঞাপন সারা

শহরে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। দর্শকের ভিড়ে নাট্যশালা উপচে পড়েছিল। প্রখ্যাত নাট্যসমালোচক হেমেন্দ্রকুমার রায় জানিয়েছেন যে, তাঁকে এক টাকার টিকিট তিন টাকা দিয়ে জোগাড় করতে হয়েছিল। প্রথম রাত্রেই বিক্রি হলো ২২৫০ টাকা।

আহমদনগরের বীরনারী চাঁদবিবি মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তাঁর রাজ্য রক্ষার জন্য আমৃত্যু লড়েছিলেন। এই গৌরবময় লড়াইয়ের কাহিনী বঙ্গভঙ্গের (১৯০৫) অব্যবহিত পরবর্তীকালে বাংলার দর্শকের কাছে খুবই আদৃত হয়েছিল।

চাঁদবিবি নাটকের অভিনয়ে ঐকতানবাদন, নৃত্যগীত, সাজসজ্জা ও দৃশ্যপট এতই উজ্জ্বল ও মনোমুগ্ধকর হয়েছিল যে, সমালোচক হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের অভিজ্ঞতায় তা অমরাবতী বলে মনে হয়েছিল। অভিনয়ও খুবই আকর্ষণীয় হয়েছিল।

সময়ের পরিস্থিতিতে এবং অভিনয়ের গুণে ঐতিহাসিক নাটক 'চাঁদবিবি' অসম্ভব সাফল্য লাভ করল। তাতে উৎসাহিত হয়ে কোহিনূর বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনীর নাট্যরূপ অভিনয়ের পরেই মঞ্চস্থ করল আরো দুটি ঐতিহাসিক নাটক। দুটিই গিরিশের— ছত্রপতি শিবাজী (১৫-৯-১৯০৭) এবং মীরকাশিম (১৬-১১-১৯০৭)। সেই সময়ে অন্য থিয়েটারগুলিতেও জাতীয় ভাবোদ্দীপক ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয় চলছিল। মিনার্ভাতেই চলছিল 'ছত্রপতি শিবাজী'। গিরিশ কোহিনূরে নামালেন এই নাটক। অভিনয় করলেন—

> শিবাজী—দানীবাবু। আওরঙ্গজেব—গিরিশ। দাদাজী কোণ্ডা—নীলমাধব চক্রবর্তী। তানাজী—কার্তিকবাবু। জিজাবাঈ—তিনকড়ি। লক্ষ্মীবাঈ—তারাসুন্দরী। সইবাঈ—কিরণশশী।

দৃশ্যপট, পোষাক-পরিচ্ছদ, মঞ্চসজ্জা এবং অভিনয় খুবই সুন্দর হয়েছিল। শিবাজীর সময়কাল যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল মঞ্চে। সে যুগের সংবাদপত্রের নাট্য-সমালোচকদের কাছে মিনার্ভার চাইতে কোহিনূরের 'ছত্রপতি শিবাজী' সবদিক থেকেই অনেক ভালো ছিল বলে মনে হয়েছিল। 'মীরকাশিম' অত উচ্চমানের না হলেও দানীবাবুর অভিনয় উচ্চাঙ্গের হয়েছিল।

২৫ ডিসেম্বর ক্ষীরোদপ্রসাদের 'দাদা ও দিদি' মঞ্চস্থ হলো। গিরিশের অসুস্থতার কারণে নাটকটি পরিচালনা করেন দানীবাবু। নাটকটি মোটামুটি জমেছিল। কিন্তু বিপত্তি এলো অন্য দিক দিয়ে। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিনে (৩১ ডিসেম্বর) কোহিনূরের স্বত্বাধিকারী শরৎকুমার রায়ের মৃত্যু হয়। তাঁর ছোট ভাই শিশিরকুমার রায় রিসিভার হিসেবে থিয়েটারের তত্ত্বাবধান করতে থাকেন।

১৯০৮-এর প্রথম ছয় মাসে এখানে কয়েকটি নাটকের অভিনয় হল। ক্ষীরোদপ্রসাদের অশোক, বরুণা, ভূতের বেগার, গিরিশের প্রফুল্ল, বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী (নাট্যরূপ : গিরিশ) উল্লেখযোগ্য। 'অশোক' নাটকে অভিনয় করেছিলেন—দানীবাবু (অশোক), তিনকড়ি (ধারিণী), প্রমদাসুন্দরী (কুনাল) এবং খুবই প্রশংসা লাভ করেছিলেন।

এই বছরের মাঝামাঝি সময় থেকেই শিশিরকুমার রায়ের সঙ্গে গিরিশের মনোমালিন্য শুরু হয়। শিশির রায় তাঁর দাদার দায়িত্ব গ্রহণ করলেও খুব ভালভাবে থিয়েটার চালানোর যোগ্যতা দেখাতে পারেননি। তাছাড়া আর্থিক ব্যাপারেও তিনি দাদার মতো অত মুক্তহস্ত ছিলেন না। অভিনেতাদের মধ্যে অনেকেই, যেমন, ক্ষেত্রমোহন মিত্র, মন্মথ পাল, মণীন্দ্র মণ্ডল কোহিনূর ছেড়ে চলে গেলেন। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা ও ভাঙনের চিহ্ন দেখা দিল। মালিকের অপ্রীতিকর আচরণে গিরিশ ক্ষুব্ধ হলেন। এদিকে এই অবস্থায় গিরিশের হাঁপানি অসুখ বেড়ে যাওয়াতে তিনি নিয়মিত থিয়েটারে আসতে পারেন না, ফলে নাট্যশিক্ষা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। শর্তানুযায়ী নতুন নাটকও লিখে দিতে পারছিলেন না। মালিক শিশির রায় গিরিশের বেতন বন্ধ করে দিলেন। গিরিশ তিন মাসের বেতন ও বোনাসের বাকি চার হাজার টাকার জন্য আদালতে মামলা করলেন। বিচারে গিরিশ জিতে গিয়ে সব পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিয়ে কোহিনূর ছেড়ে মিনার্ভায় চলে গেলেন (১৮ জুলাই, ১৯০৮), সঙ্গে নিয়ে গেলেন পুত্র দানীবাবুকে।

এখানে উল্লেখযোগ্য একটি খবর হল, অসুস্থ অবস্থাতেই গিরিশ কোহিনূরের জন্য 'ঝাঁসীর রানী' নাটকটি লিখতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু ব্রিটিশ পুলিশের তরফে তাঁকে এই ধরনের নাটক আর না লিখতে বলা হয়। গিরিশও আর এই নাটক লেখা শেষ করেন নি।

গিরিশ চলে গেলে, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি কোহিনূরে যোগ দিলেন ১৯০৮-এর জুলাই মাসে। ছিলেন আগস্ট মাস পর্যন্ত। কোহিনূরে তখন অভিনীত হল সংসার (১৫ জুলাই), জেনানাযুদ্ধ (১৫ জুলাই), আবুহোসেন (২৯ জুলাই), দুর্গেশনন্দিনী (১ আগস্ট), নীলদর্পণ (২ আগস্ট), প্রফুল্ল (৯ আগস্ট), নবীন তপস্বিনী (৯ আগস্ট)। অর্ধেন্দুর উদ্যোগে, পরিশ্রমে ও অভিনয়ে কোহিনূর আবার স্থিতাবস্থায় ফিরে এলো। এখানে নবখুড়ো (সংসার), পদ্মলোচন (জেনানাযুদ্ধ), আবুহোসেন (আবুহোসেন), বিদ্যাদিগগজ (দুর্গেশনন্দিনী), তোরাপ (নীলদর্পণ), যোগেশ (প্রফুল্ল), জলধর (নবীন তপস্বিনী) প্রভৃতি চরিত্রাভিনয়ে দর্শকদের আকৃষ্ট করতে লাগলেন। বিশেষ করে আবুহোসেন, বিদ্যাদিগগজ, কিংবা জলধরের চরিত্রে তাঁর অভিনয় সকলকে মুগ্ধ করল। এখানে অর্ধেন্দু নতুন দুটি চরিত্রে প্রথম অভিনয় করলেন, যেগুলি তিনি এর আগে কখনো করেন নি। যেমন তোরাপ ও যোগেশ। যোগেশ চরিত্রে গিরিশ এবং অমৃতলাল মিত্র যেভাবে অভিনয় করতেন, অর্ধেন্দু তাকে পুরো পালটে দিয়ে তাঁর অভিনয়ে নতুন ডাইমেনশান নিয়ে এলেন। বোদ্ধা ও রসিক দর্শকের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করেছিলেন তিনি। তোরাপের অভিনয়ে তোরাপের গোঁয়ার্তুমিকে অর্ধেন্দু কৃষক বিদ্রোহী চরিত্রে রূপান্তরিত করে হাজির করেছিলেন। তোরাপের এই গভীরতা অন্য অভিনেতার অভিনয়ে কখনো পরিস্ফুট হয়নি।

৯ আগস্ট, ১৯০৮-এ এখানে নবীন তপস্বিনী ও প্রফুল্ল নাটকেই অর্ধেন্দুশেখরের

শেষ অভিনয়। এর পরেই ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯০৮, তাঁর মৃত্যু হয়।

১৯০৮-এর একেবারে শেষে (১৮ ডিসেম্বর) 'পাঞ্জাব গৌরব' নাটক অভিনীত হয়। দ্বিতীয় রাত্রের অভিনয়ে পাঞ্জাবী দর্শকেরা গোলমাল করে অভিনয় বন্ধ করে দেয়। কারণ হচ্ছে, ঠাকুর সিংহের মাতা পান্নারানীর একটি সংলাপ। সেখানে সে নিজেকে পঞ্চনদবাসী সমগ্র খালসাদের জননী বলে ঘোষণা করে। আপত্তির কারণ, একজন বারাঙ্গনা অভিনেত্রী জননী সেজে সমগ্র শিখসমাজের মাতা হতে চায়, এ গর্হিত কাজ চলবে না। অতএব অভিনয় বন্ধ। উপায়ান্তর না দেখে কোহিনূর কর্তৃপক্ষ নাটকটির নাম পালটে 'বীরপূজা' নামে অভিনয় করল (৩০ জানুয়ারি, ১৯০৯)। পাঞ্জাবের কাহিনীকে মারাঠাদের কাহিনীতে রূপান্তরিত করে দেওয়া হল এবং ঠাকুর সিংহের জায়গায় রাজারামের কাহিনী তৈরি করে নেওয়া হল। অভিনয় করলেন : রাজারাম—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। গোবর্ধন--মন্মথনাথ পাল। রঙ্গনাথ—ক্ষেত্রমোহন মিত্র। কোহিনূরের একটি উল্লেখযোগ্য অভিনয় হিসেবে বীরপূজার উল্লেখ করা হয়। বিশেষ করে অভিনয়ে মন্মথ পাল হাস্যরসের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন। রঙ্গনাথের অভিনয়ও ভালো হয়েছিল।

১৯০৯-এ আরো অভিনীত হল হরনাথ বসুর ময়ূর সিংহাসন, যোগীন্দ্রনাথ বসুর নেড়া হরিদাস উপন্যাসের নাট্যরূপ প্রতিফল, দুর্গাদাস দে'র সোনার সংসার, হরিপদ মুখোপাধ্যায়ের রাণী দুর্গাবতী। ময়ূর সিংহাসনে অভিনয় করেছিলেন—

> সাজাহান—পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। ঔরঙ্গজেব—ক্ষেত্রমোহন মিত্র। দারা—অপরেশ মুখোপাধ্যায়। মোরাদ—অটলকুমার। জিহনআলি—মন্মথ পাল। রোসেনারা—প্রমদাসুন্দরী। আমিনা--চারুবালা। সিপার--ভূষণ। নাদিরা—কিরণশশী।

দুর্গাবতী নাটকের অভিনয়ে নামভূমিকায় প্রমদাসুন্দরীর অনবদ্য অভিনয় সকলকে মুগ্ধ করেছিল।

১৯০৯-এর ৭ জুলাই পর্যন্ত অপরেশচন্দ্র ম্যানেজার ছিলেন। তারপর তিনি ও তারাসুন্দরী কোহিনূর ত্যাগ করেন।

১৯১০-এর ৯ জানুয়ারি রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায় গলদ' প্রহসনের অভিনয় হয়। ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভূতের বিয়ে' নক্সা, গিরিশের 'চণ্ড' ও 'রাজা অশোক', হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের 'আকবরের স্বপ্ন' অভিনীত হয়। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সাহায্যার্থে ২০ মার্চ, 'বেনিফিট নাইট' করা হয়। সেখানে নাচ গান ও নানা নাটকের খণ্ড খণ্ড অংশ দেখানো হয়েছিল।

১৯১১-তে বেশ কয়েকটি নাটক অভিনীত হলো। ১৯১১-এর ২৭ মে থেকে অতুল মিত্র নাট্যকার এবং কুসুমকুমারী অভিনেত্রী হিসেবে যোগ দিলেন। 'শখের জলপান' ও 'মধুর মিলন' নামে শৈলেন্দ্রনাথ সরকারের লেখা দুটি কৌতুক নাটক এখানে অভিনীত হল (৩ জুন)। হরিশচন্দ্র সান্যালের গ্রহের ফের (২১ অক্টোবর), অতুলকৃষ্ণ মিত্রের জেনোরিয়া (২৫ নভেম্বর), প্রাণের টান (২৫ ডিসেম্বর), পরপর অভিনয়েও কোনো সাফল্য এলো না। জেনোরিয়া গীতিনাট্যে বাংলা থিয়েটারে দ্বৈত নৃত্য গীতের বিখ্যাত

জুটি কুসুমকুমারী (জেনোরিয়া) এবং নৃপেন বসু (জোজিয়ক) জমাতে পারলেন না। এদের সঙ্গে ফরমাজ চরিত্রে অপরেশ মুখোপাধ্যায় ছিলেন। তিনিও সুবিধে করতে পারলেন না। 'প্রাণের টান' নাটিকা মলিয়েরের-এর নাটক অবলম্বনে অতুল মিত্র রচনা করেছিলেন, তাতে অভিনয়ে অনেকেই যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন, তবুও জমলো না।

১৯১২-তে নানাধরনের বেশ কয়েকটি নাটক অভিনীত হল। কোহিনূরের অবস্থা তেমন ভালো যাচ্ছিল না। তবুও পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, নাটকাভিনয়ের মাধ্যমে অবস্থা ফেরাবার চেষ্টা হতে লাগল। গিরিশের বলিদান, পাণ্ডব গৌরব, শঙ্করাচার্য, ক্ষীরোদপ্রসাদের খাঁজাহান ও পলিন, বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলা (নাট্যরূপ গিরিশ), গোল্ডস্মিথের 'সি স্টুপস টু কঙ্কার' অবলম্বনে অতুল মিত্রের 'মোহিনী মায়া' এই বছরের উল্লেখযোগ্য নাটক। মোহিনী মায়ার অভিনয়ে এলান উইলকিস নামে বিখ্যাত একজন ইংরেজ অভিনেতা-পরিচালকের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। তবুও সার্থক হলো না এর অভিনয়। কুসুমকুমারী, অপরেশচন্দ্র কিংবা নাট্যকার অতুল মিত্র, কারো চেষ্টাতেই কোহিনূরের ভাগ্য ফিরল না। দুরবস্থা চরমে উঠতে লাগল। আর্থিক দায়দায়িত্ব ও থিয়েটার পরিচালনা নিয়ে শিশির রায়ের সঙ্গেও তাঁর দাদা শরৎকুমার রায়ের বিধবা স্ত্রীর বিবাদ শুরু হলো। কিন্তু কোনো উপায়েই দেনাগ্রস্ত থিয়েটারের ভাগ্য সুপ্রসন্ন করা গেল না।

কোহিনূর থিয়েটারের শেষ অভিনয় : ২১ জুলাই, ১৯১২, নাটক : বিশ্বামিত্র ও পলিন। ২৭ জুলাই, ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে কোহিনূর থিয়েটার দেনার দায়ে নীলামে উঠলে মনোমোহন পাঁড়ে (তখন তিনি মিনার্ভা থিয়েটারেরও মালিক) এক লক্ষ এগারো হাজার টাকায় কিনে নেন। মনোমোহন মিনার্ভার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে মিনার্ভার দলবল নিয়ে কোহিনূরে চলে আসেন এবং সেখানে অভিনয় শুরু করেন।

১৯১২-এর ২৭ আগস্ট মঙ্গলবার গিরিশের স্মৃতিভাণ্ডার নির্মাণকল্পে এখানে বিভিন্ন নাট্যমঞ্চের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সম্মিলিত অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। নাটক, গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডবগৌরব' ও 'বলিদান' এবং একাধিক গীতিনাট্য। বলিদানে অভিনয় করেন—

> অমৃতলাল বসু—করুণাময়। ক্ষেত্রমোহন মিত্র—মোহিত। সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ—দুলাল। মন্মথনাথ পাল—রমানাথ। তারাসুন্দরী—সরস্বতী। সুশীলবালা—জোবি। কিরণবালা—কিরন্ময়ী। চারুবালা—হিরন্ময়ী।

পাণ্ডব গৌরবে অভিনয় করেন ঃ অমরেন্দ্রনাথ দত্ত—ভীম। প্রমদাসুন্দরী—উর্বশী। নাটকগুলির পরিচালনা করেন অমৃতলাল বসু। তিনকড়ি অসুস্থতার কারণে অভিনয় করতে পারেন নি। সে-রাত্রে টিকিট বিক্রি হয়েছিল ৩৬৩৬ টাকা।

মনোমোহন কোহিনূর থিয়েটার কিনে নিয়ে সেই মঞ্চে মিনার্ভা নাম দিয়ে মিনার্ভা সম্প্রদায়ের দলবল নিয়ে অভিনয় চালিয়ে যেতে থাকেন। এই নিয়ে উপেন্দ্রনাথ মিত্রের

সঙ্গে তার মামলা হয়। মনোমোহন হেরে যান। কোর্টের নির্দেশে তিনি ওখানে আর মিনার্ভা নাম ব্যবহার করতে পারবেন না। তাই নাম পালটে কোহিনূর নামেই ওখানে অভিনয় চালিয়ে যান। শেষে ১৯১৫-এর ১ সেপ্টেম্বর কোহিনূর নাম পালটে রাখেন মনোমোহন থিয়েটার। ম্যানেজার করে নিয়ে আসেন দানীবাবুকে।

নীলামে বিক্রয়ের পরই কোহিনূর থিয়েটারের ইতিহাস শেষ হয়ে যায়।

কোহিনূর থিয়েটার সর্বমোট পাঁচ বৎসর চলেছিল। গিরিশ অর্ধেন্দুশেখর থেকে শুরু করে সে-যুগের থিয়েটারের বিখ্যাত প্রায় সব অভিনেতা-অভিনেত্রী এখানে অভিনয় করেছেন। এখানকার বেশ কয়েকটি নাটক খুবই সাড়া ফেলেছিল। নবসজ্জায় সজ্জিত এই রঙ্গমঞ্চ দর্শকের মনোমুগ্ধকর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু থিয়েটার পরিচালনার ত্রুটি, মালিকের পারিবারিক কলহ, মালিক ও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মনোমালিন্য প্রভৃতি কারণে কোহিনূর থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়। প্রধান উদ্যোগী ও মালিক শরৎকুমার রায় থিয়েটার প্রতিষ্ঠার কয়েক মাসের মধ্যেই মারা যান। ফলে তাঁর পরিকল্পিত থিয়েটারের যাত্রা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি।

এখানে গিরিশচন্দ্রের ৭ খানি, ক্ষীরোদপ্রসাদের ১০ খানি, অতুলকৃষ্ণ মিত্রের ৩ খানি, হরনাথ বসুর ৩ খানি, রবীন্দ্রনাথের ১ খানি, দুর্গাদাস দে-র ২ খানি এবং নিত্যবোধ বিদ্যারত্ন, হরিপদ মুখোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের ১ খানি করে নাটক অভিনীত হয়েছিল। সর্বমোট ৪০টি নাটক এই পাঁচ বছরে অভিনীত হয়।

জাঁকজমক ও প্রচুর অর্থব্যয়ে গড়ে তোলা কোহিনূর থিয়েটার পাঁচ বছরেই বন্ধ হয়ে যায়। প্রভূত সম্ভাবনার এই ক্ষণস্থায়িত্ব, থিয়েটার-অনুরাগীদের বিষাদাচ্ছন্ন করে তোলে।

অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি ও বাংলা থিয়েটার

বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে অর্ধেন্দুশেখর (জানুয়ারি, ১৮৫০-১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯০৮) একটি স্মরণীয় নাম। পিতা শ্যামাচরণ মুস্তাফির অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। বাগবাজারের কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী স্ট্রিটের ১৯ নম্বর বাড়ির পৈতৃক ভদ্রাসনে জন্মগ্রহণ করেন। মাতা মুক্তকেশী দেবী। লেখাপড়াও খুব বেশি করেন নি। কিন্তু ব্যক্তিগত চেষ্টায় তিনি ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে অধিকার অর্জন করেন। আঞ্চলিক ভাষাসমূহও আয়ত্ত করেন। সহজাত প্রতিভা, অনুমান ক্ষমতা এবং কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে বাংলা থিয়েটারে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

অর্ধেন্দুশেখর নাট্যকার ছিলেন না।[১] তিনি ছিলেন সংগঠক, মঞ্চাধ্যক্ষ, অভিনেতা ও নাট্যশিক্ষক। এবং অল্পাংশে থিয়েটারের মালিক। জীবনে প্রথম অভিনয় ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'কিছু কিছু বুঝি' প্রহসনে ; দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জোড়াসাঁকো কয়লাহাটার বাড়িতে, দন্তবক্র, মুরাদ আলি ও চন্দনবিলাসের ভূমিকায়। ২ নভেম্বর, ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দে। ধনী বাড়ির সখের নাট্যশালার অভিনয়ে।

তারপরে বাগবাজারের এমেচার থিয়েটারের সধবার একাদশী অভিনয়ে (১৮৬৮—৭০) সাতবার কেনারামের চরিত্রে অভিনয় করেন। ক্রমেই বিয়ে পাগলা বুড়োতে রাজীব মুখুজ্জে'র ভূমিকায় (১৮৭০) এবং শ্যামবাজার নাট্যসমাজের হয়ে লীলাবতী নাটকে হরবিলাস ও ঝি'র চরিত্রাভিনয়ে নিজেকে প্রস্তুত করে তোলেন।

১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে যে কয়জন যুবক উদ্যোগী হয়ে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অর্ধেন্দুশেখর ছিলেন তাদের প্রধানতম। সেখানে 'নীলদর্পণ' নাটক বাছাই, নাট্য শিক্ষাদান এবং একই সঙ্গে পাঁচটি চরিত্রের অভিনয়ে অংশগ্রহণ তাঁর ক্ষমতার প্রমাণ রাখে। ন্যাশনাল থিয়েটার ভেঙে গেলে হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটারের দল নিয়েও তিনি নানা স্থানে অভিনয় করেন। তারপর বাংলা থিয়েটার পুরোপুরি ব্যবসায়িক ও পেশাদারি থিয়েটার হয়ে গেলে, তিনিও থিয়েটারকে তাঁর জীবন ও জীবিকা হিসেবেই গ্রহণ করেন। কোনোদিন চাকুরি করেননি, থিয়েটারই তাঁর চাকুরি-স্থল। থিয়েটারের জন্য অর্ধেন্দুশেখর প্রভাবশালী আত্মীয়ের বিদ্বেষ উপেক্ষা করেছেন ; বাড়িঘর, পরিবার, সন্তান কিছুরই তোয়াক্কা করেন নি। গিরিশ লিখছেন : 'আহার চলিলেই হইল, তাহার পর যাহা হউক না কেন থিয়েটার লইয়াই আছেন।' (: বঙ্গীয় নাট্যশালায় নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি।) থিয়েটার করা ভিন্ন তাঁর জীবনে

১. অর্ধেন্দুশেখরের লেখা 'ভগবান ভূত' প্রহসন ও 'দুর্গাপূজার পঞ্চরং'। তাছাড়া তাঁর 'পাকা তামাশা' গুলি সবই মুখে মুখে রচিত।

যে অন্য কোনো কাজ আছে, পুত্র-পরিবার আত্মীয়স্বজনের কাছে যে কোনো দায়িত্ব থাকতে পারে, সেকথা তিনি মাথাতেই রাখতেন না।

থিয়েটার-পাগল এই মানুষটির নিজ চরিত্রের মধ্যে কোনো স্থিতধী ভাব ছিল না বলে কোনো থিয়েটারেই তিনি নিজেকে বেশিদিন যুক্ত রাখতে পারেন নি। ন্যাশনাল থিয়েটার ভাগ হলে, ভাঙা দল নিয়ে তিনি কিছুদিন চেষ্টা চালান। ক্রমে তিনি মূল ন্যাশনাল থিয়েটারের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। মুল ন্যাশনালের দল গিরিশচন্দ্রের নেতৃত্বে প্রথমে ন্যাশনাল থিয়েটার, তারপরে বিডন স্ট্রিটে স্টার, তারপরে হাতীবাগানের স্টারে স্থিত হয়। অর্ধেন্দুশেখর এই মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে তাঁর অভিনয় জীবনের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল।

প্রতাপচাঁদ জহুরির ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার (১৮৮১) পর থেকেই অর্ধেন্দুশেখর প্রায়শই দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়তেন। মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন, অভিনয় করতেন, অভিনয় শিক্ষা দিতেন, আবার কলকাতা ত্যাগ করে যেতেন। প্রায় একযুগ এই সময়ে তিনি রঙ্গমঞ্চ থেকে প্রায়শই সরে থাকতেন। দর্শকও তাঁর কথা ক্রমশই বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল। এই সময়ে তিনি যোগাভ্যাসে মন দিয়েছিলেন। আবার সব ছেড়ে-ছুড়ে মিনার্ভায় এসে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে যোগ দিলেন ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে। এইখানে পরপর বেশ কিছু অভিনয় করলেন, নাট্যশিক্ষা দিলেন। হঠাৎ মনস্থির করলেন, নিজেই থিয়েটার চালাবেন। তাই এমারেল্ড থিয়েটার ভাড়া নিয়ে ১৮৯৪-এর ২২ সেপ্টেম্বর অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'মা' নাটক দিয়ে উদ্বোধন করলেন। তারপরে 'মান', 'রাজা বসন্ত রায়', 'আবুহোসেন' পরপর প্রযোজনা করলেন।

থিয়েটার ভালবাসলেও, থিয়েটারের অন্য সব গুণ থাকলেও, কি করে থিয়েটার ব্যবসা চালাতে হয়, সে বুদ্ধি বা ধারণা অর্ধেন্দুশেখরের ছিল না। তিনি মোহের বশে থিয়েটার ব্যবসায় নেমে পড়েন। তাই যখন এমারেল্ড থিয়েটার পতনোন্মুখ তখন এমারেল্ডের দায়িত্ব নেন। দেনায় ডুবে যান। ভরাডুবি অবস্থায় ব্যবসা ছাড়েন—ততদিনে বিষয়সম্পত্তি, বসতবাড়ি সবই বেচে দিতে হয়েছে। গিরিশ লিখছেন : 'তিনি অভিনেতা ছিলেন, বিষয়ী ছিলেন না। তিনি শিক্ষা দিতে জানিতেন, কিন্তু কিরূপে সকল দিক সামঞ্জস্য রাখিয়া থিয়েটার চালাইতে হয়, তাহা জানিতেন না।'

অর্ধেন্দুশেখরের অভিনয় জীবন বহু বিস্তৃত। নানা থিয়েটারে নানাভাবে যুক্ত থেকে তিনি বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

শৌখিন পর্বের কথা আগেই বলেছি। এবারে সাধারণ রঙ্গালয় পর্বে তাঁর কিছু অভিনয়ের পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। থিয়েটারগুলিতে তাঁর অবস্থান-কাল, অভিনীত নাটক ও চরিত্রের নির্বাচিত তালিকা :

১. ন্যাশনাল থিয়েটার (১৮৭২-৭৩)
   নীলদর্পণ (উড, সাবিত্রী, গোলোক বসু, একজন রায়ৎ), সধবার একাদশী (জীবনচন্দ্র), নবীন তপস্বিনী (জলধর), কৃষ্ণকুমারী (ধনদাস)।

২. হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার (১৮৭৩)
শর্মিষ্ঠা (মাধব্য), বিধবাবিবাহ নাটক (কর্তা)।

৩. গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার (১৮৭৪)
প্রণয়পরীক্ষা (নটবর), মৃণালিনী (হৃষিকেশ), কমলেকামিনী (বক্কেশ্বর)।

৪. প্রতাপচাঁদ জহুরির ন্যাশনাল থিয়েটার (১৮৮৩)
আনন্দমঠ (মহাপুরুষ), রাজা বসন্ত রায় (রমাই ভাঁড়)।

৫. এমারেল্ড থিয়েটার (১৮৮৭)
পাণ্ডবনির্বাসন (ধৃতরাষ্ট্র)।

৬. আর্যনাট্যসমাজ বীণা থিয়েটার মঞ্চে (১৮৮৮)
নীলদর্পণ (পূর্ববৎ)।

৭. এমারেল্ড থিয়েটার (১৮৮৯)
বক্কেশ্বর (বক্কেশ্বর)।

৮. মিনার্ভা থিয়েটার (১৮৯৩-৯৪)
ম্যাকবেথ (দ্বারপাল, বৃদ্ধ, ডাক্তার, ১ম ডাকিনী, ১ম হত্যাকারী), মুকুলমুঞ্জরা (বরুণচাঁদ), আবুহোসেন (আবুহোসেন), জনা (বিদূষক)।

৯. এমারেল্ড থিয়েটার (নিজের মালিকানায়—১৮৯৪-৯৫)
রাজা বসন্ত রায় (প্রতাপাদিত্য)।

১০. মিনার্ভা থিয়েটার (১৯০০—)
পলাশীর যুদ্ধ (ক্লাইব), বঙ্গবিজেতা (মাসুমি কাবুলি)।

১১. অরোরা থিয়েটার, বেঙ্গল থিয়েটার মঞ্চে, (১৯০২)
সধবার একাদশী (নিমচাঁদ), রিজিয়া (ঘাতক), প্রফুল্ল (যোগেশ)।

১২. স্টার থিয়েটার, হাতিবাগান (১৯০৩)
প্রতাপাদিত্য (বিক্রমাদিত্য ও রডা)।

১৩. মিনার্ভা থিয়েটার (১৯০৪-০৮)
নীলদর্পণ (উড ও তোরাপ), বলিদান (রূপচাঁদ ও করুণাময়), রানা প্রতাপ (পৃথ্বিরাজ), সিরাজদৌল্লা (দানশা ও শওকতজঙ্গ), মীরকাশিম (মিঃ ড্রেক, মিঃ শেরাফটন. মুশালা), সংসার (নবখুড়ো), দুর্গেশনন্দিনী (গজপতি), সিরাজদৌল্লা (মীরজাফর), দুর্গেশনন্দিনী (বিদ্যাদিগগজ), প্রফুল্ল (রমেশ), চৈতন্যলীলা (জগাই), মীরকাশিম (হলওয়েল হে, মেজর এডামস), দুর্গাদাস (রাজসিংহ)।

১৪. কোহিনূর থিয়েটার (এমারেল্ড থিয়েটার মঞ্চে, ১৯০৮)
জেনানা যুদ্ধ (পদ্মলোচন), সংসার (নবখুড়ো), নীলদর্পণ (তোরাপ), নবীন তপস্বিনী (জলধর)।

শেষ অভিনয় : কোহিনূর থিয়েটারে ৯ আগস্ট, ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে, প্রফুল্ল ও নবীন তপস্বিনী নাটকে যথাক্রমে যোগেশ ও জলধরের ভূমিকায়।

অসামান্য অভিনেতা ছিলেন। একেবারে যাকে বলে 'বিধাতার হাতে গড়া এ্যাক্টর'।—(অমৃতলাল বসু)। নানা ধরনের চরিত্রে অভিনয়ে পারদর্শী ছিলেন। হাস্যরসাত্মক ভূমিকায় তাঁর জুড়ি ছিল না। আবার করুণ রসাত্মক অভিনয়েও নতুন মাত্রা জুড়ে দিতে পারতেন। অভিনয় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন, একই ভূমিকা নানাভাবে অভিনয়ের চেষ্টা, একেক রাত্রে করতেন। আবার একই নাটকে একই রাত্রে একই সঙ্গে একাধিক বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করতেন, কখনো কখনো নারী চরিত্রেও নেমে পড়তেন। তাঁর অভিনয়ের বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি তাঁর উপস্থিতি দিয়েই দর্শকদের মাত করে দিতে পারতেন। গিরিশ বলছেন : 'দর্শক দেখিতেন অর্ধেন্দু, কি ভূমিকা, তাহা নয়। এইরূপ শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি একক, দর্শকের সম্পূর্ণ প্রীতি জন্মাইতে পারে, দৃশ্যপট, অভিনেতা প্রভৃতির বিশেষ সাহায্য প্রয়োজন হয় না।'

শিশিরকুমার ভাদুড়ি স্বীকার করেছেন যে, ক্যারেক্টার এ্যাকটিং-য়ে অর্ধেন্দুশেখরের জুড়ি ছিল না। (দ্রঃ পাদটীকা পৃষ্ঠা-২৩৪) সেদিক থেকে তিনি গিরিশচন্দ্রের থেকেও বড় ছিলেন। একসঙ্গে একাধিক ভূমিকার রূপ, কণ্ঠ, ম্যানারিজম বদলিয়ে যখন অভিনয় করে যেতেন, তখন ধরার উপায় থাকতো না যে একই লোক—সেই অর্ধেন্দুশেখর।

তিনি মঞ্চে ছোট ছোট ভূমিকা (Part) বেছে নিতেন। অন্যেরা যখন বড় এবং পছন্দসই ভূমিকা নিতেন, অর্ধেন্দুশেখর তখন সাধারণ ছোট ভূমিকা নিতেন। এবং নিজের অসামান্য দক্ষতায় সেগুলিকে এমন মূর্ত করে তুলতেন যে, সারা অভিনয়ে লোকে ঐ ভূমিকাগুলিরই আলোচনা করত। সাধারণ দর্শক থেকে শুরু করে শিক্ষিত রুচিশীল দর্শক উভয়েরই প্রশংসা লাভ করতেন। এইভাবে রিজিয়ার ঘাতক, চৈতন্যলীলার জগাই, ম্যাকবেথের ১ম হত্যাকারী ও পোর্টার, নীলদর্পণের রায়ত চাষী, দুর্গেশনন্দিনীর বিদ্যাদিগ্‌গজ গজপতি তাঁর অসামান্য চরিত্রাভিনয় কীর্তির স্বাক্ষর হয়ে আছে।

অর্ধেন্দুশেখর নানা ভাষা ও উপভাষায় কথা বলতে পারতেন অনর্গল। ফলে বাংলা হিন্দি ইংরাজি যেমন তাঁর মুখে খইয়ের মত ফুটতো, তেমনি মেদিনীপুর, খুলনা, চট্টগ্রাম, কি ঢাকার উপভাষাও অনর্গল বলতে পারতেন। উড়িয়া, ভোজপুরিতেও তিনি নিপুণ ছিলেন। ফলে একেকদিন বা জায়গা বিশেষে তিনি তাঁর অভিনীত চরিত্রগুলির ভাষা পালটে নিতেন। এইভাবে ছোট ছোট ভূমিকাগুলিকে তিনি ক্রমেই আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য করে তুলতেন।

অভিনয়ে চরিত্র নিয়ে ভাবনাচিন্তা করে, মানুষের জীবন থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করে সেগুলিকে কিভাবে প্রাণবন্ত করা যায়—অর্ধেন্দুশেখর সব সময়েই সে চেষ্টা করতেন। নিজের অভিনয়ে সেই ভাব নিয়ে আসতেন। শিশির ভাদুড়িকেও স্বীকার করতে হয়েছে যে, অর্ধেন্দুশেখরের এই চরিত্র বিশ্লেষণ ও তার প্রকাশের ক্ষমতা অসাধারণ ছিল।

কৌতুক অভিনয়ের নির্বিশেষ গুণ তাঁর ছিল। অঙ্গভঙ্গি, কণ্ঠস্বর এবং সাজসজ্জার কৌশলে তিনি স্বভাবতই কৌতুকরস পরিবেষণ করতেন। তবে তা কখনোই ভাঁড়ামোর পর্যায়ে চলে যেত না। থিয়েটারের অভিনয়ে তীব্র ব্যঙ্গ, তীক্ষ্ণ শ্লেষ এবং নির্মল রসিকতা

অর্ধেন্দুশেখরই প্রথম বাংলা রঙ্গমঞ্চে নিয়ে আসেন। গিরিশচন্দ্র থেকে শুরু করে সে-যুগের অন্যান্য বিদগ্ধ সকলেই স্বীকার করেছেন যে, কৌতুকাভিনয়ে অর্ধেন্দুই সেরা এবং অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো বিকল্প হওয়া সম্ভব ছিল না।

একই নাটকে একই রাত্রের অভিনয়ে একই মঞ্চে বিভিন্ন ভূমিকায় তিনি অভিনয় করতেন। চার-পাঁচটি ভূমিকাতেও তিনি এইভাবে প্রায়শই নেমেছেন। নীলদর্পণ, ম্যাকবেথ, প্রতাপাদিত্য—প্রভৃতি নাটকে তিনি এইভাবে অভিনয় করেছেন। নারী ভূমিকা থেকে শুরু করে বৃদ্ধ, যুবক নানা ভূমিকায় তিনি অবলীলাক্রমে একই রাতে অভিনয় করে গেছেন। অঙ্গভঙ্গির পরিবর্তন, কণ্ঠস্বরের সামঞ্জস্য এবং সাজসজ্জা দিয়ে তিনি এমনভাবে চরিত্রগুলিকে উপস্থাপন করতেন যে, কোনো দর্শকের পক্ষেই বোঝা সম্ভব ছিল না যে, একই অর্ধেন্দুশেখর বহুরূপে সম্মুখে উপস্থিত। অভিনয়ের এ-এক অলৌকিক ক্ষমতা।

আবার, একই চরিত্রকে বিভিন্ন রাতের অভিনয়ে একেকভাবে উপস্থাপনা করার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন। 'প্রফুল্ল'র যোগেশকে নিয়ে তিনি পরীক্ষা করেছেন, 'সংসারে'র নবখুড়ো, 'নবীন তপস্বিনী'র জলধর, 'বলিদানে'র করুণাময়, 'কৃষ্ণকুমারী'র ধনদাস, আবুহোসেনে'র আবুহোসেন—তার উদাহরণ।

মিনার্ভা থিয়েটারে 'চৈতন্যলীলা' অভিনয়ে জগাই চরিত্রে অসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। চৈতন্যের ভাববিরোধী জগাই সঙ্কীর্তনের দলকে আক্রমণ করেছেন। অথচ ক্রমে তাঁর মনের পরিবর্তন ঘটছে চৈতন্যের সাক্ষাতে। মনের এই দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব তিনি শরীরের অভিনয়ে ফুটিয়ে তুলতেন। মুখে মাতালের সংলাপ এবং শরীরের উপরের অঙ্গে মাতলামি, সঙ্গে সঙ্গে শরীরের নীচের অংশে দু'পায়ে চলেছে সঙ্কীর্তনের তালে তালে পা মেলানো। ক্রমে নিম্ন থেকে সঙ্কীর্তনের তাল ক্রমে ঊর্ধ্বাঙ্গে উঠে আসছে—ক্রমশ সারা শরীরকে মাতিয়ে দিচ্ছে—মাতাল জগাই দু'হাত তুলে সঙ্কীর্তনে গলা মিলিয়ে দিয়েছে—গুণ্ডা, মাতাল ও চৈতন্য ভাব-বিরোধী জগাই ধীরে ধীরে ভক্তপ্রবর জগাইতে রূপান্তরিত হয়ে গেল।—সে-যুগে অর্ধেন্দুর অভিনয়ের এই ক্ষমতা যারা দেখেছেন অনেকেই মুক্তকণ্ঠে লিখে রেখে গেছেন সাক্ষ্য হিসেবে। মনে রাখতে হবে মিনার্ভাতে চৈতন্যলীলার অভিনয়ে অর্ধেন্দুর পাশে থাকত মাধাইরূপে গিরিশচন্দ্র—অভিনয়ের ক্ষেত্রে মহাসম্মিলন। সে এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা।

এখানে সে-যুগের আরেক শ্রেষ্ঠ অভিনেতা গিরিশের সঙ্গে অর্ধেন্দুর অভিনয়ের তুলনা করা যেতে পারে। গিরিশচন্দ্র ট্র্যাজিক চরিত্র অভিনয়ে পারদর্শী ছিলেন। অর্ধেন্দু কমিক এবং সিরিও-কমিক চরিত্রাভিনয়ে কুশলতা দেখিয়েছেন। অর্ধেন্দুর স্পষ্ট ও নির্দোষ উচ্চারণ, হ্রস্ব-দীর্ঘ মাত্রা অনুযায়ী উচ্চারণ এবং সুরবর্জিত স্বাভাবিক অভিনয় নিঃসন্দেহে আধুনিক কালের অভিনয়ধারা ও পরিণত রুচির অভিনয়ের পূর্বসূরি বলেই মনে হয়। অন্যদিকে গিরিশ ভাবগম্ভীর সুরেলা, ছন্দোময় অভিনয় করতেন। ছন্দ ও সুর তাঁর সংলাপ উচ্চারণের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এতে ভাব গভীরতা আসে। আবেগ সৃষ্টি হয়। গিরিশ ভাবাবেগ ছড়িয়ে দিতেন। অর্ধেন্দু চরিত্র বিশ্লেষণ করতেন।

শিশির ভাদুড়ির মতে অভিনেতা হিসেবে অর্ধেন্দুশেখর গিরিশের চেয়ে অনেক বড় ছিলেন। কিন্তু গিরিশের ছিল 'থিওরি' ও 'প্র্যাকটিশ'—এই উভয় বিভাগেই জ্ঞান এবং রিয়ালিজম। ছিল দর্শক বিচারের ক্ষমতা। মঞ্চকে বাঁচাবার জন্য গিরিশ তাই কমপ্রোমাইজ-ও করেছেন। অন্যদিকে অর্ধেন্দুর স্পষ্ট ও নির্দোষ উচ্চারণ এবং সুরবর্জিত অভিনয় রীতি ও গদ্য উচ্চারণভঙ্গি ও স্বাভাবিক অভিনয়ের প্রশংসা করেছেন শিশিরকুমার। তাছাড়া পরিশীলিত অভিনয়ের ধারক রবীন্দ্রনাথসহ ঠাকুর বাড়ির অন্যেরাও অর্ধেন্দুশেখরকে সে-যুগের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বলেছেন।[২] তাঁর স্টেজ-ফ্রি এ্যাকটিংয়ের সবিশেষ গুণের কথাও স্বীকার করেছেন।

অভিনয় যে যুগে নিন্দিত, থিয়েটার ঘৃণার বস্তু সে যুগেও সামাজিক অর্ধেন্দুশেখর দম্ভভরে নিজের পরিচয় দিতেন, 'আমি অভিনেতা'।

অর্ধেন্দুশেখর উচ্চশ্রেণীর অভিনেতা ছিলেন। তেমনি উচ্চশ্রেণীর অভিনয় শিক্ষকও ছিলেন। ন্যাশনাল থিয়েটারের গোড়ার দিকে সব অভিনেতাদের তিনিই হাতে ধরে তৈরি করেছিলেন। তাঁর সমান নাট্যশিক্ষক তাঁর যুগে আর কেউ ছিল না। পরবর্তী অভিনেতা ও পরিচালক অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে, অর্ধেন্দুশেখর বঙ্গীয় নাট্যশালার প্রতিদ্বন্দ্বীহীন সুশিক্ষক ছিলেন। 'অতুলনীয় নাট্যশিক্ষক'—একথা অমৃতলাল বসুও স্বীকার করেছেন। শিশির ভাদুড়িও বলেছেন যে, অর্ধেন্দুশেখর অন্য অভিনেতাদের অভিনয় শেখাবার সময়ে মানুষের জীবন অভিজ্ঞতা থেকে চরিত্র বিশ্লেষণ ও ভাবপ্রকাশ শিক্ষা দিতেন অনবদ্যভাবে। তাঁর মতে, শিক্ষক হিসেবেও অর্ধেন্দুশেখর গিরিশের চেয়ে অধিকতর কৃতকার্য ছিলেন।

একই মঞ্চে গিরিশ ও অর্ধেন্দু যুক্ত থাকলে অভিনয় শিক্ষার দায়িত্ব অর্ধেন্দুই নিতেন। সেকালের সব অভিনেতা-অভিনেত্রীই কোনো-না-কোনো সময়ে অর্ধেন্দুর কাছে অভিনয় শিক্ষা নিয়েছেন। প্রতিটি ছোট ও তুচ্ছ ভূমিকার দিকেও অর্ধেন্দু গভীর মনোযোগ দিতেন এবং নিজের মনোমত না হওয়া পর্যন্ত অভিনেতা-অভিনেত্রীকে রিহার্সাল দেওয়াতেন। সংলাপ উচ্চারণ শেখানো, অভিনয় সুস্পষ্ট ও সুশ্রাব্য করে তোলা, ছোটখাট ক্রিয়া ও চরিত্রের প্রকৃতি, ভাব, মেজাজ নিখুঁত করে তোলার জন্য তিনি ধৈর্যসহকারে পরিশ্রম করে যেতেন। অন্য অভিনেতার সঙ্গে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে মঞ্চে অভিনয় কিভাবে করতে হয়, তারও শিক্ষা তিনি হাতে ধরে শেখাতেন।

অর্ধেন্দুশেখর থিয়েটারের মিশনারীরূপে সে যুগে খ্যাতিলাভ করেন। অমৃতলাল বসু লিখেছেন যে, 'থিয়েটারের যদি কেহ কখনও মিশনারী হইয়া থাকেন তাহা হইলে একমাত্র অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী ভিন্ন আর কাহারও নাম করা যায় না.'—তিনি সারাজীবন শুধুমাত্র থিয়েটার ও অভিনয়ের কল্যাণেই ব্যয় করেছেন। যখনই সুযোগ পেয়েছেন নাট্যদল নিয়ে কলকাতার বাইরে নানাস্থানে, এমনকি বাংলার বাইরেও ভারতের নানাস্থানে অভিনয় করে

২. ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—'মনে এলো', দেশ, ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৫ : "রবিবাবু, অবনীবাবু ঠাকুরবাড়ীর মতে তিনিই (অর্ধেন্দুশেখর) ছিলেন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। 'এমনটি আর হয় না'—কবি বলতেন।"

বেড়িয়েছেন। যখন নাট্যদল পাননি, তখন একাই নানা প্রান্তে গিয়ে সেখানকার মানুষজনের সঙ্গে মিশেছেন, নাট্যদল তৈরি করে দিয়ে এসেছেন, নতুবা নাট্যদল থাকলে তাদের উৎসাহ অনুপ্রেরণা এবং অভিনয় শিক্ষা দিয়ে এসেছেন। এতে তাঁর ক্লান্তি বা অবসাদ ছিল না, বরং উৎসাহ ও আগ্রহ ছিল বেশি। হিন্দু ন্যাশনালের দল নিয়ে তখনকার পূর্ববঙ্গে অভিনয় করেছেন। এই ন্যাশনালের দল নিয়ে বাংলার বাইরে অভিনয় করতে গেছেন, মিনার্ভার নাট্যদল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন অভিনয়ে। কলকাতার আশেপাশে মফস্বলে তো কথাই নেই। থিয়েটারের প্রসারে বাংলার (তখন অবিভক্ত বাংলা) এবং ভারতের বাঙালি অধ্যুষিত নানা অঞ্চলে তাঁর এই চেষ্টা সম্মানের সঙ্গেই স্মরণ করা উচিত।

অর্ধেন্দুশেখরের আর একটি গুণ ছিল, তাঁর স্বদেশপ্রেম। নাটকের মাধ্যমে জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করার একটা দায়বদ্ধতা তাঁর মধ্যে সবসময়ে কাজ করেছে। সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়ে সেই নাট্যশালার নাম 'ন্যাশনাল থিয়েটার' দেওয়া, সেখানে প্রথমেই দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করা, —প্রভৃতির মধ্যে তাঁর এই জাতীয় ভাবাবেগের প্রকাশ দেখা যায়। অর্ধেন্দুর চেষ্টাতেই ন্যাশনাল থিয়েটারে 'ভারতমাতা' অভিনীত হয়েছিল। গিরিশ লিখছেন : 'যে সকল পঞ্চরং অভিনীত হইত, তাহাতে বিশেষ রাজনৈতিক কটাক্ষ ছিল এবং তীব্র ব্যঙ্গশক্তিতে ঐ সকল পঞ্চরং রচিত না হইলেও অর্ধেন্দুর অভিনয়ে সেই শ্লেষের পূর্ণ বিকাশ হইত। অর্ধেন্দুর ধারণা ছিল যে, রঙ্গমঞ্চ হইতে অনেক কুরীতির প্রতি দর্শকের ঘৃণার উদ্রেক করা যায়, অনেক কদাচারী দমিত হয়, নীতি শিক্ষা, রাজনৈতিক শিক্ষা রঙ্গমঞ্চ হইতে দেওয়া যায়, রঙ্গমঞ্চের কার্য দেশের কার্য—তাঁহার জ্ঞান ছিল।'

অভিনয়নিয়ন্ত্রণ আইনের (১৮৭৬) পরবর্তীকালেও দেখি, অর্ধেন্দু যখন যে থিয়েটারে যুক্ত থেকেছেন, সেখানেই 'নীলদর্পণ' এবং অন্যান্য জাতীয় ভাবোদ্দীপক নাটকের অভিনয় করেছেন। বঙ্গভঙ্গের প্রাক্কাল থেকেই তিনি যখনই যে মঞ্চে ছিলেন সেখানেই দেশপ্রেমোন্মাদনার নাটকগুলি অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছেন। এইভাবে স্টার, মিনার্ভা তাঁর আগ্রহে ও উদ্যমেই দেশপ্রেমের নাটকগুলি বাছাই করে অভিনয় করেছে।

স্বদেশ-অনুরাগের প্রসঙ্গেই অর্ধেন্দুশেখরের **'মুস্তাফি সাহেবকা পাক্কা তামাশা'** প্রসঙ্গটি আলোচনা করা যেতে পারে।

ন্যাশনাল থিয়েটার এবং তার পরবর্তীকালে অর্ধেন্দুশেখর 'মুস্তাফি সাহেবকা পাক্কা তামাশা' নামে এক ধরনের প্যান্টোমাইম অভিনয় করতে থাকেন। তাঁর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল, এই ধরনের মজাদার ছোট অভিনয়গুলির মধ্য দিয়ে নাটক অভিনয়ের ফাঁকে দর্শকদের মাতিয়ে রাখা। এর উৎপত্তিও সেইভাবে হয়েছিল। এক রাতে অভিনয়ের শেষে প্রচণ্ড বৃষ্টির জন্য দর্শকেরা বাইরে বেরুতে পারছিল না। বসে থাকা এই দর্শকদের আনন্দ দেবার জন্য অর্ধেন্দু তাড়াতাড়ি ছেঁড়া কোট প্যান্ট পরে, মাথায় টুপি হাতে ছাতা নিয়ে ভবঘুরে সাহেবের সাজে মঞ্চে নেমে গেয়ে, নেচে এবং প্যান্টোমাইম করে দর্শকদের প্রভূত আনন্দ দিয়েছিলেন। মুখে মুখে সংলাপ ও সিচ্যুয়েশান তৈরি করে অন্য

দু-একজন পাকা অভিনেতা-অভিনেত্রীর সহযোগে অর্ধেন্দু এইভাবে দুই নাটকের ফাঁকে প্রায়শই দর্শকদের আনন্দ দিতে থাকেন। গোড়া থেকেই সাহেবের অভিনয়ে অর্ধেন্দু খুবই পারদর্শিতা ও খ্যাতিলাভ করেন। নীলদর্পণে মিঃ উড, প্রতাপাদিত্যে রডা, সিরাজদৌল্লায় মিঃ ড্রেক, পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইভ,—এই ধরনের অভিনয় তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং থিয়েটার মহলে তিনি 'সাহেব' নামেই পরিচিত হন। ইংরাজি উচ্চারণ ও আদবকায়দায় তিনি পাকা সাহেবের মতো আচরণ করতেন। গিরিশচন্দ্রও স্বীকার করেছেন : 'দেখ, ওর মতো সাহেব সাজতে বাঙালী কেউই পারবে না।' (ললিতচন্দ্র মিত্র—অর্ধেন্দু কথা)।

'প্রতাপাদিত্য' নাটকে রডার ভূমিকা অনেক ছোট ছিল। অর্ধেন্দুশেখর রডা সেজে এমন মাতিয়ে দিলেন যে, নাট্যকার রডার ভূমিকা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। প্রতাপাদিত্যের পরাজয়ের পর রডা যখন বলে ওঠে—'কি করবে রাজা, তোমার লোক চাকসিরি দিয়ে দুশমনকে এনেছে।'—তারপরে দুচোখে জল নিয়ে এসে রডার উক্তি : 'কুছ্ করতে পারলে না রাজা, ভেরি সরি।'

রডার ভূমিকায় সে অভিনয় ভুলতে পারেন নি সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (অর্ধেন্দুশেখর। সচিত্র শিশির, চৈত্র, ১৩৬৩) ; অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (অর্ধেন্দুশেখর / সঙ্কল্প, অগ্রহায়ণ, ১৩২১) ; হেমেন্দ্রকুমার রায় (যাদের দেখেছি, পৃ. ৮০-৮৫)। তাই সাহেবের পোষাকে সাহেব অর্ধেন্দু মুস্তাফির প্যান্টোমাইম দর্শকের কাছে 'মুস্তাফি সাহেবকা পাক্কা তামাশা' নামে পরিচিত হতে দেরি হয়নি। সংবাদপত্রে এই জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপনে ঐ একই নাম ব্যবহার করা হতে থাকে।

এই 'তামাশা' সর্বপ্রথম চালু হয় ন্যাশনাল থিয়েটারে, ১৮৭৩-এর ১৫ জানুয়ারি, বুধবারে। সেদিন 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র সঙ্গে এই তামাশা অভিনীত হয়েছিল। পরে পরে বিলাতিবাবু, সাবস্ক্রিপসান বুক, প্রাইভেট থিয়েটারের গ্রীণরুম, কুস্তার অঘটন, মডেল স্কুল (রচয়িতা অমৃতলাল বসু), মুস্তাফি সাহেবকা পাক্কা তামাশা, পরীস্থান, মুস্তাফি সাহেবের বক্তৃতা ইত্যাদি অভিনীত হয়েছে। সবগুলিই অর্ধেন্দুশেখরের উদ্যমেই অভিনীত হয় এবং প্রত্যেকটির প্রধান ভূমিকায় অর্ধেন্দুশেখর।

প্রাথমিক উদ্দেশ্যের অন্তরঙ্গে একটি গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। সেই সময়ে সাহেবদের অপেরা হাউসে (রয়্যাল থিয়েটার) 'দেবকার্সন' নামে একজন ইংরেজ অভিনেতা[৩] ভাঁড়দের মতো অভিনয় করে, 'Variety Theatre'-এর আয়োজন করে পয়সা উপার্জন করত। দেবকার্সন প্রায়ই নেটিভ বাঙালিদের আচার ও জীবনধারা নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতেন। তারই প্রতিক্রিয়ায় অর্ধেন্দুশেখর তাঁর প্যান্টোমাইমগুলিতে তীব্র শ্লেষ ও ব্যঙ্গের দ্বারা সাহেবিয়ানা, ফিরিঙ্গিদের জীবনযাপন ও তাদের তথাকথিত সভ্যতা

৩. জাতীয়তাবোধে বিরোধিতা থাকলেও অভিনেতা দেবকার্সনকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিল স্টার থিয়েটার তাঁর মৃত্যুর দিনে (২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৬) অভিনয় বন্ধ রেখে। এবং 'রাজসিংহ' অভিনয় করে (১৪ মার্চ, ১৮৯৬) তাঁর পত্নীর সাহায্যার্থে।

ইত্যাদিকে তীব্র আক্রমণে জর্জরিত করতেন। পরাধীনতার অপমান এবং ইংরেজের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ-এর জবাব অর্ধেন্দুশেখর সেদিন বাঙালির থিয়েটারের মাধ্যমেই দিয়েছিলেন। থিয়েটার করা তাঁর কাছে দেশের কার্য বলেই মনে হয়েছিল। অমৃতলাল বসু তাই অর্ধেন্দুকে 'ন্যাশনাল প্রপার্টি' (নাচঘর, ৫ আশ্বিন, ১৩৩৫) বলেছেন।

দেবকার্সন কাগজে বিজ্ঞাপন দিতেন—'দেবকার্সন সাহেবকা পাক্কা তামাশা'। তার মধ্যে দি বেঙ্গলীবাবু, প্রফেসার, দি স্কুল মাস্টার, দেবকার্সন ইন দি পুলিশ কোর্ট প্রভৃতি পঞ্চরং সাহেব-ফিরিঙ্গি মহলে খুবই উপভোগ্য ছিল। তার বিদ্রূপের একটি নমুনা :

'I am a very Bengalee Baboo / I keep my Shop at Radha Bazar /

I live in Calcutta, eat my Dal Vat / And Smoke my Hooka / etc.'

উত্তরে অর্ধেন্দুশেখর হিন্দি-ইংরেজি মিশিয়ে একটি গান গেয়ে দেবকার্সনকে পাল্টা জবাব দিলেন। সেই ফিরতি জবাবেরই নাম দেওয়া হলো 'মুস্তাফি সাহেবকা পাক্কা তামাশা,' এই তামাশায় তিনি তিনজন সহ-অভিনেতা নিয়ে কাফ্রীসাহেব সেজে বেহালা বাজাতে বাজাতে গান গেয়ে সাহেবদের বিদ্রূপ করতেন :

'হাম বড়া সাহেব হ্যায় ডুনিয়ামে / None can be compared হামারা সাট / Mr. Mustafee name হামারা / চাটগাঁও মেরা আছে বিলাট। / ...coat পিনি Pantaloon পিনি, পিনি মোর trousers / Every two years new suits পিনি / Direct from Chandny Bazar / ...'

সাধারণ রঙ্গালয়ে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর নাটক এবং উপন্যাসের নাট্যরূপ অভিনয় করার ক্ষেত্রে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন অর্ধেন্দুশেখর। গিরিশ প্রমুখের চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথ যখন বারেবারে সাধারণ রঙ্গালয়ে গৃহিত হচ্ছেন না, তখন অর্ধেন্দুশেখর যখন যে রঙ্গালয়ে ছিলেন, সেখানেই বারেবারে রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয় করেছেন। এইভাবে রাজা বসন্ত রায় (বউ ঠাকুরানীর হাট উপন্যাসের নাট্যরূপ), রাজা ও রানী তিনি বারবার অভিনয় করেছেন। বাংলা থিয়েটারে তিনিই প্রথম সম্যকভাবে বুঝেছিলেন রবীন্দ্র প্রতিভাকে। রবীন্দ্রনাথকে তিনি সম্মান করতেন। রবীন্দ্রনাথও অর্ধেন্দুশেখরের অভিনয়ের উচ্চ প্রশংসা করেছেন। এক্ষত্রে তাঁর রমাই ভাঁড় ও প্রতাপাদিত্য চরিত্রাভিনয় স্মরণীয় হয়ে আছে।

এইসব মিলিয়েই অর্ধেন্দুশেখর। অর্ধেন্দুশেখরের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে পরের দিন (১৮-৯-১৯০৮) বেঙ্গলী পত্রিকা লিখেছিল : '...Babu Ardhendu Sekhar Mústafi, the father and founder of native stage in Bengal as well as the first, foremost and unparalled master of the histrionic art...'

অর্ধেন্দুশেখরকে তাই বাদ দিয়ে বাংলা থিয়েটারের আলোচনা সম্ভব নয়। তিনি থিয়েটারের অন্যতম প্রধান স্তম্ভস্বরূপ নাট্যব্যক্তিত্ব। গিরিশচন্দ্রের ভাষায় : 'যতদিন বাঙ্গালায় রঙ্গালয় থাকিবে, কেহ তাঁহাকে ভুলিবে না।—রঙ্গালয়ে অর্ধেন্দুশেখর অমর।'[৪]

৪. অর্ধেন্দুশেখরের মৃত্যুর তিনদিন পরে (৩ আশ্বিন, ১৩১৫) মিনার্ভা থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র প্রদত্ত ভাষণ : 'বঙ্গীয় নাট্যশালায় নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি।'

গিরিশচন্দ্র ও বাংলা থিয়েটার

সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে গিরিশের মৃত্যু পর্যন্ত (১৮৭২-১৯১২) বাংলা থিয়েটার গিরিশচন্দ্রকে (১৮৪৪-১৯১২) বাদ দিয়ে চলতে পারেনি। আবার গিরিশচন্দ্রেরও সমগ্র নাট্যজীবন এই সময়কার থিয়েটারগুলিকে অবলম্বন করেই গড়ে ও বেড়ে উঠেছে। থিয়েটার ও গিরিশচন্দ্রের পারস্পরিক সম্পূরণের মধ্য দিয়েই বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রথম চল্লিশ বছর কেটেছে। 'গিরিশ যুগ' নামাঙ্কিত থিয়েটারের এই সময়কালকে পেশাদারি থিয়েটারের সম্ভাবনা ও সাফল্যের 'সুবর্ণযুগ'ও বলা হয়ে থাকে। সেই গিরিশচন্দ্রকে বাদ দিয়ে যেমন এই যুগের থিয়েটারের আলোচনা সম্ভব নয়, তেমনি সমসাময়িক থিয়েটারের মঞ্চব্যবস্থা ও প্রেক্ষালয় পরিমণ্ডল বিচ্ছিন্ন করে গিরিশচন্দ্রের নাট্যজীবন আলোচনা অসম্ভব।

নাট্যশালার প্রায় সর্বক্ষেত্রেই গিরিশ নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। তিনি ছিলেন সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। ছিলেন একনিষ্ঠ অভিনয় শিক্ষক। মঞ্চাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনে সুনিপুণ। থিয়েটার প্রতিষ্ঠান পরিচালনার 'ম্যানেজারি'তে সুদক্ষ এবং অসাধারণ সংগঠক। থিয়েটারে অভিনয়ের প্রয়োজনেই তিনি নাট্য রচনা শুরু করেন। এবং ক্রমে সে যুগের তথা বাংলা নাট্য জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের মর্যাদা লাভ করেন। একজন মানুষের মধ্যে একসঙ্গে এতগুলি থিয়েটার জগতের গুণাবলী থাকলে, স্বভাবতই সব রঙ্গালয়ই তাঁকে পেতে চাইবে। গিরিশচন্দ্রও নিরলসভাবে নানা রঙ্গালয়ের সঙ্গে পেশাদারি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে তার নাট্যক্রিয়াকর্ম করে গেছেন। নাটক রচনা, নাট্যরূপ দেওয়া, সঙ্গীত রচনা, অভিনয় শিক্ষাদান, নাট্য পরিচালনা, মঞ্চ পরিকল্পনা এবং অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করা—সব করেছেন।[১] সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যিক থিয়েটারের ব্যবসায়িক ও পেশাগত দিক নিয়ন্ত্রণ করতে হয়েছে। অনেক সময়েই নিজে উদ্যোগী হয়ে নতুন নতুন থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রথম দিকে নিজে থিয়েটারের মালিক হয়েছেন। পরে অবশ্য পারিবারিক কারণে তিনি আর কখনোই কোনো মঞ্চের মালিক হননি। কিন্তু অন্যে মালিক হলেও, তিনিই সেই প্রতিষ্ঠিত থিয়েটারের প্রধান উদ্যোগী এবং প্রাণপুরুষ হয়ে থেকেছেন। তাই গিরিশচন্দ্রকে বাদ দিয়ে যেমন এই সময়কালের থিয়েটারের ইতিহাস আলোচনা করা যায় না, তেমনি এই সময়কালের পরিমণ্ডল বাদ দিলে গিরিশচন্দ্রকে পুরোপুরি বুঝে ওঠাও সম্ভব হবে না। একটা বাদ দিয়ে আরেকটা দেখাও গেলে—নিঃসন্দেহে সে আলোচনা অসম্পূর্ণ হয়ে পড়তে বাধ্য।

গিরিশের নাট্যজীবন মোট পঁয়তাল্লিশ বছরের। বাগবাজারের এমেচার থিয়েটারের

১. অনুসন্ধান পত্রিকা তখন (৩০. ৯. ১৮৯০) লিখেছিল : 'একা গিরিশ আর ক'দিক রাখিবেন? অভিনয় করিবেন, না সঙ সাজিবেন, না নাটক লিখিবেন?'

হয়ে ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' নাটকে নিমচাঁদ চরিত্রে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে গিরিশের নাট্যজীবনের শুরু। শ্যামবাজার নাট্য সমাজের নামে 'লীলাবতীতে' ললিতমোহন করেন। এই দল ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করে অভিনয় শুরু করলে গিরিশ প্রথমে তাতে ছিলেন না, পরে 'কৃষ্ণকুমারী'র অভিনয়ের সময়ে (১৮৭৩) 'এমেচার' হিসেবে যোগ দেন এবং ভীমসিংহের ভূমিকায় প্রভূত খ্যাতিলাভ করেন। থিয়েটার জীবনের শুরু ও প্রতিষ্ঠার পর থেকে তাঁকে আর থেমে থাকতে হয়নি। তারপরে নিজের মালিকানায় 'ন্যাশনাল থিয়েটার' কিছুদিন চালান। প্রতাপচাঁদ জহুরি 'ন্যাশনাল থিয়েটারে'র মালিক হয়ে গিরিশকে পেশাদারিভাবে থিয়েটারে নিয়ে আসেন। গিরিশ ১৫০ টাকা মাইনের চাকুরি জীবনের নিরাপত্তা ছেড়ে প্রতাপ জহুরির থিয়েটারে একশো টাকার মাইনেতে যোগ দেন। এরপর থেকে গিরিশ সারাজীবন থিয়েটারের সঙ্গে পেশাগতভাবে নিজের জীবনকে জড়িয়ে ফেলেন। থিয়েটার ছাড়া অন্য কোথাও অন্য কোনো জীবিকা গ্রহণ করেননি।

ব্যবসায়িক থিয়েটার পেশাগত ভাবে পরিচালনার নিয়মনীতি এখান থেকেই চালু হল। এখানেই অভিনয় করতে করতে নাটকের অভাবে একেবারে 'দায়ে পড়ে' গিরিশচন্দ্রকে নাট্য রচনা শুরু করতে হয়। রঙ্গমঞ্চের শূন্য উদর পূর্ণ করতে নাটক রচনায় হাত দিতে গিয়ে বেতনভোগী গিরিশ পেশাদারি মঞ্চের 'প্লে-রাইট' হয়ে পড়লেন। থিয়েটারের অন্য কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নাট্যকার জীবনের অধ্যায়ও অব্যাহতভাবে চলতে লাগল।

তাঁর সমকালীন প্রায় প্রত্যেকটি নাট্যালয়ের সঙ্গেই তিনি যুক্ত ছিলেন। গুর্মুখ রায়ের স্টার থিয়েটার, হাতীবাগানের স্টার থিয়েটার, এমারেল্ড, মিনার্ভা, ক্লাসিক, কোহিনূর প্রভৃতি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ রঙ্গালয়ের অনেকগুলির প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোগী তিনি। আবার এগুলির সঙ্গে তিনি বারে বারে যুক্ত হয়ে থিয়েটারের গতিধারাকে নিজের মতো নিয়ন্ত্রণ করে নিয়ে গেছেন।

কর্মজীবনের ৪৫ বছরের মধ্যে ৩৫ বছর তিনি নাট্যরচনা করেছেন। গিরিশ নাটক লেখা শুরু করেন তাঁর ৩২ বছর বয়সে। বেঁচে ছিলেন ৬৭ বৎসর ১১ মাস। এই সময়ের মধ্যে অনলস নাটক লিখে গিয়েছেন তিনি।

নিজের মালিকানায় 'ন্যাশনাল থিয়েটারে' থাকাকালীন গিরিশ তিনটি ছোট ছোট গীতিনাট্য অপেরা রচনা করেন মুকুটাচরণ মিত্র ছদ্মনামে। অকালবোধন, আগমনী, দোললীলা। এই সময়ে তিনি বঙ্কিমের উপন্যাস (কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, দুর্গেশনন্দিনী), নবীনচন্দ্র সেনের পলাশীর যুদ্ধ, মাইকেলের মেঘনাদবধ, দীনবন্ধুর যমালয়ে জীবন্ত মানুষ ইত্যাদির নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। ধারাবাহিক নাটক লিখতে শুরু করলেন প্রতাপ জহুরির থিয়েটারে এসে। মায়াতরু, আলাদীন, মোহিনীপ্রতিমা, আনন্দরহো, রাবণবধ, সীতার বনবাস, অভিমন্যুবধ, লক্ষ্মণবর্জন, সীতার বিবাহ, রামের বনবাস. সীতাহরণ, মলিনমালা, ভোটমঙ্গল, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস। চুক্তিবদ্ধভাবে তাঁকে নাটক গীতিনাট্য ও নক্সাপ্রহসন

লিখে যেতে হয়। 'রাবণবধ' অভিনয়ে সার্থক হয় এবং 'সীতার বনবাস' দর্শক আনুকূল্য লাভ করে। চুক্তিবদ্ধ প্লে-রাইটের বিড়ম্বনা একটা ঘটনা থেকে বোঝা যাবে। সীতার বনবাস দর্শক আনুকূল্য পেলে প্রতাপ জহুরি বুঝেছিলেন সীতার দুঃখকথা এবং লবকুশের গান এই নাটকের সাফল্যের মূলে। সীতার বনবাসের পর গিরিশ অভিমন্যুবধ লিখলেন এবং এখানে অভিনীত হয়ে দর্শক আকর্ষণে ব্যর্থ হলে প্রতাপ জহুরি গিরিশকে বলেছিলেন—'বাবু, যব দোসরা কিতাব লিখগে তব্ ফিন ওহি দুনো লেড়কা ছোড় দেও।'—এবার গিরিশ লিখলেন 'লক্ষ্মণ বর্জন' এবং নিয়ে এলেন ঐ 'দুনো লেড়কা' লব-কুশকে। তাদের ছেড়ে দিলেন তাঁর নাটকের মাধ্যমে মঞ্চে। অকিঞ্চিৎকর এই নাটক চলল ভালো, উচ্চমানের নাটক অভিমন্যুবধ ব্যর্থ হলো। ব্যবসায়ি জহুরি লক্ষ্মীর কৃপা কোথায় বুঝেছিলেন। প্লে-রাইট গিরিশ উপায়ান্তরবিহীনভাবে সেই ধরনের নাটক লিখতে বাধ্য হলেন।

গুর্মুখ রায়ের স্টার উদ্বোধন হল গিরিশের নাটক 'দক্ষযজ্ঞ' দিয়ে। তারপরে এখানে অভিনয়ের জন্য লিখলেন ধ্রুবচরিত্র, নলদময়ন্তী। গুর্মুখ স্টার ছেড়ে চলে গেলে, তারপর লিখলেন কমলে কামিনী, বৃষকেতু, শ্রীবৎস চিন্তা, চৈতন্যলীলা, প্রহ্লাদচরিত্র, চৈতন্যলীলা (২য় ভাগ), প্রভাসযজ্ঞ, বুদ্ধদেবচরিত, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর, বেল্লিকবাজার, রূপসনাতন, নিমাই সন্ন্যাস। বোঝা যায় এই সময়ে গিরিশের নাট্যরচনার ক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত। স্টারে সেই সময়ে মঞ্চ মালিকের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। গিরিশই ছিলেন সর্বেসর্বা। নিজের খুশি মতো নাটক রচনার সুযোগ পেয়ে গিরিশ তাঁর শ্রেষ্ঠ কয়েকটি নাটক এই সময়ে রচনা ও অভিনয় করেন। 'চৈতন্যলীলা' তো বাংলা থিয়েটারে অভিনয়ের কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। নলদময়ন্তী, বুদ্ধদেবচরিত, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর, রূপসনাতন, প্রহ্লাদচরিত্র তাঁর পৌরাণিক নাটকের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা।

এমারেল্ড থিয়েটারে কুড়ি হাজার টাকা বোনাস ও তিনশো পঞ্চাশ টাকা মাইনেতে যোগ দিয়ে গিরিশ লিখেছিলেন খুব কম নাটক। পূর্ণচন্দ্র, বিষাদ। হাতীবাগানে নতুন স্টার থিয়েটার তৈরির উদ্যম নিয়ে সঙ্গীসাথীদের নিজের বোনাসের ষোল হাজার টাকা দিয়ে দেন। এমারেল্ডে চুক্তিবদ্ধ থাকার জন্য 'সেবক' ছদ্মনামে লুকিয়ে লুকিয়ে লিখেছেন 'নসীরাম' ; যা কিনা হাতীবাগানের স্টারের উদ্বোধন রজনীতে অভিনীত হল। স্টারের ড্রামাটিক ডিরেক্টার থাকাকালীন লিখলেন প্রফুল্ল, চণ্ড, মলিনাবিকাশ, মহাপূজা, হারানিধি, কালাপাহাড়, হীরক জুবিলী, পারস্য প্রসূন, হাল্কা নৃত্যগীতের ছোট নাটক। শুধুই অভিনয়ের জন্য লেখা, প্রফুল্ল তাঁর প্রথম সামাজিক নাটক। এর আগে গিরিশ কখনো সামাজিক নাটক লেখেন নি। সামাজিক নাটক লেখা আর 'নর্দমা ঘাঁটা' তাঁর কাছে একই রকম মনে হতো। কিন্তু তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'সরলা' (অমৃতলাল বসু কৃত) খুবই জনপ্রিয় হলে গিরিশকে মঞ্চের চাহিদায় লিখতে হল 'প্রফুল্ল'। সেই সামাজিক নাটক লিখতেই হল তাঁকে। তারপরে হারানিধি, মায়াবসান। পরে আরো আরো।

মিনার্ভার উদ্বোধন হয় গিরিশের অনুবাদ করা 'ম্যাকবেথ' নাটক দিয়ে। গিরিশ এখানে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন ম্যানেজার, নাট্যকার ও শিক্ষক হিসেবে। প্রচুর পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে 'ম্যাকবেথ' অভিনয় করা হলো। কিন্তু এই বিশ্ববিশ্রুত নাটক দর্শক আকর্ষণে ব্যর্থ হল। ভালো নাটকের জন্য তাঁর এতো পরিশ্রমের এই ব্যর্থতা লক্ষ্য করে গিরিশ বলেছিলেন—'নাটক দেখিবার যোগ্যতা লাভে ইহাদের এখনও বহু বৎসর লাগিবে, নাটক বুঝিবার সাধারণ দর্শক এখনও রঙ্গালয়ে তৈয়ারী হয় নাই। পেশাদার থিয়েটার প্রতিষ্ঠানে আমার যে আপত্তি ছিল—ইহাও তাহার একটি কারণ।'

ম্যাকবেথ ব্যর্থ হলে গিরিশ লিখলেন মুকুল মুঞ্জরা ও আবু হোসেন। অচিরাৎ দর্শক-পরিপূর্ণ হয়ে গেল প্রেক্ষাগৃহ। ম্যাকবেথ ছেড়ে আবু হোসেনের প্রতি দর্শকের পক্ষপাতিত্ব গিরিশের নাট্যভাবনাকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করল। শেক্সপীয়র এবং অন্যান্য ভালো বিদেশী নাটকের অনুবাদ করে অভিনয়ের যে পরিকল্পনা গিরিশের ছিল ম্যাকবেথের তিক্ত অভিজ্ঞতায় তিনি তা থেকে নিরস্ত হলেন। এবারে লিখলেন অনেকগুলি হাল্কা প্রহসন ও নাচ-গানের নাটক। সপ্তমীতে বিসর্জন, বড়দিনের বখশিস, স্বপ্নের ফুল, সভ্যতার পাণ্ডা, ফণীর মণি, পাঁচ কনে। বড়ো নাটক বলতে একমাত্র 'জনা'। 'জনা' তাঁর উল্লেখযোগ্য ভালো নাটক। অভিনয়েও সাফল্যলাভ করেছিল।

ক্লাসিক থিয়েটারে যোগ দেন তিন বছরের এগ্রিমেন্টে নাট্যকার, নাট্যশিক্ষক ও নাট্যাচার্যরূপে। বছরে চারটি নাটক (দুটি বড়) লিখে দেবার চুক্তিতে আবদ্ধ হন। ক্লাসিকের উদ্বোধন হয় গিরিশেরই পুরনো নাটক নল-দময়ন্তী ও বেল্লিক বাজার দিয়ে। তারপরে ক্লাসিকে অভিনয়ের জন্য লেখেন—হাল্কা গীতিনাট্য ও প্রহসন—দিলদার, অভিশাপ, অশ্রুধারা, আয়না, মনের মতন। বড়ো নাটকের মধ্যে পাণ্ডব-গৌরব ও সৎনাম উল্লেখযোগ্য। সৎনাম তো মুসলমান দর্শকদের আপত্তিতে বন্ধ করে দিতে হয় লোকসান সত্ত্বেও। একমাত্র 'পাণ্ডব-গৌরব' তার ভালো পূর্ণাঙ্গ নাটক।

দ্বিতীয় দফায় মিনার্ভায় আবার এসে তিনি শেষদিকটা এখানেই কাটান। মাঝে মাঝে অন্য থিয়েটারেও গেছেন। ১৮৯৮ থেকে ১৯০৭-এর দীর্ঘ সময়ে তিনি গীতিনাট্য প্রহসন লেখেন—মণিহরণ, নন্দদুলাল, হরগৌরী, বাসর, য্যায়সা-ক্যা-ত্যায়সা, ছটাকী। স্টেজে অভিনয় করছেন সীতারাম, আবার গ্রীনরুমে বসে মুখে মুখে বলে যাচ্ছেন মণিহরণ। তারই ফাঁকে ২৮টি গানও লিখেছিলেন। সেই নাটক রিহার্সাল দিয়ে পরের রবিবার অভিনয় করা হলো।

পূর্ণাঙ্গ নাটক বলিদান, সিরাজদৌল্লা, মীরকাশিম, ছত্রপতি শিবাজী। ১৯০৫-এর 'বঙ্গ ভঙ্গ' প্রতিরোধে যে প্রবল আন্দোলন বাংলায় গড়ে ওঠে, তার মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশানুরাগ মূর্ত হয়ে উঠেছিল। রঙ্গমঞ্চও সেই জনজোয়ারের আবেগকে অস্বীকার করতে পারেনি। জনমানসের স্পন্দন উপলব্ধি করে সাধারণ রঙ্গালয় ইতিহাসের কাহিনী নিয়ে স্বদেশপ্রেমের নাটক অভিনয় করতে থাকে। মিনার্ভায় গিরিশ পর পর এই রকমের নাটকগুলি লিখে গেলেন। অভিনয়ে অভূতপূর্ব জনসমর্থনও লাভ করা গেল। গিরিশ এর

আগে অকিঞ্চিৎকর দু-একটি ছাড়া আর কোনো ঐতিহাসিক বা দেশাত্মবোধের নাটক রচনা করেননি। কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের সময়ে জনসমর্থনের প্রত্যাশায় ও স্বদেশানুরাগের দাবীতে গিরিশ লিখে ফেললেন সিরাজদৌল্লা, মীরকাশিম, ছত্রপতি শিবাজী।

তৃতীয় দফায় মিনার্ভায় থাকাকালীন (১৯০৮-১১) লিখেছিলেন শাস্তি কি শান্তি, শঙ্করাচার্য, অশোক, তপোবন।

গিরিশকে নাটক লিখতে হয়েছে তাঁর সময়কালীন থিয়েটারের ব্যবস্থা ও পরিবেশের মধ্যে থেকে। তার মধ্যে মঞ্চমালিক যেমন আছে, তেমনি রয়েছে দর্শক সম্প্রদায়। আবার মঞ্চের অভিনেতা-অভিনেত্রী, গায়ক-গায়িকা ও নৃত্যশিল্পী। সব কিছুকে মাথায় রেখেই নাটক লিখতে হয়েছে। এবং বিশুদ্ধ নাট্যরসের চেয়ে মঞ্চ সাফল্যের তাগিদই সেখানে কাজ করেছে বেশি। যাত্রার রসপুষ্ট সাধারণ দর্শকের মর্মাশ্রয়ী নাটক লিখতে গিয়ে তিনি ধর্মাশ্রয়ী পৌরাণিক নাটক লিখলেন, নর্দমার কাদা ঘাঁটতে হবে জেনেও লোকচাহিদার জন্যে সামাজিক নাটক-প্রহসন-নক্সা লিখলেন। গীতিনাট্য-পঞ্চরং লিখতে হলো অজস্র, রঙ্গমঞ্চের উদরপূর্তি ও সাধারণ দর্শকের মানসপূর্তির জন্য। তাছাড়া তখনকার চলতি প্রথামতো দুর্গাপূজা, জন্মাষ্টমী, দোল, বড়দিন, ভোট, মজাদার কেলেঙ্কারীর কোনো ঘটনা—এই সমস্ত তাৎক্ষণিক বিষয়ে নাট্যরচনা করতে হয়েছে। তার বাইরে পৌরাণিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে অনেকগুলি নাটক লিখেছেন। পরবর্তীকালে সেইসব নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করেন -'গীতিনাট্যের কথা বাদ দিলে তাঁহার প্রায় পঁয়তাল্লিশখানি নাটকের বদলে চার-পাঁচখানি মাত্র লেখায় তাঁহার যশোহানি ঘটিত না।'

চার-পাঁচখানি মাত্র নাটক লিখলে তাঁর যশোলাভ কতোখানি ঘটত বলা মুশকিল, তবে একথা ঠিক, রঙ্গালয়ের ক্ষুধা এবং দর্শকের চাহিদা মেটাতে আবার শতখানেক নাটক না লিখলে, নাট্যকারের যে মানহানি ঘটতো, তাতে সন্দেহ নেই। নাট্যালয়ে অভিনয়ের ধারাকে সচল ও প্রাণবন্ত রাখতে গিরিশকে অনবরত ও অপর্যাপ্ত নাট্য রচনা করে যেতে হয়েছে। তদানীন্তন মঞ্চব্যবস্থা ও প্রেক্ষালয় পরিস্থিতি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিরিশচন্দ্রকে শুধুমাত্র সাহিত্য শিল্পগত দিক দিয়ে বিচার করতে গিয়ে পরবর্তী অনেক সমালোচকই এমন মন্তব্য করেছেন।

সর্বসাধারণের জন্য নাটক লিখতে হত বলে, নাটক মহড়ার সময়ে গিরিশ মালিক থেকে রঙ্গমঞ্চের দারোয়ান, সিফটার সবাইকে ডেকে দেখাতেন। মন্মথমোহন বসুর 'বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ' গ্রন্থের বিবরণ থেকে দেখছি যে, গিরিশ স্ত্রী-পুরুষ, পণ্ডিত মূর্খ সকলের আনন্দ দানের জন্য নাটক লিখতেন বলে পণ্ডিতের সঙ্গে মূর্খেরও নাটকখানি কেমন লাগছে তা দেখার জন্যই এমন ব্যবস্থা করতেন। প্রয়োজনে কারো অপছন্দের অংশ পরিবর্তন করতেন। এইভাবে 'সিরাজদৌল্লা' নাটকের প্রথম দৃশ্যটি তিনবার পরিবর্তন করে বর্তমান দৃশ্যটি তৈরি করেছিলেন।

গিরিশকে নাটক লিখতে হয়েছে স্টেজের প্রয়োজনে। স্টেজে অভিনয়ের সাফল্যই হচ্ছে দর্শকের ভিড়। অন্তত বাণিজ্যিক থিয়েটারের হিসেব তাই বলে। গিরিশকে তাই স্টেজ, জনরুচি, নিজের দলের শিল্পী সবার দিকে নজর রাখতে হয়েছে। সমসাময়িক অন্য নাট্যদলগুলির সঙ্গে মঞ্চে প্রতিযোগিতা, যাত্রার প্রচণ্ড দর্শক-আকর্ষণ, তার প্রকরণ, সংস্কৃত রীতি ও ইংরেজি নাটকের আদর্শ—সবগুলি মাথায় রেখে, সব মিলে তাঁর নাটকে যে নতুন নাট্যরীতি গড়ে উঠেছে তাতে এ্যাকশান ও ইমোশান মিশে গেছে—পরে আবার এ্যাকশানের ওপর সেন্টিমেন্ট বেশি হয়ে গেছে। সীমিত বাছাই সমঝদার দর্শকের সামনে নিজের প্রেরণায় নাটক রচনা নয়, সর্বসাধারণের সামনে নাটক হাজির করতে হয়েছে। তাঁর কোনো নাটকই তিনি রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের চাহিদা ছাড়া রচনা করেননি। কখনো কখনো এই গণ্ডী ভেঙে স্বাধীন নাট্যসত্তার বিকাশে যখন আকাশে ডানা মেলতে চেয়েছেন, তখনই বাস্তবের প্রেক্ষাগৃহের শূন্য আসন অভিসম্পাতের মতো তাঁকে জর্জরিত করেছে। এই নিয়ে তাঁর আক্ষেপোক্তি এখনো কানে বাজে।

গিরিশের সাক্ষ্য থেকেই জানা যায় যে, তিনি মনে মনে নাটক রচনা করতে চেয়েছিলেন, 'শুধু Internal facts and internal struggle' নিয়ে, কারণ তাঁর মত ছিল 'internal actions এঁকে দেখানোই best literary art'. কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, 'দেশের লোকের apathy'র জন্যে শেষ পর্যন্ত গিরিশ মনের ইচ্ছা কার্যে পরিণত করতে পারেননি পুরোপুরি। তবুও গণ্ডীবদ্ধতার মধ্যেও তিনি যা করেছেন, তার জন্যে বাংলা নাটক ও নাট্যশালা তাঁকে চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

ইংরেজি নাটক থেকে সৃষ্ট বাংলা নাটক ইংরেজিয়ানার দিকে মোড় ফিরেছিল। আবার জনরুচিতে ছিল তৎকালীন গীতাভিনয় যাত্রার আকর্ষণ। গিরিশ ইংরেজি নাটক এবং বাংলা যাত্রার টানাপোড়েনে পথ হারাননি। জাতীয় জীবনের মূল ভাবনার সঙ্গে বাংলা নাটককে তিনি বেঁধে দিতে পেরেছিলেন। যাত্রা থেকে মুখ ফিরিয়েছিল শিক্ষিত বাঙালি, আর ইংরেজি নাটকের সঙ্গে সাধারণ বাঙালির কোনো নাড়ীর যোগ ছিল না। গিরিশ এই দুটোর হাত থেকেই বাংলা নাটককে বাঁচিয়েছিলেন। বাঙালির জাতীয় ভাবনাকে একটা সুনির্দিষ্ট পথ দিয়েই তিনি নাটকের মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। সে যুগের রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে শিক্ষিত বাঙালির ঘৃণা ও অনীহা উপেক্ষা করে, নিজের সমগ্র জীবনকে তিনি রঙ্গালয়ের সঙ্গেই জুড়ে দিয়েছিলেন। এবং নিয়ত প্রচেষ্টায় বাংলা মঞ্চকে ধারাবাহিকভাবে সামনে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। সে যুগের মঞ্চের 'গরুড়ের ক্ষুধা' মেটাতে তাঁকে অনেক কিছুই করতে হয়েছে—সেগুলির জন্যে তাঁকে সমকাল ও পরবর্তীকালে সমালোচকদের নিন্দা-প্রস্তাব সহ্য করতে হয়েছে—কিন্তু নির্দ্বিধায় অবিচল বিশ্বাসে তিনি মঞ্চকে এবং তার সঙ্গে বাংলা নাটককে বাঁচিয়ে গেছেন। বাংলা নাটককে বাঙালির প্রাণের জিনিসে পরিণত করে গেছেন।

অভিনয় শিক্ষক হিসাবে তিনি অতি নিষ্ঠায় সে যুগের অনেককেই অভিনয় শিক্ষা দিয়েছেন। অর্ধেন্দুশেখরের মতো তাঁরও হাতে অনেক শ্রেষ্ঠ অভিনেতা তৈরি হয়েছেন—

তাঁরাই পরবর্তী সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনয়ের উচ্চমান বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। সে যুগের শ্রেষ্ঠ বহু অভিনেতাই তাঁর হাতে তৈরি। মতিলাল সুর, ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু), মহেন্দ্রলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু), নীলমাধব চক্রবর্তী, চুনীলাল দেব তাঁরই হাতে গড়া সব শিল্পী।

১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনেত্রী গৃহিত হলে, বাংলা নাটকের ধারাই কিছুটা পাল্টে যায়। নৃত্যগীত-পটিয়সী অভিনেত্রীদের জন্য গীতিনাট্য-অপেরা প্রচুর লিখিত ও অভিনীত হয়েছে। কিন্তু এদের সকলেই অভিনয়ে পারদর্শী ছিলেন না। সেরকম শিক্ষাদীক্ষাও ওদের ছিল না। প্রত্যেকের উচ্চারণ ক্ষমতা ও ভাবপ্রকাশের পরিশীলন ছিল না। এইসব অভিনেত্রীদের বেশিরভাগই গিরিশের হাতে ক্রমে ক্রমে তৈরি হয়েছেন। গিরিশচন্দ্র তাঁদের জন্য নাটকে নারী চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। তাদের উচ্চারণ উপযোগী সহজ শব্দ ব্যবহার করে সংলাপ রচনা করেছেন। এবং বিখ্যাত 'গৈরিশ ছন্দ' সৃষ্টির মূলেও এই অভিনেত্রীদের সংলাপ উচ্চারণের সুযোগ-সুবিধার প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে।[২] তখনকার অভিনেত্রীদের 'আকৃতি' ও 'অভিনয় ক্ষমতা'র দিকে লক্ষ্য রেখেই তাঁর নাটকের নারী চরিত্র ও সংলাপ সৃষ্টি করেছেন। ফলে অভিনেত্রীরা খুব সহজে ও কম পরিশ্রমে সেই চরিত্রে রূপদান করতে পারতেন। অভিনেত্রীরাও তাই গিরিশের নাটকে এবং তাঁর শিক্ষাদানে অভিনয় করতে পেরে সার্থকতা লাভ করত। এবং ক্রমে ক্রমে নিজেদের অভিনেত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারত। গিরিশের মৃত্যুর পর স্মরণসভায় প্রায় সব অভিনেত্রীই অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে এই কথা স্বীকার করেছেন। (নাট্য-মন্দির, আশ্বিন-কার্তিক, ১৩১৯, পৃঃ ৬৮-৭৭)। গিরিশের নাটকে এই নারী চরিত্র ও তাদের সংলাপ বিচারে তৎকালীন থিয়েটারের পরিমণ্ডল তাই অবশ্যই স্মরণযোগ্য।

সমকালীন হাতে গড়ে-পিটে তৈরী করা এইসব অভিনেত্রীদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে বাংলা মঞ্চের খ্যাতিমান শিল্পীতে পরিণত হয়েছিলেন। বিনোদিনী, তিনকড়ি, তারাসুন্দরী, কুসুমকুমারী এদের অন্যতমা। সমাজে নিন্দিত ও অপমানিত এইসব অভিনেত্রীদের গিরিশ অসীম সহনশীলতায় ও নিষ্ঠায় শিল্পী হিসেবে তৈরি করেছিলেন। অপবাদ, নিন্দা ও দোষত্রুটির যতো গরল কণ্ঠে ধারণ করে গিরিশ নীলকণ্ঠের মতো বাংলা মঞ্চের অভিনয়ের ধারাকে অব্যাহত ও গতিশীল রেখেছিলেন।

গিরিশ নিজেও অসামান্য ভালো অভিনেতা ছিলেন। ট্রাজিক চরিত্র অঙ্কনে তাঁর খুবই পারদর্শিতা ছিল। ভারী ও গম্ভীর কণ্ঠস্বরের অধিকারী গিরিশ কিছুটা রোমান্টিক ধরনের অভিনয়ের পক্ষপাতী ছিলেন। মঞ্চে তাঁর ব্যক্তিত্বময় উপস্থিতি ও চরিত্রচিত্রণের কুশলতা দর্শকদের আবেগবিহ্বল ও মুগ্ধ করে রাখত। নিমচাঁদ (সধবার একাদশী), ভীমসিংহ (কৃষ্ণকুমারী), ক্লাইভ (পলাশীর যুদ্ধ), রাম (রাবণ বধ) ম্যাকবেথ (ম্যাকবেথ), বিদূষক (জনা), যোগেশ (প্রফুল্ল), কঞ্চুকী (পাণ্ডবগৌরব), করুণাময় (বলিদান), করিমচাচা

২. দর্শন চৌধুরী—'বঙ্গরঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রী গ্রহণ ও তৎকালীন প্রতিক্রিয়া'। উনিশ শতকের নাট্যবিষয় (১৯৮৫) পৃঃ ১০১-২।

(সিরাজদৌল্লা), পশু পতি (মৃণালিনী) নগেন্দ্রনাথ (বিষবৃক্ষ), রঙ্গলাল (ভ্রান্তি) প্রভৃতি বিভিন্ন জাতের চরিত্রাভিনয়ে গিরিশ অভিনয়ের নতুন ধারা তৈরি করেছিলেন।

তিনি নিজে অভিনেতা ও নাট্যকার ছিলেন বলে, তাঁর অভিনয়-জীবনের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নাটকের প্রধান চরিত্রগুলিও পরিবর্তিত হয়েছে। প্রথম জীবনের নাটকের প্রধান চরিত্র যৌবনদীপ্ত পুরুষ। মধ্যবয়সে প্রধান চরিত্রগুলি মধ্যবয়সী হয়ে গেছে। পরিণতকালে চরিত্রগুলি পরিণত বয়স্ক। ১৮৮১-তে রাম (রাবণবধ), ১৮৯৫-তে যোগেশ (প্রফুল্ল) এবং ১৯০৫-তে করুণাময় (বলিদান) চরিত্র গিরিশের ক্রমবিবর্তনের স্বাক্ষরবাহী। অভিনেতা ও নাট্যকার একই ব্যক্তি হলে নাট্য রচনায় তাঁর প্রভাব কখনোই অস্বীকার করা যায় না।

গিরিশের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা থিয়েটার পরমুখাপেক্ষী ছিল। মধুসূদন, দীনবন্ধুর নাটক, বঙ্কিমের উপন্যাসের নাট্যরূপ অভিনীত হচ্ছিল। তারপরে মঞ্চে নাটকের অভাবে, 'দুর্ভিক্ষে বিচারহীন কদন্ন আহারের মতো,' যা তা নাটক লেখা ও অভিনীত হতে থাকল। রঙ্গমঞ্চ প্রাণশূন্য হয়ে পড়ল। গিরিশ এই সময়েই শুধু অভিনয় নয়, নাট্যবাণীর পূজার প্রধান উপকরণ, তার প্রাণ, তার অন্ন—নাটক রচনা শুরু করলেন। গিরিশ যেমন অনেক নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোগী হলেন, তেমনি, অন্ন দিয়ে তাদের প্রাণরক্ষা করেছিলেন। বরাবর স্বাস্থ্যকর আহার দিয়ে তাকে পুষ্ট করেছিলেন, মজ্জায় মজ্জায় রসসঞ্চার করে তাকে পরিপূর্ণ ও আনন্দপূর্ণ করে তুলেছিলেন। আর সেই কারণেই গিরিশচন্দ্র 'ফাদার অফ দি নেটিভ ষ্টেজ।' নাট্যকার ও নাট্য পরিচালক অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের তাই মত : 'ইহার খুড়া- জ্যাঠা কেহ কোনদিন ছিল না। ইহা একপ্রকার অভিভাবক-শূন্য বেওয়ারিশ অবস্থায় টলিতেছিল, পড়িতেছিল, ধূলায় গড়াইতেছিল। যে অমৃত পানে বাঙ্গালায় নাট্যশালা এই পঞ্চাশ বৎসরাধিক [কাল] বাঁচিয়া আছে, প্রকৃতপক্ষে সে অমৃতের ভাণ্ড বহন করিয়া আনিয়াছিলেন গিরিশচন্দ্র।' (রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর)।

১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জুলাই 'বলিদান' নাটকে করুণাময়ের ভূমিকায় তাঁর শেষ অভিনয়। এদিন অভিনয় চলাকালীন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার মাঝরাত্রে ১-২০ মিনিটের সময় তাঁর মৃত্যু হয়। তাই ইংরেজিতে ৯ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার তাঁর প্রয়াণ দিবস হওয়া উচিত। যদিও বাংলা মতে ১৩১৮ সালের ২৫ মাঘ তাঁর মৃত্যু দিবস।

অভিনয়ে, অভিনয় শিক্ষাদানে, মঞ্চাধ্যক্ষের কাজে, থিয়েটারের ম্যানেজারিতে এবং নাট্য রচনায় গিরিশ বাংলা থিয়েটারকে বাঁচিয়ে রাখেন। বাংলা সাধারণ রঙ্গালয় ও নাটকের প্রথম পঞ্চাশ বছর তাই গিরিশ নামাঙ্কিত হয়েছে শুধু তাঁর অবস্থানের জন্য নয়, হয়েছে তাঁর কার্যগুণাবলীর জন্যই।

সাধারণ রঙ্গালয় ও রবীন্দ্রনাথের নাটক

রবীন্দ্রনাথের জন্মের (১৮৬১) এগারো বছরের মধ্যেই জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির অনতিদূরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ন্যাশনাল থিয়েটার (১৮৭২)। বছর ঘুরতেই ন্যাশনাল থিয়েটার ভেঙে গেছে, তৈরি হয়েছে নিজস্ব বাড়ি নিয়ে বেঙ্গল থিয়েটার (১৮৭৩) এবং গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার (১৮৭৩)। ব্যবসায়িক ও পেশাদারি সাধারণ রঙ্গালয় মালিকানা ভিত্তিক ও মুনাফাভিত্তিক উদ্দেশ্য ও আদর্শ নিয়ে চলতে শুরু করেছে।

সাধারণ রঙ্গালয়ে রবীন্দ্রনাথের নতুনদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা নাটকগুলি অভিনীত হয়ে সাফল্য লাভ করেছে। ঠাকুর বাড়ির মেয়ে পুরুষ সবাই একযোগে পুরো থিয়েটার ভাড়া নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অশ্রুমতী' অভিনয় দেখেছে। সাধারণ রঙ্গালয়ে নতুনদার নাটক অভিনীত ও প্রশংসিত হওয়াতে রবীন্দ্রনাথ উৎসাহিত হয়েছিলেন। তবে প্রথম যুগে রবীন্দ্রনাথের নাটক বা কাব্যনাট্য-গীতিনাট্যগুলি লেখা হয়েছিল তাঁদের পরিবারের নিজস্ব প্রয়োজনার জন্যই।

প্রতাপচাঁদ জহুরির মালিকানায় ন্যাশনাল থিয়েটারে ম্যানেজার কেদার চৌধুরী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পূর্ব অভিনীত 'স্বপ্নময়ী' নাটকের অভিনয় করালেন (সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩)। তখনো রবীন্দ্রনাথের কোনো নাটক লিখিত বা প্রকাশিত হয়নি। সদ্য বেরিয়েছে উপন্যাস 'বউ ঠাকুরানীর হাট' (১৮৮৩)। এর আগে নানা উপন্যাসের প্রচুর নাট্যরূপ বাংলা থিয়েটারে অভিনীত ও অভিনন্দিত হয়েছে। কেদার চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের নতুন উপন্যাসটির নাট্যরূপ দিয়ে নাম রাখলেন **'রাজা বসন্ত রায়'**। অভিনীত হল প্রতাপচাঁদ জহুরির ন্যাশনাল থিয়েটারে, ৩ জুলাই, ১৮৮৬। রবীন্দ্রনাথের তখন বয়স ২৫ বৎসর। ততদিনে প্রতাপচাঁদ মালিকানা ছেড়ে দিয়েছেন, ন্যাশনালের 'লেসী' হয়েছেন ভুবনমোহন নিয়োগী। রবীন্দ্রনাথও তখন রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠেন নি।

সাধারণ রঙ্গালয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রবেশ ঘটল তাঁর নাটক নিয়ে নয়, সদ্য প্রকাশিত উপন্যাসের নাট্যরূপ নিয়ে। 'রাজা বসন্ত রায়' নাটকে অভিনয় করলেন সেযুগের খ্যাতনামা অভিনেতা-অভিনেত্রীরা।

> অর্ধেন্দুশেখর—রমাই ভাঁড়। রাধামাধব কর—বসন্ত রায়। মতিলাল সুর—প্রতাপাদিত্য। মহেন্দ্রলাল বসু—উদয়াদিত্য। পূর্ণচন্দ্র ঘোষ—অনঙ্গমোহন। নীলমাধব চক্রবর্তী—রামচন্দ্র। হরিমতি—বিভা। ছোটরানী—সুরমা। ভবতারিণী—রানী। লক্ষ্মী—মঙ্গলা।

সেকালের পত্রপত্রিকায় অভিনয়ের সুখ্যাতি করা হয়েছিল। নাটকটিরও প্রশংসা করা হয়েছিল। রাধামাধব করের (বসন্ত রায় চরিত্র) অভিনয় ও গান খুবই প্রশংসিত হয়। হরিমতির বিভা চরিত্রে প্রাণবন্ত অভিনয়ের জন্য তার নামই হয়ে যায় 'বিভাহরি'।

রাধামাধবের কণ্ঠে 'আজ তোমারে দেখতে এলেম অনেক দিনের পরে' প্রথম জনপ্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গীত।[১]

নাট্যরূপটি এতই জনপ্রিয় হয় যে, উপন্যাসটির দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৮৭) রবীন্দ্রনাথ প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় লিখলেন 'বউঠাকুরানীর হাট (রাজা বসন্ত রায়)'। নাট্যরূপের অভিনয়ের সাফল্যকে রবীন্দ্রনাথ কতোখানি মূল্য দিয়েছিলেন, এতেই তা বোঝা যায়। 'রাজা বসন্ত রায়' অভিনয়ের সঙ্গে অর্ধেন্দুশেখরের নাম জড়িয়ে আছে। বোঝা যায়, তাঁরই উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ সাধারণ রঙ্গালয়ে গৃহিত হচ্ছেন। অর্ধেন্দুশেখর যখন যে রঙ্গালয়ে যুক্ত থেকেছেন, সেখানেই তিনি 'রাজা বসন্ত রায়' বা রবীন্দ্রনাথের অন্য নাটক বা নাট্যরূপের অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছেন। এইভাবে রাজা বসন্ত রায় এমারেল্ডে হয়েছিল (১৮৮৭-১৮৯৫), সেখানে অর্ধেন্দু প্রতাপাদিত্য'র ভূমিকায় অভিনয় করতেন। মিনার্ভাতে হয়েছিল (১৯০১)। অর্ধেন্দু রমাই ভাঁড়।

রবীন্দ্রনাথের '**রাজা ও রানী**' নাটক তখন সবে বেরিয়েছে। এমারেল্ড থিয়েটার এই নাটকের অভিনয় করল। প্রথম অভিনয় হলো, ৩০ নভেম্বর, ১৮৮৯। পরপর কয়েক রাত্রি অভিনয়ের পর আবার ৭ জুন থেকে দ্বিতীয় দফায় অভিনয় শুরু হয়।

এমারেল্ডের তখন খুবই দুরবস্থা। কেদার চৌধুরী নেই, থিয়েটারের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা, সংবাদপত্রে বিরূপ মন্তব্য। তবুও সেখানে রবীন্দ্রনাথের অনুমতি নিয়েই 'রাজা ও রানী'র অভিনয় হলো। কুমার সেনের ভূমিকায় অভিনয় করে মহেন্দ্রনাথ বসু 'ট্রাজেডিয়ান অফ বেঙ্গল' নামে খ্যাতিলাভ করলেন। বিষাদ নামে পরিচিত কুসুম অভিনয় করেছিল ইলা চরিত্র। মতিলাল বসুর 'বিক্রম' এবং গুলফনহরি 'সুমিত্রা'। এই অভিনয়ের সাফল্যের কথা বলে অহীন্দ্র চৌধুরী (নিজেরে হারায়ে খুঁজি) বিশেষ করে মহেন্দ্রলাল বসুর অভিনয়ের উচ্চ প্রশংসা করেছেন। তাঁর সংলাপ উচ্চারণ আজো যেন অনুরণন তোলে।

শেক্সপীয়রীয়ান আদর্শে লেখা ঘটনা বহুল এই নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ে খুবই আদৃত হয়েছিল। বিশেষ করে নাটকীয় অংশগুলি সবার ভালো লেগেছিল। আবার নৃত্যগীতের অংশগুলিও সবার মন জয় করেছিল। পাঁচ অঙ্কের বিস্তৃত ঘটনা প্রাধান্য ও নাটকীয় চরিত্র বিক্ষেপ, গীতিরস, সংলাপের আবেগ বাহুল্য সেযুগের সাধারণ রঙ্গালয়ের অভিনীত নাটকেরই উপযোগী হয়েছিল। স্বভাবতই জনসম্বর্ধনাও লাভ করেছিল।

বেঙ্গল থিয়েটার 'রাজা ও রানী'র অভিনয় করেছিল ১৮৯৩-এর ১৮ জানুয়ারি। তবে এই নাটকের অভিনয় সবচেয়ে জমেছিল অমরেন্দ্রনাথ দত্তের ক্লাসিক থিয়েটারে। প্রথম অভিনয়, ২৪ জুলাই, ১৮৯৭। দশটির ওপর অভিনয় এখানে হয়েছিল। সেখানে অমর দত্ত (বিক্রম), মহেন্দ্রলাল বসু (কুমার সেন), কুসুমকুমারী (সুমিত্রা), হরিভূষণ ভট্টাচার্য (দেবদত্ত) খুবই উচ্চমানের অভিনয় করেছিলেন। নাচে গানে, অভিনয়ে সে সময়ে

১. সুকুমার সেনের মতে 'বসন্ত রায় নাটকের গানগুলি রবীন্দ্রনাথের রচনা'। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্রজীবনী (১ খণ্ড), ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ১৫৭।

'রাজা ও রানী' খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। ।থ রাজা জগদীন্দ্রনাথ রায়কে সঙ্গে নিয়ে ক্লাসিকে এই নাটকের অভিনয় দেখতে এসেছিলেন (১১ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭)।

পরে রাজা ও রানী অভিনীত হয়েছিল কোহিনূরে (২৩.১০.১৯১০), স্টারে (১৮.৫.১৯১২)। থেসপিয়ান টেম্পলে (৮.১.১৯১৬), মনোমোহন থিয়েটারে (২০.১১.১৯১৯), আর্ট থিয়েটারে (২৯.৮.২৩)। [বন্ধ তে ঐ থিয়েটারে প্রথম রাত্রের অভিনয়ের তারিখ]

'রাজা বসন্ত রায়' ও 'রাজা ও রানী'র মতো সেই যুগে কম নাটকের ভাগ্যেই এত জনপ্রিয়তা জুটে ছিল। ১৮৯০-তে ২৬টি (রাজা ও রানী—২০ + রাজা বসন্ত রায়—৬), ১৮৯১-তে ২১টি (১১+১০), ১৮৯২-তে ৭টি (৫+২), ১৮৯৫-তে ১৭ বার (৭+১০), এবং ১৮৯৭ থেকে ১৯০০-এর মধ্যে ১০টি অভিনয় (রাজা ও রানী) সে যুগের হিসেবে নিঃসন্দেহে জনপ্রিয়তার প্রমাণ।[২]

এমারেল্ড থিয়েটার রবীন্দ্রনাথের 'খ্যাতির বিড়ম্বনা' কৌতুক নাটককে **'দু'কড়ি দত্ত'** এই পরিবর্তিত নামে অভিনয় করে ৬ এপ্রিল, ১৮৯৫-তে, আড়াই মাসের মধ্যেই ৫ রাত্রি অভিনয় হয়। তৎকালে রঙ্গালয়ে যে ধরনের সামাজিক নক্সা, প্রহসন অভিনয় হত 'দুকড়ি দত্ত' তার থেকে অনেক ভিন্ন। এতে ব্যক্তিগত আক্রমণ নেই। নেই তীব্র ব্যঙ্গ কিংবা অশ্লীলতা ; নির্মল মজার এই নাটিকা এমারেল্ডে নতুন স্বাদ এনে দিয়েছিল।

১৯০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়েছে এই তিনটি মাত্র নাটক—তার একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক, একটি ছোট প্রহসন এবং আরেকটি উপন্যাসের নাট্যরূপ। এই সময়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' (রাজর্ষি উপন্যাসের কিছু অংশের রবীন্দ্রনাথ কৃত নাট্যরূপ), 'মালিনী' ছাড়া আর কোনো নাটক ছিল না। যা ছিল তা 'গোড়ায় গলদ' বা 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র মতো ছোট প্রহসনধর্মী নাটক এবং কিছু ব্যঙ্গকৌতুক জাতীয় ছোট নাটিকা। বাদবাকি কিছু গীতিনাট্য এবং নাট্যকাব্য। আর কোনো উপন্যাসও প্রকাশিত হয়নি। 'বিসর্জন' নাটকে ধর্মীয় সংস্কার ও মানবতার যে দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে এবং ধর্মের মোহমুক্তি ঘটানো হয়েছে, ১৯ শতকের শেষাংশে বাংলা রঙ্গালয়ে অভিনীত পৌরাণিক নাটকের ধর্মভাব ও হিন্দু ভক্তিবাদের সঙ্গে তার সংঘর্ষ অনিবার্য ছিল। সে যুগে কোনো রঙ্গমঞ্চ তাই 'বিসর্জন' অভিনয়ের সাহস দেখায় নি। 'মালিনী'র ধর্মীয় বাতাবরণ, মানবত্ব এবং ট্রাজেডির ঋজু ও সংহত সমাপ্তি সে যুগের রঙ্গালয়ে দর্শকের মানস উপযোগী ছিল না। এগুলির অভিনয়ও তাই হয়নি।

'চোখের বালি' (১৯০৩) উপন্যাস প্রকাশিত হয়ে এক বছরের মধ্যেই দ্বিতীয় সংস্করণ হয়ে গেল। উপন্যাসটির জনপ্রিয়তা দেখে অমরেন্দ্রনাথ তাঁর ক্লাসিক থিয়েটারে এর নাট্যরূপ অভিনয়ের ব্যবস্থা করলেন। নাট্যরূপ দিলেন অমরেন্দ্রনাথ নিজেই। অনেকের ধারণা নাট্যরূপ দিয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র, কিন্তু 'বেঙ্গলী' পত্রিকার বিজ্ঞাপন

২. অভিনয়ের এই হিসাব করা হয়েছে, শঙ্কর ভট্টাচার্য : বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান (১৯৮৮) গ্রন্থ থেকে।

(২৬/১১/১৯০৪) অমরেন্দ্রনাথকেই সমর্থন করে : 'Choker Bali' / Carefully dramatised by Amarendranath Dutt.

[চোখের বালির নাট্যরূপ-দাতা প্রসঙ্গে দ্র. দর্শন চৌধুরীর প্রবন্ধ--মঞ্চে গিরিশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ : একটি সংঘাতের ইতিবৃত্ত / নাট্যচিন্তা / বর্ষ ২১. সংখ্যা ৭-১২.] রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়ে তাঁর অনুমতি নেওয়া হলো। ২৬ নভেম্বর, শনিবার, ১৯০৪ ক্লাসিকে প্রথম অভিনীত হলো। অভিনয় করলেন--

অমরেন্দ্রনাথ--মহেন্দ্র। মনোমোহন গোস্বামী--বেহারী। কুসুমকুমারী--বিনোদিনী। হরিসুন্দরী (ব্লাকি)--আশা। জগত্তারিণী--অন্নপূর্ণা। পান্নারানী--রাজলক্ষ্মী।

রবীন্দ্রনাথ ঐদিন অভিনয় দেখতে উপস্থিত ছিলেন। ক্লাসিকে গিরিশের সঙ্গে অমরেন্দ্রনাথের মাইনেপত্র নিয়ে মতান্তর চলছিল। তার ওপর ক্লাসিকে রবীন্দ্রনাথের এই ধরনের 'দুর্নীতিগ্রস্ত' উপন্যাসের নাট্যরূপের অভিনয় গিরিশ পছন্দ করেননি। গিরিশ তাঁর অনুগতদের নিয়ে ক্লাসিক ছেড়ে চলে যান। এই সময়ে আর্থিক দিক দিয়ে অমরেন্দ্রনাথের অবস্থা খুবই খারাপ, একসঙ্গে মিনার্ভা ও ক্লাসিক দুটি থিয়েটার চালাতে গিয়ে এবং অন্য থিয়েটারের সঙ্গে উপহার দেওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমে ও 'রঙ্গালয়' পত্রিকার আর্থিক ঝামেলা সামলাতে গিয়ে প্রায় সর্বস্বান্ত--আর্থিক, মানসিক এবং 'ক্লাসিক' সবদিক দিয়ে। এই অবস্থায় অনেক আশায় রবীন্দ্রনাথের সদ্য প্রকাশিত এবং জনপ্রিয় উপন্যাস চোখের বালির নাট্যরূপ ক্লাসিকে অভিনয় করা হলো। প্রথম দিকে নাটকটি জমলো না। এর পাঁচ মাসের মাথায় অমরেন্দ্রনাথ ক্লাসিক থিয়েটার ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। 'চোখের বালি'র অভিনয়ের ধারাবাহিকতা এই কারণেই নষ্ট হয়ে গেল। পরবর্তী কোনো সাধারণ রঙ্গালয়ে আর 'চোখের বালি'র অভিনয়ের খবর পাওয়া যায় নি। ১৯ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের গোড়ায় যে ধরনের সামাজিক নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হত, 'চোখের বালি' তার থেকে স্বতন্ত্র। মানুষের অন্তর্জীবনের গহনলোকের উদঘাটনের মাধ্যমে নরনারীর হৃদয়ের উন্মোচন যে উদার দৃষ্টিতে দেখানো হয়েছে--সে বিষয় ও ভাবনা গ্রহণ করবার মতো মানসিক প্রস্তুতি তখনকার দর্শকদের ছিল না।

'নতুন অবতার' কৌতুক নক্সার নাট্যরূপ **'ভগীরথ'** (ক্ষীরোদপ্রসাদ কৃত) মিনার্ভা অভিনয় করল, ১৯০৯ এর ২৫ ডিসেম্বর। এক মাসের মধ্যে চার বার অভিনীত হয়।

আগের লেখা **'গোড়ায় গলদ'** প্রহসনটি অনেকদিন বাদে অভিনয় করল কোহিনূর থিয়েটার, ৯ জানুয়ারি, ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে। কোহিনূর তখন চলছে এমারেল্ড থিয়েটারের মঞ্চে। এখানে 'রাজা ও রানী'র নির্বাচিত অংশের অভিনয়ও করা হয়েছিল (২৩-৩-১৯১০)।

রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তির উপায়' গল্প অবলম্বনে **'দশচক্র'** নাটক অভিনীত হলো স্টার থিয়েটারে। নাট্যরূপ দিলেন কবির স্নেহধন্য সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। অমরেন্দ্রনাথ তখন ক্লাসিক ছেড়ে স্টারে এ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজার। তাঁরই উৎসাহে দশচক্র অভিনীত হল স্টারে, ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ ফেব্রুয়ারি। অভিনয়ে ছিলেন--

অমরেন্দ্রনাথ--ফকিরচাঁদ। হীরালাল দত্ত--মাখনলাল দত্ত। কার্তিকচন্দ্র দে--যষ্ঠীচরণ। সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ--চাকর। নরীসুন্দরী-হৈমবতী। কুসুমকুমারী--মুরলা। বসন্তকুমারী--সুবালা। হরিসুন্দরী (ব্লাকি)--কামিনী।

অমরেন্দ্রনাথের আগ্রহেই স্টার থিয়েটারে অনেকদিন বাদে **'রাজা ও রানী'র** অভিনয়ের আয়োজন করা হলো, ১৮ মে, ১৯১২। তখন অমরেন্দ্রনাথ নিজেই স্টার লীজ নিয়ে থিয়েটারের কর্ণধার হয়েছেন। মালিক হয়েই তিনি তাঁর পূর্বের সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত 'রাজা ও রানী' স্টারে নামালেন।

বিক্রমদেব সাজলেন আগের মতো তিনিই। কুমারসেন হলেন ক্ষেত্রমোহন মিত্র। দেবদত্ত--কুঞ্জলাল চক্রবর্তী। অক্ষয় চক্রবর্তী অভিনয় করলেন ত্রিবেদীর ভূমিকায়। রানী সুমিত্রার চরিত্রে দারুণ অভিনয় করলেন সুশীলাবালা। সুশীলাবালার গান সে সময়কার দর্শকদের খুবই খুশি করেছিল। অমরেন্দ্রনাথের বিক্রমদেব সুধী দর্শকের প্রশংসা পেয়েছিল। কোনো কোনো রাত্রে অমরেন্দ্রনাথ বিক্রমদেব ও কুমারসেন--দুটি ভূমিকাতেই অভিনয় করেছিলেন (৬ জুন, ১৯১২)। 'রাজা ও রানী' বেশ কয়েক রাত্রি স্টারে অভিনীত হয়েছিল।

অমরেন্দ্রনাথ থাকাকালীনই স্টারে **'বিনি পয়সার ভোজ'** মঞ্চস্থ হল ১০ অক্টোবর, ১৯১২। অমরেন্দ্রনাথ কৌতুকাভিনয়েও খ্যাতিলাভ করেন।

এর আগেই অমরেন্দ্রনাথ স্টার থিয়েটার ছেড়ে দিয়ে বেঙ্গল থিয়েটারের বাড়ি ভাড়া নিয়ে সেখানে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার খুলেছিলেন। এই নবপ্রতিষ্ঠিত থিয়েটারের উদ্বোধন করলেন রবীন্দ্রনাথের 'দালিয়া' গল্প অবলম্বন করে লেখা **'জীবনে মরণে'** নাটক দিয়ে। নাট্যরূপ দিলেন অমরেন্দ্রনাথ স্বয়ং। অভিনয় হলো ১৭ জুন, ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে। সঙ্গে অমরেন্দ্রনাথের নিজের প্রহসন 'আহামরি'।

'জীবনে মরণে'র নাট্যরূপে অমরেন্দ্রনাথ দুটি নতুন চরিত্র সৃষ্টি করলেন। তাহের ও রঙ্গিলা। তাহের আরাকান রাজের (সাহজেনান) অভিন্নহৃদয় বন্ধু। রঙ্গিলা আরাকান রাজের প্রধানা বাঁদি। সম্রাটের বিশ্বস্ত। তাহের ও রঙ্গিলা সম্রাটের বন্ধুত্ব লাভ করেছে। আগের 'আলিবাবা' নাটকের মর্জিনা-আবদালাকে মনে পড়িয়ে দেয়।

নতুন থিয়েটারের উদ্বোধন রজনীর নাটক বাছাই যে ভুল হয়নি, তার প্রমাণ পাওয়া গেল এর অভূতপূর্ব সাফল্যে। বেশ কয়েকরাত্রি দর্শক ঠাসা প্রেক্ষাগৃহে জীবনে-মরণের অভিনয় চলেছিল। উদ্বোধন রাত্রে অমরেন্দ্রনাথ প্রত্যেক দর্শককে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি বিশিষ্ট ব্রোচ বিতরণ করেন। তাঁর নাট্যরূপায়িত 'জীবনে-মরণে' নাটিকাটি রবীন্দ্রনাথের অনুমতি নিয়েই অমরেন্দ্রনাথ ছাপিয়ে প্রকাশ করেছিলেন এবং কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে রবীন্দ্রনাথকে 'বাণীর বরপুত্র' রূপে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। জীবনে-মরণের ভূমিকালিপি :

অমরেন্দ্রনাথ--সাহজেনান। সুশীলাবালা--তাহের। অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়--রহমৎ আলি। গোপাল ভট্টাচার্য--মেসরু। বসন্তকুমারী--জুলিয়া। রানীসুন্দরী--আমিনা। চারুবালা--রঙ্গিলা।

সুশীলাবালা ও অমরেন্দ্রনাথের অভিনয় নাটকটির সাফল্যের প্রধান কারণ হয়েছিল। 'রাজা ও রানী'র পর এই নাট্যরূপটিই রঙ্গালয়ে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

'বিদায় অভিশাপ' অভিনয় করল মিনার্ভা থিয়েটার, ৯ আগস্ট, ১৯১৩। এতদিনে মিনার্ভা প্রথম রবীন্দ্রনাটকের অভিনয় করল। এই নাট্যকাব্যটিতে কচ-এর ভূমিকায় দানীবাবু এবং দেবযানী চরিত্রে তারাসুন্দরী তাদের স্বভাবগত অভিনয়ধারা থেকে সরে এসে অভিনয়ের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু 'বিদায় অভিশাপ' দর্শক মনে কোনো রেখাপাত করতে পারল না। মোট একরাত্রি অভিনয় হয়।

স্টার থিয়েটার আবার রবীন্দ্রনাথের গল্পের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করল। 'শাস্তি' গল্পের নাট্যরূপ দিলেন অমরেন্দ্রনাথ, সহায়তা করলেন রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। নাট্যরূপের নাম হলো **'অভিমানিনী'**। ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ জুন স্টারে অভিনীত হলো। সবটাই অমরেন্দ্রনাথের উৎসাহে ও উদ্যোগে।

প্রথম রজনীতে অমরেন্দ্রনাথ কোনো ভূমিকা নেননি, দ্বিতীয় রজনী থেকে তিনি 'ছিদাম' অভিনয় করেন। প্রথম রাতে 'ছিদাম' করেন মন্মথনাথ পাল। দুখীরাম—ক্ষেত্রমোহন মিত্র। রামলোচন—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়। সিভিল সার্জেন—ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। চন্দরা—কুসুমকুমারী। ললিতা—নরীসুন্দরী। রাধা—মৃণালিনী। 'অভিমানিনী' একাধিক রজনী বেশ ভালভাবেই চলেছিল। গল্পের নতুন বিষয়বস্তু দর্শকের ভালো লেগেছিল।

চার মাস বাদেই স্টার আবার রবীন্দ্রনাথের গল্পের নাট্যরূপ অভিনয় করল। 'দিদি' গল্পের নাট্যরূপ দিলেন রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। স্টারে অভিনীত এই নাটকের নাম দেওয়া হলো **'অকলঙ্ক শশী'**। প্রথম অভিনয় ৩১ অক্টোবর, ১৯১৪। বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন অমরেন্দ্রনাথ, কুসুমকুমারী, মন্মথনাথ পাল, নরীসুন্দরী, ক্ষেত্রমোহন মিত্র, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

১৯১০ থেকে ১৯২০, এই বছরগুলিতে রবীন্দ্রনাথের লেখা কোনো উল্লেখযোগ্য নাটকের অভিনয় সাধারণ রঙ্গালয়ে হয়নি। যা হয়েছে বেশির ভাগই তাঁর গল্প বা উপন্যাসের নাট্যরূপ। তার মধ্যে বেশির ভাগ প্রচেষ্টাই দেখা যাচ্ছে অমরেন্দ্রনাথের। এককভাবে তাঁর এই প্রচেষ্টা সে যুগে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। (এর পূর্বযুগে অর্ধেন্দুশেখর উদ্যোগ নিয়ে রবীন্দ্র নাটকের অভিনয় করেছিলেন।) এগুলির মধ্যে একমাত্র 'জীবনে মরণে' (দালিয়া গল্পের নাট্যরূপ) ভালোই সাফল্য পেয়েছিল এবং আর্থিক উপার্জনও ভালোই হয়েছিল। অন্যগুলি সেভাবে সাফল্য পায়নি। 'রাজা ও রানী', 'দুকড়ি দত্ত', বা 'গোড়ায় গলদ'-এর পর মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের লেখা কোনো নাটকের আর অভিনয় দেখা যাচ্ছে না প্রায় কুড়ি বছর। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের নামে যেগুলির অভিনয় সাধারণ রঙ্গালয়ে হচ্ছিল, তার সবই সহজ সরল নাট্যরূপ মাত্র। কয়েকটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাম জড়িত ছিল বটে, সেগুলি কিন্তু তাঁর গল্প বা উপন্যাসের নাট্যরূপ—বিভিন্ন নাট্যরূপদাতা নিজেদের এবং মঞ্চের মর্জি অনুসারে নাট্যরূপ দিয়েছেন। মূল কাহিনীর

গ্রহণ বর্জন তাদের খেয়ালখুশি মতো হয়েছে। কোনো কোনো নাটকে তাদের নিজেদের লেখা গানও এর মধ্যে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।

তবে মনে রাখতে হবে, ১৯১০-২০ এই সময়কালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে নাটকগুলি লিখেছেন, তার সবগুলিই রূপক-সাঙ্কেতিক নাটক। শারদোৎসব, প্রায়শ্চিত্ত, রাজা, ডাকঘর, অচলায়তন, ফাল্গুনী, গুরু, ঋণশোধ, মুক্তধারা প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথের নাট্যভাবনা এই যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। তিনি তাঁর অন্তর্মুখীন ভাবনার এই নাটকগুলি লিখছেন এবং নিজের উদ্যোগে নিজের পরিচালনায় অভিনয়ের আয়োজন করছেন। এই গভীর ভাবাত্মক, ব্যঞ্জনাধর্মী এবং তত্ত্বপ্রধান নাটকগুলির বেশির ভাগেরই দর্শক-উদ্যোক্তা এবং অংশগ্রহণকারী সকলেই রবীন্দ্রভাবনায় অনুপ্রাণিত। পেশাদার সাধারণ রঙ্গালয় স্বাভাবিকভাবেই এই নাটকগুলির অভিনয়ের দুঃসাহস দেখাতে পারেনি। যা করেছে, তার সবই ঐ গল্প উপন্যাসের নাট্যরূপ, যেগুলির অভিনয় খুব উচ্চাঙ্গের হয়নি এবং দর্শকরাও খুব উল্লসিত হতে পারেনি।

এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়ে বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছেন (১৯১৩) এবং সাধারণ বাঙালির কাছেও পরিচিত ও আদৃত হচ্ছেন। যৌবনের রবীন্দ্রনাথ এতদিনে পঞ্চাশোর্ধ্ব 'রবীন্দ্রনাথে' পরিণত হয়েছেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে (১৯১৪-১৮) ও পরে দেশের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ রঙ্গালয়েরও খুবই দুরবস্থার সময়। রঙ্গমঞ্চগুলি কোনো রকমে পুরনো গতানুগতিক নাটকগুলির অভিনয় চালিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করছিল।

তার মধ্যেও 'থেসপিয়ান টেম্পল' থিয়েটার বেঙ্গল থিয়েটারের মঞ্চে 'রাজা ও রানী' অভিনয় করে (৮ জুন, ১৯১৬), মনোমোহন থিয়েটার 'রাজা ও রানী' নামায় ২০ নভেম্বর, ১৯১৯। মিনার্ভায় অভিনীত হয় 'বশীকরণ' (২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯২০)। অভিনেত্রী চারুশীলা এই নাটকে খুবই কৃতিত্ব দেখান ও খ্যাতিলাভ করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে স্টার থিয়েটারের খুবই দুরবস্থার কালে সেখানে আর্ট থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়, ৩০ জুন, ১৯২৩। উদ্বোধনের দুই মাসের মধ্যেই আর্ট থিয়েটার 'রাজা ও রানী'র অভিনয় শুরু করে, ২৯ আগস্ট, ১৯২৩ থেকে। 'কর্ণার্জুন' নাটকের অভূতপূর্ব সাফল্যের মধ্যেও 'রাজা ও রানী' ভালই চলেছিল। অভিনয় করেন : অহীন্দ্র চৌধুরী--কুমার দেব। তিনকড়ি চক্রবর্তী—বিক্রম দেব। নরেশ মিত্র--শঙ্কর। অপরেশ মুখোপাধ্যায়—দেবদত্ত। কৃষ্ণভামিনী--সুমিত্রা। নীহারবালা—ইলা।

এবারে আর্ট থিয়েটার নামাল **'চিরকুমার সভা'**। এই নাটকের অভিনয় সাধারণ রঙ্গালয়ে খুবই সাফল্য লাভ করেছিল এবং জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। প্রথম অভিনয় হল ১৮ জুলাই, ১৯২৫। রবীন্দ্রনাথের অনেক আগে লিখিত ও প্রকাশিত 'প্রজাপতির নির্বন্ধ'কে কবি স্বয়ং ঠিকঠাক করে দিয়ে অভিনয় উপযোগী করে তোলেন। নাম দেন 'চিরকুমার সভা'। সাধারণ রঙ্গালয় আর্ট থিয়েটারের অহীন্দ্র চৌধুরীরা তাঁর নাটক অভিনয়ের কথা ভাবছেন শুনে রবীন্দ্রনাথ ২৪ বৎসর আগে লেখা 'প্রজাপতির নির্বন্ধ'-এর নতুন নাট্যরূপ দানে প্রবৃত্ত

হলেন। হেমেন্দ্রকুমার রায় জানিয়েছেন (সৌখিন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ) যে, শিশিরকুমার ভাদুড়িদের জন্যই তিনি একাজে হাত দেন। দৌত্য করেছিলেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। 'চিরকুমার সভাকে নাট্য অভিনয়ের উপযোগী করে তুললেন বটে শিশির সম্প্রদায়ের জন্যে, কিন্তু তা অভিনীত হলো স্টার রঙ্গমঞ্চে আর্ট সম্প্রদায়ের দ্বারা।'

মহাসমারোহে এবং বিপুল পরিশ্রমে নাটকটি মঞ্চস্থ হলো। চরিত্রলিপি :

অহীন্দ্র চৌধুরী—চন্দ্রবাবু। তিনকড়ি চক্রবর্তী—অক্ষয়। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—পূর্ণ। অপরেশ মুখোপাধ্যায়—রসিক। নীহারবালা—নীরবালা।

আর্ট থিয়েটারের কুশলী নট-নটীদের অভিনয় গুণে 'চিরকুমার সভা' অচিরেই দারুণ জনপ্রিয়তা অর্জন করল। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর্ট থিয়েটারে গিয়ে নাটকের প্রস্তুতিতে সাহায্য করেন। গগন ঠাকুর দেখে দিয়েছিলেন মঞ্চ, দৃশ্যসজ্জা, সিনসিনারি আর দিনেন ঠাকুর নাটকের গানের ব্যাপারে তত্ত্বাবধান করেছিলেন, নিজে গান শিখিয়ে দিয়েছেন অভিনেতা-অভিনেত্রীদের। বিজ্ঞাপনেও তাঁদের নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেও নানাভাবে সাহায্য করলেন এবং দ্বিতীয় রজনীতে নিজে অভিনয় দেখতে এলেন (২৫ জুলাই, ১৯২৫) ঠাকুরবাড়ির অনেকের সঙ্গে। পরের দিন অভিনেতারা ঠাকুরবাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করলে তিনি অভিনয়ে তাঁর সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং রসিকের ভূমিকায় অপরেশচন্দ্রের ভূয়সী প্রশংসা করে তাঁর নাম দেন 'রসিকবাবু।'

আর্ট থিয়েটার প্রাণপণ যত্নে নাটকটি অভিনয় করে। বেশভূষা, মঞ্চের সাজসরঞ্জাম, আসবাবপত্র, দৃশ্যপট, সঙ্গীত, বক্তৃতা, সংলাপ, অভিনয়—সব দিকেই নিখুঁত করার চেষ্টা ছিল। পালিশ করা কাঠের দরজা, কাচের শার্সি, ঝিলিমিলি—এসব দিয়ে মঞ্চে ঘর সাজানো হয়। দলের অভিনেতৃবর্গের আন্তরিক অভিনয় এবং সঙ্গীত—নাটকটিকে মঞ্চসফল করে তুলল। দিনেন্দ্রনাথের শিক্ষায় নীহারবালা ও তিনকড়ি চক্রবর্তীর গাওয়া রবীন্দ্রনাথের গান খুবই জনপ্রিয় হয়। নীহারবালার (নীরবালা) গাওয়া—'জয়যাত্রায় যাও গো', 'যেতে দাও গেল যারা', 'না বলে যায় পাছে সে', 'জ্বলেনি আলো অন্ধকারে' এবং তিনকড়ি চক্রবর্তী (অক্ষয়)—'না, না গো না, কোর না ভাবনা', 'চলেছে ছুটিয়া পলাতকা হিয়া'—প্রভৃতি গান জনপ্রিয়তালাভের ফলে রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রসারে খুবই কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিল।

শিশিরকুমার ভাদুড়ি খ্যাতির তুঙ্গে থাকাকালীন আর্ট থিয়েটারের আমন্ত্রণে একরাত্রির জন্য (২৯ জুলাই, ১৯২৯) 'চন্দ্রবাবুর' ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, নিময়িত অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরীর অনুপস্থিতিতে। পরের বছর আর্ট থিয়েটারের দুর্দিনে শিশির ভাদুড়ি তাঁর সম্প্রদায়ের অনেককে নিয়ে আর্ট থিয়েটারের হয়ে 'চিরকুমার সভা' নতুন করে অভিনয় করেন। সেই অভিনয় দর্শকদের কাছে নতুন করে আগ্রহের সঞ্চার করেছিল। সেখানে অভিনয় করেছিলেন —শিশিরকুমার (চন্দ্র), বিশ্বনাথ ভাদুড়ি (পূর্ণ), প্রভাদেবী (শৈলবালা), কৃষ্ণভামিনী (পুরবালা), সরস্বতী (নৃপবালা), সুশীলাবালা (নির্মলা) এবং কঙ্কাবতী (নীরবালা)।

'আর্ট থিয়েটার' তাদের অভিনয়ে কমেডি নাটকটিকে হাল্কা রঙ্গ ব্যঙ্গ ও রসিকতার ঢঙে উপস্থাপন করেছিল। কোনো অংশ বেশ স্থূল ও ভাঁড়ামোর পর্যায়েও নিয়ে গিয়েছিল। চরিত্রগুলির সূক্ষ্ম বিকাশের চাইতে মোটা দাগের অভিনয়ে সেগুলিকে কৌতুকাত্মক করে তোলার চেষ্টা করেছিল। স্বভাবতই সেই সময়ের সাধারণ রঙ্গালয়ের দর্শকের কাছে এর আবেদনই বেশি ছিল। এবং 'চিরকুমার সভা' সাধারণ রঙ্গালয়ে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে 'মঞ্চ সফল' নাটক। অথচ শিশির ভাদুড়ি বাহুল্য, গ্রাম্যতা বা স্থূলতা বর্জন করে নাটকের সূক্ষ্ম রসিকতা প্রকাশ করতে চেয়েছেন। শিশিরবাবুর অভিনয়ে 'চন্দ্রবাবু' আত্মভোলা দার্শনিক শ্রেণীর মানুষ হিসেবেই (অনেকটা রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো) উপস্থিত হয়েছে, স্থূল ভাঁড় নয়। অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয়ে দর্শকেরা হেসে গড়াগড়ি যেত, শিশিরকুমারের অভিনয়ে রসিকবোদ্ধা দর্শক পরিতৃপ্ত হয়েছিল। শিশিরকুমার কখনো 'রসিকে'র চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, যে চরিত্রে অপরেশ মুখোপাধ্যায়, তখনকার থিয়েটারের ভাষায় একেবারে 'জ্বালিয়ে' দিয়েছিলেন। বোঝাই যায়, রঙ্গালয়ের বৃহত্তর দর্শক কোনটা পছন্দ করেছিল!

'চিরকুমার সভা' সবাক চলচ্চিত্ররূপে মুক্তি পেল ১৯৩২-এর ২৮ মে, কলকাতার 'চিত্রা' সিমেনায়। রবীন্দ্রনাথের কাহিনী অবলম্বনে প্রথম সবাক চলচ্চিত্র। পরিচালনায় প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। অভিনয়ে : দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনকড়ি চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ইন্দুবালা, নিভাননী, মলিনাদেবী প্রমুখ।

'চিরকুমার সভা'র সাফল্যে উৎসাহিত আর্ট থিয়েটার রবীন্দ্রনাথের **'গৃহপ্রবেশ'** নাটকটি মঞ্চস্থ করল। ৫ ডিসেম্বর, ১৯২৫, প্রথম অভিনয় হলো। 'শেষের রাত্রি' গল্পের নাট্যরূপ এটি, নাট্যরূপ দিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজে, আর্ট থিয়েটারের অভিনয়ের জন্য। ১৯২৫-এর সেপ্টেম্বরে গ্রন্থাকারে প্রকাশের তিনমাসের মধ্যেই (ডিসেম্বর) অভিনয় করা হলো। ভূমিকালিপি :

অহীন্দ্র চৌধুরী—যতীন। তিনকড়ি চক্রবর্তী—ডাক্তার। কুমার কনকনারায়ণ ভূপ—অখিল। সুশীলাসুন্দরী—মাসী। নীহারবালা—হিমি। সেবাবালা—মণি।

তৃতীয় অভিনয় রজনীতে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীসাথী নিয়ে সপরিবারে 'গৃহপ্রবেশে'র অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন (১৯ ডিসেম্বর, ১৯২৫)। 'রবীন্দ্রনাথের খুবই ভালো লেগেছিল এই অভিনয়,' অহীন্দ্র চৌধুরীর এই মন্তব্য সত্ত্বেও, দেখছি, গৃহপ্রবেশ কোনো দিক দিয়েই সাফল্য লাভ করতে পারে নি। গৃহপ্রবেশের অভিনয়েও রবীন্দ্রনাথ অনেক সাহায্য করেছিলেন। থিয়েটারের সন্তোষ দাস রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে গানগুলি কণ্ঠে তুলে নিয়ে এসেছিলেন। অহীন্দ্র চৌধুরীর 'পার্টের রিডিং' পর্যন্ত শিখিয়ে দিয়েছেন। গগন ঠাকুর মঞ্চ এবং দিনেন ঠাকুর সঙ্গীতের দিকটা দেখেছিলেন। একই মঞ্চে পাশাপাশি দুটো ঘর এবং এঘর থেকে সে ঘর চলাচল অব্যাহত—এই রকম সেট বাংলা মঞ্চে প্রথম দেখা গেল গগন ঠাকুরের মঞ্চ নির্দেশনায়।

এই নাটকের অভিনয় দেখে রবীন্দ্রনাথ অনেক পরিবর্তন করে দিলেন। অতিরিক্ত

সংলাপ যোজনা, সম্পাদনা করে দৃশ্য বাড়ানো-কমানো, নতুন চরিত্র সৃষ্টি করা ('টুকরি' ও 'বৈষ্ণবী') ; নীহারবালার (হিমি) কণ্ঠে গান পছন্দ হওয়াতে তার গলায় গান বাড়িয়ে দেওয়া —এসব করেছিলেন।

'গৃহপ্রবেশ' ততোখানি সাফল্য পেল না, 'চিরকুমার সভা' যতোটা পেয়েছিল। তবু আর্ট থিয়েটার এবারে দুটি নাটক নামাল রবীন্দ্রনাথের, 'বশীকরণ' ও 'বিদায় অভিশাপ'। এই দুটি আগেই মিনার্ভায় অভিনীত হয়েছিল। আর্ট থিয়েটারে **'বশীকরণের'** অভিনয়ে (প্রথম অভিনয় : ১০ জানুয়ারি, ১৯২৬) ছিলেন—রানীসুন্দরী—মাতাজী। রাধিকা মুখোপাধ্যায়—অন্নদা।

এর তিন মাসের মাথায় (১৫ এপ্রিল) নামাল **'বিদায় অভিশাপ'**। কচ—রাধিকানন্দ এবং দেবযানী—সুশীলাবালা। মিনার্ভায় দানীবাবু ও তারাসুন্দরীর কচ-দেবযানী চরিত্রের অভিনয় সত্ত্বেও একরাত্রির বেশি অভিনয় হয়নি। এখানে কিন্তু কয়েক রাত্রি চলল। তবে তেমন দর্শক সাড়া পাওয়া গেল না।

ঐ ১৯২৬-এই আর্ট থিয়েটার রবীন্দ্রনাথের **'শোধবোধ'** নাটকটি অভিনয় করল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কর্মফল' গল্পের নাট্যরূপ দিলেন নিজেই। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন (রবীন্দ্রজীবনী—৩। পৃ. ২৩৪) : 'চিরকুমার সভা ও শোধবোধ' নাটক দুইটি অভিনয়ের জন্য রচিত—খানিকটা ফরমাইসিই বলিব।.... পাবলিক রঙ্গালয়ে মঞ্চস্থ হইবে বলিয়া লোকরঞ্জনের দিকে কবির দৃষ্টি ছিল বেশী।' অভিনয় হল ২৬ জুলাই। চরিত্রলিপি :

> অহীন্দ্র চৌধুরী—সতীশ। রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়—শশধর ও মিঃ নন্দী। সুশীলা—সুকুমারী। নীহারবালা—নলিনী। কনকনারায়ণ—মিঃ লাহিড়ী। রাণীসুন্দরী—বিধুমুখী। সরস্বতী—চারুবালা। দুর্গাপ্রসন্ন বসু—মন্মথ।

রবীন্দ্রনাথ অভিনয় দেখে গেলেন ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৭। খুশিও হলেন। আর্ট থিয়েটারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হচ্ছে। এই একই সময়ে শিশির ভাদুড়ির প্রয়োগনৈপুণ্যে ভরসা রেখে তাঁকে অনেক নাটক করতে দিচ্ছেন। আবার আর্ট থিয়েটারের চাহিদাও মিটিয়ে যাচ্ছেন।

এবারে রবীন্দ্রনাথ নিজেই উদ্যোগী হয়ে তাঁর পুরনো উপন্যাস 'বউঠাকুরাণীর হাট'-এর নাট্যরূপ নিজেই দিলেন, নামকরণ হল **'পরিত্রাণ'**। অবশ্য এই উপন্যাস থেকে রবীন্দ্রনাথ নিজে 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক লেখেন। সেই নাটক সাধারণ রঙ্গালয় নেয়নি। এবারে রবীন্দ্রনাথ একই উপন্যাসের দ্বিতীয় নাট্য রূপান্তর করলেন 'পরিত্রাণ' নামে। অনেক আগে 'রাজা বসন্ত রায়' নামে রূপান্তর করেছিলেন কেদার চৌধুরী। সে যুগে এই নাট্যরূপান্তর চলেছিলও খুব।

রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে নাট্যরূপ দিইয়ে আর্ট থিয়েটার 'পরিত্রাণ' অভিনয় করল। প্রথম অভিনয় ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯২৭। উল্লেখযোগ্য অভিনয় করলেন—তিনকড়ি চক্রবর্তী (ধনঞ্জয় বৈরাগী), নরেশচন্দ্র মিত্র (রাজা বসন্ত রায়), তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়

(প্রতাপাদিত্য), মণীন্দ্রনাথ ঘোষ (রামচন্দ্র)। সন্তোষ সিংহ (উদয়াদিত্য), নীহারবালা (বিভা), সরস্বতী (সুরমা)।

প্রথম যুগের মতোই এযুগেও 'বউঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসের নাট্যরূপ বেশ ভালই সাফল্যলাভ করল।

আর্ট থিয়েটারের একেবারে শেষের দিকে **'বৈকুণ্ঠের খাতা'** অভিনয় করে, ১৫ জুন, ১৯৩৩। মনোমোহন নাট্যমন্দিরে এর অনেক আগে বৈকুণ্ঠের খাতা অভিনয় হয়েছিল (১৯২৪)। অহীন্দ্র চৌধুরী (বৈকুণ্ঠ), মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (কেদার), জহর গাঙ্গুলি (অবিনাশ) উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন। তাছাড়া তিনকড়ি চক্রবর্তী ও শৈলেন চৌধুরীও অভিনয়ে অংশ নেন। শিশির ভাদুড়ি একদিন (১ জুলাই, ১৯৩৩) এখানে কেদারের ভূমিকায় নেমেছিলেন। পরে অবিনাশের চরিত্রেও অভিনয় করেছিলেন।

আর্ট থিয়েটার এবং বিশেষ করে অন্যতম কর্ণধার প্রবোধচন্দ্র গুহের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে উঠেছিল। প্রবোধচন্দ্র আর্ট থিয়েটার ছেড়ে মনোমোহন থিয়েটারে যুক্ত হলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে তাঁর 'মুক্তির উপায়' গল্পের নিজে নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় স্বত্ত্ব দিয়েছিলেন। **'মুক্তির উপায়'** মনোমোহনে অভিনীত হলো ১৭ মে, ১৯৩০। আর্ট থিয়েটারের অনেক অভিনেতা অভিনেত্রী সেখানে যুক্ত ছিলেন। তাদের মধ্যে রাধিকানন্দ (ফকির), দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (মাখনলাল), নীহারবালা (হৈমবতী) প্রভৃতি অভিনয় করলেন। অনেক আগে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের নাট্যরূপে 'দশচক্র' নামে এটি স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আর্ট থিয়েটারই উদ্যোগ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের পর পর আটটি নাটক ও নাট্যরূপের অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিল। তারা রবীন্দ্রনাথের সক্রিয় সাহায্যও পেয়েছিল। দলের ক্ষমতাশালী নটনটীদের সহযোগিতা এবং অপরেশচন্দ্রের পরিচালনার কৃতিত্বে কয়েকটির অভিনয় সাফল্যলাভ করেছিল। আর্ট থিয়েটার যথাযোগ্য মর্যাদায় রবীন্দ্র নাটক বা নাট্যরূপের অভিনয়ের চেষ্টা করেছে। তখনকার পত্রপত্রিকায় এই অভিনয়গুলির প্রশংসাই করা হয়েছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা, আশীর্বাদ, সহযোগিতা, সমর্থন ও সাহায্যও তারা পেয়েছিল। রবীন্দ্রনাটকের অভিনয়ে সাধারণ রঙ্গালয়ের মধ্যে আর্ট থিয়েটারের প্রচেষ্টাকে তাই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতেই হবে।

শিশির ভাদুড়ির রঙ্গালয়ে রবীন্দ্র নাটকের বা নাট্যরূপের অভিনয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর 'প্রয়োগনৈপুণ্যে' খুশি রবীন্দ্রনাথ 'নটরাজ' শিশিরকুমারকে তাঁর কয়েকটি নাটকের অভিনয়ের ভার দিতে কুণ্ঠিত হননি। রবীন্দ্রনাথ-ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা এক পত্রে স্বীকার করেছিলেন : 'শিশির ভাদুড়ির প্রয়োগনৈপুণ্য সম্বন্ধে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। সেই কারণেই ইচ্ছাপূর্বক আমার দুই একটি নাটক অভিনয়ের ভার তার হাতে দিয়েছি।' (তারিখ : ১২ ভাদ্র, ১৩৩১)। নতুন যুগের ভাবনাচিন্তা ও উপস্থাপনার পরিকল্পনায় তিনি রবীন্দ্র নাটকের অভিনয়ের যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।

সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনয় শুরু করার পাঁচ বছর বাদে শিশিরকুমার রবীন্দ্রনাথের

'বিসর্জন' অভিনয় করলেন। নাট্যমন্দিরের উদ্বোধন হলো বিসর্জন দিয়ে, ২৬ জুন, ১৯২৬। শিশির ভাদুড়ির পরিচালনায় অভিনয় করলেন :

> রঘুপতি--শিশির ভাদুড়ি। জয়সিংহ--রবি রায়। গোবিন্দমাণিক্য--মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। নক্ষত্র রায়--নরেশ মিত্র। চাঁদপাল--অমিতাভ বসু। রাণী গুণবতী--চারুশীলা। অপর্ণা--ঊষাবতী (পটল)। পরের দিকে শিশির জয়সিংহ করেছেন। নরেশ মিত্র ও রবি রায়ও কখনো রঘুপতি সেজেছেন। দৃশ্যপট, সাজসজ্জা, অভিনয় এবং প্রয়োগনৈপুণ্যে বিসর্জনের অভিনয় বাংলা থিয়েটারে নতুন মাত্রা এনে দিল। দিনেন ঠাকুর সঙ্গীত এবং অবনীন্দ্র-শিষ্য রমেন চট্টোপাধ্যায় দৃশ্যপট নির্মাণে সাহায্য করেছিলেন। নাট্যমন্দিরে অভিনয়ের জন্য 'বিসর্জনে' দৃশ্য সংস্থানের পরিবর্তন এবং কিছু নতুন গান যোজনা করা হয়েছিল কবির সমর্থনেই। এবং নাটকেরও কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছিল। গানে কৃষ্ণচন্দ্র দে (কানাকেষ্ট) এবং কঙ্কাবতী নৈপুণ্য দেখালেন।

রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ তথা সে যুগের বিদগ্ধ রসিক দর্শকেরা এই প্রযোজনা দেখে প্রীত হয়েছিলেন। কিন্তু বৃহত্তর দর্শকের সাড়া তেমনভাবে পাওয়া যায়নি। মনে রাখতে হবে ১৯ শতকে যেমন, তেমনি বিশ শতকের এই এক-চতুর্থাংশ সময়ের মধ্যে এই প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়ে বিসর্জন অভিনীত হলো। ধর্মীয় আবেগ ও সংস্কারে আঘাত এবং কালীমূর্তির বিসর্জন সাধারণ রঙ্গালয়ের দর্শকের মনঃপুত হয়নি কখনোই।

পরের বছরেই নাট্যমন্দির **'শেষরক্ষা'** প্রযোজনা করল। অন্য মঞ্চে আগেই অভিনীত 'গোড়ায় গলদ' প্রহসনের এটি পরিবর্তিত ও পূর্ণাঙ্গ নাট্যরূপ। প্রথম অভিনয় : ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯২৭। পরিচালনা ও অভিনয়ে শিশিরকুমার।

> চরিত্রলিপি : শিশিরকুমার--চন্দ্রবাবু। রবি রায়--বিনোদ। যোগেশ চৌধুরী--নিবারণ। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য--শিবরতন। শৈলেন চৌধুরী--গদাই। রাধিকানন্দ--ললিত। চারুশীলা--ক্ষান্তমণি। কৃষ্ণভামিনী--কমল। প্রভা দেবী--ইন্দুমতী। ঊষাবতী (পটল)--ঠাকুরাণী।

'শেষরক্ষা'র অভিনয় স্বত্ব পাওয়ার জন্য নাট্যমন্দির ও স্টার উভয় সম্প্রদায়ই চেষ্টা করেছিল। রবীন্দ্র নাটকের অভিনয়ের জন্য দুই রঙ্গালয়ের রেষারেষি উল্লেখযোগ্য খবর। ঢেলে সাজানো নাটকটির নতুন নামকরণ রবীন্দ্রনাথ করলেন এবং শিশিরের হাতে দিয়ে মজা করে বললেন--গোড়ায় গলদ ছিল, এবারে শেষরক্ষা হল। অবশ্যই শিশিরের অনুরোধে মঞ্চোপযোগী করে তোলার জন্য।[১]

দৃশ্যপট, সাজসজ্জা ও সম্প্রদায়ের প্রথম শ্রেণীর নটনটীদের অসামান্য অভিনয়ে

১. নাম বদলে গেছে দেখে শিশিরকুমার মন্তব্য করেন : 'গুরুদেব, দর্শক আমার পক্ষে গোড়ায় গলদ নামটি কিন্তু বেশ ছিল।' রবীন্দ্রনাথ মজা করে, অথচ যথাসম্ভব গাম্ভীর্য বজায় রেখে হতাশার ভাণ করে বললেন, গোড়ায় গলদ ছিল, কেটেকুটে শেষরক্ষা করলাম, তা-ও তোমার মন পেলাম না শিশির!
(অমল মিত্র--কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও নটরাজ শিশিরকুমার)

শেষরক্ষা খুবই সাফল্য পেল। বাহুল্যবিহীন মঞ্চসজ্জা ও দৃশ্যপট পত্রপত্রিকার প্রশংসালাভ করল। অভিনয়ে, গানে ও প্রয়োগে নাটকটি জমে গেল। বহুবিচিত্র চরিত্র অভিনয়ের ফাঁকে শিশিরকুমারের চন্দ্রবাবুর চরিত্রে অভিনয় সবাইকে মাতিয়ে দিল।

নাটকের শেষ দৃশ্য গদাই-ইন্দুমতীর বিবাহ। স্টেজের মাঝ থেকে একটি প্লাটফর্ম ও সিঁড়ি দিয়ে প্রেক্ষাগৃহের দর্শকদের সঙ্গে যোগসাধন করা হয়েছিল। চন্দ্ররূপী শিশির ভাদুড়ি বর-কর্তার বেশে মঞ্চ থেকে নেমে এসে দর্শকদের নিমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে আপ্যায়ন করতে থাকেন। মঞ্চে গান শুরু হয় : 'যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে, সেই আমাদের ভালো / আমাদের ওই আঁধার ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালো / ওগো তোমরা সবাই ভালো।' দর্শকাসনে ছড়িয়ে থাকা গায়কের দল তার সঙ্গে গলা মেলাতে থাকে। মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ উৎসব মুখরিত বিবাহ-প্রাঙ্গণের রূপ ধারণ করে। শেষ দৃশ্যের এই উপস্থাপনা রবীন্দ্রনাথ সহ অনেকেরই সপ্রশংস অভিনন্দন লাভ করে। শিশির ভাদুড়ি এইভাবে দর্শক ও মঞ্চের ভেদরেখা তুলে দিয়েছিলেন।

এই উপলক্ষে মজাদার সব বিজ্ঞাপনও দেওয়া হতো : 'মহাশয়গণ, সবান্ধবে, মদীয় নাট্যমন্দির ভবনে শুভাগমন করিয়া মহাসমারোহে শুভকার্য সুসম্পন্ন করাইবার ব্যবস্থা করিবেন। ইতি বিনীত চন্দরদা।'--'হাউসফুল' অভিনয় চলেছিল বহুদিন। সাধারণ ও বোদ্ধা-রুচিশীল--উভয় শ্রেণীর দর্শকের আগমনে 'শেষ রক্ষা' সাফল্যলাভ করেছিল।

নাট্যমন্দিরে এরপর অভিনীত হল **'তপতী'**। প্রথম অভিনয় : ২৫ ডিসেম্বর, ১৯২৯। ভূমিকালিপি :

> বিক্রমদেব--শিশির ভাদুড়ি। নরেশ--জীবন গাঙ্গুলি। দেবদত্ত--যোগেশ চৌধুরী। ত্রিবেদী ও চন্দ্রসেন--অমলেন্দু লাহিড়ী। কুমার সেন ও রত্নেশ্বর--রবি রায়। সুমিত্রা--প্রভা দেবী। বিপাশা--কঙ্কাবতী। গৌরী--সুশীলাবালা (ছোট)।

বহুপূর্বে অভিনীত মঞ্চসফল 'রাজা ও রানী' নাটকের রবীন্দ্রনাথকৃত পরিবর্তিত রূপ 'তপতী'। সাধারণ রঙ্গালয়ে এই নাটক চলবে না--এবম্বিধ আপত্তি সত্ত্বেও শিশিরকুমার 'তপতী' প্রযোজনা করলেন। রবীন্দ্রনাথও আরো কিছু ঘষামাজা করেছিলেন। প্রচুর অর্থব্যয়ে ও পরিশ্রমে 'তপতী' নামানো হলো। মঞ্চসজ্জা--শিল্পী রমেন চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীত--দিনেন ঠাকুর। প্রত্যেকের অভিনয় পত্র-পত্রিকায় উচ্চ প্রশংসিত হল। সাজসজ্জা, মঞ্চ, সঙ্গীত, আলো--উপস্থাপনার মান বাড়িয়ে দিল। কঙ্কাবতীর কণ্ঠে গান : 'প্রলয়-নাচন নাচলে যখন', 'আলোক চোরা লুকিয়ে এলো ঐ', 'তোমার আসন শূন্য আজি'--খুবই ভালো হয়েছিল।

এতদসত্ত্বেও 'তপতী' চলল না। রসিকজন ফুরিয়ে গেলেই, দর্শকাসন শূন্য থাকতে লাগল। দর্শক-শূন্য অডিটোরিয়াম দেখে নায়িকা প্রভাদেবী অনুযোগ করলে শিশিরকুমার বলেছিলেন--ঐ শূন্য চেয়ারগুলিকে দর্শক ভেবে অভিনয় চালিয়ে যাও। স্টারে এই সময়ে সামাজিক আবেগধর্মী নাটক 'মন্ত্রশক্তি'র সঙ্গে 'তপতী' পাল্লা দিতেই পারল না। প্রচুর আর্থিক লোকসান দিয়ে তপতীর অভিনয় বন্ধ করে দিতে হলো। অবশ্য 'লীজ' শেষ হওয়ায় শিশিরকুমারকে কর্ণওয়ালিস থিয়েটার ছেড়ে দিতে হলো, সেটাও 'তপতী'

বন্ধ হয়ে যাওয়ার আরেকটি কারণ। অবশ্য পরে আর শিশিরকুমার কোথাও 'তপতী'র অভিনয় করেন নি। 'নাচঘর' পত্রিকা দুঃখ করে লিখেছিল (২৩ ফাল্গুন, ১৩৩৬) : 'রবীন্দ্রনাথের নাটকের মর্মগ্রহণ করবার মতো শিক্ষার উৎকর্ষ ও রসবোধ এদেশের দর্শক সাধারণের নেই, তাই 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' এদেশের সাধারণ রঙ্গমঞ্চে আজও অভিনীত হয়নি। 'তপতী'র অভিনয়ে দর্শকের অভাব একথা সপ্রমাণ করছে।'

'যোগাযোগ' উপন্যাসের নাট্যরূপ শিশিরকুমার মঞ্চস্থ করলেন নব প্রতিষ্ঠিত 'নবনাট্য মন্দিরে' ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর। শিশিরের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই নাট্যরূপ দিলেন। অভিনয় করলেন :

> মধুসূদন--শিশির ভাদুড়ি। বিপ্রদাস--শৈলেন চৌধুরী। কুমুদিনী--কঙ্কাবতী। নবীন--কানু বন্দ্যোপাধ্যায়। মতির মা--রানীবালা। শ্যামা--ঊষাবতী (পটল)।

রবীন্দ্রনাথ অভিনয় দেখতে আসেন এবং শিশির ও বিশেষ করে কঙ্কাবতীর অভিনয়ের প্রশংসা করেন। কিন্তু 'যোগাযোগ' নাট্যরূপের দুর্বলতা, অহেতুক গান (কয়েকটি গান আবার রবীন্দ্রনাথের লেখা নয়। প্রযোজনার স্বার্থে মেনে নিয়েছিলেন) ও পরোক্ষ চরিত্র বিশ্লেষণ সার্থক প্রযোজনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে।

যোগাযোগ অভিনয়ে সেরকম দর্শক সমাগম হলো না। কিছু দিনের মধ্যেই আবার আর্থিক লোকসান দিয়ে অভিনয় বন্ধ করে দিতে হলো।

শিশির ভাদুড়ি ও রবীন্দ্রনাথ--পারস্পরিক মানসিক সান্নিধ্যের জন্যই রঙ্গালয়ে দুজন একত্রিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ খুশি হয়ে তাঁর নাটক ও নাট্যরূপগুলি শিশিরকে অভিনয় করতে দিয়েছেন। আবার শিশিরও অনেক পরিশ্রমে রবীন্দ্রনাথের নাটক বা নাট্যরূপগুলি অভিনয় করেছেন। কিন্তু তাঁর অন্য প্রযোজনার তুলনায় তা খুবই স্বল্প। 'রক্তকরবী', 'বাঁশরী' নাটকের অভিনয়ের অনুমতি রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দিয়েছিলেন। সেগুলিও করা হয়নি। 'চিরকুমারসভা' বা 'শেষরক্ষা' ছাড়া কোনোটিই সাফল্যলাভ করেনি, বরং প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল। শেষের দিকে, রবীন্দ্রনাথ শিশির ভাদুড়ির ওপর আগের মতো ভরসা রাখতে পারেন নি। শিশির যে সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রচলিত আবেষ্টনীর বাইরে যেতে পারছেন না--তা রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন। তাই নিজের নাটকের অভিনয় ছাড়া তিনি শিশির প্রযোজিত অন্য নাটক আর দেখতে যান নি। এমন কি 'যোগাযোগে'র অভিনয়ও দেখতে গেছেন 'মনে কুণ্ঠা' নিয়ে।

রবীন্দ্রনাথের নাটককে শিশির ভাদুড়ি কিছু বোদ্ধা দর্শকের রসিক-মনের কাছে গ্রহণীয় করে তুললেও, সাধারণ রঙ্গালয়ের দর্শকের কাছে আদরণীয় করে তুলতে পারেন নি। অথচ অন্যান্য কতো নাট্যকারের কতো নাটকে তিনি অসামান্য জনপ্রিয়তা ও সাফল্য একসঙ্গে লাভ করেছেন, সেখানে সুধী দর্শকেরও সাধুবাদ পেয়েছেন।

শিশির ভাদুড়ির 'যোগাযোগ' অভিনয়ের পাঁচদিন আগেই পার্শ্ববর্তী 'নাট্যনিকেতন' রঙ্গালয়ে **'গোরা'**র অভিনয় অসম্ভব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। প্রথম অভিনয় : ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৩৬। নাট্যরূপ দেন নরেশ মিত্র এবং পরিচালনা তাঁরই। ভূমিকালিপি :

আনন্দময়ী—রাজলক্ষ্মী। বরদাসুন্দরী—মনোরমা। সুচরিতা—শান্তি গুপ্তা। ললিতা—চারুবালা। পরেশ—অহীন্দ্র চৌধুরী। পানুবাবু—নরেশ মিত্র। গোরা—ভূমেন রায়। বিনয়—জহর গাঙ্গুলি। মহিম—রবি রায়।

গোরার জীবনের ঘটনা ও দ্বন্দ্বকে সহজ করে বলা হলো নাটকে, অথচ উপন্যাসের মূলভাব থেকে বিচ্যুত হয়নি। সাধারণ দর্শক 'গোরা' বুঝতে পেরেছিল। উপন্যাসের আবেদন নাটকে আরো স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছিল। যোগাযোগের মনস্তত্ত্ব সাধারণ দর্শক বুঝে উঠতেই পারে নি। তাছাড়া 'গোরা'র অভিনেতা অভিনেত্রীদের সুনিপুণ অভিনয় দক্ষতা দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল। শিশিরকুমারের 'যোগাযোগ'-এর দলের তখন ভগ্ন অবস্থা, ভালো বলতে কেউ নেই। 'গোরা' ও 'যোগাযোগ'-এর দুই অভিনয়ের তুলনা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> 'গোরা'র অভিনয়ের প্রশংসা অনেকেরই কাছে শুনেছি—যোগ্য অভিনেতা নির্বাচন তার একটি কারণ। 'যোগাযোগে' ঠিক তার বিপরীত। অর্থাভাবে শিশির যাকে তাকে নিয়ে কাজ সারতে বাধ্য হয়, মাঝের থেকে অপযশ হয় লেখার।'

১৯৪১-এ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু পর্যন্ত আর কোনো নতুন নাটক বা নাট্যরূপের অভিনয় সাধারণ রঙ্গালয়ে হয়নি। পুরনোগুলির মধ্যে অভিনীত হয়েছিল, মৃত্যুর আগে-পরে :

> চিরকুমার সভা (নাট্যভারতী, ১৩. ৪. ৪০) ; চিরকুমার সভা (রঙমহল, ১৪. ৭. ৪০ ; ২৩. ১২. ৪২ এবং ৮. ৫. ৬১—তিন দফায়) ; শেষ রক্ষা (শ্রীরঙ্গম, ১. ১০. ৫০) ; মুকুট (রঙমহল, ৮. ৫. ৫২) ; তপতী (মিনার্ভায়, লিটল থিয়েটার গ্রুপ, ১০. ৫. ৬১)।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে স্টার **'নৌকাডুবি'** উপন্যাসের নাট্যরূপের প্রথম অভিনয় করে ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ৭ মে। নাট্যরূপ : মহেন্দ্র গুপ্ত, পরিচালনাও তাঁরই। মহেন্দ্র গুপ্ত (রমেশ), ফিরোজাবালা (কমলা) মুখ্য দুটি চরিত্রে অভিনয় করেন। তাছাড়া সন্তোষ সিংহ, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, বন্দনা, সুহাসিনী অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন। 'নৌকাডুবি' বেশিদিন স্টারে চলেনি।

তারপরে নতুন বলতে স্টার নামায় **'কাবুলিওয়ালা'**। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গল্পের নাট্যরূপ দেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকীর বছরে (১০ মে, ১৯৬১) প্রথম অভিনয় হয়। এদিন একই সঙ্গে পূর্ব অভিনীত রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তির উপায়' গল্পের নাট্যরূপটিও স্টারে অভিনীত হয়। কাবুলিওয়ালায় অনবদ্য অভিনয় করেন ছবি বিশ্বাস (কাবুলিওয়ালা)। অন্যান্য চরিত্রে অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় (মিনির বাবা), অপর্ণা দেবী (মিনির মা), মালা বাগ (মিনি ছোট), মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায় (মিনি বড়), প্রেমাংশু বোস (ভোলা), সুখেন দাস (পাঁচু), শ্যাম লাহা (জগন্নাথ) মানানসই অভিনয় করেন।

'মুক্তির উপায়' অভিনয়ে ছিলেন, কমল মিত্র (গুরু), শ্যাম লাহা (বলদেও), ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (ফকির), অনুপকুমার (মাখন), তুলসী চক্রবর্তী (ষষ্ঠিচরণ), সুখেন দাস (চরণ দাস), লিলি চক্রবর্তী (হৈম), গীতা দে (পুষ্পবালা) প্রমুখ।

১৯৩৬-এ 'গোরা' ও 'যোগাযোগ'-এর পরে একযুগ রবীন্দ্রনাথের কোনো নতুন নাটক

সাধারণ মঞ্চে অভিনীত হয় নি। ১৯৬১-তে শতবার্ষিকীর বছরেই সাধারণ রঙ্গালয়ে রবীন্দ্রনাথের নাটকের মোটামুটি শেষ অভিনয়। মাঝে ১৯৯০-এর দশকে রঙ্গনা থিয়েটার রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবি উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে 'কি বিভ্রাট' নামে ও নানা মজাদার ঘটনার সন্নিবেশে কিছুদিন অভিনয় চালাবার চেষ্টা করেছিল। এবং সাফল্য লাভ-ও করতে পেরেছিল, অন্তত দর্শক আকর্ষণের দিক দিয়ে। তারপরে আজ পর্যন্ত (জানুয়ারি, ২০০৩) কোনো বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ে পেশাদারিভাবে রবীন্দ্রনাথের নাটক বা নাট্যরূপের অভিনয় হয়নি।

চল্লিশের দশকে গণনাট্য সঙ্ঘ রবীন্দ্রনাথের নাটকের অভিনয় শুরু করে। পঞ্চাশের দশকে গ্রুপ থিয়েটারগুলি তাদের প্রযোজনার নতুন প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি এবং বিশেষ করে রূপক-সাঙ্কেতিক নাটকগুলির অভিনয় করতে থাকে। আর রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর নিজস্ব থিয়েটারে তাঁর নাটকগুলির অভিনয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা বারে বারে করে গেছেন। কিন্তু সে অন্য ইতিহাস।

সাধারণ রঙ্গালয়ে রবীন্দ্র নাটকের অভিনয়ের স্বল্পতার কারণ নিয়ে নানা কথা শোনা যায়। সেই তর্কে যাওয়ার আগে অভিনয়ের হিসেবটি নেওয়া যাক। রবীন্দ্রনাথের সর্বশুদ্ধ সাতাশটি নাটক / নাট্যরূপের অভিনয় সাধারণ রঙ্গালয়ে হয়েছিল।

প্রথম যুগে, ১৮৮৬—১৯০০ = ৩টি→২টি নাটক + ১টি নাট্যরূপ

দ্বিতীয় যুগে, ১৯০১—১৯২০ = ১০টি→৪টি নাটক + ৬টি নাট্যরূপ

তৃতীয় যুগে, ১৯২১—১৯৬১ = ১৪টি→৬টি নাটক + ৮টি নাট্যরূপ

দেখা যাচ্ছে, ছোট নাটক, বড়ো নাটক, নাটকের নাট্যরূপান্তর মিলিয়ে ১২টি এবং উপন্যাস ছোটগল্পের নাট্যরূপ ১৫টি অভিনীত হয়েছে। নাট্যরূপের অল্প কয়েকটি রবীন্দ্রনাথের নিজের করা, বাকিগুলি অন্যদের।

১৮৮৬-তে প্রথম রবীন্দ্র নাটকের অভিনয় সাধারণ রঙ্গালয়ে শুরুর পর ১৯০০-এর মধ্যে তিনটির অভিনয় খুবই মঞ্চ সাফল্য ও দর্শক সমাদর লাভ করে। অথচ এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ তেমন কোনো আর নাটক লিখলেন না। ১৮৯৬ থেকে ১৯০৮ অবধি ছোট-খাটো কিছু ব্যঙ্গ নাটিকা ছাড়া আর কোনো নাটক তাঁর নেই। ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধ লিখে তিনি সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতি তাঁর বিরূপতা জানিয়ে দিলেন। সেখানে যে ধরনে ও যে উপায়ে নাটক অভিনীত হয়ে চলেছে, সেগুলির সঙ্গে তাঁর মানসিক সাযুজ্য নেই—একথাও স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন। এবং ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে 'শারদোৎসব' নাটক লেখার মাধ্যমে তিনি নতুন আঙ্গিক ও ভাবনার নাট্য রচনার সূত্রপাত করলেন। যেগুলিকে সমালোচকেরা রূপক-সাঙ্কেতিক নাটক বলে থাকেন। এগুলির ভাব ও প্যাটার্ন এতোই নতুন এবং পরীক্ষামূলক যে সাধারণ রঙ্গালয়ের তদানীন্তন মানসপরিমণ্ডলে এগুলির অভিনয় সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব থিয়েটারেও তার সবগুলির অভিনয় করে উঠতে পারেন নি নানা কারণে।

১৯ শতকের শেষ দিকে বেশ জনপ্রিয় রবীন্দ্র নাটক বিশ শতকে আর লেখা হল না। রঙ্গালয় তখন রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস, ছোটগল্প, ব্যঙ্গ নাটিকা এগুলিকেই রূপান্তরিত করে অভিনয় করতে লাগল। নাটকের মধ্যে হাল্কা কমেডি জাতীয় শেষ রক্ষা, চিরকুমার সভা, নাচ গান ও মজায় সহজ সাফল্য লাভ করল। ছোটগল্পের ছোট নাট্যরূপ অন্য নাটকের সঙ্গে একই রাতে অভিনয় করা হল। এইভাবে অর্ধেন্দুশেখর, অমরেন্দ্রনাথ, অপরেশচন্দ্র ও শিশিরকুমারের চেষ্টায় রবীন্দ্র নাটক ও নাট্যরূপের অভিনয় চলল। ১৯১৩-তে নোবেল পুরস্কারের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে সাধারণ রঙ্গালয় রবীন্দ্রনাথের নাটকের অভিনয় করতে চেয়েছে। কিন্তু রূপক-সাংকেতিক ছাড়া অন্য তেমন কোনো সাধারণ রঙ্গালয়ের উপযোগী নাটক তারা পায়নি। তাই বাধ্য হয়েই গল্প উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে তাদের মতো অভিনয় করেছে। দেখা যাচ্ছে, সাধারণ রঙ্গালয় রবীন্দ্র নাটক থেকে একেবারে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি, আবার রবীন্দ্রনাথও সাধারণ রঙ্গালয়ে তাঁর নাটক অভিনয়ে কোনোরকম আপত্তি করেননি। বরং অনেকক্ষেত্রে সাহায্যই করেছেন, পরিবর্তন মেনে নিয়েছেন, নিজে পরিবর্তন করে দিয়েছেন, অভিনয় দেখতে গেছেন, প্রশংসাসূচক অভিনন্দনও জানিয়েছেন। নাট্যরূপ ধরলে রবীন্দ্রনাটক খুবই অল্প হয়েছে রঙ্গালয়ে একথা যেমন মানা যায় না, তেমনি রবীন্দ্রনাথ সাধারণ রঙ্গালয় থেকে মুখ ফিরিয়ে ছিলেন একথাও মানা যায় না। তবে সাধারণ রঙ্গালয়ের পরিবেশ, তাদের উপস্থাপনার বিশেষ কৌশল, বাণিজ্যিক থিয়েটারের মনোবৃত্তি ও দর্শকের সাধারণ মান—রবীন্দ্রনাথের পছন্দসই ছিল না। তাই তিনি কোনোদিনই সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে যুক্ত থেকে, তাদের মতো অভিনয়যোগ্য নাট্যরচনা করেননি। অনুরোধে উপরোধে নাট্যরূপ দিয়ে দিয়েছেন মাত্র, অভিনয়ের সম্মতিও দিয়েছেন. কিন্তু কখনোই কোনোদিন মানসিক সাজুয্য পাননি। তবে তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হোক—তবে তাঁর নিজের রুচি ও রসবোধের কাছাকাছি হোক। অথচ তিনি স্বয়ং কিছুতেই সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে যুক্ত হলেন না। তা হলে, গ্যয়টে, শেক্সপীয়র. চেকভ, হাউপ্টম্যান, বার্নার্ড শ', মায়ারহোল্ড, ইবসেন, আর্থার মিলার প্রমুখ নাট্যকারদের মতো সে এক অনন্য ঐতিহাসিক সংযোগ স্থাপিত হতো।

অথচ সাধারণ রঙ্গালয়ের বাইরে থেকে 'শারদোৎসব' এবং তারপর যেসব নাটক লিখতে লাগলেন, সেখানে অভিনীত নাটকের একশো যোজন দূরে সেগুলির অবস্থান।

১৮৮৬ থেকে ১৯৬১ এই পঁচাত্তর বছরে সাধারণ রঙ্গালয়ে ২৭টি নাটক / নাট্যরূপের অভিনয় ১৪টি রঙ্গালয় নতুনভাবে কিংবা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অভিনয় করেছে। রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখা ৪১টি নাটকের বেশিরভাগই অভিনীত হয়নি। অতি সাধারণ হাল্কা প্রহসন, ব্যঙ্গকৌতুক এবং সাধারণ ছোটগল্পের এবং উপন্যাসের নাট্যরূপ অভিনীত হয়েছে। নাটক বলতে, রাজা ও রানী, বিসর্জন, শেষরক্ষা, তপতী, চিরকুমার সভা, ছোট আকারের মুকুট কিংবা গৃহপ্রবেশ। তাই পুরোপুরি রবীন্দ্রনাথ সাধারণ রঙ্গালয়ে গৃহিত না হওয়ার কয়েকটি কারণ :

১. সাধারণ রঙ্গালয়ের দর্শক রবীন্দ্রনাটক গ্রহণের উপযুক্তভাবে তৈরী হয়নি। ফলে বেশিরভাগই সাফল্যলাভ করেনি।

২. বহির্ঘটনাপ্রধান, হাল্কা রঙ্গরস এবং নৃত্যগীতে ভরা তদানীন্তন নাটকগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাটকের কোনো মিল ছিল না।

৩. রবীন্দ্র নাটক উপস্থাপনার যে পরিশীলিত দক্ষতা প্রয়োজন—সে দক্ষতা বা নিষ্ঠা এবং সময় (তখন মঞ্চে তাড়াতাড়ি নাটক নামাতে হতো) কোনো রঙ্গালয়েরই ছিল না। তাঁর নাটকের যথার্থ মুল্য তাই স্বীকৃত হয়নি।

৪. রবীন্দ্র নাটক অভিনয়ের উপযুক্ত নির্দেশক বা অভিনেতা-অভিনেত্রী তখনো তৈরী হয়নি। চরিত্রের অন্তর্মুখিনতা ফোটাবার দক্ষতা, বিশেষ করে নারী চরিত্রের, সকলের ছিল না। অভিনয়ের ব্যর্থতার দায় নাট্যকারের উপর পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত তাঁর বিশ্বাসভাজন শিশিরকুমারের উপরও ভরসা রাখতে পারেননি। অন্যদের কথা তো, বলাই বাহুল্য।

৫. সাধারণ রঙ্গালয়ের মঞ্চব্যবস্থা ও পরিবেষ্টনী রবীন্দ্রনাথের জানা ছিল না। রবীন্দ্রনাথের নিজের থিয়েটার পরিমণ্ডলের উপযোগী নাটকগুলির অভিনয় সাধারণ রঙ্গালয়ে করতে তাই অসুবিধে হত। অনেক পরিবর্তনের প্রয়োজন হতো। পৃথিবীর অন্য শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের মতো রবীন্দ্রনাথ যদি সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে যুক্ত হতে পারতেন, তাহলে রবীন্দ্রনাথের মানসজগৎ ও থিয়েটারের আবেষ্টনী উভয়ে মিলে বাংলায় অসাধারণ নাটকের সৃষ্টি হতে পারত। তাঁর নিজের থিয়েটারের অভিনয় তাঁর নিজের পরিমণ্ডলেই সীমাবদ্ধ ছিল, বৃহত্তর জনমানসে কোনো সাড়া ফেলতে পারেনি।

৬. বাংলা নাটক ও অভিনয় মঞ্চকে ধরে এগিয়েছে এবং বাণিজ্যিক থিয়েটারের ব্যবস্থার মধ্যেই লিখিত ও অভিনীত হয়েছে। রবীন্দ্র নাটক শৌখিনভাবে অভিনয়ের প্রেরণাতেই রচিত। সাধারণ রঙ্গালয়ের বিষয়বস্তু, ভাবধারা ও প্রয়োগব্যবস্থার কোনোটার সঙ্গেই রবীন্দ্রমানসের যোগ ছিল না।

৭. প্রথম যুগ ছাড়া পরবর্তীকালে কোনো নাটকই (চিরকুমার সভা ও শেষরক্ষা বাদে) তেমন সাফল্য পায়নি। ব্যর্থতার আর্থিক দায়িত্বের কারণে অনেক মঞ্চ-মালিকই রবীন্দ্র নাটকের অভিনয় করতে চাননি। যারা করেছেন (অমর দত্ত, অপরেশচন্দ্র, শিশিরকুমার এবং অর্ধেন্দুশেখর) তারাও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ব্যক্তিগত অনুরাগে করেছেন এবং বিশ্বখ্যাতি পাওয়ার পর (১৯১৩) অনেকে তাঁর জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছিলেন।

৮. প্রথম যুগ থেকেই রবীন্দ্রসাহিত্যকে দুর্নীতি ও অশ্লীলতার দায়ে পড়তে হয়েছে। তাঁর নাটকও এর থেকে মুক্ত নয় বলে অনেকের ধারণা ছিল, তাই সে যুগের অমৃতলাল বসু বা গিরিশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কোনো নাটকের অভিনয় তাঁদের থাকাকালীন মঞ্চে অভিনীত হোক, তা চাননি।

৯. রবীন্দ্র নাটকের ভাষা ও সংলাপ এবং ভাবভঙ্গির মধ্যে সে যুগে অনেকেই 'মেয়েলিপনা' ও 'ন্যাকামি' লক্ষ্য করেছেন, পৌরুষ ভাবের অভাব ছিল বেশি বলে নাটক ও রবীন্দ্র অনুরাগীদের ব্যঙ্গ করা হতো। সে যুগের থিয়েটারে দর্শকেরা অভিনয়ের পৌরুষ ও দাপট পছন্দ করত বেশি।

১০. রক্ষণশীল, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও ধর্মান্ধ থিয়েটারে উদার উন্মুক্ত মানবতাবাদের রবীন্দ্র নাটক গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। রবীন্দ্র জীবনাদর্শের বিরোধী অনেকেই ছিলেন।

১১. জীবনাবেগের অভাব এবং কৃত্রিমতা রবীন্দ্র নাটকে বর্তমান--সাধারণ রঙ্গালয় তার বিপরীত ছিল।

১২. দেবনারায়ণ গুপ্তের মতে (দীর্ঘকাল স্টার থিয়েটারের মঞ্চাধ্যক্ষ, পরিচালক ও নাট্যকাররূপে যুক্ত থাকার অভিজ্ঞতায় বলেন) : 'জীবনটাকে সাধারণভাবে দেখা আর জীবনদর্শন উপলব্ধি করা এক কথা নয়। সাধারণ রঙ্গালয়ের দর্শকেরা জীবনটাকে দেখতে এসেছেন, জীবনদর্শনের আস্বাদ গ্রহণ করতে আসেননি বলেই, সাধারণ রঙ্গালয়ে রবীন্দ্রচর্চা ব্যর্থ হয়েছে।'

১৩. প্রখ্যাত নট ও সেযুগের নাট্য পরিচালক অহীন্দ্র চৌধুরীর মত : 'আমি মনে করি তাঁর (রবীন্দ্রনাথ) নাটকের অভিনয় বিশ্বকবির বিশেষভাবে পরিকল্পিত রঙ্গ-মঞ্চ ছাড়া অন্য কোথাও হতে পারে না।' (বাঙালির নাট্যচর্চা)

১৪. রবীন্দ্র সমালোচক অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর 'রবীন্দ্র নাটকের অভিনয় যোগ্যতা' সম্বন্ধে মত : তাঁর নাটক এতই সূক্ষ্ম বায়বীয় ব্যাপার যে, মঞ্চে রূপ নেবার মতন ওজন ও নির্দিষ্ট রেখার বন্ধন সেগুলির কোনদিনই হবে না।...'দেশে যতই শিক্ষা বিস্তারিত হোক, রুচির যতই উন্নতি হোক, রবীন্দ্র নাটক কখনো সাধারণ রঙ্গ-মঞ্চের বস্তু হইয়া উঠিবে না।' (রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ)

১৫. রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মত : 'রবীন্দ্রনাথের নাটক যতটা পাঠযোগ্য ততখানি অভিনয়যোগ্য নয়, আসলে মঞ্চসাফল্যের গৈরিশী নৈপুণ্য রবীন্দ্রনাথের আয়ত্ত ছিল না--রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই ত্রুটি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। তাই ক্রমশ তিনি তাঁর নাটকগুলিকে ঘটনামুখ্যতা থেকে ভাবধর্মিতার দিকে অগ্রসর করে নিয়েছেন।' ('স্বাধীনতা' পত্রিকা, ৪-১২-১৯৬০)।

১৬. বাংলা থিয়েটারের উদ্ভব ও বিকাশ বিলিতি থিয়েটারের প্রভাবে। বাংলা নাটকের বিবর্তনও সেই মঞ্চব্যবস্থার মধ্যেই হয়েছে। তাই এদেশের থিয়েটার ও নাটক ইংলন্ডের মঞ্চব্যবস্থা ও নাট্যরচনা থেকে এসেছে। বাংলা দেশজ প্রাণের সঙ্গে কোনো যোগ গড়ে ওঠেনি। তার ওপরে বাণিজ্যিক থিয়েটারে অভিনয় সাফল্য মানেই দর্শক আনুকূল্য বোঝায়। সাধারণ রঙ্গালয় এই সব ভাবনার পরিমণ্ডলেই ঘুরপাক খেয়েছে। দেশীয় রীতি ও ভাবনা থেকে দূরে সরে থেকে বাংলা নাটক ও মঞ্চের কোনো বিস্তৃতি ঘটেনি। একই গলিপথে ঘুরে পথ হারিয়েছে। কেউ,

এমনকি শিশিরকুমার পর্যন্ত তাই মুক্তি পাননি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রথম দিকে বিদেশী থিয়েটার ও নাটকের প্রভাবে থাকলেও ক্রমে তা কাটিয়ে দেশজ রীতি, রূপ, আঙ্গিক, ভাষা ও প্রকাশের ভাব ও রূপাঙ্গিককেই গ্রহণ করেছিলেন। নিজের থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথ নিজের নাটকের সেই রূপাঙ্গিককেই ধরতে চেয়েছিলেন। বিলিতি থিয়েটারের নকলে গঠিত নাটক ও মঞ্চের ধারণা থেকে তা অনেক ভিন্ন ও স্বপ্রতিষ্ঠ। সাধারণ রঙ্গালয় অন্ধভাবে নিজের গণ্ডীতেই পথ হাতড়েছে—সম্মুখে উপস্থিত ভাস্বর আলোকবর্তিকা উপলব্ধি করার প্রস্তুতি ও ব্যবস্থা তাদের ছিল না।

১৭. স্তানিস্লাভস্কি যেমন সাধারণ রঙ্গালয়ের দর্শককে তৈরি করে নিতে নিতে 'চেকভে'র নাটক জনপ্রিয় করেছিলেন, বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ে সেরকম কোনো রবীন্দ্রপ্রযোজক আসেনি। শিশিরকুমারের. ক্ষমতা থাকলেও তিনি সাধারণ রঙ্গালয়ের ব্যবস্থাতেই নিজেকে হারিয়ে ফেললেন। শিশিরকুমারের মন্তব্য : 'আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য, আমাদের রঙ্গমঞ্চের দুর্ভাগ্য, সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠভাবে গড়ে উঠল না।'

১৮. বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাটক প্রযোজনার অনীহা প্রসঙ্গে প্রখ্যাত নাট্য পরিচালক ও অভিনেতা শ্রী বিভাস চক্রবর্তী মন্তব্য করেন :

ক. 'রবীন্দ্রনাথের সব নাটকই দারুণ ভালো বলা চলে না। কয়েকটি নাটক অত্যন্ত সাধারণ স্তরের, কয়েকটি বড়ো বেশি ছকে বাঁধা, কয়েকটি কোনো বিশেষ উপলক্ষে রচিত।'

খ. 'আইডিয়ার স্তরে যখন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেন, তখন উভয়পক্ষকে সমানভাবে তুলে ধরতে পারেন না তিনি। তাই বিসর্জনের প্রতিটি প্রযোজনায় রঘুপতিরা ব্যর্থ হন (বিশেষ ক্ষেত্রে সীমিত ক্ষমতার অভিনেতাদের কথা বাদ দিলেও)।'

গ. রবীন্দ্রনাথের বেশিরভাগ চরিত্রকে আপাতভাবে বাস্তব বলে মনে হয় না, বিশেষ করে তারা যখন রবীন্দ্রনাথের ভাষায় কথা বলে, নিজের ভাষায় নয়। [বিভাস : ব্যক্তিগত ও শিল্পগত]

আবার বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্য প্রযোজক ও পরিচালক উৎপল দত্তের মন্তব্য অন্য কথা বলে :

> 'রবীন্দ্রনাথ জীবিত অবস্থায়ই জনপ্রিয় নাট্যকার হিসেবে জনতার প্রণাম কুড়িয়ে গেছেন! ভালো নাটক মাত্রেই একাধারে মঞ্চ সচেতন এবং সাহিত্য সচেতন। সেই মঞ্চসাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে রবীন্দ্রনাথে। মাইকেলের কৃষ্ণকুমারীতে ওর শুরু ; ক্ষীরোদপ্রসাদে ওর পুষ্টি ; রবীন্দ্রনাথে ওর চরম বিকাশ।' [চায়ের ধোঁয়া]

১৯. রবীন্দ্রনাথই রবীন্দ্র নাটকের শ্রেষ্ঠ প্রযোজক—কিন্তু সে স্বতন্ত্র ইতিহাস।

রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার

[রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব থিয়েটার। নিজের লেখা নাটক রবীন্দ্রনাথ নিজেই প্রযোজনা করছেন যেখানে, সেটাই রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার। এই থিয়েটারের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাট্যভাবনা এবং থিয়েটার ভাবনার যুগ্ম পরিচয় পাওয়া যাবে। বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস।]

রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) যখন নাটক লেখা শুরু করেন তখন বাংলা থিয়েটারে পেশাদারি-নাট্যশালার যুগ চলছে। থিয়েটারের ইতিহাসে যাকে পাবলিক থিয়েটার বা সাধারণ রঙ্গালয় বলা হয়ে থাকে। গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল, কেদার চৌধুরী প্রভৃতির নেতৃত্বে সাধারণ রঙ্গালয়ের সে বেগবান যুগে একের পর এক থিয়েটার গড়ে উঠছে, নানা ধরনের নাট্যাভিনয় চলেছে। অভিনয়ে নাচে গানে বাংলা থিয়েটার তখন মাতোয়ারা।

রবীন্দ্রনাথের বাড়ির অনতিদূরে অবস্থিত এইসব নাট্যশালাগুলির সঙ্গে তাঁর কোনো প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। বরং বলা যেতে পারে, তাঁদের ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক মঞ্চ ও অভিনয়ধারাই তাঁকে নাটক লিখতে ও অভিনয় করতে অনুপ্রাণিত করেছিল।

রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে তাঁদের বাড়িতেই নাটকের একটা আবহাওয়া তৈরি হয়েছিল। শিশুকালে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'জোড়াসাঁকো নাট্যশালা', বাড়ির লোকজনের উদ্যোগে। ১৮৬৫ থেকেই সেখানে নাট্যাভিনয় শুরু হয়েছিল। ধনী বাঙালি বাড়ির সখের নাট্যশালাগুলির মতো জৌলুষ ও জাঁকজমক দেখানোর চেয়ে এখানে পাশ্চাত্য ও ভারতীয় নাট্যরীতি এবং দেশজ নাট্যকলার ভাবনা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটা প্রয়াস ছিল। তারও অনেক আগে, পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর সাহেবদের থিয়েটারের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন, একসময়ে মালিকানাও গ্রহণ করেছিলেন। পিতা দেবেন্দ্রনাথ সঙ্গীত ও নাটকে অনুরাগী ছিলেন। আত্মীয় পাশের বাড়ির গনেন্দ্রনাথ. গুনেন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ অভিনয়ে উৎসাহী ছিলেন। নতুনদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সঙ্গীত ও নাটকে নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। দিদি স্বর্ণকুমারীরও অনুপ্রেরণা ছিল। পারিবারিক উত্তরাধিকার এবং সমসাময়িক পরিবেশ তাঁকে নাট্যরচনা, প্রযোজনা এবং অভিনয়ে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

রবীন্দ্র প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথের থিয়েটারকে তিনটি পর্বে ভাগ করে নেওয়া যায়। নাট্যরচনা শুরু করা থেকে প্রথম একুশ বছর (১৮৮১-১৯০১) তাঁর কলকাতার প্রথম পর্বে দুটি ভাগ—(১) জোড়াসাঁকো বাড়ির থিয়েটার পর্ব। (২) সঙ্গীত-সমাজের থিয়েটার-পর্ব। তারপরে ১৯০১ থেকে ১৯১৫ পর্যন্ত দ্বিতীয়, শান্তিনিকেতন পর্ব।

পরবর্তী ২৫ বছর তৃতীয়, মিশ্রপর্ব--কখনো কলকাতায়, কখনো শান্তিনিকেতনে।

ঠাকুরবাড়ির অভিনয় হতো তিনতলার ছাদে, প্রাঙ্গণে এবং বিচিত্রা ভবনে। কোনো কোনো অভিনয় হয়েছে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কলকাতা পার্ক স্ট্রিটের বিরজিতলার বাড়িতে। সঙ্গীত সমাজের সদস্যদের অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রায় দশ বছর নাটক লেখা, অভিনয় করা এবং নাট্য পরিচালনায় যুক্ত ছিলেন। শান্তিনিকেতনে তাঁর কর্মজীবনে অভিনয় হত কখনো খোলা আকাশের নিচে মুক্ত প্রাঙ্গণে, কখনো 'নাট্যঘরে'র মেঝেতে। আবার শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় এসে অভিনয় করতেন কখনো বাড়িতে, কখনো সাধারণ রঙ্গালয় ভাড়া নিয়ে।

বাড়ির থিয়েটারে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবেরাই অভিনয় ও প্রযোজনায় নানা বিষয়ে অংশ নিতেন। সঙ্গীত সমাজের ক্ষেত্রে তার সদস্যেরাই বেশি ছিলেন। শান্তিনিকেতনে তাঁর ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এবং পরিচিত কেউ কেউ অভিনয় করতেন। শেষ পর্বে কলকাতায় এসে অভিনয়ের সময়ে শান্তিনিকেতন দলের সঙ্গে কলকাতায় পরিচিত কেউ কেউ মিশে অভিনয় করত। তবে সব প্রযোজনারই মূলে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁরই নাটক, পরিচালনা তাঁরই, এবং বহুক্ষেত্রে প্রধান অভিনেতা তিনিই। 'শিশিরবাবু (শিশির ভাদুড়ি) একাধিকবার বলেন যে; রবীন্দ্রনাথই তাঁর মতে দেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা।' [ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়—মনে এলো]

রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার সাধারণ রঙ্গালয়ের মতো পেশাদারি বা ব্যবসায়িক ছিল না। বেশির ভাগই বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন জ্ঞানীগুণী মানুষের সমাবেশে অভিনয় করা হয়েছে। দর্শকের সবাই আমন্ত্রিত। শান্তিনিকেতনেও ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, শুভানুধ্যায়ী এবং অন্য বিদ্বজ্জনের উপস্থিতিতেই মঞ্চস্থ হয়েছে। টিকিট বিক্রি করে যখন অভিনয় করেছেন, সে অর্থ থিয়েটারের ব্যবসায়ের জন্য নয়, কোনো-না-কোনো ব্যাপারে সাহায্য হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে। তা শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের উন্নতি বা দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষজনের সাহায্য, যেভাবেই হোক। আর অভিনেতা-অভিনেত্রী বা অন্য সাহায্যকারীবৃন্দ সকলেই নাটকের প্রতি আগ্রহে ও উৎসাহে কাজ করেছে, অর্থকরী লাভালাভের প্রসঙ্গই সেখানে নেই।

রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার পেশাদারি থিয়েটারের মতো যেমন পরিচালিত হয়নি, তেমনি তদানীন্তন শৌখিন নাট্যাভিনয়ের মতোও এগুলি ছিল না। ধারাবাহিকতাহীন, স্বল্পস্থায়ী শখ-শৌখিনতার এই নাট্যাভিনয়গুলির সঙ্গে রবীন্দ্র প্রযোজনার সাযুজ্য ছিল না। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ ষাট বৎসর ধরে তাঁর থিয়েটারের প্রযোজনা চলেছে, নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে এবং ভীষণ 'সীরিয়াস' রবীন্দ্রনাথের নাটকের যাবতীয় সৃষ্টি ও বিকাশ তাঁর থিয়েটারের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছিল। বিস্তৃত ও অসামান্য নাট্যজীবনের পরীক্ষাগার ছিল তাঁর নিজস্ব থিয়েটার। রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে, রবীন্দ্রনাথের কিছু নাটক বা গল্প উপন্যাসের নাট্যরূপ সাধারণ পেশাদারি রঙ্গালয়েও অভিনীত হয়েছিল। কখনো সেখানে তিনি বাইরে

থেকে সাহায্য করেছেন। কিন্তু কোনোটার সঙ্গেই তিনি নিজস্বভাবে বা পেশাদারিভাবে যুক্ত ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার আলোচনা প্রসঙ্গে সেগুলির আলোচনার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

প্রথম পর্ব : বাড়ির থিয়েটার । ১ ।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিককার নাট্যাভিনয়ের হাতেখড়ি তাঁর বাড়ির অভিনয়েই। অন্য কারো লেখা নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়েই তাঁর নাট্যজীবনের শুভারম্ভ।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা **'এমন কর্ম আর করব না'** প্রহসনে, ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে অলীকবাবুর ভূমিকায়। সাহেব চিত্রকর দিয়ে 'সীন' আঁকিয়ে এই নাটকের অভিনয় হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ চরিত্রে অভিনয় করলেন এবং খুবই প্রশংসিত হলেন। অলীকবাবুর চরিত্রেই তাঁর মঞ্চে প্রথম অভিনয় বলে রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন।

অনেকে **মানময়ী** গীতিনাট্যের ঘরোয়া অনুষ্ঠানে মদনের চরিত্রে অভিনয়কেই তাঁর প্রথম অভিনয় হলে অনুমান করেছেন। কিন্তু মামময়ী অভিনয় হয়েছিল ১৮৮০-তে। তাহলে, ১৮৭৭-এর অভিনীত এমন কর্ম আর করব না-কেই রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ের হাতেখড়ি বলা যায়।

কেউ কেউ মানময়ীকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের যৌথ রচনা বলে উল্লেখ করেছেন। অনেকে আবার এই রচনায় অক্ষয় চৌধুরীর হাত আছে বলে মনে করেন। প্রশান্তকুমার পাল (রবিজীবনী-২) সর্বশেষ অনুমান করেছেন, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সুরে কথা বসিয়ে গীতিনাট্যটি বস্তুত অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর লেখা।' তবে আখ্যাপত্রে রচয়িতা হিসেবে কারো নাম নেই, একথা মনে রাখতে হবে। এই গীতিনাট্যের ৭টি গানের মধ্যে ৩টি রবীন্দ্রনাথের রচনা। তার মধ্যে রবীন্দ্ররচিত শেষ গানটি (আয় তবে সহচরী) উল্লেখযোগ্য। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই গীতিনাট্যে বসন্তের ভূমিকায় অভিনয় করেন।

মানময়ীর পরিবর্তিত রূপ **পুনর্বসন্ত**। তাতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ৪টি এবং রবীন্দ্রনাথের ২১টি গান সংযোজিত হয়। অনেক পরে সঙ্গীত সমাজে অভিনীত হয়েছিল, ২৩ ডিসেম্বর, ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে।

বিবাহ উৎসব নামে গীতিনাট্যে রবীন্দ্রনাথ এক নারীর ভূমিকায় নেমে গান গাইতেন।

একেবারে নিজের নাটক, নিজের পরিচালনায় এবং নিজের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ থিয়েটারে প্রথম অবতীর্ণ হলেন **'বাল্মীকি প্রতিভা'**য়, ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের ২৬ ফেব্রুয়ারি। বিদ্বজ্জন সমাগম সভার (প্রতিষ্ঠা : ১৮ এপ্রিল, ১৮৭৪) বার্ষিক অভিনয় উপলক্ষে জোড়াসাঁকোর মহর্ষি ভবনের তেতলার ছাদে পাল খাটিয়ে।

স্টেজ বেঁধে, জ্ঞানীগুণী আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধবদের সামনে অভিনয় হয়েছিল। নিজের লেখা গীতিনাট্যের সুরকার ও পরিচালক ছিলেন তিনি নিজেই। বাল্মীকি—রবীন্দ্রনাথ এবং সরস্বতী—প্রতিভা দেবী (ভাইঝি)। রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব ভাবপরিকল্পনায় গীতিনাট্যটির উপস্থাপনা করেছিলেন। তাঁর অভিনয় ও গান এই অভিনয়ের সম্পদ।

'গানের সূত্রে নাট্যের মালা' 'বাল্মীকি প্রতিভা' অনেকবার অভিনীত হয়। পরের দিকে রবীন্দ্রনাথ এতে সঙ্গীতের সঙ্গে সক্রিয় অভিনয়ের দিকেও গুরুত্ব দেন। দৃশ্য সজ্জাতেও বাস্তবধর্মিতা ফুটিয়ে তোলা হতো। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঘরোয়া' গ্রন্থে জানিয়েছেন, আয়নার ওপর আলো ফেলে বিদ্যুৎ, টিন বাজিয়ে ও ছাদে ডাম্বেল গড়িয়ে বজ্রের শব্দ আর গাছের ডালপালা সাজিয়ে জঙ্গল করা হয়েছিল।

জনপ্রিয় এই গীতিনাট্যটি পরে আদি ব্রাহ্মসমাজের সাহায্যার্থে ঠাকুর বাড়িতেই অভিনয় করা হয়েছিল দুবার (২০ এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৬)। টিকিট ছিল– ৮,৫,৪,৩,২ টাকা। এই অভিনয় থেকে বেশ কয়েক হাজার টাকা উঠেছিল। এই অভিনয়ের সময়েই প্রথম সংস্করণের অনেক পরিবর্তন করা হয়। 'কালমৃগয়া' গীতিনাট্যের অনেকগুলি গান এবং বনদেবীর চরিত্র এখানে গৃহিত হয়।

বোঝা যায়, অভিনয়ের গোড়া থেকেই রবীন্দ্রনাথ নাট্য প্রযোজনার বিষয় নিয়ে ভাবছেন এবং নাটকের পরিবর্তন ও পরিমার্জন করছেন। এবং বলা যায়, নাট্য রচনার ও মার্জনার প্রেরণাই আসছে অভিনয়ের তাগিদ থেকে।

'কালমৃগয়া' গীতিনাট্যটিও বিদ্বজ্জন সভার অধিবেশনে তেতলার ছাদে একইভাবে অভিনীত হয়েছিল। ১৮৮২ সালের ২৩ ডিসেম্বর। মূল উদ্যোক্তা ও প্রযোজনার দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথের। অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ (অন্ধমুনি), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (দশরথ), ঋতেন্দ্রনাথ (অন্ধমুনির পুত্র), অভিজ্ঞতাদেবী (অন্ধমুনির কন্যা) অংশ নেন। 'বাল্মীকি প্রতিভা'র অভিনয় সাফল্যে উৎসাহিত হয়েই কালমৃগয়া রচিত ও অভিনীত হয়।

ঠাকুর বাড়ির ছেলেদের সঙ্গে মেয়েরাও অভিনয়ে মেতে ওঠে। দিদি স্বর্ণকুমারী দেবীর 'মহিলা সমিতি'র অভিনয়ের জন্য রবীন্দ্রনাথ **'মায়ার খেলা'** গীতিনাট্য লিখেছেন। মহিলা সমিতি ও ঠাকুর বাড়ির মেয়েরা একসঙ্গে অভিনয় করে বেথুন কলেজে, ১৮৮৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর। শুধুমাত্র মেয়েরাই অভিনয় করবে বলে গীতিনাট্যটি সেইভাবে লেখা। পরিচালনায় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'মায়ার খেলা' পরে নানান স্থানে অভিনয় করা হয়। একবার অভিনয়ে বসন্ত ও মদন সেজে রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গান গেয়ে মাতিয়ে দিয়েছিলেন। 'ভারতী' পত্রিকার সাহায্যের জন্যও গীতিনাট্যটি বিরজিতলার বাড়িতে মঞ্চস্থ করে প্রাপ্ত টাকা পত্রিকাকে দেওয়া হয়।

'রাজা ও রানী' প্রথম অভিনয় করলেন ১৮৯০, (আশ্বিন, ১২৯৬) সালে, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরজিতলার বাড়ির প্রশস্ত বারান্দায়, রীতিমতো মঞ্চ তৈরি করে। অভিনয় করেন–

> রবীন্দ্রনাথ–বিক্রমদেব। জ্ঞানদানন্দিনী–সুমিত্রা। সত্যেন্দ্রনাথ–দেবদত্ত। মৃণালিনী–নারায়ণী। প্রমথ চৌধুরী–কুমারসেন। নীতিন্দ্রনাথ–সেনাপতি। অবনীন্দ্রনাথ নিয়েছিলেন ছোট ছোট ছয়টি ভূমিকা।

সে যুগে এইভাবে বাড়ির মেয়েদের নিয়ে, বিশেষ করে দেওর-বৌদি, ভাসুর-ভাদ্রবৌ, অভিনয় করাতে ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল। সাধারণ

রঙ্গালয়ে ১৮৭৩-এই অভিনেত্রীরা এসে গেছেন, কিন্তু ভদ্রঘরের মেয়েরা এইভাবে প্রকাশ্যে অভিনয় করছে, এটা মেনে নিতে পারেনি অনেকেই। অবশ্য এই সমালোচনা ঠাকুরবাড়ি বা রবীন্দ্রনাথ কাউকে বিচলিত করেনি। রবীন্দ্রনাথ এর আগে এবং পরেও তাঁর পরিচিত গণ্ডির মেয়েদের নিয়েই সব অভিনয় করে গেছেন। সাধারণ রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীদের মুখাপেক্ষি হননি কখনো।

পূর্ণ অভিনেতারূপে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বময় প্রকাশ এই নাটকাভিনয়েই প্রথম দেখা গেল। শেক্সপীয়রের আদলে লেখা এই নাটকে বিষয়বিন্যাস, চরিত্র নির্মাণ ও আঙ্গিক গঠনে প্রবৃত্তির সংঘাত, হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাত যেভাবে বিন্যস্ত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যদের অভিনয়ে সেগুলির প্রকাশ সকলকে মুগ্ধ করেছিল।

প্রত্যক্ষদর্শী একাধিক জনের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় যে, এমারেল্ড থিয়েটারের নট-নটীরা গোপনে এসে এই অভিনয় দেখে যায়। এমারেল্ডে 'রাজা ও রানী'র অভিনয়ে (প্রথম অভিনয় ৭ জুন, ১৮৯০) ঠাকুরবাড়ির অভিনয়ের ধারা, নারীচরিত্রের অভিনয়কৌশল, পোষাক-পরিচ্ছদ অনুকরণ করেছিল। অভিনেত্রী গুলফন হরি (সুমিত্রা) জ্ঞানদানন্দিনীর সাজসজ্জা, বলবার ভঙ্গি অনুকরণ করেছিল। যদিও মূল প্রযোজনায় তফাৎ ছিল অনেক। দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ থাকাটাই স্বাভাবিক।

নাচগানের পালা গীতিনাট্য থেকে সরে এসে রবীন্দ্রনাথ এই প্রথম পূর্ণাঙ্গ ঘটনাবহুল ও দ্বন্দ্বজাত নাটকের প্রযোজনা করলেন। তাঁর পরিচালনার অভিজ্ঞতা, নায়কচরিত্রে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা, পঞ্চাঙ্ক নাটকের দৃশ্যসজ্জা ও পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা--ইত্যাদি সব কিছু নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ নাট্য উপস্থাপনার মানসভঙ্গি গড়ে তুলেছেন।

'বিসর্জন' নাটকটির প্রথম অভিনয় হয়েছিল বিরজিতলার বাড়িতে, ১৮৯০ তে। 'রাজর্ষি' উপন্যাসের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ (জয়সিংহের মৃত্যু) অবধি ঘটনা অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ নাট্যরূপ দেন, তার নাম হয় বিসর্জন। গ্রন্থাকারে প্রকাশ হয় ১৫ মে, ১৮৯০।

১৯০২-এর শীতকালে শান্তিনিকেতনে বিসর্জন-এর অভিনয়ের কথা লিখেছেন রথীন্দ্রনাথ। নাট্যঘর তৈরি হয়নি তখনো। তাই বিদ্যালয়ের পেছনে খাবার ঘরে রঙ্গমঞ্চ তৈরি হয়। হ. চ. হ. (হরিশচন্দ্র হালদার) 'সীন' এঁকেছিলেন। জগদানন্দ রায় রঘুপতি এবং নয়নমোহন চট্টোপাধ্যায় নক্ষত্রমাণিক্য রূপে অভিনয় করেন। প্রশান্তকুমার পাল (রবিজীবনী—৫) অনুমান করেছেন, এই অভিনয় হযেছিল ১৯০২-এর পৌষ-উৎসবের আগে কিংবা পরে।

প্রথম অভিনয়ের পর অনেকবার বিসর্জনের অভিনয় হয়, কলকাতার নানা স্থানে, শান্তিনিকেতনে এবং শেষের দিকে এম্পায়ার থিয়েটার ভাড়া নিয়ে (১৯২৩) পর পর তিনরাত্রি।

রবীন্দ্রনাথের পরিচালনায় 'বিসর্জন'-এর অভিনয় সুসংবদ্ধ রূপলাভ করে। ক্রমে আঁকা সীন তুলে দিয়ে সমতল মঞ্চকে কয়েকটি ধাপে ভাগ করে অভিনয় করতেন। পোষাক পরিচ্ছদের পরিকল্পনাও নতুনভাবে করেছিলেন। প্রথমদিকের অভিনয়ে রঘুপতির

ভূমিকায় তিনি নামতেন, জয়সিংহ অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অনেকের মতেই রঘুপতির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের অভিনয় তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয়। ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা, তেজোদৃপ্ত কণ্ঠস্বর, উচ্চারণ ভঙ্গি, অনন্যসাধারণ রূপ ও সজ্জা, শোকোচ্ছ্বাসের ভাবাভিব্যক্তি এবং মঞ্চে চলাফেরা—অভিনয়ের নতুন মাত্রা এনে দিয়েছিল।

শান্তিনিকেতনে বিসর্জনের অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রযোজনা ও পরিচালনার সব দায়িত্ব পালন করলেও, নিজে অভিনয় করেননি। কলকাতার এম্পায়ার মঞ্চে ১৯২৩-এর ২৫, ২৭, ২৮ আগস্টের অভিনয়ে জয়সিংহের চরিত্রে বাষট্টি বছরের রবীন্দ্রনাথ অভিনয় করেন। মেক-আপে বয়স কমানো যায়, কিন্তু অভিনেতার শক্তিতে ও গুণে তিনি শারীরিক পরিবর্তনকে সহজসাধ্য করে তুলেছিলেন। রঘুপতি করেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অপর্ণা, প্রথম রাতে মঞ্জু ঠাকুর ; দ্বিতীয় রাত থেকে রাণু অধিকারী। নতুন যোজিত কিছু গান সাহানা দেবী বিনা সঙ্গতে গেয়েছিলেন। আর গোবিন্দমাণিক্য সেজেছিলেন গগনেন্দ্রনাথ।

প্রথম অভিনয়ের পর থেকেই রবীন্দ্রনাথ প্রযোজনার স্বার্থে 'বিসর্জন' নাটকটির অনেক পরিবর্তন করেন। প্রথমের ২৯টি দৃশ্য ক্রমে ২১ এবং শেষে ১৯টি দৃশ্যে এসে দাঁড়ায়। হাসি ও কেদারেশ্বর এবং অপর্ণার অন্ধ পিতাও বাদ যায়। ধ্রুব ও চাঁদপাল চরিত্রের সংস্কার হয়। শেষ অঙ্কেরও কিছু পরিবর্তন করা হয়।

পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ কতোখানি পরিপক্ক অভিনেতা হতে পেরেছিলেন তার সাক্ষ্য পাওয়া যাবে সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রবীণ অভিনেতা অমৃতলাল বসুর কথায়। 'ইন্ডিয়ান ডেইলি নিউজ' পত্রিকায় (৪-৯-১৯২৩) বিসর্জনের অভিনয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে লেখেন : 'নাটক যতো এগোতে লাগল, আমি—এক ঘাঘী মঞ্চঘোটক—অনুভব করলাম আমি অভিনয়ের শিল্পের বাস্তব শিক্ষা লাভ করছি।' সাধারণ রঙ্গালয়ের তুলনায় এই অভিনয় নতুন ধরনের, একেবারে হাল আমলের, সে কথা স্বীকার করে তিনি লিখেছিলেন, 'এই মহান কবি একজন মহান অভিনেতা, মঞ্চবিজ্ঞান শৈলীর একজন অধিকর্তা।'

অহীন্দ্র চৌধুরী থেকে আরম্ভ করে সে যুগের অনেক খ্যাতিমান অভিনেতাও এই অভিনয়ের উচ্চ প্রশংসা করেছেন, 'প্রথম শ্রেণীর শিল্পী' বলে তাঁদের মনে হয়েছে। শুধু রবীন্দ্রনাথ নয়, তাঁর হাতে গড়া অন্য চরিত্রগুলির অভিনয়েরও উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রযোজনায় অনুপ্রাণিত হয়ে শিশির ভাদুড়ি তাঁর থিয়েটারে বিসর্জন অভিনয় করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় 'বহুরূপী' গোষ্ঠিও এর অভিনয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন।

ভারতীয় সঙ্গীত সমাজ । ২। প্রতিষ্ঠা : ২৭ জানুয়ারি ১৮৯৮। ১৫ মাঘ, ১৩০৪।

সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীতসমাজ ছিল অনেকটা মহারাষ্ট্রের গায়েন সমাজের আদলে তৈরি। অনেকটা বিলিতি ক্লাব ও স্বদেশী বাবুদের বৈঠকখানার মিশ্রণে তৈরি। ঠাকুর বাড়ির অনেকের মতোই রবীন্দ্রনাথ এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এর সঙ্গে দশ বৎসর যুক্ত থেকে তিনি বেশ কয়েকটি নাটক রচনা, অভিনয়ের ব্যবস্থা এবং

প্রয়োজনে অভিনয় করেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরও বেশ কয়েকটি নাটকও এখানে অভিনীত হয়েছিল।

'গোড়ায় গলদ' (প্রকাশ : ৩১ ভাদ্র, ১২৯৯/১৮৯২) খামখেয়ালি সভার তাগিদে[১] লেখা। অভিনীত হয় ১৮৯২ সালে। রবীন্দ্রনাথ পরিচালনা ও অভিনয়ে অংশ নেন। তবে খুব পরিশ্রম করে নাটকটি তৈরি করলেও উচ্চবিত্ত সদস্যদের অনভ্যস্ত অভিনয়ের জন্য নাটকটির প্রযোজনা ভালো হয়নি। চন্দ্রবাবুর ভূমিকাভিনেতা শ্রীশচন্দ্র বসু গান ভালো গাইতে পারতেন না। নাটকের শেষ দৃশ্যে তাই রবীন্দ্রনাথ নিজেই মঞ্চে এসে কিছু সংলাপের সঙ্গে গান গেয়ে সমস্যা সামাল দিতেন।

কারো কারো মতে 'গোড়ায় গলদ' অভিনীত হয়েছিল ১৯ জানুয়ারি, ১৯০০ (২২ মাঘ, ১৩০৬) সঙ্গীত সমাজের উদ্যোগে। এই অভিনয় যে উচ্চমানের হয়েছিল অভিনেতা অমৃতলাল বসু তা দ্বিধাহীনভাবে জানিয়েছেন।

তবে এই অভিনয়ের ফলে রবীন্দ্রনাথ গোড়ায় গলদ নাটকের অভিনয়গত ত্রুটিগুলি ধরতে পারেন এবং পরবর্তীকালে ত্রুটিগুলি সংশোধন করার জন্য শিশির ভাদুড়ির অনুরোধমত পরিমার্জনাও করেন। **'শেষরক্ষা'** নামে সেই পরিবর্তিত নাটকটি শিশির ভাদুড়ি 'নাট্যমন্দিরে' অভিনয়ও করেছিলেন সাফল্যজনকভাবে। অভিনয় করতে গিয়ে নিজের লেখা নাটকের ত্রুটি রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন। পরবর্তীকালে এইভাবে তিনি তাঁর বহু নাটকের 'অভিনয়যোগ্য রূপ দেবার জন্যই' নানা পরিবর্তন করেছিলেন। এই পরিবর্তন কোনো ভাবাবেগের ফলে নয়, একেবারে নাট্য প্রযোজক রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতার উৎসাহেই করা হয়েছিল।

'বৈকুণ্ঠের খাতা' লেখা হয় খামখেয়ালি'র আসরে পড়বার জন্য। অনেকে অনুমান করেন যে, ১৮৯৭-তে বৈকুণ্ঠের খাতা প্রথম অভিনীত হয়। তার কোনো তথ্য প্রমাণ নেই। অবনীন্দ্রনাথ ড্রামাটিক ক্লাবের কথা বলেছেন, যাকে 'গার্হস্থ্য নাট্য সমিতি' বলে অনেকে মনে করেন। সেখানেও এর অভিনয়ের কোনো তথ্য নেই। বলা যায়, বৈকুণ্ঠের খাতা সঙ্গীত সমাজে একবার অভিনীত হয়, ১৯০৩-এর জানুয়ারি মাসে। ঐখানেই রবীন্দ্রনাথ--কেদার। জগদীন্দ্রনাথ রায়--অবিনাশ। অবনীন্দ্রনাথ--তিনকড়ি। গগনেন্দ্রনাথ--বৈকুণ্ঠ। তিনকড়ির হাস্য ও চটুল ভূমিকায় অবনীন্দ্রনাথ খুব খ্যাতিলাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ কেদারের কুটিলতা স্বাভাবিক অভিনয়ে ফুটিয়ে তোলেন। পরবর্তীকালে শিশির ভাদুড়ির 'বৈকুণ্ঠের খাতা' অভিনয় দেখে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

> 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র এমন সুনিপুণ অভিনয় এক আমাদের বাড়িতে গগন-অবনদের ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। কেদার আমার ঈর্ষার পাত্র, একদা ঐ পার্টে আমার যশ ছিল।' [অমল হোমকে লেখা চিঠি, ২৩ মাঘ, ১৩১৮]

---

১. খামখেয়ালি সভা। প্রতিষ্ঠা ও প্রথম অধিবেশন : ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৭. এর সঙ্গেই পূর্বের ড্রামাটিক ক্লাব উঠে যায়। আবার পরে সঙ্গীতসমাজের প্রতিষ্ঠা হলে খামখেয়ালি সভা বন্ধ হয়ে যায়। ড্রামাটিক ক্লাব প্রতিষ্ঠার তথ্য নেই।

শান্তিনিকেতন পর্ব

১৮৯৭-এর পর কলকাতাপর্ব শেষ হলো। তারপর শান্তিনিকেতন পর্ব শুরু হতে রবীন্দ্রনাথের মাঝে, প্রায় এগারো বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। এই এগারো বছর তিনি তেমন কোনো নাটক রচনা করেননি, প্রযোজনাও করেননি। কাহিনী, হাস্যকৌতুক, ব্যঙ্গ কৌতুকের ছোট নাটিকাগুলি শুধু এই সময়কার রচনা।

বিশ শতকের গোড়া থেকেই রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে বসবাস শুরু। আশ্রমে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, তার সুষ্ঠু পরিচালনা ইত্যাদির জন্য শান্তিনিকেতনে থাকতে থাকতে সেখানকার ছাত্রশিক্ষকদের নিয়ে নানা উৎসব অনুষ্ঠানে নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করলেন। এই পর্বের নাটকগুলি তাই শান্তিনিকেতনের পরিস্থিতি ও পরিবেশ অনুযায়ী লেখা হল ও সেইভাবে প্রযোজিত হলো। মঞ্চ নেই, মঞ্চ তৈরি করা, কিংবা দৃশ্য সজ্জার মতো অর্থ নেই, মেয়েরা নেই, অভিনেতা বলতে ছাত্র-শিক্ষক, নিজে এবং কিছু শুভানুধ্যায়ী। কলকাতার মতো কোনো দিকের কোনো সুবিধেই এখানে নেই। তাই এই পর্বের নাট্য পরিকল্পনা, রচনা ও প্রযোজনা কলকাতা পর্বের চেয়ে পরিবর্তিত হয়ে গেল। মঞ্চবাহুল্যহীন যাত্রাঙ্গিকে অভিনয়, আড়ম্বরহীন সাজসজ্জা, দৃশ্য পরিকল্পনা নেই, থাকলেও ইঙ্গিতবহ, বাস্তবানুযায়ী নয়। পুরুষেরাই নারীচরিত্রে অভিনয় করছে, ফলে নারীচরিত্রবিহীন কিংবা স্বল্প সংখ্যক নারীচরিত্র রেখে নাটক লেখা হচ্ছে। শান্তিনিকেতন পর্বে লেখা তিনটি নাটক শারদোৎসব, অচলায়ন এবং ফাল্গুনীতে কোনো নারী চরিত্র নেই। আশ্রমে তখন স্ত্রী ভূমিকা অভিনয় করবার মেয়ে ছিল না বলেই, তাঁকে প্রয়োজনে স্ত্রী ভূমিকা বর্জন করতে হয়েছিল। এর আগে আশ্রমে 'বিসর্জন' অভিনয়ে স্ত্রী চরিত্রগুলি পুরুষেরাই অভিনয় করেছিল। উন্মুক্ত পরিবেশে অভিনয়ের ফলে এইসব নাটকে ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যেও প্রকৃতি যেন একটা ভূমিকা পালন করে চলেছে।

এই পর্ব শুরুর মুখেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধটি লেখেন (বঙ্গদর্শন, পৌষ, ১৩০৯)। এই সময়কার নাট্যমানসিকতা এখানে প্রতিফলিত হয়েছে। বাস্তবানুসারী দৃশ্যসজ্জাকে তাঁর 'স্ফীত পদার্থ' বলে মনে হয়েছে। নারীচরিত্র অভিনয়ে অভিনেত্রীর অবশ্য প্রয়োজনীয়তা তিনি অস্বীকার করেছেন। যাত্রাঙ্গিকের মধ্যে নিজের প্রযোজনার সাজুয্য পাচ্ছেন। বিলিতি নকলের বর্বরতার থিয়েটারকে তিনি বরবাদ করে দিতে চাইছেন। এই প্রবন্ধে শান্তিনিকেতন পর্বে রবীন্দ্রনাথের নাট্য প্রযোজনার প্রস্তুতিটুকু কাজ করেছে। পরবর্তীকালে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তিনি তাঁর নিজের নাট্য প্রযোজনায় এর অনেকগুলিকেই আবার অস্বীকার করে নিজের মতো ব্যবহার করেছেন। মঞ্চসজ্জা, সাজসজ্জা, নারীচরিত্রে অভিনেত্রী গ্রহণ শুরু করেছেন। যেগুলি শান্তিনিকেতনপর্বের আগে কলকাতায় করেছিলেন। নাট্য প্রযোজক রবীন্দ্রনাথ তাঁর থিয়েটার ভাবনা গড়ে তুলছেন সমসাময়িক প্রযোজনাগত পরিস্থিতি ও প্রাপ্ত সুযোগ এবং ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। পরিস্থিতির প্রয়োজনে প্রযোজক হিসেবে অনেক কিছু করেছেন। কিন্তু এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তাঁর নাট্যবোধ ও

মানসিকতা যে স্তরে উন্নীত হচ্ছে, বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে তা অনন্য সংযোজন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকছে।

মঞ্চ ভাবনা ও প্রয়োগরীতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নাট্যরচনার মধ্যেও সেই নূতন পরিকল্পনা কাজ করল। তাঁর প্রথম যৌবনের 'সাহিত্যদেবতা' শেক্সপীয়রের আদর্শে তিনি রোমান্টিক নাটকগুলি লিখছিলেন। তার সঙ্গে রোমান্টিক কাব্যনাট্য, গীতিনাট্য-হাস্যরসাত্মক প্রহসন রচনা করছিলেন। এখন লিখতে শুরু করলেন রূপক-সাঙ্কেতিক নাটক। সেখানে ঘটনা ও চরিত্রের দৃশ্যরূপ অপেক্ষা ব্যঞ্জিত রূপই প্রধান হয়ে উঠলো। অঙ্ক-দৃশ্যভাগ উঠে গেল। দৃশ্যের পর দৃশ্য রচিত হলো।

মঞ্চের 'চিত্রপটে'র চেয়ে দর্শকের 'চিত্তপটে'র ওপর ভরসা রেখে রবীন্দ্রনাথ দেশীয় যাত্রার ধরনটিকে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন—'যাত্রার পালাগানে লোকের ভিড়ে স্থান সঙ্কীর্ণ হয় বটে, কিন্তু পটের ঔদ্ধত্যে মন সঙ্কীর্ণ হয় না।'—শান্তিনিকেতনের উন্মুক্ত পরিবেশে ও নতুন অবস্থায় তাঁর নাটক রচনা ও প্রয়োগের দিকে এই নতুন ভাবনাচিন্তার প্রবণতা আসা স্বাভাবিক ছিল।

আরেকটি কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ যে রূপক-সাঙ্কেতিক নাটকগুলি রচনা করেন সেগুলির অভিনয় যেমন শান্তিনিকেতনে, তেমনি কলকাতাতেও হয়েছিল। শান্তিনিকেতনের অভিনয় আঙ্গিকগত দিক দিয়ে অনেকাংশে যাত্রাধর্মীয় হতো। আবার কলকাতায় অভিনয়ের সময়ে গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতি শিল্পীর প্রতীকী মঞ্চ ও দৃশ্যনির্মাণের সাহায্য নিতেন। কলকাতার বাড়ির ও বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে দক্ষ অভিনয়শিল্পীরা অংশ নিতেন। তাই স্থান পরিবর্তন ও সুযোগ সদ্ব্যবহারের কারণে একই নাটকের অভিনয়ে মঞ্চ ও দৃশ্য ব্যবস্থারও পরিবর্তন হয়ে যেত। দু'জায়গাতেই রবীন্দ্রনাথ নির্দেশকের দায়িত্ব পালন করেছেন। এই দ্বৈত ভাবনা তাঁর ছাপানো 'তপতী' নাটকটি থেকে ভালো বোঝা যায়। ভূমিকায় দৃশ্যপট তুলে দেবার জন্য দাবী করেছেন। আবার নাটকের প্রতিটি দৃশ্যে দৃশ্যপটের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শান্তিনিকেতন পর্বের প্রথম নাটক **'শারদোৎসব'** অভিনীত হল ১৯০৮ সালে। 'নাট্যঘর' নামে একটি মাটির ঘরে একদিকের উঁচু মেঝেতে মঞ্চ করে, দর্শকদের বসবার জন্য সতরঞ্চি বিছিয়ে, একেবারে দৃশ্যপটবিহীন অভিনয় হয়েছিল। মঞ্চের দু'ধারে গাছের ডাল লাগিয়ে তাতে দেবদারু পাতা বেঁধে নানা রঙের পট্টবস্ত্র টাঙিয়ে নিখরচায় রুচিসম্মত মঞ্চ তৈরি হয়েছিল। বেনারসে 'ঠাকুরদা' নামে পরিচিত ক্ষিতিমোহন সেন শান্তিনিকেতনে শিক্ষক হয়ে এসেছেন। তাঁর দিকে তাকিয়েই রবীন্দ্রনাথ 'ঠাকুরদা' চরিত্রটি সৃষ্টি করেন এবং কণ্ঠে অনেক গান দেন। ভয়ে ক্ষিতিমোহন এই ভূমিকায় শেষ পর্যন্ত নামেননি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাটকে 'ঠাকুরদা' চরিত্রটি নানাভাবে ও রূপে স্থান পেয়ে গেছে।

এইভাবে শান্তিনিকেতনে অভিনয় করলেন **মুকুট**। প্রথম অভিনয় ২২ ডিসেম্বর, ১৯০৮। দ্বিতীয় অভিনয় হয় ১৯০৯-এর মার্চ-এপ্রিলের কোনো সময়ে। নাটকটির

ভূমিকায় লেখা আছে : 'বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বালকদের দ্বারা অভিনীত হইবার উদ্দেশ্যে 'বালক' পত্রে প্রকাশিত 'মুকুট' নামক ক্ষুদ্র উপন্যাস হইতে নাট্যাকৃত।' শারদোৎসবের সাফল্যে উৎসাহিত হয়েই তিনি মুকুট লেখেন, একথা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন। মুকুট গল্প ও নাটকে কোনো তফাৎ নেই। শুধু গল্প শেষ হয়েছে ট্রাজেডিতে, নাটক সেখানে মিলনান্তক। বোধকরি অভিনয়স্থলের পরিবেশের কারণেই এই পরিবর্তন।

প্রায়শ্চিত্ত ১৯০৯-য়ে প্রকাশিত হলেও ঐ সময়েই অভিনীত হয়নি। কবির পঞ্চাশতম জন্মদিনে, ৮ মে, ১৯১১ (২৫ বৈশাখ, ১৩১৭), অভিনয়ের খবর পাওয়া যায়।

১৯১০-এ লেখা **রাজা** নাটক গ্রন্থাকারে প্রকাশ হয় ৬ জানুয়ারি, ১৯১১। প্রথম অভিনয় করলেন ১৯ মার্চ ১৯১১-তেই। পরে 'রাজা' এখানে ও কলকাতায় অনেকবার অভিনীত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ—ঠাকুরদা। অজিতকুমার চক্রবর্তী—সুদর্শনা। সুশীল চক্রবর্তী—সুরঙ্গমা। জগদানন্দ রায়—কাঞ্চীরাজ।

শান্তিনিকেতন ও কলকাতা পর্ব

কলকাতায় এই নাটক অভিনয়ের পর কথা ওঠে, রবীন্দ্রনাথের এই সমস্ত নাটক অস্পষ্ট ও ধোঁয়াটে এবং অর্থহীন। এবং একেবারেই গতিহীন। নতুন ধরনের এইসব নাটক ও তার উপস্থাপনা বুঝে ওঠা অনেকের পক্ষেই সম্ভব ছিল না। রবীন্দ্রনাথকে তাই বারে বারে এই জাতীয় নাটক নিয়ে কলকাতায় এসে অভিনয় করে যেতে হয়েছে। ৭৪ বছর বয়সেও 'রাজা'র পরিবর্তিত রূপ 'অরূপরতন' নিয়ে কলকাতায় অভিনয় করে গেছেন, ১৯৩৫-এর শেষদিকে। তখন ঠাকুরদা তো করেইছিলেন, আবার নেপথ্যে থেকে অন্ধকারের 'রাজা'র ভূমিকাও পালন করেছিলেন।

'অচলায়তন' নাটকের প্রথম অভিনয় ২৬ এপ্রিল ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে, (১৩ বৈশাখ ১৩২১), দীনবন্ধু এন্ড্রুজ সাহেবের সম্বর্ধনা উপলক্ষে। শান্তিনিকেতনে এই অভিনয়ে ছিলেন—

> রবীন্দ্রনাথ—আচার্য অদীনপুণ্য। সন্তোষ মজুমদার—উপাচার্য। দিনেন্দ্রনাথ—পঞ্চক। জগদানন্দ রায়—মহাপঞ্চক। ক্ষিতিমোহন—দাদাঠাকুর। পিয়ার্সন সাহেবও নেমেছিলেন একজন 'শোনাপাংশু' হয়ে। প্রমথনাথ বিশী—সুভদ্র। সন্তোষ মজুমদার —উপাচার্য।

'ফাল্গুনী'র প্রথম অভিনয় শান্তিনিকেতনের 'নাট্যঘরে' ২৫ এপ্রিল, ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে। রবীন্দ্রনাথ—অন্ধবাউল। ক্ষিতিমোহন—চন্দ্রহাস। জগদানন্দ রায়—দাদা। প্রভাত মুখোপাধ্যায়—সর্দার। অসিত হালদার—কোটাল।

এই পর্বের অভিনয়ে চিত্রবিচিত্র 'সীন' ব্যবহার আগেই বর্জিত হয়েছিল। ফাল্গুনীতেও তাই হল। পরিবর্তে একটা আস্ত বাগান—গাছে ফুল ফুটে আছে, গাছের ডালে দোলনা বাঁধা —এইভাবে মঞ্চ সাজানো হয়েছিল। ১৯১৬-র জানুয়ারিতে জোড়াসাঁকোতেও

ফাল্গুনীর অভিনয় হল। এই প্রথম শান্তিনিকেতন ও জোড়াসাঁকোয় সম্মিলিত সহযোগিতায় রবীন্দ্রনাথের অভিনয় হলো। এরপর থেকে সব নাটকের অভিনয় এইভাবে মিলিত উদ্যোগেই হয়। কলকাতার এই অভিনয় বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সাহায্যার্থে অভিনীত হবে। পয়সা দিয়ে যারা দেখতে আসবে তাদের কাছে নাটকটি খুবই ছোট বলে মনে হবে। এই কারণে রবীন্দ্রনাথ ফাল্গুনীর পূর্বে 'বৈরাগ্যসাধন' নামে একটি দৃশ্য জুড়ে দেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, একটু introduction গোছের scene, এটা ছোট হবে, মেয়ে থাকবে না, শুরুতে যারা আসতে দেরী করবে disturbance-টা ঐ দৃশ্যের ওপর দিয়েই যাবে।

কলকাতার মঞ্চসজ্জায় অবনীন্দ্রনাথ ইঙ্গিতধর্মিতার দিকে নজর দিতেন। খরচ কমের দিকেও খেয়াল রাখতে হতো। পেছনের আঁকা সীনের বদলে দেওয়া হল নীল মখমলের বনাত। দেখতে হল যেন গাঢ় নীল রঙের রাতের আকাশ। ডালপালা কিছু এখানে ওখানে দিয়ে স্টেজ সাজানো হল। বাঁশের গায়ে দড়ি ঝুলিয়ে দোলনা হলো। মনে হতে লাগল যেন উঁচু গাছের ডালের সঙ্গে দোলনা ঝুলছে।

রবীন্দ্রনাথের পরিচালনায় ফাল্গুনীর শেষ অভিনয় হয় শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে, ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে। ফাল্গুনী অভিনয়ের সময়েই রবীন্দ্র উপলব্ধির (মঞ্চের চিত্রপটের চেয়ে দর্শকের চিত্তপটের ওপর নির্ভরতা) সার্থক প্রকাশ ঘটে।

'ডাকঘর' ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে লেখা হলেও প্রথম অভিনয় হয়েছিল কলকাতায় ৩ মে, ১৯১৭-তে। এটি শান্তিনিকেতন ও কলকাতায় অভিনীত হয়েছিল। শান্তিনিকেতনেই প্রথম অভিনয়, ১৯১৭-তেই। এর অনেক আগে 'The Post office' ইংরেজি অনুবাদ কবি ইয়েটসের উদ্যোগে ডাবলিনে (১৭ মে, ১৯১৩) এবং লন্ডনে (১০ জুলাই, ১৯১৩) অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয়টি হয়েছিল মেরী কার্পেন্টার হলে। এই অভিনয় রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে হয়নি। তবে শান্তিনিকেতনের চাইতে কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বিচিত্রাভবনে 'ডাকঘরে'র অভিনয়ই সবদিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। ভূমিকালিপি :

রবীন্দ্রনাথ—ঠাকুরদা। গগনেন্দ্রনাথ—মাধব। অবনীন্দ্রনাথ—মোড়ল। অসিত হালদার —দইওয়ালা। সুরূপা (অবনীন্দ্রনাথের ছোটমেয়ে)—সুধা। আশামুকুল—অমল।

১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে অভিনয় হয়েছিল সাতবার। মঞ্চ বাঁধা হয়েছিল বিচিত্রাঘরের একপাশে, দর্শকাসন ছিল দেড়শো। মঞ্চ পরিচালনায় গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও রথীন্দ্রনাথ। 'ডাকঘর' অভিনয়ের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁদের নানা বর্ণনা থেকে জানা যায়—হলঘরের একপাশে উঁচু-স্টেজ বাঁধা হয়েছিল। মঞ্চে একটি সত্যিকার কুঁড়েঘর তৈরি হয়েছিল, তার খড়ের চাল, ছিটে বাঁশের বেড়া, আসবাবপত্র, আলনা, পিলসুজ, খড়ের চালে বাবুই পাখির শূন্য বাসা—এইভাবে নানা খুঁটিনাটি জিনিসের সমাবেশে মঞ্চটি চমৎকার বাস্তবানুগ রূপ পেয়েছিল। গোবরমাটি লেপে, আলপনা কেটে, পেছনে গবাক্ষের গাঢ়নীল বনাতে রূপালী কাগজে চাঁদ কেটে লাগানো

হয়েছিল। অভ্রের টাসেল দেওয়া শিকেতে রং-করা মাটির হাঁড়ি ঝুলিয়ে, মাটির পিলসুজে প্রদীপ জ্বেলে দেওয়া হয়েছিল। সামনের যবনিকায় নীলপর্দা টানা হলো। চালাঘরের তক্তায় লাল রঙ, ঘরে কুলুঙ্গি, চৌকাঠের মাথায় লতাপাতা, ঠিক যেখানে যেমনটি দরকার, যেন একটি পাড়াগেঁয়ে ঘর। তারপরে 'ফিনিশিং টাচ' হিসেবে একপাশে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো একটি পিতলের দাঁড়, পাখি নেই তাতে, গল্পের আইডিয়ার সাথে মিলে গেল। তারপরে খুব রং-চংয়ের একটি পট উইংয়ের পাশে আটকে দেওয়া হয়।

নাট্যপরিচালক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ এখানে 'দ্বিধাগ্রস্ত'। তাঁর 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে যা বলেছিলেন, 'ডাকঘরের' কলকাতা প্রযোজনায় তা মেলেনি। আড়ম্বরপূর্ণ ও বাস্তবানুগামিতা লক্ষ্য করা গেল মঞ্চসজ্জায়। মঞ্চসজ্জা অবন-গগনরা করেছে বললেও পরিচালক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ সেই দায় এড়াতে পারেন না।

'ডাকঘর' নাটকটি রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে অনেক স্থানে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। কলকাতার অভিনয়ের দ্বিতীয় দিনে মহাত্মা গান্ধী, লোকমান্য তিলক, মদনমোহন মালব্য, এ্যানি বেসান্ত প্রমুখ খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ববর্গ উপস্থিত ছিলেন। অনেকের কাছেই 'ডাকঘরে'র সাজসজ্জা ও অভিনয় রুচি, সৌন্দর্য, দৃশ্যসংস্থান ও পরিকল্পনার দিক দিয়ে অনন্য সাধারণ বলে মনে হয়েছে।

'রাজা ও রানী'র পরিবর্তিতরূপ **তপতী** অভিনীত হয় জোড়াসাঁকোয় ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের পরপর চারদিন, সেপ্টেম্বর মাসের ২৬, ২৭, ২৮ এবং অক্টোবরের ১ তারিখে। (১৩৩৬ সালের আশ্বিন মাসের ১১, ১২, ১৩ এবং ১৫ তারিখে)।

চরিত্রলিপি :

রবীন্দ্রনাথ--বিক্রম। অমিতা ঠাকুর—সুমিত্রা। অজিন ঠাকুর—নরেশ। সুমিতা চক্রবর্তী—বিপাশা। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর—দেবদত্ত। কালীমোহন ঘোষ—কুমার সেন। নলীন মিত্র—চন্দ্রসেন। নিতাইবিনোদ গোস্বামী—ত্রিবেদী।

রবীন্দ্রনাথ ও অমিতার অভিনয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছিল দুটি চরিত্রের সংঘাত ও সংক্ষোভ। শান্তিনিকেতনের অভিনয়ে সুমিত্রা ও বিক্রম সেজেছিলেন অমিতা ঠাকুর ও অজিন ঠাকুর। ১৯২৯-এই শিশিরকুমার ভাদুড়ি এই তপতী নাটক সাধারণ রঙ্গালয় নাট্যমন্দিরে অভিনয় করেছিলেন। দর্শক আনুকূল্যে ব্যর্থ হয়ে বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন।

এখানে 'তপতী' সম্পর্কিত দুটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। এক. কলকাতায় তপতী অভিনয় হওয়ার কিছু আগে (২ আশ্বিন, ১৩৩৬) শান্তিনিকেতনে খবর আসে বিপ্লবী যতীন দাস লাহোর জেলে অনশনে প্রাণত্যাগ করেন। ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে তাঁর এই প্রতিবাদে মৃত্যুবরণ রবীন্দ্রনাথকে উত্তেজিত করে। তিনি ঐ দিনই রচনা করেন 'সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ' গানটি। তপতী নাটক তখন ছাপা হয়ে গেছে। তাই গ্রন্থে গানটি দেওয়া যায়নি। কিন্তু অভিনয়ে ভৈরব মন্দিরের ভৈরবের উপাসক দলের গান হিসেবে নাটকের প্রথমেই রাখা হয়। অভিনয়ের ক্রোড়পত্রে এই গানটি প্রথমেই

ছাপা হয়। [শান্তিদেব ঘোষ--রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচিত্রা]

দুই. রাজা ও রানীতে রত্নেশ্বরের চরিত্র ছিল না। তপতীতে এই চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে প্রজাদের প্রতি শীলাদিত্যের অত্যাচারের যে চিত্রটি তিনি এঁকেছেন, সেটি সে যুগের ইংরেজ শাসকেরই যে চিত্র তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। এই অত্যাচারকে রুখতে হলে জনসাধারণকে কি করতে হবে বা তাদের কি করা উচিত, রানী সুমিত্রার মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তা-ও বলিয়ে দিয়েছেন। এই সংলাপ যে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতবাদের প্রতিধ্বনি তা সহজেই বোঝা যায়। [ঐ]

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের শেষ অভিনয় **'শারদোৎসব'** নাটকে সন্ন্যাসী চরিত্রে, ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ১১ ও ১২ ডিসেম্বর । ঐ বছরেই কলকাতার নিউ-এম্পায়ারে করেন **'অরূপরতন'**, রাজা নাটকের রূপান্তরিত রূপ। রবীন্দ্রনাথ রাজার ভূমিকায় অভিনয় করেন। কিছুদিন আগে অচলায়তন ভেঙে **'গুরু'** লিখেছিলেন। এবার 'রাজা' দেখা দিল 'অরূপরতন' রূপে (১৯২০)। এই রূপান্তরের কারণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ভূমিকায় বলছেন : 'এই নাট্যরূপটি 'রাজা' নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ--নূতন করিয়া পুনর্লিখিত।' রাজাতে সুদর্শনা ছিল রাজার বিবাহিতা স্ত্রী। রূপান্তরে সে অনূঢ়া, পিতৃগৃহস্থিতা। পরের রূপান্তরে আবার সে রাজার স্ত্রী। বর্তমানে এই শেষ রূপান্তরই গৃহিত ও প্রচলিত। প্রথম অরূপরতন থেকে দ্বিতীয় অরূপরতন অনেক বড়ো এবং তাতে কয়েকটি নতুন গানও যোগ করা হয়েছে।

'অরূপরতন' রবীন্দ্রনাথের কলকাতায় শেষ অভিনয়। বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথের নাট্যজীবনে এটাই শেষ অভিনয়।

'রক্তকরবী' একবার অভিনয়ের খবর পাওয়া যায়। ১৯৩৪-এর ৬ এপ্রিল 'দি টেগোর ড্রামাটিক গ্রুপ' রক্তকরবী মঞ্চস্থ করেছিল কলকাতার 'নাট্যনিকেতন' থিয়েটারে। তবে এই নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ততোটা যুক্ত ছিলেন না। তাঁর 'আত্মীয়বর্গ' রক্তকরবীর এই অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ 'তাঁদেরি আহবানে' শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় এসে সেই অভিনয় দেখে গিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ হেমন্তবালা দেবীকে একটি চিঠিতে (২৯ মার্চ, ১৯৩৪) লিখছেন : 'সম্ভবত: আগামী সোম কিংবা মঙ্গলবার কলকাতা অভিমুখে যাব। সেখানে আমার আত্মীয়বর্গ রক্তকরবী অভিনয়ে প্রবৃত্ত, তাদেরি আহ্বানে আমাকে যেতে হচ্ছে। কর্তব্য সমাধা হলেই ফিরে আসতে হবে।'

১৯৩৪-এর ৭ এপ্রিলের চিঠি থেকে (হেমন্তবালা দেবীকে লেখা) আরো জানা যাচ্ছে যে, আগের দিন অর্থাৎ ৬ এপ্রিল রবীন্দ্রনাথ 'রক্তকরবী' অভিনয় থেকে 'শ্রান্ত দেহে ক্লান্ত মনে' জোড়াসাঁকোয় ফিরেছেন।

রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি দুটি থেকে 'রক্তকরবী' প্রযোজনা সম্পর্কে তেমন কোনো খবর পাওয়া না গেলেও, এটুকু বোঝা যায় যে, তিনি এই প্রযোজনার সঙ্গে তেমনভাবে যুক্ত ছিলেন না এবং এই প্রযোজনায় তিনি পরিতৃপ্ত হননি। নিজের নাটকের অভিনয়

দেখতে যাওয়াটা তাঁর কাছে নিছক 'কর্তব্য' বলে মনে হয়েছে। এবং অভিনয় দেখে ফিরেছেন শ্রান্ত দেহে ক্লান্ত মনে।

১৯২৬-য়ে **'নটীর পূজা'** অভিনয় থেকেই রবীন্দ্রনাথের **নৃত্যনাট্যগুলি** নতুন আঙ্গিকে গড়ে উঠতে থাকে। নটীর পূজায় সব চরিত্রই নারী চরিত্র। ভদ্রঘরের মেয়েরা এইভাবে মঞ্চে নাচবে, সকলের মনঃপুত হয়নি। তবে সামাল দেওয়ার জন্য 'উপালি' চরিত্র সৃষ্টি করে রবীন্দ্রনাথ নিজে সেই চরিত্রে মঞ্চে নেমে মেয়েদের অভিভাবকের মতো বাইরের বিরোধিতাকে কাটাতে চেয়েছিলেন। পরেও এই ধরনের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ কোনো ভূমিকা না থাকলেও সাধারণ মঞ্চে বসে থাকতেন। রবীন্দ্রনাথের মহিমান্বিত ও শ্রদ্ধেয় উপস্থিতিতে সব কিছু মানানসই ও গ্রহণীয় হয়ে উঠতো।

পূর্বযুগের গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্যগুলির সঙ্গে এবারের এই সৃষ্টিগুলির তফাৎ অনেক। ভেতরে ভাবপ্রকাশের একটা আবেগ ছিল। তার ওপর শান্তিনিকেতনে তখন অনেক ছাত্রী নাচগান শিখছে তালিম নিয়ে। ভালো গানের ও নাচের মাস্টার এসেছে। এইসব উপকরণ কাছে পাওয়াতে ভেতরের আবেগ বাইরে প্রকাশের ভঙ্গির সহায়তা করল। নাচে গানে নতুন চেহারা ও মাত্রায় এ একেবারে স্বতন্ত্র জিনিস। সাধারণ রঙ্গালয়ের অপেরা—গীতিনাট্যের সঙ্গে এর তফাৎ যোজন-বিস্তৃত। সূক্ষ্মরুচি, মর্যাদা এবং রসসম্ভোগে এই নৃত্যনাট্যগুলির বিচার অন্যভাবে করতে হবে। তাসের দেশ, নটীর পূজা, শ্যামা, চণ্ডালিকা, চিত্রাঙ্গদা, শাপমোচন প্রভৃতি নৃত্যনাট্যে নাচ ও গানের আলাদা শিক্ষক ছিলেন, কিন্তু সামগ্রিক পরিচালনা ও পরিকল্পনার দায়িত্ব ছিল রবীন্দ্রনাথের। একেবারেই স্বতন্ত্র এই নৃত্যনাট্যগুলির আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথ নাট্যরচনা ও প্রযোজনার জগৎ থেকে ফিরে নৃত্যসহযোগী নাট্যে আর 'রেখানাট্যে' (ছবি আঁকায়) মগ্ন। বাস্তবতার ঊর্ধ্বে উঠে এক অকৃত্রিম নিবিড় বাস্তবতাকে ছোঁয়ার জন্য তাঁর চৈতন্য অন্তঃপুরে অদ্ভুত প্রকাশলীলা দেখা যাচ্ছিল।

রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ ষাট বৎসর ধরে নাট্যরচনা এবং সেগুলির প্রযোজনা করেছেন। প্রথমদিকের কলকাতা-পর্বে, বিরজিতলায় 'বিসর্জন' অভিনয় পর্যন্ত, তাঁর প্রযোজনায় বিলিতি রঙ্গমঞ্চের অনুকরণে গড়ে ওঠা দেশের সাধারণ রঙ্গালয়গুলির মঞ্চব্যবস্থার অনুকরণ দেখা যায়। বা অনুকৃতিও বলা যায়। যে হ.চ.হ. (হরিশ্চন্দ্র হালদার) নামে ব্যক্তিটি রবীন্দ্রনাথের মঞ্চ নির্মাণে সহায়তা দিতেন, তিনি সাধারণ রঙ্গালয়েও মঞ্চ তৈরি করতেন। পরে অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথরা এসেছেন। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে অভিনয় (Acting) এবং উপস্থাপনার অন্য দিকগুলি নিয়ে ভাবলেও মঞ্চভাবনা, দৃশ্যসজ্জা এবং সাজসজ্জার দিকে মনোযোগ দেননি। প্রধান নির্দেশকের নির্দেশে মঞ্চ ভাবনা স্থিরিকৃত হয়নি।

পরিবর্তন শুরু হল 'শারদোৎসব' (১৯০৮) থেকে। বাস্তবানুসারী মঞ্চভাবনা থেকে সরে এসে ব্যঞ্জনাধর্মিতার দিকে যাওয়া। সাজসজ্জা, পোষাক, মেকআপ এবং সর্বোপরি নাট্যবিষয় ও ভাবনা, সবকিছুর মধ্যেই এই পরিবর্তনের পরিক্রমা শুরু হল। এর যথার্থ

রূপ পাওয়া গেল ১৯১৬-তে ফাল্গুনী অভিনয়ের সময় থেকেই। মাঝে ডাকঘরের কলকাতায় অভিনয়ের সময় মঞ্চবাহুল্য ও বাস্তবানুসারিতার অতিরেক লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এর অনেক কিছুই রবীন্দ্রনাথের পছন্দ না হওয়ার কথা। নাহলেও পাঁচজনের চেষ্টায় যেটা তৈরি হয়ে গিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ স্মিতহাস্যে তা মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু পরের সব নাট্য প্রযোজনাতেই রবীন্দ্রনাথ 'suggestive'—এর দিকে চলে গেছেন। ১৯২৩-এ কলকাতায় বিসর্জন অভিনয়ের সময়ে তার সফলতম প্রকাশ দেখা গেল। কয়েকটি চৌকো সংস্থান সাজিয়ে বেদি, একটি দুটি ধাপ, বেদিতে দীপবৃক্ষ ও পুষ্পথালা—মন্দিরের দৃশ্য রচনা হয়েছে। কোনো উপকরণ বাহুল্য নেই। প্রতীকগুলিকে স্পষ্টতর করবার প্রয়াস ডাকঘরে যা ঘটেছিল, সেরকম নেই। 'তপতী' প্রযোজনায় (১৯২৯) সেই ভাবনার 'perfection' দেখা গেল।

প্রথম ভাগের প্রযোজনার ভাবনা যদি হয় প্রতিফলনাত্মক বা Representational, তাহলে দ্বিতীয় ভাগের উপস্থাপনা হবে প্রতিফলন বর্জিত, প্রতীকী, ব্যঞ্জনাময়—suggestive. এই পরিবর্তন নিঃসন্দেহে নাট্য প্রযোজক রবীন্দ্রনাথের নাট্য উপস্থাপনার ভাবনা থেকেই ক্রম-সঞ্জাত।

থিয়েটার যেহেতু মঞ্চ ব্যবস্থার উপকরণের মধ্য দিয়ে নাট্য উপস্থাপনার ব্যাপার, তাই তাঁর প্রযোজনায় সব সময়েই পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে সেই রকম মঞ্চ ব্যবস্থা করা হয়েছে। কলকাতা ও শান্তিনিকেতনের প্রযোজনার পার্থক্যটি সেইভাবে তৈরি হয়েছে। তবে সব সময়েই তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর নিজস্ব রুচি, নাট্যবোধ ও পরিশীলিত রসজ্ঞান। উপস্থাপনের কারণে তাঁর অনেক নাটকের অনেক পরিবর্তন ও রূপান্তর করতে হয়েছে। উপস্থাপনাতেও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছেন। কিন্তু সবার ওপরে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের শিল্পীমনের সৃষ্টিশীল ক্রিয়াশীলতা।

তবে এখানে সেখানে কয়েকটি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মন্তব্য ছাড়া নাট্যপ্রয়োগরীতি সম্পর্কে সুচিন্তিত কোনো তত্ত্ব বা নির্দেশাবলী তিনি রেখে যান নি। ফলে থিয়েটারের ছাত্ররা চেখভ বা ইবসেনকে বিশ্লেষণ বা বোঝার যে সুযোগ পায়, স্তানিস্লাভস্কি বা ব্রেখট-এর প্রয়োগরীতি অধ্যয়ন, অনুধাবন বা অনুশীলনের যে সুযোগ পায়, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সেটা কখনোই পাওয়া যায় না। তাই প্রত্যক্ষদর্শী, অংশগ্রহণকারী কিংবা পরোক্ষ মানুষজনের বিবরণ ও সাক্ষ্য থেকে রবীন্দ্রনাথের নাট্য প্রযোজনার পরিপূর্ণ রূপটি পাওয়া যায় না।

সমসাময়িক সাধারণ রঙ্গালয়ের নাট্যাভিনয় ধারার সঙ্গে তাই রবীন্দ্রনাথের প্রযোজনার কোনো মিল নেই। তাঁর ষাট বৎসরের নাট্যরচনা ও উপস্থাপনার পাশাপাশিই কলকাতাতেই সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রচুর নাট্যরচনা ও নাট্যাভিনয় হয়ে চলেছিল। রবীন্দ্রনাথেরও কয়েকটি নাটক ও বেশকিছু গল্প-উপন্যাসের নাট্যরূপ এখানে অভিনীত হয়েছিল। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রযোজনার সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন নি। নাটকের ভাববস্তু, চরিত্রচিত্রণ ও ঘটনা বর্ণনা এবং উপস্থাপনার নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা

রবীন্দ্রনাথ তাঁর থিয়েটারে যেভাবে করতে চেয়েছেন, পেশাদারি সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে তার কোনো সামঞ্জস্য ছিল না। বিশ্বাসভাজন 'প্রয়োগকর্তা' শিশির ভাদুড়িকে কয়েকটি নাটক প্রযোজনা করতে দিলেও রবীন্দ্রনাথের মন শেষ পর্যন্ত ভরেনি। সেই সময়ে এক সাক্ষাৎকারে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব পরিষ্কার বোঝা যায় :

'যেভাবে এখন সাধারণ রঙ্গালয় চলছে, তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। যাঁর মনে রসবোধ ও কলাজ্ঞান আছে সেখানে গিয়ে তাঁর প্রাণ কিছুতেই তিষ্ঠুতে পারবে না।'—এই প্রসঙ্গেই তিনি তাঁর নিজস্ব থিয়েটারের পরিকল্পনা দেন :

'সর্বসাধারণের জন্য নয়—যাঁরা ললিতকলার সূক্ষ্মসৌন্দর্য উপভোগ করতে চান—তাদের জন্যে কি বাংলাদেশে একটি অতিরিক্ত রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করা চলে না?...সাধারণ রঙ্গালয় দর্শকদের মুখ চেয়ে যেমন চলছে চলুক, অতিরিক্ত রঙ্গালয়ের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই থাকবে না। এখানে যেসব নাটক নির্বাচিত হবে, কলারসিকের উন্নতমনে তা ভাবের রেখাপাত করতে পারবে।' [নাচঘর, ৩ জুন, ১৯২৭]

এই রকম থিয়েটারের কল্পনা রবীন্দ্রমানসে ছিল। প্রযোজনার মাধ্যমে এমনি একটি থিয়েটারের দিকে তিনি যেতে চেয়েছিলেন।—'নাটক দৃশ্যকাব্য ; যাহা দেখা যায় সেই উপকরণ লইয়া যাহা দেখা যায় না সেই ভাবরসকে নাটকে অভিব্যক্ত করিতে হইবে।' [প্রবাসী, ভাদ্র ১৩২৭]

তাঁর সময়ে সাধারণ রঙ্গালয়ের পেশাদারি অভিনয়ের ধারাই প্রবলতর ছিল। তার পাশেই রবীন্দ্রনাথ একটি সমান্তরাল নাট্য প্রযোজনার ধারা প্রচলন করতে চেয়েছিলেন। ভাবনায়, চিন্তায়, উপস্থাপনায় ও রসপ্রয়োগে এ তাঁর একান্তই নিজস্ব সৃষ্টি। তাঁর সহযোগী অন্য সব প্রথিতযশা অনুগামীদের নানা সাহায্য তিনি নানাভাবে পেয়েছেন। শক্তিমান উচ্চক্ষমতার বেশ কয়েকজন অভিনেতা তাঁর কাছেই ছিলেন। চারুশিল্পী, সঙ্গীতবিদ এবং নৃত্য বিশারদ বিশেষজ্ঞের সর্বাঙ্গীন সহযোগ সব সময়েই পেয়েছেন। সম্মিলিত প্রয়াসে এবং রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় এদেশে গড়ে উঠেছিল একটি পরিণত থিয়েটার। এই থিয়েটারে নাটক উপভোগের মতো বাছাই পরিশীলিত বিদগ্ধ দর্শকও তিনি পেয়েছেন। সব মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার প্রায় ষাট বৎসর ধরে অবিচ্ছিন্নভাবে নানা ভাব ও রসের, নানা নাটকের উপর্যুপরি অভিনয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে। সে এক স্বতন্ত্র ও অনন্য এবং একমাত্র থিয়েটার।

সাধারণ রঙ্গালয়ের নাট্যাভিনয়ের প্রবল বাণিজ্যিক ধারার পাশে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব প্রযোজনা এক সমান্তরাল থিয়েটারের (Parallel Theatre) ধারা তৈরি করেছে। সেই ধারা পরবর্তী বাংলা নাট্য আন্দোলনের বহুমুখী প্রচেষ্টার মধ্যে এক উজ্জ্বল দিক নির্দেশের কাজ করেছে। সম্পূর্ণভাবে দেশীয় ভাবনায় ভাবিত এবং গভীর অর্থে মৌলিক রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার পেশাদারি রঙ্গালয়ের পাশাপাশি আধুনিক বুদ্ধিদীপ্ত থিয়েটারের ঐতিহ্যসৃষ্টিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে।

শিশিরকুমার ভাদুড়ি ও বাংলা থিয়েটার

১৯২১–১৯৫৯

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে পেশাদার রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমার ভাদুড়ির (২ অক্টোবর, ১৮৮৯—৩০ জুন, ১৯৫৯) আবির্ভাব। কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে পুরোপুরি নট ও নির্দেশকের জীবন গ্রহণ করলেন তিনি। এতদিন রঙ্গমঞ্চে নটজীবন নিন্দিত ও সমাজে অপাংক্তেয় ছিল। অধ্যাপনার সম্মানের নিশ্চিন্ত জীবন ত্যাগ করে তিনি নিন্দিত রঙ্গ-মঞ্চকে নতুন সম্মানের জীবন দান করতে এগিয়ে এলেন। বাংলা রঙ্গমঞ্চ সত্যিকারের প্রাণস্পন্দিত হলো। অভিনয়ের নতুন রীতিতে, মঞ্চোপস্থাপনার নবতর আঙ্গিকে, নাট্য-নির্দেশনার সুরুচি-সম্মত শিল্পবোধে—সর্বোপরি নাটকের নতুন ভাবনায় তিনি বাংলা রঙ্গ-মঞ্চে নাটকাভিনয়ের নতুন প্রাণদান করলেন। রুচি, শিল্পবোধ, নাট্যজ্ঞান ও ব্যক্তিত্বে তিনি যে আকর্ষণীয় নবত্ব সৃষ্টি করলেন তাতে সে যুগের শিক্ষিত শ্রেষ্ঠ, সুরুচিসম্পন্ন ও পরিশীলিত, বিদগ্ধ নাট্যরসিকেরা তাঁর ন্যাটাশালায় হাজির হলেন।

তাঁর আবির্ভাবকালে গতানুগতিক থিয়েটার নিম্নমানের এবং জীবনবিমুখ হয়ে পড়েছিল। ১৯ শতকের ধারা বেয়ে বিশ শতকের দুটো দশক অবধি সেই বাংলা নাট্যাভিনয়ের ধারা একই খাতে প্রবাহিত হচ্ছিল। ১৯ শতকের নাট্যজগতের প্রথম সারির ব্যক্তিত্ব যাঁরা ছিলেন তাঁদের অনেকেই এই সময়ের মধ্যে মারা গেছেন। অর্ধেন্দুশেখর (১৯০৮), গিরিশ (১৯১২), নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল (১৯১৩), অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৯১৬) একে একে চলে গেলেন—এই সময়েই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু (১৯১৪-১৮) হয়ে গেল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে বাংলা থিয়েটারের দৈন্য আরো প্রকট হয়ে পড়ল। ক্ষীরোদপ্রসাদ ছাড়া আর জীবিত নাট্যকার নেই। সেরা অভিনেতা ও নির্দেশকেরা চলে গেছেন। একমাত্র গিরিশ-পুত্র সুরেন্দ্রনাথ (দানীবাবু) অভিনয় করছেন, অমৃতলাল বৃদ্ধ হয়েছেন (মৃত্যু : ১৯২৯)। অভিনেত্রী সুশীলাবালা পুরনো রীতির অভিনয় চালাচ্ছেন। ১৯ শতকের অবশিষ্ট অভিনেতৃকুল কোনোক্রমে বাংলা থিয়েটারের পূর্ববর্তী ধারার জের চালিয়ে যাচ্ছেন। নতুন উদ্যম, ভাবনা কিংবা নাট্যপ্রচেষ্টা কোনো দিক দিয়েই দেখা যাচ্ছিল না। বাংলা থিয়েটারের তখন প্রায় 'অজন্মা' অবস্থা চলছিল।

এই সময়ে কলকাতায় তিনটি থিয়েটার চলছিল। মনোমোহন পাঁড়ের মনোমোহন থিয়েটারে দানীবাবু অধ্যক্ষ ও অভিনেতারূপে জড়িত ছিলেন। মিনার্ভা তখন ধুঁকছে। স্টার থিয়েটারে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তারাসুন্দরী চেষ্টা করছেন থিয়েটারকে বাঁচাতে। থিয়েটারের এই দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে পার্শি ব্যবসায়ি ম্যাডান কোম্পানীর নামে কর্ণওয়ালিস্ থিয়েটার খুলে ব্যবসা জমাতে চাইছে। রঙ ঢঙ, হাল্কা রসিকতা,

অশ্লীলতা, জাঁকজমক, নৃত্যগীত--ইত্যাদিতে ভরিয়ে দিয়ে ব্যবসা জমাতে চাইছে। কিন্তু অন্যদের মতো তারাও ব্যর্থ হলো।

প্রথম শ্রেণীর অভিনেতার অভাব, ভাল নাট্যকার ও নাটকের অভাব, প্রযোজনাগত একঘেয়েমি এবং নির্দেশনার চর্বিত-চর্বণ বাংলা রঙ্গালয়ের জরাজীর্ণ অবস্থাকে আরো বাড়িয়ে তুলল। সেই একঘেয়ে ঐতিহাসিক নাটকের নামে সস্তা ভাবাবেগ ও উদ্দীপনাময় রোমান্স, পৌরাণিক নাটকের নামে ভক্তির তারল্য, প্রহসনগুলিতে ভাঁড়ামো এবং হাল্কা নাচগানের গীতিনাট্যের পসরার বিরক্তিকর সৌষ্ঠবহীনতা--।

এই সময় (১৯২১) ম্যাডান কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে এক হাজার টাকা মাস মাইনেতে শিশির ভাদুড়ি বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ে এলেন। নাট্যকার রইলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ।

শিশিরকুমার তখন অবধি শৌখিন শিল্পীরূপে অভিনয় করেছেন। ছাত্রাবস্থায় স্কটিশ-চার্চ কলেজে শেক্সপীয়রের নাটকে অভিনয় করেছেন। পরে ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটে তাঁর শিক্ষিত বন্ধুবান্ধবদের সহযোগে বেশ কয়েকটি নাটকে অভিনয় করেছেন। নাট্য শিক্ষালাভ করেছেন অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মত রসিক ও বিদগ্ধজনের কাছে। 'মেরি গোল্ড ক্লাব' তৈরি করে সেখানে হ্যামলেট (১৯০৯), কুরুক্ষেত্র (১৯০৯), বুদ্ধদেব চরিত (১৯১০), চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১), বৈকুণ্ঠের খাতা (১৯১২), জনা (১৯১২) প্রভৃতি নাটকের একাধিকবার অভিনয় করেন। এইসব নাটকে হ্যামলেট, চাণক্য, কেদার, প্রবীর প্রভৃতি চরিত্রে তাঁর অভিনয় বিদগ্ধ ও রসিক মহলে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বৈকুণ্ঠের খাতা'য় কেদারের অভিনয় দেখে শিশিরকুমারের ভূয়সী প্রশংসা করেন। চন্দ্রগুপ্ত নাটকের চাণক্য অভিনয় দেখে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল শিশিরকে মাল্যভূষিত করেন এবং শিশিরের বুদ্ধিদীপ্ত অভিনয়ের প্রশংসা করে বলেন : 'আমি কল্পনায় যে চিত্র এঁকেছি তার চেয়েও এগিয়ে গিয়েছে--ইতিহাসের চাণক্য আমার চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।'

শৌখিন থিয়েটারের এই নবীন প্রতিভা ম্যাডান কোম্পানীতে যোগ দিয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলমগীর' নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে সাধারণ রঙ্গালয়ে পদার্পণ করলেন, ১০ই ডিসেম্বর, ১৯২১। সঙ্গে রইলেন তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কামবক্সের ভূমিকায়), প্রভাদেবী প্রমুখ।

শিশিরকুমারের আবির্ভাবে বাংলা মঞ্চে সাড়া পড়ে গেল। মঞ্চাভিনয়ের এই পরিকল্পনা, এই অভিনয়, এই উপস্থাপনা বাংলামঞ্চে নতুনের আস্বাদ এনে দিল। বাংলা থিয়েটারে যেন প্রাণ ফিরে এলো। অন্য মঞ্চগুলিও এবার নতুনদের দিকে নজর দিলেন। মিনার্ভায় উপেন্দ্রনাথ মিত্র এই নতুন পরিবর্তনে আগ্রহী হয়ে নিয়ে এলেন শিশিরের সহযোগী শৌখিন অভিনেতা রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও নরেশ মিত্রকে। স্টার নিয়ে এলো তারাসুন্দরীকে, সঙ্গে নির্মলেন্দু লাহিড়ী। স্টারে অপরেশ মুখোপাধ্যায় ও

প্রবোধচন্দ্র গুহের কৃতিত্বে 'আর্ট থিয়েটার' ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে 'কর্ণার্জুন' নাটক দিয়ে মাতিয়ে দিল। নতুন সব মুখ--অহীন্দ্র চৌধুরী, তিনকড়ি চক্রবর্তী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশ মিত্র, নীহারবালা, নিভাননী, কৃষ্ণভামিনী।

মিনার্ভা পুড়ে গেল। মনোমোহন থিয়েটার 'বঙ্গেবর্গী' ও 'ললিতাদিত্য' নাটক নিয়ে, দানীবাবুর অভিনয় দিয়েও চালাতে পারল না। শিশির সম্প্রদায় ও আর্ট থিয়েটারের দাপটে তখন মনোমোহন টিকতে পারল না।

ম্যাডানের কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে শিশিরকুমার তিনটি নাটক, আলমগীর, রঘুবীর এবং চন্দ্রগুপ্ত অভিনয় করেন। এখানেও আলমগীর, রঘুবীর ও চাণক্যের অভিনয়ে তিনি প্রথম শ্রেণীর অভিনেতার মর্যাদা পেলেন। কিন্তু ম্যাডানের সঙ্গে সম্পর্ক তিক্ত হওয়ায় তিনি ১৯২২-এর আগস্ট মাসে ম্যাডান থিয়েটার ছেড়ে দেন। কিছুদিন রইলেন মঞ্চের বাইরে। এই সময়ে তিনি নবাগত চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পরিচালনা ও অভিনয় করতে থাকেন।

ইডেন গার্ডেনে তখন একটি বৃহৎ প্রদর্শনী চলছিল। সেখানে শিশিরকুমার দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' মঞ্চস্থ করেন (ডিসেম্বর, ১৯২৩) তাঁর ওল্ড মেরী ক্লাবের সহযোগীদের নিয়ে। বিশ্বনাথ ভাদুড়ি, ললিতমোহন লাহিড়ী, রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, যোগেশ চৌধুরী, তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি রায়, জীবন গঙ্গোপাধ্যায়। অভিনেত্রীরা এলেন সাধারণ রঙ্গালয় থেকে--খ্যাতিময়ী মালিনী, নীরদাসুন্দরী, প্রভাদেবী, শেফালিকা (পুতুল) প্রভৃতি। তাঁর এই নবগঠিত সম্প্রদায় অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে 'সীতা' অভিনয় করে সুধীজনের প্রচুর সমাদর লাভ করল। প্রযোজনা, পরিচালনা এবং অভিনয়ে নতুন ভাবধারার সৃষ্টি হলো।

উৎসাহিত শিশিরকুমার তাঁর এই নবগঠিত নাট্যদলকে নিয়ে সাধারণ রঙ্গালয়ে ফিরে এলেন--হ্যারিসন রোডে 'আলফ্রেড থিয়েটার'-এ সীতা অভিনয় শুরু করবেন ঠিক করলেন। তিনি নিজে অভিনয় করেছিলেন রামচন্দ্রের ভূমিকায়। এই সময়েই আর্ট থিয়েটার চক্রান্ত করে 'সীতা'র স্বত্ব কিনে নিয়ে শিশিরকুমারের সীতা অভিনয় আইনের চালে বন্ধ করে দিলেন, নিজেরাও করলেন না। ব্যর্থ হয়ে শিশিরকুমার মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে দিয়ে লিখিয়ে 'বসন্তলীলা' অভিনয়ের ব্যবস্থা করলেন (মার্চ, ১৯২৪)। তারপরে পুরনো নাটক আলমগীর, রঘুবীর, চন্দ্রগুপ্ত ঐ ১৯২৪ সালেই পরপর অভিনয় করলেন।

মনোমোহন থিয়েটার ১৯২৪-এ বন্ধ হয়ে গেলে শিশিরকুমার আলফ্রেড ছেড়ে এই মনোমোহন থিয়েটার ভাড়া নিলেন মাসিক তিন হাজার টাকায়। নবগঠিত নাট্যদল নিয়ে এখানে উদ্বোধন করলেন তাঁর **নাট্যমন্দির** (৬ আগস্ট, ১৯২৪)। দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা'র স্বত্ব হারিয়ে তিনি যোগেশ চৌধুরীকে দিয়ে নতুন করে 'সীতা' লেখান। তাড়াহুড়ো করে লেখানোর ফলে নাটকটি অকিঞ্চিৎকর হলো। কিন্তু নাট্যাভিনয়ের গুণে মাত করে দিলেন তিনি। সীতা অভিনয়ে যথার্থ প্রয়োগকর্তার কুশলতা তিনি দেখালেন। অভিনয়, দৃশ্যপট রচনা, সাজসজ্জা, দৃশ্যসজ্জা, আলোর ব্যবহার এবং সঙ্গীত--সবকিছুর মধ্যেই

প্রয়োগকর্তার সুনিপুণ স্বাক্ষর লক্ষ্য করা গেল। এই প্রথম বাংলা থিয়েটারে একটি ছন্দোবদ্ধ নাট্যাভিনয়ের প্রকাশ দেখা গেল। তাছাড়া শেষদৃশ্যে প্রায় পঞ্চাশজন মতো লোক নিয়ে যে জনতার দৃশ্য তৈরি হয়েছিল, তা সবাইকে মুগ্ধ করে দিল। সাজসজ্জা, দৃশ্য পরিকল্পনা, অভিনয় এবং প্রয়োগ কৌশলে সীতার অভিনয় প্রায় কিংবদন্তী সৃষ্টি করল। রবীন্দ্রনাথ নাটক হিসেবে সীতাকে অতি সাধারণ বলেছেন, কিন্তু এর অভিনয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

মনোমোহনে তাঁর 'নাট্যমন্দির' মঞ্চে তিনি সীতা ছাড়া দ্বিজেন্দ্রলালের পাষাণী (১০ই ডিসেম্বর, ১৯২৪), গিরিশের জনা (৩ জুন, ১৯২৫) এবং শ্রীশ বসুর 'পুণ্ডরীক' (১৩ই আগস্ট, ১৯২৫) অভিনয় করেন। কিন্তু এই সময়েই 'ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট' নতুন রাস্তা তৈরি করার জন্য মনোমোহন থিয়েটার বাড়ি ভেঙে ফেলে। নাট্যমন্দির উঠে যায়।

শিশির আবার ফিরে এলেন ম্যাডানদের কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে। সেখানেও **নাট্যমন্দির** নাম দিয়ে তিন বছরের লীজ নিয়ে অভিনয় শুরু করলেন। উদ্বোধন হল 'সীতা' নাটক দিয়ে, ১৯২৬ এর ২৩ জুন। এই সময়ে তাঁর 'নাট্যমন্দির' লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তরিত হয়। এবং তাঁর থিয়েটারের নাম রাখা হলো **'নাট্যমন্দির লিমিটেড'**। এই নাট্যমন্দিরে তিনি ১৯২৯ পর্যন্ত অভিনয় করেছেন। এখানে তিনি পর পর অভিনয় করলেন :

> বিসর্জন (রবীন্দ্রনাথ, ২৬ জুন, ১৯২৬)। পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস (গিরিশ, ১ জুলাই, ১৯২৬)। নরনারায়ণ (ক্ষীরোদপ্রসাদ, ১ ডিসেম্বর, ১৯২৬)। প্রফুল্ল (গিরিশ, জুন, ১৯২৭)। সধবার একাদশী (দীনবন্ধু, জুলাই, ১৯২৭)। ষোড়শী (শরৎচন্দ্রের দেনা-পাওনার নাট্যরূপ, ৬ আগস্ট, ১৯২৭)। শেষরক্ষা (রবীন্দ্রনাথ, ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯২৭)। সাজাহান (দ্বিজেন্দ্রলাল, নভেম্বর, ১৯২৭)। বলিদান (গিরিশচন্দ্র, ২৫ জানুয়ারি, ১৯২৮)। বিল্বমঙ্গল (গিবিশ, ২৯ মে, ১৯২৮)। হাসনেহানা (বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, ২৫ আগস্ট, ১৯২৮), দিগ্বিজয়ী (যোগেশ চৌধুরী, ১৪ ডিসেম্বর, ১৯২৮)। বিবাহ-বিভ্রাট (অমৃতলাল বসু, ৩ মে, ১৯২৯)। বুদ্ধদেব (গিরিশ, ৮ জুন, ১৯২৯)। রমা (শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ-এর নাট্যরূপ, আগস্ট, ১৯২৯)। শঙ্খধ্বনি ('The Bells' নাটকের রূপান্তর : ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২ নভেম্বর ১৯২৯)। তপতী (রবীন্দ্রনাথ, ডিসেম্বর, ১৯২৯)।

১৯৩০ সালের মার্চ মাসে কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে নাট্যমন্দিরের 'লীজ' শেষ হলো। এখানে শেষ অভিনয়, সীতা ও ষোড়শী, ১৯৩০ এর ২৫ মার্চ। পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য শেষের দিকের কয়েকটি নাটক, বিশেষ করে 'তপতী' প্রচুর লোকসান করে দিল। প্রায় শূন্য অডিটোরিয়ামেও একেক দিন অভিনয় করতে হল। আর্থিক দায়িত্ব নেওয়ার সঙ্গতি না থাকায় নাট্যমন্দির বন্ধ করে দিতে হলো। ম্যাডানদের হাতে কর্ণওয়ালিস থিয়েটার চলে গেল।

সঙ্গতিবিহীন শিশিরকুমার কিছুদিন আর্ট থিয়েটারে যোগ দেন. স্টার থিয়েটারের মঞ্চে তিনি আর্ট থিয়েটারের হয়ে ১৯৩০-এর কয়েক মাসে অভিনয় করলেন

রবীন্দ্রনাথের চিরকুমার সভা, অনুরূপা দেবীর উপন্যাসের নাট্যরূপ মন্ত্রশক্তি, দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত এবং অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের কর্ণার্জুন। এর কয়েকটি আবার আমন্ত্রণমূলক ছিল। চন্দ্রবাবু, চাণক্য, ঔরঙ্গজেব, কর্ণ প্রভৃতি ভূমিকায় তাঁর অভিনয় এখানে খুবই প্রশংসিত হলো।

এরপর শিশিরকুমার চলে যান আমেরিকায়, ১৯৩০-এর সেপ্টেম্বর মাসে। স্কচ অভিনেতা এরিক ইলিয়ট কলকাতায় সীতার অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে আমেরিকার শিল্প-সংগঠক মিস মারবেরিকে জানান। তারই আমন্ত্রণে শিশিরকুমার দলবল নিয়ে নিউইয়র্ক যান। কিন্তু সেখানে মিস মারবেরি চুক্তি ভঙ্গ করলেন। তখন অসহায় শিশির ওখানে সতু সেনের সাহায্যে ভ্যানডার বিল্ট থিয়েটারে 'সীতা' মঞ্চস্থ করেন (১২ জানুয়ারি, ১৯৩১)। পরপর কয়েকটি অভিনয় করলেন। তারপর আমেরিকা থেকে ফেরার পথে বড়লাট লর্ড আরউইনের অনুরোধে দিল্লীতে সীতা অভিনয় করলেন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানরূপে, ২০ মার্চ, ১৯৩১।

আমেরিকায় তিনি প্রায় ব্যর্থ হয়েছিলেন বলা যায়। দলের সব অভিনেতা-অভিনেত্রীকে আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া হয়নি। দৃশ্যপট, মঞ্চসজ্জা ও সাজসজ্জার সমস্ত উপকরণ নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। ফলে দুর্বল অভিনয়, অঙ্গহীন দৃশ্যসজ্জা, অপ্রস্তুত অভিনেতা—সব মিলিয়ে তাঁর এই সফর তাঁর খ্যাতি কোনো অংশেই বাড়াতে পারেনি। সতু সেন চেষ্টা করে মুখরক্ষা করেছিলেন মাত্র।

ওখান থেকে ফিরে নিজস্ব থিয়েটার না থাকায় আবার ভাড়াটে অভিনেতা হয়েই অভিনয় করতে লাগলেন। নাট্যনিকেতন, রঙমহল প্রভৃতি মঞ্চে অভিনেতা ও নাট্য-শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। ১৯৩১-এর আগস্ট থেকে আট মাস এই ভাবে অভিনয় চালিয়ে শিশির রঙমহল ছেড়ে (ফেব্রুয়ারি, ১৯৩২), প্রবোধ গুহের নাট্যনিকেতনে যোগ দেন। সেখানে চন্দ্রশেখর (১৯৩২), গৈরিকপতাকা (১৯৩২), দক্ষযজ্ঞ (১৯৩২) নাটকে অভিনয় করেন। শিবাজী ও দক্ষের অভিনয়ে কৃতিত্ব দেখান।

১৯৩৩-এ নাট্যনিকেতন ছেড়ে দিয়ে স্টারে যোগ দেন। এখানে বৈকুণ্ঠের খাতা, রমা এবং রিজিয়া (মনোমোহন রায়) নাটকে ঐ এক বছরেই অভিনয় করেন।

১৯৩৩-এর মাঝামাঝি স্টার মঞ্চে আর্ট থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেল। শিশিরকুমার স্টার থিয়েটারের বাড়ি গ্রহণ করে সেখানে **'নবনাট্য মন্দির'** প্রতিষ্ঠা করলেন, ১৯৩৪-এর জানুয়ারি মাসে। নবপ্রতিষ্ঠিত 'নবনাট্য মন্দির' অনেকদিন বাদে শিশিরের নিজস্ব থিয়েটার হল। যদুনাথ খাস্তগীরের লেখা 'অভিমানিনী' নাটক দিয়ে এই নবনাট্য মন্দিরের প্রথম অভিনয় শুরু হল, ১৯ জানুয়ারি, ১৯৩৪।

নতুন উদ্যমে শিশিরকুমার আবার নিজের প্রযোজনায় নিজের নাট্যাভিনয় শুরু করলেন। পরপর অভিনয় করলেন :

অভিমানিনী (যদুনাথ খাস্তগীর, ১৯ জানুয়ারি, ১৯৩৪)। ফুলের আয়না (নরেন্দ্রদেব, ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪)। বিরাজ বৌ (শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপ,

২৮ জুলাই, ১৯৩৪)। মায়া (সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪)। সরমা (সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪)। প্রতাপাদিত্য (ক্ষীরোদপ্রসাদ, নভেম্বর, ১৯৩৪)। দশের দাবী (শচীন সেনগুপ্ত, ২৪ নভেম্বর, ১৯৩৪)। বিজয়া (শরৎচন্দ্রের 'দত্তা'র নাট্যরূপ, ২২ ডিসেম্বর, ১৯৩৪)। শ্যামা (সত্যেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৩৫)। রীতিমত নাটক (জলধর চট্টোপাধ্যায়, ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৩৫)। অচলা (শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ'র নাট্যরূপ, ২২ অক্টোবর, ১৯৩৬)। যোগাযোগ (রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের নাট্যরূপ, ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৩৬)।

১৯৩৭ এর জুন মাসে স্টার থিয়েটারের মালিকের সঙ্গে মামলায় হেরে গিয়ে শিশির ভাদুড়ি ওখান থেকে উচ্ছেদ হন। নবনাট্যমন্দির বন্ধ হয়ে যায়। জুন, ১৯৩৭। এখানে তিনি মূলত রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের বেশ কয়েকটি উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করেন। হাতের কাছে ভালো নাট্যকার ও নাটক না থাকাতে তাঁকে এই কাজ করতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে বাংলা শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির নাট্যরূপ দর্শকদের দেখিয়ে, কাহিনী ও চরিত্রের নতুন সম্ভার তাদের কাছে হাজির করেন।

আবার ১৯৩৭ থেকে ১৯৪১, এই সময় কালে শিশিরের নিজস্ব কোনো মঞ্চ ছিল না। কিন্তু সম্মিলিত অভিনয় করা ছাড়া তিনি ও তাঁর দলের কোনো কাজ ছিল না। শিশির এই সময়ে কয়েকটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। তাঁর নির্দেশনায় ও অভিনয়ে সীতা, দস্তুরমত টকী (রীতিমত নাটকের চিত্ররূপ), চাণক্য মুক্তি পায় ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৯-এর মধ্যে।

১৯৪১ সালে প্রবোধ গুহের নাট্য নিকেতন বন্ধ হয়ে গেলে শিশিরকুমার এই রাজকিষেণ স্ট্রিটের নাট্যনিকেতন থিয়েটার বাড়ি লীজ নিয়ে তাতে খোলেন—'**শ্রীরঙ্গম**'। এখন সেখানে বিশ্বরূপা থিয়েটার। শ্রীরঙ্গম মঞ্চের উদ্বোধন হলো ১৯৪১-এর ২৮ নভেম্বর তারাকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'জীবনরঙ্গ' নাটক দিয়ে। শিশিরকুমার অভিনয় করলেন নাট্যাচার্য অমরেশের ভূমিকায়। শ্রীরঙ্গম মঞ্চে অভিনয় তালিকা :

জীবনরঙ্গ (তারাকুমার মুখোপাধ্যায়, ২৮ নভেম্বর, ১৯৪১)। উড়োচিঠি (নিতাই ভট্টাচার্য, ১১ মার্চ, ১৯৪২)। দেশবন্ধু (মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪২)। মাইকেল (নিতাই ভট্টাচার্য, ২৩ এপ্রিল, ১৯৪৩)। বিপ্রদাস (শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপ, ২৫ নভেম্বর, ১৯৪৩)। [বিপ্রদাসের পরিচালনা ও নামভূমিকায় ছিলেন বিশ্বনাথ ভাদুড়ি। প্রথমে শিশিরকুমার অভিনয় করেননি, পরে কয়েকবার বিপ্রদাস চরিত্রে অভিনয় করেন।] তাইতো (বিধায়ক ভট্টাচার্য, ডিসেম্বর, ১৯৪৩)। বন্দনার বিয়ে (মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ১৯৪৩) [এটিরও পরিচালনা ও মুখ্য চরিত্রে বিশ্বনাথ ভাদুড়ি।] দুঃখীর ইমান (তুলসী লাহিড়ী, ১৯৪৬) [পরিচালনা করেন শিশিরকুমার কিন্তু অভিনয় করেননি]। বিন্দুর ছেলে (শরৎচন্দ্রের গল্পের নাট্যরূপ দেবনারায়ণ গুপ্ত, ডিসেম্বর, ১৯৪৪)। সিরাজদৌল্লা (গিরিশ, ডিসেম্বর, ১৯৪৭)। পরিচয় (জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১০ আগস্ট,

১৯৪৯)। ষোড়শী (শরৎচন্দ্রের 'দেনা পাওনা'র নাট্যরূপ, ১৯৫১)। তখত-এ-তাউস (প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, ১০ মে, ১৯৫০)। আলমগীর (ক্ষীরোদপ্রসাদ, ১০ ডিসেম্বর, ১৯৫১)। [শিশিরকুমারের অভিনয় জীবনের ত্রিশ বৎসর পূর্তিতে এই দিন তাঁর প্রথম নাটক আলমগীর পুনরভিনয় করেন]। প্রশ্ন (তারাকুমার মুখোপাধ্যায়, ৩ জানুয়ারি, ১৯৫৩)।

এর পরে প্রায় তিন বছর শ্রীরঙ্গমে নতুন কোনো নাটকের অভিনয় করেননি। পুরনো নাটকগুলির পুনরভিনয় করেন। শেষের দিকে তিনি আর অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতেন না। পরিচালনা করতেন। তবে আলমগীরে আলমগীর এবং রাজসিংহ ও সাজাহান নাটকে সাজাহান ও ঔরঙ্গজেব—এর ভূমিকায় অভিনয় করেন। ১৯৫৬ এর গোড়াতে নতুন নাটক ধরলেন--

মিশরকুমারী (বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, ২২ জানুয়ারি, ১৯৫৬)। তারপরে আবার পুরনো নাটক চন্দ্রগুপ্ত (দ্বিজেন্দ্রলাল ২৩ জানুয়ারী, ১৯৫৬)। প্রফুল্ল (গিরিশ, ২৪ জানুয়ারি, ১৯৫৬)।

শ্রীরঙ্গমে শিশিরকুমারের শেষ অভিনয় প্রফুল্ল নাটকে যোগেশ চরিত্রে, ১৯৫৬-এর ২৪ জানুয়ারি। বাড়ি ভাড়ার দায়ে মঞ্চ ছেড়ে দিতে হলো। ২৮ জানুয়ারি, ১৯৫৬, ঐ বাড়িতে তৈরি হল বিশ্বরূপা থিয়েটার। শ্রীরঙ্গমে শিশিরকুমার ছিলেন একটানা চৌদ্দ বৎসর। এই সময়ে তিনি চৌদ্দটি নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন এখানে।

১৯৫৬-এর পর থেকে শিশিরকুমারের অভিনয় প্রায় বন্ধ হয়ে আসে। মাঝে মাঝে ইতস্তত অভিনয় করেছেন। মিনার্ভা মঞ্চে 'জীবনরঙ্গ' (ভূমিকা : অমরেশ)। ভবানীপুরে থিয়েটার সেন্টারের ক্ষুদ্র প্রেক্ষাগৃহে সধবার একাদশী (নিমচাঁদ) ; এন্টালি কালচারাল কনফারেন্সে মাইকেল (মাইকেল) অভিনয় করেন। আমন্ত্রিত অভিনয়ও করেছেন কলকাতার বাইরে গিয়েও।

এই সময়ে কিছু তরুণ লেখক শিল্পী সাংবাদিক সমালোচক ও নাট্যামোদী ব্যক্তি গড়ে তোলেন 'নব্য বাংলা নাট্য পরিষদ'। শিশিরকুমারকে মধ্যমণি করে এই সংস্থা তার কাজ শুরু করে। শিশিরকুমার এখানে অভিনয় এবং আলোচনা করতেন। এই দলবল নিয়ে কলকাতার বাইরে গিয়ে সফর করতেন, নাট্যাভিনয় করতেন।

১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পরপর চারদিন তিনি ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট মঞ্চে তিনটি নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। মাইকেল (দুদিন), ষোড়শী ও বিজয়া। তিনি অভিনয়েও অংশ নেন। জীবানন্দ, রাসবিহারী এবং মাইকেল চরিত্র তাঁর শেষ জীবনের অভিনয়ের সাক্ষী।

১৯৫৯-এর ২৬ জানুয়ারি তাঁকে ভারত সরকার 'পদ্মভূষণ' উপাধি দেন। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। রাষ্ট্রীয় সম্মানের চেয়ে তিনি স্বাধীন রাষ্ট্রের কাছে একটি 'থিয়েটার হল' চেয়েছিলেন, যেখানে তিনি নিজের মনের মতো করে অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে পারবেন।

১৯৫৯-এর ৮ মে, মহাজাতি সদনে 'আলমগীর' নাটক এবং ১৮ মে 'রীতিমত নাটক' অভিনয় করেন। রীতিমত নাটকে প্রফেসর দিগম্বরের ভূমিকায় অভিনয়ই তাঁর জীবনের শেষ অভিনয়।

১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ জুন শেষ রাত্রে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

শিশির ভাদুড়ি শৌখিন অভিনয় করতে করতে পেশাদার রঙ্গালয়ে এসেছিলেন। তাঁর সময়ে বাংলা থিয়েটার গতানুগতিকতায় ধুঁকছে। এই সময়ে সিনেমা এদেশে নবাগত হলেও, তার ধরন, অভিনয় কৌশল এবং সর্বোপরি এদেশের কাছে একেবারে বিস্ময়কর উপস্থাপন—নতুন উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। এই সিনেমাগুলিও বৈচিত্র্য সৃষ্টি ছাড়া শিল্প হিসেবে গড়ে উঠতে পারে নি। একঘেয়ে মৃতপ্রায় থিয়েটার এবং সিনেমার শিল্পহীন অভিনবত্ব—রুচিশীল শিক্ষিত সূক্ষ্মভাবের দর্শকের আগ্রহসৃষ্টি করতে পারেনি। আবার সাধারণ দর্শক গতানুগতিক থিয়েটার যেমন দেখে, তার চেয়ে বেশি ভিড় করে সিনেমায়। ফলে সিনেমার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় থিয়েটার ক্রমশ হেরে যেতে থাকল।

শিশির ভাদুড়ি থিয়েটারের এই উভয়ত দুর্যোগের সময়ে 'উদিত সূর্যের' আলোক প্রতিভা নিয়ে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন। থিয়েটারকে উন্নত করে রুচিশীল দর্শকের শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা পেলেন। রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে সেই সময়কার সমস্ত বিদগ্ধ মানুষ শিশির ভাদুড়িকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। মনোমোহন থিয়েটারে নাট্যমন্দিরে 'সীতা' নাটকের অভিনয়ের খবর দিয়ে নাচঘর পত্রিকা (১ ভাদ্র, ১৩৩১) লিখেছিল :

> 'গত রবিবারের সীতার অভিনয় দেখবার জন্যে মনোমোহন নাট্যমন্দিরে যত শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সেবক ও কলাবিদের সমাগম হয়েছিল এর আগে বাংলা রঙ্গালয়ে আমরা তা দেখিনি।'

রবীন্দ্রনাথ শিশিরকুমারকে 'নটরাজ' উপাধিতে সম্বর্ধিত করেছিলেন। যে সাধারণ রঙ্গালয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ এতদিন মুখ ফিরিয়েছিলেন ; শিশিরকুমারের জন্যই তার প্রতি তাঁর আস্থা ফিরে এসেছে এবং সাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে (১২ ভাদ্র, ১৩৩১) স্পষ্ট জানিয়েছিলেন :

> 'শিশির ভাদুড়ির প্রয়োগ নৈপুণ্য সম্বন্ধে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। সেই কারণেই ইচ্ছাপূর্বক আমার দুই একটা নাটক অভিনয়ের ভার তার হাতে দিয়েছি।'

নাট্যনৈপুণ্য দেখেই রবীন্দ্রনাথ পেশাদার বাংলা রঙ্গালয়ের দিকে হন। এবং আশ্বাস দেন যে, তাঁর জন্য তিনি অর্জুনকে নিয়ে একখানি পৌরাণিক নাটক রচনা করবেন। অবশ্য সে কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। [হেমেন্দ্রকুমার রায়—গল্পভারতী, রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ সংখ্যা, ১৩৬৮]

'প্রয়োগনৈপুণ্য' শব্দটি রবীন্দ্রনাথ প্রথম ব্যবহার করলেন। এবং শিশিরকুমারের নাট্য

প্রযোজনার সম্বন্ধেই এই কথাটি তিনি ব্যবহার করলেন। প্রয়োগকর্তা বা প্রয়োগকুশলতা বাংলা থিয়েটারে প্রথম। এর আগে এভাবে কেউ ভাবেনি। পূর্ববর্তী বাংলা থিয়েটারে ছিল অভিনয় শিক্ষক, মঞ্চাধ্যক্ষ, নাট্যাচার্য কিংবা মোশন মাস্টার--কিন্তু প্রয়োগকর্তা ছিলেন না কেউ। যিনি নাট্য প্রযোজনার সব কয়টি দিক--মঞ্চ পরিকল্পনা, অভিনয়, দৃশ্য সৌন্দর্য, সাজসজ্জা, আলোক সম্পাত, সঙ্গীত, নৃত্যগীতবাদ্য ইত্যাদি সব কিছুর সামগ্রিক সম্মিলনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ নাট্য প্রযোজনা উপস্থিত করতে পারেন--তিনিই তো সার্থক প্রয়োগকর্তা। বাংলা থিয়েটারে এই সর্বাঙ্গীন প্রয়োগ নৈপুণ্য শিশিরকুমারের থিয়েটারেই প্রথম লক্ষিত হল।

প্রযোজনার বিভিন্ন দিকে সহায়তা করার জন্য তাঁর সহযোগী হিসেবে সেই সময়ের স্বক্ষেত্রে বিখ্যাত কয়েকজন মানুষ তাঁর সঙ্গে ছিলেন। যেমন দৃশ্যপট ও সাজপোষাক দেখতেন প্রখ্যাত শিল্পী চারু রায়। সঙ্গীত রচনা করতেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। সঙ্গীত পরিচালনা করতেন কৃষ্ণচন্দ্র দে এবং গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। নৃত্যপরিকল্পনায় হেমেন্দ্রকুমার রায় ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। প্রাসঙ্গিক সঙ্গীত দেখাশোনা করতেন নৃপেন্দ্র মজুমদার, যিনি পরে কলকাতা আকাশবাণীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে খ্যাতিলাভ করেন। উপদেষ্টা হিসেবে ছিলেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

এরা সবাই তৎকালীন পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের বাইরেকার লোক। তাই গতানুগতিক একঘেয়ে মঞ্চব্যবস্থার রোমস্থন এঁদের মধ্যে ছিল না। এঁদের শিক্ষা, রুচি, শিল্পবোধ ও নাট্যরস ভাবনা শিশিরকুমারকে সাহায্য করেছিল। সর্বোপরি প্রয়োগকর্তা শিশিরকুমারের নিয়ন্ত্রণে সঙ্ঘবদ্ধ শিল্পের ঐকতান সৃষ্টি হতে পেরেছিল।

১৯ শতকের গতানুগতিকতার ধারা থেকে বাংলা থিয়েটারে অভিনয়ের এই দিক পরিবর্তনের কথা সবাই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন। তার মধ্য থেকে এখানে অমৃতলাল বসুর মন্তব্য উদ্ধার করি, কেননা তিনি সাধারণ রঙ্গালয়ের উদ্বোধন মুহূর্ত থেকেই অভিনেতা, প্রযোজক ও নির্দেশকের দায়িত্ব নিয়ে নানাভাবে নানা সময়ে রঙ্গশালায় বিচিত্র গতিপ্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নতুন যুগের দিক পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বললেন :

> 'কিছুদিন পূর্বে আমাদের দেশে নাট্যকলা অত্যন্ত হীন হয়ে পড়েছিল। সারা জীবন ধরে আমি এই কলার সাধনা করে এসেছি। শেষে আমার ওই বৃদ্ধ বয়সে নাট্যকলার এই অবনতি দেখে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমাকে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হচ্ছিল। সে বেদনা থেকে এরা আমায় মুক্তি দিয়েছেন। যাঁদের সঙ্গে একসঙ্গে এই কাজে আমি নেমেছিলাম, তারা একে একে সকলেই এই সংসার থেকে বিদায় নিয়েছেন--আমি ভাবছিলাম, ঈশ্বর কি আমাকে রঙ্গালয়ের এই হীন অবস্থা দেখবার জন্যই জীবিত রেখেছেন। কিন্তু আজ আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি এরা আমায় সে আশঙ্কা থেকে মুক্তি দিয়েছেন।'--[মনোমোহন 'নাট্যমন্দিরে' সীতা নাটকের উদ্বোধনের দিনে (৬-৮-১৯২৪) অমৃতলালের উদ্বোধনী ভাষণ।]

শিশিরকুমার বাংলা রঙ্গালয় ও নাট্যাভিনয়কে নতুন প্রাণে উজ্জীবিত করলেন। গত শতকের নাট্যাভিনয়ের রোমান্টিক ভাববিলাস, অবাস্তবতা, বীর, করুণ, হাস্যরসের উপস্থাপনের 'হাস্যকর' প্রচেষ্টা, নৃত্যগীত বাহুল্য, ধর্মীয় ভাবালুতা, অসংযত আচরণ এবং সাধারণ দর্শকের স্থূলরুচি, অভদ্র আচরণ ও চাহিদা--এইসব দিক থেকেই তিনি বাংলা নাট্যশালাকে মুক্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং বেশ কিছু ক্ষেত্রে সার্থকও হয়েছিলেন। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে এই কারণে তিনি চিরকাল স্মরণীয়।

নাটক তিলোত্তমাশিল্প (composite art)। নাট্যপ্রযোজনায় এই মিশ্র শিল্পের কয়েকটি অবশ্য প্রয়োজনীয় দিকে শিশিরকুমারের প্রচেষ্টা ও সার্থকতা আলোচনা করা যেতে পারে।

দৃশ্যপট। আগে দৃশ্যপট হিসেবে আঁকা সিনের প্রচলন ছিল। যে দৃশ্য শুরু হত সেই দৃশ্য উপযোগী সিন এঁকে পেছনে টাঙিয়ে দেওয়া হত, তাতে বোঝাবার চেষ্টা হত এটি রাজপ্রাসাদ, কি মন্দির, না রাস্তা, না বনপথ--। শিশিরকুমার এই প্রচলিত আঁকা সিন ব্যবহার পালটে দিলেন। তাঁর আগে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত কিছু সেট-সিনের প্রচলন করেন। কিন্তু সব দৃশ্য নয়, কোনো কোনো দৃশ্য তিনি বাস্তব সম্মত করতে পুরো খাট-বিছানা, আলমারি, চেয়ার-টেবিল সব মঞ্চে বসিয়ে দিতেন। আবার কোনো দৃশ্যে আঁকাসিন ঝুলিয়ে দেওয়া হত। তাই কোনো কোনো দৃশ্যে আচমকা এই ধরনের ব্যবহার বিসদৃশ হতো। সেখানে প্রয়োগকর্তার কোনো হাত থাকত না। শিশির ভাদুড়ি সবকিছুকে একসূত্রে বাঁধলেন। দৃশ্য অনুযায়ী সেট তৈরি করলেন। যে যুগের নাট্যকাহিনী--তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সেট তৈরি করা হতে লাগল। এই ব্যাপারে শিল্পী চারু রায়ের সহায়তাকে তিনি পুরোপুরি কাজে লাগাতে পেরেছিলেন।

আলো। আলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি চিন্তাভাবনা করলেন। শুধু মঞ্চকে আলোকিত কিংবা অন্ধকার করা অথবা আলো দিয়ে কৌশলে চমকপ্রদ কিছু সৃষ্টি করে দর্শককে চমকে দেওয়া, এসবের জন্যই শুধু আলোর ব্যবহার তিনি করলেন না। পূর্বে মঞ্চের সামনে পাদপ্রদীপ তার আলো নিয়ে ঝলমল করত। তিনি পাদপ্রদীপ তুলে দিলেন। উইংসের পাশ থেকে, ওপর থেকে নানাভাবে আলো ফেলার ব্যবস্থা করলেন। পরিস্থিতি ও চরিত্রের 'মুড' অনুযায়ী আলো ব্যবহারের ভাবনা চিন্তা তিনি করতে থাকেন।

সাজসজ্জা। দৃশ্যসজ্জা অনুযায়ী পোষাক, সাজসজ্জা সবই পরিকল্পিত হয়েছিল। যুগ অনুযায়ী পোষাক পরিচ্ছদ তৈরি করা হতো পোযাক পরিচ্ছদের ব্যবহারে পূর্বে কোন বোধ কাজ করেনি। রাজার পোযাক, চাষার পোযাক, সাধুর পোষাক--এইভাবে নির্দিষ্ট পোষাক দিয়ে চরিত্রদের সাজানো হতো। কিন্তু যুগে যুগে পোষাকের যে বিবর্তন হয় এবং মনুষ্য চরিত্রের বৈচিত্র্য অনুযায়ী পোষাকের যে ছাপ মারা থাকতে পারে না--তা নিয়ে শিশির কুমার ভেবেছেন। রাম কিরকম পোযাক পরতে পারেন, ঔরঙ্গজেব বা সিরাজদৌল্লা কি ধরনের সাজসজ্জা করতেন--ইতিহাস থেকে তিনি তার পরিকল্পনা

সংগ্রহ করলেন। গতানুগতিক প্রথা ভেঙে তিনি যুগ ও চরিত্রোপযোগী সাজসজ্জা ব্যবহার করলেন। সাহায্য পেলেন ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

সঙ্গীত। সঙ্গীতে থিয়েটারি যে রীতি ছিল, তাতে সুরের মিশ্র প্রাধান্য ছিল। কথার মর্যাদা ছিল না। দ্বিজেন্দ্রলাল নিজে গান লিখতেন ও সুর দিতেন বলে তিনি কথাকে খেলাপ করেন নি। রবীন্দ্রনাথের গানে কথা ও সুর অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। সেখানে সুর কখনোই কথাকে নষ্ট করে দেয় না। শিশির ভাদুড়ি থিয়েটারের সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের গানের রীতি ব্যবহার করলেন। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণচন্দ্র দে এই কাজে দক্ষভাবে তাঁকে সাহায্য করলেন। তাছাড়া দৃশ্যান্তরের মাঝখানে, আগে কনসার্ট বাজানো হত যার সঙ্গে মূল নাটকের ঐ দৃশ্যের কোনো ভাবগত বা সুরগত মিল থাকত না। শিশিরকুমারই প্রথম দুটি দৃশ্যের মাঝে সুনিয়ন্ত্রিত সুর ব্যবহার করে অভিনয়ের রস ঘনীভূত করার জন্য যন্ত্রসঙ্গীতের সাহায্য নিয়েছিলেন। এছাড়া কৃষ্ণচন্দ্র দে'র কণ্ঠমাধুর্যও স্বীকার করতে হবে। এগুলিকে ব্যবহার করে তিনি আবার প্রয়োগ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। শিশিরকুমারের ওপর ভরসা থাকার জন্যই রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে লেখা গান সংযোজন বা বর্জন করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

নৃত্য। নৃত্যের ক্ষেত্রে বাংলা থিয়েটারে তো একেবারে ছাপমারা বন্দোবস্ত ছিল। 'সখীর দল' সব থিয়েটারেই থাকত। কারণে অকারণে হাত-পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে তারা নেচে যেত। অন্য চরিত্রের নৃত্যও মূল নাটকের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ থেকে যেত। লোকে নাচটা দেখত, মূল নাটকের ধারার সঙ্গে সঙ্গতি কেউ খুঁজত না। বোধকরি খুঁজলে পেত-ও না। থিয়েটারে গতানুগতিক নৃত্য ভাবনা পালটে ভাবানুযায়ী, চরিত্র অনুযায়ী ভারতীয় মুদ্রার ব্যবহার তিনি চালু করলেন। রাগতাল দিয়ে ভাব অনুষঙ্গের নৃত্য পরিকল্পনা করা হল। শিল্পীদের সেইভাবে তৈরি করা হতে লাগল।

অভিনয় (Acting)। অভিনয় (acting)-এর ক্ষেত্রে শিশিরকুমার একটি উচ্চাঙ্গের মান তৈরি করতে পেরেছিলেন। অনুপুঙ্খরূপে নাট্য শিক্ষকের দায়িত্ব তিনি পালন করতেন। নাটকের বিষয় ও ভাব অনুযায়ী চরিত্রের গঠন ও বিকাশ কিভাবে অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা যায়, তা নিয়ে তিনি বিস্তর ভেবেছেন। নিজে তৈরি হতেন, সেইমত অন্য অভিনেতা অভিনেত্রীদের তৈরি করতেন। তিনি জানতেন, একক অভিনেতার অভিনয়ে নাটক গঠিত হতে পারে না। আগের যুগে সেটাই অপরিহার্য ছিল। শিশিরকুমার সব সহযোগী অভিনেতাকে পারস্পরিক সংযোগের মধ্য দিয়ে 'স্কেলে' দাঁড় করানোর চেষ্টা করতেন। সেই কারণে ধৈর্য সহকারে সব কিছু প্রস্তুত করার যে অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা প্রয়োজন, শিশির কুমারের তা ছিল। এই কারণে তিনি আধুনিক থিয়েটারের রীতি অনুযায়ী মহলার (Rehearshal) ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দিতেন।

অভিনয় শিক্ষক। প্রয়োজনে তিনি আনকোরা নতুন নট-নটীদের দক্ষ অভিনয় শিক্ষা দিতেন। তাতে অচিরাৎ তারা বড় অভিনেতা-অভিনেত্রীরূপে তৈরি হয়ে যেতেন। তাঁর

এই অভিনয় শিক্ষা-গুণে পরবর্তী অনেক বড় অভিনেতা-অভিনেত্রী তৈরি হয়েছে। তাই অনেকেরই মনে হতে পারে যে, শিশিরকুমার বড় অভিনেতা, না, বড় অভিনয়-শিক্ষক। সীতার অভিনয় দেখে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাচঘর পত্রিকায় লিখেছিলেন : 'কি অভিনয় করার দক্ষতা, কি অভিনয় শিক্ষা দেবার ক্ষমতা, দুই দিক দিয়ে শিশিরবাবুর পরিচয় নেবার সৌভাগ্য হয়ে গেল আমার সেদিন।'

অভিনয় রীতি। অভিনয় ধারায় তিনি আমূল পরিবর্তনের চেষ্টা করলেন। পুরনো যুগের 'সেনসেসেনাল' এবং 'ইমোশনাল' অভিনয় রীতিকে তিনি বর্জন করলেন। অভিনয়ে 'ইনটেলেক্ট' বা মননশীলতা তিনিই প্রথম বাংলা থিয়েটারে নিয়ে এলেন। আগের যুগে অর্ধেন্দুশেখরের অভিনয়ে যার সূত্রপাত হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। শিশিরকুমার ভাবাবেগ দিয়ে চরিত্র প্রকাশ না করে যুক্তি ও মননশীলতা দিয়ে চরিত্র সৃষ্টির দিকেই জোর দিলেন। চরিত্রটিকে বুঝে নিয়ে তার অন্তর্ধর্মকে প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বুদ্ধি-বৃত্তির ওপর জোর দিলেন। যে অর্থে চরিত্র-সৃষ্টি কথাটি ব্যবহৃত হয়, শিশির সেই আধুনিক অর্থেই চরিত্রকে স্বাভাবিকতার পর্যায়ে নিয়ে এসে নিজের মতো করে তাকে তৈরি করে নিতে পারতেন। তখন তা আর অভিনয় থাকত না, হয়ে যেত সৃষ্টি। অভিনয়ের সঙ্গে নাটকের চরিত্রটিকে তিনি বিশ্লেষণ করে যেতেন। ফলে অন্তরে বাইরে একটা গোটা মানুষের চরিত্রকে মঞ্চের ওপর দেখতে পাওয়া যেত। 'দিগ্বিজয়ী' নাটকে নাদিরশাহ'র ভূমিকায় তাঁর অভিনয় দেখে 'নাচঘর' পত্রিকা লিখেছিল : 'শিশিরকুমারের আর্টের একটা মস্ত বিশেষত্ব হচ্ছে, একাধারে তা অভিনয় ও চরিত্র বিশ্লেষণ।'

শিশিরকুমার নিজে তাই বড় অভিনেতা হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর চেহারা, কণ্ঠস্বর, স্বরক্ষেপনের মাত্রাজ্ঞান, মঞ্চ ব্যবহারের দক্ষতা অসাধারণ ছিল। তাঁর মতে, অভিনয়ের সময়ে চরিত্রের সঙ্গে ভাবাবেগে (Mood) একাত্ম হয়ে পড়া যায় না, কেননা অভিনেতাকে মঞ্চে সব সময়ে নিজের চরিত্র সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সব শিল্পীদের উপস্থিতি, আলো এবং মঞ্চোপকরণের দিকে নজর রাখতে হয়। তবেই 'টোটাল এ্যাকটিং' সম্ভব।

শিশিরকুমার নানা ধরনের চরিত্রের ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করতেন। কয়েকটি চরিত্র অভিনয় তো কিংবদন্তী হয়ে গেছে। যেমন, আলমগীর (আলমগীর), রাম (সীতা), রঘুবীর (রঘুবীর), চাণক্য (চন্দ্রগুপ্ত), সাজাহান ও ঔরঙ্গজেব (সাজাহান), নিমচাঁদ (সধবার একাদশী), জীবানন্দ (ষোড়শী), জয়সিংহ ও রঘুপতি (বিসর্জন), মধুসূদন (যোগাযোগ), রাসবিহারী (বিজয়া), মাইকেল (মাইকেল), নাদিরশাহ (দিগ্বিজয়ী), কেদার (বৈকুণ্ঠের খাতা), চন্দ্রবাবু (চিরকুমার সভা) প্রভৃতি নানাধরনের চরিত্রে তাঁর অসামান্য অভিনয় সকলকে মুগ্ধ করে দিয়েছিল।

দলগত অভিনয়। শুধু একক অভিনয় নয় ; সব চরিত্রের পারস্পরিক আদানপ্রদানের মধ্য দিয়েই নাটকের চরিত্রগুলি এগিয়ে চলে। তাই অভিনয়ে অভিনেতাদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহযোগ্যতায় অভিনয় সামগ্রিক মাত্রা পায়। বাংলা থিয়েটারে অভিনয়ে এই 'Team-work' তৈরির প্রচেষ্টা শিশিরকুমারই প্রথম করেন।

তাছাড়া বহু চরিত্রকে একসঙ্গে মঞ্চে এনে সবাইকে দিয়ে অভিনয় করিয়ে নিয়ে যে 'টোটালিটি' সৃষ্টি করা যায়, শিশিরকুমার তা দেখালেন। প্রয়োজনে তিনি দর্শকদেরও এর সঙ্গে জড়িয়ে নিতেন।

'সীতা'র যেমন শেষ দৃশ্যে তিনভাগে মঞ্চকে ভাগ করে প্রায় পঞ্চাশাধিক অভিনেতাকে দেখানো হয়েছিল। এমন সুশৃঙ্খল জনতার দৃশ্য ও তার অভিনয় বাংলা থিয়েটারে পূর্বে হয়নি। 'শেষ রক্ষা'র শেষ দৃশ্যে তিনি 'থিয়েট্রিক্যাল ইনটিমেসি' সৃষ্টির জন্য মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন। অভিনেতারা মঞ্চ থেকে নেমে এসে গদাইচন্দ্রের বিয়ের নেমন্তন্ন করতেন দর্শকদের এবং শেষে গানে সবাইকে গলা মেলাতে বলতেন।

তাই বলা যায় থিয়েটার সম্পর্কিত সামগ্রিক ধ্যানধারণায় তিনি ছিলেন এ যুগের মধ্যে আশ্চর্যরকম ব্যতিক্রম। অভিনেতা হিসেবে, পরিচালক হিসেবে আধুনিক থিয়েটার সম্পর্কিত ভাবনা চিন্তা তাঁর মধ্যেই সচেতনভাবে দেখা গিয়েছিল। নাটককে দৃশ্যপটকে, অভিনয়কে, শব্দকে, সব কী করে একসঙ্গে নাট্যের মধ্যে ব্যবহার করতে হয়, তার শিক্ষা পরবর্তী নাট্যপ্রজন্ম তাঁর কাছ থেকে পেয়েছে। পরবর্তী প্রজন্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যপ্রযোজক ও অভিনেতা শম্ভু মিত্রের মন্তব্য উদ্ধার করি : 'তিনিই (শিশির ভাদুড়ি) আমাদের প্রথম নির্দেশক। এ বাংলাদেশের, আমার অনুমানে সমগ্র ভারতবর্ষের, প্রথম নির্দেশক, যিনি মঞ্চের ছবি কল্পনা করেছেন। যিনি আলো, দৃশ্যপট, অভিনয় দিয়ে থিয়েটারের একটা সামগ্রিক রূপ প্রথম এদেশে এনেছিলেন।'

এই প্রসঙ্গে উৎপল দত্তের সংযত মন্তব্য স্মরণযোগ্য : 'সে যুগের থিয়েটারের অভিনয়ের যা কিছু ভাল সব শিশির ভাদুড়িতে এসে সংঘবদ্ধ হয়েছে , সংহত হয়েছিল'।

'মঞ্চ, আলো এবং আবহের সমন্বিত ব্যবহারে থিয়েটারকে গভীরতর মাত্রা দেবার বাস্তবায়ন ঘটল শিশিরকুমারেই প্রথম।'

সীমার গণ্ডি : শিশিরকুমারের প্রচেষ্টা ও ব্যর্থতা

শিশিরকুমারের সময়ে হাতের কাছে একমাত্র ক্ষীরোদপ্রসাদ ছাড়া অন্য কোনো প্রতিষ্ঠিত নাট্যকার ছিলেন না। তিনি নিজেও নাটক রচনা করেননি। একে তাকে দিয়ে তাঁর নাটক লিখিয়ে নিতে হতো। ফলে প্রায়ই ভালো নাটক তিনি পেতেন না। যা পেতেন সেগুলিকেই ঘষে মেজে তাঁকে দাঁড় করাতে হতো। সেই কারণেই তিনি পূর্ববর্তী নাট্যকারদের অনেক নাটক বারবার অভিনয় করেছেন। প্রয়োজনে সেগুলিকে পালটে নিয়েছেন। গিরিশের 'জনা' করতে গিয়ে নাট্যকারের 'ফেবারিট' চরিত্র বিদূষককে তিনি বাদ দিয়ে অভিনয় করতেন (যদিও বেশ কয়েকটি অভিনয়ের পর আবার বিদূষক চরিত্র রেখেছিলেন) এবং স্বভাবতই এযুগে অচল বলে শেষ দৃশ্যে 'ক্রোড়-অঙ্ক'টিকে বর্জন করতেন।

হাতের কাছে ভালো নাটক বা নাট্যকার না পাওয়াতে তিনি তাঁর সময়ের জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের অনেক উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে (কখনো নিজে দিয়েছেন, কখনো বা এর-তার সাহায্যে লিখিয়ে নিয়েছেন) অভিনয় করেছেন। এইভাবে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের নাট্যরূপও তাঁকে অভিনয় করতে হয়েছে।

শিশিরকুমারই পূর্ণ মর্যাদায় রবীন্দ্রনাথের নাটক এবং উপন্যাসের নাট্যরূপকে পেশাদার মঞ্চে অভিনয় করেছেন। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে নাটকের অনেক অংশ পরিবর্তন করিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ শিশিরকুমারের নাট্য ভাবনার প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসবশত তাঁর নাটকের পরিবর্তন করতে দ্বিধা করেন নি। 'গোড়ায় গলদ'-কে এইভাবে শেষ রক্ষা, 'প্রজাপতির নির্বন্ধ'-কে এইভাবে চিরকুমার সভায় পরিবর্তন করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির তিনি অভিনয় উপযোগী সম্পাদনা করেছেন, গান বাদ দিয়েছেন, কিংবা নতুন গান সংযোজন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ শিশিরকুমারকে সানন্দে তার অনুমতি দিয়েছেন।

গিরিশ, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলালের বেশ কয়েকটি নাটক তিনি অভিনয় করেছেন। এঁরা প্রতিষ্ঠিত এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ ছাড়া অন্য দুজন তখন জীবিত নেই। তিনি জীবিত আর যাদের দিয়ে নাটক লিখিয়েছেন, তাদের মধ্যে তারাকুমার মুখোপাধ্যায়, যোগেশ চৌধুরী, নিতাই ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, জলধর চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সকলেই শিশিরের ঘনিষ্ঠ। তারা কেউ এমন উচ্চস্তরের নাট্যকার ছিলেন না বা পরবর্তীকালে নাট্যকার হিসেবে অসামান্য সাফল্যও পাননি। নতুন ভালো নাট্যকার তিনি তৈরি করে নিতে পারেন নি বা নতুন নাট্যকারদের দিয়ে পরিবর্তিত সামাজিক বা রাজনৈতিক বিষয়বস্তুর নাটক লিখিয়ে নিতে পারেন নি। আর পুরনো নাট্যকারদের মধ্যে গিরিশ, অমৃতলাল, দীনবন্ধু, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল—এঁদের প্রচলিত নাটকগুলিই করেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর বিখ্যাত রসিকতা—ভালো নাটক না পেয়ে মঞ্চে তাঁকে সারাজীবন 'ঘুঘুবীর' (রঘুবীর), 'হালুমগীর' (আলমগীর) ও বাঁশবেহারী (রাসবিহারী : বিজয়া) অভিনয় করে যেতে হয়েছে।

ব্যতিক্রম জীবিত রবীন্দ্রনাথের নাটক। সৎসাহসের সঙ্গে তিনিই প্রথম পেশাদারি মঞ্চে যথার্থভাবে রবীন্দ্রনাটকের ও নাট্যরূপের অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু তাঁর কমেডি বা প্রহসন ছাড়া অন্য কোনো নাটকে সাফল্য লাভ করতে পারেননি। 'তপতী'র অকল্পনীয় ব্যর্থতার পরে তিনি আর তেমন উৎসাহের সঙ্গে রবীন্দ্র নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন নি। তাঁর পরিকল্পিত 'রক্তকরবী' বা 'ঘরে বাইরে'র নাট্যরূপের অভিনয়ের সঙ্কল্প তিনি ত্যাগ করেন।[১]

নাট্যকার যেমন তৈরি করতে পারেন নি, তেমনি নতুন যুগচেতনার উপযোগী

১. 'রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুগ্রহে শিশিরকুমার তাঁর নূতন ও অপূর্ব নাটক 'রক্তকরবী' অভিনয় করবার অধিকার পেয়েছেন।...প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে এখন এরকম নাটক অভিনয় করে সফল হবার শক্তি, সাহস ও প্রতিভা আছে একমাত্র শিশিরকুমারেরই।' [নাচঘর ১৩ ভাদ্র, ১৩৩১]

নাট্যবিষয়ও তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে বাংলায় উপন্যাসে গল্পে, কবিতায় নানা বিষয়ের ও আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছিল এবং তার ফলে বাংলা কথাসাহিত্য ও কবিতার জগতে অসামান্য ব্যাপ্তি ও গভীরতা এসেছিল। বাংলা নাটকে সেই পরিবর্তন দেখা যায় নি। প্রথম থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ অবধি (১৯১৪-১৯৪৫) শিশিরকুমারের নাট্যজগতের স্বর্ণসীমা। অথচ এই সময়ে পেশাদারি মঞ্চ থেকে কোনো ভালো নাট্যকার উঠে আসেনি বা নাটক সৃষ্টি হয়নি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সারা পৃথিবীতে যে হতাশা, জীবনযন্ত্রণা মানুষকে জীবন সম্বন্ধে ভাবিয়ে তুলেছিল, তারই প্রকাশ প্রবন্ধে, কাব্যে ফুটে উঠেছিল। কেউ ১৯ শতকীয় জীবন ভাবনাচক্রে আবর্তিত হতে চাননি। এরা তথাকথিত জীবনের অপর পৃষ্ঠা দেখতে চেয়েছিলেন। নতুন যুগের সাহিত্যে তাই সাধারণ ও অন্ত্যজ মানুষ (বর্ণ ও অর্থগত দিক দিয়ে) তার দুঃখ দারিদ্র্য, বিকৃতি, ব্যভিচার, জড়ত্ব, কুসংস্কার, বঞ্চনা, লাঞ্ছনা, বাঁচবার তাগিদ ও লড়াই—সবকিছু নিয়ে হাজির হয়েছে। অথচ এই সময়ের বাংলা নাটকে সে পরিবর্তন ঘটলো না। এই সময়কালের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও প্রযোজক শিশিরকুমার। এ দায়ভাগ তাঁকে গ্রহণ করতেই হবে।

নাট্য প্রযোজনায় অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তা সত্ত্বেও বাংলা নাট্যাভিনয়ের আমূল পরিবর্তন তিনি করতে পারেন নি। এজন্যে তাঁর আক্ষেপ ছিল। নিজের মতো একটি থিয়েটার তাই তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। পরাধীন দেশে তা সম্ভব হয়নি। স্বাধীন দেশেও পাননি। সারাজীবন ভবঘুরের মতো (নিজেকে বলতেন 'ভাড়াটে কেষ্ট') এর তার থিয়েটার ভাড়া করে তাঁকে অভিনয় করতে হয়েছে। ফলে গতানুগতিক পেশাদার থিয়েটারের ব্যবস্থার মধ্যেই নাট্যপ্রযোজনা করে যেতে হয়েছে। একটি জীর্ণ প্রচলিত মঞ্চ ব্যবস্থা ও তার বিধি-ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক বিলি-ব্যবস্থার মধ্যে থেকেই তাঁকে নাটক করতে হয়েছে। প্রচলিত বিধিব্যবস্থার মধ্যে থেকেই তিনি পরিবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। সংস্কারবাদী এই প্রচেষ্টার সীমাবদ্ধতাব ফলে পদে পদে ব্যর্থ হয়ে মর্মপীড়া ভোগ করতে হয়েছে। প্রতিবাদে, অভিমানে, ব্যর্থতায় তিনি গর্জন করে উঠেছেন। প্রচলিত ব্যবস্থার খাঁচায় বন্দী শিশিরকুমারের সিংহ-গর্জন এখনো কান পাতলে শোনা যায়।

তাঁর নিজের জীবনাচরণও অনেকবার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। উচ্ছৃঙ্খল ও অসংযত জীবনধারা তাঁকে সুস্থির শিল্পভাবনার পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে দেয়নি।

পেশাদার থিয়েটার চালাবার পেশাদারি মনোভাব তাঁর ছিল না। নাট্যমন্দিরে শেষ রাতের অভিনয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি স্বীকার করেছিলেন : 'আমি থিয়েটারই করতে শিখেছি, ব্যবসা করতে শিখিনি।'—ফলে থিয়েটারের প্রযোজনাগত দিক সামলাতে গিয়ে থিয়েটার-প্রতিষ্ঠানগত দিকে নজর দিতে পারেন নি। তাই বহু নাটক ভালো চললেও তিনি বারবার আর্থিক দেনার দায়ে পড়ে থিয়েটার ছেড়ে দিয়েছেন, মানসিকভাবে বারবার বিচলিত হয়েছেন।

তাঁর সময়ই রবীন্দ্রনাথ শৌখিনভাবে যে প্যারালাল থিয়েটারের পরীক্ষা করছিলেন বাণিজ্যিক থিয়েটারের পরিমণ্ডলের মধ্যে থেকে শিশিরকুমারের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। রবীন্দ্রনাথ নিজে সাধারণ রঙ্গালয় থেকে সরে থেকে নিজের মতো নিজের থিয়েটারে নিজের নাটক অভিনয় করেছেন। বাণিজ্যিক থিয়েটারের দায়ভাগ তাঁকে নিতে হয়নি। তবুও রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের মতো একটি থিয়েটার চেয়েছিলেন, যেখানে কলাজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়। শিশিরকুমারও জাতীয় নাট্যশালার নামে তাঁর নিজের এই রকম থিয়েটার চেয়েছিলেন যেখানে টাকা নয়, রসজ্ঞান লাভ হবে।

এরকম থিয়েটার রবীন্দ্রনাথ পাননি। শিশিরকুমারও পাননি। শিশিরকুমারের সার্থকতার উৎফুল্ল উচ্ছ্বাসধ্বনি এবং ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাসের হাহাকার বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসকে যুগপৎ গৌরবোজ্জ্বল ও ভারাক্রান্ত করে রেখেছে।

আর্ট থিয়েটার

হাতিবাগানে স্টার থিয়েটার মঞ্চ

প্রতিষ্ঠাতা : আর্ট থিয়েটার লিমিটেড
প্রতিষ্ঠা : ৩০ জুন, ১৯২৩
নাটক : কর্ণার্জুন (অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

স্থায়িত্বকাল : ৩০ জুন, ১৯২৩-- সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হাতীবাগানের স্টার থিয়েটারের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়ে। ১৯২০-তে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রবোধচন্দ্র গুহের সহায়তায় এবং অভিনেত্রী তারাসুন্দরীর আনুকূল্যে স্টার থিয়েটার 'লীজ' নিয়ে চালাতে থাকেন। ক্রমে অপরেশচন্দ্র এবং প্রবোধচন্দ্র উদ্যোগী হয়ে 'আর্ট থিয়েটার লিমিটেড' নামে এক যৌথ প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন। সহায়তা পেলেন তখনকার বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের পরিচালক ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে (ইনি নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথ নন)। এই যৌথ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ছিলেন--ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র সেন, কুমারকৃষ্ণ মিত্র, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ম্যানেজার), প্রবোধচন্দ্র গুহ (সেক্রেটারি)। এই যৌথ প্রতিষ্ঠান স্টার থিয়েটার 'লীজ' নিয়ে সেখানে 'আর্ট থিয়েটার' চালু করলেন। অভিনেত্রী তারাসুন্দরীও এই থিয়েটারের আংশিক মালিক ছিলেন। এইভাবে কলকাতার কয়েকজন ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আনুকূল্য পেয়ে অপরেশচন্দ্র ও প্রবোধচন্দ্র দ্বিগুণ উৎসাহী হয়ে উঠলেন। অবশ্য আর্ট থিয়েটারের মূল ব্যক্তি ছিলেন অপরেশচন্দ্র। তিনি ম্যানেজারের সঙ্গে একাধারে নাট্যকার, নাট্যশিক্ষক ও অভিনেতা। প্রথমে কিছুদিন শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' চালিয়ে গেলেন ; তারপরে--

১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ জুন অপরেশচন্দ্রের লেখা নতুন নাটক 'কর্ণার্জুন' দিয়ে আর্ট থিয়েটারের পাকাপাকি উদ্বোধন হল। অভিনয় করলেন :

> কর্ণ--তিনকড়ি চক্রবর্তী। অর্জুন--অহীন্দ্র চৌধুরী। শকুনি--নরেশ মিত্র। পরশুরাম--অপরেশচন্দ্র। বিকর্ণ--দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। পদ্ম--কৃষ্ণভামিনী। নিয়তি--নীহারবালা। দ্রৌপদী--নিভাননী। এছাড়া ইন্দু মুখোপাধ্যায়, তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরমা প্রভৃতিও অংশ গ্রহণ করেন। পরে গিরিশপুত্র দানীবাবু এখানে যোগ দেন ও নানা ভূমিকায় অভিনয় করেন।

২৬০ রাত্রি একাদিক্রমে 'কর্ণার্জুনে'র অভিনয় বঙ্গরঙ্গমঞ্চে যুগান্তকারী ঘটনা। 'কর্ণার্জুন' অভিনয় প্রসঙ্গে শিশির পত্রিকা লিখেছিল : 'স্টার থিয়েটার যে নূতনত্ব দেখাইতেছেন, ভরসা করি তাহা চিরদিনই দেখাইতে পারিবেন।...এদেশের চিরাচরিত মলিন, নিষ্প্রাণ ভাবধারাকে বিদায় দিয়া তাঁহারা নূতনত্বের সূচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের

আমরা সর্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।' এখানে অজন্তা গুহার চিত্রের আঙ্গিকে বেশভূষা ও অলঙ্কার তৈরি করে ব্যবহার করা হয়েছিল।

অভিনয়ে, সাজসজ্জায়, চাকচিক্যে, মঞ্চকৌশলে এবং তরুণ তাজা নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রীর সমন্বয়ে আর্ট থিয়েটার প্রথম থেকেই সাফল্য লাভ করে। এইখান থেকেই পরবর্তীকালে অনেক খ্যাতিমান অভিনেতার আবির্ভাব ঘটে। অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশচন্দ্র মিত্র, তিনকড়ি চক্রবর্তী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, নিভাননী, নীহারবালা, কৃষ্ণভামিনী। স্বয়ং অপরেশচন্দ্র তো ছিলেনই।

আর্ট থিয়েটার চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা ও সাফল্য লাভ করে। ঠিক সেই সময়েই শিশির ভাদুড়ি সাধারণ রঙ্গালয়ে এসে পাকাপাকি অভিনয় শুরু করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সেই একই সময়ে আর্ট থিয়েটারের সগৌরব অস্তিত্ব ঘোষণা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। তারপর থেকে আর্ট থিয়েটার টানা দশবছর ধরে স্টার থিয়েটারের মঞ্চে অভিনয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছিল।

১৯২৩ : কর্ণার্জুন (অপরেশচন্দ্র, ৩০ জুন), মুক্তির ডাক (মন্মথ রায়, একাঙ্ক, ২৫ ডিসেম্বর), রাজা ও রানী (রবীন্দ্রনাথ, ২৯ আগস্ট)।

১৯২৪ ইরাণের রানী (অস্কার ওয়াইল্ডের 'দি ডাচেস অফ পাড়ুয়া'/ অপরেশ, ১ জানুয়ারি)।

১৯২৫ গোলকোণ্ডা (ক্ষীরোদপ্রসাদ, ৪ ফেব্রুয়ারি), চিরকুমার সভা (রবীন্দ্রনাথ, ১৮ জুলাই), গৃহপ্রবেশ (রবীন্দ্রনাথ, ৫ ডিসেম্বর), বন্দিনী (অপরেশ, ২৫ ডিসেম্বর)।

১৯২৬ : বশীকরণ (রবীন্দ্রনাথ, ১০ জানুয়ারি), বিদায়-অভিশাপ (রবীন্দ্রনাথ, ১৬ এপ্রিল), শোধবোধ (রবীন্দ্রনাথ, ২৩ জুলাই), বন্দেমাতরম (অমৃতলাল, ১০ নভেম্বর), অপরেশচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ (১৫ মে) এবং চণ্ডীদাস (২৫ ডিসেম্বর)।

১৯২৭ : চিত্রাঙ্গদা (রবীন্দ্রনাথ, ১০ মে), পরিত্রাণ (রবীন্দ্রনাথ, ১০ সেপ্টেম্বর), মগের মুলুক (অপরেশ, ৩ ডিসেম্বর)।

১৯২৮ : পল্লীসমাজ (শরৎচন্দ্র / হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, ৪ আগস্ট), ফুল্লরা (অপরেশ, ২১ অক্টোবর)।

১৯২৯ : চিরকুমার সভা (রবীন্দ্রনাথ, ২৯ জুলাই) [অহীন্দ্র চৌধুরীর অনুপস্থিতিতে একরাত্রি শিশির ভাদুড়ি 'চন্দ্রে'র ভূমিকায় অভিনয় করেন।] আগস্ট মাসে প্রবোধচন্দ্র গুহ আর্ট থিয়েটার ছাড়লেন। মন্ত্রশক্তি (অনুরূপাদেবী / অপরেশ, ২৩ নভেম্বর)।

১৯৩০ : চিরকুমার সভা (রবীন্দ্রনাথ, ২৮ মে। চন্দ্র—শিশির ভাদুড়ি), অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ (৩০ অক্টোবর)।

১৯৩১ : মুক্তি (অপরেশ, ১ জানুয়ারি), স্বয়ংবরা (সৌরীন্দ্রমোহন, ২৭ জুন), শ্রীগৌরাঙ্গ (১৯ সেপ্টেম্বর)।

১৯৩২ : পোষ্যপুত্র (অনুরূপা দেবী / অপরেশ, ১২ মার্চ), মানময়ী গার্লস স্কুল (রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, ২৬ ডিসেম্বর), এছাড়া অপরেশের বিদ্রোহিনী (৫ নভেম্বর), নরেশ সেনগুপ্তের বড়বৌ (২৪ ডিসেম্বর)।

১৯৩৩ : বৈকুণ্ঠের খাতা (রবীন্দ্রনাথ, ১৭ জুন), ২রা জুলাই থেকে 'কেদার'-- শিশির ভাদুড়ি। প্রথমে করতেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'মন্দির প্রবেশ' (২৭ মে)।

দানীবাবু এখানকার খ্যাতিমান অভিনেতা ছিলেন। 'পোষ্যপুত্র' নাটকে তাঁর অভিনীত শ্যামাকান্তের অভিনয় খুবই প্রশংসা লাভ করে লোকের মুখে মুখে ফিরেছিল। কিন্তু ১৯৩৩-এ দানীবাবুর মৃত্যুতে আর্ট থিয়েটারের মনোবল ভেঙে যায়। দেনার দায়ে আর্ট থিয়েটারের অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়। পরের বছরেই অপরেশচন্দ্রের মৃত্যু হয় (১৫ মে, ১৯৩৪)। তার সঙ্গে সঙ্গেই স্টার থিয়েটারে 'আর্ট থিয়েটার'-এর নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস শেষ হয়।

অপরেশচন্দ্রের উদ্যমে, প্রবোধ গুহের পরামর্শে এবং তারাসুন্দরীর আনুকূল্যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নিয়ে যে থিয়েটার খোলা হয়েছিল দশ বছর ধারাবাহিক নাট্যাভিনয়ের পর তা উঠে যায়। অপরেশচন্দ্রের একুশটি নাটক ছাড়া এখানে গিরিশ, ক্ষীরোদপ্রসাদ, অমৃতলাল প্রভৃতির পুরনো কিছু নাটকের অভিনয় হয়েছিল। বেশ কিছু নতুন নাটকের অভিনয়ও এরা করে। শরৎচন্দ্রের, অনুরূপা দেবীর উপন্যাসের নাট্যরূপও এখানে অভিনীত হয়। এখানে পরপর রবীন্দ্রনাথের নয়টি নাটক ও উপন্যাস-ছোটগল্পের নাট্যরূপ অভিনীত হয়। উদ্বোধনের দু'মাসের মধ্যেই তারা 'রাজা ও রানী' অভিনয় করে। অহীন্দ্র চৌধুরী--কুমার সেন। তিনকড়ি চক্রবর্তী--বিক্রম। নরেশ মিত্র--শঙ্কর। অপরেশ মুখোপাধ্যায়--দেবদত্ত। কৃষ্ণভামিনী --সুমিত্রা। নীহারবালা--ইলা।

প্রস্তাব মতো রবীন্দ্রনাথ 'প্রজাপতির নির্বন্ধ'-এর নাট্যরূপ 'চিরকুমার সভা' শিশির ভাদুড়িকে না দিয়ে আর্ট থিয়েটারকে অভিনয়ের জন্য দেন। এই অভিনয়ে অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের যে কটি নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ে সাফল্যলাভ করেছে, চিরকুমার সভা তাদের মধ্যে অন্যতম। অহীন্দ্র চৌধুরী (চন্দ্রবাবু), তিনকড়ি (অক্ষয়), দুর্গাদাস (পূর্ণ), অপরেশ (রসিক), নীহারবালা (নীরবালা) কমেডি নাটকের অভিনয়ে এবং নাচে গানে নাটকটিকে জমিয়ে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মঞ্চ, দৃশ্যসজ্জা, দৃশ্যপট তৈরিতে সাহায্য করেন এবং দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর গান শিখিয়ে দিয়েছেন। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের গৃহপ্রবেশ, বশীকরণ, বিদায়-অভিশাপ, শোধবোধ (কর্মফল গল্পের কবিকৃত নাট্যরূপ), পরিত্রাণ ('বউঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসের কবিকৃত নাট্যরূপ), বৈকুণ্ঠের খাতা, চিত্রাঙ্গদা অভিনয় করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আর্ট থিয়েটার উদ্যোগ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের নাটককে সাধারণ রঙ্গালয়ে নিয়ে আসে। এই পর্যায়ে আর্ট

থিয়েটারই সর্বাধিক রবীন্দ্রনাটকের অভিনয়ের আয়োজন করে। তারা রবীন্দ্রনাথের সক্রিয় সাহায্য, উপদেশ ও সহযোগিতা পেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রতি অনুরাগ, শ্রদ্ধা ও অপরেশচন্দ্রের পরিচালনার আন্তরিকতা এবং সে যুগের সব ক্ষমতাশালী অভিনেতা-অভিনেত্রীর দক্ষতায় রবীন্দ্রনাটকগুলি আর্ট থিয়েটারে সাফল্যলাভ করেছিল। এই একই সময়ে শিশির ভাদুড়ি তাঁর থিয়েটারে রবীন্দ্রনাটকের যা অভিনয় করেছেন, আর্ট থিয়েটার তার চেয়ে অনেক বেশি করেছে এবং যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে অভিনয়ের চেষ্টা করেছে। সবগুলি সমান সাফল্য না পেলেও তারা অভিনয় চালিয়ে গেছে। তখনকার পত্র-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাটকের অভিনয়ের প্রশংসাই করা হয়েছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সমর্থন, প্রশংসা ও আশীর্বাদ তারা লাভ করেছিল। বহু নাটকের অভিনয় রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে ও স্বজন বান্ধবসহ দেখতে গিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাটকাভিনয়ের সঙ্গে অনেক সময়েই তারা প্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা শিশির ভাদুড়িকে ডেকে এনে অভিনয় করিয়েছেন। শিশির ভাদুড়ির উপস্থিতি ও অভিনয়ে আর্ট থিয়েটারের মর্যাদা আরো বেড়ে গেছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ঝিমিয়ে পড়া বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়কে আর্ট থিয়েটার চাঙ্গা করে তুলেছিল। নাটক নির্বাচন, অসামান্য অভিনেতা-অভিনেত্রী'র সমাবেশ, অপরেশচন্দ্রের নিষ্ঠা এবং প্রয়োগ কৌশলের গুণে শিশির ভাদুড়ির সমকালে আর্ট থিয়েটার জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠেছিল। আর্ট থিয়েটারের সাফল্যের ইতিহাস টানা দশ বছর অব্যাহত ছিল। অপরেশচন্দ্রের ২১টি, রবীন্দ্রনাথের ৯টি এবং অন্যান্য নাট্যকারের আরো ২২টি, মোট প্রায় ৫২ টি নাটক আর্ট থিয়েটার মঞ্চস্থ করে।

মাঝে ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে আর্ট থিয়েটার মনোমোহন থিয়েটার ভাড়া নেয়। তখন একই সঙ্গে দুটো থিয়েটারই আর্ট থিয়েটার লিমিটেড চালাতে থাকে। আর্ট থিয়েটার সেই সময়ে স্টার মঞ্চে অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে মনোমোহন মঞ্চে অপরেশের শ্রীরামচন্দ্র (১ জুলাই), মন্মথ রায়ের চাঁদসওদাগর (১৮ সেপ্টেম্বর), পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের আরবী হুর (২৩ ডিসেম্বর) অভিনয় করেছিল। এছাড়া কিছু পুরনো নাটকেরও অভিনয় চালানো হয়েছিল।

১৯২৮-এর জুন মাসে মনোমোহন মঞ্চ ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো। কেননা, এই দুই মঞ্চেই একই শিল্পীরা অভিনয় করতেন। একই দিনে অনেক শিল্পীকে দুটো থিয়েটারেই অংশ নিতে হতো। ফলে শিল্পী পরিচালক এবং অন্যেরা অত্যধিক শারীরিক চাপের দরুন দুটো দিক সামলাতে পারছিলেন না। তাই শুধু স্টার মঞ্চ রেখে আর্ট থিয়েটার মনোমোহন মঞ্চে অভিনয় বন্ধ করে দেয়।

আর্ট থিয়েটারের সমকালে শিশির ভাদুড়ির নাট্যপ্রযোজনাগুলি বেশি স্বীকৃতি এবং প্রচার পায়—বিশেষ করে বিদগ্ধ, শিক্ষিত মহলে। আর্ট থিয়েটার অন্যদিকে সাধারণ দর্শকের সমাদর লাভ করেছিল অনেক বেশি। বহু সময়ে বিদগ্ধ দর্শকদেরও তারা আকৃষ্ট করতে পেরেছিল। আর্ট থিয়েটারের নাট্যাভিনয়ের কাল বাংলা থিয়েটারের একটি উজ্জ্বল অধ্যায়।

আর্ট থিয়েটার সম্পর্কে বলা যেতে পারে :

১. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বাংলার মৃতপ্রায় থিয়েটারকে নতুনভাবে চাঙ্গা করে তুলেছিল আর্ট থিয়েটার।
২. একাদিক্রমে দশবৎসর ধরে পঞ্চাশাধিক নানাভাব ও রসের নাটক অভিনয় করে দর্শকের মনকে থিয়েটার অভিমুখি করে তুলেছিল।
৩. সমসময়ে শিশিরকুমার ভাদুড়ি বাংলা থিয়েটারে যে প্রাণবন্যা এনেছিলেন, সেখানে বিদগ্ধরুচিশীল মানুষের সাজুয্য পেয়েছিলেন। আর্ট থিয়েটার একই সময়ে সাধারণ দর্শক ও বিদগ্ধ দর্শক—উভয়েরই মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছিল।
৪. তরতাজা সব নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রী দিয়ে আর্ট থিয়েটার নাট্যাভিনয়ে তারুণ্যের প্রাণ এনেছিল। এরাই পরবর্তী যুগে স্বনামখ্যাত হয়েছিলেন।
৫. গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ধারাকে আর্ট থিয়েটার এগিয়ে নিয়েছিল। অন্যদিকে শিশিরকুমার নতুন অভিনয়ধারা প্রবর্তন করেছিলেন।
৬. স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ স্বেচ্ছায় আর্ট থিয়েটারে তাঁর ‘চিরকুমার সভা’ অভিনয়ের সময়ে নিজে এবং তাঁর অনুগামীদের দিয়ে অভিনয়ে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন।
৭. এরাই সাধারণ রঙ্গালয়ে সবচেয়ে বেশি রবীন্দ্রনাটকের অভিনয় করেছিল।
৮. নাট্যকার, অভিনেতা এবং নাট্য পরিচালক হিসেবে বাংলা থিয়েটারে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও সিদ্ধি এই আর্ট থিয়েটারের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছিল।

রঙমহল থিয়েটার

৬৫/১ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট (বিধান সরণি), কলকাতা

প্রতিষ্ঠা : ১৯৩১ প্রথম নাটক : শ্রীশ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া

প্রতিষ্ঠাতা : রবি রায় ও সতু সেন (যোগেশ চৌধুরী)

স্থায়িত্ব কাল : ১৯৩১-২০০১

১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রমোহন রায় (রবি রায়) ও সতু সেনের উদ্যোগে একটি যৌথ প্রতিষ্ঠানরূপে 'রঙমহল'[১] থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রখ্যাত অন্ধ গায়ক ও অভিনেতা কৃষ্ণচন্দ্র দে (কানাকেষ্ট) ও রবি রায় এর অন্যতম ডিরেক্টর ছিলেন।

রবি রায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে ছাড়া যষ্ঠী গাঙ্গুলি, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, এস. আহমেদ, ডি. এন. ধর. হরচন্দ্র ঘোষ. হেমচন্দ্র দে প্রভৃতিকে নিয়ে একটি যৌথ কোম্পানী গড়ে তোলা হয়। ম্যানেজিং ডিরেক্টর হন অমর ঘোষ।

প্রতিষ্ঠার সময়ে রঙমহল থিয়েটারে অভিনেতা-অভিনেত্রী হিসেবে যোগ দেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ধীরাজ ভট্টাচার্য, যোগেশ চৌধুরী, নরেশ মিত্র, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শেফালিকা, শান্তি গুপ্তা, সরযূ দেবী প্রমুখ সে সময়ের খ্যাতিমান শিল্পীবৃন্দ। রবি রায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে তো ছিলেনই। শিল্প নির্দেশনা এবং আলোক সম্পাতের দায়িত্বে ছিলেন সতু সেন (সত্যেন্দ্রনাথ সেন)।

প্রখ্যাত অভিনেতা ও নাট্য পরিচালক শিশিরকুমার ভাদুড়ি এবং এঞ্জিনীয়র সতু সেন তখন আমেরিকা থেকে নাট্যাভিনয় করে ফিরে এসে নিজের কোনো থিয়েটারের অভাবে বসে ছিলেন। 'রঙমহল' তাঁদের দুজনকেই গ্রহণ করল।। শিশিরকুমারকে দশ হাজার টাকা বোনাস দিয়ে নিয়ে আসা হলো।

নতুন থিয়েটারের দ্বারোদঘাটন করেন সেকালের আর্ট থিয়েটারের পরিচালক ও নাট্যকার অভিনেতা অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। আনুষ্ঠানিক এই উদ্বোধন হয় ১৯৩১-এর ১ মে (১৭ বৈশাখ, ১৩৩৮)।

১৯৩১-এর ৮ আগস্ট যোগেশ চৌধুরীর লেখা 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া' নাটক দিয়েই রঙমহলের যাত্রা শুরু।

নাটক—যোগেশ চৌধুরী। পরিচালনা—শিশিরকুমার। সঙ্গীত—কৃষ্ণচন্দ্র দে।

১. ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে কলকাতার নতুনবাজার অঞ্চলে 'রঙমহল' নামে একটি থিয়েটার স্বল্পকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখানে প্রথম নাটক অভিনীত হয়েছিল মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মহামানব'। এই থিয়েটারটিই পরে 'রূপমহল'—নামে পরিবর্তিত হয়ে (১৯৩৫) অল্প কিছুদিন চলেছিল। দেবনারায়ণ গুপ্ত—নটনটী (৪র্থ খণ্ড), পৃঃ ৬২।

মঞ্চ--সতু সেন। মঞ্চ সজ্জাকর--ভূতনাথ দাস। স্মারক--মণিমোহন চট্টোপাধ্যায় ও বিমলচন্দ্র ঘোষ।

অভিনয়ে--নিমাই ও বিষ্ণুপ্রিয়ার চরিত্রে শিশিরকুমার এবং প্রভাদেবী অংশ নেন। শচীমাতা--কঙ্কাবতী। এছাড়া যোগেশ চৌধুরী, কৃষ্ণচন্দ্র দে, রবি রায়, সরযূ দেবী, রাজলক্ষ্মী অভিনয় করেন।

সতু সেন এই নাটকেই প্রথম বাংলা মঞ্চে শিল্পনির্দেশক হিসেবে কাজ শুরু করেন। আলোকসম্পাতের দায়িত্বও ছিল তাঁর। মঞ্চে আলো ব্যবহারের ধারা এবং সুরটাই তিনি পালটে দিলেন। প্রবীণ অভিনেতা অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য :

'বাংলা রঙ্গমঞ্চে মঞ্চ ও আলোর ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে ছিলেন সতু সেন। আমেরিকা থেকে ফেরার পর 'বিষ্ণুপ্রিয়া' নাটকে উনি প্রথম আলো করেন। দর্শক হিসেবে সেই আলো দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। নিমাইয়ের বাড়ির দাওয়া, মা-ছেলের কথা হচ্ছে। সময় তখন ধরা যাক সাড়ে বারোটা, তারপর গভীর রাত্রি, ক্রমশ ভোর হল। এই সম্পূর্ণ পরিবেশটা পেছনে শুধু সাইক্লোরামার সাহায্যে উনি তৈরি করেছিলেন।' [সংস্কৃতি, সতু সেন বিশেষ সংখ্যা। বর্ষ--২, ১৯৯৮]

'বিজয়িনী' অভিনয় হলো ১৭ জানুয়ারি, ১৯৩২। ২৫ মার্চ অভিনীত হলো 'রঙের খেলা' (নলিনী চট্টোপাধ্যায়)। বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের 'বনের পাখী' (২ এপ্রিল)। মে মাসে অভিনীত হলো 'শাদী কি শূল' এবং ২৫ জুন নামানো হলো উৎপলেন্দু সেনের 'সিন্ধুগৌরব'। এই নাটকে অভিনয় করেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী, ধীরাজ ভট্টাচার্য, উৎপল সেন, সরযূবালা প্রমুখ। সতু সেন মঞ্চ ও আলোতে অভিনবত্ব সৃষ্টি করে দর্শকদের চমকে দেন। মঞ্চ জুড়ে সিন্ধুনদের উপকূলে বিশাল নৌকা নির্মাণ করেছিলেন। মঞ্চসজ্জাও করা হয়েছিল জাঁকজমক সহকারে। 'বনের পাখী' নাটকটিও খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। রবি রায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে, সন্তোষ সিংহ, ধীরাজ ভট্টাচার্য, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, চারুবালা, শশীবালা, শেফালিকা, সরযূ দেবী প্রমুখ শিল্পীর অভিনয়ে নাটকটি জমে গিয়েছিল।

শিশিরকুমার ততদিনে 'রঙমহল' ছেড়ে চলে গেছেন। তিনি এখানে ১৯৩১-৩২ পর্যন্ত ছিলেন। 'রঙমহল'-এর আর্থিক দুরবস্থার ফলে কর্তৃত্বভার হস্তান্তরিত হয়। ১৯৩৩ থেকে যামিনী মিত্র ও শিশির মল্লিক থিয়েটার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সতু সেন-ও এদের সঙ্গে ছিলেন। উদ্যোগী হয়ে নতুন কর্তৃপক্ষ নলিনী চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবদাসী' প্রযোজনা করল ১৯৩৩-এর ফেব্রুয়ারি মাসে। তারপরেই যামিনী মিত্র ও শিশির মল্লিক যৌথভাবে রঙমহল-এর নতুন মঞ্চ নির্মাণে তৎপর হন। সতু সেনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাঁরই পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টায় 'ঘূর্ণায়মান মঞ্চ' (Revolving Stage) তৈরি করা হয়। বাংলা তথা ভারতে রঙমহল থিয়েটারেই প্রথম এই ধরনের মঞ্চ প্রবর্তন করা হয়। এঞ্জিনীয়ার নাট্যরসিক সতু সেনের উদ্যোগ ও কর্মকুশলতায় প্রবর্তিত হলো 'ঘূর্ণায়মান মঞ্চ'। এই রকমের মঞ্চের উপযোগিতা সম্পর্কে সতু সেনেব বক্তব্য :

'স্থানু মঞ্চের উপর একটি দৃশ্য থেকে অপর একটি দৃশ্যে যেতে হলে মঞ্চসজ্জার পরিবর্তন, বিভিন্ন চরিত্রের আগমন ও নিষ্ক্রমণে প্রচণ্ডভাবে সময়ের অপব্যবহার হত। দ্বিতীয়ত, নাটকের গতি ও সচলতাও তাতে বিঘ্নিত হয়ে পড়ে। উক্ত অসুবিধাগুলি দূর করার প্রয়াসেই আমি ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চ নির্মাণে ব্রতী হই।'

এই মঞ্চ তৈরি করতে সে সময়ে খরচ হয়েছিল এগারো হাজার তিনশ টাকা।

এই নতুন মঞ্চে অভিনয়ের জন্য ঠিক করা হলো অনুরূপা দেবীর জনপ্রিয় উপন্যাস 'মহানিশা'। নাট্যরূপ দিলেন যোগেশ চৌধুরী। পরিচালনা—নরেশ মিত্র। অভিনয় করলেন--নরেশ মিত্র, যোগেশ চৌধুরী, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি রায়, ভূমেন রায়, শান্তি গুপ্তা, পুতুল, চারুবালা প্রমুখ। রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এই নাটকেই অভিনয়ের জন্য রঙমহলে প্রথম যোগ দেন।

১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ এপ্রিল মহাসমারোহে 'মহানিশা' নাটকের অভিনয় দিয়ে রঙমহলের নবযাত্রা শুরু হলো। প্রথম ঘূর্ণায়মান মঞ্চে অভিনীত হলো 'মহানিশা'। মঞ্চ পরিকল্পনা, মঞ্চস্থাপত্য এবং আলোর ব্যবহারে অভিনবত্ব এলো বাংলা মঞ্চে। 'মহানিশা' খুবই জনপ্রিয় হয়। ভালো ভালো অভিনেতা-অভিনেত্রী, নরেশ মিত্রের কুশলী পরিচালনা, নতুন ধরনের ঘূর্ণায়মান মঞ্চ, অনুরূপা দেবীর উপন্যাসের কাহিনী—সব মিলিয়ে মহানিশা দর্শকদের ভীষণভাবে আকৃষ্ট করে। রঙমহলের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এই নাটকে যোগেশ চৌধুরীর অসামান্য অভিনয়ের বিবরণ দিয়েছেন শম্ভু মিত্র তাঁর 'কিছু স্মরণীয় অভিনয়' প্রবন্ধে [যোগেশ চৌধুরী অভিনয় করতেন গ্রামের এক সুদখোর বদমেজাজি লোকের চরিত্রে] :

'একদিন সেই খিটখিটে স্বভাবের লোকটি তাঁর পুরনো জমজমাট সংসারের বর্ণনা দেন। শুরুটা করেন যেন খানিকটা ব্যঙ্গে, অলিপ্ত তৃতীয় ব্যক্তির মতো। কিন্তু বলতে বলতে তাঁর গলা বদলে যায়, স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে, বিবরণটা ক্রমশ যেন গভীরভাবে ব্যক্তিগত হয়ে উঠল। তখন এই নিঃসঙ্গ বদমেজাজি মানুষটার গোপন ক্ষতের জায়গাটা হঠাৎ প্রকাশ হয়ে পড়ে। যোগেশ চৌধুরীর বাচনভঙ্গি ছিল স্বাভাবিক কথা বলারই মতো। এই অভিনয়ে বরং খিচিয়ে ওঠার ভাব ছিল বেশি। সেই কাঠামোর মধ্যেই তিনি অতিকৃতির সাহায্য না নিয়ে এমন একটা সুর আনতেন যে, বর্ণনার শেষটুকুতে মনে হত লোকটা যেন আর্তনাদ করে বিলাপ করে উঠল।

১৯৩৩-এর ২ ডিসেম্বর অভিনীত হলো মন্মথ রায়ের 'অশোক'। পরিচালনায় নরেশ মিত্র। অভিনেত্রী শান্তি গুপ্তা এই নাটকেই প্রথম রঙমহলে যোগ দেন। অন্য শিল্পীরা হলেন রবি রায়, ভূমেন রায়, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশ মিত্র, চারুবালা প্রমুখ।

এই নাটকেও সতু সেনের মঞ্চসজ্জা ও আলোকসম্পাত উচ্চমানের হয়েছিল। অমৃতবাজার পত্রিকার মন্তব্য :

'...of all Play-houses, in Calcutta to-day, Rangmahal is probably doing most to build up a sound tradition for the Bengali Stage on

entirely new lines.' অথবা

'Cheer up Rangmahal! You have received the fallen glory of Bengali Stage.'

ধীরেন্দ্র নারায়ণ রায়ের উপন্যাস 'স্পর্শের অভাব' অবলম্বনে নাটক তৈরি করেন যোগেশ চৌধুরী। নাম দেন 'পতিব্রতা'--প্রথম অভিনয় হল ৩১ মার্চ, ১৯৩৪। অভিনয়ে —নরেশ মিত্র, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দুভূষণ, শান্তি গুপ্তা, যোগেশ চৌধুরী প্রমুখ।

'বাংলার মেয়ে' অভিনীত হলো ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর কাহিনী 'পথের শেষে' অবলম্বনে 'বাংলার মেয়ে' নাটক তৈরি করেন যোগেশ চৌধুরী। পরিচালনায় ছিলেন সতু সেন ও নির্মলেন্দু লাহিড়ী।

এর আগে কয়েকটি পুরনো নাটক যেমন কাজরী (শৈলেন রায়), রাবণ (যোগেশ চৌধুরী, ১২.১২.৩৪), বনের পাখী (৭.৮.৩৪) অভিনীত হয়েছিল কিন্তু তেমন সাফল্য পায়নি। কিন্তু 'মহানিশা'র অভূতপূর্ব সাফল্যের পর অশোক এবং বাংলার মেয়ে অধিক সাফল্য পেয়েছিল।

১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে রঙমহল অভিনয় করে অনুরূপা দেবীর 'পথের সাথী' (নাট্যরূপ : যোগেশ চৌধুরী, ৯ মে)।

১৯৩৫-এ শিশির মল্লিক রঙমহল-এর দায়িত্ব ছেড়ে দেন। দায়িত্ব নেন অমর ঘোষ। তাঁরই নেতৃত্বে এখানে এবার অভিনয় হলো 'চরিত্রহীন'। ২০ ডিসেম্বর, ১৯৩৫। শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয় ও বহু আলোচিত উপন্যাসটির নাট্যরূপ দিলেন যোগেশ চৌধুরী। যুগ্ম পরিচালনায় রইলেন নরেশ মিত্র ও সতু সেন। অভিনয়ে ছিলেন—উপেন্দ্র-মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। সাবিত্রী--শেফালিকা। কিরণময়ী—শান্তি গুপ্তা। দিবাকর—ধীরাজ ভট্টাচার্য। এছাড়া যোগেশ চৌধুরী, নরেশ মিত্র, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীরাও ছিলেন। উপেন্দ্র চরিত্রে অভিনয় করে বাংলা মঞ্চে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা পান মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। 'চরিত্রহীন' একটানা দীর্ঘদিন চলে রঙমহল-এর গৌরব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে।

'চরিত্রহীন' নাটকের অভিনয় বেশ কিছুদিন চলার পর কর্তৃপক্ষ আবার পুরনো মঞ্চসফল 'পথের সাথী' নাটকটি অভিনয় করে (৯ মে, ১৯৩৬)। তারপরে সুধীন্দ্রনাথ রাহার 'সর্বহারা' এবং যোগেশ চৌধুরীর নাটক 'নন্দরানীর সংসার' (২৩ আগস্ট ১৯৩৬) নামানো হয়। মাঝে অনেকগুলি নাটকের ব্যর্থতার পর 'নন্দরানীর সংসার' কিছুটা সাফল্য পেয়েছিল। তাতেও থিয়েটারের দুরবস্থা কাটেনি। তাই থিয়েটার বন্ধ রাখতে হয়।

ঋণভার কাটিয়ে নতুন করে আবার যামিনী মিত্র, যোগেশ চৌধুরী, কৃষ্ণচন্দ্র দে, রঘুনাথ মল্লিক প্রমুখের যৌথ পরিচালনায় রঙমহল চালু হয়। যামিনী মল্লিক এবং রঘুনাথ মল্লিক থিয়েটারের দায়িত্ব নেন। নাট্য পরিচালক হিসেবে যোগ দিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। নতুন নাট্যকার হিসেবে রঙমহলে এলেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্যের অভিষেক হলো এখানে। নতুন উদ্যোগে এবার অভিনয় শুরু হলো ১৯৩৭-এর মাঝামাঝি।

প্রথমে নামানো হলো অভিযেক, সর্বহারা প্রভৃতি কয়েকটি সাধারণ মানের নাটক। তারপরে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ডিটেকটিভ' (১০ জুলাই, ১৯৩৭) ও বন্ধু (১৮ আগস্ট, ৩৭) এবং শচীন সেনগুপ্তের প্রলয় (১৯৩৭) এই নাটকগুলি মোটের ওপর চলল। রঙমহল কর্তৃপক্ষ কিছুটা সামলে নিয়ে নতুনভাবে প্রস্তুত হলেন। 'বন্ধু' নাটক পরিচালনায় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। অভিনয়ে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (জ্ঞানাঞ্জন), জহর গাঙ্গুলি (হেমন্ত), তুলসী চক্রবর্তী (কেবল রাম), শেফালিকা (উর্মিলা), ঊষা দেবী (মন্দা)। সঙ্গীত পরিচালনায় কৃষ্ণচন্দ্র দে। সুধীন্দ্রনাথ রাহার সর্বহারা (৩০।৫।৩৬) নাটকে নজরুল কয়েকটি গান লিখে দেন এবং সুর সংযোজনাও করেন। 'বন্ধু' নাটকেও সঙ্গীত পরিচালনা করেন নজরুল।

তারপরেই অভিনীত হলো শচীন সেনগুপ্তের 'স্বামীস্ত্রী'। অভিনয় করলেন অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। এদের উল্লেখযোগ্য অভিনয়ে 'স্বামীস্ত্রী' বেশ ভালোভাবে চলল। এই নাটকেই কয়লাখনির দৃশ্য বাস্তবসম্মত ভাবে দেখানো হয়েছিল। আলো ও দৃশ্যপটের কৌশলে কয়লাখনির দৃশ্য এতো জীবন্ত হয়ে উঠেছিল যে, দর্শক বিমোহিত হয়েছিল।

১৯৩৭-৩৮-এর মধ্যেই রঙমহলে অভিনেতা হিসেবে যোগ দিয়েছেন দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অহীন্দ্র চৌধুরী। সে যুগের জনপ্রিয়, সুদর্শন ও প্রতিভাবান এই দুজন অভিনেতাকে একসঙ্গে পেয়ে রঙমহলের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো। তার ওপরে নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য এবং নাট্য পরিচালক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র—এই চারের সম্মিলনে 'রঙমহল' নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করল।

অভিনীত হলো 'তটিনীর বিচার'। প্রথম অভিনয় ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৩৮। নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত। অভিনয় করলেন অহীন্দ্র চৌধুরী—ডাঃ ভোস। রাণীবালা—তটিনী। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও অভিনয় করেন। তটিনীর চরিত্রে রানীবালার অভিনয় খুবই প্রশংসিত হয়েছিল। ডা. ভোস চরিত্রে অহীন্দ্র চৌধুরী নতুন ধরনের চরিত্র রূপায়ণে কৃ[illegible] অর্জন করেন। দারুণভাবে জমে গেল 'তটিনীর বিচার'। অভিনেতা-অভিনেত্রী হিসেবে অহীন্দ্র চৌধুরী-রানীবালার স্মরণীয় অভিনয় এই নাটকে দর্শকদের অত্যধিক খুশি করল।

'স্বামী স্ত্রী', 'বিদ্যুৎপর্ণা' (মন্মথ রায়), তটিনীর বিচার', 'ভোটভণ্ডুল' ([illegible] ভদ্র) পরপর অভিনয় করে রঙমহলের আবার স্থিতাবস্থা ফিরে এলো।

১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে শুরু হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধের আতঙ্ক, ব্লাক আউট, বোমা পড়ার ভয়—সব নিয়ে কলকাতা তখন বিপর্যস্ত। সব থিয়েটারের মতো রঙমহলেরও তখন প্রাণান্তকর অবস্থা। এই সময়ে কিছুদিন রঙমহল বন্ধ থাকে। ১৯৩৯-এর ৫ জুলাই শুরু হলো বিধায়ক ভট্টাচার্যের লেখা নাটক 'বিশ বছর আগে'। রানীবালা এই নাটকে 'বীণা' চরিত্রে খুব ভালো অভিনয় করেন। তারপরে গৌর শী'র নাটক 'ঘূর্ণি', বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মালা রায়' অভিনীত হয়। 'মেঘমুক্তি' (৯.৯.৩৯) ভালোই চলেছিল।

১৯৪০-এর ২৪ ডিসেম্বর অভিনীত হলো 'রত্নদীপ', প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'রত্নদীপ' অবলম্বনে নাটক লিখলেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। অভিনীত হলো 'মাটির ঘর' (সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯)। এই নাটকে অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাসের সঙ্গে শান্তি গুপ্তা। এই নাটকেই প্রথম মোটে ৬টি দৃশ্যের সেট ব্যবহার করে অভিনয় করা হয়। সে যুগে 'রত্নদীপ' খুবই সাফল্য লাভ করেছিল।

১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে রঙমহলের 'লেসী' হলেন অভিনেতা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি সে সময়কার সেরা শিল্পীদের এখানে জড়ো করলেন। অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, সন্তোষ সিংহ, জহর গাঙ্গুলি, তুলসী চক্রবর্তী, মিহির ভট্টাচার্য, রানীবালা, সুহাসিনী প্রভৃতি। রঙমহলের তখন বেশ ভালো অবস্থা। অভিনয়গুলি দর্শক আনুকূল্যে সাফল্য লাভ করছে। উৎসাহিত হয়ে কর্তৃপক্ষ পরপর অভিনয় করে গেলেন বেশ কয়েকটি নাটক। তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হলো মাকড়শার জাল, ডা. মিস কুমুদ, আগামীকাল, আঁধার শেষে, রক্তের ডাক ইত্যাদি।

এখানে উল্লেখযোগ্য, রঙমহলের 'মালা রায়' নাটকের অভিনয়েই প্রখ্যাত অভিনেতা ও নাট্য পরিচালক শম্ভু মিত্র প্রথম মঞ্চাবতরণ করেন এবং পরবর্তী কালের বিখ্যাত অভিনেতা নীতিশ মুখোপাধ্যায় 'রক্তের ডাক' নাটকে অভিনয় জীবন শুরু করেন।

এই সময়কার উল্লেখযোগ্য অভিনয় 'গোরা'। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের নাট্যরূপ। গোরা চরিত্রে অভিনয় করেন অহীন্দ্র চৌধুরী।

১৯৪১-এর ১৪ আগস্ট তুলসী লাহিড়ীর নাটক 'মায়ের দাবী' অভিনীত হলো। অভিনেতা হিসেবে তুলসী লাহিড়ীও এই নাটকে প্রথম মঞ্চে অবতীর্ণ হন। এই বছরেই অভিনয় হলো বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'তুমি ও আমি' (৩ ডিসেম্বর)।

১৯৪২-এর গোড়ার দিকে অভিনীত হলো মহেন্দ্র গুপ্তের 'মাইকেল' এবং অয়স্কান্ত বক্সীর 'ভোলা মাস্টার'। দুটি নাটকেই নাম ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরীর অসামান্য অভিনয় উল্লেখযোগ্য। হেনরিয়েটা চরিত্রে রানীবালার অভিনয়ও স্মরণযোগ্য।

পুরনো নাটক 'রিজিয়া' অভিনীত হলো ১৯৪৩-এর সেপ্টেম্বর মাসে। রিজিয়া চরিত্রে সুশীলাসুন্দরী অনবদ্য অভিনয় করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে এই সময়ে বেশ কিছুদিন রঙমহল বন্ধ থাকে। ১৯৪৪ থেকে আবার অভিনয় শুরু হয়।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, বিশ্বযুদ্ধের মহাঘোর সঙ্কটঘন মুহূর্তে যখন দেশবাসী বিপর্যস্ত এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রবল জোয়ারে যখন উত্তাল বঙ্গদেশ, তখন কোনো থিয়েটারেই তার রেশ পড়েনি। রঙমহলও পারেনি সেই সময়কার দেশবাসীর প্রাণচাঞ্চল্য ও বিপর্যয়কে নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করতে। বরং তারা গতানুগতিক ভাব-ভাবনা ও ধারণার নাটকই ক্রমাগত অভিনয় করে গেছে।

১৯৪৪-এর ১৪ সেপ্টেম্বর অয়স্কান্ত বক্সীর নাটক 'অধিকার' দিয়ে রঙমহল আবার চালু হলো। অভিনয়ে ছিলেন—অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি গুপ্তা, পূর্ণিমা, সুহাসিনী,

সন্তোষ সিংহ, জহর গাঙ্গুলি প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ।

তারপরে তারাশঙ্করের নিজের লেখা নাটক 'বিংশ শতাব্দী' অভিনীত হলো ১৯৪৪-এর ২৫ ডিসেম্বর। তার আগেই অভিনীত হয়েছিল শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি'র নাট্যরূপ (দেবনারায়ণ গুপ্ত), ২২ জুন, ১৯৪৪।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের নাট্যরূপ (বাণী কুমার) 'সন্তান' অভিনীত হলো ১৯৪৫-এর ১৮ জানুয়ারি। অভিনয় করলেন—

সত্যানন্দ--অহীন্দ্র চৌধুরী। জীবানন্দ—অমল বন্দ্যোপাধ্যায়। ভবানন্দ--মিহির ভট্টাচার্য। শান্তি—শান্তি গুপ্তা।

'সন্তান' নাটক যুগীয় উন্মাদনার কাছাকাছি আসতে চেয়েছিল। তাই চলেছিলও ভালো।

তারপরেই অভিনীত হলো শরৎচন্দ্রের 'অনুপমার প্রেম' বড়ো গল্পের নাট্যরূপ (ঃ দেবনারায়ণ গুপ্ত)। শচীন সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌলা' এই বছরের (১৯৪৫) উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা।

১৯৪৬-এ রঙমহলে অভিনীত হলো উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে 'রাজপথ' নাটক। নাট্যরূপ—দেবনারায়ণ গুপ্ত। তারপরেই রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা'। রবীন্দ্রনাথের এই নৃত্যগীতপূর্ণ কমেডি নাটক এর আগে আর্ট থিয়েটারে অভিনীত হয়ে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। রঙমহলে 'চিরকুমার সভা' আর তেমনভাবে চলল না।

১৯৪৬-এ কলকাতায় ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। তাতে সারাদেশের জনজীবন উৎকণ্ঠিত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। থিয়েটারগুলির ওপরেও তার প্রভাব পড়ে। সেই সময়ে কলকাতার থিয়েটারগুলির খুবই সঙ্গীন অবস্থা। রঙমহল-ও কিছু কিছু পুরনো নাটক অভিনয় চালিয়ে থিয়েটারকে বাঁচাবার প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। 'চিরকুমার সভা' সেই সময়ে তাই চলেনি। কিন্তু ভালো চলল বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'সেই তিমিরে' নাটক (১৮ ডিসেম্বর ১৯৪৬)।

১৯৪৭-এর ১৪ আগস্ট, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বরাত্রে, অভিনীত হলো শচীন সেনগুপ্তের নতুন নাটক 'বাংলার প্রতাপ'। প্রতাপাদিত্যকে কেন্দ্র করে এই নাটক বাঙালীর স্বাধীনতা স্পৃহাকে কেন্দ্র করে লেখা। এই নাটকে ফিরিঙ্গি 'কার্ভালো' চরিত্রে অসামান্য অভিনয় করেন অহীন্দ্র চৌধুরী। পরে অভিনেতা ভূমেন রায় এই চরিত্রে সমধিক কৃতিত্ব অর্জন করেন। 'বাংলার প্রতাপ' খুবই সাফল্য লাভ করল।

এদিকে দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দ্বিখণ্ডিত হলো। ওপার বাংলার ছিন্নমূল মানুষের ভিড়ে কলকাতা তখন ব্যতিব্যস্ত। উদ্বাস্তু সমস্যা দেশের এক বিরাট সমস্যা হয়ে দেখা দিল। বাংলার অর্থনীতিতে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করল। এই সময়ে কলকাতার কোনো রঙ্গমঞ্চই স্বাভাবিকভাবে নাটক অভিনয় চালাতে পারেনি। রঙমহল-ও তা থেকে বাদ গেল না।

১৯৪৮-এ অভিনীত হলো দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখা ঐতিহাসিক নাটক 'রাণাপ্রতাপ', শচীন সেনগুপ্তের 'আবুল হাসান'।

১৯৪৯-এ কোনো রকমে অভিনীত হলো 'এই স্বাধীনতা' (শচীন সেনগুপ্ত) এবং 'ক্ষুদিরাম' (শশাঙ্কশেখর)। 'এই স্বাধীনতা'র প্রথম অভিনয় ২৪ ডিসেম্বর ১৯৪৯।

স্বাধীনতার সময় থেকে রঙমহলে অভিনেতা-অভিনেত্রী হিসেবে ছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী, জহর গাঙ্গুলি, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, সন্তোষ সিংহ, মিহির ভট্টাচার্য, রানীবালা, সুহাসিনী প্রমুখ খ্যাতিমান শিল্পীবৃন্দ। নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অভিনেতা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি 'লেসী' হিসেবে দক্ষতার সঙ্গে থিয়েটার পরিচালনা করলেও, বে-হিসেবি খরচ-খরচার জন্য দেনায় জড়িয়ে পড়েন। তিনি 'দেউলিয়া' ঘোষিত হন আদালতের নির্দেশে। ১৯৪৯ থেকে দায়িত্ব নেন সীতানাথ মুখোপাধ্যায়। শরৎচন্দ্রের আমলে নাট্যপরিচালক ও প্রধান অভিনেতা হিসেবে অহীন্দ্র চৌধুরী রিজিয়া, মেবারপতন, বঙ্গের বর্গী ইত্যাদি পুরনো নাটকগুলির সম্পাদনা করে কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। তবুও শরৎচন্দ্রকে বাঁচানো যায় নি। তিনি নিঃস্ব হয়ে পড়েন।

১৯৪৯-এ আরো অভিনীত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী'র নাট্যরূপ (২৯.৭.৪৯) এবং তারাশঙ্করের লেখা নাটক 'দুইপুরুষ'। 'রজনী'র নাট্যরূপ দেন শচীন সেনগুপ্ত। 'দুইপুরুষ' দারুণ সাফল্য লাভ করে। বিশেষ করে নুটুবিহারী চরিত্রের দৃপ্ত সংগ্রামী চেতনা ও সততার অন্বেষণ দর্শকদের মুগ্ধ করে। সেই সময়কার পত্র-পত্রিকায় 'দুই পুরুষ' নাটকের খুবই প্রশংসা করা হয় :

'The play presents itself as a perfect specimen of a heat drama, masterfully woven by a magic hand, neatly executed with finished touches of productional fineness and re-created by a nicely co-ordinated band of artists.' [Anritabazar Patrika,28-6-1942]

এই সময়ে সতীশচন্দ্র ঘটকের 'আদর্শ স্ত্রী' অভিনীত হয়েছিল (২৯ অক্টোবর, ১৯৪৯)।

১৯৫০-এ শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' উপন্যাসের নাট্যরূপ খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। নাট্যরূপ—শচীন সেনগুপ্ত। এই নাটক সম্পর্কে দুটি তথ্য উল্লেখযোগ্য। প্রথম, এই নাটকে 'বসন্ত' নামে একটি নতুন চরিত্র নাট্যরূপে সংযোজন করা হয়, যা মূল উপন্যাসে ছিল না। এই চরিত্রটি তৈরি করা হয়েছিল নির্মলেন্দু লাহিড়ীর অভিনয়ের জন্য। দ্বিতীয়, ১৯৫০-এর ২৩ জানুয়ারি 'দেবদাস' নাটকের এই নবসৃষ্ট 'বসন্ত' চরিত্রেই নির্মলেন্দুর শেষ অভিনয় এই রঙমহল থিয়েটারেই।

১৯৫১-তে শরৎচন্দ্রের রমরমা। তাঁর কাহিনীর ওপর ভরসা করেই 'রঙমহল' বেঁচে উঠতে চাইছে। প্রথমে নামানো হলো 'পণ্ডিতমশাই' (নাট্যরূপ : বিধায়ক ভট্টাচার্য), ৭ জুন, ১৯৫১। তারপরেই 'নিষ্কৃতি'। নাট্যরূপ দিলেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। অভিনীত হলো ১৯৫১-র ২ অক্টোবর। অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করল। পারিবারিক সেন্টিমেন্টাল কাহিনী এবং বড়ো ভাই গিরীশ এবং বড়ো বউ সিদ্ধেশ্বরীর চরিত্রে জহর গাঙ্গুলি এবং প্রভাদেবীর অসামান্য অভিনয়—নাটকটির সাফল্যের মূলে। প্রচুর আর্থিক উপার্জন হলো

এই নাটকে। অন্য শিল্পীরা ছিলেন—রানীবালা, হরিধন মুখোপাধ্যায়।

'নিষ্কৃতি'র সময়েই (১৯৫১) মধ্য সাপ্তাহিক নাটক হিসেবে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'চাঁদবিবি' নামানো হয়। নাটকটি খুবই প্রশংসিত হয়। বিশেষ করে চাঁদবিবির চরিত্রে প্রভাদেবীর অনবদ্য অভিনয় এবং রঘুজীর চরিত্রে জহর গাঙ্গুলির আকর্ষণ। ঘোড়ায় চড়ে যোশীবাঈ চরিত্রের মঞ্চে আসা সেই সময়ে দর্শক মহলে খুবই চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল।

১৯৫২-এর প্রথম দিনেই অভিনীত হলো 'জীজাবাঈ'। নাটক—সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়। জীজাবাঈ চরিত্রে প্রভাদেবী খুবই উৎকর্ষ দেখিয়েছিলেন। এই নাটকেই তাঁর মঞ্চে শেষ অভিনয়। এই বছরে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'বড় বৌ' নাটক মঞ্চস্থ হয় দেবনারায়ণ গুপ্তের পরিচালনায়।

১৯৫৩-তে 'রাণাপ্রতাপ' অভিনীত হয় (৭.১.১৯৫৩)। নাট্যরচনা—বিধায়ক ভট্টাচার্য। তারপরেই অশোক সেনের লেখা নাটক 'রানীবউ' (২৬.১.১৯৫৩)।

১৯৫৩-এর জুন মাসে প্রযোজিত হলো বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'আদর্শ হিন্দু হোটেল'-এর নাট্যরূপ (ঃ গোপাল চট্টোপাধ্যায়)। হাজারী ঠাকুরের ভূমিকায় অভিনয় করলেন ধীরাজ ভট্টাচার্য। তাঁর এই অভিনয় বহুদিন বাঙালি দর্শকের স্মৃতি হয়ে ছিল। দীর্ঘদিন চলল এই নাটক।

১৯৫৩-তে আরো কিছু অকিঞ্চিৎকর নাটকের অভিনয় হয়েছিল। ধীরেন্দ্র নারায়ণ রায়ের 'বিষবহ্নি' (১৪.৪.৫৩), প্রবোধচন্দ্র সান্যালের 'শ্যামলীর স্বপ্ন'-এর নাট্যরূপ (১৫.১০.৫৩), ব্রজেন্দ্রনাথ দে'র 'লাল পাঞ্জা' (৬.১১.৫৩) এবং মন্মথ রায়ের 'খুনীর বাড়ি' (১৫.১২.৫৩) সবগুলিই সাধারণ মানের। কোনোটিই তেমন চলেনি।

এরপরে 'রঙমহল' বন্ধ হয়ে যায়। মালিকানা হস্তান্তরিত হয়। ১৯৫৪-এর মে-জুন মাসে রঙমহলের পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন জীতেন বোস (প্রাচী সিনেমার মালিক), ভিটল ভাই মানসাটা (জ্যোতি সিনেমার মালিক)। ব্যবস্থাপক হিসেবে রইলেন নলিনী ব্যানার্জী এবং হেমন্ত ব্যানার্জী। পরিচালক হিসেবে রইলেন কালীপ্রসাদ ঘোষ। প্রযোজনার নিয়ামক হলেন নেপাল নাগ।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'দূরভাষিণী' উপন্যাস অবলম্বনে নাটক তৈরি করলেন সলিল সেন। নতুনভাবে নাটকটি অভিনয় করার জন্য আহ্বান করা হলো 'বহুরূপী' নাট্য সম্প্রদায়ের কয়েকজন শিল্পীকে। বিশেষ করে শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, গঙ্গাপদ বসু প্রভৃতি কয়েকজন। 'বহুরূপী' তখন 'রক্তকরবী' নাটক মঞ্চস্থ করে খ্যাতির তুঙ্গে। তাঁরা এসে যোগ দিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই নানা কারণে মতান্তর দেখা দিল। পরিচালক কালীপ্রসাদ ঘোষের হাত থেকে পরিচালনার দায়িত্ব নেন শম্ভু মিত্র। রিহার্সালের সময়েই নানা শর্তে গোলমাল চলে। শেষ পর্যন্ত বহুরূপীর অভিনেতৃবৃন্দ রঙমহল ছেড়ে দেন। তখন সলিল সেনের পরিচালনায় নীতিশ মুখোপাধ্যায়, জীবেন বোস, প্রণতি ঘোষ প্রভৃতি রঙমহলের নিয়মিত শিল্পীরা এগিয়ে এসে কোনক্রমে 'দূরভাষিণী' মঞ্চস্থ করলেন। ১৯৫৪-এর ৩১ জুলাই।

এরপরেই নামানো হলো 'উল্কা' নাটক। নীহাররঞ্জন গুপ্তের বহুল জনপ্রিয় উপন্যাস 'উল্কা' অবলম্বনে নাটকটি তৈরি হলো। পরিচালনা করলেন অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়। অভিনয় করলেন--

অরুণাংশু--দীপক মুখোপাধ্যায়। তাছাড়া নীতিশ মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, রবীন মজুমদার, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, শিপ্রা মিত্র, তপতী ঘোষ, গীতা সিং প্রমুখ।

১৯৫৪-এর ২ অক্টোবর 'উল্কা' নাটক রঙমহলে প্রথম অভিনীত হলো। কিম্ভূতদর্শন পুরুষ অরুণাংশুর চরিত্রে নবাগত দীপক মুখোপাধ্যায় সুন্দর অভিনয় করলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই 'উল্কা'র খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। ক্রমাগত দর্শকের ভিড়ে নাটকটি একাদিক্রমে ৫০০ রজনী অভিনীত হলো। এরপরেও বেশ কিছু রাত্রি অভিনীত হয়ে প্রায় ৬০০ রজনী পূর্ণ করল। ১৯৫৬-এর ৪ নভেম্বর পর্যন্ত একটানা অবিচ্ছিন্নভাবে 'উল্কা'র অভিনয় চলেছিল। বাংলা থিয়েটারে 'উল্কা' অভিনয় জগতে পাঁচশো রাত্রি অতিক্রম করে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। কর্তৃপক্ষ আর্থিক সাফল্যের মুখ দেখলেন।

'উল্কা'র অভূতপূর্ব সাফল্যের পরে অভিনীত হলো 'শেষলগ্ন'। মনোজ বসুর ঐ নামের উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি নাটকটি পরিচালনা করলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। 'শেষলগ্ন'-এ অভিনয় করলেন--

রবীন মজুমদার--প্রশান্ত। হরিধন মুখোপাধ্যায়--বনমালী। জীবেন বোস--নিখিল। জহর রায়--গোবিন্দ। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়--শিবনাথ। অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়--সাতকড়ি। দীপক মুখোপাধ্যায়--নীরদ। প্রণতি ঘোষ--গৌরী। গীতা সিং--বিভা। কেতকী দত্ত--সুরবালা। ইরা চক্রবর্তী--কাদম্বিনী (পরে সাধনা রায়চৌধুরী)। কানন দেবী--রজনী। মঞ্জুদেবী--কমলা।

১৯৫৬-এর ৮ নভেম্বর প্রথম অভিনয় শুরু করে ১৯৫৭-এর এপ্রিল মাস পর্যন্ত একটানা 'শেষলগ্নে'র অভিনয় চলেছিল। এই নাটকে সুরকার হিসেবে রাজেন সরকার খুবই কৃতিত্বের পরিচয় দেন। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র নাট্য পরিচালক হিসেবে সাফল্য অর্জন করেন।

এখানে একটি তথ্যের উল্লেখ করি। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ রঙমহলে ১৯৫৬ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত একটানা নাট্য পরিচালক হিসেবে যুক্ত ছিলেন। প্রখ্যাত কৌতুক অভিনেতা অজিত চট্টোপাধ্যায় ১৯৫৪ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত টানা ২৫ বছর রঙমহলে নিয়মিত অভিনয় করে গেছেন। ১৯৫৭ থেকে মৃণাল মুখোপাধ্যায় (মৃত্যুঞ্জয়) ১৯৭৭ পর্যন্ত রঙমহলে ২৯টি নাটকে ছোট বড়ো নানা ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

১৯৫৭-তে অভিনেতা-পরিচালক-নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্ত স্টার থিয়েটার ছেড়ে রঙমহলে যোগ দিলেন। তিনি যোগ দিয়েই এখানে তাঁর নিজের নাটক 'শতবর্ষ আগে' অভিনয় করলেন (১.৫.৫৭)। তারপরেই নামানো হলো তারাশঙ্করের স্বকৃত নাট্যরূপ 'কবি', ১৯৫৭-এর ১২ জুন। পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। এর আগেই চলচ্চিত্রে 'কবি' দেবকীকুমার বসুর পরিচালনায় খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। সেখানে নিতাই

কবিয়ালের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন রবীন মজুমদার। গায়ক-নায়ক এই অভিনেতাকে আনা হলো রঙমহলে ঐ একই চরিত্রে অভিনয়ের জন্য। নিতাই কবিয়ালের ভূমিকায় রবীন মজুমদার অভিনয় ও গানে অসামান্য কৃতিত্ব দেখালেন। মাঝে এই ভূমিকায় প্রশান্তকুমারও অভিনয় করেছিলেন কিছুদিন। উল্কার মতো কবিও অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে দীর্ঘরাত্রি অভিনীত হয়েছিল।

অভিনয়ে—

নিতাই কবিয়াল—রবীন মজুমদার। রাজন—নীতিশ মুখোপাধ্যায়। বসন—নীলিমা দাস। ঠাকুরঝি—গীতা সিং। মহাদেব কবিয়াল—হরিধন মুখোপাধ্যায়। বিপ্রপদ—জহর রায়। মামী—রাজলক্ষ্মী (বড়)। রাজনের স্ত্রী—কেতকী দত্ত। নীলিমা দাসের পরে কিছুদিন প্রণতি ঘোষ বসনের চরিত্রে অভিনয় করেন।

নাচে, গানে, অভিনয়ে এবং কাহিনীর আকর্ষণে কবি নাটক সাফল্য লাভ করেছিল। বসনের ভূমিকায় প্রথম মঞ্চাবতরণে নীলিমা দাস দারুণ জনপ্রিয়তা লাভ করেন। তারাশঙ্কর রচিত এই নাটকের গানগুলি রাজেন সরকারের সুরে একসময় লোকের মুখে মুখে ফিরেছিল। এই সম্পর্কে প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের অভিজ্ঞতা :

'যে নাটক দেখার পর বাড়ি ফিরেও মনের মধ্যে সুরের রেশ গুঞ্জরিত হতে থাকে, মামুলি বিশ্লেষণে তার প্রশংসা করতে মন চায় না। তারাশঙ্করের 'কবি' নাটকটি আমার কাছে একটি মধুর করুণ কবিতার মতো উপাদেয়। বারবার উপভোগ করেও আশা মেটে না।'

তারপরে তারাশঙ্করের নাটক 'দুইপুরুষ' (২১ ডিসেম্বর, ১৯৫৭) অভিনীত হলো। পরিচালনায় মহেন্দ্র গুপ্ত। এই নাটকে নুটু বিহারীর চরিত্রে ছবি বিশ্বাসের অনবদ্য অভিনয় এখনো স্মরণীয় হয়ে আছে। শিবনারায়ণ করেন অহীন্দ্র চৌধুরী। ১৯৫৮-এর এপ্রিল মাস পর্যন্ত একটানা চলে। নাটকটি এর আগেও রঙমহলে অভিনীত হয়েছিল।

১৯৫৮-এর উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা 'মায়ামৃগ' (১৪ এপ্রিল)। নীহাররঞ্জন গুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে তৈরি 'মায়ামৃগ' নাটকের পরিচালনায় ছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। সুরকার অনিল বাগচি। চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় সুদর্শন অভিনেতা বিশ্বজিৎ এই নাটকের ছোট একটি চরিত্রে অবতীর্ণ হন। এই নাটকটিও খুব সাফল্যজনকভাবে অভিনীত হয়। ১৯৫৯-এর ২০ মার্চ পর্যন্ত একটানা চলে।

১৯৫৯ থেকে প্রখ্যাত নাট্যকার অভিনেতা-পরিচালক তরুণ রায় (ধনঞ্জয় বৈরাগী) রঙমহলে যোগ দিয়ে নাটক অভিনয় করতে থাকেন। ১৯৫৯-৬০ এই দুই বছর তরুণ রায় তাঁর দল 'থিয়েটার সেন্টার'-এর লোকজন নিয়ে রঙমহলে নাট্য পরিচালনা করেন। এই সময়ে নাট্যকার হিসেবে শৈলেশ গুহ নিয়োগী এখানে যোগ দেন।

এই দুই বছরে তরুণ রায় তাঁর নিজের দুটো নাটক খুবই সফলভাবে অভিনয় করেন। পরিচালনাও তাঁরই। 'একমুঠো আকাশ' (১৫ এপ্রিল, ১৯৫৯), এবং 'এক পেয়ালা কফি' (১৯ ডিসেম্বর, ১৯৫৯)।

'এক মুঠো আকাশ' একটু ভিন্নধর্মী নাটক। বস্তিবাসীদের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা

এখানে প্রতিফলিত। নাটকটি এখানে একটানা আটমাস চলেছিল। নতুন স্বাদের এই নাটকটিকে সেদিনের দর্শকবৃন্দ স্বাগত জানিয়েছিল। তরুণ রায় ও দীপান্বিতা রায় গ্রুপ থিয়েটার থেকে এসে সাধারণ রঙ্গালয়ে খ্যাতি অর্জন করেন।

'এক পেয়ালা কফি' বিদেশী নাট্যকার ব্রুসেলস-এর নাটকের রূপান্তর (ধনঞ্জয় বৈরাগী)। এই নাটকটিও খুব সাফল্য লাভ করে। ডিকেটটিভ ধর্মী নাটকটি সেদিন দর্শকদের উত্তেজনায় ও রোমাঞ্চে ভরিয়ে রাখত। তরুণ রায়ের দুটি নাটকেই তাঁর থিয়েটার সেন্টারের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অংশ নিলেন। সঙ্গে রইলেন রঙমহলের নিয়মিত শিল্পীরা। তরুণ রায়, দীপান্বিতা রায়, রবীন মজুমদার, জহর রায়, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, কেতকী দত্ত, শৈলেশ গুহনিয়োগী প্রমুখ। পরে যোগ দেন দীপক মুখোপাধ্যায়, তপতী ঘোষ।

তরুণ রায় দলবল সমেত রঙমহল ছেড়ে চলে গেলে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের পরিচালনায় 'সাহেব বিবি গোলাম' নাটকের অভিনয় শুরু হয়। বিমল মিত্রের সুখ্যাত উপন্যাসের নাট্যরূপ 'সাহেব বিবি গোলাম' প্রথম অভিনয় হলো। নাট্যরূপ : শচীন সেনগুপ্ত। প্রথম অভিনয় হলো ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০। উল্লেখ্য, এই নাটকে মুখ্য ভূতনাথ-এর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন বিশ্বজিৎ।

১৯৬১-তে এসে রঙমহলে অভিনীত হলো সুশীল মুখোপাধ্যায়ের 'অনর্থ' (২৬ জানুয়ারি) এবং নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'চক্র' নাটক (১৫ আগস্ট)। প্রথমটি বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এবং দ্বিতীয়টি সলিল সেন পরিচালনা করেন। সাধারণ মাপের নাট্য প্রযোজনা দুটি বেশ কয়েক রাত্রি অভিনীত হয়।

১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে এসে রঙমহলে সঙ্কট ঘনিয়ে আসে। থিয়েটারের দুই মালিক জীতেন বোস এবং ভিটলভাই মানসাটা ছিলেন কলকাতার দুটি সিনেমা হলের মালিক। তারা বেশ কিছুদিন ধরেই চেষ্টা চালাচ্ছিলেন, যাতে এই থিয়েটার হলটিও একটি সিনেমা হলে রূপান্তরিত হয়। সেই মর্মে বিজ্ঞাপনও দেন তারা। একথা জানতে পেরে রঙমহলের শিল্পী ও কর্মীবৃন্দ ধর্মঘট করে এবং মালিকপক্ষের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে মুখর হয়। সমস্ত কর্মী ও শিল্পী থিয়েটারের সামনে ধর্ণা দিতে থাকেন জহর রায়, সরযূবালা সহযোগে। অভিনেতা অজিত চট্টোপাধ্যায় এই সময় থিয়েটারের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেন। সঙ্গে ছিলেন রঙমহলের শিল্পী-কলাকুশলী ও কর্মীবৃন্দ। মালিকপক্ষের হেমন্ত ব্যানার্জী এবং নলিনী ব্যানার্জী কর্মীদের পক্ষে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত ড. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের মধ্যস্থতায় তৎকালীন কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায় উভয় পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেন। ড. রায়ের উদ্যোগেই রঙমহল থিয়েটারটিকে শিল্পী-কলাকুশলী ও কর্মীদের হাতেই পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। সমবায় ভিত্তিতে এবার রঙমহল পরিচালিত হতে থাকে। অভিনেত্রী সরযূবালা এবং অভিনেতা জহর রায় সমবায় ভিত্তিক (co-operative) থিয়েটারের তরফে পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মালিকানা ভিত্তিক সাধারণ

রঙ্গালয়ের ইতিহাসে এই প্রথম একটি রঙ্গালয় সমবায় প্রথায় পরিচালিত হতে থাকে, শিল্পী-কলাকুশলী-কর্মীরা যার সদস্য।

এবারে নতুন উদ্যমে অভিনয় শুরু হলো। সমবায় প্রথায় রঙমহলে প্রথম অভিনীত হলো 'আদর্শ হিন্দু হোটেল', ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬২। এই নাটক অনেক বছর আগে এখানেই অভিনীত হয়ে প্রবল সাড়া ফেলে দিয়েছিল। এবারে নতুন শিল্পীরা নতুন উদ্যমে নাটকটিকে আবার সফল করে তুললেন। অভিনয়ে--সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, রবীন মজুমদার। পদ্ম ঝি'র ভূমিকায় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় অসামান্য কৃতিত্ব দেখালেন। আগের নাট্যরূপ (গোপাল চট্টোপাধ্যায়) এখানে কিছুটা সংশোধিত হয়ে অভিনীত হয়েছিল। জহর রায়--মতি চাকর। রবীন মজুমদার--শালাবাবু।

১৯৬৩-তে 'কথা কও' (সুনীল সরকার, ১২ জানুয়ারি), স্বীকৃতি (সলিল সেন, ২১ ডিসেম্বর) অভিনীত হলে। 'কথা কও' নাটকে অভিনয়ের জন্য এলেন গ্রুপ থিয়েটার 'রূপকার' গোষ্ঠীর পরিচালক অভিনেতা-গায়ক সবিতাব্রত দত্ত। সঙ্গে রইলেন অসিতবরণ, জহর রায়, রবীন মজুমদার, সত্য বন্দোপাধ্যায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, সরযূ দেবী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, শিপ্রা মিত্র প্রমুখ। নাট্যপ্রযোজনায় উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছিলেন সলিল সেন।

'স্বীকৃতি' নাটকে অভিনয়ের সময়ে রঙমহলের নিয়মিত শিল্পীদের সঙ্গে এসে যোগ দিলেন গ্রুপ থিয়েটারের অভিনেতা-পরিচালক শেখর চট্টোপাধ্যায়। আর, রঙমহলে 'স্বীকৃতি' নাটকেই রবীন মজুমদারের শেষ অভিনয়।

সমবায় প্রথায় পরিচালিত রঙমহল থিয়েটারে পরপর সফলভাবে নাটক অভিনীত হতে থাকল। এবং প্রায় সব নাটকই দর্শক আনুকূল্যলাভে সার্থক হলো। পরপর অভিনীত হয়ে চলল একের পর এক নাটক।

নাম বিভ্রাট : ২ অক্টোবর, ১৯৬৪। অস্কার ওয়াইল্ডের 'দ্য ইমপরটেন্স অফ বিয়িং আর্নেস্ট' নাটকের বাংলা রূপান্তর (ঃ আলো দাসগুপ্ত)।

টাকার রঙ কালো : ২ অক্টোবর, ১৯৬৫। নাট্যকার সুনীল চক্রবর্তী।

প্রতিমা : ১২ মে, ১৯৬৬। নাট্যকার সলিল সেন। তাঁরই পরিচালনায় অভিনীত হয়। এই সময়ে নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য আবার রঙমহলে যোগ দেন।

অতএব : ৬ অক্টোবর, ১৯৬৬। চলেছিল ১৯৬৭-এর জুলাই মাস পর্যন্ত। নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য। পরিচালনায় যুগ্মভাবে জহর রায় এবং হরিধন মুখোপাধ্যায়।

আদর্শ হিন্দু হোটেল : ১৮ জুন, ১৯৬৭।

(তৃতীয় পর্যায়)

ছায়ানায়িকা : ১৮ জুলাই, ১৯৬৭। চলেছিল ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৮ পর্যন্ত। নাট্যকার পার্থপ্রতিম চৌধুরী। পরিচালনায় যুগ্মভাবে পার্থপ্রতিম এবং সলিল সেন। আলো--তাপস সেন। নাটকটি একদমই চলেনি।

নহবত : ৯ মার্চ, ১৯৬৮। নাট্যকার সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরই পরিচালনায়

অভিনীত হয়। অভিনয়ে উল্লেখযোগ্য : সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, সরযূ দেবী, আরতি ভট্টাচার্য। এই নাটক অসামান্য সাফল্য লাভ করে এবং রঙমহলের আর্থিক সঙ্গতি ফিরিয়ে আনল।

সেমসাইড : ১২ ডিসেম্বর, ১৯৬৮। নাট্যকার শৈলেশ গুহ নিয়োগী ও প্রবোধবন্ধু অধিকারী। যুগ্মভাবে তাঁরাই পরিচালনা করেন।

আমি মন্ত্রী হব : ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯। চলেছিল ডিসেম্বর ১৯৭০ পর্যন্ত। নাট্যকার সুনীল চক্রবর্তী। পরিচালনা জহর রায়।

বাবা বদল : ১ জানুয়ারি, ১৯৭১। নাট্যকার মনোজ মিত্র। পরিচালনায় জহর রায়। মনোজ মিত্রের 'কেনারাম বেচারাম' নাটকের প্রভূত পরিবর্তিত রূপ। নাট্যকারকে না জানিয়েই করা হয়।

উত্তরণ : ১ মে, ১৯৭১। আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনীর নাট্যরূপ দেন বীরু মুখোপাধ্যায়। পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।

সুবর্ণ গোলক : ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২। বঙ্কিমের কাহিনীর নাট্যরূপ (ঃ সন্তোষ সেন)। পরিচালনা জহর রায়। নাচগানে ভরা এবং ব্যঙ্গকৌতুকের এই নাটক জমে গিয়েছিল।

তথাস্তু : ২৬ জানুয়ারি, ১৯৭৩। নাট্যকার সুশীল মুখোপাধ্যায়। পরিচালনা সলিল সেন।

আলিবাবা : ১৩ মে, ১৯৭৩। নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। রঙ্গরস ও নৃত্যগীতে ভরা পুরনো এই নাটক আবার জমে গেল রঙমহলে। অভিনয়ে ছিলেন-- কালী ব্যানার্জী (আলিবাবা), প্রভাত ঘোষ (আবদালা), জয়শ্রী সেন (মর্জিনা), মৃণাল মুখোপাধ্যায় (কাশিম), শম্ভু ভট্টাচার্য (দস্যু সর্দার) ছন্দা দেবী (সাকিনা), সরযূদেবী (ফতিমা)।

অনন্যা : ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩। চলেছিল ডিসেম্বর, ১৯৭৫ পর্যন্ত একটানা চলে। নাট্যকার কুণাল মুখোপাধ্যায়। এই নাটকে অভিনয়ের জন্য চলচ্চিত্র জগতের খ্যাতিমান অভিনেতা অসীমকুমার ও স্বরূপ দত্ত রঙমহলে যোগ দেন। নাটকটি পরিচালনা করেন জহর রায়।

চণ্ডীদাস বসুর সুরে ও কথায় গান গেয়েছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও বনশ্রী সেনগুপ্ত। এই নাটকে ক্যাবারে নৃত্যে মিস্ চন্দ্রকলা নেমেছিলেন। অন্যান্য অভিনয়ে ছিলেন--জয়শ্রী সেন, বীথি গাঙ্গুলি, জহর রায়, ঠাকুরদাস মিত্র, কামু মুখোপাধ্যায়, ধীমান চক্রবর্তী প্রমুখ।

'অনন্যা' নাটক থেকেই রঙমহলে ক্যাবারে নৃত্য চালু হয়। কলকাতার বিশ্বরূপা থিয়েটারে ১৯৭১-এ 'চৌরঙ্গী' নাটক অভিনয়ের সময়েই প্রথম রঙ্গমঞ্চে ক্যাবারে নর্তকী নামানো হয়। রাসবিহারী সরকারের মালিকানায় সাধারণ রঙ্গালয়ে ক্যাবারে নর্তকীদের নিয়ে এসে কুরুচিপূর্ণ ও উত্তেজক নৃত্য-গীতের ব্যবহার চালু হয়। নাটক নয়, ক্যাবারে

নর্তকীদের 'বস্ত্র বিপ্লব'-এর আকর্ষণেই তখন থিয়েটারে ভিড় বেড়ে চলেছিল। রঙমহলও এতোদিনের সুস্থ নাট্যাভিনয়ের ঐতিহ্য বিস্মৃত হয়ে ক্যাবারে নৃত্য চালু করে দিয়ে সস্তা প্রমোদ মাধ্যমে দর্শক আকর্ষণের চেষ্টা করে। এতেই বোঝা যায়, এই সময় থেকেই রঙমহলের অবস্থা খারাপ হতে থাকে। সমবায় প্রথার ভিত্তি দুর্বল হতে থাকে। জহর রায়, সরযূ দেবী নাট্য পরিচালনার পুরোদায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন। কুণাল মুখোপাধ্যায় এই সুযোগে রঙমহলে এসে সস্তা ও কুরুচিপূর্ণ নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে নিজের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে যান।

এবার 'অনন্যা'র পর নামানো হয় পুরনো নাটক 'ভোলাময়রা'।

ভোলাময়রা : ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৫। নাট্যকার ও পরিচালক—কুণাল মুখোপাধ্যায়। ভোলা ময়রার ভূমিকায় অভিনয় করেন পুরনো দিনের প্রখ্যাত গায়ক অভিনেতা তারা ভট্টাচার্য।

নুরজাহান : ১৪ এপ্রিল, ১৯৭৬। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকটির নাম দেওয়া হলো 'সম্রাজ্ঞী নূরজাহান'। পুরনো নাটকটির সম্পাদনা করেন শেখর চট্টোপাধ্যায়। পরিচালনা অনুপকুমার। সত্তরের দশক তখন রাজনৈতিক ভাবে উত্তাল। ইন্দিরা গান্ধী সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করে দেশব্যাপী জরুরী অবস্থা জারি করেছেন। সন্ত্রাস, রাজনৈতিক হানাহানি এবং একনায়কতন্ত্রের নখদন্ত বিস্তারের প্রেক্ষাপটে নুরজাহান নাটকের ঘটনা ও নুরজাহান চরিত্রটিকে স্থাপন করা হয়েছে। পুরনো নাটকের ঘটনা আধুনিক কালে নতুন ডাইমেনশান পেয়ে গেল। শেখর চট্টোপাধ্যায় ও অনুপকুমারের প্রচেষ্টায় রঙমহলে নাটকটি অভিনীত হয়েছিল।

নন্দা : ২৩ মে, ১৯৭৬। চলেছিল জানুয়ারি, ১৯৭৭ পর্যন্ত। আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে নাট্যরূপ দেন প্রভাত হাজরা। পরিচালনা জহর রায়।

অপরিচিত : ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭। কাহিনী সমরেশ বসু। নাট্যরূপ শঙ্কর সিকদার ও সমীর লাহিড়ী। পরিচালনা জহর রায়। অভিনয়ে—দিলীপ রায় (সুজিত নাথ), জহর রায় (ভুজঙ্গ রায়), সরযূ দেবী (কিরণময়ী),লিলি চক্রবর্তী (সুনীতা)। এই নাটকেই প্রখ্যাত চরিত্রাভিনেতা ও কৌতুকশিল্পী জহর রায়ের শেষ অভিনয়। ১৯৭৭-এর ১ আগস্ট জহর রায়ের মৃত্যু হয়।

জহর রায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই রঙমহলের শিল্পী-কলাকুশলী-কর্মীদের সমবায় প্রথার অস্তিত্ব-ও শেষ হয়ে গেল।

১৯৭০-এর মাঝামাঝি সময় থেকেই রঙমহলের অবস্থা খারাপ হয়ে আসে। সমবায় প্রথা ভেঙে পড়ে, অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রী রঙমহল ছেড়ে চলে যায়। টাকা পয়সার হিসাব-পত্রও ঠিকভাবে রাখা হয়নি। জহর রায় যে সাংগঠনিক দায়িত্ব নিয়ে অজিত চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় রঙমহল চালাচ্ছিলেন, শেষের দিকে তা নানাকারণে বিঘ্নিত হয়। হতোদ্যম জহর রায় উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন, দায়িত্ব পালনেও অনীহা ও তিক্ততা সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক পালাবদল ও উত্তেজনায় পূর্ণ সত্তর দশকের উত্তাল সময়ে

থিয়েটারের ওপরও আক্রমণ নেমে আসে। আক্রান্ত হন জহর রায়, স্বরূপ দত্ত প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ।

এবারে রঙমহলের কর্মাধ্যক্ষ হলেন শান্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও অজয় ভদ্র। জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, সরযূদেবীর উদ্যমে রঙমহলের যে সাফল্যের যুগ শুরু হয়েছিল, এবারে তা শেষ হলো।

ছদ্মবেশী : অক্টোবর, ১৯৭৭। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের নাট্যরূপ। পরিচালনা রবি ঘোষ। অভিনয়ে—রবি ঘোষ, সন্তোষ দত্ত, সন্তু মুখোপাধ্যায়, উজ্জ্বল সেনগুপ্ত, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, অলকা গাঙ্গুলি। আলো কণিষ্ক সেন। অগোছালো এই নাট্য প্রযোজনা বেশিদিন চলেনি।

রঙমহলের দুরবস্থার দিনে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৭৫-এর কিছুদিন রঙমহলে 'থানা থেকে আসছি' (নাট্যরূপ : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়) অভিনয় করেন। মঞ্চের প্রখ্যাত অভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্রও এই নাটকে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু এই নাটক জমেনি, চলেও নি তেমন।

দিলীপ রায়ের পরিচালনায় 'রাজদ্রোহী' অভিনীত হলো ১৯৭৮-য়ে। কাহিনী শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। নাট্যরূপ বীরু মুখোপাধ্যায়। অভিনয় করেছিলেন—দিলীপ রায়, লিলি চক্রবর্তী, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শিপ্রা মিত্র, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌর শী, সন্তু মুখোপাধ্যায়, গীতা কর্মকার, কল্যাণী মণ্ডল। এই নাটকে ফজল আলির চরিত্রে অভিনয় করেন বিজন ভট্টাচার্য।

আলো—তাপস সেন। মঞ্চ—সুরেশ দত্ত। সঙ্গীত রচনা ও সুর সংযোজনা—চণ্ডীদাস বসু। আবহ—পার্থপ্রতিম চৌধুরী। নৃত্য—শম্ভু ভট্টাচার্য। গ্রন্থনা—প্রদীপ ঘোষ। সহ-পরিচালনা—শ্যামল ঘোষ। এই নাটকে গান গেয়েছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্ত, শক্তি ঠাকুর। মঞ্চাধ্যক্ষ—মণি চট্টোপাধ্যায়।

'রাজদ্রোহী' খুব সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় হয় দীর্ঘ দিন। এরপরে নানাকারণে রঙমহল কয়েকমাস বন্ধ থাকে।

এই অব্যবস্থা ও দুরবস্থার দিনে 'পিউ কাঁহা' নামে এক নাটক নামানো হয়। ৩ মে, ১৯৭৯। কাহিনী সুবোধ ঘোষ। পরিচালনা মৃণাল ঘোষ। ১৯৮০-র ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত চলে।

কলকাতার অনেক থিয়েটারেই তখন 'এ' মার্কা নাটকের অভিনয় চলছিল, যেখানে নাটক বহির্ভূত অনেক দৃশ্য থাকত। বিশেষ করে ক্যাবারে নর্তকীদের দিয়ে দেহভঙ্গিমা-সর্বস্ব নৃত্যের ব্যবস্থা করা হতো। রঙমহলও সেই স্রোতে গা ভাসিয়ে 'পিউ কাঁহা' নাটকটি নামায়। নাটক হিসেবে অকিঞ্চিৎকর নিম্নমানের এই প্রযোজনায় দর্শকের ভিড় উপচে পড়তে থাকে। কারণ, মিস ববি, মিস জে নামে ক্যাবারে নর্তকীদের দেহসর্বস্ব স্বল্পবাস পরিহিত অশ্লীল নৃত্য। এতে রঙমহলের এতোদিনের সুনামের ঐতিহ্য বিঘ্নিত হয়।

এর বিরুদ্ধে উদ্যোগী হয়ে শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় নামানো হলো

'অমরকণ্টক' ১৯৮০-র ৪ এপ্রিল।

'পিউ কাঁহা'র আগে রঙমহলের দুরবস্থার দিনে কলকাতার গ্রুপ থিয়েটারগুলিকে এনে এখানে তাদের খ্যাতিপ্রাপ্ত নাটকগুলি অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৯৭৯-এর এপ্রিল মাসের ১৩ তারিখ থেকে ২২ তারিখ পর্যন্ত থিয়েটার কমিউন তাদের নাটক 'দানসাগর' (২টি অভিনয়), সুন্দরম-এর নাটক 'সাজানো বাগান' (১টি অভিনয়), থিয়েটার ওয়ার্কশপ-এর 'নরক গুলজার' (২টি অভিনয়), ঘটকালি (৪টি অভিনয়) করে। থিয়েটারে নতুন ধরনের নাটক উপস্থাপনার মাধ্যমে দর্শকদের রুচি ফেরাবার চেষ্টা তখনই শুরু হয়েছিল। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হওয়াতে 'পিউ কাঁহা' নামিয়ে তদানীন্তন থিয়েটারের রুচিবিকৃতির গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয়।

'অমরকণ্টক' তারই প্রতিবাদ। পরিচালনা--শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে সহযোগী হয়ে অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় এগিয়ে আসেন। এই নাটকটি প্রথমে ৫০০ রজনী অভিনীত হয়েছিল নেতাজী ইনস্টিটিউটে (পূর্বের ক্রেম ব্রাউন মঞ্চ), তারপর থেকে রঙমহলে ধারাবাহিক অভিনীত হতে থাকে। এখানে সবশুদ্ধ ৬০০ রজনী অভিনীত হয়েছিল।

এবার কিন্তু ক্যাবারে নৃত্য বা 'এ' মার্কা থিয়েটার থেকে সরে এসে সুস্থ নাট্যাভিনয়ের চেষ্টা চালানো হয় এবং অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। ছ'শো রাত্রি অভিনয়ই তার প্রমাণ।

'অমরকণ্টক'-এর মূল কাহিনী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ঐ নামের উপন্যাস। নাট্যরূপ দেন কুণাল মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা তাদের এই প্রয়াসকে সাধুবাদ জানায়। শতরজনীর স্মারক পুস্তিকায় (২৪-৬-১৯৮০) পরিচালক শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় জানান :

> 'গত কয়েকবছর ধরে দেখা যাচ্ছে কিছু লোক পেশাদার রঙ্গমঞ্চে বিকৃত ক্ষুধার রসদ জুগিয়ে নাটক করে কিছু রোজগার করেছেন ও করছেন। যে কোনও প্রকারে কিছু প্রাপ্তিই তাঁদের উদ্দেশ্য। তাঁদের বক্তব্য দর্শক নিচ্ছে এবং উপভোগও করছে। আমি মনে করি বাংলাদেশের দর্শক সত্যিকারের নাটক ও মনে রাখার মতো অভিনয় দেখতে ভালোবাসেন এবং চান। 'অমর কণ্টক' মঞ্চস্থ করে জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থনে আমাদের বিশ্বাস আবার প্রমাণিত হল।' [পরিচালকের বক্তব্য]

এর মধ্যে অনুপকুমারের পরিচালনায় 'হঠাৎ নবাব' নাটকটি এখানে কয়েকরাত্রি অভিনীত হয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই বিখ্যাত প্রহসনটি প্রথম অভিনয় হয় ২৪ মে, ১৯৮০।

জয় মা কালী বোর্ডিং নাটকটি সুধাংশুকুমার মিত্রের প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হলো। প্রথম অভিনয় ১০ অক্টোবর, ১৯৮২। মঞ্চ ও চিত্র জগতের খ্যাতিমান চরিত্রাভিনেতা এবং কৌতুক শিল্পী ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় নাটকটি পরিচালনা করেন। আলো তাপস সেন। মঞ্চ--সুরেশ দত্ত।। অভিনয়ে--ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, মনু মুখোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়,

উজ্জ্বল সেনগুপ্ত, ধীমান চক্রবর্তী প্রমুখ। নাটকটি মোট তিনমাসে ৭৪ বার অভিনীত হয়। শেষ অভিনয় ১৯৮৩-র ৩০ জানুয়ারি।

এরপরে মার্চ-এপ্রিল রঙমহল বন্ধ থাকে। তারপরে অভিনীত হয় 'বিবর'। সমরেশ বসুর বহু বিতর্কিত উপন্যাসের নাট্যরূপ দিলেন সমর মুখোপাধ্যায়। তাঁর আরেকটি উপন্যাস 'অশ্লীল'-এর নাট্যরূপ দিলেন তরুণকুমার। প্রথমটি সমর মুখোপাধ্যায় এবং দ্বিতীয়টি কুণাল মুখার্জীর পরিচালনায় অভিনীত হয়। নাটক দুটিতে অভিনয় করেন প্রশান্তকুমার, গৌরীশঙ্কর ব্যানার্জী, মিন্টু চক্রবর্তী, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, সীমন্তিনী দাস প্রমুখ। দুটি নাটক 'এ'-মার্কা হয়ে প্রচারিত হতো। 'বিবর' তেমন না চললেও, অশ্লীল চলেছিল টানা ৫০০ রাত্রি।

১৯৮৭ থেকে রঙমহল সংস্কারের জন্য বন্ধ থাকে। ১৯৮৭-র ২৭ জুন থেকে 'স্বীকারোক্তি' অভিনয় শুরু হয়। দেবনারায়ণ গুপ্ত তখন রঙমহলের সর্বাধ্যক্ষ। পরিচালনায় সুভাষ বসু। এই নাটকটি এখানে ২০০ রজনীর মতো অভিনয় হয়েছে। অভিনয়ে--অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, চিরঞ্জিৎ, ধীমান চক্রবর্তী, সুমন্ত মুখোপাধ্যায়, জয় সেনগুপ্ত, সঙ্ঘমিত্রা ব্যানার্জী, রমা গুহ প্রমুখ।

১৯৮৮-তে প্রযোজিত হলো 'নীলকণ্ঠ'। নাট্যরচনা, নির্দেশনা ও সঙ্গীত পরিচালনায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। আলো--তাপস সেন। মঞ্চ--নির্মল গুহরায়। এই নাটকটি প্রযোজনা করেন শুক্লা সেনগুপ্ত। অভিনয়ে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল ঘোষ, সুমন্ত মুখোপাধ্যায়, সায়নী মিত্র, দেবিকা মিত্র।

সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রচলিত নাটকের তুলনায় 'নীলকণ্ঠ' ভিন্ন ধরনের নাটক। বিষয়ভাবনা, উপস্থাপনা এবং বক্তব্যে এই নাটক নতুন যুগের নতুন চিন্তার দোসর। টানা ৩০০-এরও বেশি বার অভিনীত হয়েছিল। বেশ কিছু পরিমাণে দর্শক যে এই নাটককে গ্রহণ করেছিল, এটাই তার প্রমাণ। আনন্দবাজার পত্রিকা লিখেছিল :

> 'কলকাতার পেশাদার মঞ্চের ক্ষেত্রে একদা 'কল্লোল' যেমন বিষয়ে এবং আঙ্গিকে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিল, ঠিক তেমনই কিছুকাল আগে বাংলা পেশাদার মঞ্চ যখন সাফল্যের হাতিয়ার হিসেবে কিছু সস্তা উপাদান নিয়ে মত্ত তখন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের 'নামজীবন' ছিল পেশাদার মঞ্চের নতুন করে উত্তরণের সার্থক ইঙ্গিত। 'ফেরা'র পর 'নীলকণ্ঠ' নিঃসন্দেহে সেই সার্থকতার আরেকটি স্মারক চিহ্ন।' [১১-১১-১৯৮৮]

মনে রাখতে হবে এর আগে সৌমিত্র কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে 'নামজীবন' এবং বিশ্বরূপায় 'ফেরা' দুটি ভিন্ন ধরনের নাটক অভিনয় করেছিলেন। প্রযোজিকা শুক্লা সেনগুপ্তের প্রচেষ্টা এবং সৌমিত্রের উদ্যোগে রঙমহলে 'নীলকণ্ঠ' অভিনয় নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। তিনটি পেশাদার মঞ্চেই সৌমিত্রের ভিন্ন ধরনের এই নাটকগুলি জনসম্বর্ধনা লাভ করেছিল।

'পরমা' অভিনীত হলো ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯। পরিচালনা সুভাষ বসু। মুখ্য চরিত্রে

বসন্ত চৌধুরী ও পাপিয়া অধিকারী। তারপরেই নামানো হয় 'জীবনসঙ্গিনী' (১২.৭.৯০) অঞ্জনা এন্টারপ্রাইজের প্রযোজনায়। পরিচালনা করেন শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়। সিরিও-কমিক এই নাটকটি ভালোই চলেছিল। দাদা ও বৌদি চরিত্রে অভিনয় করেন শুভেন্দু ও সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়। নায়ক-নায়িকা চরিত্রে গৌতম দে ও নয়না দাস। এছাড়া জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় রায়, কল্যাণী মণ্ডল অভিনয় করেন। উল্লেখযোগ্য এই নাটকে একাধারে রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং পপ সঙ্গীত ব্যবহার করা হয়েছিল। রবীন্দ্রসঙ্গীত দুটি গেয়েছিলেন অরুন্ধতী হোম চৌধুরী এবং পপ সঙ্গীতে গোপা ঘোষ।

রাধাগোবিন্দ এন্টারপ্রাইজ এবার রঙমহলে প্রযোজনায় এসে অভিনয় করল 'গৌরব' নাটক। প্রথম অভিনয় ১৪ এপ্রিল, ১৯৯৩। নাটক ও নির্দেশনা--অসিত বসু। এই নাটকে সিনেমার জনপ্রিয় নায়ক প্রসেনজিৎ অভিনয়ে অংশ নেন। ঐকতান নিবেদিত 'গৌরব' নাটক পুরোপুরি ব্যর্থ হয় সবদিক দিয়ে।

তারপরে ডি. মুখার্জি প্রযোজিত ঐকতান নিবেদিত নাটক 'মাণিকচাঁদ'। নাটক উৎপল রায়। ১৯৯৪-এর এই নাটকটি পরিচালনা করেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়। চলচ্চিত্রের খ্যাতিমান অভিনেতা তাপস পাল এই নাটকে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন, মুল মাণিকচাঁদ চরিত্রে। অন্য চরিত্রগুলিতে ছিলেন--দিলীপ রায় (ট্রাক ডাইভ্রার দর্শন সিং), জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় (ভাড়াটে সাতকড়ি), লিলি চক্রবর্তী (ফুলবসন), রাজশ্রী (মাণিকচাঁদের প্রেমিকা মাধুরী)। নাটকটি তাপস পাল, দিলীপ রায় এবং জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

এবারে নামানো হলো 'আলোয় ফেরা'। কাহিনী দুলেন্দ্র ভৌমিক। নাট্যরূপ ও পরিচালনা দেবসিংহ। অভিনয়ে তাপস পাল ও শ্রীলা মজুমদার থাকলেও হাল্কা নাচগান ও হাস্যরসে ভরা এই নাটক তেমন মঞ্চসফল হয় নি।

আর্থিক টানাটানিতে এরপরে রঙমহল বন্ধ হয়ে যায়। মাঝে বেশ কিছু বছর নানাজনকে ভাড়া দিয়ে নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেইভাবেই চলছিল। এবারে পুরোপুরিই বন্ধ করে দেওয়া হলো।

অনেক দিন বাদে আবার রঙমহল খুলল। এবারে ইউনিফোকাসের তরফ থেকে রত্না ঘোষাল ও সুশীল দাস 'জয় জগন্নাথ' নাটকটি নামান। দুলেন্দ্র ভৌমিকের 'জগন্নাথ কাহিনী' গ্রন্থ থেকে এর নাট্যরূপটি তৈরি হয়। নাট্য পরিচালনা এবং অভিনয়ে ছিলেন রত্না ঘোষাল। অন্যান্য চরিত্রে--জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, কল্যাণী মণ্ডল, নিমু ভৌমিক, বোধিসত্ত্ব মজুমদার, দেবাশিস রায়চৌধুরী প্রমুখ। ১৯৯৭-এর জুলাই মাসে অভিনয় শুরু হয় । কিন্তু কিছুদিন অভিনয়ের পর ১৯ নভেম্বর এর অভিনয় বন্ধ হয়। সেই সঙ্গে রঙমহলও বন্ধ হয়ে যায়। এইভাবে পড়ে থাকার পর রঙমহল থিয়েটার হলটি বিয়ে বাড়ির জন্য ভাড়া দেওয়া শুরু হয় ১৯৯৯ থেকে। কোনো অভিনয় আর হয়নি।

অবশেষে ২৮ আগস্ট, মঙ্গলবার, ২০০১ খ্রিষ্টাব্দের মাঝরাতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে রঙ্গালয়টি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ['শেষরাতে আগুন, ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত রঙমহল'

শীর্ষক সংবাদ। আনন্দবাজার, ২৯-৮-২০০১]

দীর্ঘ ঐতিহ্য লালিত রঙমহল থিয়েটারের ইতিহাস এখানেই শেষ। পুনর্নির্মাণ ও পুনরভিনয়ের কোনো খবর আজ অবধি (২৫ ডিসেম্বর, ২০০২) নেই।

বাংলা থিয়েটারের রঙমহলের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি হলো

এক. টানা প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরে একটানা একাদিক্রমে রঙমহল থিয়েটারে নাট্যাভিনয় চলেছিল। যে কোনো থিয়েটারের পক্ষেই এটি শ্লাঘার বিষয়।

দুই. এই থিয়েটারে উচ্চস্তরের ভাবের ও রসের নানা নাটকের অভিনয় বাংলা থিয়েটারের নাট্যাভিনয়ের মর্যাদাকে বিস্তৃত করেছিল। যেমন মহানিশা, বাংলার মেয়ে, চরিত্রহীন, সন্তান, তটিনীর বিচার, স্বামীস্ত্রী, দেবদাস, বাংলার প্রতাপ, চিরকুমার সভা, আদর্শ হিন্দু হোটেল, উল্কা, দুইপুরুষ, কবি, সাহেব বিবি গোলাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

তিন. রঙমহল থিয়েটারেই ভারতের মধ্যে সর্বপ্রথম 'রিভলভিং স্টেজ' ব্যবহার করা হয়। পরে অন্য অনেক থিয়েটার এই ঘূর্ণায়মান মঞ্চ তৈরি করে।

চার. এখানে অপরাধমূলক ও রোমাঞ্চকর নাটক অভিনীত হয়ে বাংলা থিয়েটারের বিষয়ের সীমা বাড়িয়ে দিয়েছে।

পাঁচ. উল্কা নাটকের অসাধারণ সাফল্যের কারণে এই থিয়েটারেই একটি নাটকের একটানা পাঁচশো রাত্রির অধিক অভিনয়ের নজির সৃষ্টি হলো। এর আগে স্টারে 'শ্যামলী' এর কাছাকাছি সাফল্য দেখিয়েছিল।

ছয়. এই থিয়েটারেই প্রথম শিল্পী-কলাকুশলী ও কর্মীদের সমবায় প্রথা চালু হয়। সমবায় প্রথায় শিল্পী কর্মীদের থিয়েটার পরিচালনার এই প্রয়াস ভারতে সর্বপ্রথম রঙমহলেই শুরু হলো।

সাত. উচ্চভাবের নাটকের অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে এখানে অপরাধমূলক, রোমাঞ্চকর নাটকের যেমন অভিনয় হয়েছে, তেমনি কৌতুকরসাত্মক প্রচুর নাটকের অভিনয় বাংলা থিয়েটারে হাস্যরসের মরাগাঙে জোয়ার এনে দিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে জহর রায় ও অজিত চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগ স্মরণযোগ্য।

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এবং কৌতুক-রসের মধ্য দিয়ে নাট্য-পরিচালক ও অভিনেতা জহর রায় ১৯৭০-এর দশকের রাজনৈতিক বিপর্যয়কে কিছু অংশে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। তার মাশুলও তাঁকে দিতে হয়েছিল। কংগ্রেসি রাজনৈতিক দলের কর্মীদের আক্রমণে রঙমহলে নাট্যাভিনয় বন্ধ করে দিতে হয়েছে। আবার অভিনেতা ও পরিচালকের ওপর হুমকি ও নির্যাতনও সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু তাতেও তারা দমিত না হয়ে নাটকের অভিনয় চালিয়ে গিয়ে জনসম্বর্ধনা লাভ করেছেন।

আট. এই মঞ্চেই অভিনেতা-অভিনেত্রী হিসেবে সে যুগের সেরা সম্মেলন ঘটেছিল।

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়. অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, ধীরাজ ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, মিহির ভট্টাচার্য, ছবি বিশ্বাস, জহর রায়, তরুণ রায় এখানে দীর্ঘদিন অভিনয় করেন। অভিনেত্রীদের মধ্যে শান্তি গুপ্তা, রানীবালা, শেফালিকা, সরযূবালা, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় উল্লেখযোগ্য।

নয়. নাট্যকার হিসেবে রঙমহলে যুক্ত ছিলেন তারাশঙ্কর, বিধায়ক ভট্টাচার্য, শচীন সেনগুপ্ত, তরুণ রায়, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, দেবনারায়ণ গুপ্ত, সলিল সেন প্রমুখ প্রখ্যাত নাট্যকারেরা।

দশ. নাট্যপরিচালক হিসেবে সেকালের সেরা ব্যক্তিত্ববৃন্দ এখানে কাজ করে গেছেন। নরেশ মিত্র, অহীন্দ্র চৌধুরী, দেবনারায়ণ গুপ্ত, মহেন্দ্র গুপ্ত, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, জহর রায়, তরুণ রায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম করা যায়।

এগারো. এখানে অনেক নাট্যকারের মৌলিক নাটক যেমন অভিনীত হয়েছে, তেমনি অনেক ভালো উপন্যাসের নাট্যরূপও অভিনীত হয়েছে। যেমন দেবদাস, চরিত্রহীন, নিষ্কৃতি, মহানিশা, আনন্দমঠ (সন্তান), শেষলগ্ন, কবি, দুইপুরুষ, সাহেব বিবি গোলাম, উল্কা উল্লেখযোগ্য।

বারো. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু থেকে যে বিপর্যয় বাংলায় দেখা দেয়, তা ক্রমশ সমগ্র চল্লিশের দশক জুড়ে নানা ঘটনায় বাংলার জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। রঙমহল এই সময়ে অভিনয় চালিয়ে গেছে। যুদ্ধ, আগস্ট আন্দোলন, পঞ্চাশের মন্বন্তর, কালোবাজারি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা, স্বাধীনতা প্রভৃতি--নানা ঘটনারাজির মধ্যে চল্লিশের দশক উত্তাল হয়ে ছিল। এই সময়েই গণনাট্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নাটক জনজীবন-সমস্যার মুখোমুখি হতে পেরেছিল। কিন্তু কখনোই রঙমহল থিয়েটার জনজীবন সমস্যার মুখোমুখি হওয়া তো দূরের কথা, কোনো অংশেই তার প্রকাশ নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে ঘটাতে পারেনি।

তেরো. ঐতিহ্যপূর্ণ দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের থিয়েটার রঙমহল যেমন নানা উচ্চমান ও ভাবের এবং বিচিত্র বিষয়ের নাটক অভিনয় করেছে, তেমনি আবার ঐতিহ্যবিচ্যুত হয়ে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সস্তারুচি, কুরুচিপূর্ণ নৃত্য গীত ও অশ্লীল ভাবভঙ্গির আমদানি থিয়েটারে করেছিল। দীর্ঘ উন্নত ঐতিহ্যের মধ্যে এই ক্ষুদ্রতা রঙমহলের কৃতিত্বকে কিছু অংশ ম্লান করে দিয়েছে।

চোদ্দ. তাহলেও, দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর একাদিক্রমে নানা ভাব, বিষয় ও ভাবনার নানান নাট্যাভিনয় করে, বহু নাট্যকার, অভিনেতা-অভিনেত্রীর সমাহার ঘটিয়ে, বিভিন্ন খ্যাতিমান নাট্যপরিচালকের সাহায্য নিয়ে যে নাট্যসম্ভার বাঙালিকে উপহার দিয়েছে, তার জন্য রঙমহল বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে অবশ্যই স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বিশ্বরূপা

২ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিট, কলকাতা

প্রতিষ্ঠা : ৭ জুন, ১৯৫৬
প্রতিষ্ঠাতা : সরকার ব্রাদার্সের তরফে
রাসবিহারী সরকার
প্রথম নাটক : আরোগ্য নিকেতন (তারাশঙ্কর)

স্থায়িত্বকাল : ৭ জুন, ১৯৫৬—
১৪ নভেম্বর, ২০০১

প্রবোধচন্দ্র গুহ প্রতিষ্ঠা করেন নাট্যনিকেতন (১৬ মার্চ, ১৯৩১)। চলে ১৯৪১-এর অক্টোবর পর্যন্ত। এবারে দায়িত্ব নেন শিশিরকুমার ভাদুড়ি। তিনি নাট্যনিকেতনের নাম পালটে রাখেন শ্রীরঙ্গম। শিশিরকুমারের পরিচালনায় শ্রীরঙ্গম খ্যাতির তুঙ্গে ওঠে। ১৯৫৬-এর ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত অভিনয় চালিয়ে তাঁকে থিয়েটার বাড়ির দখল ছেড়ে দিতে হয়। আদালতের মাধ্যমে থিয়েটার বাড়ির দায়িত্ব পেলেন মেসার্স সরকার ব্রাদার্স অ্যান্ড প্রপার্টিস (প্রাইভেট) লিমিটেড (২৮-১-৫৬)। নাট্য আগ্রহী নটবর সরকারের কনিষ্ঠপুত্র রাসবিহারী সরকার কোম্পানীর তরফে উদ্যোগী হয়ে নাট্যমঞ্চ চালাবার দায়িত্ব নিলেন। সরকার ব্রাদার্সের অন্যান্য ব্যবসাও ছিল। পুরনো এই থিয়েটার বাড়িকে সরকার ব্রাদার্স নতুন করে গড়ে তোলেন। নানাভাবে সংস্কার করে শ্রীরঙ্গমের ভোল পালটে দেন। নতুন নামকরণ করা হলো বিশ্বরূপা। প্রথম নাটক অভিনীত হলো তারাশঙ্করের সদ্যপ্রকাশিত জনপ্রিয় উপন্যাস আরোগ্য নিকেতন-এর নাট্যরূপের, একই নামে। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৭ জুন।

নতুন কর্তৃপক্ষ শিশিরকুমারের 'শ্রীরঙ্গম' নাম বদল না করে ঐ নামই রেখে দিতে চেয়েছিলেন। এবং শিশিরকুমারকে সসম্মানে এই মঞ্চে যোগদানের আমন্ত্রণও জানিয়েছিলেন কর্তৃপক্ষ। কিন্তু আদালত কর্তৃক দেউলিয়া হিসেবে ঘোষিত সর্বরিক্ত অভিমানী শিশিরকুমার দুটো প্রস্তাবের কোনোটাতেই রাজি হন নি। নিজের দেওয়া নাম 'শ্রীরঙ্গম' তিনি অন্য কাউকে দিতে রাজি হন নি। আর নতুন করে কারো 'গোলামি' (তাঁর ভাষায় 'ভাড়াটে কেষ্ট') করতেও তিনি সম্মত হন নি।

বিশ্বরূপার তরফ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলনে (৪ এপ্রিল ১৯৫৬) থিয়েটারের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঘোষণা করা হলো :

১. এই রঙ্গালয়কে ভারতের সর্ববৃহৎ আধুনিক নাট্যশালা করে গড়ে তোলা হবে।

২. মা-বাবার সঙ্গে থিয়েটারে আসা শিশুদের 'ক্রেশ' তৈরি করা হবে। সেখানে শিশুরা থাকবে, তাদের দেখাশোনার লোক থাকবে এবং শিশুদের খাদ্যেরও ব্যবস্থা করা হবে।

৩. ১৫০টি মতো সাইকেল রাখার ব্যবস্থা থাকবে।

৪. রঙ্গালয়ের মোট আসন ৯১২টি। নিচে ৬৬২টি এবং ওপরে ২৫০টি বসার আসন থাকবে।

৫. থিয়েটার হলের সামনে ফুলের বাগান করা হবে এবং সেই বাগানের ফুল দিয়ে বাংলা নাট্যশালার পূর্ববর্তী ব্যক্তিত্বদের জন্য তৈরি বেদিতে অর্ঘ্য নিবেদন করা হবে।

৬. ভেতরে 'সিট' দেখাবার জন্য মেয়েদের ('আসার') নিযুক্ত করা হবে।

প্রথম নাট্যাভিনয় ৭ জুন শুরু হয়ে গেলেও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হলো ২২ জুলাই (১৯৫৬)। উদ্বোধন করেন অহীন্দ্র চৌধুরী। প্রধান অতিথি—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। সেদিন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ও বিদ্বজ্জনের উপস্থিতিতে বিশ্বরূপা মঞ্চের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

১৯৫৬-এর ৭ জুন 'আরোগ্য নিকেতন' নাটক দিয়ে বিশ্বরূপার নাট্যাভিনয় শুরু হয়েছিলো। নিজের উপন্যাসের নাট্যরূপ দিলেন তারাশঙ্কর। কিন্তু অভিনয়ের প্রয়োজনে এই নাট্যরূপের নানা পরিবর্তনসাধন করা হয়। নাটকটির ভূমিকায় তারাশঙ্কর সেই পরিবর্তন এবং তাঁর ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন। পরিচালনার দায়িত্বে রইলেন আরেক খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। গ্রুপ থিয়েটারের প্রখ্যাত আলোকশিল্পী তাপস সেনকে দিয়ে আলোক সম্পাতের কাজ করানো হলো। তাপস সেন-ও এই প্রথম পেশাদারি মঞ্চে যোগ দিলেন। সঙ্গীত কমল দাশগুপ্ত। নৃত্য-অনাদিপ্রসাদ। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করলেন সেই সময়ের থিয়েটার ও চলচ্চিত্রের খ্যাতিমান অভিনেতা-অভিনেত্রীবৃন্দ :

বসন্ত চৌধুরী (প্রদ্যোত)। নীতিশ মুখোপাধ্যায় (জীবনমশাই)। কালী বন্দ্যোপাধ্যায় (শশী কম্পাউন্ডার)। সন্তোষ সিংহ (ভুবন রায়)। নবদ্বীপ হালদার (দাতু ঘোষাল)। বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় (কিশোর)। জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায় (সেতাব)। অজিত গঙ্গোপাধ্যায় (চারু ডাক্তার)। মণি শ্রীমানী (ইন্দিবর)।

তপতী ঘোষ (মঞ্জু)। শান্তি গুপ্তা (আতর বৌ)। কমলা ঝরিয়া (মতি বৈষ্ণবী)। পূর্ণিমা দেবী (অভয়া)। মেনকা দেবী (শুভ্রা)। চিত্রা মণ্ডল (সুধা)।

আরোগ্যনিকেতন-এর অভিনয় এবং বিশ্বরূপা থিয়েটারকে নিয়ে কিছু বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য সেই সময়ে কোনো কোনো সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিল। যেমন—'নাট্যশালার নাম বিশ্বরূপা আর নাটকের নাম 'আরোগ্য নিকেতন'। নাট্যশালার এখানে-ওখানে নার্সরূপিনী সেবিকার ছোটাছুটি আর নাটকের মধ্যে ব্রহ্মলোক, প্রেতলোক, মর্ত্যলোক অর্থাৎ বিশ্বরূপের ছড়াছড়ি। আমার যেন মনে হল, 'আরোগ্য নিকেতনে' এসে 'বিশ্বরূপা' দেখে গেলাম।

আগের শিশিরকুমারের শ্রীরঙ্গম-এর সঙ্গেও কেউ কেউ তুলনা করে লিখলেন—

'পূর্বতন শ্রীরঙ্গমের সঙ্গে বর্তমান বিশ্বরূপার আকাশ পাতাল তফাৎ আশা করলে

হতাশ হতে হবে। অভিনয় ও প্রযোজনার কথা বাদই দিলাম। পুরাতন শ্রীরঙ্গমের গায়ে চুনকাম করা এবং সিট পাল্টানো ছাড়া তেমন কিছু পরিবর্তন হয়নি।'

এতোসব বিরূপ মন্তব্য সত্ত্বেও নতুন প্রতিষ্ঠিত বিশ্বরূপা তার প্রথম নাট্যপ্রযোজনার মধ্য দিয়েই জনমনে স্বীকৃতি লাভ করল। জনসমর্থন লাভ করে 'আরোগ্য নিকেতন' দীর্ঘদিন অভিনীত হলো এখানে।

দ্বিতীয় নাটক 'ক্ষুধা'। প্রথম অভিনয় : ২১ এপ্রিল, ১৯৫৭ (৭ বৈশাখ, ১৩৬৪)। নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য। পরিচালনায়—নরেশচন্দ্র মিত্র। সহ-পরিচালক—কানু বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীত—নচিকেতা ঘোষ। আলো—তাপস সেন।

বিজ্ঞাপন দেওয়া হলো : 'জাতির ও জীবনের নাটক ক্ষুধা।' বেকার তিন যুবক (সদা গজা রমা)-এর নানা লাঞ্ছনা ও দুর্গতির মধ্য দিয়ে জীবনসংগ্রাম এবং বেঁচে থাকার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টাই এই নাটকের বিষয়বস্তু। বেকার জীবনের মর্মন্তুদ একটি বিষয়কে অনাবিল হাস্য এবং বেদনাবিধুর কারুণ্যের মিশ্রণে প্রকাশ করা হয়। সংবাদপত্রে লেখা হয়েছিল : 'বিশ্বরূপার নতুন নাটক 'ক্ষুধা' শুধু আক্ষরিক অর্থে নয়, ভাবের দিক দিয়েও নাটকটি নতুন। জমিদার আর তার নায়েব-গোমস্তাসহ সামন্ততন্ত্রী যুগকে অতীতের নিস্তরঙ্গ শান্তির মধ্যে রেখে নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য ও পরিচালক নরেশ মিত্র দর্শকদের সম্মুখে যে যুগ আর যে সমস্যাকে উপস্থিত করেছেন, তা একান্তই আধুনিক। ভঙ্গ বঙ্গদেশের প্রধান সমস্যা ক্ষুধা, তারই তরঙ্গ রঙ্গমঞ্চে এ নাটকের মাধ্যমে এসে লেগেছে ; অন্তত এই একটি কারণেই নাট্যরসিকেরা ক্ষুধাকে গ্রহণ করবেন।'

প্রয়োগনৈপুণ্য এবং দলগত অভিনয়—নাটকটিকে অসামান্য জনপ্রিয় করে তোলে। একটানা ৫৭৩ রাত্রি অভিনয় চলে। শেষ অভিনয় হয় ৩০ আগস্ট, ১৯৫৯। বিশ্বরূপার ক্ষুধা বাংলা মঞ্চাভিনয়ের এতোদিনকার সব রেকর্ড ভেঙে দিল। এর আগে স্টারে শ্যামলী (৪৮৪ রাত্রি), রঙমহলে উল্কা (৫০৭ রাত্রি) টানা অভিনয়ের যে ধারা তৈরি করেছিল, বিশ্বরূপার ক্ষুধা টানা ৫৭৩ রাত্রি অভিনয়ের মাধ্যমে তা ভেঙে দেয়।

অভিনয়ে ছিলেন :

বসন্ত চৌধুরী (রমা)। কালী বন্দ্যোপাধ্যায় (গজা)। তরুণকুমার (সদা)। এছাড়া নরেশ মিত্র, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ, নবদ্বীপ হালদার, মণি শ্রীমাণি, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শান্তি গুপ্তা, তপতী ঘোষ, জয়শ্রী সেন, সুব্রতা সেন, আরতি দাস প্রমুখ সেযুগের সিনেমা ও থিয়েটারের খ্যাতিমান অভিনেতা-অভিনেত্রীবৃন্দ। পরের দিকে বসন্ত চৌধুরীর পরিবর্তে অসিতবরণ রমা চরিত্রে অভিনয় করেন।

শিল্পীদের অসামান্য অভিনয় নাটকটিকে আকর্ষণীয় করে তোলে। নিখুঁত অভিনয়ের এমন টিমওয়ার্ক বিরল। উন্নতমানের অভিনয়ের এক সামগ্রিক প্রাণপ্রাচুর্য স্থানে স্থানে নাটককে কোন সার্থকতার পর্যায়ে তুলে নিয়ে যেতে পারে, শিল্পীরা তার স্বতঃস্ফূর্ত নজির দেখিয়েছেন এই নাটকে।

আলোকসম্পাতে তাপস সেনের কুশলী ব্যবহার ক্ষুধা নাটকটিকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলেছিল।

এই সময়ে বিশ্বরূপা থিয়েটার, বিশেষ করে কর্ণধার রাসবিহারী সরকারের উদ্যোগে, কয়েকটি কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বাংলা নাটক ও নাট্যশালার সার্বিক উন্নতির প্রচেষ্টায় এই কার্যক্রমগুলি সে সময়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কোনো থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ এর আগে বাংলা থিয়েটারের উন্নতিকল্পে এই ধরনের কোনো পরিকল্পনা কখনো গ্রহণ করেনি। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনার কার্যক্রম হলো :

১. নাট্যউন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ গঠন।
২. নাট্য সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা।
৩. পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক নাটকের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নাট্য উন্নয়ন। নাম দেওয়া হল গিরিশ নাট্যপ্রতিযোগিতা।
৪. রবীন্দ্র নাট্য প্রতিযোগিতা।
৫. গিরিশ নাট্য উৎসব।
৬. বার্ষিক বঙ্গনাট্য সাহিত্য সম্মেলন
৭. নাট্যবিষয়ক আলোচনা এবং বিতর্কসভা
৮. শিশু নাট্যশাখা গড়ে তুলে সেখানে নাচগান নাটকের আয়োজন করা।

এইভাবে নানা দিক দিয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করে সেদিন বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চ বাংলা থিয়েটারে নাটক, নাট্যাভিনয়, নাট্যরচনা ও নাট্যসমালোচনার নানাদিকের উন্নতিসাধন করার চেষ্টা করেছিলেন।

১৯৬২ থেকে বিশ্বরূপা কর্তৃপক্ষ তাদের নাট্যউন্নয়ন পর্ষদের তরফে বাংলা যাত্রাকে পরিপুষ্ট করার চেষ্টা করেন। এখানে ব্যাপকতরভাবে যাত্রা উৎসব পালন করা হয়, যা ১৯৬১-তেই শোভাবাজার রাজবাড়িতে নিখিলবঙ্গ যাত্রা উৎসব রূপে চালু হয়েছিল। বিশ্বরূপায় নিয়মিতভাবে কলকাতার যাত্রাভিনয়ের আয়োজন হতে থাকে। দেখাদেখি, কলকাতার অন্য মঞ্চগুলিতেও এরপর থেকে যাত্রাভিনয় হতে থাকে।

এগুলি তো ছিলই। ছাড় নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘে 'গিরিশ থিয়েটার' নামে নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রতি রবিবার সকালে 'গিরিশ থিয়েটার'-এর নামে নাট্যানুষ্ঠান হতো। প্রথমেই সলিল সেনের 'ডাউন ট্রেন' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়, ৩১ জুলাই, ১৯৬০-এর সকাল সাড়ে দশটায়। নাটকটি পরিচালনা করেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। উল্লেখযোগ্য, চলচ্চিত্রের প্রখ্যাত অভিনেতা নাট্যপণ্ডিত রাধামোহন ভট্টচার্য এই নাটকেই প্রথম পেশাদার থিয়েটারে আত্মপ্রকাশ করেন। পরে এখানে মঞ্চের বিখ্যাত অভিনেতা মহেন্দ্র গুপ্তকে আনা হয়। এঁরা ছাড়া অন্য অভিনেতৃবৃন্দ হলেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়শ্রী সেন, গীতা দে।

গিরিশ থিয়েটার-এর অভিনয়ের প্রকল্পে ছিল প্রতি সোম, বুধ, শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে

ছ'টায় এবং রবিবার ও ছুটির দিনে সকাল সাড়ে দশটায় নাটকাভিনয় হবে। 'ডাউন ট্রেন' ৭৩ রাত্রি অভিনীত হয়। কিন্তু খুব বেশি সাফল্য লাভ না করায় প্রকল্পটি বন্ধ করে দিতে হয়।

১৯৫৮-তে শিশুনাট্য শাখাটি গড়ে উঠলেও এবং প্রতি শনি, রবি এবং ছুটির দিন সকালে শিশুদের নিয়ে নাচগান ও নাটকের আয়োজন করা হলেও, শিশু এবং অভিভাবকদের সহযোগিতার অভাবে এই প্রকল্পটিও বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৫৮-এর ২০ ডিসেম্বর থেকে চালু হয় 'গিরিশ নাট্যপ্রতিযোগিতা'। এতে খুব সাড়া পড়ে। অজস্র সৌখিন নাট্যদল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় এবং এখান থেকেই অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রী উঠে আসেন যারা পরবর্তীকালে বাংলা নাট্যাভিনয়ে খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

এবারে পুরনো নাটকের আধুনিক মঞ্চায়নের চেষ্টা করা হয় বিশ্বরূপায়। প্রতি বৃহস্পতিবার বেলা ৩টায় এবং শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় অভিনয়ের আয়োজন করা হয়। এই প্রকল্পের প্রথম নাটক অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'কর্ণার্জুন' নাটক। ১৯৬৩-এর ২৫ জুলাই। এই নাটক দিয়ে, ৩০ জুন, ১৯২৩, আর্ট থিয়েটারের উদ্বোধন হয়েছিল এবং অভূতপূর্ব সাড়া ফেলে দিয়েছিল। সেই সাফল্যমণ্ডিত পুরনো নাটকটি এখানে অভিনয় করা হলো। যাত্রাজগতের খ্যাতিমান অভিনেতা দিলীপ চট্টোপাধ্যায় (কর্ণ) এবং সুজিত পাঠক (অর্জুন) অভিনয় করেন। পুরনো নাটকটিকে আধুনিক রূপে সম্পাদনা করেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। পরিচালনায় ছিলেন সন্তোষ সিংহ ও কানু বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীত—রবীন চট্টোপাধ্যায়। আলো—অমর ঘোষ। নৃত্য—অনাদিপ্রসাদ। নিয়তির কণ্ঠে গান গেয়েছিলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। মঞ্চ—আর. আর. সিন্ধে।

নাটকের বিষয় ভাবনায় যখন নতুন জীবনের ইশারা মিলছে, সেই সময় কর্ণার্জুনের মতো পৌরাণিক নাটক নতুন করে অভিনয় করাকে অনেকেই স্বাগত জানিয়েছিলেন। কেননা, পেশাদার মঞ্চ থেকে পৌরাণিক নাটক তখন বিদায় নিয়েছে। এই অভিনয়ের বিবরণ দিয়ে 'রূপমঞ্চ' পত্রিকা তখন লিখেছিল : 'আলোক সম্পাতের অভিনবত্ব—দৃশ্যপটের মনোহারিত্ব, পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি সর্ববিষয়ে বিশ্বরূপা কর্তৃপক্ষ, নিজেদের চিন্তাশক্তি ও কর্মক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন।' এখানে যাত্রা, সৌখিন নাট্যদল এবং গ্রুপ থিয়েটার প্রভৃতি অন্যান্য অভিনয় ক্ষেত্রের শিল্পী বাছাই করেছিলেন। তাতে অভিনয় ততোটা দানা না বাঁধলেও, এই প্রয়াসকে সকলে অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানিয়েছিলেন।

'গিরিশ থিয়েটার'-এর নামে 'ডাউন ট্রেন' অভিনয়ের পর এখানে বিমল ঘোষের (মৌমাছি) লেখা 'মায়াময়ূর' নামে একটি শিশুনাট্য অভিনীত হয়। পরিচালনা করেন নরেশ মিত্র । তাছাড়া 'কর্ণার্জুন' নাটকটিও এই নাট্যানুষ্ঠানে অভিনীত হয়েছিল।

বিশ্বরূপার নিয়মিত অভিনয়ের ধারায় এবার শুরু হলো 'সেতু' নাটক। কিরণ মৈত্রের 'বুদবুদ' একাঙ্ক অবলম্বনে এই পূর্ণাঙ্গ নাটকটি রচনা করেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। প্রথম অভিনয় হলো ৮ অক্টোবর, ১৯৫৯। পরিচালনা—নরেশ মিত্র। আলো—তাপস সেন।

মঞ্চ--অমর ঘোষ। রূপসজ্জা--শক্তি সেন। 'ক্ষুধা' নাটকের পর 'সেতু'ও অসামান্য সাফল্য লাভ করে। ১০৮২ রাত্রি একটানা অভিনয়ের রেকর্ড সৃষ্টি করে নাটকটির অভিনয় বন্ধ করা হয় ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে।

'বহুরূপী' নাট্যদলের অভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্র নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেন। এক বন্ধ্যা নারীর জীবনযন্ত্রণা ও সন্তানহীনা নারীর হৃদয় বেদনা তাঁর অভিনয়ে এতোই স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছিল যে, পেশাদার থিয়েটারে নারীচরিত্র অভিনয়ের নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে গিয়েছিল। যুগান্তর পত্রিকা লিখেছিল : 'সেতু' নাটকের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ নায়িকা অসীমার ভূমিকায় তৃপ্তি মিত্রের অনিন্দ্যসুন্দর অভিনয়।' অন্যান্য শিল্পীরা হলেন :

> অসিতবরণ (পরে অসীমকুমার), নরেশ মিত্র, তরুণকুমার, সন্তোষ সিংহ, তমাল লাহিড়ী, তারক ঘোষ, মণি শ্রীমানি, মমতাজ আহমেদ খাঁ, জয়শ্রী সেন, আরতি দাস, সুব্রতা সেন প্রমুখ।

এই নাটকের দলগত অভিনয় সকলকে মুগ্ধ করে। তাছাড়া প্রয়োগনৈপুণ্যের কুশলতাও নাটকটির সাফল্যের মূলে কাজ করেছিল।

আলোক সম্পাতে তাপস সেনের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। তাঁর আলোর কারসাজি সেদিন জনমানসে প্রচণ্ড সাড়া ফেলেছিল। আলোছায়ার মায়াজাল সৃষ্টি করে মঞ্চে চলন্ত ট্রেনগাড়ি এবং সেখানে আত্মহত্যার মুহূর্তে নায়িকার উদ্ধার--এর এফেক্ট সেদিন দর্শক মনে প্রভূত সাড়া ফেলে দিয়েছিল। তবে এই নিয়ে সেদিন তর্কও উঠেছিল, নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে আঙ্গিক বড়ো না বিষয় বড়ো। তাপস সেনের আলোর কারসাজি দেখতেই সেদিন বহু দর্শক ভিড় করেছিল। আবার একথাও ঠিক এক বন্ধ্যা নারীর হৃদয়বেদনার সেন্টিমেন্ট সাধারণ দর্শককে স্বভাবতই আকর্ষণ করেছিল।

এরপরে 'লগ্ন' নাটক। নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য। প্রথম অভিনয় ঃ ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দের ৭ মে, বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টায়।

'লগ্ন' নাটকাভিনয় থেকে বিশ্বরূপা সম্পর্কে দুটি তথ্য উল্লেখযোগ্য। এক. এই নাটক থেকেই থিয়েটারের সব কৃতিত্ব স্বয়ং মালিক রাসবিহারী সরকার গ্রহণ করলেন। এবার থেকে তিনি নাট্যাভিনয়ের সব দায়িত্ব নিজের হাতে নিলেন। খ্যাতকীর্তি যে সব নাট্যব্যক্তিত্বের সহায়তায় বিশ্বরূপা অভিনয়ের রেকর্ড সৃষ্টি করে চলেছিল, তার কৃতিত্বের সবটাই থিয়েটারের কর্ণধার হিসেবে নিজের নামে চালাতে থাকলেন। অন্তত কাগজে কলমে তাঁর নামই প্রকাশিত হতো। ফলে বিশ্বরূপা যে গৌরব দিয়ে শুরু হয়েছিল, সেই গৌরব আর ফিরে এলো না। 'লগ্ন' নাটকের বিজ্ঞাপনে দেখা গেল--'প্রবর্ধনা, প্রবর্তনা ও পরিচালনা : রাসবিহারী সরকার।'

দুই. 'লগ্ন' অভিনয় থেকেই বিশ্বরূপায় 'থিয়েটার স্কোপ' চালু করা হয়। উদয়শঙ্করের শঙ্করস্কোপের আদলে এই থিয়েটারস্কোপ চালু হলেও, অনেকের কাছেই মনে হয়েছে, এটি বিজ্ঞাপনের চমক ছাড়া আর কিছুই নয়। বিশ্বরূপা কর্তৃপক্ষ এই থিয়েটারস্কোপের বৈশিষ্ট্য জানিয়ে ছিল :

ক. ব্যাকস্টেজ বলে কিছু থাকবে না, অন্তত দর্শক তা দেখতে পাবে না।

খ. নাট্য দৃশ্যগুলিকে বিভিন্ন স্তরে সাজিয়ে এক বা একাধিক স্তরে অভিনয়ের ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ নিরন্তর অভিনয় চলবে--কোনো ছেদ পড়বে না।

গ. পরিবেশ অনুযায়ী আবহসঙ্গীত বেজে চলবে।

ঘ. শব্দের সাহায্যে চরিত্রগুলির অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ।

ঙ. স্বগতোক্তিকে নাটকীয় অথচ বাস্তবানুগভাবে প্রকাশ করা হবে।

এই বিবৃতি থেকে সব কিছু বুঝে ওঠা যায় না। এতে নতুনত্ব কী হলো। সতু সেন অবশ্য জানিয়েছিলেন যে, তাঁর সৃষ্ঠ ঘূর্ণায়মান মঞ্চের (রিভলভিং স্টেজ) পরে এই থিয়েটারস্কোপ আরেক নতুন পদক্ষেপ বাংলা মঞ্চের বিবর্তনের ক্ষেত্রে। সতু সেনের এই সার্টিফিকেট বিশ্বরূপা কর্তৃপক্ষের কাজে লাগলেও, দর্শকেরা কিন্তু এমন কিছুই অভিনবত্ব খুঁজে পেলেন না। তবে অনেকটা একই সঙ্গে থিয়েটার এবং সিনেমার মিশ্রণ। এই পদ্ধতিতেই এখানে 'লগ্ন', 'রাধা' এবং 'হাসি' নাটক অভিনীত হয়। বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল : 'ভারতীয় নাট্যশালার ইতিহাসে বিস্ময়কর উদ্ভাবন / থিয়েটারস্কোপ সমন্বিত বিশ্বরূপা থিয়েটারের / লগ্ন'।

অভিনয়ে ছিলেন : জহর গাঙ্গুলি, সন্তোষ সিংহ, অসিতবরণ, তরুণকুমার, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, জয়শ্রী সেন, মিতা চট্টোপাধ্যায়, সাধনা রায়চৌধুরী। এই প্রথম মঞ্চে পুরোপুরি অভিনয় শুরু করলেন স্বয়ং নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য। মাঝে তিনি অভিনেতার অনুপস্থিতিতে কখনো কখনো (যেমন 'ক্ষুধা' নাটকে) অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

'রাধা' প্রথম অভিনীত হয় ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ এপ্রিল। তারাশঙ্করের সদ্যপ্রকাশিত উপন্যাস-এর ঘূর্ণায়মান মঞ্চ-নাট্যরূপ দিলেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। থিয়েটারস্কোপ, নাটক ও পরিচালনা--রাসবিহারী সরকার। সঙ্গীত--জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়। কণ্ঠসঙ্গীত--পান্নালাল ভট্টাচার্য, ছবি বন্দোপাধ্যায়, গৌরী মিত্র, দিলীপ কুমার রায় ও দিলীপ মুখোপাধ্যায়। নৃত্য--অনাদিপ্রসাদ। মঞ্চ--প্রহ্লাদ দাস। আলো--বংশী সাউ। রূপসজ্জা--শক্তিসেন।

অভিনয় করেছিলেন :

মিহির ভট্টাচার্য, রূপক মজুমদার, বিদ্যুৎ গোস্বামী, শঙ্কর ব্যানার্জী, গঙ্গাপদ বসু, অরুণ মিত্র, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, নির্মল ঘোষ, শিপ্রা মিত্র, জয়শ্রী সেন।

কোনো কোনো পত্রিকা 'রাধা' নাটক এবং থিয়েটারস্কোপের ব্যবহার নিয়ে খুবই প্রশংসা করেছিল। কোনো কোনো পত্রিকা আবার তীব্র নিন্দা করেছিল : 'বিশ্বরূপায় 'রাধা' দেখে মনে হল নাটকটি রাম-শ্যাম-যদুচরণ নামে কোনও চতুর্থ শ্রেণীর হস্তিমূর্খের রচনা। কোথায় তারাশঙ্করের রাধা!' (প্রসেনিয়াম)।

এরপরের নাটক 'জাগো'। বনফুলের ত্রিবর্ণ উপন্যাসের নাট্যরূপ। এইবারে নাট্যরূপদাতা হিসেবেও রাসবিহারী সরকারের নাম ঘোষিত হলো। পরিচালনাও তাঁরই। প্রয়োগ প্রধানও তিনি। প্রথম অভিনয় হলো ১২ অক্টোবর, ১৯৬৬।

থিয়েটারস্কোপ পদ্ধতিতে এই নাটকটিরও অভিনয় হলো। অভিনয়ে : অসিতবরণ, নির্মলকুমার, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দ গাঙ্গুলি, জয়শ্রী সেন, সুমিতা সান্যাল, শ্রাবণী বসু প্রমুখ। সবদিক দিয়েই 'জাগো' ব্যর্থ হলো। বিশ্বরূপার পূর্ববর্তী দক্ষ ব্যক্তিরা বিদায় নিয়েছেন। বিধায়ক ভট্টাচার্য নেই, পরিচালনায় নরেশ মিত্রবা কানু বন্দ্যোপাধ্যায় নেই, আলোতে নেই তাপস সেন। সব একা রাসবিহারী। ফলও হলো ব্যর্থতা। সার্বিক ব্যর্থতা।

এবারে বিশ্বরূপায় নিয়ে আসা হলো তরুণ রায়কে। তরুণ রায় এতোদিন তাঁর 'থিয়েটার সেন্টার' নাট্যদল নিয়ে নানাধরনের নাটক রচনা ও পরিচালনা করে খ্যাতিলাভ করেছেন। গ্রুপ থিয়েটারের তরুণ রায়কে (অন্য নাম ধনঞ্জয় বৈরাগী) দায়িত্ব দেওয়া হলো নাট্যকার ও পরিচালনার।

প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের উপন্যাস 'জব চার্ণকের বিবি' অবলম্বনে নাট্যরূপ দিলেন তরুণ রায় (ধনঞ্জয় বৈরাগী), প্রতাপচন্দ্রের সহযোগিতায়। নাট্যরূপের নাম 'রঙ্গিনী'। প্রথম অভিনয় হলো ২০ মে, ১৯৬৭। পরিচালনাও করেন তরুণ রায়। এই নাটকটিও সাফল্য লাভ করতে পারল না।

১৯৬৭-এর ১৫ আগস্ট ধনঞ্জয় বৈরাগীর নাটক 'এক পেয়ালা কফি' অভিনীত হয়। পরিচালনাও তাঁরই (তরুণ রায় নামে)। ডিকেটটিভ কাহিনীর ধরনে এই নাটকে রহস্য, রোমাঞ্চ এবং সাসপেন্স--দর্শককে উৎকণ্ঠায় ভরিয়ে রাখত।

অল্প কিছুদিন চলার পর নাটকটি বন্ধ করে এবারে নামানো হলো 'আগন্তুক'। ৭ অক্টোবর, ১৯৬৭ প্রথম অভিনয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সহায়তায় ধনঞ্জয় বৈরাগীর নাটক 'আগন্তুক' তারই পরিচালনায় অভিনীত হলো। এই নাটকটি খুবই সাফল্য লাভ করে। অভিনয় ও প্রয়োগের কুশলতায় 'আগন্তুক' কৃতিত্ব অর্জন করে। প্রায় দুই বছরের বেশি সময় ধরে (ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ পর্যন্ত) নাটকটি ধারাবাহিক অভিনীত হয়।

রঙ্গিনী, এক পেয়ালা কফি, আগন্তুক এই তিনটি নাটকেই মূলত তরুণ রায়ের নিজের নাট্যদল থিয়েটার সেন্টারের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অংশ গ্রহণ করে। গ্রুপ থিয়েটারের অভিনয়ের ধরন পেশাদার সাধারণ রঙ্গালয়ে নিঃসন্দেহে নতুন মাত্রা আরোপ করেছিল।

'আগন্তুক' নাটক চলাকালীনই থিয়েটারের সত্ত্বাধিকারী সরকার পরিবারে মৃত্যু ভাঙন-পৃথগন্ন ইত্যাদি কারণে বিশ্বরূপাতেও তার প্রভাব পড়ল। সরকারদের পারিবারিক ভাঙনের কারণে বিশ্বরূপা থিয়েটারের দায়দায়িত্ব সরকার পরিবারের যৌথ দায়িত্ব থেকে এবারে ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে রাসবিহারী সরকার এককসত্ব গ্রহণ করেন। থিয়েটারের ওপর পরিবারের সামগ্রিক দায়িত্ব আর রইলো না।

এর আগে যেমন সরকার পরিবারের তরফ থেকে দক্ষিণেশ্বর সরকার কিছুদিন বিশ্বরূপা থিয়েটার চালিয়েছিলেন। তাঁরই কর্তৃত্বে ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ এপ্রিল অভিনীত হয়েছিল 'হাসি' নাটক। নাট্যকার কিরণ মৈত্র। পরিচালনা—দক্ষিণেশ্বর সরকার। নাটকটি

সেভাবে জনসম্বর্ধনা লাভ করেনি।

১৯৬৮-এর শেষের দিকে রাসবিহারী পুরোপুরি একক দায়িত্বে বিশ্বরূপা থিয়েটার চালাতে লাগলেন। প্রথমেই তিনি তরুণ রায় এবং তাঁর নাট্যদল থিয়েটার সেন্টারের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করলেন।

রাসবিহারী সরকারের একক দায়িত্বে প্রযোজিত হলো 'ঘর' নাটক। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মেঘের ওপর প্রাসাদ' উপন্যাস অবলম্বনে নাট্যরূপ ও পরিচালনা করলেন রাসবিহারী। প্রথম অভিনয় হলো ১৯৬৯-এর ৩ মার্চ। অভিনয়েও অংশ নিলেন প্রায় সব নতুন অভিনেতা--যারা এর আগে বিশ্বরূপার সঙ্গে তেমনভাবে যুক্ত ছিলেন না ; একমাত্র কালী ব্যানার্জী ছাড়া। অনুপকুমার, স্বরূপ দত্ত, কণিকা মজুমদার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সর্বেন্দ্র প্রমুখেরা তখন অন্য মঞ্চ ও সিনেমার খ্যাতিমান শিল্পী। এঁরা ছাড়াও অভিনয় করলেন--গোবিন্দ গাঙ্গুলি, সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল ঘোষ, ইন্দ্রজিৎ সেন, তপন গাঙ্গুলি, উমানাথ চৌধুরী। মঞ্চ ও আলো--অমর ঘোষ। আবহ--কমল রায়চৌধুরী।

নাট্যকাহিনীর প্রশংসা হলেও নাট্যপ্রযোজনা ও অভিনয়ের তেমন খ্যাতিলাভ হলো না।

এইভাবে খ্যাতিমান ঔপন্যাসিকের জনপ্রিয় উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে রাসবিহারী পরপর প্রযোজনা করে চললেন। অভিনীত হলো বিমল মিত্রের উপন্যাস 'বেগম মেরী বিশ্বাস'-এর নাট্যরূপ। নাট্যরূপ ও পরিচালনা রাসবিহারীর। প্রথম অভিনয় হলো ৪ জানুয়ারি, ১৯৭০।

এইভাবেই অভিনীত হলো সমরেশ বসুর সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস 'কোথায় পাবো তারে'র নাট্যরূপ। নাট্যরূপ দিলেন রাসবিহারী নিজে এবং পরিচালনাও তাঁরই। প্রথম অভিনয় হলো ১ জানুয়ারি, ১৯৭১। নাটকটি সুপ্রযোজিত হলেও দর্শক আনুকূল্য লাভ করতে পারেনি।

'চৌরঙ্গী' নাটক অভিনয়ে আবার বিশ্বরূপার সাফল্য দেখা গেল। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ সেপ্টেম্বর শঙ্করের লেখা জনপ্রিয় উপন্যাসের নাট্যরূপ অভিনয়ের মাধ্যমে এবারে রাসবিহারীর প্রচেষ্টা সার্থক হলো। নাট্যরূপ ও পরিচালনা তাঁরই। ধারাবাহিকভাবে দীর্ঘদিন, প্রায় দুই বছর নাটকটি অভিনীত হলো। শেষ অভিনয় ১৯৭৩-এর ১ জুলাই।

'চৌরঙ্গী'তেই প্রথম পেশাদারি মঞ্চে ক্যাবারে নৃত্যের ব্যবহার করে দর্শক আকর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছিল। প্রথমে 'থিয়েটারস্কোপে'র 'স্টান্ট' দিয়ে দর্শক আকর্ষণের প্রয়াস দেখা গিয়েছিল। এবারে হোটেলের ক্যাবারে নর্তকীদের থিয়েটারে নিয়ে এসে আবার এক লোক-বিনোদনের সস্তা এবং নাটক বহির্ভূত উপায় ব্যবহার করা হলো। ক্যাবারে নর্তকী 'মিস্ শেফালী' সেদিন নাটকের চেয়েও প্রচারের তুঙ্গে ছিলেন। টানা দুই বছর 'চৌরঙ্গী' নাটক একটানা অভিনয়-সাফল্যের পেছনে কাহিনী এবং নাট্যগুণের তুলনায় ক্যাবারে নৃত্যের আকর্ষণ হয়তো বেশি ছিল। বিকাশ রায় প্রমুখ খ্যাতিমান অভিনেতারা

সেদিন ম্লান হয়ে গিয়েছিলেন 'মিস্ শেফালি'র দাপটে।

'চৌরঙ্গী'র পর 'আসামী হাজির'। কাহিনী বিমল মিত্রের। নাট্যরূপ--রাসবিহারী সরকার। প্রথম অভিনয় : ৫ জুলাই, ১৯৭৩।

অভিনয়ে 'চৌরঙ্গী'র প্রায় সব অভিনেতা-অভিনেত্রী। বিকাশ রায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন মজুমদার, তরুণকুমার, অজয় গাঙ্গুলি, নির্মল ঘোষ, প্রমোদ গাঙ্গুলি, কণিকা মজুমদার, রুবি দত্ত, সৈকত পাকড়াশি, কিরণকুমার, মিস শেফালি। পরের দিকে পাহাড়ি সান্যাল, দিলীপ রায়, আরতি ভট্টাচার্য অংশগ্রহণ করেন। এই অভিনয়ের সময়েই পাহাড়ি সান্যালের মৃত্যু হয়। তাঁর পরিবর্তে অভিনয়ে অংশ নেন পান্নালাল চট্টোপাধ্যায়।

ক্যাবারে নৃত্যের যে সূচনা 'চৌরঙ্গী'তে হয়েছিল, তারই সার্থকতম (?) রূপায়ণ হলো 'আসামী হাজির' নাটকে। বিজ্ঞাপনের ভাষা :

'চৌরঙ্গী'র চেয়েও সাড়া জাগানো, মন মাতানো বর্তমান বাংলা নাট্যমঞ্চের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার-পরিচালক রাসবিহারী সরকারের দুর্ধর্ষ প্রচেষ্টা আসামী হাজির।'

আসামী হাজির প্রবলভাবে দর্শক আকর্ষণে সফল হলো। চৌরঙ্গী এবং আসামী হাজির-এর জনপ্রিয়তায় উৎসাহিত হয়ে রাসবিহারী আবার নতুন কোনো স্টান্ট ব্যবহারের দিকে ঝুঁকছিলেন।

থিয়েটারে ক্যাবারে নৃত্য ব্যবহারের প্রচণ্ড সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে অন্যান্য কিছু থিয়েটার যেমন মিনার্ভা, রঙমহল, প্রতাপ মেমোরিয়াল কিংবা বয়েজ ওন লাইব্রেরির মঞ্চ তাদের নাটকে ক্যাবারে নর্তকীদের প্রবলভাবে ব্যবহার করতে লাগলেন। এইসব থিয়েটারে এই ধরনের নৃত্যরতা নর্তকীদের ভিড় বেড়েই চলেছিল। বলা যায়, এতোদিনের বাংলা থিয়েটারের সুস্থ সংস্কৃতির ঐতিহ্যের সঙ্কট দেখা দিয়েছিল। একমাত্র ব্যতিক্রম হিসেবে সেদিন বাংলা পেশাদার থিয়েটারগুলির মধ্যে স্টার থিয়েটার পরিচ্ছন্ন নাট্যোপহার দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে প্রশংসার্হই হয়েছিল। সেদিন সুস্থ সংস্কৃতির সপক্ষের মানুষজনের আন্দোলন থিয়েটারগুলিকে চরম বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করেছিল। 'বস্ত্র বিপ্লবের' যে আহ্বান বিশ্বরূপা জানিয়েছিল (তাদের বিজ্ঞাপনে নর্তকীর মঞ্চে এসে একে একে পরিধেয় সব বস্ত্র খুলে ফেলে শুধুমাত্র 'বিকিনি' ধারণ করে নৃত্যকে 'বস্ত্রবিপ্লব' বলা হচ্ছিল)। তা থেকে বাংলা থিয়েটাব উদ্ধার পেয়েছিল।

সে যাই হোক, 'আসামী হাজির' নাটকের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে রাসবিহারী এবারে পরপর বিমল মিত্রের উপন্যাস বেছে বেছে নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করে চলেছেন। প্রথমে অভিনয় করলেন 'পরস্ত্রী' উপন্যাসের নাট্যরূপ। নাট্যরূপ ও পরিচালনা রাসবিহারী সরকার। প্রথম অভিনয় : ২ আগস্ট, ১৯৭৫। এই নাটকে রাসবিহারী আরেক নতুন ধরনের টেকনিক ব্যবহার করলেন। তার নাম দিলেন 'স্পিডোস্কোপ'। নাটকের দৃশ্যান্তর দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য আলো না নিভিয়ে ঘূর্ণায়মান মঞ্চের সাহায্যে

পরের দৃশ্যে নাটক চলে আসছিল। থিয়েটারস্কোপ-এও প্রায় এই পদ্ধতি ছিল। আবার বিজ্ঞাপন দিয়ে লোক টানবার চেষ্টা চালিয়ে গেলেন রাসবিহারী।

তারপর কড়ি দিয়ে কিনলাম (২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬) জনগণমন (১২ জানুয়ারি, ১৯৭৮), সাহেব বিবি গোলাম (১৯৭৭), সব ঠিক হ্যায় (৪ অক্টোবর, ১৯৮০) অভিনয় করলেন। সব কয়টিই বিমল মিত্রের উপন্যাস। নাট্যরূপ ও পরিচালনা রাসবিহারীর। কিন্তু কোনো নাট্যরূপের অভিনয়ই সাফল্য লাভ করল না। 'সব ঠিক হ্যায়' নাট্যাভিনয়ে আবার 'স্পিড রিফ্লেকশান' রীতি ব্যবহার করা হলো। এ-ও সেই থিয়েটারস্কোপ-এর পুরনো আঙ্গিক নতুন নামের চটকে বিজ্ঞাপিত হলো। কিন্তু তাতেও জনসমর্থন মিলল না।

তাই মাঝে বিমল মিত্র থেকে সরে এসে রাসবিহারী অভিনয় করলেন শরৎচন্দ্রের 'দেনাপাওনা' উপন্যাসের নাট্যরূপ (৩১ মে, ১৯৭৯)। বিগত যুগেও বাংলা মঞ্চের দুর্দশার দিনে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপ বাংলা থিয়েটারে সাফল্য এনে দিয়েছিল। এখানে দেনাপাওনা-ও ব্যর্থ হলো। নাট্যরূপ ও পরিচালনা রাসবিহারীর।

এবার দ্বারস্থ হলেন আশাপূর্ণা দেবীর জনপ্রিয় উপন্যাস 'সুবর্ণলতা'র কাছে। নাট্যরূপ ও পরিচালনা—রাসবিহারী। অভিনয় হলো ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭৯।

কিন্তু শুধু বিমল মিত্র কেন, কোনো ঔপন্যাসিকের কোনো জনপ্রিয় উপন্যাসের নাট্যরূপই সার্থক হলো না।

১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্বরূপা মঞ্চে গ্রুপ থিয়েটার 'বহুরূপী' নাট্যসম্প্রদায় তাদের সার্থক প্রযোজনা 'পুতুলখেলা' এবং 'রক্তকরবী' নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিল নিয়মিত ভাবে প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায়। তা-ও শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। বহুরূপী তাদের প্রবল খ্যাতি সত্ত্বেও বিশ্বরূপার নিয়মিত দর্শকদের আকর্ষণ করতে পারেনি। তারা ব্যর্থ হয়ে এখানে অভিনয় বন্ধ করে দেয়। পরে অবশ্য তাদের নতুন নাটক 'কাঞ্চনরঙ্গ'-এর প্রথম অভিনয় এখানে করেছিল বহুরূপী, ২৪ জানুয়ারি, ১৯৬১। মনে রাখতে হবে, বিশ্বরূপাতেই 'বহুরূপী'র প্রধানা অভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্র 'সেতু' সহ একাধিক নাটকে অভিনয় করে খ্যাতি বৃদ্ধি করেছিলেন।

১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দের ১ ডিসেম্বর বিশ্বরূপা থিয়েটার বিনা ভাড়ায় বহুরূপীকে তাদের 'রক্তকরবী' নাটক অভিনয় করতে দিয়েছিল। কেননা, বহুরূপী এই অভিনয় থেকে সংগৃহিত অর্থ প্রতিরক্ষা তহবিলে দিতে চেয়েছিল। তখন ভারত-চীনের যুদ্ধের নামে সীমান্ত সংঘর্ষ চলছিল। বহুরূপী সংগৃহিত অর্থ থেকে তিন হাজার টাকা দিয়েছিল। আবার অভিনেতা—নাট্যকার তুলসী লাহিড়ীর সাহায্যার্থে বিশ্বরূপা নাট্যোন্নয়ন পরিকল্পনার অধীনে বহুরূপী এখানে 'ছেঁড়া তার' অভিনয় করেছিল।

পরপর ব্যর্থ হয়ে ক্রমাগত লোকসান দিয়ে রাসবিহারী হতোদ্যম হয়ে থিয়েটারের বাইরে নতুন পরিকল্পনা করলেন। থিয়েটারে নাটকাভিনয় পরিত্যাগ করে নেমে পড়লেন

প্রোমোটারি ব্যবসায়। তাদের পারিবারিক ব্যবসার অন্যতম ছিল এই ব্যবসা। বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চের লাগোয়া ফাঁকা জমিতে তিনি ফ্ল্যাটবাড়ি তুলে বিক্রি করার ব্যবস্থা করে ফেললেন। সেইমতো অগ্রিম টাকাও নিতে লাগলেন।

কিন্তু জানা গেল, থিয়েটারের স্বত্ব তার হলেও জমির মালিক তিনি নন। তাই মামলা শুরু হলো। থিয়েটারে লোকসান, অগ্রিম নেওয়া টাকা ফেরত দেওয়ার তাগাদা এবং মামলা-মোকদ্দমায় জেরবার হয়ে রাসবিহারী শেষ পর্যন্ত থিয়েটার করা ছেড়ে দিলেন। তার এতোদিনের পরিকল্পনা, স্বপ্ন, উদ্যম এবং নেশা সব নিঃশেষ হয়ে গেল।

১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি শুক্লা সেনগুপ্ত নামে একজন বিশ্বরূপার লীজ নেন রাসবিহারীর কাছ থেকে।

শুক্লা সেনগুপ্ত উদ্যোগী হয়ে বিশ্বরূপায় সুস্থ রুচির নাটক প্রযোজনা শুরু করলেন। বিশ্বরূপায় এবার নতুন স্বত্বাধিকারীর উদ্যোগে পরপর অভিনীত হলো স্বরলিপি, ফেরা, স্বীকারোক্তি, নীলকণ্ঠ।

মানতেই হবে, সেই সময়ে বিশ্বরূপা এবং তাব দেখাদেখি অন্য মঞ্চগুলিতে যেভাবে ক্যাবারে নৃত্য এবং 'নায়িকার বস্ত্রবিপ্লব' দেখানো শুরু হয়েছিল, শুক্লা সেনগুপ্ত নিজের উদ্যোগে সেখানে সুস্থ রুচির নাটক অভিনয়ের চেষ্টা চালিয়ে যান। কুরুচির সস্তা বিনোদনকে দূরে ঠেলে দিয়ে তিনি সুস্থ রুচির থিয়েটারে মন দেন। এইভাবে তাঁর প্রযোজনায় স্বরলিপি, ফেরা বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। লোক সমাদর পেয়েছিল। [নাট্য চিন্তা : বর্ষ ২০। সংখ্যা ৭--১২]

তারপরে তিনি প্রযোজনা করেন ঘণ্টা ফটক, ভালো খারাপ মেয়ে। গ্রুপ থিয়েটারের নামী শিল্পী রমাপ্রসাদ বণিককে এনে নাটক দুটির প্রযোজনা করেছিলেন তিনি। তাঁর কথায় : প্রোডাকশনের বিপুল খরচ মাথায় নিয়ে প্রথমদিকে মার খেলেও আমি হতোদ্যম হইনি। 'ফেরা'-তেও প্রথমে লোক হয়নি, কিন্তু পরে হল। বিপুল জনপ্রিযতা পেল দুটি নাটকই। [যুগান্তর : ২৩ জুলাই, ১৯৮৯]

কিন্তু একক প্রচেষ্টায় এইভাবে পেশাদার থিয়েটার চালাতে গিয়ে শুক্লা ক্রমে ঋণভারে জড়িয়ে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত তিনি আত্মহননের পথ বেছে নেন। বিশ্বরূপা তথা বাংলা পেশাদার থিয়েটারকে বাঁচাতে গিয়ে গৃহবধূ শুক্লা সেনগুপ্ত শেষ অবধি নিজেকে শেষ করলেন। বিশ্বরূপাও রক্ষা পেল না। এ এক মর্মান্তিক প্রচেষ্টার ইতিহাস।

বিশ্বরূপার অভিনয় তারপর থেকে বন্ধই হয়ে পড়েছিল। ২০০১-এর ১৪ নভেম্বর, কালীপূজার দিনে রাত দুটোর সময় বিশ্বরূপা মঞ্চে আগুন লাগে।

আগে থেকেই এই থিয়েটার বন্ধ রেখে পেছনে বহুতল বাড়ি উঠছিল। পরিকল্পনা ছিল, মঞ্চটি ভেঙে ফেলে সেখানে 'মার্কেট কমপ্লেক্স' গড়ে উঠবে এবং সেখানেই একটি ৬০০ আসনের থিয়েটার হল তৈরি করা হবে। বর্তমান মালিক রাসবিহারী সরকারের কন্যা জয়ন্তী মিশ্র সেইভাবেই জানান।

কিন্তু তার আগেই বিশ্বরূপা থিয়েটার যেভাবে দাঁড়িয়েছিল, তা-ও আগুন লেগে ভস্মীভূত হয়ে গেল।

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বরূপা থিয়েটার যেমন নানাদিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য, তেমনি তার উজ্জ্বলতার মধ্যে বেশ কিছু পরিমাণে মালিন্যের কালিমার ছাপও রয়ে গেছে। গুণে-দোষে বিশ্বরূপা বাংলা পেশাদার থিয়েটারের ইতিহাসে অবশ্যই স্মরণীয়।

এক. বিভিন্ন খ্যাতিমান কথাসাহিত্যিকদের জনপ্রিয় উপন্যাসের নাটরূপ এখানে রীতিমতো অভিনীত হয়েছে। তার একটা ঐতিহ্য বাংলা থিয়েটারে ছিল। বিশ্বরূপা সেই ধারারই সার্থক পুনঃপ্রবর্তন করেছিল। এখানে শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, বিমল মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ বসুর রচিত কথাসাহিত্যের নাট্যরূপ ধারাবাহিক ও সাফল্যজনকভাবে অভিনয় করা

দুই. প্রযোজনার আঙ্গিকগত দিক দিয়ে নানা অভিনব প্রয়াস এখানে করা হয়েছিল। থিয়েটারস্কোপ, স্পিডোস্কোপ প্রভৃতি অভিনব নাট্যোপস্থাপনার প্রয়োগকৌশল এখানে ব্যবহৃত হয়েছিল। তাতে নাট্য প্রযোজনা কতো উন্নতমানের হয়েছিল কিংবা এদেশে নাট্য প্রয়োগের অগ্রগতিতে কতোটা সহায়ক হয়েছিল, তা নিয়ে মতান্তর থাকতেই পারে। কিন্তু গতানুগতিক সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রয়োগ প্রাধান্যকে গুরুত্ব না দিয়ে অভিনব এইসব কৌশল অবলম্বন করে সেদিন বিশ্বরূপা জনমনে নিঃসন্দেহে উদ্দীপনা ও উত্তেজনার সঞ্চার করেছিল। সিনেমা ও থিয়েটারের যুগ্ম কৌশলকে এইভাবে ব্যবহার করে নাট্যপ্রয়োগের যে সম্ভাবনা তারা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন তা ব্যর্থ হলো। অন্য কোনো থিয়েটার এই পদ্ধতি সেভাবে ব্যবহার বা অনুসরণ করল না, বিশ্বরূপাও তার কোনো প্রযোজনায় এই নব-ব্যবহৃত আঙ্গিকের সার্থকতর প্রয়োগ করে উঠতে পারল না।

তিন. নাটকের প্রযোজনার চেয়েও দর্শককে বিস্মিত-আকর্ষণের প্রচেষ্টা এখানে দেখা গেল, আলোর কারসাজির মধ্যে। আলোর কারুকৃতি দিয়ে দর্শকের মন ভোলানোর একটা প্রয়াস এখানে ছিল। গ্রুপ থিয়েটারের বিখ্যাত আলোকশিল্পী তাপস সেনকে নিয়ে আসা হয়েছিল এখানে অগ্রিম পাঁচশো টাকা এবং মাস মাইনে দেড়শো টাকার চুক্তিতে। 'আরোগ্য নিকেতনে' ব্রহ্মলোক, ব্রহ্মার আবির্ভাব, মৃত্যুর প্রতিমূর্তি নর্তকীর নৃত্য, প্রেতলোক ইত্যাদি আলোর কারিকুরিতে এমনভাবে দেখানো হলো যে, মূল নাটকের বাইরে এই চমক নানাভাবে আলোচিত হলো।

'সেতু' নাটকে ছুটন্ত ট্রেন মঞ্চে দেখিয়ে সেদিন হৈচৈ ফেলে দিয়েছিল

বিশ্বরূপা। দর্শক নাটকের চেয়েও আলোর এই ম্যাজিক দেখতেই বেশি ভিড় করেছিল। নাটকের চেয়ে তার আঙ্গিক কৌশল প্রাধান্য পেয়ে গেলে, তা নিঃসন্দেহে নাট্য প্রযোজনার ত্রুটি বলেই গণ্য হবে।

চার. দেহসর্বস্ব ক্যাবারে নৃত্য চালু করে বিশ্বরূপা যেভাবে নায়িকার 'বস্ত্রবিপ্লব' ঘটাতে চেয়েছিল তার মূল উদ্দেশ্যই ছিল নাট্যাতিরিক্ত অন্য কিছু দিয়ে দর্শকের মনকে আকর্ষণের চেষ্টা। মালিকের লাভালাভের পক্ষে তা সাফল্যজনক হলেও, বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে তার কলঙ্কের দাগ কিন্তু রয়ে গেল। তারা যে বিকৃতরুচির প্রবর্তন করেন, পরে সেই ধারাই অন্য অনেক রঙ্গালয়ে প্রবর্তিত হয়ে বাংলা নাট্যাভিনয়কে নিম্নমানের করে তুলেছিল।

পাঁচ. তা সত্ত্বেও বিশ্বরূপার কিছু প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাতেই হবে। যেমন :

ক) বাংলা নাট্যোন্নয়নের নানা চেষ্টা তারা করেছিল। এর জন্যে জ্ঞানীগুণী মানুষজনদের নিয়ে পরিষদ তৈরি করে, তাদের উপদেশ গ্রহণ করে নানা উন্নয়ন মূলক কাজে তারা হাত দিয়েছিল। এর আগে সাধারণ রঙ্গালয়ের ইতিহাসে অন্য কোনো থিয়েটার এইভাবে এগিয়ে আসেনি। তাদের গৃহিত সব কর্মসূচিতে হয়তো তারা সফল হতে পারেনি, কিন্তু তাদের প্রচেষ্টার মধ্যেই যে সৎ ও আন্তরিক প্রয়াস ছিল, তা কিন্তু নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ।

খ) শুধু তখনকার চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় ও খ্যাতিমান অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বিশ্বরূপায় নিয়ে এসে অভিনয় করানো হয়েছিল তা-ই নয়, সেই সময়কার গ্রুপ থিয়েটারের শিল্পীদেরও পেশাদার থিয়েটারে এনে অভিনয় করানো হয়েছিল। তৃপ্তি মিত্র, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, অজয় গাঙ্গুলি, তরুণ মিত্র, নির্মল ঘোষ, গোবিন্দ গাঙ্গুলি, সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ রায়, দীপান্বিতা রায়, গঙ্গাপদ বসু, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, সাধনা রায়চৌধুরী, তমাল লাহিড়ী, মমতাজ আহমেদ প্রমুখ শিল্পীরা এখানে অভিনয় করেছিলেন। শুধু অভিনয়ে নয়, আলোকসম্পাতে তাপস সেন, রূপসজ্জায় শক্তি সেন—এদেরকেও বিশ্বরূপা গ্রুপ থিয়েটার থেকে নিয়ে এসে ব্যবহার করেছিল।

ফলে, পেশাদার থিয়েটারের প্রচলিত অভিনয়ের রীতি ও মান অনেক পালটে গিয়েছিল। ভিন্ন অভিনয়রীতির উচ্চমান সেখানে তৈরি হয়েছিল। তেমনি এইসব শিল্পীর জনপ্রিয়তা ও জন আকর্ষণের ক্ষমতাকে বিশ্বরূপা ব্যবসায়িকভাবে কাজে লাগিয়েছিল।

গ) এদেশের যাত্রার উন্নয়নের চেষ্টা বিশ্বরূপা করেছিল। থিয়েটারের মঞ্চে যাত্রাদলকে দিয়ে অভিনয় করিয়ে শহরবাসীর মনে যাত্রা সম্পর্কে নতুন করে উৎসাহ সৃষ্টি করিয়েছিল। যাত্রার পুনরুজ্জীবনের এই প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল।

ঘ) পূর্ণাঙ্গ নাটকের সঙ্গে সঙ্গে একাঙ্ক নাটকের প্রসারেও বিশ্বরূপা উদ্যোগ নিয়েছিল। বিভিন্ন শৌখিন দলকে নিয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করে তাদের

উৎসাহিত করার সঙ্গে সঙ্গে নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রীর সম্ভাবনাও তারাও তৈরি করেছিল।

ঙ) নাট্য-উন্নয়নের প্রকল্পে বিশ্বরূপা একটি লাইব্রেরি চালু করেছিল। সেখানে নাট্যবিষয়ক এদেশ-বিদেশের গ্রন্থাদি রাখা হয়েছিল এবং উৎসাহী পাঠক-গবেষকদের সেখানে পড়াশোনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বাংলার কোনো পেশাদার থিয়েটার কখনো এইভাবে নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যশিক্ষার প্রসারের ব্যবস্থা করেনি। বিশ্বরূপার এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

মহান প্রযোজক শিশিরকুমারের 'শ্রীরঙ্গম' রঙ্গমঞ্চ গ্রহণ করে সেখানে বিশ্বরূপা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রবল উদ্যোগ, উৎসাহ ও আন্তরিকতায় বিশ্বরূপা বাংলা নাট্যাভিনয় ও নাট্যোন্নয়নের প্রসারে উদ্যমী হয়েছিল। সেইভাবে তাদের কাজকর্ম প্রসারিত হচ্ছিল এবং নাট্যাভিনয়ে অগ্রগতির পথও সন্ধান করেছিল। থিয়েটারের ইতিহাসে সেইসব উদ্যোগ স্মরণ রাখতে হবে। আবার দর্শক আকর্ষণের যেসব জনমনোরঞ্জনী কৌশল তারা গ্রহণ করেছিল, তাতে নাট্যাভিনয়ের যে ক্ষতি হয়েছিল ; তাও স্মরণ রাখতে হবে।

বিশ্বরূপা প্রতিষ্ঠার প্রায় সমসময়ে (১৯৫৯ থেকে) মিনার্ভা থিয়েটারে উৎপল দত্ত ও তাঁর নাট্য সম্প্রদায় 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ' নিয়ে বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রবলবেগে নাট্যাভিনয়ের যে জোয়ার এনেছিল ; বিষয়বস্তু, ভাবনা, উপস্থাপনা এবং অভিনয়ের যে নতুনতর ও অসাধারণ উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিল ; বিশ্বরূপা তার থেকে অনেক দূরে ছিল। যদিও তারা 'বহুরূপী' নাট্যদলকে দিয়ে সেখানে নাট্যাভিনয়ের একটা চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তা ফলবতী হয়নি। বিশ্বরূপা তার মতো করেই তার নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করেছিল।

একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিশ্বরূপা ভস্মীভূত হয়ে গেল। নতুন কোনো উদ্যম এখনো শুরু হয়নি।

রঙ্গনা থিয়েটার

১৫৩/২ এ, (পরবর্তীকালে ২ই), আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা

প্রতিষ্ঠা : ৫ অক্টোবর, ১৯৭০
প্রথম নাটক : 'বিনিপয়সার ভোজ' (রবীন্দ্রনাথ)
প্রযোজনা : শিল্পী যাযাবর
দ্বিতীয় নাটক : 'য্যায়সা কি ত্যায়সা' (গিরিশচন্দ্র)
প্রযোজনা : মন্মথ নাট্যসংস্থা (শ্রীমঞ্চ)

প্রতিষ্ঠাতা : গণেশ মুখোপাধ্যায় (মুখোপাধ্যায় পরিবার ও পাল পরিবার যৌথভাবে)
স্থায়িত্বকাল : ৫ অক্টোবর, ১৯৭০- এখনে চলছে।

১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর কলকাতার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে রঙ্গনা থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। রাধাবল্লভ ও গোপেন্দ্রকৃষ্ণ শীল মহাশয়ের কাছ থেকে জমিটা কিনে নেন মুখার্জী পরিবার। এই পরিবারের নাট্যানুরাগে খ্যাতি ছিল। সেই পরিবারের এক নাট্যব্যক্তিত্ব গণেশ মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় ও গোলক পালের উদ্যোগে নতুন থিয়েটার হল তৈরি হলো শীলদের জমিতে। কোনোরকম সরকারী সাহায্য বা অনুদান ছাড়াই এই থিয়েটার বাড়ি তৈরি হয়েছিল। বিখ্যাত নট অহীন্দ্র চৌধুরীর পরামর্শ ও তত্ত্বাবধানে রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করা হলো। অহীন্দ্র চৌধুরী নামকরণ করলেন রঙ্গনা। ৮৫০টি আসন। পরে ৯০৫টি।

১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের ৫ অক্টোবর দুর্গাপূজার মহাসপ্তমীর সন্ধ্যায় এই রঙ্গমঞ্চের উদ্বোধন হলো। শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অহীন্দ্র চৌধুরী। তারাশঙ্কর ছিলেন প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। প্রথম নাটক অভিনীত হলো রবীন্দ্রনাথের ছোট প্রহসন নাটিকা 'বিনিপয়সার ভোজ'। প্রযোজনা করল শিল্পী যাযাবর নামে নাট্যগোষ্ঠী। তারপরেই অভিনয় করা হলো গিরিশচন্দ্রের বহুখ্যাত প্রহসন 'য্যায়সা কি ত্যায়সা'। এই প্রহসনটির প্রযোজনা করল মন্মথ নাট্যসংস্থা। (শ্রীমঞ্চ)।

প্রথম রাতেই নাটক জমে গেল। রঙ্গনা থিয়েটারের নাম লোকমুখে পরিচিত হলো। কিন্তু রঙ্গনা কর্তৃপক্ষের নিজের কোনো নাটক না থাকায়, অভিনয়ে ছেদ পড়ল।

১৯৭০-এর দশক কলকাতা তথা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক টালমাটাল অবস্থা। বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ তখন উত্তাল। কলকাতা তখন প্রায় দুঃস্বপ্নের নগরী। সেই বিভীষিকা-পূর্ণ অন্ধকারের দিনে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত

হয়েছিল রঙ্গনা থিয়েটার।

এদিকে কলকাতায় তখন গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন তুঙ্গে। সেই আন্দোলনে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নান্দীকার নাট্যগোষ্ঠী তখন নানাধরনের নাটক অভিনয় করে শিক্ষিত ও রুচিশীল এবং থিয়েটারপ্রেমিক মানুষের মনে উন্মাদনার সৃষ্টি করেছে। সেই নান্দীকার গোষ্ঠী রঙ্গনা থিয়েটার ভাড়া নিয়ে প্রায় পেশাদারি প্রথায় গ্রুপ থিয়েটারের নাটক করা শুরু করল। প্রতি সপ্তাহের শনি, রবি ও বৃহস্পতিবার নিয়মিত নাটকের অভিনয় আরম্ভ হলো। 'তিন পয়সার পালা' (১৯৭০-এর ৭ অক্টোবর) নাটক দিয়ে তাদের রঙ্গনায় অভিনয়ের প্রথম পদক্ষেপ। কলকাতায় তখন গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনে জার্মান নাট্যকার ও প্রযোজক বারটোল্ট ব্রেখটের চর্চা রীতিমতো চলছে। ব্রেখটের নাটক 'থ্রি পেনী অপেরা' অবলম্বনে বাংলা রূপান্তর 'তিন পয়সার পালা' নাটক। অনুবাদ ও রূপান্তর করলেন অজিতেশ এবং অভিনয়ে অংশগ্রহণ করলেন নান্দীকার গোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ। নির্দেশনায় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রঙ্গনায় রাতারাতি জনপ্রিয়তা অর্জন করল নান্দীকার। উত্তর কলকাতায় বাণিজ্যিক থিয়েটারের পরিবেশে রঙ্গনায় একটি গ্রুপ থিয়েটারের এই ধরনের প্রয়াস জনসমর্থন লাভে ধন্য হলো।

মনে রাখতে হবে, ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে এইভাবেই প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার উৎপল দত্তের উদ্যোগে ও পরিচালনায় লিটল থিয়েটার গ্রুপ মিনার্ভা থিয়েটার মঞ্চে, উত্তর কলকাতার বাণিজ্যিক থিয়েটারের অঞ্চলে, গ্রুপ থিয়েটারের জয়যাত্রা শুরু করেছিল। সে এক সাফল্যের অনন্য ইতহাস। ধারাবাহিক ও নিয়মিত নানা নাটকের অভিনয়ে তখন মিনার্ভা প্রাণ ফিরে পেয়েছিল। সেই একই অনুপ্রেরণায় অজিতেশ ও নান্দীকারগোষ্ঠী রঙ্গনা মঞ্চে নিয়মিত অভিনয় শুরু করল। রঙ্গনার জন্মমুহূর্তেই এই প্রয়াস জনমানসে রঙ্গনাব প্রতিষ্ঠা সার্থক করে তুলল।

এখানে নান্দীকারের প্রযোজনায় ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় পরপর অভিনীত হলো শের আফগান (লুইজি পিরানদেল্লো), মঞ্জরী আমের মঞ্জরী (আন্তন চেখভ), নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র (লুইজি পিরানদেল্লো)। এগুলি নান্দীকারের আগের প্রযোজনা। সেই নাটকগুলিই রঙ্গনায় নান্দীকার অভিনয় করে যেতে লাগল নিয়মিত। তারপরে ব্রেখট অনুপ্রাণিত ভালোমানুষ (গুড উওম্যান অব সেৎজুয়ান অবলম্বনে)। নান্দীকারগোষ্ঠীর সব শিল্পীর অভিনয় ও অজিতেশের নির্দেশনায় ভালোমানুষ রঙ্গনার খ্যাতি অনেকাংশে বাড়িয়ে দিল। এখানে কেয়া চক্রবর্তীর (শ্বেতার ভূমিকায়) পুরুষ ও নারীচরিত্রের একাধারে অভিনয় অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। নান্দীকারের অন্যান্য কুশীলবের কথাও স্মরণযোগ্য। এছাড়া নান্দীকার অভিনয় করে বীতংস, হে সময় উত্তাল সময়।

নান্দীকার রঙ্গনায় ছিল একাদিক্রমে পাঁচ বৎসর। পুরো সময়টাই তাদের অভিনয়ের সার্থকতা ও সাফল্যের ইতহাস।

নান্দীকার রঙ্গনা থিয়েটার ছেড়ে দিলে (১৯৭৫) কর্ণধার গণেশ মুখোপাধ্যায় নিজে এখানে নিয়মিত অভিনয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁরই উদ্যেগে শুরু হলো 'নটনটী'। নাট্যরচনা ও পরিচালনায় রইলেন গণেশ মুখোপাধ্যায় নিজে।

প্রথম অভিনয় হলো ১০ অক্টোবর, ১৯৭৫ শুক্রবার, সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায়। প্রথমে প্রতি শুক্রবার সাড়ে ৬টা, শনিবার ৩টা ; রবি ও ছুটির দিন সকাল ১০টা। এইভাবে ৪৫বার অভিনয়ের পর দ্বিতীয় দফায় বৃহস্পতিবার সাড়ে ৬টা, শনিবার ৩টা এবং রবিবার ও ছুটির দিন ৩টা ও সাড়ে ৬টা। এভাবেই একটানা ৪৫৫ বার নাটকটি অভিনীত হয়।

সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন বিখ্যাত সুরকার অনিল বাগচি।

অভিনয়ে : গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মলিনা দেবী, সন্তোষ দত্ত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল দেব, দীপিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, বাসন্তী দেবী, গৌতম দে প্রমুখ।

'নটনটী' নাচে গানে অভিনয়ে জমে গিয়েছিল। বিগত শতকের থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জীবনযন্ত্রণা, জীবনযাপন এবং জীবনের ঘাত-অভিঘাত তৎকালীন রঙ্গমঞ্চের পরিবেশে গড়ে উঠেছে।

এরপরে অভিনীত হলো 'বহ্নি'। কাহিনী বনফুল। নাট্যরূপ ও পরিচালনা গণেশ মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালনায় অনিল বাগচি। প্রথম অভিনয় ১ জুলাই, ১৯৭৭, বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা। নাটকটির মোট অভিনয় হয়েছিল ৫০ বার। অভিনয় করেছিলেন--

সুজিত বসু, অরুণ মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ দত্ত, অসিতবরণ, শমিতা বিশ্বাস, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরিচালনায় সাহায্য করেছিলেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়।

'বহ্নি' অভিনয়ের সময়েই রঙ্গনার মালিকানা নিয়ে শরিকি বিরোধ শুরু হলো। কিন্তু সেই বিরোধের মধ্যেও রঙ্গনায় নাট্য প্রযোজনা থেমে থাকেনি। এই বিসংবাদের মধ্যেও দীর্ঘ দশ বৎসর রঙ্গনা বাংলার নাট্য ঐতিহ্য বহন করে চলেছিল। নভেম্বর ১৯৮৬ থেকে হাইকোর্টের নির্দেশে পাল পরিবার তাদের অংশ বিক্রি করে দিল। এবারে পুরো মালিকানা রইলো মুখার্জী পরিবারের হাতে।

শরিকি সংঘর্ষের সময়ে রঙ্গনার মূল প্রযোজকের দায়িত্ব নিয়েছিলেন হরিদাস সান্যাল। যশস্বী নাট্যকার ও পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্ত রঙ্গনার নাট্যাভিনয়ের ভার গ্রহণ করলেন। ১৯৭৮-এর ৭ অক্টোবর শরৎচন্দ্রের চন্দ্রনাথ উপন্যাসের নাট্যরূপ (ঃ দেবনারায়ণ গুপ্ত) মহাসমারোহে মঞ্চস্থ হলো। দেবনারায়ণ ও হরিদাস সান্যালের যৌথ উদ্যোগে রঙ্গনা আবার নবউদ্যমে নাটকাভিনয় শুরু করল।

প্রায় একবছর 'চন্দ্রনাথ' অভিনয়ের পর ১৯৭৯-এর ১২ জুলাই নামানো হলো 'জয় মা কালী বোর্ডিং'। নাট্যরূপ ও পরিচালনা দেবনারায়ণ গুপ্ত। তারপরে অঘটন, সুন্দরী লো সুন্দরী, দম্পতি, রাজদ্রোহী। মনোজ মিত্রের লেখা 'দম্পতি' (১৯৮৬) এখানে বেশ

সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। বাদবাকি সব কয়টি পুরনো এবং অন্যান্য থিয়েটারের মঞ্চসফল নাটক। সেইগুলিকেই রঙ্গনায় অভিনয় করে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিল।

১৯৮৬-এর শেষের দিকে মুখার্জী পরিবারের হাতে রঙ্গনার পুরো মালিকানা আসার পর ১৯৮৮ থেকে গণেশ মুখোপাধ্যায় পুনরায় রঙ্গনার নাট্যাভিনয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে এবার শুরু হলো 'জয়জয়ন্তী'। নাটক ও পরিচালনা গণেশ মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত--কল্যাণ সেন বরাট। প্রথম অভিনয় হলো ১৯ জুন, ১৯৮৮ রবিবার, সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা। মোট অভিনয় হয়েছিল ৪০০ বার। অভিনয় করেছিলেন শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, প্রেমাংশু বোস, অভিষেক চট্টোপাধ্যায়, অরিন্দম গাঙ্গুলি, নিমু ভৌমিক, বাসবী নন্দী, গীতা দে, নন্দিনী মালিয়া।

রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' অবলম্বনে 'কি বিভ্রাট' নাটকের প্রথম অভিনয় হলো ১৫ এপ্রিল, ১৯৯০ রবিবার, বেলা ৩টা। নাটকটি লিখলেন গণেশ মুখোপাধ্যায়। পরিচালনাও তাঁরই। সঙ্গীত কল্যাণ সেন বরাট। সেই সময়ে এই মজার নাটক চলেছিল খুব ভালোই। টানা প্রায় ৮০০ রজনী। অভিনয়ে--অনুপকুমার, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক চট্টোপাধ্যায়, অরিন্দম গাঙ্গুলি, নিমু ভৌমিক, গীতা দে, অলকা গাঙ্গুলি, রত্না ঘোষাল প্রমুখ।

এরপরে 'মোসাহেব' নাটক অভিনীত হলো রঙ্গনায়। প্রথম অভিনয় হলো ১৪ এপ্রিল, ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে, বুধবার ৩টায়। কাহিনী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের। নাট্যরূপ ও পরিচালনা--গণেশ মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত কল্যাণ সেন বরাট। মোট অভিনয় হয়েছিল ৪৫৭ রজনী। অভিনয়ে চিন্ময় রায়, জর্জ বেকার, দেবরাজ রায়, নিমু ভৌমিক, গীতা দে, নয়না দাস, পাপিয়া অধিকারী প্রমুখ।

তারপরে 'বাদশাহী চাল'। নাটকটি শৈলেশ গুহ নিয়োগীর লেখা। সম্পাদনা ও পরিচালনায় গণেশ মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত কল্যাণ সেন বরাট। প্রথম অভিনয় হয়েছিল ১৯৯৫-এর ২ জানুয়ারি, রবিবার বেলা ৩টায়। অভিনয়ে ছিলেন নিমু ভৌমিক, চিন্ময় রায়, অরিন্দম গাঙ্গুলি, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, নয়না দাস, গীতা দে, শাশ্বতী রায়।

'বিয়ের সানাই' সম্পাদনা ও নির্দেশনা গণেশ মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত কল্যাণ সেন বরাট। প্রথম অভিনয় ১৫ আগস্ট, ১৯৯৬। অভিনয়ে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময় রায়, চৈতী ঘোষাল, ধীমান চক্রবর্তী, শাশ্বতী রায়।

১৯৯৮ থেকে রঙ্গনায় নাট্য প্রযোজনার দায়িত্ব নেয় 'নিভা আর্টস' নামে এক সংস্থা। তাদের প্রযোজনায় প্রথম অভিনীত হয় 'পাকে চক্রে'। নির্দেশনা অশোক চ্যাটার্জী। সঙ্গীত দেবজিত। প্রথম অভিনয় ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮। অভিনয়ে জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, সমীর মজুমদার, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়।

তারপরে 'জোয়ারভাঁটা'। নিভা আর্টসের প্রযোজনায়। প্রথম অভিনয় ১৪ অক্টোবর, ১৯৯৯। জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়ের উপদেশনায় এবং অশোক চ্যাটার্জীর পরিচালনায়

নাটকটি অভিনীত হয়। অভিনয় করেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, সুনীল মুখোপাধ্যায়, সমীর মজুমদার, গীতা নাথ প্রমুখ।

রঙ্গনার সব নাটকের আলো ও মঞ্চের দায়িত্বে ছিলেন হীরক মুখোপাধ্যায়।

এরপরে আবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন গণেশ মুখোপাধ্যায়। তিনি নানাভাবে রঙ্গালয়টিকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কখনো নিজে প্রযোজনা করছেন, কখনো বা অন্য কোনো দলকে ডেকে এনে অভিনয়ের ব্যবস্থা করছেন। উত্তর কলকাতার প্রায় সব পেশাদারি থিয়েটার যখন একে একে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, তখন নিরলস প্রচেষ্টায় এই ধরনের একটি থিয়েটার নিরবচ্ছিন্ন চালু রাখা নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ।

২০০২-এর শারদীয় পূজার সময় গ্রুপ থিয়েটারের প্রখ্যাত তিনটি নাট্যদলকে নিয়ে এসে রঙ্গনায় প্রতি সপ্তাহে শনি, রবি ও বৃহস্পতিবার অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। দর্শক আনুকূল্যও জুটেছিল। কিন্তু কিছুদিন পরেই সে উদ্যোগ বন্ধ হয়ে যায়।

উপযুক্ত দৃশ্যপট এবং সুনিপুণ আলো ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সাজসজ্জা রঙ্গনার অভিনয়ের গৌরববৃদ্ধি করেছে। 'জয়জয়ন্তী' নাটকে পেশাদারি মঞ্চে 'লাইভ সঙ'-এর পুনঃপ্রবর্তন করা হয়। মঞ্চে লাইভ সঙ-এর ব্যবহার বাংলা ব্যবসায়িক থিয়েটার থেকে বিলুপ্ত হতে বসেছিল। আগে এর চল খুবই ছিল। রঙ্গনায় সেই ঐতিহ্য এখনো প্রবহমান।

উত্তর কলকাতার পেশাদারি তথা বাণিজ্যিক থিয়েটারের পরিমণ্ডলে ১৯৭০-৮০-'র দশকে যে সমস্ত সস্তা চটকদারি সংস্কৃতির নামে যথেচ্ছাচারের প্রয়োগ চলছিল, রঙ্গনা তার মূর্ত প্রতিবাদ হিসেবে এইসব নাটক অভিনয় করে যেতে থাকে। সুস্থ সংস্কৃতি, নির্মল মজা, আনন্দ এবং নাটকীয় ঘটনায় পূর্ণ সব নাটকের অভিনয় দর্শকদেরও খুশি করেছে।

দীর্ঘ পঁচিশ বছরের বেশি সময় ধরে রঙ্গনা থিয়েটার নানা উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে সুস্থ সংস্কৃতি ও নির্মল নাট্যঐতিহ্যের ধারাকে সংগ্রামী দৃঢ়তায় রক্ষা করে চলেছে।

এক. রঙ্গনার পঁচিশ বছরের ইতিহাসে দেখা যায়, সেখানে যেমন বিশুদ্ধ প্রমোদের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তেমনি বাণিজ্যসফল প্রযোজনার দিকেও নজর দিয়েছে। বাণিজ্য ও বিশুদ্ধ প্রমোদের চিরকালীন বিবাদ মিটিয়ে মঞ্চসফল নাটক করার চেষ্টা করেছে।

দুই. রঙ্গনা থিয়েটারেই গ্রুপ থিয়েটারের নান্দীকার গোষ্ঠী একাদিক্রমে পাঁচবছর ভিন্ন স্বাদের নাটক অভিনয় করে বাণিজ্যিক থিয়েটারের ধ্যানধারণাকে পাল্টে দিয়েছিল। বিদেশী নাটকের বঙ্গীকরণ এবং দৃপ্ত অভিনয় ও সুনিপুণ পরিচালনা যে ব্যবসায়িক মঞ্চেও সফলভাবে করা যায়, তার প্রমাণ নান্দীকার রঙ্গনায় করে দেখিয়েছিল।

তিন. তবুও বলা যায়, আধুনিক নাট্যভাবনা ও প্রযোজনা গ্রুপ থিয়েটারের মাধ্যমে যেভাবে প্রসারলাভ করে চলেছে, রঙ্গনায় নান্দীকারগোষ্ঠী যে বাতাবরণ

গোড়াতেই তৈরি করে দিয়েছিল, রঙ্গনা সেই ধারা থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছে। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নান্দীকারের চেষ্টায় যে নবতম প্রচেষ্টা রঙ্গনায় শুরু হয়েছিল সেই ধারা রঙ্গনা কর্তৃপক্ষ বজায় রাখতে পারেনি।

চার. এই সময়ে উত্তর কলকাতা অঞ্চলের পেশাদারি বাণিজ্যিক থিয়েটারের মধ্যে প্রবলভাবে যে ক্যাবারে নৃত্য তথা অশ্লীল অপসংস্কৃতির প্রসার ঘটে চলেছিল, রঙ্গনা অবশ্য তার থেকে সবসময় নিজেকে দূরে রেখে, বিশুদ্ধ প্রমোদ ও নাটকীয় উত্তেজনা ও সংঘাত বিতরণের চেষ্টা করেছে।

পাঁচ. সমসাময়িক আধুনিক নাট্যভাবনার সঙ্গে কিন্তু রঙ্গনা কখনোই নিজেকে জড়িত করতে পারেনি।

এখনো (২০০৩) রঙ্গনা কর্তৃপক্ষ কখনো নিজেরাই নাট্যাভিনয়ের প্রযোজনা করছেন, অথবা অন্য কোনো প্রযোজককে ভাড়া দিয়ে অভিনয় চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে চলেছেন।

কয়েকটি স্বল্পস্থায়ী গৌণ নাট্যশালা

উনিশ ও বিশ শতকের উল্লেখযোগ্য, দীর্ঘস্থায়ী ও প্রভাবশালী নাট্যশালাগুলির পাশে পাশে বেশ কয়েকটি স্বল্পস্থায়ী ও গৌণ নাট্যশালার ও তাদের নাটকাভিনয়ের খবর পাওয়া যায়। ইতিহাসের ধারা পরিপূরণে এদের অবদান হয়তো বিপুল বা ব্যাপক নয়, কিংবা একেবারেই গতানুগতিক, তাহলেও সেই ধরনের কয়েকটি প্রয়াসের কথা আলোচনা না করলে তদানীন্তন নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা ও নাট্যাভিনয়ের উদ্যোগ ও হৃদস্পন্দন বুঝে ওঠা যাবে না। সাধারণ রঙ্গালয়ের চরিত্রবৈশিষ্ট্য নিয়েই এগুলি গড়ে উঠেছিল।

এক. মনোমোহন থিয়েটার (১৯১৫-২৪)।

বিশিষ্ট ব্যবসায়ি মনোমোহন পাঁড়ে থিয়েটারটির প্রতিষ্ঠা করেন। এমারেল্ড থিয়েটার বাড়িতে কোহিনুর থিয়েটার চলছিল। মনোমোহন লক্ষাধিক টাকায় এই থিয়েটারটি কিনে সেখানে মনোমোহন থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে কোহিনূর নামেই চালু করেন। পরে সেখানে মিনার্ভা মঞ্চের লোকজন নিয়ে গিয়ে মিনার্ভার নামে অভিনয় শুরু করেন। মনোমোহনের উদ্বোধন হল ১৯১৫-এর ১০ সেপ্টেম্বর, গিরিশের 'কালাপাহাড়' এবং সুরেশচন্দ্র রায়ের 'রূপোর ফাঁদ' নাটক দিয়ে। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন তারাসুন্দরী, দানীবাবু, প্রিয়নাথ ঘোষ প্রমুখ। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'ভীষ্ম', 'পলিন' ও অতুল মিত্রের 'শিরী-ফরহাদ' নাটক দিয়ে এর যাত্রা শুরু হল। ১ সেপ্টেম্বর থেকে নাম রাখা হলো মনোমোহন থিয়েটার। সেদিন একসঙ্গে বেশ কয়েকটি নাটক, যেমন ভীষ্ম, ধ্রুবচরিত্র—বড়ো নাটক এবং জন্মাষ্টমী, নন্দবিদায়, চতুরালী প্রভৃতি ছোট গীতিনাট্য অভিনীত হয়। সেই সময় থেকে চুনীলালদেব, তিনকড়ি এখানে যোগ দেন। তারপর থেকে পর পর বেশ কয়েকটি নাটক এখানে অভিনীত হয়। দানীবাবু ২৫০ টাকা বেতনে ম্যানেজার ছিলেন।

ক্ষীরোদপ্রসাদের 'বাদশাজাদী', নিশিকান্ত বসুরায়ের 'বাপ্পারাও', দাশরথি মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠহার, হরিনাথবাবুর 'কবীর', সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মোগল-পাঠান', গিরিশের 'চণ্ড', বঙ্কিমের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের নাট্যরূপ, ১৯১৭ পর্যন্ত খুবই সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়।

১৯১৮-তে এসে দেবলা দেবী (নিশিকান্ত বসুরায়) খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯১৯-এ 'পারদর্শী' (পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়), ১৯২০-তে 'হিন্দুবীর' (সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায়), উল্লেখযোগ্য অভিনয়। এছাড়া 'পানিপথ', 'বিষবৃক্ষ' প্রভৃতি অভিনয় ভালো হয়েছিল। ১৯২৪ পর্যন্ত এইভাবে মনোমোহন থিয়েটার তার অভিনয় চালিয়ে যায়। শেষের দিকে অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়ে। মনোমোহন নিজে অসুস্থ থাকায়

ভালোভাবে নজর দিতেও পারেননি। শেষে শিশির ভাদুড়ি এই থিয়েটার লীজ নিয়ে সেখানে খোলেন 'নাট্যমন্দির', ১৯২৪-এর এপ্রিল মাসে। মনোমোহন থিয়েটারের প্রথম পর্বের ইতিহাস এখানেই শেষ।

এই থিয়েটার নতুন কোনো উল্লেখযোগ্য নাটকের অভিনয় করতে পারেনি, অন্তত প্রথম পর্বে। তবুও তার মধ্যে পূর্ব অভিনীত নাটকগুলির কয়েকটি এখানে সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করে। এখানে প্রধান অভিনেতা দানীবাবুর বাবর শা (পানিপথ), খিজির খাঁ (দেবলা দেবী), হিমু (হিন্দুবীর), নগেন্দ্র (বিষবৃক্ষ) অভিনয় উচ্চমানের খ্যাতিলাভ করেছিল। সাধারণ নাটকও শুধু অভিনয়ের আকর্ষণে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

বিষবৃক্ষ অভিনয়ের সময়ে এখানে নাটকের বিশেষ কয়েকটি দৃশ্য নতুন আমদানীকৃত নির্বাক চলচ্চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়েছিল। অন্য থিয়েটারগুলিও এর আগে এই কাজ করেছিল। টিকিট বিক্রির লোভে মনোমোহনও এই পথে পা বাড়িয়েছিল। সাধারণ রঙ্গালয়ের ইতিহাসে মনোমোহন থিয়েটার কোনো নতুন নাটক, নাট্যকার বা নাট্যাভিনয়ের পথ প্রদর্শন করতে পারেনি। গতানুগতিকতার পথে এর যাত্রা শুরু ও শেষ।

দ্বিতীয় পর্ব প্রবোধচন্দ্র গুহের আমল। ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাস থেকে প্রবোধচন্দ্র গুহ এককভাবে মনোমোহন থিয়েটারের পরিচালনার দায়িত্ব নেন। তাঁরই নেতৃত্বে পথের শেষে (নিশিকান্ত বসু রায়), গৈরিক পতাকা (শচীন সেনগুপ্ত), কারাগার (মন্মথ রায়) প্রভৃতি পূর্ব অভিনীত ও জনপ্রিয় নাটকগুলির অভিনয় হয়েছিল।

শচীন সেনগুপ্তের 'রক্তকমল' এখানে প্রথম অভিনীত হয় (২-৬-২৯)। এই নাটকের সব কয়টি গানের রচয়িতা এবং সুরকার নজরুল ইসলাম। পূরবী চরিত্রে ইন্দু বালার কণ্ঠে গানগুলি সেই সময়ে খুবই জনপ্রিয় হয়। নির্মলেন্দু লাহিড়ী (দাদামশায়), বিশ্বনাথ ভাদুড়ি (পতিতপ্রসন্ন), সরযূবালা (মমতা) অভিনয় করেন। সেই আমলে সাধারণ রঙ্গালয়ে রক্তকমলের মতো একাঙ্ক নাটকের অভিনয় খুবই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

মন্মথ রায়ের 'মহুয়া' এখানে প্রথম মঞ্চস্থ হয় (৩১-১২-২৯)। এতে নির্মলেন্দু লাহিড়ী (হুমড়ো সর্দার), দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (নদের চাঁদ), ইন্দুবালা (রাধু পাগলি), সরযূবালা (মহুয়া) চরিত্রে অভিনয় করেন। এই নাটকেও নজরুল গীতরচনা ও সুর সংযোজনায় কৃতিত্ব দেখান।

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জাহাঙ্গীর (২৫-১২-২৯) এখানে প্রথম অভিনীত হয়। এই নাটকের জন্য নজরুল একটি গান লিখে দেন। দানীবাবু (জাহাঙ্গীর), নির্মলেন্দু (সাজাহান), শশিমুখী (নুরজাহান), দুর্গাদাস (যশোবন্ত সিংহ) উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন। অল্পবয়সী আওরঙ্গজেব এবং হুঁসিয়ার চরিত্রে আঙুরবালা ও ইন্দুবালা অভিনয় করে মাতিয়ে দেন।

রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তির উপায়' (ঐ নামের গল্পের রবীন্দ্রনাথকৃত নাট্যরূপ) এখানে

অভিনীত হলো (১৭-৫-৩০)। প্রবোধচন্দ্র গুহের উদ্যোগেই এই অভিনয়ের আয়োজন। অভিনয় করেন রাধিকানন্দ (ফকির), দুর্গাদাস (মাখনলাল), নীহারবালা (হৈমবতী)। অনেক আগে স্টারে 'দশচক্র' নামে একই গল্পের নাট্যরূপ (সৌরীন্দ্রমোহন) অভিনীত হয়েছিল।

দুই. ইউনিক থিয়েটার (১৯০৩)।

বিডন স্ট্রিটের বেঙ্গল থিয়েটার বাড়ি লীজ নিয়ে গিরিমোহন মল্লিক ইউনিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। সতীশ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ম্যানেজার। স্টেজ ম্যানেজার ধর্মদাস সুর। পুরনো কিছু শিল্পী নিয়ে নাট্যদল তৈরি হলো। দানীবাবু, চুনীলালদেব, তারাসুন্দরী, সুশীলাবালা, ক্ষেত্রমোহন মিত্র, শরৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এদের দলে রইলেন। উদ্বোধন হলো ১৯৩০-এর ৬ জুন। সতীশ চট্টোপাধ্যায়ের নাটক 'রত্নমালা' অভিনীত হলো।

মোট আটমাস স্থায়ী এই রঙ্গমঞ্চে নানা ধরনের নাটক, গীতিনাট্য, পঞ্চরং, প্রহসন অভিনীত হয়েছিল। ঐতিহাসিক, সামাজিক, পৌরাণিক সব বিষয়ের নাটকই এখানে অভিনীত হয়। অভিনীত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটক হলো—বিবাহ বিভ্রাট ও তরুবালা (অমৃতলাল)। আবু হোসেন, বিল্বমঙ্গল, জনা, নলদময়ন্তী (গিরিশচন্দ্র)। রত্নমালা, নতুনবাবু, জাহানারা (সতীশ চট্টোপাধ্যায়)। আলিবাবা (ক্ষীরোদপ্রসাদ)। তারাবাঈ (দ্বিজেন্দ্রলাল)।

১৮ই নভেম্বর, ১৯০৩ নলদময়ন্তী-ও আলিবাবার অভিনয়ের সময় থেকে ম্যানেজার সতীশচন্দ্র চলে যান, অংশীদার ও ম্যানেজার হলেন দানীবাবু ও চুনীলাল দেব। তবে আর বেশীদিন 'ইউনিক' চলেনি। সতীশ চট্টোপাধ্যায়ের 'জাহানারা' নাটকই এখানে শেষ অভিনয়। তারপরেই ইউনিক বন্ধ হয়ে যায়। স্বত্ব বিক্রি করে মালিকেরা এবং শিল্পীরাও স্থানান্তরে যোগ দেন।

একেবারেই ক্ষণস্থায়ী ইউনিক থিয়েটারের কোনোদিক দিয়েই কোনোরকম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেই।

তিন. গ্রান্ড ন্যাশনাল থিয়েটার (১৯১১-১৫)।

বেঙ্গল থিয়েটারের বাড়িতে চুনীলালদেব গ্রান্ড ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন, ১৯১১-এর ৯ ডিসেম্বর। অভিনীত হয় 'রাজলক্ষ্মী' নাটক। বাংলা থিয়েটারের পরিচিত সব শিল্পী এসে জড়ো হয়েছিলেন। চুনীলাল, নিখিলকৃষ্ণদেব, নেপা বোস, মন্মথনাথ পাল, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, লীলাবতী, সরোজিনী, বসন্তকুমারী, কুসুমকুমারী, (বিষাদ) প্রভৃতি। প্রায় তিনবছর এই রঙ্গালয়টি একটানা অভিনয় চালিয়ে যায়। প্রায় পঞ্চাশটি নাটক, অপেরা, প্রহসন এখানে অভিনীত হয়েছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো—দীনবন্ধুর 'জেনানা যুদ্ধ' ; মনোমোহন গোস্বামীর পৃথ্বিরাজ, রিজিয়া ; গিরিশের আবু হোসেন, হীরার

ফুল, নলদময়ন্তী, পাণ্ডবগৌরব, চৈতন্যলীলা, রূপসনাতন ; দ্বিজেন্দ্রলালের তারাবাঈ ; ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রমোদরঞ্জন, আলিবাবা ; চুনীলালদেবের বাহবা, গুলরুজেরিনা, নবাবনন্দিনী ; বঙ্কিমের উপন্যাস দেবীচৌধুরাণী, কৃষ্ণকান্তের উইল (ভ্রমর) ইত্যাদির নাট্যরূপ ; রাজকৃষ্ণ রায়ের বনবীর ইত্যাদি নাটক খুবই সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করে। চুনীলালদেবের নবাবনন্দিনী (দামোদর মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে লেখা) নাটকটি পুলিশের নির্দেশে অভিনয় বন্ধ রাখতে হয় এবং বেশ কিছু অংশ বাদ দিয়ে তবে অভিনয়ের অনুমতি পাওয়া যায়। ১৯১২-এর ফেব্রুয়ারি মাসে গ্রান্ড ন্যাশনাল কিছুদিন কলকাতার বাইরে নানা অঞ্চলে অভিনয় করতে যায়। ফিরে এসে মার্চ মাস থেকে অভিনয় শুরু করে। আবার ১৯১৩-এর ফেব্রুয়ারি মাসে পঞ্চকোটের রাজবাড়িতে অভিনয় করতে যায়। ফিরে এসে কলকাতায় অভিনয় করে গিরিশের চৈতন্যলীলা, রূপসনাতন, আবু হোসেন ; হরিশ্চন্দ্র সান্যালের ভীষ্ম, কপালকুণ্ডলার নাট্যরূপ, অমৃতলাল বসুর চোরের উপর বাটপাড়ি ; চুনীলালের আলুবকরা, তিনটি আপেল প্রভৃতি নাটক। ১৯১৫ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত গ্রান্ড ন্যাশনাল অভিনয় চালিয়ে যায়। ক্রমে এই নাট্যদল স্টার থিয়েটারের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে অভিনয় শুরু করে। শেষ পর্যন্ত প্রায় সব শিল্পীই চুনীলালদেবের সঙ্গে স্টার থিয়েটারে যোগ দেন। গ্রান্ড ন্যাশনালের অভিনয় শেষ হয়ে যায়।

এখানে প্রায় সবই পুরনো নাটকের অভিনয় হয়েছিল। অখ্যাতনামা নাট্যকারদের কয়েকটি নতুন নাটক এখানে অভিনীত হয়। পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক নাটক, গীতিনাট্য-অপেরা এবং পঞ্চরং-প্রহসন এখানে অভিনীত হয়েছিল। বঙ্কিমের কয়েকটি উপন্যাসের নাট্যরূপও অভিনীত হয়েছিল। নাচে গানে নৃপেন বোস, কুসুমকুমারী এবং অভিনয়ে চুনীলাল দেব, মন্মথনাথ পাল, কুসুমকুমারী খুবই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। স্বল্পস্থায়ী গ্রান্ড ন্যাশনাল থিয়েটারের আর কোনো উল্লেখযোগ্য সংবাদ নেই।

চার. থেসপিয়ান টেম্পল (১৯১৫-১৬)।

বেঙ্গল থিয়েটারের বাড়িতে থেসপিয়ান টেম্পল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন ক্ষেত্রমোহন মিত্র। তিনি স্টার থিয়েটারের অভিনেতা ছিলেন। গ্রান্ড ন্যাশনাল থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেলে ক্ষেত্রমোহন সেখানে লেসী ও ম্যানেজার হন। ১৯১৫-এর ৭ আগস্ট নূরমহল (হরিমোহন মুখোপাধ্যায়) নাটক দিয়ে এই থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। এখানে নাট্যদলের শিল্পীরা হলেন ক্ষেত্রমোহন মিত্র, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল (মণ্টুবাবু), ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায়, রামকালী বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণ ঘোষ, তিনকড়ি, হরিসুন্দরী (ব্লাকী) প্রভৃতি।

এর আগের গ্রান্ড ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত বেশিরভাগ নাটকই এখানে অভিনীত হয়। এবং সেই গতানুগতিক ঐতিহাসিক-পৌরাণিক-সামাজিক নাটক ও গীতিনাট্য প্রহসনের অভিনয় চলতে থাকে। বছরখানেক স্থায়ী এই মঞ্চে এই ধরনের প্রায় পঞ্চাশটি নাটকের অভিনয় হয়।

উল্লেখযোগ্য নাটকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রাজা ও রাণী, নারায়ণ বসুর হাম্বীর, হরিপদ মুখোপাধ্যায়ের রাণী দুর্গাবতী, রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের রমা (হেনরি উড-এর 'ইস্টলিন'-এর নাট্যরূপ), পলাশীর যুদ্ধ, আলিবাবা, জয়দেব (হরিপদ চট্টোপাধ্যায়), উভয় সঙ্কট (রামনারায়ণ), দুর্গেশনন্দিনী ও বিষবৃক্ষের নাট্যরূপ, ক্ষীরোদপ্রসাদের চাঁদবিবি, গিরিশের আলাদীন, বিল্বমঙ্গল, দক্ষযজ্ঞ, মেঘনাদবধের নাট্যরূপ, রামকালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাজীরাও এখানে অভিনীত হয়।

১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ এপ্রিল এই থিয়েটারে শেষ অভিনয় হয়। গতানুগতিক ধারায় বহু অভিনীত পুরনো নাটকের অভিনয় এখানে হয়েছিল। নতুন নাটক, নাট্যকার বা নতুন অভিনয় ধারা সৃষ্টি করার মতো কোনোরকম উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা এই থিয়েটারে লক্ষ্য করা যায় না। বরং দর্শক বাড়াবার জন্য এখানে টিকিটের দাম কমিয়ে অর্ধেক করা হয়। তখনকার অন্য অনেক থিয়েটারের মতো 'বায়স্কোপ' দেখাবার ব্যবস্থা করা হয়। তবে এই থেসপিয়ান টেম্পলেই পরবর্তীকালের খ্যাতিমান নাট্যকার ও অভিনেতা যোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রথম মঞ্চাবতরণ করেন। রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রমা' নাটকে সেনাপতির চরিত্রে সাধারণ রঙ্গালয়ে তাঁর প্রথম অভিনয়।

পাঁচ. প্রেসিডেন্সি থিয়েটার (১৯১৭-১৮)।

প্রেসিডেন্সি থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয় বেঙ্গল থিয়েটার মঞ্চে। প্রতিষ্ঠা করেন পি. সি. চ্যাটার্জি নামে এক ভদ্রলোক। থিয়েটার কোম্পানী লিমিটিড তৈরি করে তার ম্যানেজিং ডিরেক্টার পি. সি. চ্যাটার্জী নতুন সব অভিনেতা-অভিনেত্রী নিয়ে নাট্যদল তৈরি করেন। তারাই বেঙ্গল থিয়েটার মঞ্চে থেসপিয়ান থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেলে, সেখানে প্রেসিডেন্সি থিয়েটার চালু করলেন। শিল্পীদের মধ্যে তারক পালিত, ভুবনেশ মুস্তাফি, অবিনাশ চট্টোপাধ্যায়, চারুশীলা, গোলাপসুন্দরী প্রভৃতি ছিলেন।

১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ অক্টোবর থিয়েটারের উদ্বোধন হয়. অভিনীত নাটক 'বাঙ্গালী পল্টন' (সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) ও 'নিশার স্বপন' গীতিনাট্য। 'নিশার স্বপন' গীতিনাট্যটি শেক্সপীয়রের 'এ মিডসামার নাইটস ড্রিম' অবলম্বনে তৈরি করা হয়। নাটক ও গীতিনাট্য দুটিরই প্রশংসা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

মোটামুটি ছয়মাস প্রেসিডেন্সি থিয়েটার চালু ছিল। তার মধ্যে গিরিশের 'প্রফুল্ল,' অমৃতলালের 'রাজাবাহাদুর', রাজকৃষ্ণ রায়ের 'মীরাবাঈ', অমরেন্দ্রনাথ দত্তের 'শ্রীকৃষ্ণ', বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের 'হাসনুহানা', চুনীলালদেবের 'কুব্জা ও দর্জি' এখানে অভিনীত হয়। ১৯১৭-এর অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে এগুলি অভিনীত হয়। তারপর মাস দুয়েক থিয়েটারে অভিনয় বন্ধ থাকে। আবার মার্চ মাস থেকে অভিনয় শুরু হয়। রণেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'কর্মবীর', অতুল মিত্রের 'হিরন্ময়ী', গিরিশচন্দ্রের 'দোললীলা' প্রভৃতি নাটক ও গীতিনাট্যের অভিনয় হয়েছিল।

১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসেই এই থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়।

ছয়. ন্যাশনাল থিয়েটার (১৯০৫-১০)।

বেঙ্গলমঞ্চে প্রতিষ্ঠিত আরেকটি থিয়েটার হলো 'ন্যাশনাল থিয়েটার'। ১৮৭২-এ প্রতিষ্ঠিত গৌরবময় ন্যাশনাল থিয়েটারের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। শুধু নামটুকু ছাড়া। বেঙ্গল মঞ্চ থেকে অরোরা ও ইউনিক থিয়েটার উঠে গেলে সেখানকারই শিল্পীরা এক হয়ে এই থিয়েটার গড়ে তোলেন। ইউনিকের ম্যানেজার সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রইলেন ম্যানেজার। উদ্বোধন হল ১৯০৫-এর ২ ডিসেম্বর। অভিনীত হলো রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অদৃষ্ট' নাটক। উল্লেখযোগ্য শিল্পীরা হলেন—তিনকড়ি, সুকুমারী, কুসুমকুমারী, তারাসুন্দরী, মানদাসুন্দরী, সতীশ চট্টোপাধ্যায়, শরৎ চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয় চক্রবর্তী, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, চুনীলালদেব, মনোমোহন গোস্বামী প্রমুখ।

এখানে নতুন ও পুরনো অনেক নাটক অভিনীত হয়। গিরিশের সীতার বনবাস, বিল্বমঙ্গল, নলদময়ন্তী, জনা, অমৃতলালের তরুবালা, ক্ষীরোদপ্রসাদের আলিবাবা প্রভৃতি পুরনো নাটকের সঙ্গে সঙ্গে মনোমোহন গোস্বামীর পৃথ্বিরাজ, সংসার, ছত্রপতি শিবাজী, মনোমোহন রায়ের রিজিয়া, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের 'বঙ্গবিজয়' প্রভৃতি নতুন নাটকও অভিনীত হয়।

১৯০৬-এর পর ম্যানেজার যখন জহরলাল ধর এবং পরে এন. সি. মল্লিক, তখন থেকেই এই ন্যাশনাল থিয়েটারে উপহার-প্রথা চালু হয়। টিকিটের দাম কমিয়ে, লাউ, কুমড়ো, কয়লা, ছাতা, গ্রন্থ উপহার দিয়েও 'ন্যাশনাল থিয়েটার' সেই সময়ের স্টার, মিনার্ভা, কোহিনূরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে অভিনয় বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। মজার মজার উপহার দিয়ে দর্শক-আকর্ষণের হাস্যকর প্রচেষ্টার জন্য এই 'ন্যাশনাল থিয়েটার' আলোচিত হয়। ১৯১০-এর ১৭ ডিসেম্বর এখানে শেষ অভিনয় হয়।

সাত. নাট্যনিকেতন (১৯৩১–১৯৪২)।

প্রবোধচন্দ্র গুহের উদ্যোগে 'নাট্যনিকেতন' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ মার্চ এই নাট্যগৃহের উদ্বোধন হয়। প্রথম নাটক 'ধ্রুবতারা' সেদিন অভিনীত হয়। যতীন্দ্রমোহন সিংহের উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। এই নাটকে দুটি রবীন্দ্রসঙ্গীত ব্যবহৃত হয়। বাকি গানগুলি লেখেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। সুর দিয়েছিলেন নজরুল। অভিনয়ে ছিলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, নীহারবালা প্রমুখ।

মন্মথ রায়ের 'সাবিত্রী' অভিনীত হয় ১৯৩১-এর মে মাসে (১৬ জ্যৈষ্ঠ. ১৩৩৮)। এই নাটকের সব গান লেখেন নজরুল এবং তিনিই সুর দেন। 'সাবিত্রী'র গানগুলি সে সময়ে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।

এরপরে মন্মথ রায়ের সাড়া জাগানো নাটক 'কারাগার' এখানে অভিনীত হয় ৮ আগস্ট, ১৯৩১। এই নাটকটি প্রথমে মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল (২৪.১২.৩০)। কিন্তু ১৮টি অভিনয়ের পর ব্রিটিশের রাজরোষে অভিনয় বন্ধ করে দিতে হয়, অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের জোরে। বন্ধ হয়ে যাওয়া এই নাটকটি নাট্যনিকেতনে

পুনরায় অভিনীত হতে থাকে। এখানেও 'কারাগার' সাফল্য লাভ করে।

১৯৩১-এর ১৪ নভেম্বর এখানে শচীন সেনগুপ্তের 'ঝড়ের রাতে' অভিনীত হয়। পরিচালক হিসেবে এই নাটকে সতু সেন প্রয়োগনৈপুণ্য ও শিল্প নির্দেশনা এবং আলোকসম্পাতে অভিনবত্ব সৃষ্টি করে কলারসিকের প্রশংসা অর্জন করেন। গানে সুর সংযোজনা করেন নজরুল। অভিনয়ে নির্মলেন্দু লাহিড়ী (প্রশান্ত) এবং নীহারবালা (বিজলী) খুবই কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। পরিচালক হিসেবে সতু সেনের খ্যাতি বৃদ্ধি হয়। নাটক খুবই প্রশংসা পায় এবং দর্শক আনুকূল্য লাভ করে।

নজরুলের গীতিনাট্য-রূপক 'আলেয়া' এখানে প্রথম অভিনীত হয়। ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৩১। নৃত্যগীতের মধ্য দিয়ে জীবনে প্রেমের রূপক এই নাটকে পরিবেশিত হয়েছে। নজরুলের লেখা গান এবং তাঁরই সুর এই গীতিনাট্যটিকে আস্বাদনীয় করে তুলেছিল।

১৯৩২ থেকে ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে এখানে সর্ব মোট ১৬টি নাটকের অভিনয় হয়। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো :

সতীতীর্থ (শচীন সেনগুপ্ত), মহাপ্রস্থান (সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত), অনুরূপা দেবী'র 'মা' উপন্যাসের নাট্যরূপ (ঃ অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়), চক্রব্যূহ (মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য), প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর উপন্যাস ব্রতচারিণী'র নাট্যরূপ (ঃ মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য), খনা (মন্মথ রায়) প্রভৃতি।

এই নাটকগুলি অভিনয়ে খুবই সাফল্য লাভ করে এবং নাট্যনিকেতনের নাট্য প্রযোজনার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়। আর্থিক সঙ্গতিও বৃদ্ধি পায়।

তা সত্ত্বেও প্রবোধচন্দ্র ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে নাট্যনিকেতনের পরিচালনভার হস্তান্তরিত করেন। 'ক্যালকাটা থিয়েটার্স লিমিটেড' দায়িত্ব গ্রহণ করে। যশোদানন্দন ঘোষ প্রধান হিসেবে এই থিয়েটার পরিচালনা করতে থাকেন।

যশোদানন্দনের নেতৃত্বে ক্যালকাটা থিয়েটার্স লিমিটেড এখানে প্রথম অভিনয় শুরু করে রমেশ গোস্বামীর 'কেদার রায়' নাটক দিয়ে, ১৯৩৬-এর ৪ এপ্রিল। 'কেদার রায়' সে সময়ে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।

তারপরে সুধীন্দ্রনাথ রাহার 'আলাদীন' নাটক অভিনীত হয়। এই নাটকেও নজরুল গান লিখে দিয়েছিলেন।

১৯৩৬-এর ১৯ ডিসেম্বর অভিনীত হয় রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের নাট্যরূপ (ঃ নরেশ মিত্র)। এছাড়া মন্মথ রায়ের 'সতী' নাটক এখানে অভিনীত হয় ১৯৩৭-এর ২৮ এপ্রিল। প্রযোজক হিসেবে তখন নরেশ মিত্র নাট্য নিকেতনের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেছেন। 'সতী' নাটকে নজরুল গীত রচনা ও সুর সংযোজনা করেন।

এবারে প্রবোধচন্দ্র গুহ আবার নাট্যনিকেতনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন ১৯৩৮-এর জুন মাস থেকে। পুনরুদ্যমে এবার নাট্যনিকেতন আবার চলা শুরু করে।

১৯৩৮-এর ২৯ জুন নামানো হলো শচীন সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌলা'। নতুন করে এখানে 'সিরাজদ্দৌলা'র অভিনয় শুরু হয়। এই নাটকের জন্য নজরুল গান লেখেন এবং

সুর দেন। নাটকটি পরিচালনা করেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী ও সতু সেন। অভিনয়ে-- নির্মলেন্দু (সিরাজ), রবি রায় (গোলাম হোসেন), নীহারবালা (আলেয়া), সরযূ দেবী (লুৎফাউন্নিসা)। প্রত্যেকেই অসামান্য অভিনয় করেন। নির্মলেন্দুর সিরাজ, রবি রায়ের গোলাম হোসেন এবং নীহারবালার আলেয়া বাংলা থিয়েটারের অভিনয়ের ধারায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

মন্মথ রায়ের 'মীরকাশিম' এখানে অভিনীত হয় ডিসেম্বর, ১৯৩৮। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস 'পথের দাবী'র নাট্যরূপ (ঃ শচীন সেনগুপ্ত) অভিনীত হয় ১৩ মে, ১৯৩৯। এখানেই প্রথম তারাশঙ্করের বিখ্যাত উপন্যাস 'কালিন্দী'র নাট্যরূপ (ঃ তারাশঙ্কর) অভিনয় করা হয়। প্রথম অভিনয় হয় ১৯৪১-এর ১২ জুলাই।

১৯৩৭-এ এখানে টিকিটের দাম কমানো হয় সিনেমার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে। অভিনয়ের সময়ও কমিয়ে আনা হয় সিনেমার মতো করে।

নাট্যনিকেতনে শচীন সেনগুপ্তের 'গৈরিক পতাকা' অভিনীত হয়েছিল। প্রবোধচন্দ্র গুহ পুলিশের সঙ্গে যোগসাজসে এক নির্দেশনামায় বলিয়ে নেন যে, নাটকটি রাজরোষে নিষিদ্ধ। পরে আবার এই আদেশ প্রত্যাহারও করে নেওয়া হয়। এবার নতুন করে নাটকটি নাট্যনিকেতনে অভিনয় শুরু হলে দর্শকের ভিড় ক্রমশই বাড়তে থাকে। দর্শক আকর্ষণের এ-এক অভিনব কৌশল সেদিন প্রবোধচন্দ্র গুহ নিয়েছিলেন।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও নাট্যনিকেতন ভালোভাবে চলছিল না। শেষ পর্যন্ত থিয়েটারটি ভাড়া দেওয়া হলো শিশিরকুমার ভাদুড়িকে। তিনি এই মঞ্চ ভাড়া নিয়ে সেখানে খোলেন তাঁর বিখ্যাত 'শ্রীরঙ্গম' ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে।

পরবর্তীকালে সেই থিয়েটার বাড়িতে 'বিশ্বরূপা' থিয়েটার গড়ে ওঠে। ২০০১-এর ১৪ নভেম্বর এই থিয়েটার বাড়ি অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেখানে অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়।

আট. কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ (১৯৫৪–১৯৮০)।

কলকাতার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে মাণিকতলার খালপুলের পাশে এই থিয়েটারটি অবস্থিত। প্রতিষ্ঠা করেন সমাজসেবিকা শ্যামমোহিনী দেবী। কাশী বিশ্বনাথ সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় এটি নির্মিত হয়। পাশেই ছিল তাদের একটি স্কুল এবং দেবমন্দির। তারই সংলগ্ন এই থিয়েটার বাড়িটি নির্মিত হয়। প্রথমে নাম দেওয়া হয় 'কাশী বিশ্বনাথ ইনস্টিটিউট'। ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে এই থিয়েটার বাড়ির নির্মাণ শেষ হয় এবং ১৯৫৪-এর ৩১ জানুয়ারি মঞ্চটির উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন তৎকালীন কংগ্রেসি ভূমি ও রাজস্ব মন্ত্রী সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

উদ্যোক্তাদের নিজস্ব নাট্যপ্রযোজনা না থাকাতে তাঁরা এই মঞ্চটি অন্য দলগুলিকে অভিনয়ের জন্য ভাড়া দিতে থাকেন। বিভিন্ন পেশাদার ও অপেশাদার নাট্যদল এ মঞ্চ ভাড়া নিয়ে অভিনয় করতে থাকে।

১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে খ্যাতনামা অভিনেতা-নাট্যকার-পরিচালক মহেন্দ্র গুপ্ত নিজস্ব নাট্যদল গঠন করে এখানে নিয়মিত অভিনয় আরম্ভ করেন। সেই সময়ে তিনি তাঁর এই নতুন মঞ্চে নাট্যাভিনয়ের যেসব বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে এবং অন্যত্র দিলেন, তাতে মঞ্চটিকে 'কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ' বলে উল্লেখ করা হতো। তাই থেকেই পূর্বের ইনস্টিটিউটের বদলে এই থিয়েটারের নাম প্রচারিত হয়ে যায় 'কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ'রূপে।

মহেন্দ্র গুপ্ত এখানে তাঁর কয়েকটি পুরনো নাটক অভিনয়ের ফাঁকে নতুন নাটক 'শাপমুক্তি' (১১.৪.১৯৬৩) এবং 'রাজা রামপাল' (২৫.৬.১৯৬৫) অভিনয় করেন। দুটি নাটকই মহেন্দ্র গুপ্তের রচনা এবং তাঁরই পরিচালনায় অভিনীত হয়।

পরে বিভিন্ন নাট্যদল মঞ্চটি ভাড়া নিয়ে তাঁদের নাটকাভিনয় করতে থাকে। ১৯৬৬-এর ২৬ অক্টোবর অভিনীত হয় 'এন্টনী কবিয়াল'। নাটকটি রচনা ও পরিচালনা করেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। প্রযোজনা করে 'নান্দিক' গোষ্ঠী। এন্টনী কবিয়ালের ভূমিকায় সবিতাব্রত দত্ত ও সৌদামিনীর চরিত্রে কেতকী দত্ত অসামান্য অভিনয় করেন। সবিতাব্রতের গাওয়া গানের গরিমায় নাটকটি আরো বেশি জমে যায়। ভোলা ময়রার ভূমিকায় প্রবীণ অভিনেতা জহর গাঙ্গুলি গানে এবং অভিনয়ে নতুন করে নিজেকে চিনিয়ে দেন। সুরারোপে ছিলেন অনিল বাগচি। টানা আড়াইবছর নাটকটি এখানে অভিনীত হয়। অভূতপূর্ব দর্শক সমাগমে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে রঙ্গালয়টি। 'কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ' জনমনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের নাট্যরূপ (: বিধায়ক ভট্টাচার্য) এখানে অভিনীত হয়, বিধায়ক ভট্টাচার্যের পরিচালনায়। প্রথম অভিনয় ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮।

এই নাটকটি কিছুদিন চলার পর 'নান্দিক গোষ্ঠী'র দ্বিতীয় প্রযোজনা 'নটী বিনোদিনী' অভিনীত হলো ১৯৬৯-এর মার্চ মাসে। নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য। পরিচালনা করেন প্রবীণ অভিনেতা কানু বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে সহায়তা করেন বিধায়ক ভট্টাচার্য।

ধনঞ্জয় বৈরাগী'র নাটক 'মুখোশের আড়ালে' এখানে অভিনীত হয় ১৯৭০-এর ১ জানুয়ারি। তিনিই (তরুণ রায় নামে) পরিচালনা করেন। তরুণ রায় নিজে এবং তাঁর স্ত্রী দীপান্বিতা রায় দুটি বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করেন। দিলীপকুমার রায়ের কাহিনী 'অঘটন আজো ঘটে' অবলম্বনে ধনঞ্জয় বৈরাগী নাটকটি লেখেন।

মাঝে অভিনীত হয় 'সওদাগর' (১ এপ্রিল, ১৯৭১)। সমরেশ বসুর কাহিনী অবলম্বনে নাটকটি তৈরি হয়েছিল। ১৯৭২-এর ২৩ ফেব্রুয়ারি 'দয়াল অপেরা' মঞ্চস্থ হলো। নাটকটি ধনঞ্জয় বৈরাগীর লেখা। তাঁরই (তরুণ রায় নামে) পরিচালনায় নাটকটি এখানে অসামান্য জনসম্বর্ধনা লাভ করে। সুরকার অনিল বাগচির সুরারোপিত গানগুলি খুবই জনপ্রিয় হয়। দলগত অভিনয়ে, প্রয়োগকুশলতায় এবং গানের ব্যবহারে এই নাটকটি খুবই সাফল্য লাভ করে।

এবারে অভিনীত হলো 'মল্লিকা'। জরাসন্ধের কাহিনীর নাট্যরূপ দিলেন বীরু মুখোপাধ্যায়। এখানে প্রথম অভিনীত হলো ১৯ নভেম্বর, ১৯৭২। এই সময় থেকেই

এই মঞ্চের পরিচালনায় একটা ধারাবাহিক পর্যায় শুরু হয়। এই সময়ে হরিদাস সান্যাল এই 'থিয়েটার হল'টি ভাড়া নেন এবং নিয়মিত অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন।

তাঁরই আমলে অভিনীত হলো 'মল্লিকা'। নাটকটি পরিচালনা করলেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়। মল্লিকা চরিত্রে অসামান্য অভিনয় করেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, সাধনা রায়চৌধুরী, অলকা গাঙ্গুলি উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন। আলোক সম্পাতে ছিলেন তাপস সেন। মঞ্চ নির্মাণে সুরেশ দত্ত। আবেগধর্মী এই নাটক, এক বন্দিনী নারীর বেদনার্ত জীবনের বঞ্চনার হাহাকার দর্শকদের আবেগাপ্লুত করে তুলেছিল। অভিনয়ে পরিচালনায় এবং মঞ্চের কুশলতায় নাটকটি দর্শকমনে সাড়া ফেলে দিয়েছিল।

তারাশঙ্করের উপন্যাস 'না' অবলম্বনে নাটক তৈরি করেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়। তাঁরই পরিচালনায় 'না'—নাটকটি মঞ্চস্থ হতে থাকে ৪ অক্টোবর, ১৯৭৫ থেকে। নাটকটি খুব বেশিদিন চলেনি।

বনফুল-এর কাহিনী অবলম্বনে 'অঘটন' নাটকটি নির্মিত হয়। নাট্যরূপ বীরু মুখোপাধ্যায়। পরিচালনা জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়। প্রথম অভিনয় হয় ২৫ নভেম্বর, ১৯৭৬। নাটকটি দীর্ঘদিন ধরে এখানে চলেছিল। ঘটনার চমক, অভিনয়ের কুশলতা, মঞ্চ নির্মাণের কৌশল এবং আলোর চমকে নাটকটি দর্শকমন জয় করে নিয়েছিল।

এখানে আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা 'নামজীবন'। নাট্যকার ও পরিচালক-- সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। এখানে অভিনয় শুরু হয় ২১ ডিসেম্বর, ১৯৭৮ থেকে। খুবই সাফল্য লাভ করে। পেশাদারি মঞ্চে এই ধরনের পরীক্ষামূলক নাটক সে সময়ে দর্শক আনুকূল্য এবং কলারসিকজনের প্রশংসা লাভ করেছিল। একটি ভাঙাচোরা দোতলা বাড়ির সেট, সামনে রাস্তা--ঘরের উঠান—এই একটি মাত্র সেট ব্যবহার করে, আলোর বিভাজনে বিভিন্ন স্থান নির্দিষ্ট করে নাটকটি অভিনীত হতো। সাধারণ রঙ্গালয়ে মঞ্চ ব্যবহারের এই নবতম পরীক্ষা খুবই আদৃত হয়েছিল। কাহিনীর গুণে, অভিনয়ের কৃতিত্বে এবং বাস্তবজীবনভাবনা উপস্থাপনে 'নামজীবন' যেমন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের তেমনি বাংলা রঙ্গালয়েরও. একটি মাইলস্টোন। অভিনয়ে সৌমিত্র এবং লিলি চক্রবর্তীর পারঙ্গমতা অবশ্যই স্বীকার্য।

১৯৮০-তে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে 'বেণী সংহার এখানে অভিনীত হয়েছিল। নাট্যরূপ বীরু মুখোপাধ্যায়। পরিচালনা জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়। প্রথম অভিনয় হলো ২ অক্টোবর, ১৯৮০। নাটকটি বেশিদিন চলেনি।

১৯৮০-এর দশকের পর থেকে কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ বন্ধ হয়েই আছে। সেখানে এখন মালপত্র রাখার গুদামঘর তৈরি হয়েছে! এখন অবধি সেখানে আর কোনো অভিনয়ের খবর নেই।

নয়. নাট্যভারতী (১৯৩৯–১৯৪৩)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোল তখন চলছে। ব্লাক-আউট, বোমাতঙ্ক, যুদ্ধের মহড়া, এই সব নিয়ে কলকাতা তখন আতঙ্কিত ও ভীতগ্রস্ত। এই অবস্থায় কলকাতার প্রচলিত রঙ্গালয়গুলিই খুব ভালোভাবে চলছে না, নাট্যাভিনয়ের প্রাবল্যও স্তিমিত হয়ে এসেছে।

এই সময়েই, ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে রঘুনাথ মল্লিক নাট্যভারতী প্রতিষ্ঠা করেন। হ্যারিসন রোডে (বর্তমান মহাত্মা গান্ধী রোড) কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের পাশের সিনেমা হলটিকে (বর্তমান গ্রেস সিনেমা) ভাড়া নিয়ে তিনি এখানে নতুন রঙ্গালয় তৈরি করেন।

উদ্বোধন হয় ১৯৩৯-এর ৫ আগস্ট। প্রথম নাটক শচীন সেনগুপ্তের বহু অভিনীত নাটক 'তটিনীর বিচার'। পরপর কয়েকটি পূর্বে অভিনীত পুরনো নাটক অভিনয়ের পর এখানে অভিনীত হয় নজরুল ইসলামের 'মধুমালা' নামে নৃত্যগীতবহুল নাটক। ১৯৩৯-এর ২০ অক্টোবর। তারপর ২৩ ডিসেম্বর অভিনীত হলো শচীন সেনগুপ্তের 'সংগ্রাম ও শান্তি'। ১৯৪০-এ শচীন সেনগুপ্তের 'নার্সিং হোম' (১৩ জুন), জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'সিঁথির সিঁদুর' (২৪ আগস্ট) এবং 'পি-ডবলু-ডি' (১ অক্টোবর), মনোজ বসুর 'প্লাবন' (১৯৪১-এর ২৪ জুলাই) প্রভৃতি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটক এখানে অভিনীত হয়।

১৯৪২-এর জানুয়ারি মাসে নাট্যভারতীর মালিক রঘুনাথ মল্লিক থিয়েটারের মালিকানা হস্তান্তর করেন। এবারে মালিক হলেন মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়। এবারে মালিক মুরলীধরের নেতৃত্বে থিয়েটার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন শিশির মল্লিক। নতুন করে থিয়েটার হল সংস্কার করা হয়। বিধি-ব্যবস্থা এবং আসন নতুন হলো। নতুন মালিক, নতুন ব্যবস্থা, নতুন মঞ্চ এবং নতুন পরিচালনায় এখানে ১৯৪২-এর ২৮ মে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক 'দুইপুরুষ' অভিনীত হলো। এই নাটকটি অন্য মঞ্চের মতো এখানেও খুবই খ্যাতিলাভ করে। উৎসাহিত হয়ে কর্তৃপক্ষ তারাশঙ্করের 'পথের ডাক', শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' (নাট্যরূপ : শচীন সেনগুপ্ত) অভিনয় করল। দুটি নাটকই সেভাবে না চলাতে এবারে নামানো হলো শচীন সেনগুপ্তের 'ধাত্রীপান্না'। অতিসত্বর নাটকটি জনসম্বর্ধনা লাভ করল। এই নাটকের প্রভূত সাফল্যে নাট্য ভারতীর আর্থিক অবস্থা ভালো হলো। নাট্যভারতীর খ্যাতি জনমুখে ছড়িয়ে পড়ল।

তা সত্ত্বেও মালিক মুরলীধর চট্টোপাধ্যায় থিয়েটার চালাতে রাজি না থাকায় নাট্যভারতী বরাবরের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। সেখানে গড়ে ওঠে বর্তমানের গ্রেস সিনেমা হল। নতুন আগত চলচ্চিত্রের আগ্রাসন নেমে আসে থিয়েটারের ওপর।

দশ. কালিকা থিয়েটার (১৯৪৪–১৯৫২)।

উত্তর কলকাতা অঞ্চল জুড়েই এতোদিন যতো পেশাদার সাধারণ রঙ্গালয়গুলি গড়ে উঠেছিল। এবারে দক্ষিণ কলকাতার কালীঘাট অঞ্চলে ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে কালিকা থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রধান উদ্যোক্তা এবং প্রতিষ্ঠাতা রামচন্দ্র চৌধুরী।

১৯৪৪-এর ২২ ডিসেম্বর শরৎচন্দ্রের উপন্যাস 'বৈকুণ্ঠের উইল'-এর নাট্যরূপ

(ঃ বিধায়ক ভট্টাচার্য) দিয়ে এই থিয়েটারের উদ্বোধন হয়।

প্রথম নাটকই এখানে জমে গেল। অসম্ভব জনপ্রিয়তা লাভ করার ফলে কালিকা থিয়েটারের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। উদ্যোক্তারাও উৎসাহিত হয়ে পরপর নাট্যাভিনয় করে যেতে থাকে। ১৯৪৫-এ ধীরেন্দ্র নারায়ণ রায়ের 'অচলপ্রেম' (১৭ ডিসেম্বর), ১৯৪৬-এ তারক মুখোপাধ্যায়ের 'রামপ্রসাদ' (২৭ নভেম্বর), ১৯৪৮-এ তারক মুখোপাধ্যায়ের 'যুগদেবতা' (১৯ নভেম্বর) অভিনীত হয়।

'রামপ্রসাদ' নাটক বেশ জমে গিয়েছিল এবং চলেও ছিল ভালো। তবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাহিনী অবলম্বনে নাটক 'যুগদেবতা' অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করল। উত্তর কলকাতার থিয়েটারের দর্শকেরাও দক্ষিণ কলকাতায় ভিড় করতে লাগল। 'যুগদেবতা' অনেক পেশাদার মঞ্চকে প্রভাবিত করেছিল।

তারক মুখোপাধ্যায়ের 'মীরাবাঈ'-এর অভিনয় শুরু হলো ২০শে জুলাই, ১৯৪৯। 'মীরাবাঈ' নাটকটিও গানে ও অভিনয়ে দর্শক মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়। পরেই শরৎচন্দ্রের উপন্যাস 'বিরাজবৌ'-এর নাট্যরূপ (ঃ কানাইবোস) অভিনীত হয় ২৩ নভেম্বর, ১৯৪৯। 'বিরাজ বৌ' সেভাবে না চলাতে এবারে ১৯৫০-এর গোড়ায় নামানো হলো '২৬ জানুয়ারি'। নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য। নাটকটি খুবই খ্যাতি অর্জন করে। অভিনয়, প্রয়োগ এবং সঙ্গীতে এই নাটক জনপ্রিয় হয়।

১৯৫০-এর আরেকটি প্রযোজনা 'কল্যাণী', তারক মুখোপাধ্যায়ের রচনা। অভিনীত হলো ১৮ মার্চ। নাটকটি একমাসের বেশি চলেনি। তাই ২৮ এপ্রিল নামানো হলো মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক 'কাজল গাঁয়ের মেয়ে'। এই নাটক তিনচার মাস চলার পরে অভিনীত হলো ঐ একই নাট্যকারের ঐতিহাসিক নাটক 'পেশোয়া মাধবরাও' (১৬.১২.১৯৫০)। এটিও খুব সার্থক হয়নি।

স্বাধীনতার বছরে (১৯৪৭) যেমন নামানো হয়েছিল 'স্বাধীনতার সাধনা' এবং 'যশোরেশ্বরী'—সেগুলি একেবারেই চলেনি। তেমনি পরবর্তী কালের এই নাটকগুলিও সাফল্য লাভ করেনি।

এবারে অভিনীত হলো তারাশঙ্করের নাটক 'দ্বীপান্তর'। অভিনীত হলো ১৯৫১-এর ৩০ মার্চ। কালিকা থিয়েটারের এটিই শেষ উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা। কয়েকমাস চলার পর এটির অভিনয় বন্ধ হয়। সঙ্গে সঙ্গে কালিকা থিয়েটারেরও দরজা বন্ধ হয়ে যায়। সাত বছর নিয়মিত চলার পর এই থিয়েটার আর্থিক অনটনে বন্ধ হয়ে যায়। তারপরে এই থিয়েটার সিনেমা হলে রূপান্তরিত হয়ে দরজা খোলে।

১৯৯০-এর দশকে কলকাতায় পেশাদারি থিয়েটার

১. বিশ্বরূপা : ২ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ
[২০০১-এর ১৪ নভেম্বর আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।]
২. নেতাজী মঞ্চ : রেল কোয়ার্টার, শিয়ালদহ.
৩. কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ : ২০/২ সি, ক্যানেল ওয়েস্ট রোড।
৪. মিনার্ভা থিয়েটার : ৬ বিডন স্ট্রিট।
৫. মুক্তাঙ্গন থিয়েটার : ১২৩, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড।
৬. প্রতাপ মেমোরিয়াল হল : রাজাবাজার।
৭. রামমোহন মঞ্চ : ২৬৬, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড।
৮. রঙ্গনা : ১৫৩/২ এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড।
৯. রঙমহল থিয়েটার : ৭৬/১, বিধান সরণী।
[২৮ আগস্ট, ২০০১ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়।]
১০. সারকারিনা : রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিট।
১১. স্টার থিয়েটার : ৭৯/৩/৪ বিধান সরণী।
[আগুন লেগে ভস্মীভূত হয়ে যায়, ইংরাজি মতে ১৩ অক্টোবর, মধ্যরাত্রে, ১-১০ মিঃ]
১২. থিয়েটার সেন্টার হল : ৩১ এ, চক্রবেড়িয়া রোড (দক্ষিণ)।
১৩. সুজাতা সদন : হাজরা রোড।
১৪. তপন থিয়েটার : ৩৭এ/বি, সদানন্দ রোড।
১৫. বয়েজ ওন লাইব্রেরি : পি-২৯, সি. আই. টি. স্কিম।
১৬. উত্তম মঞ্চ : ১০/১/১ মনোহরপুকুর রোড। কলকাতা-২৬।
১৭. বিজন থিয়েটার : শ্যামবাজার। রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিট।

বর্তমানে এই মঞ্চগুলি চালু থাকলেও, সবগুলিতে নিয়মিত অভিনয় হয় না। মালিকপক্ষ অনেক সময়েই কোনো নাট্যদলকে ভাড়া দেন। তারা সেখানে কিছুদিন অভিনয় করে। তারপর আবার বন্ধ থাকে। কোনোটা মালিকই চালান। কোনোটি আবার থিয়েটারের কর্মী ও শিল্পীবৃন্দ উদ্যোগী হয়ে চালান। কোনোটি সেই অর্থে পেশাদারিভাবে চালিত হয় না। কিছু আছে শুধু ভাড়াই খাটানো হয়। বেশিরভাগ পেশাদারি মঞ্চই এখন ঝিমিয়ে রয়েছে। পূর্বের সেই রমরমা ও জাঁকজমক এখন কোনো মঞ্চেরই নেই। গত বেশ কয়েক বছর ধরেই কোনো রঙ্গালয়েই তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য নাট্যাভিনয়ের খবর পাওয়া যায় না। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মাঝে মাঝে কোনো কোনো মঞ্চে একটু ব্যতিক্রমী কর্ম প্রয়াস দেখতে পাওয়া যায়। পেশাদারি থিয়েটারের এখন খুবই সঙ্কটজনক অবস্থা। টেলিভিশন, সিনেমা, ভি. ডি. ও-শো, যাত্রা এবং গ্রুপ থিয়েটারের

প্রাবল্যে বর্তমানে পেশাদারি থিয়েটারে অভিনয়ের বাজার একেবারেই মন্দা। তাই উৎসাহিত তেমন কোনো নাট্যাভিনয় এখানে সম্ভব হচ্ছে না। তবুও আশার কথা, ১৯৯৪-তেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'উত্তম মঞ্চ'।

তবুও বর্তমানকালের পেশাদারি থিয়েটারগুলির ইতিহাস লিখিত হওয়া উচিত। যদিও বর্তমানে এই থিয়েটার থেকে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য নাটক বা নাট্যকারেরও আবির্ভাব ঘটছে না। পেশাদারি থিয়েটার ১৯৮০-র দশক থেকে এতো নির্জীব হয়ে পড়েছে কেন, কেন এতো মার খাচ্ছে--তার ইতিহাসও তো লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত।

কয়েকজন নাট্যব্যক্তিত্ব

মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২)

বিদ্বজ্জন মনোমোহন বসু ডেভিড হেয়ারের কাছে শিক্ষালাভ করেন। তিনি নাট্যকার, মঞ্চাধ্যক্ষ এবং 'মধ্যস্থ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কবি ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য মনোমোহন ছাত্রকালেই সংবাদ প্রভাকর, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে 'মধ্যস্থ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন, তিনি তার সম্পাদক। পরে এই পত্রিকা পাক্ষিক, এবং শেষে মাসিকরূপে প্রকাশিত হয়। পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের ঐতিহাসিক তথ্যভিত্তিক জীবনী 'দুলীন' নামে বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করে সেকালে খ্যাতিলাভ করেন। স্কুল-পাঠ্যপুস্তক 'পদ্যমালা' সে যুগে খুবই প্রচলিত ও সমাদৃত ছিল।

প্রথম দিকে মনোমোহন যাত্রা, হাফ-আখড়াই, পাঁচালী, কীর্তন, বাউল প্রভৃতি নানা বিষয়ে সঙ্গীত রচনা করতেন। তাতে তাঁর খ্যাতিও ছিল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের গোড়ায় এদেশে থিয়েটার চালু হয় ধনী বাঙালির প্রাসাদমঞ্চে। আবার এদেশের প্রচলিত যাত্রা নিম্নস্তরে নেমে গিয়ে নতুন যুগের শিক্ষিত জনের কাছে অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে পড়েছিল। মধুসূদন, দীনবন্ধু প্রমুখেরা পাশ্চাত্য রীতি ও ভাবনার নাটক রচনার ধারা তৈরি করেন। সেই যুগে মনোমোহন যাত্রাকে উন্নত করে সেই যুগের মানুষের কাছে গ্রহণীয় করার চেষ্টা করেন। তিনি যে নাটকগুলি রচনা করেন তার বহিরঙ্গ আধুনিক নাটকের মতো, কিন্তু অন্তরঙ্গ এদেশীয় যাত্রাধর্মী। এগুলিকে যাত্রার মতো খোলামঞ্চে অভিনয় করা যায়, আবার স্টেজ বেঁধে আধুনিক থিয়েটারের মতো অভিনয় করা যায়। এই সময়ে 'গীতাভিনয়' নামে এই জাতীয় এক ধরনের মিশ্রধর্মী ফর্ম তৈরী হয়েছিল। থিয়েটার ও যাত্রার এই মিশ্রণ মনোমোহন তাঁর নাটকগুলির মধ্যে করেছিলেন। নতুন যুগের থিয়েটারের প্রতি আকর্ষণ রয়েছে, আবার দেশের পুরনো যাত্রাকে বর্জন করা যাচ্ছে না এবং স্টেজ বেঁধে থিয়েটার করার সঙ্গতি নেই—এমন যুবকবৃন্দের কাছে থিয়েটারের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে মনোমোহন খুবই আদৃত ও শ্রদ্ধেয় ছিলেন।

মনোমোহন 'বহুবাজার বঙ্গ নাট্যালয়'-এর সঙ্গে পৃষ্ঠপোষক ও নাট্যকার হিসেবে যুক্ত থেকে কয়েকটি নাট্য রচনা করেন। রামাভিষেক (প্রথম অভিনয় : ১৮৬৮), সতী নাটক (: ১৮৭৪), হরিশ্চন্দ্র নাটক (: ১৮৭৫) সে যুগে বারবার অভিনীত হয়ে খুবই খ্যাতিলাভ করে। সতী নাটক বিয়োগান্তক হওয়াতে অনেকের আপত্তি থাকায় মনোমোহন একটি মিলনান্তক 'ক্রোড়অঙ্ক' লিখে ছাপিয়ে এর সঙ্গে জুড়ে দেন। বিয়োগান্তক নাটককে শুধুমাত্র ক্রোড়অঙ্ক জুড়ে মিলনান্তক করার এই হাস্যকর নাট্যবোধহীন প্রচেষ্টা বাংলা যাত্রায় ছিল। মনোমোহনের ব্যবহারে ক্রমে বাংলা নাটকেও

এই রীতি প্রবর্তিত হয়ে জনপ্রিয় হয়। তাঁর অন্য কয়েকটি নাটক হলো : প্রণয় পরীক্ষা (১৮৬৯), পার্থপরাজয় (১৮৮১), রাসলীলা (১৮৮৯), আনন্দময় নাটক (১৮৯০)।

১৮৭২-এ ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে মনোমোহন উৎসাহী ছিলেন। নতুন যুগের এই থিয়েটারকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে দীর্ঘ বক্তৃতা দেন।

মনোমোহন পূর্ববর্তী কয়েকটি সাধারণ রঙ্গালয়ে পেশাদারি ভাবে মঞ্চাধ্যক্ষের কাজ করেন। বাংলা থিয়েটারের পুরনো ও নতুন ভাবনার সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে মনোমোহন যাত্রাকে উন্নত করে, তাঁর সঙ্গীতাংশকে মার্জিত করে আধুনিক থিয়েটারের মধ্যে ব্যবহারের সম্বন্ধে মত দিয়েছেন। তাঁর নাট্যরচনাও সেই ভাবনাজাত।

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (১৮৪০-১৯০১)

প্রখ্যাত অভিনেতা, নাট্যকার এবং মঞ্চাধ্যক্ষ বিহারীলাল ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ব্রিটিশ কোম্পানী এবং রেল বিভাগে চাকুরি করেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতায় ধনী বাঙালির বাড়িতে যে শৌখিন নাট্যশালাগুলিতে অভিনয় হচ্ছিল, বিহারীলাল তাতে প্রথম দিকে নারী চরিত্রে অভিনয় করতেন। জয়রাম বসাকের বাড়ি 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের অভিনয়ে (১৮৫৭) জনৈকা স্ত্রীলোক এবং মেট্রোপলিটান থিয়েটারে কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে অভিনীত উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ' নাটকে (১৮৫৯) সুলোচনার ভূমিকায় অভিনয় করেন। পরে শোভাবাজার নাট্যশালায় 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকাভিনয়ে (১৮৬৭) তিনি প্রথম পুরুষ চরিত্র ভীমসিংহের ভূমিকায় অভিনয় করেন। পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্র বিহারীলালের সুলোচনা এবং ভীমসিংহ দুই ধরনের চরিত্রাভিনয়েরই উচ্চ প্রশংসা করেন।

শরৎচন্দ্র ঘোষ বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা (১৮৭৩) করলে বিহারীলাল সেখানে যুক্ত হন। প্রথম দিকে তিনি এই থিয়েটারের অভিনেতা ও সহযোগী ম্যানেজার হিসাবেই কাজ করেন এবং বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তাদের মধ্যেও ছিলেন। শরৎচন্দ্রের সময়ে বেঙ্গল থিয়েটারে বিহারীলালের উল্লেখযোগ্য অভিনয় হলো :

শুক্রাচার্য (শর্মিষ্ঠা), মাধবাচার্য (মৃণালিনী), কাপালিক (কপালকুণ্ডলা), মোহান্ত (মোহান্তের এই কি কাজ), চন্দ্রশেখর (চন্দ্রশেখর) অভিরাম স্বামী (দুর্গেশনন্দিনী) প্রভৃতি। অভিনেত্রী বিনোদিনী তাঁর আত্মজীবনীতে বিহারীলালের 'কাপালিক' চরিত্রের অভিনয়ের উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

১৮৮০-তে শরৎচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু হলে বিহারীলাল বেঙ্গল থিয়েটারের কর্ণধার হন। ১৮৮০ থেকে ১৯০১-এর ২২ মার্চ অর্থাৎ তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত বিহারীলাল বেঙ্গলের সর্বেসর্বা শুধু নন ; নট, নাট্যকার, অভিনয় শিক্ষক, মঞ্চাধ্যক্ষ—সব কাজই নিপুণ ভাবে করেছেন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বেঙ্গল থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়। বেঙ্গল থিয়েটারের প্রথমাংশ যদি শরৎচন্দ্রের, তাহলে শেষ কুড়ি বছর বিহারীলালের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

এবারে শুধু অভিনয় নয়, অন্য সব কাজের সঙ্গে সঙ্গে নাট্য রচনাও শুরু করে দেন। আগে বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনীর নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। দায়িত্ব নেওয়ার পরে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র প্রমুখের উপন্যাসের, নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধ কাব্যের, নাট্যরূপ দেন। নিজে রচনা করেন সুভদ্রাহরণ, রাবণবধ, পাণ্ডব নির্বাসন, শ্রীবৎসচিন্তা, প্রভাসমিলন, নন্দবিদায়, জন্মাষ্টমী, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর প্রভৃতি নাটক ও গীতিনাট্য। সবগুলিই বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয়। এই পর্বে বিহারীলালের রাবণ (রাবণ বধ), ভীষ্ম (ভীষ্মের শরশয্যা), মহাদেব (মেঘনাদবধ) প্রভৃতি চরিত্রাভিনয় উল্লেখযোগ্য। গিরিশচন্দ্র তাঁর মাধবাচার্য, মহাদেব, ভীষ্ম—এই তিনটি চরিত্রাভিনয়ের খুবই প্রশংসা করেন।

অভিনেতা হিসেবে বিহারীলাল শান্ত, সংযত, আদর্শ ও ধর্মপ্রাণ চরিত্রে সার্থক ছিলেন। নাট্যকার হিসেবে পৌরাণিক নাটকেই সফল ছিলেন। নাট্য পরিচালক হিসেবে খুব কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। তবে রঙ্গমঞ্চ পরিচালনা ও অধ্যক্ষের বহুবিধ কার্য নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায় পরিশ্রমসাধ্য সাফল্য লাভ করেছিলেন।

উপেন্দ্রনাথ দাস (১৮৪৮-১৮৯৫)

নাট্যকার, নাট্যপরিচালক এবং মঞ্চমালিক ও মঞ্চাধ্যক্ষ উপেন্দ্রনাথ দাসের নাট্যজীবন স্বল্পায়ু। কিন্তু তার মধ্যেই তাঁব বহুবিচিত্র কর্মধারার জন্যে বাংলা থিয়েটারে তিনি চিরস্মরণীয়।

হাইকোর্টের প্রখ্যাত উকিল শ্রীনাথ দাসের পুত্র উপেন্দ্রনাথ সংস্কৃত কলেজে পড়াশুনা করেন। প্রথম পত্নী বিয়োগে দ্বিতীয় বিবাহ করেন বিধবা পাত্রীকে (১৮৬৮)। সেই কারণে পিতার সঙ্গে বিচ্ছেদ, গৃহত্যাগ এবং কাশীবাস। সেখানে অমৃতলাল বসুর সঙ্গে পরিচিত হন। ইন্ডিয়ান র‍্যাডিকাল লীগ স্থাপন করেন, হিন্দু সমাজের সংস্কার সাধনায় ব্রতী হন, বেশ কিছু সাময়িক পত্রিকার পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত হন।

১৮৭৫-এ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের 'লেসী' হন, বছরের শেষ দিকে ডিসেম্বর মাসে এই থিয়েটারের ডিরেক্টর হন। ম্যানেজার ছিলেন অমৃতলাল বসু। এই সময়ে নিজে উদ্যোগী হয়ে তাঁর থিয়েটারের অভিনেত্রী সুকুমারীর সঙ্গে অভিনেতা গোষ্ঠবিহারী দত্তের বিবাহ দেন। এই নিয়ে রক্ষণশীল সমাজে আলোড়ন দেখা দেয়। এইসব কাজের ফলে তাঁকে অনেকে 'উগ্র সমাজসংস্কারক' বলে থাকেন।

তাঁর সময়ে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে পরপর সব ব্রিটিশ বিরোধী নাটক অভিনীত হতে থাকে। প্রথমে অমৃতলালের 'হীরকচূর্ণ' নাটক, তাতে বরোদা রাজ্যের ইংরেজ রেসিডেন্ট-এর বিষপানে মৃত্যু, সেই অছিলায় ইংরেজ বরোদার গায়কোয়াড়ের সিংহাসন কেড়ে নেয়,—এইসব তদানীন্তন উত্তেজনামূলক ব্রিটিশ বিরোধী বিষয় ছিল। ইংরেজ শাসক এই নাটকের অভিনয়ে ক্ষুব্ধ হয়। পরে যুবরাজের ভারত আগমন উপলক্ষে 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' অভিনয় করে ব্রিটিশের কোপদৃষ্টিতে পড়েন। তাঁর লেখা 'শরৎ-সরোজিনী', 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকের মধ্যেও ব্রিটিশ বিরোধিতা ছিল। এইসব নিয়ে

ব্রিটিশ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং উপেন্দ্রনাথ, অমৃতলাল সহ থিয়েটারের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। বিচারে সাজা হলেও আপীলে তাঁরা মুক্ত হন। তখন থিয়েটারের ওপর পুরো নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে ব্রিটিশ সরকার 'অভিনয়নিয়ন্ত্রণ আইন' চালু করে, ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে। অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের কালো ইতিহাসের সঙ্গে উপেন্দ্রনাথ দাসের নাম বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে জড়িয়ে রয়েছে। পরাধীন দেশের স্বাধীনচেতা নাট্যকর্মীর গৌরবাত্মক ভূমিকার জন্যই। এরপর তিনি বিলেত চলে যান। পরে ফিরে এসে 'বীণা' মঞ্চে 'নিউ ন্যাশনাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে তাঁর লেখা 'দাদা ও আমি' নাটক রচনা ও অভিনয়ে আবার তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তারই উত্তরে এমারেল্ড থিয়েটার সেদিন অভিনয় করেছিল 'গাধা ও তুমি'। এইসব নিয়ে তখন অনেক মজা ও বাগবিতণ্ডা হয়েছিল।

উপেন্দ্রনাথ তিনখানি নাটক লিখেছিলেন। 'শরৎ-সরোজিনী' প্রকাশিত হয় ১৮৭৪-এ, প্রথম অভিনীত হয় গ্রেট ন্যাশনালে ২ জানুয়ারি, ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে। 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী'র প্রকাশকাল ১৮৭৫ এবং প্রথম অভিনীত হয় সেই বছরেই ১৪ আগস্ট, দি নিউ এরিয়ানে। 'দাদা ও আমি' ১৮৮৮-তে প্রকাশিত হয়ে সেই বছরেই নিউ ন্যাশনাল থিয়েটারে ডিসেম্বর মাসে প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম দুটি নাটক দুর্গাদাস দাস ছদ্মনামে প্রচারিত হয়েছিল।

উপেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি প্রগতিশীল ছিল, নাট্য রচনাতেও তিনি পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। এদিক দিয়ে তিনি মধুসূদন-দীনবন্ধু-জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উত্তর সাধক, গিরিশচন্দ্রের নন। পৌরাণিক-ঐতিহাসিক নাট্যাভিনয়ের প্রাধান্যের যুগে সমসাময়িক সমাজ জীবনের ছবিকেই আঁকতে চেয়েছেন, অলীক কল্পনায় অতীতচারী হননি। উচ্চবিত্ত শিক্ষিত বাঙালির ভাব ও কর্মের অগ্রবর্তী ও পশ্চাদমুখি দুটি ধারাকেই তুলে ধরেছেন তাঁর নাটকে। শরৎ-সরোজিনী নাটকের নায়ক 'ভালো জমিদার'। আবার খারাপ জমিদারও আছে—মতি—সে ভিলেন।

সাধারণ কমেডির তিনটি নাটকের প্রথম দুটি সীরিয়াস কমেডি, তৃতীয়টি লঘু কমেডি। এগুলি প্রহসনের খুব কাছাকাছি, তবে এগুলিতে ব্যঙ্গের চেয়ে মাধুর্য বেশি। তবে কখনোই নক্সাধর্মী নয়। প্রণয় মুখ্য নাটকগুলিতে আধুনিক শিক্ষিত সমাজের মুক্ত প্রণয়, মুক্ত বুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। তিনি নাটকে বাল্য বিবাহকে স্বীকার করেননি। ধনী জমিদারের লম্পট আচরণের নিন্দা করেছেন। সংস্কারমুলক কাজে উৎসাহ দেখিয়েছেন। জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। মেয়েদের শিক্ষা ও সাহিত্য চর্চার প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দিয়েছেন। তিনটি নাটকেই নতুন যুগের নবমূল্যবোধগুলিকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তার মধ্যে প্রথম দুটি নাটকে সমাজ-ভাবনা ও রাজনৈতিক চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে। শাসক ইংরেজের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, পরাধীনতার জ্বালা, স্বজাতিপ্রীতি তাঁর 'শরৎ-সরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটক দুটিকে গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা দিয়েছে। নাটকদুটি ব্রিটিশ বিরোধিতায়

'নীলদর্পণ' থেকে অনেক বেশি র‍্যাডিকাল এবং নিঃসন্দেহ সে যুগের পক্ষে ব্যতিক্রম।

ছোট আকারের এই নাটকগুলিতে নাট্যগঠন একমুখি ও সরল, ঘটনা দৃঢ়বদ্ধ। তবে উত্তেজক ঘটনা ও রোমহর্ষক ক্রিয়াকাণ্ডের ভাব তাঁর নাটক দুটিকে 'মেলোড্রামা' করে তুলেছে। উপেন্দ্রনাথের নাট্য রচনার ক্ষমতা ছিল স্বল্প, তাই নিয়েই তিনি সমসাময়িক বাস্তবভিত্তিক জীবন চিত্র আঁকতে চেয়েছেন। চরিত্রগুলিকে আকর্ষক করতে চেয়েছেন। তবে সংলাপের জড়তা তাঁর নাটকগুলির প্রধান অন্তরায়। তা সত্ত্বেও বাংলা থিয়েটারে প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ বিরোধী নাটকরচনা ও অভিনয়ে তিনি যে প্রগতিশীল রাজনৈতিক ভাব ও কর্মের প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন, তার জন্যে তিনি অবশ্য স্মরণীয়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫)

বাংলা থিয়েটারের প্রথম পর্বের নাট্যকার ও অভিনেতা। জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির সংস্কৃতি আন্দোলনের প্রধান পুরুষ। জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অংশে (৫ নম্বর বাড়ি) জোড়াসাঁকো নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন। সহযোগী ছিলেন গুনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। কলকাতায় তখন ধনী বাঙালির বাড়িতে বিলিতি ধরনের রঙ্গমঞ্চ তৈরি করে শৌখিন নাট্যাভিনয়ের প্রবল জোয়ার চলেছে। ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় প্রথম অভিনীত হয় মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক। কিছুদিন পরেই মঞ্চস্থ হয় 'একেই কি বলে সভ্যতা'। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রথম নাটকে কৃষ্ণকুমারীর মাতা এবং দ্বিতীয় প্রহসনে পুলিশ সার্জেন্টের ভূমিকায় অভিনয় করেন। ১৮৬৭-তে এখানে অভিনয় করা হয় রামনারায়ণের 'নবনাটক'। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই নাটকে নটীর ভূমিকায় নামেন। তারপরে কিছুদিন এই নাট্যশালায় অভিনয় বন্ধ থাকে। ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা 'অলীকবাবু' নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে জোড়াসাঁকো নাট্যশালা পুনর্জীবিত হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ অভিনয়ে এসে গেছেন। অলীকবাবু করেন রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যজীবনের হাতেখড়ি হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাহচর্যেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের গীতিনাট্যগুলি লিখিত ও অভিনীত হয়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে যুক্ত থেকে তাঁর নাটকগুলি লেখেন নি। সেই রঙ্গালয়ের বাইরে থেকে তিনি নাটক রচনা করেছেন এবং ক্রমে সেই রঙ্গালয়ের সঙ্গে নানা ভাবে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা নাটকগুলি সাধারণ রঙ্গালয় পরপর অভিনয় করে এবং খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাট্যকার হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত তাঁর নাটকগুলি হলো (প্রথম অভিনয়ের সাল সহ) :

পুরুবিক্রম (বেঙ্গল, ১৮৭৪), **অশ্রুমতী** (বেঙ্গল, ১৮৮০), **সরোজিনী** (বেঙ্গল, ১৮৯০), **স্বপ্নময়ী** (ন্যাশনাল, ১৮৮৩)। তাঁর নাটকগুলি এই সময়ে বেঙ্গল, গ্রেট

ন্যাশনাল, ন্যাশনাল, দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল প্রভৃতি থিয়েটারে খুবই সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। সে যুগে ইতিহাসের বিষয় নিয়ে জাতীয়তার ভাবোদ্দীপক এবং স্বদেশানুরাগের নাটক রচনা করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাঙালির জাতীয় ভাবানুরাগের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন। এগুলি ছাড়া তাঁর মৌলিক নাটক ও প্রহসনগুলি হল (প্রথম প্রকাশকাল সহ) :

কিঞ্চিৎ জলযোগ (১৮৭২) এমন কর্ম আর করব না (১৮৭৭), অলীকবাবু (পূর্ববর্তী প্রহসনের রূপান্তর, ১৯০০), মানময়ী (১৮৮০), হিতে বিপরীত (১৮৯৬), ধ্যানভঙ্গ (১৯০০) পুনর্বসন্ত (মানময়ীর রূপান্তর, ১৮৯৯)।

তিনি ইংরেজি ও সংস্কৃত নাটক থেকে অনেকগুলি অনুবাদ করেন। সংস্কৃত থেকে অভিজ্ঞান শকুন্তলা, উত্তররামচরিত, রত্নাবলী, মালতীমাধব, মৃচ্ছকটিক, মুদ্রারাক্ষস, বিক্রমোর্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র, বেণীসংহার প্রভৃতি এবং ইংরেজি থেকে জুলিয়াস সীজার, ফরাসী থেকে হঠাৎ নবাব, দায়ে পড়ে দারগ্রহ (দুটিই ফরাসী নাট্যকার মলিয়েরের নাটকের অনুবাদ)।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যকার-প্রতিভা বহুমুখি। তিনি ঐতিহাসিক পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলির মধ্যে বীরত্বপূর্ণ ভারতীয় জীবন গাথার সঙ্গে স্বদেশ প্রেম মিশিয়ে সেগুলিকে আস্বাদনীয় করে তুলেছেন। প্রহসনগুলির মধ্যে সমাজ-ব্যঙ্গ ও কৌতুকরসের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। আবার ইংরেজি ও ফরাসী থেকে অনুবাদ করে বাংলার নাট্য ভাণ্ডারকে বর্ধিত করেছেন। এবং প্রচুর বিখ্যাত সংস্কৃত নাটকের বাংলায় অনুবাদ করে বাঙালির কাছে সেই অমৃত রসধারা পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর অনুবাদ সাবলীল ও স্বাভাবিক, ভাব ও বর্ণনার পারিপাট্য প্রায় অক্ষুণ্ণ।

বাংলা নাট্যরচনার প্রথম যুগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর নাটকগুলি রচনা করেছেন। তিনি অনেকাংশে মধুসূদনের উত্তরসূরি কিন্তু কখনোই গিরিশচন্দ্রের পূর্বসূরি নন। ইংরেজি ভাব ও গঠনাশ্রিত বাংলা নাটকের যে ধারা মধুসূদন প্রমুখেরা তৈরি করেছিলেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেই ধারার নাট্যকার।

তাঁর নাটকে সংহত পরিমিতি খুবই কম। নাটকগুলি দীর্ঘ তাই প্রায়শই অভিনয়ের অনুপযোগী। দৃশ্যপরম্পরা শিথিল ও বিস্তৃত। সংলাপ দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর। তবে প্রহসনগুলিতে গান এবং সংলাপের মেলবন্ধনে কৌতুকরস বেশ জমে উঠেছে দেখা যায়। বিশেষ ভাব বা idea ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে চরিত্র ও ঘটনা অনেক সময়েই সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়নি। তাই অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর ঐতিহাসিক নাটকে দেখা যায়, জাতীয় ভাবানুরাগের চেয়ে হৃদয়গত অনুরাগই প্রাধান্য পেয়েছে বেশি।

নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে বাগবাজারের যুবকবৃন্দের চেষ্টায় 'ন্যাশনাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয়। সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যমী পুরুষদের অন্যতম প্রধান ছিলেন নগেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীকার করেছেন যে, প্রধানত নগেন্দ্রনাথ ও অর্ধেন্দুর চেষ্টায় ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ছিলেন ন্যাশনাল থিয়েটারের সম্পাদক। এখানে প্রথম অভিনীত দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটকে তিনি নায়ক নবীনমাধবের ভূমিকায় অভিনয় করেন।

বাগবাজারের অভিজাত কুলীন পরিবারের গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র নগেন্দ্রনাথ সঙ্গীতজ্ঞ গিরিশ মিত্রের কনসার্ট দলে হাত পাকিয়ে পরে নিজ বাড়িতেই কনসার্ট দল তৈরি করেন। সেই সময়ে এই ঐকতান-বাদন দলের খুবই খ্যাতি ছিল। তখন কলকাতা ও মফঃস্বলে সখের নাট্যদল তৈরি করে অভিনয়ের ব্যাপক প্রচলন হয়েছে। ধনী বাঙালির বাড়ির এইসব প্রাসাদ-মঞ্চে অভিনয়ের সঙ্গে সাধারণ বাঙালির কোনো যোগ ছিল না। প্রাসাদ-মঞ্চের গণ্ডী থেকে বাংলা থিয়েটার ও নাট্যাভিনয়কে উন্মুক্ত করে এনে সাধারণ বাঙালির দ্বারপ্রান্তে হাজির করার উদ্যম নিয়ে নগেন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর, রাধামাধব কর প্রমুখেরা 'বাগবাজার এমেচার থিয়েটার' গড়ে তোলেন। সেখানে দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' নাটকের অভিনয়ে (১৮৬৮) নগেন্দ্রনাথ 'অটল' চরিত্রে অবতীর্ণ হন। পরে থিয়েটার দলের নাম পরিবর্তন করে 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ' তৈরি হয়। নগেন্দ্রনাথ সেখানেও প্রধান উদ্যোক্তা। সেখানে দীনবন্ধুর 'লীলাবতী' অভিনয়ে (১৮৭২) নগেন্দ্রনাথ হেমচাঁদের চরিত্রে অভিনয় করেন। 'এডুকেশন গেজেট' (২৪ মে, ১৮৭২) নগেন্দ্রনাথ অভিনীত হেমচাঁদ চরিত্রের খুবই প্রশংসা করে-- 'হেমচাঁদের অভিনয় সকল সময়েই উত্তম হইয়াছিল।'

এরপরে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা ও অভিনয়ের সময়ে গিরিশচন্দ্র দল ত্যাগ করেন। কিন্তু অদম্য উৎসাহী নগেন্দ্রনাথ অন্যান্যদের সহযোগিতায় ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করে বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে ঐতিহাসিক কর্ম সম্পাদনে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। গিরিশচন্দ্র এই সময়ে ব্যঙ্গ করে যে কবিতা লেখেন, তাতেও তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছিল যে, 'নগ হতে ধারা ধায়' অর্থাৎ বাস্তবিকই নগেন্দ্রনাথই এই দল ও অভিনয়ের 'অর্গানাইজার' ছিলেন।

মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী'র অভিনয়েও নগেন্দ্রনাথ রাজভ্রাতা বলেন্দ্র সিংহের চরিত্রে অভিনয় করেন। ন্যাশনাল থিয়েটার ভেঙে দু'ভাগ হলে নগেন্দ্রনাথ তখন অর্ধেন্দুশেখর প্রমুখদের সঙ্গে 'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম নিয়ে অভিনয় করতে থাকেন। এই সময়ে তারা মফঃস্বলে অভিনয় করে বাংলা নাট্যাভিনয়ের প্রসার ঘটিয়েছিলেন নিঃসন্দেহে। পরবর্তীকালে নগেন্দ্রনাথ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের সঙ্গে অনেকদিন ম্যানেজার ও অভিনেতা হিসাবে যুক্ত ছিলেন। নিজে 'গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী' তৈরি করে অভিনয় চালিয়ে ছিলেন। সেখানে 'সতী কি কলঙ্কিনী' ও 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' অভিনীত হয়। 'কিঞ্চিৎ জলযোগ'-এ তিনি মাতালের ভূমিকায় অভিনয়ে মাতিয়ে দিয়েছিলেন।

নগেন্দ্রনাথ যে কয়েকটি অভিনয়ে খ্যাতিলাভ করেছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : নবীনমাধব (নীলদর্পণ), অটল (সধবার একাদশী), হেমচন্দ্র (মৃণালিনী), নবকুমার

(কপালকুণ্ডলা), সেকেন্দার শা (পুরুবিক্রম), হেমচাঁদ (লীলাবতী), মাতাল (কিঞ্চিৎ জলযোগ)।

স্বাস্থ্যবান, উন্নত ও দীর্ঘকায় সুপুরুষ নগেন্দ্রনাথ নায়কোচিত ভূমিকায় সাফল্যলাভ করেছিলেন। তাছাড়া অর্ধেন্দুশেখরের সাহায্যে ও শিক্ষায় টাইপ বা হাস্যরসের চরিত্রেও নিজের কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন।

নগেন্দ্রনাথ কয়েকটি নাটক লিখেছিলেন। সতী কি কলঙ্কিনী বা কলঙ্ক ভঞ্জন (১৮৭৪), পারিজাত হরণ (১৮৭৫), গুইকোয়ার নাটক (১৮৭৫)। অনুবাদ নাটক মালতী মাধব (১৮৭৩)। এর মধ্যে 'সতী কি কলঙ্কিনী' সে যুগে খুবই খ্যাতিলাভ করেছিল।

নগেন্দ্রনাথ যত বড় নাট্যকার বা যত বড় অভিনেতা ছিলেন, তার চেয়ে অনেক অনেক বড় ছিলেন সংগঠক হিসেবে। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে সংগঠক বা Organiser হিসেবেই নগেন্দ্রনাথ স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। বাংলা থিয়েটারের 'স্বতঃসিদ্ধ যোগাড়ে' নগেন্দ্রনাথ সম্পর্কে অমৃতলাল বসু বলেছেন 'অর্গানাইজ করবার অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী এবং একজন বিশিষ্ট নট।' ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা ও প্রসার এবং গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার-এর বিস্তার প্রভৃতি কাজে নগেন্দ্রনাথ যে উদ্যম, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও পরিশ্রম করেছিলেন, বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে, বিশেষ করে সাধারণ রঙ্গালয়েব গোড়াপত্তনের ইতিহাসে তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ধর্মদাস সুর (১৮৫২-১৯১০)

১৮৭২-এ ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ বাগবাজারের যে যুবক সম্প্রদায় নিয়েছিল, তাদের মধ্যে রাধানাথ সুরের পুত্র ধর্মদাস সুরও ছিলেন। তিনি মূলত অভিনেতা বা নাট্যকার ছিলেন না, ছিলেন মঞ্চশিল্পী। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসের প্রথম যুগে যে কয়েকজন বাঙালি নাট্যকর্মী মঞ্চশিল্পী হিসেবে মর্যাদা ও খ্যাতিলাভ করেছিলেন ধর্মদাস তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। গিরিশচন্দ্র তাঁকে বারবার প্রতিভাশালী 'স্টেজ ম্যানেজার' বলেছেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁর ছবি আঁকার হাত ছিল, পারিপাট্য ছিল নানান ধরনের সজ্জায় ; প্রতিমা সাজানো, মণ্ডপ নির্মাণ ও সাজানোতে তাঁর উৎসাহ ছিল। পরবর্তীকালে কারিগরের এই কুশলতা এবং শিল্পবোধ তাঁকে অসাধারণ মঞ্চশিল্পীর মর্যাদা এনে দেয়।

থিয়েটারে আকৃষ্ট হন ছোট বয়স থেকেই। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। তিনিই তাঁকে প্রথমে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কয়লাহাটার বাড়িতে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'কিছু কিছু বুঝি' প্রহসনের অভিনয়ের (২ নভেম্বর ১৮৬৭) সময়ে নিয়ে যান। ধর্মদাস তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন :

> 'কয়লাহাটার 'কিছু কিছু বুঝি' সম্প্রদায়ের যখন রিহার্সাল চলিতেছে, তখন মুস্তাফি মহাশয় আমার শিল্প নৈপুণ্য সম্বন্ধে পরিচয় দিয়া ও তাঁহাদের সকলের

মত লইয়া আমাকে স্টেজ ম্যানেজার করিলেন। আমার এই প্রথম প্রবেশ ও এই উন্নতি--' এছাড়া এখানে তিনি 'চন্দন বিলাসী' চরিত্রে অভিনয়ও করেন।

রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষ রূপে আবির্ভূত হয়ে ধর্মদাস এই কয়লাহাটার অভিনয়ের জন্য রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করেছিলেন। মঞ্চ সাজাবার দায়িত্বও তিনি নেন। পরে 'বাগবাজার এমেচার থিয়েটার'-এর সঙ্গে যুক্ত হন এবং 'ন্যাশনাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা ও চিৎপুরের সান্যাল বাড়িতে যে অভিনয় শুরু হয়, তার মঞ্চ নির্মাণ এবং মঞ্চসজ্জা করে প্রভূত খ্যাতিলাভ করেন। সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন তদানীন্তন ইঞ্জিনীয়ার যোগেন্দ্রনাথ মিত্র। এরপরে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার তৈরির সময় ধর্মদাস ইংরেজদের 'লুইস থিয়েটার'-এর আদলে তক্তার বেড়া ও 'করগেট'-এর ছাত এবং সেগুন কাঠের খুঁটি দিয়ে রঙ্গালয় তৈরি করেন এবং স্টেজের সামনের প্রসেনিয়ামের দৈর্ঘ্য এবং কার্টেন প্রস্তুত করেন। হাল্কা রোলার দিয়ে ভারী 'কার্টেন' নামানো-ওঠানোর ব্যবস্থাও তিনি করেন। আরো পরে হাতীবাগানের স্টার থিয়েটারের 'রঙ্গালয়' তৈরি করাতেও ধর্মদাস যোগেন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে কাজ করেছিলেন।

ধর্মদাস বেশ কিছুদিন গ্রেট ন্যাশনালের ম্যানেজার ও রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষ ছিলেন। তাছাড়া ন্যাশনাল, স্টার, এমারেল্ড, মিনার্ভা, কোহিনূর প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। এই সমস্ত রঙ্গমঞ্চের নানা সংস্কার তিনি করেন। তাছাড়া বিভিন্ন অভিনয়ের মঞ্চ পরিকল্পনা এবং মঞ্চ কৌশল প্রয়োগে দর্শকদের মুগ্ধ, বিস্মিত ও চমৎকৃত করে তোলেন। এইসব মঞ্চে তিনি নাট্যমঞ্চ পরিকল্পনা ও নির্মাণের নবনব পরীক্ষা করেন। মিনার্ভায় চন্দ্রশেখর নাট্যাভিনয়ের সময়ে তিনি শৈবলিনী-প্রতাপের সন্তরণ দৃশ্যে প্রকৃত নদীর জলের বিভ্রম সৃষ্টি করে দর্শকদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

পেশাদারি প্রথম সার্থক মঞ্চশিল্পী ও মঞ্চ নির্মাতা হিসেবে ধর্মদাস সুর বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে বারবার আলোচিত হবেন।

২৩ জুলাই, ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

অমৃতলাল বসু (১৭ এপ্রিল, ১৮৫৩–২ জুলাই, ১৯২৯)

বাংলা থিয়েটার ও নাটকের উল্লেখযোগ্য নাট্যব্যক্তিত্ব। পঞ্চাশ বৎসরাধিককাল তিনি থিয়েটারের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত থেকে এবং অবিরল নাট্যরচনা করে বাংলা নাটকের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

তিনি ছিলেন একাধারে অভিনেতা, নাট্যপরিচালক, মঞ্চাধ্যক্ষ, মঞ্চমালিক এবং নাট্যকার। বলা যেতে পারে তিনি পুরোপুরি থিয়েটারের লোক হিসেবেই থিয়েটারের সেবা করে গেছেন।

১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে 'ন্যাশনাল থিয়েটারে' নীলদর্পণ অভিনয়ের মধ্য দিয়ে বাংলা থিয়েটারের নতুন যুগের শুরু হয়েছিল ; সেই কর্মোদ্যোগে অমৃতলাল যুক্ত ছিলেন। নারী চরিত্র 'সৈরিন্ধ্রী'র ভূমিকায় অভিনয়ের মাধ্যমে তাঁর মঞ্চে আত্মপ্রকাশ। ন্যাশনাল থিয়েটার, গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার, বেঙ্গল, স্টার, মিনার্ভা প্রভৃতি বিভিন্ন রঙ্গালয়ের সঙ্গে তিনি নানা

সময়ে যুক্ত ছিলেন। তার মধ্যে গুর্মুখ রায়ের কাছ থেকে 'স্টার' কিনে নেবার পর থেকে হাতীবাগানে নতুন স্টার তৈরি করে, অমৃতলাল জীবনের বেশিরভাগ সময় স্টারেই অতিবাহিত করেন। মঞ্চাধ্যক্ষ হিসেবে রঙ্গালয়ে তিনি উচ্ছৃঙ্খলতা দূর করেন। নিয়ম নিষ্ঠা চালু করেন। নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাবদ্ধ কার্যপ্রণালী, বিভিন্ন কর্মে সূক্ষ্ম দৃষ্টি, ব্যবহারিক কৌশল প্রয়োগ করে থিয়েটারের আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সমসাময়িক অন্য থিয়েটারগুলির ঢিলেঢালা প্রমোদ ব্যবস্থার মাঝে তাঁর স্টার থিয়েটার শুদ্ধতা ও শৃঙ্খলার দায়িত্ব পালন করেছিল। তাঁর পরিচালনায় স্টার থিয়েটার আদর্শ রঙ্গালয়ে পরিণত হয়েছিল। তাঁরই ব্যক্তিত্বের জন্য নাট্যজগতের মানুষের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাঁরই ম্যানেজারির সময়ে গ্রেট ন্যাশনাল ব্রিটিশ বিরোধী নাটক অভিনয় করে ইংরেজ সরকারের কোপে পড়েছিল, তিনি এবং উপেন্দ্রনাথ দাস প্রমুখেরা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, পরে ছাড়াও পেয়েছিলেন। পরাধীন দেশের নাট্যকর্মীর জাতীয় মুক্তি চেতনার প্রবর্তনা, সেদিন অমৃতলাল প্রমুখেরা ঘটিয়েছিলেন। ক্ষিপ্ত ব্রিটিশ সরকার তারই জেরে 'অভিনয়নিয়ন্ত্রণ আইন' চালু করেছিল।

অভিনেতা হিসেবেও তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। স্ত্রী-ভূমিকা দিয়ে মঞ্চাভিনয় শুরু করলেও পরবর্তীকালে তিনি নানা ধবনের চরিত্রে কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। বকেশ্বর (কমলেকামিনী), মিষ্টার স্কোবল (হীরকচূর্ণ), ম্যাজিস্ট্রেট (সুরেন্দ্র-বিনোদিনী), নসীরাম (নসীরাম), রমেশ (প্রফুল্ল), বেহারীখুড়ো (তরুবালা), নিতাই (খাসদখল), কৃষ্ণকান্ত (কৃষ্ণকান্তের উইল), বিভীষণ (রাবণবধ), দোকড়ি সেন (বেল্লিকবাজার) প্রভৃতি তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য চরিত্রাভিনয়।

গিরিশচন্দ্রের সাক্ষ্যে জানা যায় অমৃতলাল অতুলনীয় অভিনেতা ছিলেন। বিশেষ করে হাস্যরসাভিনয়ে তাঁর কৃতিত্ব স্বীকার করতেই হবে। শ্লেষযুক্ত কৌতুক অভিনয়ে সে যুগে তিনিই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি অর্ধেন্দুশেখব মুস্তাফিরই যোগ্য শিষ্য। হাস্যরসাত্মক অভিনয়ে অসামান্য কৃতিত্বের জন্য সেই যুগে তিনি 'রসরাজ' আখ্যালাভ করেছিলেন। এছাড়া রমেশের কুটিল চরিত্র কিংবা সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটের চবিত্রেও তিনি সাবলীল ছিলেন।

অমৃতলাল থিয়েটারের লোক হিসেবেই নাটক রচনা করেছিলেন। নাটক, প্রহসন, নক্সা সবই তিনি লিখেছিলেন। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি :

> হীরকচূর্ণ (১৮৭৫), তিলতর্পণ (১৮৮১), চাটুজ্জে-বাঁড়ুজ্জে (১৮৮৪), বিবাহ বিভ্রাট (১৮৮৪), তরুবালা (১৮৯১), বাবু (১৮৯৪), বৌমা (১৮৯৭), কৃপণের ধন (১৯০০), খাসদখল (১৯১২), ব্যাপিকা বিদায় (১৯২৬), দ্বন্দ্বে মাতনম্ (১৯২৭), যাজ্ঞসেনী (১৯২৮)।

ন্যাশনাল থিয়েটারে থাকার সময়েই তিনি নাটক রচনা শুরু করেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নাটক রচনা করেছেন। ভাবগম্ভীর নাটক, প্রহসন, গীতিনাট্য, নক্সা সবই তিনি রচনা করেছেন। তার মধ্যে প্রহসনগুলি খুবই উল্লেখযোগ্য। গিরিশ ঘোষের সমকালে আবেগ-

বিহ্বল ভক্তি ধর্মের পৌরাণিক নাটক কম লিখে, বেশির ভাগই লিখেছেন বুদ্ধি নির্ভর, তির্যক জীবন দৃষ্টির নাটক। ভক্তিবাদ, প্রণয়লীলা কিংবা জাতীয়বোধ—সর্বক্ষেত্রের বিষয়েই ছিলেন আবেগ বর্জিত, বুদ্ধি ও চিন্তায় হাস্যমুখর অমৃতলাল। স্বীকার করতেই হবে প্রহসনগুলিই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। বাংলায় প্রহসন রচয়িতাদের মধ্যে তাঁর স্থান বেশ ওপরের দিকে।

বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের সূচনাকাল থেকে অমৃতলাল তার সঙ্গে যুক্ত। দীর্ঘকাল সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে যুক্ত থেকে তার ঐতিহাসিক ধারা পরিবর্তনের বহু ঘটনার তিনি সাক্ষী ছিলেন। উনিশ শতকের শেষের পঁচিশ বৎসর যেমন তিনি রঙ্গালয়ে থেকেছেন, তেমনি বিশ শতকের প্রথম তিনটি দশকও তিনি উপস্থিত ছিলেন। ভাব ও ভাবনা এবং কর্মের নানা পালাবদলের তীব্র হাস্যমুখর সাক্ষী তাঁর প্রহসনগুলি।

গিরিশচন্দ্র ও অর্ধেন্দুশেখরকে তিনি 'গুরু' বলে মানলেও, তাঁর কর্ম দক্ষতায় তিনি অর্ধেন্দুশেখরের বেশি নিকটবর্তী। তাঁর থিয়েটার জীবনের শুরুও অর্ধেন্দুশেখরের হাত ধরে!

সাধারণ রঙ্গালয়ের (ন্যাশনাল থিয়েটার) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবেই শুধু নয়, বাংলা রঙ্গালয় ও নাটকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকে যে কয়েকজন নাট্যব্যক্তিত্ব তাঁদের জীবন অতিবাহিত করেছেন, গিরিশচন্দ্র ও অর্ধেন্দুশেখরের পরই সেখানে অমৃতলালের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলা থিয়েটারে পাকাপাকিভাবে অভিনেত্রী গ্রহণ করা হয় ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে, বেঙ্গল থিয়েটারে। তার আগে লেবেডেফের থিয়েটারে (১৭৯৫) কিংবা ধনী বাঙালির সখের নাট্যশালায় নবীন বসুর বাড়িতে 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনয়ে (১৮৩৫) অভিনেত্রীরা অংশ গ্রহণ করেছিল। বাদবাকি সব অভিনয়ে পুরুষেরাই স্ত্রীচরিত্রে অভিনয় করত। থিয়েটারে অভিনেত্রী যুগ শুরু হওয়ার আগে যে পুরুষেরা 'অভিনেত্রী' হিসেবে অভিনয় করতেন ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁর সুদর্শন আকৃতি, মিষ্ট কণ্ঠস্বর, বাচন ভঙ্গি, নারীসুলভ হাবভাব ও আচরণ তাকে সে যুগে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল।

বাগবাজার এমেচার থিয়েটার (তখন শ্যামবাজার নাট্যসমাজ) 'লীলাবতী' অভিনয় করলে (১৮৭২) ক্ষেত্রমোহন তাতে 'রাজলক্ষ্মী'র ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই তার প্রথম মঞ্চাবতরণ। প্রথম অভিনয়েই সাফল্য পান এবং সমালোচক, দর্শক এবং বিশেষ করে নাট্যপরিচালক গিরিশচন্দ্রের প্রশংসালাভ করেন। ১৮৭২-এ ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়ে 'নীলদর্পণ' অভিনয় করলে ক্ষেত্রমোহন তাতে 'সরলা'র ভূমিকায় অভিনয় করে ('চমৎকার প্লে করিতেন' এবং 'ক্ষেতু গাঙ্গুলির মতো সরলা কোন স্ত্রীলোক কখনো সাজিতে পারে নাই।'—অমৃতলাল বসু) খ্যাতিলাভ করেন। অমৃতবাজার পত্রিকায় লেখা

হয়—'সরলা অতি সুশীলা, প্রকৃত ছোট বৌ বটে।'--এই প্রশংসা কম নয়। এখানে দীনবন্ধুর 'জামাই-বারিক'-এ পাঁচী, 'নবীন তপস্বিনী'তে কামিনী, এবং পরে 'লীলাবতী'তে লীলাবতীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। স্বয়ং দীনবন্ধু তাঁর অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে বলেন—'তুমি আমার নাটকে নায়িকার জীবন দিবার জন্যই জন্মিয়াছ।' আবার 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে নাম ভূমিকায় অসামান্য কৃতিত্ব দেখানোর জন্য নাট্যকার মধুসূদন তাঁকে সাধুবাদ জানান।

'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার'--চালু হলে (১৮৭৩) ক্ষেত্রমোহন সেখানকার প্রধান অভিনেত্রী ছিলেন। বেঙ্গল থিয়েটার মঞ্চে অভিনেত্রী নিলেও (১৮৭৩) প্রথম দিকে গ্রেট ন্যাশনাল অভিনেত্রী গ্রহণ করেনি। তখনো সেখানে পুরুষেরাই অভিনেত্রী হিসেবে কাজ চালাচ্ছেন। বঙ্কিমের উপন্যাসের নাট্যরূপ মৃণালিনীতে মনোরমা, কপালকুণ্ডলায় কপালকুণ্ডলা, দুর্গেশনন্দিনীতে তিলোত্তমা চরিত্রে অভিনয় করে ক্ষেত্রমোহন গ্রেট ন্যাশনালের খ্যাতি প্রতিষ্ঠা করেন।

এছাড়া শিশিরকুমার ঘোষের 'নয়শো রূপেয়া'য় নায়িকা, হরলাল রায়ের 'হেমলতা' নাটকে হেমলতা চরিত্রাভিনয়েও কৃতিত্ব দেখান। নবনাটক, প্রণয়পরীক্ষা, রুদ্রপাল, শত্রুসংহার, পুরুবিক্রম প্রভৃতি অনেক নাটকেই তিনি নায়িকা চরিত্রের বিচিত্র ও বহুমূখী ভূমিকায় অনায়াস সাফল্যলাভ করেছিলেন।

শেষ জীবনে তিনি ঢাকায় জমিদার ব্রজেন্দ্রকুমার রায়ের সখের থিয়েটারে অভিনয় শিক্ষদান করেছিলেন।

অভিনেত্রী যুগ প্রবর্তনের পূর্বে প্রকাশ্য নাট্যশালায় 'আদি নায়িকা' ক্ষেত্রমোহন নাট্যাভিনয়কে সচল রেখেছিলেন এবং সহস্র দর্শকের অকুণ্ঠ প্রশংসালাভ করেছিলেন। তাঁর কৃষ্ণকুমারী. কপালকুণ্ডলা, কামিনী এবং আরো কয়েকটি স্ত্রীচরিত্রের অভিনয় পরবর্তী কোনো নামজাদা অভিনেত্রীও ম্লান করতে পারেননি, বলে অমৃতলাল বসু মন্তব্য করেছেন।

বাস্তবানুগ, করুণ রসাত্মক (তাঁকে 'Tragic Muse' বলা হত সে যুগে), বিয়োগান্তক এবং মিলনান্তক সব ধরনের চরিত্রেই তিনি অভিনয়ে কৃতিত্ব ও কুশলতা দেখিয়েছেন। স্ত্রীচরিত্রে একজন পুরুষের অভিনয় করার যে সীমাবদ্ধতা তা মেনে নিয়েও বলা যায়. সে যুগে ক্ষেত্রমোহন শিল্পীসুলভ কুশলতায় তাঁর দায়িত্ব পালন করে গেছেন। থিয়েটারের সার্বিক উন্নতিতে মঞ্চে অভিনেত্রী গ্রহণ করতেই হয়েছে। তবুও বলতে হয়, বঙ্গের নাট্যশালা শ্রেষ্ঠ অভিনেতাবৃন্দের কাছে যেমন ঋণী. প্রধান স্ত্রী ভূমিকা অভিনয়কারী ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটেও তেমনি সমানভাবে ঋণী।

গুর্মুখ রায়। (১৮৬৪-১৮৮৬)

বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা গুর্মুখ রায় রাজস্থানের অধিবাসী, মাড়োয়ারি। পুরো নাম গুর্মুখ রায় মুসাদ্দি। পিতা গণেশ দাস এবং মাতা রূপা দেবী।

হোরমিলার কোম্পানীর বেনিয়ান ধনী গণেশ দাসের পুত্র গুর্মুখ রায় আঠারো বছর বয়সে পিতৃহীন হয়ে প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হন। ক্রমে বিপথগামী ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠেন। প্রতাপচাঁদ জহুরির 'নাশনাল থিয়েটারে' অভিনয় দেখতে গিয়ে অভিনেত্রী বিনোদিনীর প্রতি আকৃষ্ট হন। তাকে পাওয়ার লোভেই নিজ অর্থে নতুন থিয়েটার তৈরি করতে চান। গিরিশের নেতৃত্বে অন্য অভিনেতা-অভিনেত্রীরা প্রতাপচাঁদের ন্যাশনাল ছেড়ে গুর্মুখের নতুন থিয়েটারে যোগ দেন। অভিনেত্রী বিনোদিনীকে 'টোপ' হিসেবে ব্যবহার করে গিরিশচন্দ্রেরা গুর্মুখ রায়কে দিয়ে নতুন থিয়েটার তৈরি করিয়ে নেন। নাম হয় 'স্টার থিয়েটার'। অথচ গুর্মুখ রায় চেয়েছিলেন এবং বিনোদিনীকে বোঝানো হয়েছিল, নতুন থিয়েটারটি বিনোদিনীর নামেই 'বি-থিয়েটার' হবে। যাই হোক, স্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে গুর্মুখের নাম থিয়েটারের ইতিহাসে যুক্ত হয়ে গেল।

৬৮ নম্বর বিডন স্ট্রিটে গুর্মুখ রায় নির্মিত স্টার থিয়েটারের উদ্বোধন হল ২১ জুলাই, ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে। নাটক : গিরিশের দক্ষযজ্ঞ। গুর্মুখ মালিক থাকাকালীন স্টারে অভিনীত হয়েছিল :

গিরিশের দক্ষযজ্ঞ, ধ্রুবচরিত্র, রামের বনবাস, সীতার বনবাস, মেঘনাদবধ (নাট্যরূপ), রাবণবধ; নলদময়ন্তী। এছাড়া রামনারায়ণ তর্করত্নের সীতাহরণ, চক্ষুদান ; দীনবন্ধুর সধবার একাদশী। ১৮৮৩-র জুলাই থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই এগুলি অভিনীত হয়।

পারিবারিক চাপে শেষ পর্যন্ত গুর্মুখ রায় বিনোদিনী তথা স্টার থিয়েটারের সংস্রব ত্যাগ করেন। মাত্র ১১ হাজার টাকায় স্টারের স্বত্ব বিক্রি করে দেন সেখানকার কয়েকজন অভিনেতার কাছে। ডঃ সুকুমার সেন জানিয়েছেন যে, গুর্মুখ রায়ের মৃত্যুর পর ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে অমৃতলাল বসু, ও মিত্র প্রমুখেরা স্টার কিনে নেন। তথ্য সঠিক নয়। ১৮৮৩-এর ডিসেম্বর মাসেই গুর্মুখ জীবিতাবস্থায় নিজেই থিয়েটার বিক্রি করেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে। মৃত্যু নয়, সমাজ ও পরিবারের চাপেই গুর্মুখ নিজে স্টার হস্তান্তরিত করেন।

ভগ্ন মনোরথ গুর্মুখ রায় এরপর কিছুদিন পিতার কর্মস্থানে বেনিয়ান-এর কাজ করেন। তারপর কাশীতে গিয়ে সাধুসংসর্গ ও দীক্ষা গ্রহণ করেন। সেখানেই মাত্র বাইশ বৎসর বয়সে ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

সুকুমারী দত্ত (গোলাপ)।

বঙ্গরঙ্গমঞ্চের প্রথম যুগের অন্যতমা শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী। বেঙ্গল থিয়েটার ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রথম যে চারজন অভিনেত্রীকে অভিনয়ের জন্য গ্রহণ করে, সুকুমারী তাঁদের অন্যতমা। তখন তার নাম ছিল গোলাপসুন্দরী। পরে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ-সরোজিনী' নাটকে নায়ক শরতের বোন 'সুকুমারী'র ভূমিকায় এতোই জনপ্রিয়তা লাভ করেন যে, তখন থেকেই 'সুকুমারী' নামে জনমুখে

প্রচারিত ও পরিচিত হন। গ্রেট ন্যাশনালের অভিনেতা গোষ্ঠবিহারী দত্তের সঙ্গে তার বিবাহ হওয়ার ফলে তিনি সুকুমারী দত্ত নামটিই ব্যবহার করতে থাকেন। থিয়েটারে অভিনেত্রী গ্রহণ এবং গোষ্ঠবিহারীর সঙ্গে বিবাহ--এইসব নিয়ে তখন সংবাদপত্রে ও সমাজে খুবই শোরগোল উঠেছিল।

সুকুমারীর প্রথম মঞ্চাবতরণ বেঙ্গল থিয়েটারে 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের দ্বিতীয় অভিনয়ে, ১৮৭৩-এর ২৩ আগস্ট, শর্মিষ্ঠার ভূমিকায়। বেঙ্গল থিয়েটারের উদ্বোধনের দিনের অভিনয়ে (১৬ আগস্ট) সুকুমারী অংশ গ্রহণ করেন নি। বেঙ্গল থিয়েটারে বিমলা (দুর্গেশনন্দিনী), ঐলবিলা (পুরুবিক্রম), মলিনা (অশ্রুমতী) চরিত্র অভিনয়ে প্রচুর খ্যাতি পান। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র 'বিমলা' দেখে মুগ্ধ হন। ঠাকুরবাড়ির সবাই বেঙ্গল ভাড়া নিয়ে 'অশ্রুমতী' দেখে এসেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুকুমারী সম্পর্কে লিখেছেন--'মলিনা সেজেছিলেন সুকুমারী দত্ত। স্টেজ-এ নাম ছিল গোলাপী, সে যা গাইত, বুড়ো বয়সেও শুনেছি তার গান, চমৎকার গাইতে পারত। পৃথ্বিরাজ ও মলিনার গান এখনও কানে বাজছে সে সুর।' (ঘরোয়া)। বেঙ্গলে তিনি মায়াকানন, কৃষ্ণকুমারী, উঃ মোহান্তের এই কি কাজ, রত্নাবলী, স্বপ্নধন, একেই কি বলে সভ্যতা প্রভৃতি নাটক-প্রহসনে অভিনয় করেন।

১৮৭৪-এর শেষের দিকে সুকুমারী গ্রেট ন্যাশনালে যোগ দেন। বেঙ্গলে শরৎচন্দ্র ঘোষ এবং বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের কাছে অভিনয় শিক্ষা পেয়েছিলেন। এবার পেলেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফির শিক্ষার স্পর্শ। তাঁর সুপ্ত শক্তি পরিস্ফুট হল। অভিনয় কলায় পারদর্শিনী হয়ে সে যুগের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীতে পরিণত হলেন। গ্রেট ন্যাশনালে উপেন্দ্রনাথ দাসের শরৎ-সরোজিনী নাটকে সুকুমারী এবং সুরেন্দ্র-বিনোদিনী নাটকে বিনোদিনীর অংশে অভিনয় কৃতিত্ব দেখালেন। 'সতী কি কলঙ্কিনী' গীতিনাট্যে বৃন্দার ভূমিকায় নৃত্য-গীতে অভিনয়ে মাতিয়ে দিলেন। তাছাড়া কুমারসম্ভবে রতি, রাজা বসন্ত রায়-এ সুরমা, আনন্দমঠে শান্তি তাঁর উল্লেখযোগ্য অভিনয়।

এমারেল্ড থিয়েটারেও সুকুমারী বেশ কিছু নাটকের অভিনয়ে অংশ নেন। এখানে অভিনেতা-পরিচালক মহেন্দ্রলাল বসুর কাছে শিক্ষালাভ করেন। বঙ্কিমের উপন্যাসগুলির পর পর অভিনয়ে এমারেল্ড খ্যাতিলাভ করে। সেইসব অভিনয়ে সুকুমারীর কৃতিত্ব অবিসংবাদিত। তার জন্যই উপন্যাসের চরিত্রগুলি জীবন্ত রূপ লাভ করেছিল। রোহিণী (কৃষ্ণকান্তের উইল), সূর্যমুখী (বিষবৃক্ষ), মতিবিবি (কপালকুণ্ডলা), গিরিজায়া (মৃণালিনী) চরিত্রগুলি সুকুমারীর অভিনয় চাতুর্যের স্বাক্ষর।

সুকুমারী অসামান্যা সঙ্গীতকুশলিনী ছিলেন। নাটকে নৃত্যগীতের, বিশেষ করে গীতের অংশে তার তুলনা ছিল না। বিদ্যাসুন্দরের মালিনী, সতী কি কলঙ্কিনীতে বৃন্দা, রাসলীলা নাটকে বৃন্দা তার এই ধরনের কৃতিত্বের প্রমাণ।

সাধারণ বারাঙ্গনা জীবন থেকে উঠে এসে নিজের কৃতিত্ব ও অন্যদের শিক্ষায় ধীরে ধীরে সে যুগে অভিনেত্রী হিসেবে খ্যাতির শীর্ষে উঠেছিলেন। তাকে সমাজে প্রতিষ্ঠা

দেওয়ার জন্য উপেন্দ্রনাথ দাস তার সঙ্গে অভিনেতা গোষ্ঠবিহারীর বিয়ে দেন। ১৮৭৫-এর ১৬ ফেব্রুয়ারি। কিন্তু সে জীবন সুখের হয়নি। গোষ্ঠবিহারী তাকে পরিত্যাগ করে বিলেত চলে যান। কন্যাসন্তানকে নিয়ে সুকুমারী বিপদে পড়েন। কিছুদিন পরে নিজেই উদ্যোগী হয়ে নিজের নাট্যদল তৈরি করেন। এই সময়ে তিনি 'অপূর্বসতী' নামে একটি নাটক রচনা করেন। ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ আগস্ট সুকুমারীর সাহায্যরজনী হিসেবে নাটকটি অভিনীত হয় 'দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার'-এ। এই নাটকে এক বারাঙ্গনা কন্যা নলিনীর জীবনযন্ত্রণা দেখানো হয়েছে। এই নাটকে সুকুমারীর জীবন প্রতিফলিত হয়েছে, নিঃসন্দেহে। জীবনে বাঁচবার তাগিদে গৃহবধূ সুকুমারী আবার থিয়েটার জীবনে ফিরে আসেন এবং ১৮৯০-৯১ অবধি অভিনয় জগতে ছিলেন, নানাজনের সাক্ষ্যে তা জানা যায়।

বাংলা সাধারণ মঞ্চে সুকুমারী প্রথম অভিনেত্রীদের অন্যতমা ছিলেন। শ্রেষ্ঠতমা তো বটেই। সে যুগের সমাজের নৈতিকতার সীমাবদ্ধতার মধ্যেও তিনি তার সাফল্যের পরিচয় রেখেছেন। তার সুগঠিত চেহারা, সুন্দর আকর্ষণীয় মুখশ্রী, ব্যক্তিত্বপূর্ণ অভিব্যক্তি এবং সুকণ্ঠ ও গীতকুশলতা সে যুগে তাকে প্রধানা অভিনেত্রীতে পরিণত করেছিল। সঙ্গে মিশেছিল তার অভিনয় শেখবার ঐকান্তিক আগ্রহ, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়। এসব নিয়েই তিনি তাঁর সমযুগে শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর সম্মানলাভ করেছিলেন।

বিনোদিনী (১৮৬৩—ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১)

বারবণিতার ঘৃণ্যজীবন ও পরিবেশ থেকে এসে একেবারে বালিকা বয়সে বাংলা মঞ্চে অভিনেত্রী হিসেবে যোগদান করেন। ১২ বছর বয়সে মাসিক দশ টাকা বেতনে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে 'শত্রুসংহার' নাটকে দ্রৌপদীর সখীর ছোট্ট ভূমিকায় প্রথম মঞ্চাবতরণ করেন। বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম অভিনেত্রী গ্রহণের (১৮৭৩) একবছরের মধ্যেই বিনোদিনী সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগ দেন। নৃত্যগীত পটীয়সী বিনোদিনী খুব শীঘ্রই অভিনয় বিদ্যায় পারঙ্গমা হয়ে ওঠেন। ক্রমে প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রী হিসেবে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে যান। ১৮৭৪ থেকে একটানা ১২ বৎসর অভিনয় করে তিনি নানা ভূমিকায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর বঙ্গরঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নেবার সময় (শেষ অভিনয় : বেল্লিকবাজার নাটকে 'রঙ্গিনী'র ভূমিকা) পর্যন্ত বিনোদিনী ৫০টি নাটকে ৬০টিরও বেশি চরিত্রে অভিনয় করেন। তখনকার চারটি রঙ্গালয়ে, গ্রেট ন্যাশনাল, বেঙ্গল, ন্যাশনাল এবং স্টার থিয়েটার-এ তিনি অভিনয় করেন।

সীতা, প্রমীলা, দ্রৌপদী, রাধিকা, উত্তরা, দময়ন্তী, গোপা, চিন্তামণি প্রভৃতি পুরাণের নায়িকার ভূমিকায় চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তুলতেন। আবার কাঞ্চন, কামিনী, মনোরমা, কুন্দনন্দিনী, বিলাসিনী কারফরমা, রঙ্গিনী প্রভৃতি সামাজিক চরিত্রেও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতেন। অন্যদিকে আয়েষা, তিলোত্তমা, আসমানি, কপালকুণ্ডলা, মতিবিবি প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিত্র রূপায়ণেও তেজোদ্দীপ্ত স্বরূপ ফুটিয়ে তুলেছিলেন। একই নাটকে বিভিন্ন ভূমিকায়

(মেঘনাদবধে'র সাতটি চরিত্রে), একই নাটকের দুই ভিন্নমুখী চরিত্রে (দুর্গেশনন্দিনী'র আয়েষা ও তিলোত্তমা), একই অভিনয়-রজনীতে একাধিক বিপরীত ও বিরোধী চরিত্রে (বিষবৃক্ষে'র কুন্দনন্দিনী এবং সধবার একাদশী'র কাঞ্চন ; চৈতন্যলীলা'য় চৈতন্য এবং বিবাহ বিভ্রাটে বিলাসিনী কারফরমা ; বিল্বমঙ্গলে চিন্তামণি এবং বেল্লিক বাজার-এ রঙ্গিনী) অভিনয়েও সাফল্যলাভ করেছিলেন। আবার পুরুষ চরিত্রের অভিনয়েও (চৈতন্য, নিমাই, প্রহ্লাদ) সবাইকে মুগ্ধ করে দিয়েছেন। করুণরসাত্মক, ভক্তিরসাত্মক, গুরুভাবাত্মক কিংবা গভীর গহন চরিত্রের রূপায়ণে তিনি দক্ষ ছিলেন। আবার লঘুচপল, হাস্যরসাত্মক ভূমিকাতেও নিপুণ ছিলেন। নৃত্যগীত পারদর্শিনী অভিনেত্রী আনন্দ-উচ্ছল চরিত্রাভিনয়েও দর্শকদের মাতিয়ে দিতেন। মৃণালিনী, মনোরমা, মেঘনাদবধের প্রমীলা, দক্ষযজ্ঞের সতী কিংবা দুর্গেশনন্দিনীর আয়েষা-তিলোত্তমা গহন গভীর চরিত্র। বিবাহবিভ্রাটের বিলাসিনী কারফরমা, সধবার একাদশীর কাঞ্চন, বেল্লিক বাজারের রঙ্গিনী হাস্যচপল ও কৌতুকরসাত্মক চরিত্র। চৈতন্যলীলায় চৈতন্য, বুদ্ধদেব চরিত্রে গোপা, বিল্বমঙ্গলের চিন্তামণি ভাবরসাত্মক চরিত্র। এইসব বহু বিচিত্র চরিত্রের নানা প্রকাশে বিনোদিনী সে যুগে অসামান্য সাফল্যলাভ করেছিলেন। সাধারণ দর্শক, বিদগ্ধ দর্শক, রুচিশীল দর্শক ও প্রমোদলোভী দর্শক সকলেই তাঁর অভিনয়ে মুগ্ধ হতো। রামকৃষ্ণদেব, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, ফাদার লাফোঁ, এডুইন আরনল্ড, কর্ণেল অলকট প্রমুখ দেশবিদেশের খ্যাতিমান দর্শকেরও তিনি প্রশংসা অর্জন করেন।

রামকৃষ্ণদেব গ্রীনরুমে গিয়ে তাঁকে 'চৈতন্য হোক' বলে আশীর্বাদ করেছিলেন তাঁর চৈতন্যলীলায় অভিনয় দেখে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অভিনয়ে উপন্যাসের সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে মূর্ত হয়ে উঠতে দেখেছিলেন। যে গিরিশচন্দ্র তাঁর অভিনয়ের গুরু ছিলেন, সেই গিরিশচন্দ্রও স্বীকার করেছেন যে, তাঁর নাটকগুলির আশাতীত সাফল্যের মূলে ছিল বিনোদিনীর অভিনয়ের চরমোৎকর্ষ। বিনোদিনীর সর্বতোমুখি প্রতিভার নিকট গিরিশ সম্পূর্ণরূপে ঋণী, একথা গিরিশ নিজেই স্বীকার করেছেন। এবং এ-ও স্বীকার করেছেন যে, রঙ্গালয়ে বিনোদিনীর অভিনয়ের উৎকর্ষ গিরিশের শিক্ষাকে অতিক্রম করে তাঁর নিজগুণেই অধিক সম্পন্ন হয়েছিল। তাঁর অভিনয়ে তন্ময়তা, গভীর ধ্যান ও ভাবুকতার সমাবেশ ঘটেছিল। একাগ্র সাধনা ও গভীর অনুধ্যান এবং অনলস অধ্যবসায়ের দ্বারা তিনি অভিনয়ে এতোখানি পারদর্শিতা অর্জন করতে পেরেছিলেন। এতো বড় মাপের অভিনেত্রী বাংলা মঞ্চে খুব কমই এসেছেন। তখনকার সংবাদপত্র তাঁকে 'ফ্লাওয়ার অফ দি নেটিভ স্টেজ', 'মুন অফ স্টার কোম্পানী', 'প্রাইমাডোনা অফ দি বেঙ্গলী স্টেজ' আখ্যায় ভূষিত করেছিল। তাঁর শিক্ষাগুরু গিরিশচন্দ্র 'কি করিয়া বড় অভিনেত্রী হইতে হয়' প্রবন্ধের আলোচনায় অভিনেত্রী বিনোদিনীর জীবনচর্চাকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

পাবলিক থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে তাঁর আত্মনিয়োগ ও আত্মত্যাগ রঙ্গালয়ের ইতিহাসে স্মরণীয় অধ্যায় রচনা করেছে। ধনী যুবক গুর্মুখ রায়ের ৫০ হাজার টাকার

প্রলোভন তিনি ত্যাগ করেন। বরং সেই টাকায় নতুন থিয়েটার খুলতে রাজি হন এবং গুর্মুখ রায়ের রক্ষিতা হতেও সম্মত হন। কথা ছিল, সেই থিয়েটার বিনোদিনীর নামে 'বি-থিয়েটার' হবে। কিন্তু গিরিশচন্দ্র প্রমুখ তখনকার থিয়েটারের কতিপয় ব্যক্তির প্রতারণার ফাঁদে তিনি পড়েন। তাঁর ব্যক্তিগত ত্যাগ স্বীকারে স্টার থিয়েটার গড়ে ওঠে গুর্মুখ রায়ের অর্থে, কিন্তু বিনোদিনীর নাম তাতে থাকেনি। থিয়েটারের কিছু কাছের মানুষের বিশ্বাসঘাতকতার চক্রান্তে বিনোদিনী যখন দুঃখে বেদনায় পরিতাপে দগ্ধ হতে হতে শান্তির আশ্রয় খুঁজছিলেন, তখনই রামকৃষ্ণদেব 'চৈতন্যলীলা' দেখতে এসে (১৮৮৪) তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। মনে রাখতে হবে, রামকৃষ্ণদেবের মহাপ্রয়াণের বছরেই, ১৮৮৬-তেই বিনোদিনী রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করে যান। তখন তাঁর মোটে ২২-২৩ বছর বয়স। তারপরে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকলেও, আর কখনোই মঞ্চে অভিনয়ে ফিরে আসেন নি। লিখেছেন আত্মীজীবনী 'আমার কথা', কবিতা গ্রন্থ 'বাসনা' এবং 'কনক'। কিন্তু বাংলা থিয়েটার বঞ্চিত হলো এক অসামান্যা অভিনেত্রীর উপস্থিতি, সাহায্য, সহযোগিতা এবং প্রতিভা থেকে, গঠন পর্বে যার প্রয়োজন বেশি ছিল।

বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসের প্রথম পর্বে বিনোদিনীর সক্রিয় ভূমিকা পালন, তাঁর অসামান্য প্রতিভা, আত্মত্যাগ, থিয়েটার জীবনের নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও সাধনা পেশাদার থিয়েটারের ইতিহাসে দীর্ঘদিন শক্তিশালী প্রেরণা হিসেবে কাজ করে যাবে।

তিনকড়ি (১৮৭০-১৯১৭)

সুন্দরী, দীর্ঘ আকর্ষণীয় চেহারা, তীক্ষ্ণ, ধাতব অথচ সুরেলা কণ্ঠস্বরের অধিকারিণী, ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক অভিব্যক্তি--সব মিলিয়ে অভিনেত্রী তিনকড়ি তাঁর যুগের সবচেয়ে জনপ্রিয়া অভিনেত্রী ছিলেন। প্রথমদিকে খুবই ছোটখাটো চরিত্রে নামতে নামতে এবং সখীর দলে অকিঞ্চিৎকর ভূমিকা গ্রহণের পর রাজকৃষ্ণ রায়ের বীণা থিয়েটারে তাঁর 'মীরাবাঈ' নাটকের নাম ভূমিকায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ মঞ্চাবতরণ ঘটে, ২০ জুলাই, ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে, মাত্র কুড়ি টাকা মাসিক বেতনে। প্রথম এই নাটকেই তিনকড়ি বাংলা মঞ্চে আদৃত অভিনেত্রী হয়ে গেলেন। রাজকৃষ্ণ রায়, অর্ধেন্দুশেখর, গিরিশচন্দ্র প্রমুখের কাছে তাঁর নাট্যশিক্ষা লাভ ঘটে। এক সময়ে তিনি গিরিশচন্দ্রের মানসকন্যা হয়ে গিয়েছিলেন। বহু যত্ন ও আয়াসে গিরিশ তিনকড়িকে উচ্চমানের অভিনেত্রীতে উন্নীত করেন। তিনকড়িও রঙ্গ-মঞ্চকে জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেন এবং তাঁর ধ্যান-জ্ঞান-মনন-সাধনা সবই ছিল রঙ্গ-মঞ্চ। রঙ্গমঞ্চ তাঁর পেশা ছিল না, ছিল নেশা। তার ফলে সামান্যা বারাঙ্গনা হয়েও তিনি এতো বড় অভিনেত্রী হতে পেরেছিলেন এবং অবলীলায় বিত্তশালী বাবুদের প্রলোভন ত্যাগ করতে পেরেছিলেন।

ধীর, ভয়ানক, রৌদ্ররসাত্মক অভিনয়েই তিনকড়ি সর্বাধিক খ্যাতিলাভ করেন। মিনার্ভায় গিরিশ তাঁর অনূদিত 'ম্যাকবেথ' নাটকে তাঁকে লেডি ম্যাকবেথের ভূমিকা দেন। অর্ধেন্দুশেখর ও গিরিশের শিক্ষায় তিনকড়ি অসামান্য দক্ষতায় তার এই

চরিত্রাভিনয়কে সার্থক করে তোলেন। সংবাদপত্র 'ইন্ডিয়ান নেশন' তার এই অসামান্য অভিনয়ের প্রশংসা করে তাকে ইংলন্ডের বিখ্যাতা অভিনেত্রী মিসেস সিডনস-এর সমতুল্য বলে মন্তব্য করে। আবার গিরিশের 'জনা' নাটকের নাম ভূমিকায় তার অভিনয়ে বীরাঙ্গনা মূর্তির সঙ্গে সর্বস্ব হারানোর মর্মান্তিক হাহাকার যেভাবে মিলে গিয়েছিল, পরবর্তীকালে কোনো অভিনেত্রীই 'জনা' অভিনয়ে তার ধারে কাছে যেতে পারেন নি। পাণ্ডবগৌরবে তেজস্বিনী সুভদ্রা, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে লাঞ্ছিতা দীপ্তিময়ী দ্রৌপদী, সীতারামের শান্ত শ্রী, দুর্গেশনন্দিনীতে বীর্যবতী বিমলা, ভ্রান্তি নাটকে অন্নদার চরিত্রের উন্নত ভাব, চাঁদবিবি নাটকে যোশীবাঈ, ছত্রপতি শিবাজী'তে জিজাবাঈ-এর দৃঢ়তা-- তিনকড়ির অভিনয়-জীবনের উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

মীরাবাঈয়ের গান, সুভদ্রার গান, সীতার গান, পাগলিনীর গান--সবই যেন তিনকড়িকে মনে রেখেই রাজকৃষ্ণ বা গিরিশ রচনা করেছেন। আবার আবুহোসেন-এ নৃত্যগীতের চমৎকারিত্ব ও মৌলিকতা, মুকুল মুঞ্জরার নৃত্যগীতের ফোয়ারা যেন তিনকড়ির পারদর্শিতাতেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল।

ঐতিহাসিক, ট্রাজেডি এবং গীতিনাট্য--এই তিন ধরনের নাটকে তিনকড়ি শ্রেষ্ঠা ছিলেন। তবে সামাজিক এবং ভক্তিভাবাবেগের নাটকে তার সীমাবদ্ধতা ছিল। তাই অনেকের কাছেই মনে হয়েছে যে, সূক্ষ্ম শান্ত কোমলভাব প্রকাশে তিনকড়ি ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু যেখানে জীবনের চরিত্র গাঢ় বর্ণে উজ্জ্বল, দুর্দম প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিতে চরিত্র বিক্ষুব্ধ, প্রচণ্ড শোক ও আঘাতে চরিত্র জর্জরিত, তিনকড়ির অভিনয় সেখানেই সার্থকতর হয়ে উঠেছে। তিনকড়ির আকৃতি, অবয়ব গঠন, কণ্ঠস্বর ও ব্যক্তিত্ব এইসব চরিত্রের রূপদানে তার ক্ষমতা ও প্রতিভার দোসর হয়ে উঠত।

কুসুমকুমারী (১৮৭৬—২৯ নভেম্বর, ১৯৪৮)

কুসুমকুমারীর অভিনেত্রী জীবন ৪২ বছরের। ১৯ শতকের শেষ দিকে অভিনয় জীবন শুরু করে বিশ শতকের প্রায় চার দশক তিনি বাংলার শ্রেষ্ঠ সব রঙ্গালয়ে বহু বিচিত্র চরিত্রের সাফল্যজনক অভিনয় করেছেন। গিরিশ, অর্ধেন্দুশেখর, অমরেন্দ্রনাথ প্রমুখ খ্যাতিমান নাট্যশিক্ষকের কাছে নাট্যশিক্ষা নিয়েছেন। নাচের তালিম নিয়েছেন সে যুগের থিয়েটারের শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী নৃপেন বসুর কাছে। বিভিন্ন যুগের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। গিরিশ--অর্ধেন্দু—অমর দত্তের যুগের সঙ্গে তিনি পরিবর্তমান শিশিরযুগের সম্মিলন ঘটিয়েছেন—তাঁর বিস্তৃত অভিনয় জীবনে।

প্রথম মঞ্চাবতরণ মিনার্ভা থিয়েটারে, গিরিশ অনূদিত ও পরিচালিত 'ম্যাকবেথ' নাটকে 'ফ্লিয়ান্সে'র চরিত্রে, ১৮৯৩-এর ২৮ জানুয়ারি। ছোট্ট বিদেশী চরিত্রে সার্থকতার ফলে মিনার্ভার পরের নাটক 'মুকুলমুঞ্জরা'য় একেবারে নায়িকা চরিত্রে নির্বাচিত হন। এরপরে তাঁকে আর পেছনে তাকাতে হয়নি। তার সময়ে 'কুসুম' নামে বেশ কয়েকজন অভিনেত্রী ছিলেন। তাদের চিহ্নিত করার জন্য নামের পাশে বিষাদ, হাড়কাটা, প্রহ্লাদ

ইত্যাদি লিখতে হত। আলোচ্য কুসুমকুমারীর আলাদা কোনো পরিচয় দরকার হয়নি।

তার কালে সর্বজনপ্রিয়া এই অভিনেত্রী নানা বিচিত্র ধরনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বাংলা মঞ্চের অভিনয় ধারাকে পরিপুষ্ট করে তুলেছিলেন। আলিবাবাতে যেমন মর্জিনা, তেমনি ভ্রমরে ভ্রমর ; আবার রানী দুর্গাবতীতে দুর্গাবতী ; কিংবা দেবীচৌধুরানীতে দেবীরানী ; কিসমিসে লঘুতরল কিসমিস, কিংবা প্রেমের জেপলিনে হাস্যচপলা প্রমদা ; তেমনি আবার অকলঙ্ক শশীর শশী, কিংবা রাজা ও রানীর সুমিত্রার মতো দ্বন্দ্ব বহুল চরিত্রে অভিনয় করেছেন। প্রফুল্ল নাটকের শান্তস্নিগ্ধ প্রফুল্ল, আবার চন্দ্রশেখরের শৈবলিনীর জটিল চরিত্র—সবই তিনি অবলীলায় অভিনয় করেছেন। পৌরাণিক ভক্তিবিহ্বল চরিত্র, যেমন শ্রীকৃষ্ণ, দময়ন্তী, গোপা, তাতেও তিনি সার্থক, আবার বৃদ্ধ বয়সে শচীমাতা (শ্রীগৌরাঙ্গ), গৌতমী (শকুন্তলা), কৃষ্ণপ্রিয়া (মন্ত্রশক্তি) প্রভৃতি বয়স্কা চরিত্রেও সাবলীল ছিলেন। এছাড়া চৈতন্যলীলায় নিমাই, ভ্রমরে গোবিন্দলাল, শ্রীরাধায় শ্রীকৃষ্ণ, বঙ্গে বর্গীতে সিরাজ প্রভৃতি পুরুষ চরিত্রের অভিনয়েও সার্থক ছিলেন।

কুসুমকুমারীর নানা ধরনের চরিত্রাভিনয়ের উল্লেখযোগ্য পরিচয় :

নৃত্যগীতমুখর--মুকুলমুঞ্জরা (মুঞ্জরা), আলিবাবা (মর্জিনা), মনের মতন (দেলেরা), বহুৎ আচ্ছা (রেবেকা), লাট গৌরাঙ্গ (ভূমরী), হিরন্ময়ী (অবলা), দোললীলা (গোপী), শিরী-ফরহাদ (গুলবাহার), লয়লা-মজনু (মুন্না), প্রেমের জেপলীন (প্রমদা), সাজাহান (পিয়ারা)।

নক্সা-চটুল--মজা (ফুলকুমারী), থিয়েটার (রসবতী), সধবার একাদশী (কাঞ্চন), চাবুক (তরঙ্গিনী), প্রতাপাদিত্য (ফুলজানী), ঘুঘু (মন্দাকিনী), সিরাজদৌল্লা (জহরা), বিবাহবিভ্রাট (বিলাসিনী), তাজ্জব ব্যাপার (পাতখোলাওয়ালী)।

গভীর ভাবাত্মক--ম্যাকবেথ (লেডি ম্যাকবেথ), প্রফুল্ল (প্রফুল্ল, জ্ঞানদা), ইন্দিরা (ইন্দিরা), ভ্রমর (ভ্রমর), সীতারাম (শ্রী), সরলা (সরলা), কপালকুণ্ডলা (কপালকুণ্ডলা), চোখের বালি (বিনোদিনী), নীলদর্পণ (ক্ষেত্রমণি), দুর্গেশনন্দিনী, (আয়েষা), রিজিয়া (রিজিয়া)।

কুসুমকুমারীর সবচেয়ে কৃতিত্ব ছিল নৃত্যগীতের অভিনয়ে। ক্লাসিকে 'আলিবাবা' নাটকে নৃত্যগীতে তুফান তুলে কুসুমকুমারী (—মর্জিনা। আবদালা--নৃপেন বোস) বাংলা থিয়েটারে যে উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিলেন, তারই ফলে নৃত্যগীত পটিয়সী কুসুমকুমারীর জন্যই, তখন রঙ্গমঞ্চে প্রচুর নৃত্যগীতের অপেরা জাতীয় নাটক লিখিত ও অভিনীত হয়েছিল। এই ব্যাপারে তাঁর গুরু ও যোগ্য সহযোগী ছিলেন নৃপেন বোস।

সীরিয়াস চরিত্রাভিনয়ে তিনি একটা মাত্রা অবধি উঠতে পারতেন—তার বেশি গভীরে যেতে পারেন নি। তার সমকালে এই ধরনের অভিনয়ে তিনকড়ি, তারাসুন্দরী বা সুশীলাবালা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তবে যোগ্য গুরুর শিক্ষালাভে তিনি এই ধরনের সব চরিত্রেই সার্থকতা অর্জন করেছিলেন, কখনোই ব্যর্থ হননি।

কুসুমকুমারী ছিলেন চৌকস অভিনেত্রী। নাচ, গান, অভিনয়—এই তিনের সমাহার

তার মধ্যে ছিল। সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সাহস এবং শিক্ষার গুণ। তার চেহারায় একটা বাড়তি চটক ছিল, ছিল অদ্ভুত সুন্দর গানের গলা ; নানা ধরনের নৃত্যের শারীরিক সক্ষমতা। তার নিষ্ঠার অভাব এবং কিছু মুদ্রাদোষের কথা তার অভিনয় প্রসঙ্গে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন। তবুও বলা যেতে পারে, অভিনয়ের বহুমুখীন ও বহুমাত্রিক অভিনয় ক্ষমতায় তিনি তাঁর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী ছিলেন।

শেষের দিকে কুসুমকুমারী বয়সভারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, কণ্ঠস্বর নষ্ট হয়ে গেছে, চেহারায় জৌলুষ ফিকে হয়েছে, চলাফেরায় সপ্রতিভতা হারিয়েছেন। দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে গেলেন। একেবারে নিঃস্ব ও সহায়সম্বলহীন অবস্থায় ৭২ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়, ২৯ নভেম্বর, ১৯৪৮।

তারাসুন্দরী (১৮৭৮–১৯ এপ্রিল, ১৯৪৮)

সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রথম যুগের অন্যতমা শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী তারাসুন্দরী সাত বছর বয়সে বিডন স্ট্রিটের 'স্টার' থিয়েটারে চৈতন্যলীলায় বালকরূপে প্রথম মঞ্চাবতরণ করেন। প্রথম দিকে তিনি অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল বসু এবং গিরিশচন্দ্রের কাছে নাট্য শিক্ষালাভ করেন। গোড়ায় ছোট ছোট বালকবালিকা চরিত্রে অভিনয় করতে থাকেন। স্টারে 'হারানিধি' নাটকে হেমাঙ্গিনী ভূমিকাভিনয় তাঁর বড়ো চরিত্রে প্রথম অভিনয়। প্রথম জীবনে গান জানতেন না। রামতারণ সান্যালের কাছে গান এবং কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে নৃত্য শিক্ষা করেন। অভিনয়ে, নৃত্যগীতে পারদর্শী হয়ে তের বছর বয়সেই তারাসুন্দরী চৈতন্য, গোপা, দময়ন্তী প্রভৃতি গভীর চরিত্রাভিনয়ে সাফল্য লাভ করেন। স্টার, ক্লাসিক, মিনার্ভা, অরোরা, ইউনিক, কোহিনূর, নাট্যমন্দির প্রভৃতি সেকালের সেরা সব রঙ্গালয়ে প্রধানা অভিনেত্রীর ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর জীবনে বেশ কিছুটা সময় তিনি অমরেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে ও সাহচর্যে থেকে নাট্যাভিনয় করেন। এবং শেষ দিকে প্রথমে শিশির ভাদুড়ির সম্প্রদায়ে এবং পরে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুক্ত থেকে নাট্যাভিনয় করেন। উনিশ শতকের শেষ দিকে এবং বিশ শতকের প্রথম তিন দশক তিনি থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নানা দল, নানা নট-নটী, যুগীয় নানা অভিনয়ের ধারা পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই তারাসুন্দরী নিজের অভিনেত্রী জীবন পূর্ণ করেছিলেন। বারাঙ্গনার জীবন থেকে উঠে এসে নিজের চেষ্টায়, নিষ্ঠায় ও অনুশীলনে এবং ক্ষমতা-প্রতিভায় তিনি তাঁর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হতে পেরেছিলেন। নানা গুরুর শিক্ষা ও তালিমের সঙ্গে নিজস্ব সহজাত উদ্ভাবনী শক্তি ও প্রতিভায় নানাবিধ চরিত্র রূপায়ণে সার্থকতা অর্জন করতে পেরেছিলেন।

গাম্ভীর্যপূর্ণ অভিনয়ে তারাসুন্দরী সেরা ছিলেন। শৃঙ্গার ও করুণরসের ভাবাভিব্যক্তির ক্ষমতাও তাঁর ছিল। গৃহলক্ষ্মী, স্বভাবপ্রবণ ভাবনার চরিত্রাভিনয়েও তিনি নিরুপমা ছিলেন। সামাজিক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও গীতিনাট্য—সব ধরনের নাটকের অভিনয়েও তিনি সমান সফল ছিলেন। তাঁর অভিনয় সম্পর্কে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

লিখেছেন--'নটীদের মধ্যে প্রথমে তিনকড়ি, পরে তারাসুন্দরী, এরাই সত্যকার প্রথম শ্রেণীর, অন্যের পটুত্ব ছিল বিশেষ অংশের'। তাঁর বাচন ভঙ্গি, সুস্পষ্ট ও শুদ্ধ উচ্চারণ, স্বর প্রক্ষেপণ অতুলনীয় ছিল। তাই চেহারায় অন্যদের থেকে ন্যূন হলেও শুধু অভিনয় ক্ষমতাতেই তিনি সেরা হতে পেরেছিলেন।

গাম্ভীর্যপূর্ণ অভিনয়--শৈবলিনী (চন্দ্রশেখর), মতিবিবি (কপালকুণ্ডলা), রিজিয়া (রিজিয়া), লক্ষ্মীবাঈ (ছত্রপতি শিবাজী), শ্রী (সীতারাম), ক্লিওপেট্রা (ক্লিওপেট্রা), ডেসডিমোনা (ওথেলো), বেগম (অযোধ্যার বেগম), জনা (জনা), উদিপুরী (আলমগীর), সরস্বতী (বলিদান), জাহানারা (সাজাহান), আয়েষা (দুর্গেশনন্দিনী)।

গভীর ভাব ও রসাত্মক অভিনয়--রাধিকা (হিন্দি ভাষায় কৃষ্ণবিলাস), দময়ন্তী (নল দময়ন্তী), চিন্তামণি (বিল্বমঙ্গল), গোপা (বুদ্ধদেব), শৈব্যা (হরিশচন্দ্র), গৌরী (হরগৌরী)।

নৃত্যগীত ও চটুল অভিনয়ে তিনি ততোখানি পারদর্শিনী ছিলেন না। তবে সীরিয়াস চরিত্রাভিনয়ে তাঁর কৃতিত্ব সকলেই স্বীকার করেছেন। বিপিনচন্দ্র পাল, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং গিরিশচন্দ্রও তাঁর অভিনয়ের সুখ্যাতি করেছেন।

৭০ বছর বয়সে, ১৯৪৮-এর ১৯ এপ্রিল এই প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীর মৃত্যু হয়।

ব্রজেন্দ্রকুমার দে (১৯০৭–১৯৭৬)

তাঁর সময়কালের সবচেয়ে খ্যাতিমান ও জনপ্রিয় যাত্রাপালার রচয়িতা হলেন ব্রজেন্দ্র কুমার। উচ্চশিক্ষিত মানুষটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তাঁর শিক্ষা, রুচি, সাহিত্যবোধ এবং শালীনতা জ্ঞান তাঁর পালাকে করেছে মার্জিত, গভীর ও বহুবিস্তৃত।

ব্রজেন্দ্রকুমারের নিজের যাত্রাদল ছিল না। তবে কোনো-না-কোনো যাত্রাদলের সঙ্গে তিনি অনেক সময়েই পেশাদার পালাকার হিসেবে যুক্ত থেকেছেন। স্বাধীন ভাবেও অনেক পালা লিখেছেন, যেগুলি পরে অন্য দল অভিনয় করেছে। তাঁর জীবনের পঞ্চাশ বৎসর কেটেছে পেশাদার যাত্রার প্রত্যক্ষ সংস্রবে। ১৯২৫-এ লেখা 'স্বর্ণলতা' তাঁর প্রথম রচনা--তারপর থেকে আমৃত্যু তিনি পালা রচনা করে গেছেন।

ব্রজেন্দ্রকুমার পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, কাল্পনিক, সামাজিক কাহিনী, রূপক ও পল্লীগাথা নিয়ে লোকনাট্য--সব কিছুই রচনা করেছেন। তাঁর নাটকে ইতিহাসের চেয়ে কল্পনা-মুখ্য রোমান্স প্রাধান্য পেয়েছে বেশি। দেশপ্রেম, হিন্দু-মুসলমান ঐক্যবোধ তাঁর পালার মূল সুর। জাতির কর্মপ্রবণতার উদ্যোগকে উৎসাহ দিয়েছেন। সমাজপতিদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগেও তিনি উচ্চকণ্ঠ। ব্রিটিশ রাজশক্তির অত্যাচার, পরাধীন জাতির দুর্দশা, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তাঁর পালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে। গণজীবনে দুর্দশা, তাদের বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ তাঁর পালায় লক্ষ্য করা যায়।

ব্রজেন্দ্রকুমারের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পালা :

স্বর্ণলঙ্কা (১৯২৫), বজ্রনাভ (১৯৩২), স্বামীর ঘর (১৯৪৫), আকালের দেশ (১৯৪৫), গাঁয়ের মেয়ে (১৯৫১), বাঙালি (১৯৪৮), কবি চন্দ্রাবতী (১৯৬১), সোনাই দিঘী (১৯৬২), সম্রাট জাহাঙ্গীর (১৯৬৩), রক্তের নেশা (১৯৬৩), ধূলার স্বর্গ (১৯৬৩), প্লাবন (১৯৬৪), সোনার ভারত (১৯৬১)।

প্রচলিত যাত্রাপালায় ব্রজেন্দ্রকুমার অনেক নতুনত্ব দেখিয়েছেন। তার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব :

১. ভাঁড়ামো বর্জন করে চরিত্রোপযোগী হাস্যরসসৃষ্টি। ২. দীর্ঘ সংলাপ বর্জন করে সংক্ষিপ্ত সংলাপ রচনা। ৩. আগের যাত্রায় চরিত্র শুধু মাত্র ঘটনা বহন করত, তাঁর রচনায় চরিত্র বিশ্লেষণ দেখা গেল। ৪. কাহিনী গ্রন্থন ও বিন্যাসের কৃতিত্বে তিনি তাঁর পালাকে এমনভাবে গঠন করেন যাতে অব্যর্থভাবে রসসৃষ্টি হয়। ৫. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেশের নানা উত্থান-পতন, নানা ঘটনার তিনি সাক্ষী। তাঁর পালাতেও বিষয়ের বিস্তার, বিষয়ের গভীরতা এবং ঘটনার বৈচিত্র্য বহুমুখী রূপ লাভ করেছে। ষাটের দশকের পর থেকে যাত্রাপালার পরিবর্তন, অবক্ষয়, যান্ত্রিকতার অনুপ্রবেশ, চমক ব্রজেন্দ্রকুমারকে ব্যথিত করেছিল। যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে তিনি যাত্রাপালাকে উন্নত করতে চেষ্টা করে গেছেন। তাঁর 'যাত্রার একাল-সেকাল' গ্রন্থে এই পরিচয় রয়েছে।

নির্মলেন্দু লাহিড়ী (১৮৯১–১৯৫০)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪—১৮) পর বাংলা থিয়েটারে যে কয়েকজন প্রথমশ্রেণীর উচ্চমানের অভিনেতা এসেছিলেন, তাঁর মধ্যে শিশিরকুমার ভাদুড়ি, অহীন্দ্র চৌধুরী ও দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নির্মলেন্দু লাহিড়ীর নামও স্মরণযোগ্য। এঁদের সমসাময়িক অভিনেতা নির্মলেন্দু ১৯২১ থেকে ১৯৫০ সুদীর্ঘ প্রায় ত্রিশ বৎসর বাংলা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেছেন।

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ভগিনী মালতী দেবীর তিনি পঞ্চমপুত্র। পিতা নিকুঞ্জমোহন ছিলেন ডাক্তার। পিতৃ-আবাস শান্তিপুর ছেড়ে তিনি মামা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কলকাতার বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করেন। সেই বাড়িতে ছিল থিয়েটারের পরিবেশ। সেখানে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। দাদা অমলেন্দুও থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। থিয়েটারের পরিবেশ ও নাট্যব্যক্তিত্বদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে থিয়েটারের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন।

তাঁর সম্পর্কে তাঁর মামাতো ভাই দ্বিজেন্দ্র-পুত্র দিলীপকুমার রায় লিখেছেন : 'রূপে ছিলেন তিনি অপরূপ, আবৃত্তিতে অসাধারণ, হাসিতে অনিন্দ্যনীয়, স্বরে সুকণ্ঠ, আলাপে অনবদ্য। আর কি সুন্দর তাঁর উচ্চারণ।'

প্রথমে অফিসের থিয়েটারে শৌখিন অভিনয় করে খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর সাজাহান চরিত্রে অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে ম্যাডান থিয়েটারের মালিক রুস্তমজী তাঁকে চারশো

টাকা মাইনেতে অভিনয়ের প্রস্তাব দেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদও তাঁকে 'প্রতাপাদিত্য' নাটকে অভিনয়ের জন্য আহ্বান করেন। তখনকার সামাজিক বাধার জন্য মনস্থির করতে পারেন নি। এই সময়ে শিশিরকুমার ভাদুড়ির থিয়েটারে যোগদানের খবরে উৎসাহিত হয়ে দ্বিধা কাটিয়ে থিয়েটারে পুরোপুরি যোগ দেন।

নির্মলেন্দুর পেশাদারি থিয়েটারের জীবন শুরু ম্যাডান থিয়েটারে ১৯২২ সালে। সেখান থেকে স্টার, মিত্র থিয়েটার, মনোমোহন, নাট্যনিকেতন, নাট্যভারতী, মিনার্ভা, রঙমহল হয়ে নিজের তৈরি ভ্রাম্যমান 'নিউ মনোমোহন থিয়েটারে' অভিনয় করেন। প্রথম অভিনয় ম্যাডানে রত্নেশ্বর চরিত্রে (রত্নেশ্বরের মন্দির)।

দীর্ঘ প্রায় ত্রিশ বৎসর অভিনয় জীবনে নির্মলেন্দু নানাধরনের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তাঁর সময়ে শিশিরকুমার বাংলা থিয়েটারে নতুন ভাবনার জগৎ সৃষ্টি করে চলেছেন। অভিনয়েও প্রতিষ্ঠা করছেন নবধারা। সে সময়ে গিরিশ-পুত্র দানীবাবু গিরিশের পুরনো অভিনয়ের ধারাকে বহন করে চলেছেন। অহীন্দ্র চৌধুরী গিরিশের ধারার সঙ্গে নবভাবনার সংযোগ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। নির্মলেন্দুর অভিনয়ে এই পুরনো ও নতুন ধারার সংমিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়। সুরেলা ও আবেগপ্রবণ এবং আবৃত্তিনির্ভর অভিনয়ে তিনি দানীবাবুর ধারাকে সুসংহত রূপ দিয়েছিলেন। আবার স্বর ব্যবহার, বাচিক অভিনয়ের ওপর জোর এবং উচ্চারণের স্পষ্টতা ও অর্থবহ করে তোলা এবং ছন্দের মর্যাদা রক্ষার দক্ষতার মধ্যে নতুন যুগের অভিনয় ধারার অনুরণন দেখা যায়। অনেকে তাই তাঁর অভিনয়ধারাকে দানীবাবুর বা শিশিরকুমারের কোনোটাতেই ফেলতে চান না। তিনি অনেকটা যুগসন্ধিক্ষণের প্রতিভার মতো দুটো ধারার অনুবর্তন এবং প্রত্যুদ্গমন একসঙ্গে করেছিলেন।

নায়কোচিত সুদর্শন স্বাস্থ্যবান চেহারা এবং ভরাট সুরেলা কণ্ঠস্বর—তাঁর অভিনয়ের সহায়ক হয়েছিল। সমসাময়িক অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন :

'উদাত্ত ও মধুর ছিল তাঁর কণ্ঠ। সে কণ্ঠের জুড়ি নেই। তারপরে অভিনেতা হিসেবেও সে ছিল একজন জাত অভিনেতা। সিরাজদৌল্লা নাটকে সিরাজের ভূমিকায়, গৈরিক পতাকা নাটকে শিবাজী, আর বঙ্গে বর্গীতে ভাস্কর পণ্ডিত। এ অভিনয় ভুলবার নয়। তাঁর যাদুকরী কণ্ঠে যে দরদ ফুটে উঠত, যে আবেগ মথিত হতো তাতে দর্শকেরা অভিভূত না হয়ে পারত না।' [অহীন্দ্র চৌধুরী—নিজেরে হারায়ে খুঁজি]

তাঁর দীর্ঘ অভিনয় জীবনে তিনি বহুবিচিত্র চরিত্রে রূপদান করেছেন। তার মধ্যে অনেকগুলিই সে যুগে খ্যাতিলাভ করেছিল এবং বেশ কিছু চরিত্রের অভিনয় কিংবদন্তী হয়ে আছে।

শিবাজী (গৈরিক পতাকা), সিরাজ (সিরাজদৌল্লা), ভাস্কর পণ্ডিত (বঙ্গের বর্গী), দিলদার (সাজাহান), কংস (কারাগার), যোগেশ (প্রফুল্ল), শামন্দেশ (মিশরকুমারী), সাগরসিংহ (মেবারপতন), ওসমান (দুর্গেশনন্দিনী), প্রতাপাদিত্য (প্রতাপাদিত্য), হুমড়ো সর্দার (মহুয়া) প্রভৃতি চরিত্রাভিনয় বাংলা থিয়েটারে স্মরণীয় হয়ে আছে।

এছাড়া ঔরঙ্গজেব (সাজাহান), সমুদ্রগুপ্ত (সমুদ্রগুপ্ত), চাণক্য (চন্দ্রগুপ্ত), গোবিন্দলাল (কৃষ্ণকান্তের উইল), ভজহরি (প্রফুল্ল), খিজির খাঁ (দেবলাদেবী), বাজীরাও (বাজীরাও), জয়সিংহ (রাষ্ট্রবিপ্লব), বিধুভূষণ (সরলা), নলিন (পথের শেষে) প্রভৃতি নানাধরনের চরিত্রে অভিনয়ের সার্থকতা তার কৃতিত্বের পরিচয় দেয়।

১৯৫০-এর ২৩ জানুয়ারি তাঁর শেষ অভিনয় 'দেবদাস' নাটকে বসন্ত চরিত্রে, রঙমহল মঞ্চে। শরৎচন্দ্রের মূল উপন্যাসে বসন্ত চরিত্র ছিল না। নির্মলেন্দুর অভিনয়ের জন্যই নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত এই চরিত্রটি সৃষ্টি করেছিলেন। এই চরিত্রে নির্মলেন্দুর অভিনয় অনেকেরই উচ্ছ্বসিত প্রশংসালাভ করেছিল।

অভিনয় সম্পর্কে নির্মলেন্দুর নিজস্ব মত ছিল : 'দর্শকের মনে প্রবেশ করতে হবে. সুরে সুর মেলাতে হবে।' চরিত্রের সুরে সুর মিলিয়ে নির্মলেন্দু অনায়াসেই দর্শকের মনে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। সে যুগে তিনি জনপ্রিয় ছিলেন।

অহীন্দ্র চৌধুরী (১৮৯৫-১৯৭৪)

বিংশ শতকের বিশের দশকে থিয়েটারে মুখ্যত অভিনেতা হিসেবে আবির্ভাব। শিশিরকুমার ভাদুড়ির সমকালে অন্যতম উল্লেখযোগ্য অভিনেতা। দীর্ঘকাল নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে অভিনেতা, নাট্যপ্রযোজক এবং পরিচালক হিসেবে যুক্ত ছিলেন। তবে অভিনেতা হিসেবেই তাঁর খ্যাতি বিস্তৃত। শিশিরযুগে, নতুনতর অভিনয় ধারার বিকাশের যুগে, অহীন্দ্র চৌধুরী তাঁর পূর্ববর্তী গিরিশচন্দ্র প্রবর্তিত অভিনয় ধারাকেই বিকশিত করে তুলতে চেয়েছিলেন। 'আমি গিরিশচন্দ্রের একলব্য শিষ্য। মনে মনে তাঁকে গুরুর আসনে বসিয়ে অভিনয় শিক্ষা করেছি।'--নিজের অভিনয় সম্বন্ধে অহীন্দ্র চৌধুরী শেষ জীবনেও এই মত পোষণ করে গেছেন। শিশির ভাদুড়ি যেখানে অভিনীত চরিত্রকে যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করে তাকে ফুটিয়ে তুলতে চাইতেন, অহীন্দ্র চৌধুরী সেখানে আবেগপ্রবণ ভাবনায় চরিত্রটিকে বিভোর করে তুলে নিজেই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়তেন। আর্ট থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা' নাটকে অহীন্দ্র চৌধুরী চন্দ্রবাবু চরিত্রটিকে আত্মভোলা করে তুলে তার ভুলভ্রান্তি ফোটানোর সুযোগে দর্শককে হাস্যাপ্লুত করে দিতেন। ঐ থিয়েটারেই অহীন্দ্রের অনুপস্থিতিতে শিশিরকুমার যখন 'চন্দ্রবাবু' অভিনয় করেছিলেন তখন তিনি ঐ চরিত্র রূপায়ণকে পালটে তাকে 'ইনটেলেকচুয়াল' করে ছিলেন। সেই অভিনয় দেখে রসিক দর্শকের মনে পড়ত রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা। অহীন্দ্র চৌধুরীর চন্দ্রবাবু লোক হাসাত, শিশিরবাবুর চন্দ্রবাবু দর্শককে ভাবাত। সাজাহান চরিত্রাভিনয়ে অহীন্দ্র চৌধুরী বৃদ্ধ সাজাহানকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে অভিনয় করতেন আবেগ দিয়ে। তিনি নিজেই জানিয়েছেন যে, তাঁর ঐ ধরনের ডোল (form) তৈরি হয়েছিল প্রধানত তৎকালীন জ্যেষ্ঠ অভিনেতা তিনকড়ি চক্রবর্তী এবং ভূজঙ্গধরের শিক্ষায়। যাঁরা স্বভাবতই সুরেলা অভিনয়ের ধারাকেই চালু রাখতে চেয়েছিলেন। অহীন্দ্র চৌধুরীর মন্তব্য : 'আমরা নিজেদের অভিনয়ের মধ্যে গিরিশযুগকে ধরে রেখেছিলাম—আমাদের মৃত্যুর সঙ্গে

সঙ্গে এর শেষ হবে।' এবং 'আমার অভিনয় ধারার অনুবর্তী কেউ নেই।' সাধারণ দর্শককে খুশি করার জন্য 'গ্যালারি শো'—তিনি করতেন। জানতেন থিয়েটারের গরিষ্ঠ দর্শকই সাধারণ মানুষ, জনাকয়েক বুদ্ধিজীবী মাত্র নয়।

অহীন্দ্র চৌধুরী অভিনয়ের তৎকাল প্রচলিত সব মিডিয়াতেই সার্থক হয়েছিলেন। চলচ্চিত্র, বেতার, থিয়েটার সর্ব ক্ষেত্রেই তাঁর অনায়াস সাফল্য দেখতে পাওয়া যায়।

প্রথম মঞ্চাবতরণ আর্ট থিয়েটারের হয়ে স্টার থিয়েটার মঞ্চে, 'কর্ণার্জুন' নাটকে 'অর্জুন-এর ভূমিকায়, ৩০ জুন, ১৯২৩। আর্ট থিয়েটারে রাজা ও রানী (কুমারসেন), চন্দ্রগুপ্ত (চন্দ্রগুপ্ত), প্রফুল্ল (রমেশ), চিরকুমার সভা (চন্দ্রবাবু), গৃহপ্রবেশ (যতীন), ম্যাকবেথ (ম্যাকবেথ), রাজসিংহ (ঔরঙ্গজেব), চাঁদসদাগর (চাঁদ-সদাগর), বঙ্গেবর্গী (ভাস্কর পণ্ডিত), আলমগীর (আলমগীর), মন্ত্রশক্তি (মৃগাঙ্ক), মিশরকুমারী (আবন), বৈকুণ্ঠের খাতা (বৈকুণ্ঠ) প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করে প্রচুর খ্যাতিলাভ করেন।

নাট্যনিকেতনে কেদার রায় (কেদার রায়), গোরা (পরেশবাবু), পথের দাবী (সব্যসাচী) প্রভৃতি নাটকের অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য। নাট্য-ভারতীতে থাকাকালীন বিশ বছর আগে (দুঃখহরণ), পি. ডব্লু. ডি. (রায়বাহাদুর), সরলা (গদাধর), কঙ্কাবতীর ঘাট (মিঃ মুখার্জ্জী), মিনার্ভা থিয়েটারে বেহুলা (চন্দ্রশেখর), দেশের ডাক (গুণধর), প্রতাপাদিত্য (ভবানন্দ), পোষ্যপুত্র (শ্যামকান্ত), রঙমহলে চরিত্রহীন (শিবপ্রসাদ), তটিনীর বিচার (ডাঃ ভোস), চরিত্রহীন (উপেন), ভোলামাষ্টার (ভোলামাষ্টার), বিংশশতাব্দী (ডাঃ শাস্ত্রী), আনন্দমঠ (সত্যানন্দ), বঙ্গেবর্গী (আলিবর্দী), মাইকেল মধুসূদন (মাইকেল), স্টারে আলমগীর (রাজসিংহ), বলিদান (রূপচাঁদ), ষোড়শী (এককড়ি), রণজিৎ সিংহ (রণজিৎ সিংহ), দুর্গাদাস (ঔরঙ্গজেব), জনা (বিদূষক) প্রভৃতি চরিত্রাভিনয় স্মরণীয়।

আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর শেষ মঞ্চাভিনয় দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' নাটকে সাজাহান চরিত্রে, মিনার্ভা থিয়েটারে, ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭।

আর্ট থিয়েটার, স্টার, মিনার্ভা, নাট্যনিকেতন, নাট্যভারতী, রঙমহল প্রভৃতি সেরা রঙ্গালয়-গুলিতে অহীন্দ্র চৌধুরী একটানা ৩৪ বছর বহু বিচিত্র চরিত্রে আস্বাদনীয় অভিনয় করেছেন। মোট ১১৪টি নাটকে ১৩৮টি ভিন্ন চরিত্রে তাঁর অভিনয় স্মরণীয় হয়ে আছে। ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, সামাজিক, প্রহসন ইত্যাদি সবজাতীয় নাটকেই তিনি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারতেন। ক্রুর, খল, গম্ভীর, করুণ, হাস্য সব ধরনের চরিত্রেই তিনি সাবলীল।

নাট্যচর্চায় সুপণ্ডিত, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যবিভাগের অধ্যক্ষ, অভিজাত, উন্নত দেহ, গৌর কান্তি, তীক্ষ্ণনাসা, গম্ভীর কণ্ঠস্বরে ও অভিব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল অহীন্দ্র চৌধুরী বাংলা থিয়েটারের সম্পদ। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' (১ম+২য় খণ্ড), 'নাট্যবিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র', 'বাঙালির নাট্যচর্চা' উল্লেখযোগ্য।

মৃত্যু : ১৯৭৪-এর ৪ নভেম্বর।

বিজন ভট্টাচার্য (১৭ই জুলাই, ১৯১৭–১৯ জানুয়ারি, ১৯৭৮)

নাট্যকার, নাট্যপরিচালক ও অভিনেতা। ১৯৪০-এর দশকে ভারতীয় গণনাট্যসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হলে, গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়ে তাঁর নাট্যজীবনের শুরু হয়। গতানুগতিক বাণিজ্যিক থিয়েটারের নাট্যাভিনয়ের ধারা থেকে স্বতন্ত্র যে জীবনমুখি ও সংগ্রাম মুখর নাট্য আন্দোলনের সূচনা করেছিল ফ্যাসি-বিরোধী লেখক শিল্পী সঙ্ঘ এবং তার সাংস্কৃতিক শাখা ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ--বিজন ভট্টাচার্য তার প্রথম সারির নাট্যকর্মী ছিলেন। ভাবে, ভাবনায়, চেতনায় ও সংগ্রামে প্রগতিশীল জীবনদ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটিয়ে নাটক রচনা ও নাট্যাভিনয়ের যুগান্তকারী সূচনা করেছিল ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ। বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যরচনা, অভিনয় ও পরিচালনা সর্বাঙ্গীন রূপলাভ করেছিল এই গণনাট্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এই আন্দোলনই তাঁকে গঠিত করেছিল নট-নাট্যকার-পরিচালক রূপে। গণনাট্য সঙ্ঘের (তখন ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সঙ্ঘ) প্রথম নাটক 'আগুন' তাঁরই রচনা, ১৯৪৩-এ মঞ্চস্থ হয়। ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে অভিনীত 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন' তাঁরই লেখা নাটক। গণনাট্য সঙ্ঘের এই নাটকগুলিতে তিনি প্রধান ভূমিকাভিনেতা ও অন্যতম নির্দেশক হিসেবে কাজ করেছেন। ১৯৪৪-এর ২৪শে অক্টোবর 'শ্রীরঙ্গম' মঞ্চে নবান্নের প্রথম অভিনয় থেকেই বাংলা নাট্যাভিনয়ের জগতে তুমুল আলোড়ন দেখা দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অস্থিরতা, বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলন, প্রাকৃতিক দুর্বিপাক, পঞ্চাশের মন্বন্তরের দুর্বিষহ প্রতিচ্ছবির পটভূমিকায় 'নবান্ন' (এবং জবানবন্দী-ও) রচিত। গণনাট্য আন্দোলন এবং বিজন ভট্টাচার্যের নাটক বাংলা নাট্যরচনা ও অভিনয়ের ধারায় দিক পরিবর্তনের পালা বদল ঘটিয়ে দিল।

১৯৪৮ থেকেই গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গে বিজন ভট্টাচার্যের মতান্তর ঘটে। '৪৮ থেকে '৫০, তিনি বোম্বাইয়ে গিয়ে হিন্দি সিনেমার সঙ্গে যুক্ত থাকেন। ১৯৫০-এ বাংলায় ফিরে এসে নিজের নাট্যদল 'ক্যালকাটা থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানেও তিনিই নাট্যকার, প্রধান অভিনেতা এবং পরিচালক। এখানে তাঁর কলঙ্ক, গোত্রান্তর, মরাচাঁদ, দেবী গর্জন, গর্ভবতী জননী নাটক অভিনীত হয়ে সাফল্য লাভ করে।

১৯৭০-য়ে 'ক্যালকাটা থিয়েটার' ছেড়ে দিয়ে বিজন ভট্টাচার্য নতুন দল তৈরি করলেন 'কবচ-কুণ্ডল' নাম দিয়ে। তাঁর লেখা 'কৃষ্ণপক্ষ', 'আজবসন্ত', 'চলো সাগরে', 'লাস ঘুইর‍্যা যাউক' প্রভৃতি নাটক এখানে অভিনীত হয়।

মার্কসিয় বিশ্বাসে নিজেকে গড়ে তুলে বিজন ভট্টাচার্য গণনাট্য সঙ্ঘে নাটক রচনা, পরিচালনা ও অভিনয় করতে থাকেন। কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের জীবন সংগ্রাম ও বাঁচবার লড়াই তাঁর নাটকের মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল। ক্রমে ক্রমে তিনি সেই ভাবনা থেকে সরে যেতে থাকেন ; গণনাট্য সঙ্ঘ ত্যাগ করেন ; নিজের নাট্যদল একাধিকবার ভেঙে গড়ে তৈরি করেন। তাঁর নাটক থেকেও জীবন-সংগ্রামমুখি ভাব দূরে চলে যেতে থাকে। ক্রমে মার্কসিয় দর্শনের সঙ্গে (কখনো পরিবর্তে) লোকায়ত ধর্ম, দর্শন, হিন্দু ধর্মের সমন্বয় প্রয়াসী মানসিকতা কাজ করে যেতে থাকে। চিরকালীন এক মাতৃকা

ভাবনার (গ্রেট মাদার তত্ত্ব) অনুধ্যান তাঁর নাটকে প্রায়শই লক্ষ্য করা যায়। বহুবিচিত্র সংলাপ, কাব্যিক ব্যঞ্জনা, আবার জীবনদ্বন্দ্বে মুখর তাঁর নাটকগুলিকে করে তুলেছে আস্বাদনীয়, সে পাঠেও হোক কিংবা অভিনয়েও হোক।

বিজন ভট্টাচার্যের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাটক হলো (রচনাকাল হিসেবে) :

জবানবন্দী (১৯৪৩), নবান্ন (১৯৪৪), জীয়নকন্যা (১৯৪৫), মরাচাঁদ (১৯৪৬), গোত্রান্তর, ছায়াপথ (১৯৬১), দেবীগর্জন (১৯৬৬), ধর্মগোলা (১৯৬৭), কৃষ্ণপক্ষ (১৯৬৬), গর্ভবতী জননী (১৯৬৯), আজ বসন্ত (১৯৭০), লাস ঘুইর‍্যা যাউক (১৯৭০), চলো সাগরে (১৯৭২), হাঁসখালির হাঁস (১৯৭৬)। তাঁর এইসব নাটকই অভিনীত হয়েছে।

।ভিনেতা হিসেবেও বিজন ভট্টাচার্য অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বহুবিচিত্র চরিত্রের ভাব ও কর্ম প্রকাশে তিনি পারদর্শী ছিলেন। নানা উপভাষার সংলাপ উচ্চারণেও তিনি সাফল্য অর্জন করেন। বেন্দা (জবানবন্দী), প্রধান সমাদ্দার (নবান্ন), পবন ও কেতকাদাস (মরাচাঁদ), হরেন মাস্টার (গোত্রান্তর), প্রভঞ্জন (দেবীগর্জন), মামা (গর্ভবতী জননী), কেদার (আজ বসন্ত), সুরেন ডাক্তার (চলো সাগরে) তাঁর উল্লেখযোগ্য অভিনয়ের স্বাক্ষর হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

নাট্যনির্দেশক হিসেবে তাঁর জবানবন্দী, নবান্ন গণনাট্যের যুগে অবিস্মরণীয় প্রযোজনার দলিলরূপে স্বীকৃত। পরে তাঁর নিজের গ্রুপ থিয়েটারে মরাচাঁদ, গর্ভবতী জননী, দেবীগর্জন, প্রথম শ্রেণীর প্রযোজনার সাক্ষী।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই বাংলা নাটক ও নাট্যাভিনয়ে যে নবীন জীবনভাবনা, উপেক্ষিত কৃষক-শ্রমিকের উপস্থিতি, সংগ্রামী জীবনচেতনা, মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত মানুষের প্রাধান্য প্রকাশ পেতে থাকে, গণনাট্যের অন্যতম পুরোধা হিসেবে বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যকর্মে তারই সার্বিক পটোত্তোলন ঘটেছিল।

শম্ভু মিত্র (২২ আগস্ট, ১৯১৫–১৮ মে ১৯৯৭)

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা রঙ্গমঞ্চের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও নাট্যনির্দেশক। পিতা শরৎ মিত্রের জ্যেষ্ঠ সন্তান শম্ভু মিত্রের দোহারা উন্নত চেহারা, তীক্ষ্ণ নাক ও চোখ, শ্যামলা গায়ের রঙ তাঁকে সবধরনের চরিত্রের অভিনয়ের উপযোগী করেছিল। তাঁর সুরেলা মার্জিত কণ্ঠস্বর, স্পষ্ট ও অর্থবহ উচ্চারণ, মডিউলেশন এবং শব্দনিক্ষেপ এতোই পরিশীলিত ছিল যে, সাধারণ মানের কোনো অভিনেতার পক্ষে তার ধারে কাছে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তবে উচ্চারণে অহেতুক জোর এবং কণ্ঠস্বরে নাসিক্যধ্বনির প্রাবল্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে ম্যানারিজমে পরিণত হয়েছিল। তাঁর কাছে যারা নাট্য শিক্ষা লাভ করেছেন, তাদের মধ্যে অভিনয়ক্ষমতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই ম্যানারিজমের প্রকাশও দেখতে পাওয়া যায়।

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কালেই তিনি অভিনয় জগতে আসেন। বাণিজ্যিক থিয়েটার, গণনাট্য এবং গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নিজের নাট্যপ্রতিভার বিকাশ ঘটিয়েছেন।

বাণিজ্যিক থিয়েটার রঙমহলে ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে শম্ভু মিত্র নাট্যাভিনয় শুরু করেন। বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মালা রায়' নাটকে একটি ছোট ভূমিকায়। পরিচালক ছিলেন নরেশ মিত্র। এখানে 'রত্নদীপ' ও 'ঘূর্ণী' নাটকেও অভিনয় করেন। 'ঘূর্ণী'র নির্দেশক ছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী। তারপর মিনার্ভায় 'জয়ন্তী' নাটকে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের পরিচালনায় অভিনয় করেন। নাট্যনিকেতনে 'কালিন্দী' (মিঃ মুখার্জী) এবং 'মাটির ঘর' নাটকেও অংশ গ্রহণ করেন। শিশিরকুমার ভাদুড়ির শ্রীরঙ্গম মঞ্চে 'জীবনরঙ্গ', 'উড়ো চিঠি' নাটকেও নামেন। সেখানে 'সীতা' নাটকে কখনো শত্রুঘ্ন, কখনো বশিষ্ঠ চরিত্রে অভিনয় করেছেন। 'আলমগীরে' দিলীর খাঁ-ও করেছেন। পরে বি. এস. সি—র ট্যুরিং থিয়েটারে থেকে নানা জায়গায় ঘুরে অভিনয় করেছেন কিছু কিছু নাটকে।

বাণিজ্যিক থিয়েটারে থাকাকালীন (১৯৩৯-৪২) তিনি তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পাননি এবং দক্ষতাও দেখাতে পারেন নি। তবে অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশ চৌধুরী, নরেশ মিত্র, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রমুখ এবং অবশ্যই শিশির ভাদুড়ির সঙ্গে অভিনয় করে নিজেকে অভিনেতা হিসেবে প্রস্তুত করেন। তাঁর নিজস্বতা গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নির্মলেন্দু লাহিড়ী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিশির ভাদুড়ির স্বরক্ষেপণ ও উচ্চারণের রেশও শম্ভু মিত্রের মধ্যে থেকে গিয়েছিল।

বাণিজ্যিক থিয়েটারে শম্ভু মিত্র খুব একটা নিজেকে প্রতিষ্ঠার সুযোগ পাননি। ১৯৪৩-এ সেই সুযোগ পেলেন ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘে যোগ দিয়ে। বাংলায় তখন ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সঙ্ঘের সাংস্কৃতিক শাখা হিসেবে গণনাট্য সঙ্ঘ নাট্যাভিনয় করছে। ১৯৪৩-এর মন্বন্তরের সময়ে তারা নানা নাটক অভিনয় করছে। শম্ভু মিত্র গণনাট্য সঙ্ঘে যোগ দিয়ে সেখানে অভিনয় ও নাট্যপরিচালনা করতে থাকেন। গণনাট্য সঙ্ঘে সে সময়ে যে সব তরুণ তরতাজা শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা অভিনয় করতে এসেছিল, তাদের কারোরই নাট্যাভিনয় বা পরিচালনার পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। শম্ভু মিত্রের তা ছিল। তাই স্বাভাবিকভাবেই তিনি একাজে সুযোগ পেলেন বেশি।

১৯৪৩-এ গণনাট্য সঙ্ঘের হয়ে 'ল্যাবরেটরী' নাটকের পরিচালনা ও প্রধান ভূমিকায় (বৈজ্ঞানিক) অংশ নিলেন। 'জবানবন্দী'তেও তাই। তারপর বিজন ভট্টাচার্যের লেখা 'নবান্ন' নাটক পরিচালনায় যৌথ দায়িত্ব পালন করেন এবং অভিনয়ে অংশ নেন। নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য আরেকজন পরিচালক ছিলেন ও প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

'জবানবন্দী' ও 'নবান্নে'র অভিনয় অসম্ভব সাফল্যলাভ করে এবং গণনাট্য সঙ্ঘের নাট্যপ্রযোজনার খ্যাতি লোকমুখে প্রচারিত হতে থাকে। তাজা কিছু তরুণ-তরুণীর সহযোগিতায়, আনকোরা সব মানুষের অভিজ্ঞতায় এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতায় সেদিন গণনাট্য সঙ্ঘ ও তার নাটকগুলি জনমানসে দারুণ সাড়া ফেলে দিয়েছিল। শম্ভু মিত্রের খ্যাতিও তার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। আবৃত্তিকার হিসেবেও এখানে তাঁর প্রতিষ্ঠা হয়।

স্বাধীনতার পর ১৯৪৮-এ গণনাট্য সঙ্ঘে নানা ব্যক্তির নানা মত বিরোধে, মতান্তর ও মনান্তরের মধ্য দিয়ে ভাঙন দেখা দেয়। কিছু সহযোগী সঙ্গে নিয়ে শম্ভু মিত্র গণনাট্য সঙ্ঘ ছেড়ে চলে আসেন। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ও অন্যদের সহযোগিতায় গড়ে তোলেন 'বহুরূপী' নাট্যদল। ১৯৪৮-এই তার সূত্রপাত এবং ১৯৫০-এর ১ মে তার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। নবান্ন, উলুখাগড়া ও পথিক নাটক দিয়ে বহুরূপীর পথ চলা শুরু হয়।

বহুরূপী নাট্যদলে শম্ভু মিত্র কোনো পদাধিকারী ছিলেন না, তবে এই দলের তিনিই ছিলেন সর্বেসর্বা। নাটকনির্বাচন, নাট্যপরিচালনা এবং প্রধান ভূমিকায় তিনি অংশগ্রহণ করেছেন।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে 'বহুরূপী'র শুধু সাফল্য আর সাফল্য। তখন বাংলার পেশাদারি সাধারণ রঙ্গালয়ের বাইরে গণনাট্য আন্দোলন এবং গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের মাধ্যমে প্রবলবেগে নাট্যাভিনয় করে চলেছে। শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় এবং অভিনয়ে, খালেদ চৌধুরীর মঞ্চসজ্জায়, তাপস সেনের আলোক সম্পাতে বহুরূপী বাংলা থিয়েটারে উল্লেখযোগ্য নাট্যপ্রযোজনার স্বাক্ষর রেখে চলল। শম্ভু মিত্র রইলেন এসব কিছুর প্রধানতম দায়িত্বে।

প্রয়োজনে শম্ভু মিত্র নিজে নাটক রচনা করলেন (উলুখাগড়া, কাঞ্চনরঙ্গ, চাঁদ বণিকের পালা), বিদেশী ভালো সব নাটকের রূপান্তর করলেন (স্বপ্ন—ও'নীল. পুতুলখেলা, দশচক্র—ইবসেন, রাজা অয়দিপাউস—সোফোক্লেশ), ভারতের অন্য প্রদেশের নাটকের অনুবাদ করলেন (চোপ, আদালত চলছে—তেণ্ডুলকর), রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের নাট্যরূপ দিলেন (চার অধ্যায়, ঘরে বাইরে)। এভাবে বাংলা নাটকের বিষয়ের বিস্তার ঘটিয়ে চললেন। এগুলি তো বটেই, এমন কি রবীন্দ্রনাথের নাটকের ও নাট্যরূপের অভিনয়ে নতুন মাত্রা সঞ্চার করলেন।

অভিনেতা হিসেবে শম্ভু মিত্র সমযুগে খ্যাতির তুঙ্গে উঠেছিলেন। স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলা ও ভারতের রঙ্গমঞ্চে যে কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর ভালো অভিনেতা এসেছেন, শম্ভু মিত্র নিঃসন্দেহে সেই সারিতে আসন পাবেন। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অভিনয় :

দয়াল (নবান্ন), অসীম (পথিক), বিনোদ (উলুখাগড়া), রহিমুদ্দি (ছেঁড়াতার), অতীন ও ইন্দ্রনাথ (চার অধ্যায়), ডাঃ পূর্ণেন্দু গুহ (দশচক্র), রাজা (রক্তকরবী, রাজা), রাজকবিরাজ (ডাকঘর), তপন (পুতুলখেলা), কঙ্কর (মুক্তধারা), পাঁচু (কাঞ্চনরঙ্গ), জয়সিংহ (বিসর্জন), অয়দিপাউস (রাজা অয়দিপাউস), চাণক্য (মুদ্রারাক্ষস), গালিলেও (গালিলেও)।

বিভিন্ন চরিত্র প্রকাশে শম্ভু মিত্রের সাবলীল ও অনায়াস পারঙ্গম শক্তি বিস্ময়কর। কৃষক রহিমুদ্দি থেকে রাজা অয়দিপাউস, চাকর পাঁচু থেকে রাজকবিরাজ, গৃহী তপন থেকে বিপ্লবী ইন্দ্রনাথ, যুবক জয়সিংহ থেকে বৃদ্ধ চাণক্য, ডাক্তার গুহ থেকে বৈজ্ঞানিক গালিলেও—বিভিন্ন ও বিচিত্র ধরনের এবং নানা মাত্রার চরিত্রে শম্ভু মিত্র সবসময়েই

অসামান্য পারদর্শিতা দেখিয়ে বাংলা থিয়েটারে চরিত্র অভিনয়ের নতুন ও গভীরতর মাত্রা যোগ করেছেন।

নাট্যপরিচালক হিসেবেও তাঁর দক্ষতা প্রমানিত। সেই সময়ে বাংলা থিয়েটারে বিশেষ করে বাণিজ্যিক থিয়েটারে সামগ্রিক নাট্যপরিচালনায় গতানুগতিকতা ও একঘেয়েমি ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছিল। শিশির ভাদুড়ি নতুন যুগে নতুন ভাবনায় ও কার্যে নাটক পরিচালনায় অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছিলেন। তবুও তাঁর সীমাবদ্ধতা এক সময়ে বিসদৃশ হয়ে উঠেছিল। গণনাট্য সঙ্ঘ নাট্যপরিচালনায় যে 'টোটাল থিয়েটার'-এর অনুবর্ত্তন ঘটিয়েছিল, শম্ভু মিত্র সেখান থেকে এসে এবং কিছু অংশে শিশির ভাদুড়ির নির্দেশনার শিক্ষা নিয়ে বহুরূপীতে স্বপ্রকাশিত হয়েছিলেন। সূক্ষ্মভাব ও পরিশীলিত রুচি প্রকাশে অনুপুঙ্খ নিষ্ঠা, মঞ্চসজ্জায় 'Suggestiveness', অভিনয়ে চরিত্র বিশ্লেষণের গভীরতা, শব্দ ও বাক্য উচ্চারণের সঠিক পথ নির্দেশ, প্রত্যেকটি চরিত্র এবং অন্য খুঁটিনাটি ব্যাপার ও বিষয়ের দিকে তীক্ষ্ণ নজর—শম্ভু মিত্রের নাট্যনির্দেশনার আসল গুণ। সঙ্গে তিনি বেশ কয়েকজন ভালো অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং কলাকুশলী পেয়েছিলেন। সবার পরিশ্রম, চিন্তা ও নিষ্ঠায় শম্ভু মিত্র তথা বহুরূপীর নাট্যাভিনয় শিক্ষিত, বিদগ্ধ ও নাট্যরসিক ব্যক্তিজনের কাছে আদৃত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, বিদেশী নাট্যপ্রযোজনার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাট্য-প্রযোজনা ও নির্দেশনায় বহুরূপী তথা শম্ভু মিত্র অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়ে রসিকজনের সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করেছিলেন।

শম্ভু মিত্রের নাট্যনির্দেশনার কয়েকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত :

নবান্ন (১৯৪৪), পথিক (১৯৪৯), উলুখাগড়া (১৯৫০), ছেঁড়াতার (১৯৫০), বিভাব (একাঙ্ক—১৯৫১), চার অধ্যায় (১৯৫১), দশচক্র (১৯৫২), স্বপ্ন (১৯৫৩), ধর্মঘট (১৯৫৩), রক্তকরবী (১৯৫৪), পুতুলখেলা (১৯৫৮), মুক্তধারা (১৯৫৯), কাঞ্চনরঙ্গ (১৯৬১), বিসর্জন (১৯৬১), রাজা অয়দিপাউস (১৯৬৪), রাজা (১৯৬৪), বাকি ইতিহাস (১৯৭১), চোপ, আদালত চলছে (১৯৭১)।

শম্ভু মিত্র 'নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি' তৈরি করে বিভিন্ন গ্রুপ থিয়েটার দলের সহযোগিতায় অভিনয় করেন রক্তকরবী, মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি নাটক। এবং কেন্দ্রিয় সরকারের সহায়তায় নানা গ্রুপ থিয়েটারের সাহায্যে সম্মিলিত ভাবে 'নাট্যকেন্দ্র'-র প্রযোজনায় অভিনয় করেন ব্রেখটের নাটক 'গালিলেও'-এর নাম ভূমিকায়। পরিচালনা করেন ব্রেখটের সহকর্মী নির্দেশক বেনিভিৎস।

১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 'বহুরূপী' নাট্যদল ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। কন্যা শাঁওলী মিত্রের 'পঞ্চম বৈদিক' নাট্যদলের হয়ে অভিনয় করেন 'চার অধ্যায়'। তাঁরই নির্দেশনা ও অভিনয়ে চার অধ্যায় অনেকদিন বাদে আবার অভিনীত হয়ে কলকাতার দর্শকমনে উন্মাদনা সঞ্চার করেছিল।

শম্ভু মিত্রের শেষ অভিনয় : ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে, একাডেমি মঞ্চে, 'দশচক্র' নাটকে, ডাঃ পূর্ণেন্দু গুহ'র চরিত্রে। প্রযোজনায় পঞ্চম বৈদিক। নির্দেশনায় শম্ভু মিত্র।

অভিনয় ও নির্দেশনার সাফল্যের কারণে তিনি নানাভাবে পুরস্কৃত হয়েছেন। গণনাট্য সঙ্ঘ তাঁকে দিয়েছিল প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি। বহুরূপী এনে দিল নানা পুরস্কার। উল্লেখযোগ্যগুলি হল :

সঙ্গীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার (১৯৫৯), সঙ্গীত নাটক আকাদেমির ফেলো (১৯৬৬), পদ্মভূষণ (১৯৭০), ম্যাগসেসাই পুরস্কার (১৯৭৬), বিশ্বভারতীর ভিজিটিং ফেলো (১৯৭৭), কালিদাস সম্মান (১৯৮৩)। সাম্মানিক ডি. লিট, রবীন্দ্রভারতী (১৯৮৬) জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮৪), বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯৬), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯৪), বিশ্বভারতীর দেশিকোত্তম (১৯৯২)। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যবিভাগের অধ্যক্ষ (১৯৭১-৭৬)।

নাট্যাভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে শম্ভু মিত্র নাটক ও অভিনয় সম্পর্কে নানা প্রবন্ধ ও গ্রন্থরচনা করেছেন। গ্রন্থগুলি হলো :

অভিনয় নাটক মঞ্চ। কাকে বলে নাট্যকলা। প্রসঙ্গ : নাট্য। সন্মার্গ সপর্যা। নাটক রক্তকরবী।

শম্ভু মিত্র বেতার ও চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন।

উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রে অভিনয় :

'৪২, পথিক, বৌঠাকুরানীর হাট, শুভবিবাহ, মাণিক, সূর্যস্নান, নিশাচর, পান্না, নতুনপাতা, ধরতি কে লাল।

চলচ্চিত্র পরিচালনাও করেছেন। তাঁর পরিচালিত 'জাগতে রহো' হিন্দি চলচ্চিত্র আন্তর্জাতিক সম্মান লাভ করেছিল (১৯৫৭)।

১৯৯৭-এর ১৮ মে মধ্যরাত্রে (ইংরেজি মতে ১৯ মে) কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়।

উৎপল দত্ত (২৯ মার্চ, ১৯২৯–১৯ আগস্ট, ১৯৯৩)

বর্তমানকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, নাট্যনির্দেশক এবং অভিনেতা। নাটক ও নাট্যাভিনয় ছাড়াও অভিনয়ের অন্যান্য মাধ্যমেও, যেমন চলচ্চিত্র, যাত্রা, আকাশবাণী, দূরদর্শন, পোস্টার নাটক—সর্বক্ষেত্রেই তাঁর কুশলী গমনাগমন। সার্থকও হয়েছেন অভিনয়ের বিভিন্ন মিডিয়াতে। তবুও তাঁর প্রধানতম ও একনিষ্ঠ জগৎ হলো থিয়েটারের জগৎ। বাংলা কমার্শিয়াল থিয়েটারের বাইরে যে বৃহৎ নাট্যআন্দোলন চলেছে—তিনি তাঁরই নিত্যসাথী। গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের মধ্য দিয়েই উৎপল দত্তের নাট্যজীবনের বিকাশ।

স্কুল কলেজে ইংরেজি ভাষায় ইংরেজি নাটক, বিশেষ করে শেক্সপীয়রের নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তাঁর থিয়েটার জীবনের শুরু। সেখানে 'দ্য শেক্সপীরিয়ানস' নাট্যদল তৈরি করে কিছুদিন অভিনয় করেন। সেই সময়ে ব্রিটিশ পেশাদারি নাট্যদলের সঙ্গে যুক্ত হন, সেখানে প্রযোজক-পরিচালক হিসেবে পান জিওফ্রে কেন্ডালকে। শেক্সপীয়রের নাটক, তাঁর অভিনয় এবং আধুনিক নাট্য প্রযোজনায় শিক্ষালাভ করেন সেখান থেকে। ১৯৪৯-এর ফেব্রুয়ারি মাসে প্রতিষ্ঠা করেন 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ'

সংক্ষেপে এল. টি. জি। আন্তর্জাতিক লিটল থিয়েটার আন্দোলনের শরিক হিসেবে উৎপল তাঁর দলের নাট্যপ্রযোজনা শুরু করলেন। প্রথমে ইংরেজি ভাষাতেই নাটক করতেন। ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি তৎকালীন কম্যুনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক-নাট্যসংগঠন ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গে নাট্যকার, অভিনেতা ও পরিচালক হিসেবে যোগ দেন। এই সময়েই নাট্যপ্রযোজনায় মার্কসবাদী চিন্তাভাবনার সঙ্গে একাত্ম হন এবং রাজনৈতিক নাটকের আন্তর্জাতিক চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে থাকেন।

গণনাট্য সঙ্ঘ থেকেই উৎপলের বাংলা ভাষায় নাটক অভিনয়ের শুরু। এর আগের সব নাট্যাভিনয় ও পরিচালনা করেছেন ইংরেজি ভাষায়। প্রায় একবৎসর গণনাট্য সঙ্ঘে থেকে, তারপর উৎপল নিজের লিটল থিয়েটার গ্রুপের হয়েই বাংলা ভাষায় নাটক অভিনয় আরম্ভ করেন। তাঁর কাছে থিয়েটার শুধু বিশুদ্ধ শিল্পকলা নয়, থিয়েটারের মাধ্যমে জনগণের কাছে যাওয়া এবং জনচেতনাকে উদ্দীপ্ত করে তোলাই বড়ো কাজ। এল. টি. জি-তে প্রথমে শেক্সপীয়র, ইবসেন, গোর্কি প্রভৃতি নাট্যকারের নাটকের বাংলা অনুবাদ ও রূপান্তর করে অভিনয় করেন। এবং বাংলায় মধুসূদনের বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, গিরিশের সিরাজদৌল্লা, রবীন্দ্রনাথের তপতী, শোধবোধ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অলীকবাবু অভিনয় করেন।

১৯৫৯ থেকে সাধারণ রঙ্গালয় মিনার্ভা ভাড়া নিয়ে সেখানে এল. টি. জি. অভিনয় শুরু করে। প্রথমে ওথেলো, ছায়ানট, নীচের মহল অভিনয় করেন। 'ছায়ানট' উৎপলের মৌলিক পূর্ণাঙ্গ নাট্য রচনা। তারপর তাঁর লেখা 'অঙ্গার' নাটকের অভিনয় (১৯৫৯) বাংলা নাটকের অভিনয়ের ধারায় ইতিহাস সৃষ্টি করল। মিনার্ভায় পর পর অভিনয় করলেন ফেরারী ফৌজ (১৯৬১), তিতাস একটি নদীর নাম (১৯৬৩), কল্লোল (১৯৬৫), প্রফেসর মামলক (১৯৬৫), অজেয় ভিয়েতনাম (১৯৬৬), দিন বদলের পালা (১৯৬৭), তীর (১৯৬৭), মানুষের অধিকারে (১৯৬৮), লেনিনের ডাক (১৯৬৯) প্রভৃতি নাটক। এর মধ্যে প্রফেসর মামলক ছাড়া সবই উৎপলের লেখা নাটক। একটানা ১১ বছর মিনার্ভায় সাফল্যের সঙ্গে উৎপল ও তাঁর দল অভিনয় চালিয়ে যায়।

১৯৬৯-এ উৎপল 'বিবেক যাত্রা সমাজ' নামে যাত্রাদল খোলেন। নিজের দল এবং প্রয়োজনে অন্য দলের জন্য তিনি অনেকগুলি যাত্রাপালা রচনা করেন। রাইফেল, জালিয়ানওয়ালাবাগ, সন্ন্যাসীর তরবারি, মাও-সে-তুঙ, অরণ্যের ঘুম ভাঙছে, সমুদ্রশাসন, বৈশাখী মেঘ, সাদা পোষাক তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য পালা। অন্য দলের হয়ে কিছু পালায় তিনি পরিচালকের কাজও করেছেন।

১৯৭০-এ প্রতিষ্ঠা করলেন পিপলস লিটল থিয়েটার বা পি. এল. টি। পূর্বের লিটল থিয়েটারের সঙ্গে এবার যোগ হল 'পিপলস' কথাটি। পিপলস লিটল থিয়েটারের হয়ে উৎপল লিখলেন এবং পরিচালনা করলেন বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটক। বর্গী এলো দেশে (১৯৭০), টিনের তলোয়ার (১৯৭১), সূর্যশিকার (১৯৭১), ব্যারিকেড (১৯৭২), টোটা (১৯৭৩), দুঃস্বপ্নের নগরী (১৯৭৪), লেনিন কোথায় (১৯৭৬), এবার

রাজার পালা (১৯৭৭), তিতুমীর (১৯৭৮), দাঁড়াও পথিকবর (১৯৮০), অগ্নিশয্যা (১৯৮৮), নীল সাদা লাল (১৯৮৯), একলা চলো রে (১৯৮৯), লালদুর্গ (১৯৯০), জনতার আফিম (১৯৯১), ক্রুশবিদ্ধ কুবা (১৯৯২), ফুলবাবু (১৯৯৩)।

শুধু নাট্যরচনা ও প্রযোজনা-পরিচালনায় কৃতিত্ব দেখানো নয়, অভিনেতা হিসেবেও তিনি অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বহু বিচিত্র চরিত্র রূপায়ণে তাঁর সার্থকতা অবশ্য স্মরণীয়। ওথেলো (ওথেলো), ভক্তপ্রসাদ (বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ), মামলক (প্রফেসর মামলক), লিবোভিৎস (মানুষের অধিকারে), বেণীমাধব (টিনের তলোয়ার), সমুদ্রগুপ্ত (সূর্যশিকার), বাহাদুর শাহ (টোটা); স্টালিন (স্টালিন-৩৪), মধুসূদন (দাঁড়াও পথিকবর), কীচক (পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস) প্রভৃতি চরিত্রের অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

নাট্যরচনায় উৎপল যেখানেই মানুষের সংগ্রাম এবং মুক্তির আকাঙ্ক্ষা দেখেছেন, সেখান থেকেই বিষয় গ্রহণ করেছেন। তা এদেশ-বিদেশ, বর্তমান-অতীত, প্রয়োজনে তিনি সর্বত্রচারী। ভারতের ইতিহাস (সূর্যশিকার, তিতুমীর, টোটা, কল্লোল, ফেরারী ফৌজ প্রভৃতি) ; বিদেশের ইতিহাস (লেনিনের ডাক, নীল সাদা লাল, ক্রুশবিদ্ধ কুবা, মানুষের অধিকারে, অজেয় ভিয়েতনাম, লালদুর্গ, ব্যারিকেড প্রভৃতি), সাম্প্রতিক ঘটনা (দুঃস্বপ্নের নগরী, তীর, এবার রাজার পালা, জনতার আফিম প্রভৃতি)। যেখানেই মানুষ এবং মানুষের মুক্তি সংগ্রাম, উৎপল সেখান থেকেই বিষয় গ্রহণ করে নাট্যরচনা করে, সব সময়েই মুক্তিকামী মানুষের সপক্ষে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছেন। রাজনৈতিক ভাবনার নাট্যরচনা ও প্রযোজনা করে উৎপল বাংলা নাট্যধারায় ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে গেছেন। নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে--দলগত অভিনয়, কম্পোজিশন, সেট-সেটিংস পরিকল্পনা, আলো, আবহ সব নিয়ে বাংলা থিয়েটারে মঞ্চ পরিকল্পনা ও নাট্য উপস্থাপনার যুগান্তকারী সৃষ্টির স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

উৎপল নাট্যবিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করেছেন। চায়ের ধোঁয়া, শেক্সপীয়রের সমাজচেতনা, স্তানিস্লাভস্কির পথ, Towards Revolutionary Theatre, গিরিশ মানস, জপেন দা জপেন যা, আশার ছলনে ভুলি। এছাড়া 'এপিক থিয়েটার'ও 'প্রসেনিয়াম' নামে দুটি থিয়েটার বিষয়ক পত্রিকা সম্পাদনাও করেছেন।

তৃপ্তি মিত্র (২৫ অক্টোবর, ১৯২৫-২৪ মে, ১৯৮৯)

আধুনিক বাংলা থিয়েটারের উল্লেখযোগ্য অভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্র প্রথম অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের 'আগুন' নাটকে ঝগড়াটে বউয়ের চরিত্রে, ১৯৪৩-এর মে মাসে। ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সঙ্ঘের সাংস্কৃতিক শাখা হিসেবে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ তখন পরিচিত ছিল। এরপরে গণনাট্য সঙ্ঘের প্রযোজনায় তিনি জবানবন্দী (১৯৪৩), নবান্ন (১৯৪৪), মুক্তধারা (১৯৪৬) প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করে অসামান্য খ্যাতিলাভ করেন। যথাক্রমে বেন্দার বৌ, বিনোদিনী এবং অম্বার চরিত্রে তিনি অভিনয় করেন।

১৯৪৫-এর ১০ ডিসেম্বর, গণনাট্য সঙ্ঘের অভিনেতা ও পরিচালক শম্ভু মিত্রের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। সেই সূত্রে তিনি 'ভাদুড়ি' থেকে 'মিত্র' নামে পরিচিত হন। শম্ভু মিত্র ও তাঁর সহযোগীবৃন্দ গণনাট্য সঙ্ঘ ছেড়ে বেরিয়ে 'বহুরূপী' নাট্যদল তৈরি করেন। তৃপ্তি মিত্র 'বহুরূপী'তে যোগ দেন এবং নিয়মিত প্রধান অভিনেত্রী হিসেবে অভিনয় করতে থাকেন। বহুরূপীতে তাঁর উল্লেখযোগ্য অভিনয় :

রাধিকা (নবান্ন)--১৯৪৮, সুমিত্রা (পথিক)--১৯৪৯, করুণা (উলুখাগড়া)--১৯৫০, ফুলজান (ছেঁড়াতার)--১৯৫০, এলা (চার অধ্যায়)--১৯৫১, মঞ্জু (দশচক্র)--১৯৫২, নন্দিনী (রক্তকরবী)--১৯৫৪, বুলু (পুতুল খেলা)--১৯৫৮, তরলা (কাঞ্চনরঙ্গ)--১৯৬১, গুণবতী (বিসর্জন)--১৯৬১, ইয়োকাস্তে (রাজা অয়দিপাউস)--১৯৬৪, সুদর্শনা (রাজা)--১৯৬৪, বাসন্তী (বাকি ইতিহাস)--১৯৬৭, অপরাজিতা (অপরাজিতা)--১৯৭১, বেনারেবাঈ (চোপ, আদালত চলছে)--১৯৭১, সুব্রতা (সুতরাং)--১৯৭৫ প্রভৃতি। সব কটিতেই তাঁর উজ্জ্বল অভিনয় স্মরণীয় হয়ে থাকবে। 'অপরাজিতা'য় একক অভিনয় মঞ্চাভিনয়ের ইতিহাসে গৌরবের সম্পদ।

বহুরূপীতে তিনি কয়েকটি নাটকের পরিচালনাও করেন। তার মধ্যে ডাকঘর, কিংবদন্তী, অপরাজিতা, টেরোডাকটিল, গণ্ডার, দুরাশা, ঘরে বাইরে, বাঘ, যদি আর একবার, সেদিন বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্কে, পাখি উল্লেখযোগ্য। বহুরূপীতে তাঁর গৌরবময় অধ্যায় শেষ হয় ৪ মার্চ, ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে। নিজস্ব নাট্যশিক্ষাকেন্দ্র ও নাট্যদল প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৮৩-তে, নাম দেন আরব্ধ নাট্যবিদ্যালয়।

তৃপ্তি মিত্রের মুল অভিনয় জীবন ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের মধ্যে শুরু হয় এবং পরবর্তীকালে গ্রুপ থিয়েটার-এর অভিনয়েই নিজেকে লিপ্ত রাখেন। তবে মাঝে কয়েকটি পেশাদারি নাটকে অভিনয়েও অংশ নিয়েছিলেন। সেতু, হাসি প্রভৃতি নাটকে 'বিশ্বরূপা' সাধারণ রঙ্গালয়েও তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। বেতার, দূরদর্শন এবং চলচ্চিত্রের বিভিন্ন মাধ্যমেও তিনি অভিনয়ে অংশ নেন। কে, এ আব্বাস পরিচালিত হিন্দি চলচ্চিত্র 'ধরতি কি লাল'-এ খ্যাতিলাভ করেন। এছাড়া পথিক, চারণ কবি মুকুন্দদাস-এও অভিনয় করেন।

প্রয়োজনে কয়েকটি নাটক রচনা করেছেন, নাট্যরূপ দিয়েছেন, নাটক সম্পর্কিত বেশ কিছু প্রবন্ধও রচনা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও সারা ভারত এবং বহির্ভারতেও তিনি অভিনয় করেছেন।

ভারত সরকারের 'পদ্মশ্রী', পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'দীনবন্ধু পুরস্কার', মধ্যপ্রদেশ সরকারের 'কালিদাস পুরস্কার'-এর সম্মান তিনি পেয়েছেন। এছাড়া সঙ্গীত নাটক একাডেমি পুরস্কার, আকাশবাণীর 'প্রডিউসার এমেরিটাস', বিশ্বভারতীর 'ভিজিটিং ফেলো'-র সম্মানও তিনি লাভ করেন।

তৃপ্তি মিত্রের মঞ্চে শেষ অভিনয় 'অপরাজিতা' নাটকে অপরাজিতা চরিত্রের একক অভিনয়ে, ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ অক্টোবর।

১৯৪৩ থেকে ১৯৮৮ এই ৪৫ বৎসর তৃপ্তি মিত্রের অভিনয়ের গৌরবোজ্জ্বল

অধ্যায়। নানা ধরনের বিচিত্র চরিত্রের অভিনয়েই তিনি পারদর্শিনী ছিলেন। রানী (সুদর্শনা, ইয়োকাস্তে), চাষীর বউ (বিনোদিনী, রাধিকা, ফুলজানি), ঝি (তরলা), মধ্যবিত্ত বধূ (বুলা), ভাবে ভাবনার রূপকের প্রতিমূর্তি (নন্দিনী) প্রভৃতি ভূমিকায় তিনি সমদক্ষ ছিলেন।

৪৫ বছরের দীর্ঘ অভিনয় জীবনে প্রত্যেকটি চরিত্র রূপায়ণে তিনি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তবে বহুরূপীর অভিনয়ের ঘরানা তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তাই শম্ভু মিত্র সুলভ সুরেলা উচ্চারণ, নাসিক্যধ্বনি-নির্ভর স্বরক্ষেপণ, কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণ একঘেয়ে প্রকাশ তাঁর অভিনয়কে কখনোই অসাধারণত্বের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারেনি।

তবুও, ১৮৭৩-এ বাংলা মঞ্চে প্রথম অভিনেত্রী গ্রহণের ধারাবাহিক ইতিহাস শুরু হওয়ার পর থেকে যতো অভিনেত্রী মঞ্চে এসেছেন, তাদের মধ্যে তৃপ্তি মিত্র অবশ্যই স্মরণীয়। সামাজিকভাবে নিন্দিত অভিনেত্রী জীবনকে গণনাট্য সঙ্ঘ মর্যাদা দিয়েছিল। সেখান থেকে আবির্ভূত তৃপ্তি মিত্র তাঁর সারা জীবনের অভিনয়ে, পরিচালনায়, রচনায় ও ভাবনায় এক জীবন্ত নাট্যসিদ্ধিতে বাংলা থিয়েটারকে মহান মর্যাদা এনে দিয়েছিলেন।

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩–১৪ অক্টোবর, ১৯৮৩)

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা থিয়েটারের উল্লেখযোগ্য অভিনেতা, নাট্যকার ও নাট্যপরিচালক। এই সময়কার বাংলা মঞ্চে অন্য দুজন অসাধারণ প্রতিভাবান শম্ভু মিত্র ও উৎপল দত্তের পরপরই অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর নাট্যকলায় হাতে খড়ি। আসানসোলে ছাত্রজীবনে পি, ডবলু. ডি. (জলধর সেন), বিংশশতাব্দী (তারাশঙ্কর), চার অধ্যায় (রবীন্দ্রনাথ, নাট্যরূপ : অজিতেশ) প্রভৃতি নাটকের অভিনয় করেন। কলকাতার ছাত্রজীবনে প্রস্তাব, দাও ফিরে সে অরণ্য প্রভৃতি নাটক করেন। খসড়া সাংস্কৃতিক পরিষদের হয়ে করেন ডলস হাউস, ঘরশত্রু, জলছবি, কালোটাকা প্রভৃতি নাটক। সব নাটকেরই তিনি পরিচালক এবং মুখ্য ভূমিকাভিনেতা।

ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের সদস্য এবং উদ্যমী কর্মী হিসেবে গণনাট্য সঙ্ঘে ছিলেন ১৯৫৬ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত। সেখানে অভিনয় করেন কয়লার রঙ, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও, পান্থশালা, মা, ধর্মঘট, আমার মাটি, হঠাৎ নবাব, সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রভৃতি নাটকে।

'নান্দীকার' নাট্যদল প্রতিষ্ঠা করেন ২৯ জুন, ১৯৬০। এই নান্দীকার নাট্যদলের হয়েই অজিতেশের নাট্যজীবনের নানা দিকের বিকাশ ঘটে। নান্দীকার প্রথম দিকে গণনাট্য সঙ্ঘের শাখা হিসেবে নাট্যাভিনয় করেছিল। মনে রাখতে হবে, শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, বিজন ভট্টাচার্য ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়—চারজনই জীবনের প্রথমে গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত থেকেই নাট্যাভিনয় করেছেন। পরে সেই শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা নানাদিকে নানাভাবে বিস্তৃত করে দিয়েছেন।

দীর্ঘাকৃতি, সুদেহী, উন্নত ললাট, গভীর চোখ এবং গম্ভীর অথচ সুরযুক্ত কণ্ঠস্বরের

অধিকারী অজিতেশ অসংখ্য নাটকে নানা বিচিত্রধরনের চরিত্রে অসামান্য অভিনয় করেছেন। 'নানা রঙের দিন'-এ রজনী, 'সওদাগরের নৌকা'-য় প্রসন্ন, 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী'-তে লালমোহন, 'পাপপুণ্যে' নিতাই, 'শের আফগানে' শের আফগান, 'আন্তিগোনে' নাটকে ক্রেয়ন প্রভৃতি চরিত্রে তাঁর অভিনয় প্রথম শ্রেণীর অভিনেতার স্বাক্ষর বহন করে। এছাড়া মুদ্রারাক্ষস, প্রস্তাব, সেতুবন্ধন, যখন একা শুভবিবাহ, তিনপয়সার পালা, ভালোমানুষ প্রভৃতি নাটকে অভিনেতা অজিতেশের উজ্জ্বল উপস্থিতি এখনো দর্শকের মনে স্মরণীয় হয়ে আছে।

তাঁর অভিনীত চরিত্রগুলি ছিল মানবিক অভিজ্ঞতায় পূর্ণ, অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে উজ্জ্বল। কখনো তীব্র কখনো সরল, কখনো বা গভীর বিশ্বাসে অনড়। শরীরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তার আবেগ, তার আকাঙক্ষা, তার বুদ্ধিদীপ্ত ও প্রাণবন্ত প্রকাশ দর্শকদের মোহাবিষ্ট করে রাখত। এক একটি চরিত্রের এক একরকম ব্যবহার, এক একরকম ভাষা, স্বভাব, আবেগ—তিনি জীবন্ত করে তুলতেন ডিটেলস-এর ব্যবহারে। মনন ও আবেগের সুসামঞ্জস্য গড়ে তুলে অভিনয়কে তিনি আধুনিক করে তুলতে পেরেছিলেন। গমগমে ভারী গলার খাদ থেকে উঁচু পর্দায় অনায়াস অবাধ বিচরণ ছিল তাঁর নিজস্ব প্রকাশভঙ্গির আরেক ক্ষমতা।

নাট্যপরিচালক হিসেবেও তিনি অনন্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। ১৯৬০-এর দশকে তিনি যখন নাট্যজগতে আসেন, তখন একদিকে শম্ভু মিত্রের 'বহুরূপী' নাট্যদলের পরিচালনায় জীবন ও শিল্পের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও নিখুঁত কারুকাজের অন্তর্নিহিত রস এবং অন্যদিকে উৎপল দত্তের লিটল থিয়েটার গ্রুপের পরিচালনায় উঁচু পর্দায় উদ্দাম প্রাণপ্রবাহের মাধ্যমে 'টোটালিটি' ও 'ম্যাস এপ্রোচ'—বাংলা থিয়েটারে নাট্যপরিচালনার দুই ধারা নির্মাণ করে চলেছিল। গ্রুপ থিয়েটারের এই আন্দোলন তখনকার বাণিজ্যিক সাধারণ রঙ্গালয়গুলির নাট্যাভিনয় পদ্ধতির থেকে সব দিক দিয়েই স্বতন্ত্র ও উজ্জ্বল ছিল।

অজিতেশ এই দুই ব্যক্তিত্বের মাঝে পড়ে হারিয়ে যাননি। তিনি তাঁর নিজস্ব নাট্যপরিচালনার স্বতন্ত্র ধারা তৈরি করে নিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

মঞ্জরী আমের মঞ্জরী, শের আফগান, তিনপয়সার পালা, নটী বিনোদিনী, শাহী সংবাদ, যখন একা, ভালোমানুষ, অন্ধযুগ, নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র, উইল শেক্সপীয়র একাট কল্পনা, প্রভৃতি নাট্যপরিচালনায় তাঁর মুন্সিয়ানা অবশ্যস্বীকার্য। অভিনয়, কম্পোজিশন এবং দলগত অভিনয়ের সাবলীলতার পাশাপাশি ঋজু, সরল মঞ্চস্থাপত্য ও গভীর কল্পনার উপস্থাপনা—তাঁর নাট্যপরিচালক হিসেবে কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করে।

নাট্যকার হিসেবে অজিতেশ খান কয়েক মৌলিক নাটক রচনা করলেও, মূলত তিনি বিদেশী বিখ্যাত নাটকগুলির বঙ্গীকরণ ও রূপান্তরের কাজই করেছেন বেশি। এবং সেই রূপান্তর এতো জীবন্ত ও দেশীয় হয়ে উঠত, যাতে এদেশের প্রেক্ষাপটের এবং মানুষের জীবনসংগ্রামের সঙ্গে তা একাকার হয়ে যেত ।

অজিতেশের মৌলিক নাট্যরচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'সংঘাত', 'সাঁওতাল

বিদ্রোহ,' 'ঘরশত্রু', 'জলছবি', 'সেতুবন্ধন', 'হে সময় উত্তাল সময়', 'সওদাগরের নৌকা'।

রূপান্তরিত নাটকের মধ্যে আন্তন চেকভ অবলম্বনে 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও', 'পান্থশালা', 'জানোয়ার', 'প্রস্তাব', 'নানারঙের দিন', 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী', 'শুভবিবাহ', 'তামাকু সেবনের অপকারিতা' প্রভৃতি রয়েছে। পিরানদেল্লো অবলম্বনে 'শের আফগান', 'ইবসেনের 'বিদেহী', ব্রেখট-এর 'তিনপয়সার পালা', কেসার লিং-এর 'বীতংশ', স্ট্রিন্ডবার্গের নাটক 'শাহীসংবাদ', হ্যারল্ড পিন্টারের '৩৩তম জন্মদিন' প্রভৃতি নাটকগুলি বিদেশী হলেও অজিতেশের ভাষান্তরিতকরণের দক্ষতায় ও রূপান্তরের কৃতিত্বে প্রায় এদেশীয় নাটক হয়ে উঠেছে। এই রূপান্তরিত নাটকগুলি বাংলা নাটকের রীতি, বিন্যাস, চরিত্র, ঘটনা, দৃশ্য, অনুভব এবং ভাব ও বিষয়ের বিস্তার ঘটিয়েছে।

অজিতেশ রবীন্দ্রনাথের 'রবিবার', 'চার অধ্যায়', 'বদনাম' গল্প-উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছেন। তাছাড়া শরৎচন্দ্রের 'পরিণীতা'-রও নাট্যরূপ দেন।

১৯৭০-এর দশকে অজিতেশ তাঁর নান্দীকার নাট্যদল নিয়ে উত্তর কলকাতার 'রঙ্গনা' থিয়েটার ভাড়া করে সেখানে প্রায় পাঁচবৎসর নিয়মিত পেশাদারি থিয়েটারের ধরনে 'তিনপয়সার পালা', 'ভালোমানুষ' প্রভৃতি ব্রেখটের নাটকের বঙ্গীয় রূপান্তরের অভিনয় করেন। এর আগে উৎপল দত্ত এল. টি. জি. নাট্যদল নিয়ে মিনার্ভায় ১৯৬০-এর দশকে এইরকম পেশাদারি ধরনের নাট্যাভিনয় সাফল্যের সঙ্গে চালিয়েছিলেন। গ্রুপ থিয়েটার নিয়ে এইভাবে বাণিজ্যিক থিয়েটারে নিয়মিত অভিনয় করে উৎপল ও অজিতেশ সাধারণ রঙ্গালয়ে নাট্যাভিনয়ের সমৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন।

১৯৭৭-এর ৯ সেপ্টেম্বর অজিতেশ নান্দীকার দল ছেড়ে 'নান্দীমুখ' নাট্যদল প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে নতুন দল নিয়ে শের আফগান, পাপপুণ্য (টলস্টয়), সওদাগরের নৌকা, প্রভৃতি নাটকের অভিনয় করেন।

পেশাদারি থিয়েটারের হয়ে থানা থেকে আসছি, এই অরণ্যে প্রভৃতি নাটকের অভিনয়ে ও পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়া বেতার ও চলচ্চিত্রে (বাংলা ও হিন্দি) অনেক অভিনয় করেন। চলচ্চিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় হলো : অতিথি, ছুটি, হাটেবাজারে, মেঘ ও রৌদ্র, রাণুর প্রথম ভাগ, সাগিনা মাহাতো, গণদেবতা, কপালকুণ্ডলা প্রভৃতি।

যাত্রায় অজিতেশ সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। নাট্যভারতী (রাবণ, দিনবদল), নাগ কোম্পানী (পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিং, হাটে বাজারে), গণবাণী (নটী বসন্তসেনা, কাশ্মীরি কবি, মুগল-ই-আজম) ইত্যাদি যাত্রাদলের সঙ্গে যুক্ত থেকে ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৩ পর্যন্ত নানা চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

অভিনয়ের বিভিন্ন মাধ্যমেও তিনি সফল হয়ে ছিলেন। এছাড়া গীতরচনা ও সুরসৃষ্টিতেও তাঁর কৃতিত্ব অনেক নাটকে দেখতে পাওয়া গেছে।

বাংলা গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যব্যক্তিত্ব অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয় ১৪ অক্টোবর, ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে।

নির্দেশিকা